সম্পাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু
৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বৈশাখ হইতে চৈত্র

১৩৩৮

সম্পাদক—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩৮ { প্রথম সংখ্যা

—দম্পতি—

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ফণিভূষণ আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আজ মনে হইতেছে, অন্তরঙ্গ না হইলেই যেন ভাল হইত। কেন হইত,—সেই কথাই বলি।

এম-এ পাশ করিয়া ভাল একটি চাকরিও সে পাইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে শুনিলাম, ফণিভূষণ নাকি তাহার সে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গ্রামে গিয়া চাষ করিবে।

কথাটা তখন বিশ্বাস করি নাই।

হঠাৎ আমার মামার বাড়ীতে একটা মামলা বাধিল। তাহারই জন্য সেইখানে গিয়া বছর-খানেক বাস করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ফণিভূষণ তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। শহর ছাড়িয়া সত্য-সত্যই সে বীরভূমের কোন্ এক গ্রামে গিয়া চাষ-বাস আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। যাই হোক, আমাকে সে খবর দিতে ভুলে নাই। মামার বাড়ীর ঠিকানা জানিত না বলিয়া আমার বাড়ীতেই একখানা চিঠি সে রাখিয়া গিয়াছে।

কেমন চলিতেছে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, রেল-ষ্টেশন হইতে বহুদূরে প্রকাণ্ড একটা শালের জঙ্গলের পাশে ফাঁকা একটি সমতল মাঠের উপর ফণিভূষণের রাঙা টালির 'বাংলো'। সুমুখে ফুলের বাগান, এবং তাহার পরেই অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া সবুজ শস্যক্ষেত্র। তাহারই পাশে পাশে খড়ের ছাউনী ছোট-বড় অনেকগুলি ঘর। ঘোড়ার 'রাশ্' ধরিয়া ষ্টেশন হইতে ফণিভূষণ নিজেই টম্‌টম্ হাঁকাইতেছিল; আঙুল বাড়াইয়া বলিল, "সাঁওতালদের দিয়ে কাজ করাই, ওগুলো তাদেরই থাকবার জন্যে ক'রে দিয়েছি।……ওই যে লম্বা ঘরখান', ওতে গাই থাকে, গরু থাকে; ছাগল পুষেছি। অভাব কিছুই নেই, তবে কিনা বড্ডো খাটতে হয়।"

সে কথা তাহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। এক বৎসর তাহাকে দেখি নাই, ইহারই মধ্যে গায়ের রং তাহার রৌদ্রে পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে, হাত পায়ের হাড়গুলা মোটা মোটা হইয়াছে, মুখের চেহারা দেখিলে সর্ব্বদাই তাহাকে ক্লান্ত বলিয়া বোধ হয়।

লাল কাঁকরের চমৎকার রাস্তাটি। তাহারই উপর দিয়া টম্‌টম্ একেবারে তাহার বাগানের ফটকের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

আমার সুটকেশটা হাতে লইয়া সহিস আমাদের আগে-আগে বাড়ীর ভিতর গিয়া ঢুকিল। আমরা দুই বন্ধু কথা কহিতে কহিতে

চলিতেছিলাম। সহসা সুমুখে তাকাইতেই দেখি, ফণিভূষণের স্ত্রী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হাসিয়া বলিলাম, "কেমন আছ গো? নতুন জায়গায়......"

সুষমাও হাসিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ভাল। আপনি ভাল আছেন ত?"

"হ্যাঁ।" বলিয়া আর-একবার তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। আগেও ঠিক যেমনটি দেখিয়াছিলাম, এখনও ঠিক তেমনই আছে।—তেমনি চমৎকার গায়ের রং, তেমনি ঢল-ঢল আয়ত দুইটি চক্ষু, বাঁ দিকে মাথাটি ঈষৎ কাৎ করিয়া তেমনি মিষ্টি মধুর হাসিবার সেই অপরূপ ভঙ্গী!

বারান্দার পাশেই ছোট একখানি বসিবার ঘর। মেঝের উপর কার্পেট পাতা, মাঝে একটি টেবিলের চারিদিকে দামী কয়েকটি সোফা সাজানো, দেওয়ালের গায়ে খান-কতক ছবি, খোলা দুইটি জানালার বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত নজর চলে। পশ্চিম দিগন্ত স্পর্শ করিয়া সুবিন্যস্ত ঘন বৃক্ষশ্রেণী যেন আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। বনানী প্রান্তে তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। তাহারই বিচিত্র বর্ণ-চ্ছটা উন্মুক্ত জানালার পথে সুষমার গায়ে মুখে আসিয়া পড়ায় তাহাকে যেন অপরূপ সুন্দরী বলিয়া মনে হইল। মনে হইল, ইহাকে লইয়া ফণিভূষণ যেখানেই যাক, সেইখানেই নন্দন-কানন সৃষ্টি করিয়া তুলিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! বলিলাম, "না ফণি, এ জায়গা ছেড়ে আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না।"

ফণিভূষণ ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, "যেয়ো না। তোমার যতদিন খুশী থাকো এইখানে।"

তাহার পরেই অতিথি সৎকারের পালা! সে যে কত আদর কত যত্ন তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। সুষমা দিবারাত্রি আমার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। কি খাইতে আমি ভালবাসি, কি করিলে আমি সুখে থাকিব, কেমন করিয়া আমায় সে আনন্দে রাখিবে—ইহাই যেন তাহার একমাত্র চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল।

আমারও মন্দ লাগিতেছিল না। মন্দ লাগিবার কথাও নয়।

এম্‌নি দিনের পর দিন!

আমি গান শুনিতে ভালবাসি। সুষমা প্রত্যহ বৈকালে তাহার টেবিল-হারমোনিয়াম বাজাইয়া আমায় তাহার গান শোনায়। তেমন কণ্ঠস্বর কোনোদিন কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শুনিতে শুনিতে এক-একদিন এম্‌নি তন্ময় হইয়া উঠি যে, গান বন্ধ হইবার পরেও একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুষমার মুখের পানে এম্‌নি নির্ল্লজ্জের মত তাকাইয়া থাকি যে, শেষে লজ্জার আর অবধি থাকে না।

আবার এক-একদিন আমার মুখের পানে তাকাইয়া কি যে সে লক্ষ্য করে জানি না, নিজেই হঠাৎ হাসিয়া হয়ত বলিয়া ওঠে, "বুঝেছি আপনার ভাল লাগছে না।"

জোর করিয়া হাসিয়া কত রকম করিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু সুষমা কিছুতেই বুঝিতে চায় না। বলে, "বন্ধু-অন্ত প্রাণ! একা একা ভালই বা আপনার লাগবে কেন?"

মাঠের কাজ শেষ করিয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ফণিভূষণ ফিরিয়া আসে। সুষমা বলে, "এই নাও, এসেছে। এইবার আনন্দ কর।"

বলিয়া সে এক অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া যায়।

এবার আর দিনের পর দিন নয়। মাসের পর মাস!

গ্রীষ্মকাল। সেদিন ছিল রবিবার।

ফণিভূষণ ও আমি টম্‌টম্‌ হাঁকাইয়া শহরে গিয়াছিলাম। মাইল-পাঁচেক দূরে ছোট্ট একটি শহর। দোকানে দোকানে ঘুরিয়া জিনিষপত্র কিনিবার সময়েই সূর্য্যাস্ত হইল। ফণিভূষণ আকাশের পানে তাকাইয়া বলিল, "না মেঘ নেই, জ্যোৎস্না রাত্রি, কষ্ট বিশেষ কিছু হবে না বোধ হয়।"

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা নামিল। গাড়ীর আলো জ্বালাইয়া দিয়া আমরা টম্‌টম্‌ ছাড়িয়া দিলাম। গাড়ী শহরের বাহিরে আসিতেই সহিস্‌টা বলিল, "দাঁড়ান, ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে।"

বলিয়াই সে গাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার পা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "নাল না বাধালে চলবে না বাবু, গাড়ী খুলে দিয়ে আপনারা একটুখানি অপেক্ষা করুন।"

বাধ্য হইয়া আমাদের গাড়ী খুলিয়া দিয়া সেই খানেই বিশ্রাম করিতে হইল। সহিসটা ঘোড়া লইয়া শহরে তাহার নাল লাগাইবার জন্য চলিয়া গেল।

সম্মুখে একটা রেলের পুল। জ্যোৎস্নার আলোয় দূরে লোহার লাইন্‌ চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। পাশেই ছোট্ট একটি শুক্‌নো নদী। সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চাতে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাক।

চোখ বুজিলেই সে দৃশ্য এখনও আমার চোখের সাম্‌নে হুবহু ভাসিয়া ওঠে।

সেই মনোরম সন্ধ্যা, ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীতল, মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোল—প্রকাণ্ড একটা বট-বৃক্ষের নীচে আমাদের গাড়ী খুলিয়া রাখা হইয়াছে, নদীর ওপারে জ্যোৎস্নালোকিত শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে ছোট একখানি গ্রাম, অদূরে কতকগুলা কুলিবস্তির পাশে ষ্টেশনের খালাসীরা বোধ করি কয়লার গাদায় আগুন ধরাইয়াছে, মাঝে-মাঝে গ্রাম্য কুকুরের চীৎকার!...আমরা দুই বন্ধু উঁচু একটা মাটির ঢিপির উপরে গিয়া বসিলাম।

আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ফণিভূষণ বলিল, "আচ্ছা বলতে পার মণি, আমরা যখনই কোনও অদ্ভুত কিছু বলতে চাই, তখনই আমরা আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী ছেড়ে দিয়ে হয় মৃত্যুর কথা ভাবি, নয় ত' মৃত্যুর পরে ভূত-প্রেতের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হই,—কেন বল ত?"

বলিলাম, "যার কথা আমরা কিছু জানি না—সেইখানেই আমরা ভয় পাই। যা আমরা জানি, যা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—সেখানে আর আমাদের ভয়ের কিছু থাকে না।"

ফণিভূষণ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাসের বাতাস আমার গায়ে আসিয়া লাগিতেই আমি তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। মুখখানি বিমর্ষ। বলিল, "আমার কি মনে হয় জানো মণি? দুইই সমান। মৃত্যুর পরপারও আমাদের কাছে যেমন অজানা, বর্ত্তমান জীবনটাও ঠিক তেমনি। তোমার কি মনে হয় জানি না, আমি কিন্তু ভাই মৃত্যুর চেয়ে জীবনকেই বেশি ভয় করি। এ যেন আমার একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়ে ছ মণি।" কথাগুলা শুনিয়া বোধকরি একটুখানি হাসিয়াছিলাম। ফণিভূষণ বলিল, "হাসি নয় ভাই, খুব সত্যি কথা। এই যে আমার প্রতিদিনের জীবন—সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এই যে কাজের পর কাজ - প্রতিদিনের একঘেয়ে একটানা জীবন যাত্রা, এইটেই আমার কাছে সব চেয়ে অদ্ভুত বলে' মনে হয়। এর থেকে যেন মুক্তি নেই। আমারও নেই, তোমারও নেই, বিশ্ব-সংসারে কারও নেই। মনে হয় যেন একটা মিথ্যার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে জীবন আমাদের চির দিনের জন্য বাঁধা, মনে হয় যেন শুধু প্রাণধারণের উদ্দেশ্যে আমরা নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি, অপরকে ফাঁকি দিচ্ছি, এবং পাছে সে ফাঁকি কারও কাছে ধরা পড়ে তারই জন্যে সদাসর্ব্বদা সশঙ্কিত হয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছি।—মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই মিথ্যাচার, এই গ্লানি। আজ একটা কাজ করে' বসলাম, কাল ভাবলাম, ছি, ও-কাজ করলাম কেন। শহরে চাকরি করছিলাম, ভাল লাগল না, এখানে এলাম ফাঁকা মাঠের মধ্যে,—এখানেও সেই অতৃপ্তি। জীবন যেন শুধু এই অতৃপ্তি আর ভয়ে ভরা। নিজেকেও ঠিক ভাল করে' চিনি না, অন্যকেও না। এই ধর—তোমাকে। এত ত' চিনবার ভাণ করি, কিন্তু সত্যিই কি চিনি? তাই তোমাকেও আমি ভয় করি।...”

বলিয়াই সে চুপ করিল। অনেকক্ষণ হইতে একটা ইঞ্জিনের সাঁই-সাঁই শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, দেখিলাম, একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া আমাদের চোখের সুমুখের পুলের তলা দিয়া সশব্দে পার হইয়া গেল।

আবার চারিদিক তেমনি নিস্তব্ধ।

ফণিভূষণ আবার আরম্ভ করিল :

“আচ্ছা মণি, বেশি ভাবলে মানুষ পাগল হয়ে যায়,—না? আমারও কি শেষে তাই হবে নাকি? এক-একসময় সেই কথাই ভাবি। তখন কি করি জানো? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মাঠের কাজে খেটে খেটে নিজেকে একেবারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হায়রাণ করে' ফেলি,—রাত্রে যেন বিছানায় শুয়ে কোনোকথা আমায় ভাবতে না হয়, শোবামাত্র যেন ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসে।...স্ত্রী-বস্তুটি অনেকের কাছে অত্যন্ত সুখের, স্ত্রী জীবনের সঙ্গিনী, আনন্দদায়িনী,—কেমন? আমার কাছে কিন্তু—তুমি জানো না মণি, সুষমাকে আমার জীবনের একটা অতিরিক্ত বোঝা বলে' মনে হয়।”

এই বলিয়া সে তাহার দুইটি হাত মুখের উপর একবার বুলাইয়া লইয়া কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া ঈষৎ হাসিল।

অত্যন্ত ম্লান একটুখানি হাসি!

বলিল,—“জীবনে কী বোকামিই না করেছি মণি! লোকে বলে, আমার অমন স্ত্রী, এমন সুন্দরী, এমন শিক্ষিতা,—আমার সুখের আর অন্ত নেই। কেউ কেউ আবার হিংসেও করে। কিন্তু মণি,—কোনোদিনই আর-কাউকে আমি একথা বলি নি,—তোমায় বলি, শোনো, অত্যন্ত গোপনীয় কথা।”

বলিয়াই যে কথাটি সে আমায় অত্যন্ত সন্তর্পণে কহিল, তাহা শুনিবার প্রত্যাশা আমি করি নাই। বলিল :

“সুষমাকে বিয়ে করা আমার ভুল হয়ে গেছে।”

এই বলিয়া সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল। বলিল, “সে-সব অনেক কথা মণি, তা হোক্; তা হলেও বলি। বন্ধুত্বের সুযোগ নিচ্ছি, কিছু মনে কোরো না।...সুষমার সঙ্গে বিয়ে আমার হঠাৎ হলো সেই কথাই লোকে জানে, ভেতরের ব্যাপার কেউ জানে না; আজ পর্য্যন্ত কাউকে আমি তা জানাতেও পারি নি।...বিয়ের আগেই সুষমার সঙ্গে আমার জানা-পরিচয় হয়েছিল, ভালও বেসেছিলাম। সুষমা বড় মেয়ে, ইস্কুলে পড়ে, ভাবলাম, একখানা চিঠি লিখি। লিখলাম,—তোমায় আমি ভালবাসি সুষমা, যেদিন থেকে দেখেছি সেইদিন থেকেই ভালবেসেছি। তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই, ইত্যাদি অনেক কথা। সে-সব কথা আজ আর আমার মনেও নেই। আমাদের বাড়ীর ঝিকে দিয়ে চিঠি পাঠালাম, বললাম, লুকিয়ে দিয়ে আয়,—দুটি টাকা বখ্‌শীশ্ দেবো। কাঁদতে কাঁদতে ঝি ফিরে এলো। বললে, ‘ছি ছি দাদাবাবু, চিঠি নিয়ে গিয়ে আমার কী কেলেঙ্কারীটাই না হলো! মেয়ে ত' চিঠি পড়ে' রেগেই আগুন! সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে কেঁদে-কেটে মেয়েটা তার মাকে বাবাকে—সবাইকে দেখিয়ে দিলে। আমি ত' পালাবার পথ পাই নে। তবে মেয়েটার বাপ্ লোকটা বড় ভাল। আপনাদের চেনে কিনা,

তাই কিছু বলতে পারলে না। আমায় বললে, 'যাও বাছা, তুমি আর এমন ক'রে এ'সো না।'

"আমি ত' ভয়েই অস্থির! দুদিন আর বাড়ী থেকে বেরোলাম না। কিন্তু সুষমার বাবার তখন অত বড় অবিবাহিতা মেয়ে—বিয়ের ভাবনায় বেচারা অস্থির। আমার সেই চিঠিখানি হাতে নিয়ে শুনলাম তিনি নাকি আমার বাবাকে এসে' ধরে' বসেছেন—'নিন্ মশাই, এর যা হোক একটা কিছু প্রতিবিধান করুন। বিয়ে দিন।' বিয়ে হয়ত বাবা সেখানে আমার দিতেন না, কিন্তু মেয়ে দেখে তাঁর পছন্দ হ'য়ে গেল। সুষমার সঙ্গেই আমার বিয়ের সব ঠিক, এমন দিনে শুনলাম নাকি সুষমা খুব কান্নাকাটি সুরু করেছে—আমায় বিয়ে সে করবে না। হায়, হায়,—ভাবলাম আমি নিজে গিয়ে তার হাতে ধরে অনুরোধ করে' আসি। কিন্তু মেয়ের কথা কে আর শোনে! বিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হয়ে গেল। সুষমার জন্যে সত্যি বলতে কি মণি, আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। ফুলশয্যার রাত্রে তাকে আমি কাছে পেয়ে কত আদর করলাম, কত কথা বললাম, কত বুঝালাম, কিন্তু সুষমা নির্ব্বিকার। ভাবলাম লাজুক মেয়ে, তাই বুঝি এমন ধারা চুপ করে' আছে। কিন্তু না, লজ্জায় নয়,—ক্রমাগত সে আমায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো। এম্‌নি করে' দিনের পর দিন! জিজ্ঞেস করি,—'আচ্ছা বল ত' সুষমা, আমায় পেয়ে তুমি সুখী হও নি?' জোর করে' ঘাড় নেড়ে বলে, 'না, না, না।' আমার দিক থেকে অনুরোধ-উপরোধের আর অন্ত রইল না—'তুমি আমায় ভালোবাসো সুষমা, তুমি আমায় দয়া কর, তুমি আমায় বাঁচাও!' সেই তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত!"

"সুষমাকে আর আমি বাপের বাড়ী যেতে দিই নি—নিজের কাছে রেখে শুধু ভালবাসা ভিক্ষা করেছি। এখন আর ভালবাসার কথা তার কাছে বলতে আমার ভয় করে। তবে এটুকু আমি জানি মণি,—সুষমা ভাল আমার বাসতে পারে নি। ভেবে দেখ ত' কি ভীষণ ব্যাপার! স্বামী স্ত্রী—একই ঘরে দিনের পর দিন বাস করছি, একই শয্যায় শয়ন, ছেলেও হয়েছিল দুটো মারা গেছে,—কিন্তু ভালবাসার বন্ধন তার দিক থেকে কিছু নেই। এইটেকেই আমি সব চেয়ে বেশি ভয় করি। জীবনের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার নয় ত' এ কী!—এক একসময় মনে হয় আত্মহত্যা করি। নিজেকে ঘৃণা করি, সুষমাকে ঘৃণা করি—বিধাতাকে অভিশাপ দিই। অথচ কোনও কুল-কিনারা খুঁজে পাই না। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে সুষমা সুখী হয়, আমি কথা না কইলে সুষমা ভাল থাকে,—আমায় সে মনে-মনে ঘৃণা করে, সেকথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু উপায় নেই। তার ওপর বিধাতার এম্‌নি পরিহাস,—সুষমা দিনেদিনে আমার চোখের সুমুখে যেন আরও সুন্দরী হয়ে উঠছে। দেখেছ ত' কি অপরূপ সুন্দরী?"

ফণিভূষণের গলার আওয়াজ ভারি হইয়া আসিল। আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "এ জীবন কে চেয়েছিল বল ত' মণি? একে ভয় করব না ত' কাকে করব?"

আরও হয়ত সে বলিত, কিন্তু পশ্চাতে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাইয়া তাকাইয়া দেখিলাম, আমাদেরই সহিস্ আসিতেছে। ফণিভূষণ চুপ করিল।

গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জ্যোৎস্নার আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিলাম, ফণিভূষণের মুখে আর সে ক্লান্তির ভাব নাই। বলিল, "মনে যদি সুখ থাক্‌তো মণি, হয়ত তা হ'লে আমরা আবার কলকাতায় গিয়েই বাস কর্‌তে পার্‌তাম, কিন্তু মা, আর সে জন-কোলাহলের মধ্যে নয়—এই নীরব নির্জ্জন বনানীপ্রান্তে এই সব নিরক্ষর চাষার সঙ্গই আমার ভালো।—কাল সকালে আমায় একবার

যেতে হবে, বুঝলে মণি, খানিকটা জঙ্গল আমি জমায় বন্দোবস্ত নিয়েছি, শাল গাছ কাটা হয়ে গেছে, কাল সেগুলো বিক্রি করব ভাবছি।"

কাল সমস্ত দিন ফণিভূষণ বাড়ী ফিরিবে না, আমায় একা থাকিতে হইবে, ভাবিতে গিয়া প্রথমটা কেমন যেন খারাপ বোধ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আকাশের অজস্র জ্যোৎস্নার পানে তাকাইতেই মনে পড়িল—সুষমাকে, তাহার সেই অপরূপ গৌর কান্তি, সেই অসংবদ্ধ কুঞ্চিত কৃষ্ণ অলকদাম, সেই ঢলঢল আয়ত চক্ষু, সেই মুখ, সেই হাসি! ভাবিলাম, স্বামীকে সে তাহার ভালবাসে না।

বাড়ী পৌঁছিতেই সুষমা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরি?"

জবাব দিল ফণিভূষণ। আমি কিন্তু নীরবে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিলাম,—সুষমা সুন্দরী, সুষমা অপরূপ, সুষমা রহস্যময়ী! যে কথা একটি দিনের জন্যও আমি ভাবিতে পারি নাই, আজ যেন শুধু সেই কথাটাই বারে-বারে আমার মনে পড়িতে লাগিল —ফণিভূষণকে সে ভালবাসে না। সুষমার কথায়-বার্ত্তায় হাসিতে-চাহনিতে প্রত্যেকটি গতিভঙ্গীতে আমি শুধু তাহারই ইঙ্গিত খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলাম।

আহারাদির পর ফণিভূষণ বলিল, "রাত-তিনটের সময় আমায় ঘুম থেকে উঠে জঙ্গলে যেতে হবে মণি, আমার অনেক কাজ, কিছু মনে কোরো না, আমি ঘুমোতে চললাম।"

বলিয়াই সে তাহার স্ত্রীর মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, "তোমরা দুজনে একটু গল্প সল্প কর, তারপর ঘুমিও। ঘুম যদি ভাঙে ত' আমায় তুলে দিও কিন্তু।"

ফণিভূষণ চলিয়া গেল।

আমি আর সুষমা! সুষমা আর আমি! মুখোমুখি বসিয়া আছি। কি যে বলিব—কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। হাসিয়া বলিলাম, —"একটু গান শোনাবে চল।"

বাহিরের ঘরে গিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া সুষমা আমায় গান শোনাইতে বসিল।

গান বেশীক্ষণ ভাল লাগিল না! বলিলাম "আর না।" থাক্।

সুষমা বলিল, "হুঁ, বন্ধু কাছে না থাকলে কিছু ভাল লাগে না,—না?"

আমি হাসিলাম।

বলিলাম, "বন্ধুর বাড়ীতে মানুষ দু'-চারদিনই থাকে, বড় জোর এক সপ্তাহ, কিন্তু আমার ত' দেখি, যাবার নাম নেই।"

বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে পায়-চারি করিতে লাগিলাম। সুষমাও উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া সে তাহার বড় বড় চোখ দুইটি তুলিয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "তার মানে?"

জবাব দিলাম না।

সুষমা বলিল, "মিথ্যা কথা। আপনি আছেন এখানে—সে শুধু আপনার বন্ধুর জন্যে। আর কারও জন্যে নয়। ভাল ভাল,—আজ-কালকার দিনে এমন বন্ধু প্রায়ই দেখা যায় না।"

বলিয়াই সে ঈষৎ হাসিয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

কি যে বলিব বুঝিতে পারিতেছিলাম না। শেষে অতি কষ্টে তাহার একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া বলিলাম, "বাইরে বারান্দায় বড় চমৎকার জ্যোৎস্না, চল বসে বসে একটু গল্প করা যাক্।"

সুষমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।"

আমি নিজেই বারান্দায় বাহির হইয়া গেলাম। বেশ একটুখানি জোরে-জোরে তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিলাম, "বাঃ, চমৎকার জ্যোৎস্না!"

শুনিলাম, সুষমা জবাব দিল,—"বয়ে গেল তাতে আমার কি!"

আবার ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? জ্যোৎস্না কি তোমার ভাল লাগে না—সত্যিই?"

"না। আমার কিছু ভাল লাগে না। -যাক্, সে-সব কথা শুনে আপনার লাভ ত' কিছু নেই।"

আমি নিজেই তখন হারমোনিয়ামের কাছে গিয়া আপন-মনেই যা' তা' বাজাইতে সুরু করিলাম। ভাবিলাম, দেখি কি বলে।

বলিল, "থাক্, আর বাজিয়ে কাজ নেই। ঘুম পেয়েছে আপনার। যান্—ঘুমোন্ গে। কেন মিছেমিছি রাত জাগছেন বলুন ত?"

কিছু না বলিয়াই আমি বাজাইতে লাগিলাম। সুষমা বোধকরি বিরক্ত হইয়াই বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

আমিও তাহার পিছু-পিছু নিতান্ত কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "কাল আমি চলে' যাব।"

ঈষৎ হাসিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সুষমা বলিল, "নিশ্চয়ই যাবেন। সে ত জানা কথা। বন্ধু বাড়ী থাকবে না, আপনি থাকবেন কেমন করে? থাকা আপনার উচিতও নয়।"

বলিয়াই সে একটুখানি থামিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে যদি আপনার বিয়ে হতো ত' দেখাতাম মজা! আচ্ছা দাঁড়ান! দেখাচ্ছি। আপনার গায়ের ওপর একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ব। চীৎকার ক'রে ছুটে পালাবেন।—কেমন? ওঃ, ভারি মজা হবে তা হ'লে।"

সুষমার মুখের পানে তাকাইয়া দেখি—তাহার স্নিগ্ধ কমনীয় দু'টি চক্ষু যেন আমারই দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

সেদিক পানে তাকাইতে আমার ভয় করিতেছিল, চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিন্তু সে কতক্ষণই বা!

সুষমা বলিল, "রাত হয়েছে। ঘুমোবেন চলুন, আপনার ঘুম পেয়েছে।"

বারান্দা হইতে দুজনেই ঘরে ঢুকিলাম।—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সুষমা বলিল, "নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবেন যেন, রাত জাগবেন না।" বলিয়াই সে হাসিল।

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, "নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে আমি চাই না সুষমা। বিধাতাকে তা হ'লে আমি অভিশাপ দেবো।"

তাহার পরেই ছাড়াছাড়ি। সেও চলিয়া গেল তাহার ঘরের দিকে, আমিও আমার নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। টেবিলের উপর আলোটা কমাইয়া রাখা হইয়াছিল। ভাল করিয়া জ্বালিয়া দিলাম। দেখিলাম, ফণিভূষণ তাহার গায়ের জামাটি আমারই ঘরে আমার জামার পাশেই টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে।

শয্যায় শয়ন করা বৃথা। ঘুম হইবে না জানি। আলোটা একেবারেই নিভাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বারান্দা পার হইয়া বাগানে গিয়া দাঁড়াইলাম। গাছের মাথার উপরে আকাশে চাঁদ রহিয়াছে। চারিদিকে ফুলের গাছ। একটা বেঞ্চির উপর গিয়া চুপ করিয়া বসিলাম। জীবন যৌবন, বন্ধুত্ব, নারী এবং মৃত্যুর কথা ভাবিতে গিয়া শুধু সেই এক কথাই মনে হইতে লাগিল। সেই সুষমা! যে সুষমা তাহার স্বামীকে ভালবাসে না—সেই সুন্দরী সুষমা!

ফণিভূষণের কথাই ঠিক! জীবনের মানে আমরা বুঝি না, জীবন সত্যই ভয়াবহ। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া দুঃখকে জোর করিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া সুখটুকু তাহা হইতে নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লওয়াই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

এমনি-সব এলোমেলো কত কথাই না ভাবিতেছিলাম।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখি, সুষমা আবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেখিবামাত্র একেবারে উন্মাদের মত ছুটিয়া আমি তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাহাকে আর কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়াই অতর্কিতে আমার দুই ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু দিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, "তোমায় আমি ভালবাসি সুষমা !"

সুষমা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না।

আমি তাহার ললাটে, ওষ্ঠে, গণ্ডে, গ্রীবায় চুম্বন করিয়া করিয়া তাহাকে একেবারে বিপর্য্যস্ত বিহ্বল করিয়া তুলিলাম।

ধীরে-ধীরে দু'জনেই আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। অন্ধকার ঘর। আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া নিতান্ত সন্তর্পণে সুষমা কহিল, "আমিও তোমায় ভালবাসি।"

তাহার পর দু'জনের অনেক কথা !

সুষমা শুধু সুন্দরী নয়, সে ভালবাসিতেও জানে। বলিল, "চল আমরা দু'জনে কোনও দেশ দিয়ে পালাই।"

কথাটার জবাব দিই নাই সেকথা আমার বেশ মনে আছে। জানালার পথে চাঁদের আলো আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি শুধু সেই আলোকে সুষমার মুখখানি বারে বারে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সুষমা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া চুম্বন করিয়া ভালবাসার নামে আমায় অনেক-কিছু শপথ করাইয়া লইতে চাহিল। আমি কিন্তু তাহা চাই নাই। আমি চাহিয়াছিলাম—একটিমাত্র রাত্রি,—অশ্রু নয়, ভবিষ্যতের চিন্তা নয়,—জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর একটিমাত্র চির-স্মরণীয় স্মৃতি !

রাত্রি প্রায় চারটার সময় সুষমা আমার ঘর হইতে বাহির হইল। আমি দরজার চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সহসা দেখি—আমাদের চোখের সুমুখে ফণিভূষণ !

সুষমা যেন একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া গেল। আমি মনে-মনে বলিলাম, ধরণী, দ্বিধা হও।

ফণিভূষণ ঈষৎ হাসিল, কাশিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া আমাদের কাহারও পানে না তাকাইয়া বলিল, "জামাটা কাল এই ঘরে রেখে গেছি বোধহয়।"

বলিয়া সে আমার ঘরে ঢুকিয়া দেওয়ালে টাঙানো জামাটা হাত দিয়া তুলিয়া লইল। স্পষ্ট দেখিলাম, হাতের আঙুলগুলি তাহার কাঁপিতেছে।

জামাটি গায়ে দিয়া সে একবার কটাক্ষে আমার বিছানাটার দিকে, একবার আমার পায়ের দিকে তাকাইয়াই ধীরে-ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেখিলাম, সে বারান্দা পার হইয়া বাগানের পথে গিয়া নামিল, তাহার পর বাগান পার হইয়া ফটক পার হইয়া মাঠের পথ ধরিয়া আস্তাবলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সহিস গাড়ী জুড়িয়া দিল। ফণিভূষণ গাড়ীতে চড়িয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিতেই ঝুম ঝুম করিয়া ঘুঙুর বাজাইয়া ঘোড়া ছুটিল।

* * *

কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন সবেমাত্র প্রভাত হইতেছে। রাত্রির অন্ধকার তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই।

পথ চলিতে চলিতে গত রাত্রির কথাই ভাবিতেছিলাম। নিজেরই উপর ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় যেন সর্ব্ব শরীর রী রী করিতে লাগিল। বন্ধু ফণিভূষণের কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারিতে-

ছিলাম না। জীবনের অর্থ সে আজিও খুঁজিয়া পায় নাই, তাই সে জীবনের প্রত্যেকটি বস্তুকে ভয় করিয়া চলে। তাহার সেই ভয় যেন আমাকেও পাইয়া বসিল। ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম।

এ কাজ কেন করিলাম?—কেন করিলাম?

প্রশ্নের জবাব মিলিল না।

সুষমাই বা আমায় ভালবাসিতে গেল কেন? ভালই যদি বাসিল ত' আমার কাছে আসিল কেন এবং ঠিক সেই সময়েই ফণিভূষণেরই বা জামার প্রয়োজন হইল কেন কিছুই বুঝিলাম না।

তুচ্ছ একটা জামা লইতে আসার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধই বা কতটুকু!...

ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার ট্রেণে চড়িয়া বসিলাম।

সেই অবধি তাঁহাদের সঙ্গে আমার আর দেখা করিবার সুযোগ ঘটিয়া ওঠে নাই; তবে শুনিলাম নাকি তাহারা দুই স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতেছে। *

* শেখব

টিউব ওয়েল

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

এক

তেরশ' পঁয়ত্রিশ সালের বৈশাখ মাস।

আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধুর একখানি অনুরোধ-পত্র নিয়ে আঠারো উনিশ বছর বয়সের একটী যুবক আমার কাছে উপস্থিত হোলো। পত্রখানি পড়ে দেখ্‌লাম, বন্ধু এই যুবকটীর একটা চাকরী ক'রে দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ছেলেটীর নাম রমেশচন্দ্র দাস; মাহিষ্যের ছেলে, মেদিনীপুর স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেছে, ইংরাজীও সামান্য কিছু জানে। যখন মেদিনীপুরে পড়ত, তখন সেখানে যাঁর আশ্রয়ে রমেশ ছিল, তাঁর একটা ছোটখাটো প্রেস ছিল। রমেশ তার অবকাশ সময়ে সেই প্রেসে কম্পোজ করা শিখ্‌ত। সে ইংরাজী বাঙ্গালা বেশ কম্পোজ কর্‌তে পারে; হাতও খুব চলে। ছেলেটী অতি সচ্চরিত্র ও বিনয়ী।

পত্রখানি পড়া শেষ ক'রে রমেশকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, সে আরও পড়াশুনা না ক'রে চাকরীর খোঁজে বেরিয়েছে কেন?

রমেশ বলল, আমার নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ারই ইচ্ছে ছিল; কিন্তু, এই মাস তিনেক হোলো বাবা মারা যাওয়ায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ীতে তোমার আর কে আছেন?

রমেশ বল্‌ল, বিধবা মা, আর বিধবা নিঃসন্তান এক বড় দিদি আছেন; আর কেউ নেই।

বল্‌লাম, তোমরা ত তিনটী মানুষ, তার মধ্যে আবার দু'জন বিধবা। তোমাদের কি এমন কিছু নেই, যাতে এই তিনটী মানুষের ছোট সংসার চলে।

রমেশ বল্‌ল, সামান্য যা কয়েক বিঘে জমি আছে, নিতান্ত অজন্মা না হ'লে তাতে কোন রকমে চ'লে যায়, কষ্ট হয় না। তা হ'লেও আমার কিছু উপার্জ্জন করা দরকার। প্রেসের কম্পোজের কাজ আমি শিখেছিলাম। মেদিনীপুরে হরেন্দ্রবাবুর কাছেই ছিলাম; তিনিই তাঁর প্রেসে আমাকে কাজ শিখিয়েছিলেন। তাঁর প্রেস ত বড় নয়, কাজ-কর্ম্মও তেমন বেশী নয়। তাই, তাঁর ওখানে কাজের সুবিধে হবে না ব'লে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার সঙ্গে অনেক প্রেসওয়ালার জানাশোনা আছে; একটু দয়া কর্‌লেই আমার একটা কাজ হয়ে যেতে পারে।

আমি বল্‌লাম, তুমি যদি অন্য কোন কাজ পাবার আশায় এখানে আস্‌তে, তা হ'লে তোমাকে পত্রপাঠ বিদায় ক'রে দিতাম। কাজকর্ম্ম এখন মেলে না; কিন্তু, তুমি প্রেসের কাজ জান, তোমার একটা কিছু ঠিক করে দিতে পার্‌ব, এ আশা তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু, তার জন্যেও ত দু'-চারদিন অপেক্ষা কর্‌তে হবে, আমাকে সন্ধান কর্‌বার সময় দিতে হবে।

রমেশ বলল, সে ত হবেই।

আমি বল্‌লাম, তুমি এখানে কবে এসেছ?

রমেশ বল্‌ল, আজই এসে ষ্টেসন থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি। এখানে আমার চেনা লোক কেউ নেই; কলকাতায় আমি এর আগে কখন আসি নি। রেলে একজন কলেজের ছেলের সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁকে বল্‌তে, তিনিই

আমাকে আপনার বাড়ীতে এনে দিয়ে গেলেন; তা না হ'লে এত বড় সহরে পথ চিনে আমি হয় ত আস্‌তেই পার্‌তাম না। আপনি কোথাও আমার থাক্‌বার একটা স্থান ঠিক করে দেন; আমার কাছে ছ'টা টাকা আছে। তাই দিয়ে বাসাখরচ চালাতে চালাতে আপনার দয়ায় একটা কিছু ঠিক হয়েই যাবে। আমি না হয় এক বেলা উপবাসই কর্‌ব। তাতে কি এই ছয় টাকায় দিনকয়েক চল্‌বে না? এখানে নাকি খরচ খুব বেশী লাগে, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। বাড় থেকে আর টাকা আন্‌তে পার্‌ব না; তা হ'লে মা আর দিদির কষ্ট হবে।

রমেশ যখন এই কথাগুলো বল্‌ছিল, আমি তখন তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, ছেলেটী সত্যসত্যই সুবোধ ও বিনয়ী। তার কথা শুনে আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হ'ল। আমি বল্‌লাম দেখ রমেশ, যে ক'দিন তোমার কাজকর্ম্ম না হয়, সে ক'দিন আমার এখানে থাক্‌তে তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

রমেশ একটু চুপ ক'রে থেকে হাতযোড় ক'রে বল্‌ল, সে কি ক'রে হবে? শুনেছি, এখানে খরচ বড় বেশী। আমার জন্য আপনি এত খরচ কর্‌বেন কেন? সে হয় না। আপনি দয়া ক'রে আমার একটা কাজ ঠিক ক'রে দেবেন, এই ঋণই যে আমি শোধ কর্‌তে পার্‌ব না। আপনি একটা যে কোন স্থান ঠিক ক'রে দেন। আমার ছ'টা টাকাতে যদি না কুলোয়, তখন না হয় আপনার কাছে কিছু ধার নেব, কাজ হ'লে শোধ কর্‌ব।

আমি বল্‌লাম, সে কথা পরে হবে। আমি ত তোমাকে স্থায়ীভাবে এখানে থাক্‌তে বল্‌ছি নে যে, তুমি কুণ্ঠা বোধ কর্‌ছ। যে ক'দিন কাজ না পাচ্ছ, সেই ক'দিন আমার এখানে থাক; কাজ ঠিক হয়ে গেলে একটা বাসা খুঁজে নিও, আমি তখন আপত্তি কর্‌ব না।

রমেশ তার সঙ্কোচের ভাব দূর করতে পার্‌ছিল না; কি যে বল্‌বে, তাও ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না; সুধু বল্‌লে—তা, তা, সে কি ক'রে হবে।

আমি হেসে বল্‌লাম, সে যা ক'রে হয়, তা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। তুমি ভাবছ, তোমায় দু'বেলা দুটো খেতে দিতে আমার অতিরিক্ত খরচ হবে, কেমন? তুমি ছেলেমানুষ, ঘরগৃহস্থালী ত কর নি। পনেরজনের সঙ্গে অতিরিক্ত দু'এক-জন যোগ দিলে গৃহস্থের খরচ বাড়ে না, ওইতেই চলে যায়। তুমি আপত্তি করো না, আমার এখানেই দিনকয়েক থাক। আমিও গরিব মানুষ, তুমিও গরিবের ছেলে; আমার সামান্য শাকভাতে তোমার কষ্ট হবে না, তাই ভেবেই তোমাকে অনুরোধ কর্‌তে সাহস করেছি।

কি যে আপনি বলেন, ব'লে রমেশ আমার পায়ের ধূলা নিতে এল; আমি তার হাত চেপে ধরে বল্‌লাম, প্রণাম কর্‌তে হবে না, অমনিই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি দীর্ঘজীবন লাভ করো, ধর্ম্মে মতি হোক্।

তিন-চারদিন পরেই মীরা প্রেসে রমেশের একটা চাকুরী ঠিক করে দিলাম। প্রেসের কর্ত্তারা বল্‌লেন, এক সপ্তাহ কাজ দেখে তবে মাইনে ঠিক করে দেবেন।

এই চারদিনের মধ্যেই রমেশ আমার বাড়ীর সকলের আপনার জন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কোন অপরিচিত লোক এলে বুঝ্‌তেই পার্‌ত না যে, রমেশ এ বাড়ীর ছেলে নয়। এই চারদিনে বাড়ীর সব কাজে রমেশ; মনে হয় সে যেন দশ বছর এই বাড়ীতে আছে। আমার গৃহিণী তার ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন; ছেলেপিলে বউ-ঝি সকলেরই সে আপনার জন হয়ে গেল। এমন সুন্দর ছেলে আমি ত কোনদিন দেখি নি। কোন একটা কাজ কর্‌তে গেলে গৃহিণী যদি বলেন, থাক্ বাবা, ওরা কর্‌বে। রমেশ অমনি ব'লে ওঠে, ওরা কর্‌বে কেন মা, দিন না পয়সা আমি

বাজার থেকে এনে দিচ্ছি। সারাদিন সে এ-কাজ ও-কাজ নিয়েই আছে।

যেদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে মীরা প্রেসে কাজ ঠিক করে দিলাম, সেদিন বাড়ীতে এসেই আমার গৃহিণীকে বল্‌ল, মা, বাবু আমার কাজ ঠিক ক'রে দিয়েছেন; কাল থেকে বেরুতে হবে।

গৃহিণী বল্‌লেন, বেশ হয়েছে। মাইনে কত পাবে বাবা?

রমেশ বল্‌ল, মাইনে কি এখনই ঠিক হয়! কাজ দেখে তবে মাইনে ঠিক হবে। তারা বলেছেন, সাতদিন আমার কাজ দেখে তারপরে বল্‌বেন আমি কত টাকা মাইনে পাবার উপযুক্ত। সে ত ঠিক কথা, কি বলেন মা!

গৃহিণী বল্‌লেন, তা হ'লে এখনও পাকা হয় নি, সাতদিন পরে যদি তাঁরা বলেন, না, তোমায় দিয়ে কাজ চল্‌বে না; তা হ'লে ত চ'লে আস্‌তে হবে।

রমেশ হেসে বল্‌ল, তা আর বল্‌তে হবে না মা, আপনি দেখে নেবেন। আমি খুব ভাল কম্পোজ কর্‌তে পারি, কি বাঙ্গালা কি ইংরেজী। তবে কি জানেন মা, আমি ত স্কুলে ইংরেজী পড়ি নি, বাড়ী ব'সে একটু-আধটু পড়েছি, তাও সেই রয়ালরিডার নম্বর থি পর্য্যন্ত। সে আর কতটুকু। তাই ইংরেজী হাতের লেখা যদি জড়ানো হয়, তা হ'লে ভাল পড়্‌তে পারিনে, তাই কম্পোজ কর্‌তে একটু দেরীও হয়, আর ভুলও হয়। কিন্তু বাঙ্গালা কম্পোজে আমি ডরাই নে মা। আপনাকে একদিন আমার প্রুফ এনে দেখাব, দেখ্‌বেন, ভুল হয় ত একটা-আধটা। তা মা, তাড়াতাড়ি কম্পোজ কর্‌তে গেলে আর একটা-আধ্‌টা ভুল হবে না, কি বলেন মা!

গৃহিণী বল্‌লেন, সে ত ঠিক কথা। আচ্ছা, তুমি কত মাইনে আশা কর বাবা?

রমেশ বল্‌ল, আমি তা কি ক'রে বল্‌ব, আমি তা জানি নে। সাতদিন পরে তাঁরা বাবুকে বল্‌বেন; তিনি যদি তাতে স্বীকার হন, কাজ কর্‌ব। সে কথা থাক্ মা, আমি বল্‌তে এসেছি কি—না, এখন থাক্, কেমন মা?

গৃহিণী বল্‌লেন, কি তোমার কথা রমেশ?

রমেশ বল্‌ল, বল্‌লাম যে, এখন থাক।

আমি বল্‌লাম, বলই না তোমার মনের কথাটা কি?

রমেশ বল্‌ল, আপনি ত বলেছিলেন, কাজ ঠিক হ'লেই আমার একটা বাসা ঠিক ক'রে দেবেন। কাজ ত হোলো, এখন বাসার কি হবে? মীরা প্রেসের একজন কম্পোজিটর বল্‌ছিল, তারা গোয়াবাগানে না কোথায় একটা ঘর ভাড়া করে তাতে পাঁচজন থাকে, নিকটেই একটা হোটেল আছে, সেখানে দু'বেলা খায়। তাদের সেই ঘরে আরও একজনের স্থান হ'তে পারে। সে বল্‌ল, ঘরভাড়া আট টাকা লাগে; পাঁচজনের যায়গায় ছয়জন হ'লে ভাড়াও প্রত্যেকের কম হবে। সে বল্‌ল, ঘরভাড়া, হোটেলে দু'বেলা খাওয়া, আর এটা-ওটা খরচসুদ্ধ তাদের বারো-তেরো টাকার বেশী কোন মাসেই লাগে না। সেখানেই কেন কাল থেকে যাই না। ওর থেকে কম খরচে কি আর কোথাও ব্যবস্থা হ'তে পার্‌বে?

আমি বল্‌লাম, যাদের সঙ্গে থাক্‌বে, তাদের স্বভাব-চরিত্র, ব্যবহার প্রভৃতি না জেনে আমি কোন কথাই—

আমার কথায় বাধা দিয়ে গৃহিণী বল্‌লেন, তারা যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও হয়, কি ভগবান বুদ্ধদেবও হন, তা হোলেও তোমাকে সেখানে—আর সেখানেই বা কেন, কোনখানেই যেতে দেব না; যে কয়দিন আমরা আছি, তোমাকে আমাদের কাছ ছাড়া কর্‌ব না, এ তুমি ঠিক জেনে রেখো রমেশ!

রমেশ অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল; শুন্‌লেন বাবু মায়ের কথা। মা কিনা;

তাই না বুঝে-সুজেই ব'লে ফেল্‌লেন এক কথা। গৃহিণীর দিকে চেয়ে বল্‌ল, আমাকে কি কাজ কর্‌তে হবে জানেন মা; সেই সকালে ন'টার সময় হাজিরা দিতে হবে, আর সন্ধ্যা ছ'টায় ছুটী। তাও সব দিন নয়, যেদিন কাজ বেশী থাক্‌বে, সে দিন চাই কি, রাত দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত কাজ কর্‌তে হবে। তবে কি জানেন মা, রোজ ন'টা থেকে ছ'টাই বাঁধা কাজ। তার পরেও কাজ কর্‌লে ওভার টাইম পাওয়া যায়। সেই সাড়ে আটটায় খেয়ে বেরুতে হবে, ফিরতে হবে, সাড়ে ছ'টায়। এমন চাকরীর যোগান দেওয়া মা, আপনার কর্ম্ম নয়। আর বাড়ীর কাজ কর্ম্ম যে আমি মোটেই দেখতে পারব না। সে কি ক'রে হবে বাবু, আপনিই বলুন না।

গৃহিণী বল্‌লেন, সে ভাবনা তোমায় ভাব্‌তে হবে না; সাড়ে আটটা কেন, আটটার মধ্যেই আর কেউ না পারুক, আমি রোজ তোমার ভাত রেঁধে দেব। তোমাকে কোন কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে হবে না, তোমাকে কিছু কর্‌তে দেব না।

রমেশ বল্‌ল, সে কি ক'রে হবে মা? আমি যে রোজগার কর্‌ব টাকা।

গৃহিণী বল্‌লেন, বেশ ত টাকা এনে আমার কাছে দিও। আমি জমিয়ে রাখ্‌ব। তারপর কর্ত্তা যখন অসমর্থ হবেন, তখন ঐ টাকা আর তোমার রোজগারের টাকা খাব।

রমেশ হেসে বল্‌ল, মা পাগল!

গৃহিণী বল্‌লেন, পাগল নই বাবা! এই সামান্য তিন-চারদিনেই তোমাকে আমি চিনেছি, তোমার ওপর আমার মায়া ব'সে গিয়েছে। আমার নরেশ, পরেশ, দীনেশও যেমন, তুমিও তেমনি হয়েছ। আমার এখন চার ছেলে।

রমেশ গৃহিণীর পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌ল, এমন কথা ত কোনদিন শুনি নি মা! আপনি মানুষ, না দেবী!

গৃহিণী বল্‌লেন, আমি তোমার মা।

ক্রমশঃ

জমা-খরচ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

শ্রেষ্ঠী কর্ণসেন ছিলেন খুব দাতা। পথের দুঃখী, আতুর, নিরাশ্রয় লোককে চিরদিন তিনি আশ্রয় দিয়ে এসেচেন। সকলে বল্‌তো তাঁর মত লোক আর হয় না। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা নেমে এসেচেন নররূপ ধরে, প্রজার দুঃখ দূর করতে।

সামান্য ভাবে থাক্‌লেও কর্ণসেন ছিলেন খুব ধনী। এই সব ধন বিতরণ ক'রে তিনি চিরদিন মহাসুখ পেয়ে এসেচেন। পথে চল্‌তে চল্‌তে অন্য অন্য কৃপণ-ধনীদের মূল্যবান্ অশ্বযোজিত-রথে রাজপথ কাঁপিয়ে চলে যেতে দেখে কর্ণসেন মনে মনে ভাব্‌তেন, এই সব স্বার্থপর ধনীর চেয়ে আমি কত বড়! পরক্ষণেই কিন্তু তিনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ভাব্‌তেন, না, না, ওকথা না, ও কথা না, কে কাকে দেয়? ভগবান্ শুধু আমার মধ্যে দিয়েই তাঁরই ধন তাঁর জীবদের দিচ্চেন বই তো নয়।

তখনই আবার তাঁর মনে হোত, আমি কি নিরহঙ্কার! আছে, আছে, আমার ভেতরে কিছু না থাক্‌লেই কি আর এত লোক থাক্‌তে কেবল আমাকেই দিয়ে ভগবান তাঁর...অমনি আবার সাম্‌লে নিয়ে জোর করেই মনকে বোঝাতেন, না, না, ওকি, না, ছিঃ!

কিন্তু অহঙ্কার যতই ছুঁড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করুন্ না কেন, মনের কোন্ গোপন কক্ষে এ ভাব তাঁর জেগেই থাকত; আমি এমন যে, দানের আত্মপ্রসাদটাও চাপ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি। ওই সব লোকে আর আমাতে কত তফাৎ! আমি একজন সাধু ব্যক্তি।

সেবার রাজ্যজুড়ে মড়ক উপস্থিত হোল। চারিদিকে লোক বর্ষাকালের বাদল-পোকার মত মর্‌তে সুরু করে দিল। রাজ্যময় মহা হাহাকার! নিরাশ্রয় রোগীদের ভিড়ে নগরের আরোগ্যশালা-গুলি ভর্ত্তি হয়ে গেল। নতুন রোগী এসে আর স্থান পায় না। নগরের পথের উপর তাদের মৃতদেহের স্তূপ ক্রমেই উঁচু হ'তে লাগলো।

সকল রকম সৎকার্য্যের চিন্তা ঐ দাতার মনে সকলের আগে এসে পৌঁছুত। রাত্রে শুয়ে তাঁর মনে হোল, এক কাজ করি না কেন? আমার এই এত বড় প্রাসাদ যদি আরোগ্যশালার জন্য ছেড়ে দিই, তবে কত রোগী এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে। আমার এতবড় প্রাসাদে কি প্রয়োজন?

পর-মুহূর্ত্তেই তাঁর মনে হোল, ঐ! ঐ যে আমার মনে একথা উঠ্‌লো, সে শুধু এই বিশাল রাজ্যের মধ্যে ভগবানের একমাত্র চিহ্নিত দাস বলেই। কৈ আর তো কেউ—

তখনিই আবার ভাব্‌লে, না, ছিঃ, ও সব অহঙ্কারের কথা।

সেদিন সমস্ত দিন ধরে তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌লো, দিই বাড়ীখানা ছেড়ে! লোকে এসে এখানে আশ্রয় নিক্।

তারপর তিনি ভাবলেন, না, যাক্ গে যাক্। বাড়ী দেবার কোনো দরকার নেই। কতদিন এ মড়ক চল্‌বে তার কিছু ঠিকানা নেই, বাড়ী ছেড়ে দেওয়া, সে যে মহা অসুবিধে।

পথে চল্‌তে চল্‌তে তাঁর চোখে পড়্‌তো নিরাশ্রয় আর্ত্তদিগের অসহায় শীর্ণ মুখগুলি।

তাঁর মন তখনি দয়ার আবেগে ভরে উঠ্‌তো, ভাব্‌তেন, দিই বাড়ী ছেড়ে! এদেরই তো বাড়ী, ভগবান্ আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর দয়া প্রকাশ কর্‌ছেন, এই ইচ্ছা তাঁরই দেওয়া—

মনের এক গভীর গোপন-তল থেকে একথা জাগতো—উঃ! দেখেচ, দেখেচ, মনটা আমার কি রকম দেখেচ একবার!

হতভাগ্য দরিদ্রের মৃত্যুকাতর শীর্ণ মুখগুলো মনে ক'রে তাঁর চোখে জল আস্‌তো।

মনে তাঁর উঁচুভাবের ঢেউ এল,—গেল। অন্য অন্যবার এই সব ভাবের আবেগেই তিনি অকাতরে পরের দুঃখ মোচন করে এসেছেন, এবার তিনি মনের সে ভাবটাকে কিন্তু চেপে ফেল্‌লেন। ভাবলেন—না, না, বাড়ী নয়, টাকা যেমন দিই, তেমনি কিছু দেব এখন।

মনের সে গোপন-তলাটা থেকে একথা উঠ্‌লো—আমি যে লোক খারাপ তা তো নয়! কতবার তো কত দিয়েছি—এবার যদি নাই দিই —লোক যে আমি কৃপণ তা তো নয়—আমি উঁচুই, তবে এবার—

সেবা-যত্ন-শুশ্রূষার অভাবে মৃত দরিদ্রদের শবের পূতিগন্ধে নগরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌লো।

এ সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, নগরের এক কৃপণ ধনী, এ পর্য্যন্ত যিনি কোন সৎ-কাজে এক কাণাকড়িও কোনও দিন দান করেন নি—তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা ছেড়ে দিয়েছেন নিরাশ্রয় রোগীদের আরোগ্যলাভের জন্য।

মহাপ্রাণ ধনীর জয় গীতে নগর-পথ মুখরিত হ'তে লাগলো।

কর্ণসেন ভাবলেন—এঃ, কাজটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল দেখচি—তাইতো কি করা যায়!

পরদিন তিনি শুনলেন, কৃপণ-ধনীর মহান্ দানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নগরের আর একজন ধনী বনিক্ তাঁর বাড়ী রোগীদের জন্য ছেড়ে দিয়েচেন।

আনন্দ-কোলাহলে নগরে কাণ পাতা দায় হোল।

অন্য-অন্যবার সকল মহৎ কার্য্যের অগ্রণী হতেন কর্ণসেন। তাঁরই দেখাদেখি অপরে তাঁর পথ ধরতো। এবার তিনি সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর মনে হ'তে লাগলো—কৈ! আমিই যে তাঁর চিহ্নিত ব্যক্তি, তা কৈ! এত দিন ভুল বুঝেছি, কাজ করাবেন ইচ্ছে করলে ভগবান পাষাণকেও গলিয়ে কাজ করাতে পারেন। নইলে পরীক্ষিত, ওই কঞ্জুষ, ও কি না নিজের বাড়ী—

কর্ণসেনের অহঙ্কার চূর্ণ হ'ল। তিনি ভাব্‌লেন, ভগবানের কাছে চিহ্নিত অচিহ্নিত পাত্রাপাত্র নেই, সবই সমান। আর আমিই বা এমন সাধু-ব্যক্তি কৈ? আমি যে ত্যাগস্বীকার কর্‌তে পেরে উঠ্‌লাম না, অপরে তো তা কর্‌লে?

মনে মনে নিজেকে ত্যাগী পরার্থপর বলে যে আত্মপ্রসাদ তাঁর মনে জাগ্‌তো, তা একেবারে দূর হয়ে গেল। নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধাই তাঁর এসে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

এদিকে প্রতিদিনই শোনা যেতে লাগলো, মহাপ্রাণ দাতাগণের পথ অনুসরণ ক'রে আরও অনেক লোকে তাঁদের বাড়ী ছেড়ে দিচ্চেন। কর্ণ-সেনের বন্ধু-বান্ধবেরা এসে তাঁকে চুপি চুপি জানিয়ে গেল, যে তিনিও যেন শীঘ্র একটা কিছু করেন। লোকে এবার তাঁকে নীরব থাক্‌তে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েচে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সকল সৎকাজই তিনি সকলের আগে কর্‌তেন, এবার তিনি অবিলম্বে একটা কিছু না কর্‌লে দুর্ণাম রটবে। কর্ণসেন ভাব্‌লেন, পরের দেখাদেখি এবং লোকের কাছে দুর্ণাম রটবার ভয়ে তাঁকে দান কর্‌তে হবে! কি গৌরব সে দানের? আর যদিও বাইরের লোকে তার গৌরব কর্‌তে পারে, কিন্তু মনে মনে তিনি ত বেশ বুঝ্‌তে পারছেন, এ দানে তাঁর কিছু মহত্ত্ব নেই। যদি তাঁকে দান কর্‌তে হয় তো সে দায়ে পড়ে, মান বাঁচাবার জন্যে। এ দায়ের কথা মনে হ'লেই যে তার মন নীচু হয়ে যাবে! অন্য-অন্য-বারের মত সে উচ্চ আত্মপ্রসাদ কৈ এখানে?

কর্ণসেন মনে মনে মহা চটে গিয়ে ঠিক করলেন, তিনি কিছুই করবেন না। লোকে যা বলে বলুক, যে দান স্বার্থপ্রসূত, যার মূলে লোকের কাছে নিজের মান বাঁচানোর কথা নিহিত, এমন দান তিনি কখনো করবেন না।

শয্যায় শুয়ে অনেক রাত্রে কর্ণসেনের ঘুম ভেঙে গেল। জানালার বাইরে চোখ চেয়ে দেখলেন, দূর আকাশের নীল-সাগরের পারে একটী নক্ষত্র যেন তাঁর দিকেই চেয়ে জ্বলচে, প্রলয় কালের বিশ্বের অনন্ত-জলময়ী প্রসারতার মাঝখানে অনাদিকারণ প্রজাপতির চিরজাগ্রত নেত্র-জ্যোতির মত! আকাশের নিথর নীল বুকে শুভ্রজোৎস্নার তরঙ্গগুলো যেন তাঁরই সৃজন-বীণার মর্ম্মস্পর্শী নীরব রবে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে।

কর্ণসেন ভাবলেন, উঃ, কি সুযোগই হারিয়েচি! আজ যদি আমার বাড়ীখানা ছেড়ে দিতাম, তো এই রাত্রের সঙ্গে আমার প্রাণের একটা যোগ দাঁড়াতো। আমার সঙ্গে ভগবানের আর কোন সম্বন্ধই নাই, কারণ আমি স্বার্থপর, আমি তাঁর প্রেরণার অবমাননা করেছি।

আকাশের সে দূর নক্ষত্রটির ভৎর্সনা-দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কর্ণসেন জানালা বন্ধ করে দিলেন।

হঠাৎ আতুরদিগের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখগুলি তাঁর আবার মনে এল,—আহা, এই রাত্রে তারা সব আশ্রয় অভাবে পথে শুয়ে রয়েছে!

কর্ণসেন ভাবলেন, দিই না বাড়ীখানা ছেড়ে। অবশ্য এ দানে আমার আর কোন গৌরব নেই, কিন্তু তা নাই বা হোল, এই নিরাশ্রয় লোক-গুলো তো আশ্রয় পাবে? এই শীতে তারা যে সব পথে শুয়ে রয়েচে!

কর্ণসেনের মনের সে গোপন কক্ষটীতে এবার কোনও সুর শুনতে পাওয়া গেল না। তার পরদিন নগরের লোকে শুনলে, কর্ণসেন তাঁর বিরাট প্রাসাদ-তুল্য বাড়ী নগরের দুঃস্থ আতুরদিগের আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিয়েচেন! এ জিনিষটা তখন আর নতুন নয়, কেউ কেউ একটু-আধটু প্রশংসা করলে, কেউ ভাবলে, দেবার ইচ্ছা ছিল না, মানের দায়ে দিতে হোল।

যথাসময়ে কর্ণসেনের মৃত্যু হোল। তিনি কৃতকার্য্যের ফলাফল শুনতে যম রাজার খাস দরবারে নীত হলেন।

সামনে প্রকাণ্ড খাতা খুলে বসে চিত্রগুপ্ত।

তিনি খাতা দেখে বললেন, দাতার স্বর্গই হচ্ছে সমস্ত স্বর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ। এক-একটী দানে শত মন্বন্তর ক'রে সে স্বর্গে বাস করবার অধিকার জন্মায়। তোমার একশত মন্বন্তর দাতার স্বর্গে বাস করা মঞ্জুর হয়েচে।

কর্ণসেন একটু ভেবে মাথা চুলকে বললেন—বোধ হয় হিসেবে ভুল হয়ে থাক্‌বে—আর একবার না হয়—কারণ—

চিত্রগুপ্ত খাতার পাতে আর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন—না, ভুল হয় নি। তুমি একবার তোমার বসতবাড়ী অত্যন্ত মড়কের সময় তোমার দরিদ্র প্রতিবেশীদের উপকারের জন্য ছেড়ে দিয়ে-ছিলে, এই একটী ছাড়া তোমার অন্য কোন দানের কথা তো খাতায় লেখা দেখচি নে বাপু।

কর্ণসেন বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

যম অন্য কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অন্তর্য্যামী, কর্ণসেনের মনের কথা তাঁর মনে গিয়ে পৌঁছুল। তিনি মুখ তুলে হেসে বললেন, বুঝেচি বাপু। কিন্তু তোমার অন্য অন্য দানের পুরস্কার আমরা তোমাকে তো সঙ্গে-সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি। তুমি দান ক'রে কি একটা সুন্দর আত্মপ্রসাদ ভোগ কর নি?

কর্ণসেন বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে তা স্বীকার করলেন।

যম বললেন, সেই তো আমাদের পুরস্কার! তোমার জন্মভূমি তোমার দানের খ্যাতিতে ভরে গিয়েচে, তুমি নিজে একটা সুন্দর তৃপ্তি অনুভব করেচ, ঐ তো সে সব দানের পুরস্কার। কিন্তু তুমি একটি দান একবার করেছিলে, নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে ভুলে গিয়েই, শুধু পরের দুঃখমোচন হবে বলে। নিজের দিকে সেবার তুমি চাও নি। তোমার সে দানের পুরস্কার তখন হাতে হাতে দিয়ে তোমার দানকে অপমানিত করতে আমরা সাহস করি নি। সেইটী তোমার পাওনা আছে।

ব্যবচ্ছেদ

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, বি-এ,

রামনাথ ভট্চায্যির অসুখ করিলে গ্রামের পাঁচজনের অনুরোধে চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারির পিঙ্গল ডাক্তার বিনা পয়সায় তার চিকিৎস্যার ভার লইল।

রামনাথের ব্যবসা যজন-যাজন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন। গ্রামের লোকে তাকে বলে পণ্ডিত-মশায়। তারা জানে, পণ্ডিত-মশায়ের শাস্ত্রজ্ঞান বেশী নাই, কিন্তু এই বৃদ্ধের পূজা-অর্চ্চনায় তাদের অগাধ বিশ্বাস। তারা মনে করে, তিনি পূজা করিয়া শান্তিজল ছিটাইলে সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক বিপদ কাটিয়া যায়।

কয়েকদিন পরে রোগীর অবস্থা খারাপ হইলে রামনাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নির্ম্মলা সমস্ত সঙ্কোচ এড়াইয়া পিঙ্গলের সাম্‌নে আসিয়া বলিল—বড়ই বিপদ ডাক্তারবাবু, যে ক'রে হোক্ ওঁকে বাঁচান।

পিঙ্গল আশ্বাস দিয়া বলিল—ভয় নেই, উনি সেরে উঠবেন। তারপর নির্ম্মলার পাঁচ বছরের ছেলে দেবুর চিবুক ধরিয়া একটু আদর করিল।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ডাগর চোখ দু'টি দিয়া নির্ম্মলা একবার পিঙ্গলের দিকে চাহিল।

পিঙ্গল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ডাক্তার। অনেক শক্ত রোগী সে সারাইয়াছে। নির্ম্মলার কাণেও তার এই সুখ্যাতি পৌঁছিয়াছে। যন্ত্রণাতুর স্বামীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিত—ভয় নেই, তুমি সেরে উঠবে। পিঙ্গল ডাক্তার সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।

লোকে চারটাকা ফি দিয়াও সব সময় যাকে পায় না, সেই ডাক্তার একটি পয়সা না নিয়া প্রত্যহ আসিয়া রোগীকে একবার দেখিয়া যায়। অনেক সময় দরকারী ঔষধগুলি সঙ্গে করিয়া আনে। পথেই সিকির বাজার; পিঙ্গল বাজার হইতে কোনদিন দু'টা ডালিম নিয়া আসে, কোনদিন বা দু'টা কমলা।

পিঙ্গলের চিকিৎসানৈপুণ্যে ও নির্ম্মলার শুশ্রূষায় রামনাথ মাস দেড়েক পরে সুস্থ হইলেন। অন্ন-পথ্য করার দিন তিনি পিঙ্গলকে বলিলেন—তোমার এ ঋণ জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না।

পিঙ্গল বলিল—আপনার আশীর্ব্বাদই চরম পুরস্কার।

সেই হইতে শিবের মাথায় বিল্বপত্র দেওয়ার সময় রামনাথ পিঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। সে দীর্ঘায়ু হউক, যশস্বী হউক, ভগবান তার মঙ্গল করুন।

দুই

পণ্ডিত-মশাই সারিয়া উঠার পরও পিঙ্গল আগের মতই তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল। এই অঞ্চলে রোগী দেখিতে আসিলে ত' কথাই নাই, অনেক সময় হাতে কোন কাজ না থাকিলে সে এ বাড়ীতে ঘুরিয়া যায়।

পিঙ্গল বিদেশী লোক, ব্যবসার খাতিরে লোকের সঙ্গে তাকে দূরত্ব রাখিয়া চলিতে হয়; কিন্তু এদের সঙ্গে সম্পর্কটা ব্যবসার নয়। এখানে সে যত্ন পায়, সে আসিলেই রামনাথ তামাক সাজিতে বসেন, নির্ম্মলা পাণ আনিয়া দেয়।

রামনাথ ও পিঙ্গল অনেক বিষয়েই আলোচনা করেন। তরুণ এই ডাক্তারের সঙ্গে প্রাচীন ব্রাহ্মণের প্রায়ই মতবিরোধ ঘটে; নির্ম্মলা সামনে বসিয়া তাঁদের কথা শোনে, কিন্তু কখনও কোনও

মতামত প্রকাশ করে না। তবে তার বেশীর ভাগ মতের মিল হয় ডাক্তারের সঙ্গে।

পিঙ্গলের সামনে নির্ম্মলার কোনও সঙ্কোচ নাই। সে স্বামীর প্রাণ দিয়াছে, তার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। তবে এই স্বচ্ছন্দ মেলামেশাটা যেন সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের একটা উপায় মাত্র।

পিঙ্গল মনে করে, স্ত্রীর মন স্বামীর বয়সের অনুপাতে পরিণতি লাভ করে। নির্ম্মলার স্বামী বৃদ্ধ, তাই এই তরুণী নিঃসঙ্কোচে তার সঙ্গে মিশিতে পারিতেছে।

তিন

শিরোমণির পৌত্রের অন্নপ্রাশন। নির্ম্মলার ইচ্ছা ছিল না নিমন্ত্রণে যায়। কিন্তু শিরোমণি রামনাথের বাল্যবন্ধু। নির্ম্মলা না গেলে শিরোমণি গিন্নী কি মনে করিবেন, তাই রামনাথ বিশেষ জিদ করিয়া তাকে পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু সেখানে অপমানিত হইয়া তাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। সে জানিত না যে, তাদের বাড়ীতে ডাক্তারের আসা-যাওয়া লইয়া পাঁচজনে পাঁচকথা বলিতেছে।

পদ্মঠাকরুণ গ্রামের সরকারী ঠানদি'। সুরসিকা বলিয়াই তিনি ঠানদি'র আসন পাইয়াছেন। তিনি ডাক্তারকে লইয়া নির্ম্মলার সঙ্গে রসিকতা করিতে চেষ্টা করিলে শিরোমণি-গিন্নীর নিকট অসুস্থতার দোহাই দিয়া নির্ম্মলা বাড়ী চলিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া মেজেতেই আঁচল পাতিয়া সে শুইয়া পড়িল। ডাক্তারকে নিয়া তার যে দুর্নাম রটিতে পারে, ইহা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই। তার মনে হইল, পৃথিবীটা কি নির্দ্দয়, মানুষগুলা কি জঘন্য!

রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে নির্ম্মলার সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। নিতান্ত নিরুপায়ের মত সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাকে কাঁদিতে দেখিয়া দেবু আসিয়া তার পাশে বসিল। তার মুখের উপর মুখ রাখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল। দেবুকে বুকে টানিয়া নির্ম্মলা বলিল—খোকন, বল ত' রে, মা কি তোর মন্দ!

দেবু মার গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—তুমি বড্ড ভাল মা, ঠিক সেই গন্ধরাণীর মত।

পাড়ার এক বুড়ীর কাছে সে গান্ধারীর কথা শুনিয়াছিল।

নির্ম্মলা আরও জোরে ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

রাত্রে রামনাথ খাইতে বসিলে নির্ম্মলা পাখা করিতে লাগিল, খাওয়া হইলে আঁচাইবার জল দিয়া তামাক সাজিয়া আনিল।

বেশী রাত্রে সংসারের কাজ, নিজের খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া নির্ম্মলা স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতেছিল। রামনাথ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। নির্ম্মলার অনেক কথাই মনে হইতে লাগিল। মনোমত স্বামী পাওয়ার জন্য বাল্যে সে শিব পূজা করিয়াছে, শিবের মতই তার স্বামী জুটিয়াছে। তার আবার দৈন্য কিসের, গ্লানি কিসের?

চার

তারপর কিছুদিন নির্ম্মলা আর পিঙ্গলের সামনে বাহির হয় নাই। পিঙ্গল মনে করিয়াছে, হয় ত' তার ঘনঘন আসা-যাওয়া লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে 'কথাকথি' হইয়া থাকিবে। তাই সেও যাতায়াত কমাইয়া দিয়াছে।

নিয়মিত যাতায়াতের একটা আকর্ষণ আছে; বিশেষতঃ, সে স্থানে যদি কোনও সুন্দরী যুবতী উপস্থিত থাকে। পিঙ্গলের মনটা প্রথম কয়েক-দিন উসখুস করিত; কিন্তু সে জানিত সময়ে সব সহিয়া যাইবে।

সে বিশেষ করিয়া আবার প্রাক্টিসের দিকে মন দিল। ক'মাস ডাক্তারী জার্ণালগুলি

খোলাই হয় নাই; মাস ছয়েক আগে কলিকাতা হইতে যে সব নূতন বই আনাইয়াছিল, তার এক পাতাও পড়ে নাই। নিজের মনটাকে একটা খোরাক হইতে বঞ্চিত করিয়া সে তার বিনিময়ে আর একটা খোরাক জোগাড় করিয়া লইল। একটা এ্যানোফিলিশ জাতীয় স্ত্রীমশকের হুলে এক সময়ে কতটা ম্যালেরিয়ার বীজাণু থাকিতে পারে তার গবেষণা করিতে লাগিল।

মাসকয়েক পরের কথা। একদিন পিঙ্গল অভয় বাবিকের বাড়ী হইতে রোগী দেখিয়া ফিরিতেছে। পথে দেবুর সঙ্গে দেখা। দেবু তার কাপড়ের কোঁচা ধরিয়া বলিল—চল, আমাদের বাড়ী যাবে।

পিঙ্গল বলিল—আর একদিন আসব খোকা, আজ কাজ আছে।

কিন্তু দেবু নাছোড়বান্দা।

উঠানে বসিয়া নির্ম্মলা ডালের বড়ি দিতেছিল। দেবু বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—মা, দেখ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছি।

নির্ম্মলা কি করিবে ঠিক করিবার পূর্ব্বেই পিঙ্গল ও দেবু উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

দেবু ভাবিয়াছিল, ডাক্তারকে দেখিয়া তার মা খুসী হইবে। কিন্তু তার মার মুখের দিকে চাহিয়া তার কেমন ভয় হইল। শিশু বুদ্ধিতেও সে বুঝিল, কোথায় যেন কি গোলমাল আছে। সে দৌড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা ইতস্ততঃ করিতে করিতে বলিল—ঘরে গিয়ে বসুন। তারপর ডাকিতে লাগিল—খোকা, অ-খোকা, কি দুষ্টু হয়েছিস, এক মিনিটও বাড়ী থাকবি না।

পিঙ্গল বলিল—অনেকদিন দেখা নেই, আপনার ভাল আছেন? পণ্ডিত-মশায়ের বুকের বেদনাটা…

এই সময় রামনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন—এই যে পিঙ্গল, অনেক দিন তোমায় দেখি নি। ভাল আছ?

নির্ম্মলা বলিল—আজই কি আসতেন? খোকা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এল। বলিয়াই সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল।

রামনাথ হাসিয়া বলিলেন—বাপ-মা যাকে ভালবাসে, ছেলেরও তার ওপর টান হয়।

ডাক্তার আসায় নির্ম্মলা অসুখী হয় নাই বটে, কিন্তু তার ভয় হইল পদ্মঠাকুরুণের মতো মানুষের দুর্নাম করিবার একটা সুযোগ জুটিবে।

সে রাত্রে দুরন্ত দেবুর চিবুক ধরিয়া বলিল—তোর মার এমন ক'রে শক্রতা করলি রে?

তার দু'দিন পরে রামনাথ পিঙ্গলকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

নির্ম্মলা বলিল—একবার আমায় জিজ্ঞেস করতেও নেই?

রামনাথ বলিলেন—দিলগা থেকে ফিরবার পথে দেখলুম ইলসে মাছ সস্তা, তাই দুটো নিয়ে এলুম। পথে পিঙ্গলের সঙ্গে দেখা—। যাক, তোমার অসুবিধে আছে নাকি?

নির্ম্মলা বলিল—শরীরটা ত' ভাল যাচ্ছে না।

রামনাথ বলিল—তা' ত' আমি জানতুম না। যাক, ডাক্তার এলে একবার দেখিয়ে নিতে হবে।

রাত্রে খাবার সময় দেখা গেল নির্ম্মলা প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছে।

পিঙ্গল বলিল—পণ্ডিত-মশাই বলছিলেন, আপনার শরীর ভাল নয়। অসুস্থ শরীর নিয়ে এত করলেন কেন? কি দরকার ছিল এত রাঁধবার?

রামনাথ বলিলেন—সত্যিই, পিঙ্গল ত' ঘরের ছেলে।

নির্ম্মলা বলিল—তুমি ত' বেশ লোক!

খাওয়ার পর পিঙ্গল রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্ম্মলা বলিল—না, অসুখ আমার কিছুই নেই।

সে রাত্রে সে কিছু খাইল না ; খাইবার রুচি ছিল না, মাথাও ধরিয়াছিল।

পাঁচ

পিঙ্গল ক্রমশঃ পরিবারের একজন হইয়া উঠিয়াছে। সব বিষয়েই তার পরামর্শ দরকার ; দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগের কথা তার নিকট গোপন থাকে না।

বিদেশ-বিভূঁয়ে পিঙ্গলের একটা সত্যিকার আত্মীয় জুটিয়াছে। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর এই বাড়ীতে কিছুক্ষণ না থাকিলে ক্লান্তি যেন আর কাটে না।

বাল্যকালে পিঙ্গল মাতৃহারা ; তার ভগ্নীও ছিল না। মানুষের জীবন স্ত্রীলোকের দরদের প্রতি যে আকর্ষণ থাকে, নির্ম্মলার সঙ্গে মিশিয়া পিঙ্গল সে অভাবটা পূরণ করিয়া লইয়াছে।

পিঙ্গলের আর একটা আকর্ষণ ছিল দেবু। এই সুন্দর ছেলেটিকে সে ভালবাসে। পিঙ্গল আসিলেই দেবু বই লইয়া আসে, দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকু'মার ঝুলি, ফাষ্ট বুক।

পিঙ্গল তাকে পড়ায়—বি ল এ ব্লে, সি ল এ ক্লে।

অনেক গল্পই তাকে বলে—এক যে ছিল বুড়ো, তার সব দাঁত পড়ে গিছল। তা' ছাড়া, মানাই দত্তর কাহিনী। বালেশ্বরের লড়াই।

ছয়

সেবার ৺পূজার আগে পিঙ্গল কতকগুলি ঔষধ কিনিতে কলিকাতায় যায়। ফিরিবার সময় নির্ম্মলার জন্য একখানা দামী শাড়ী কিনিয়া আনিল, দেবুর জন্য একটা খেলনা মোটর।

রামনাথের সামনেই পিঙ্গল শাড়ীখানা নির্ম্মলার হাতে দিল।

নির্ম্মলা বলিল—আমাকে শাড়ী কেন? এসব দেবার কোন দরকার ছিল না।

পিঙ্গলের মুখখানা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। রামনাথ বলিলেন—ওকথা বলছ কেন? পিঙ্গল শ্রদ্ধা ক'রে এনেছে।

পরদিন মোটর লইয়া দেবু রাস্তায় গেল। সে মোটরে চাবী দিয়া ছাড়িয়া দিলে তার খেলার সাথীর দল আসিয়া জড় হইল।

বেণু বলিল—এটা পেলি কোথায় রে?

ডাক্তার দিয়েছেন।

উঁচু-নীচু রাস্তায় মোটরটা ভাল চলে না ; একটু চলিয়াই থামিয়া যায়, কোনবার বা কাত হইয়া পড়ে। তার সমবয়সীর দল ইহাতে খুসী হয়। তাদের এমন জিনিষ নাই, দেবুরই বা থাকিবে কেন?

বেলা বারটায় মোটর চালাইয়া দেবু বাড়ী ফিরিলে নির্ম্মলা তার গালে ছোট্ট একটী চড় মারিয়া বলিল—মোটর পেয়ে খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেছে, দুষ্টু ছেলে।

সেই দিনই বৈকালে পদ্মঠাকরুণের কাণে গেল, ডাক্তার কলিকাতা হইতে দেবুর জন্য মোটর আনিয়াছে, দরদ কত!

শাড়ীখানা সত্যই খুব সুন্দর, ভিতরে জরীর কাজ। পিঙ্গলের উপর সেদিন রাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শাড়ীখানা পরিয়া আয়নায় নিজের নিজের চেহারা দেখিয়া তার রাগ কাটিয়া গেল। এ শাড়ীতে তাকে খুব ভাল মানাইয়াছে।

জমিদার ব্রজকান্ত চৌধুরীর দুর্গাপূজা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। পূজার সময় জলের মত টাকা ব্যয় হয়। অঞ্জলি না দিয়া ব্রজকান্ত জলগ্রহণ করেন না। ঠাকুর দেখিবার জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রত্যহ শত শত লোক আসে।

রামনাথ ব্রজকান্তের কুলপুরোহিত। ঠাকুর বরণ করিতে নির্ম্মলার আসা চাই-ই। প্রত্যেক বারই সে আসে। জমিদার-গিন্নী তাকে দামী শাড়ী দেন।

ভাসানের দিন সে জমিদার-বাড়ীতে আসিয়াছিল পিঙ্গলের দেওয়া শাড়ী পরিয়া। মেয়েরা

একদৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া রহিল—সে সেখানে সব চেয়ে সুন্দর, সৌন্দর্য্যের রাণী।

হরিমতি বোষ্টমী বলিল—ভশ্চায্যির ভাগ্যি ভাল। বুড়োবয়সেও এমন চোখ-জুড়োনো রূপসী পরিবার।

পদ্মঠাকরুণ বলিলেন—ভাগ্যি ভাল-মন্দর কথা বলতে পারি না। নির্ম্মলাকে শুনাইয়া তিনি এই ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু নির্ম্মলা এমন ভাব দেখাইল যে, সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই।

কিন্তু তাতেও রক্ষা ছিল না। ঠাকুর বরণ করিয়া সে বাড়ী ফিরিবে এমন সময় পদ্মঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এই শাড়ীখানা জমিদার-বাড়ী থেকে পেয়েছ বুঝি বৌ?

না।

পদ্মঠাকরুণ কিন্তু অনুমান করিয়া লইলেন, নির্ম্মলার ছেলেকে যে মোটর দিয়াছে, শাড়ীখানা তারই উপহার।

তার পরদিন প্রাতে শাড়ীখানা ভাঁজ করিয়া নির্ম্মলা উঠাইয়া রাখিবে, এমন সময় পদ্মঠাকরুণ আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন—শাড়ীটা তুলে রাখছ কেন বৌমা? ওটা পরলে তোমায় ভারী সুন্দর দেখায়।

নির্ম্মলার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া গেল; সে বলিল—আর আপনারও পাঁচ যায়গায় ব'লে বেড়াতে সুবিধে হয়।

ও কি বলছ বৌমা! ও সব অভ্যেস আমার নেই। আমি যে তোমাদের হেতাঙ্ক্ষী।

বিরক্তির হাসি হাসিয়া নির্ম্মলা বলিল—"তাই বুঝি শাড়ী পর্‌বার কথা বলতে এসেছেন? বলিয়াই সে বাক্সের ডালাটা জোরে বন্ধ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পদ্মঠাকরুণ কখন যে চলিয়া গিয়াছেন তা' সে লক্ষ্য করে নাই।

পাশের ঘরে যাইয়া একটা চেয়ারের হাতল ধরিয়া নির্ম্মলা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সাম্‌নে সবই ঘোলাটে, অস্পষ্ট। তার চোখের পাতা যে সজল হইয়া উঠিয়াছে, তাও সে জানে না।

সমস্তদিন সে কোন কথা কহিল না। নিজের মনে সে বারবারই প্রশ্ন করিতেছিল সত্যই নিন্দার মত সে কিছু করিয়াছে কিনা?

রাত্রে পিঙ্গল আসিলে মনটা তার খানিকটা শান্তভাব ধারণ করিল। পদ্মঠাকরুণ ও আর ঐ রকম পাঁচজনের কথাকে উপেক্ষা করার সহজ উপায় যেন সে আজ পাইয়াছে।

রামনাথ বলিলেন—ওর শরীরটে খারাপ, একবার দেখ ত' পিঙ্গল কি হয়েছে।

নির্ম্মলা বলিল—ওর জন্যে আর ডাক্তার দেখাতে হ'বে না।

কিন্তু স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে তবু হাত-খানাকে বাড়াইয়া দিতে হইল।

পিঙ্গলের এই প্রথম স্পর্শে তার সমস্ত শরীর-টায় নির্ম্মলা অনুভব করিল একটা মৃদু শিহরণ।

"একি সমস্তদিন উপবাসের ফল না আর কিছু? নির্ম্মলা আর ভাবিতে পারিল না ····

সাত

সেদিন দেড়ঘণ্টা গল্প করার পর পিঙ্গল উঠিতে চাহিল। নির্ম্মলা বলিল—বসুন আর একটু, এই ত' সবে এলেন।

এ অনুরোধে কোনও নূতনত্ব ছিল না। আজ-কাল প্রায়ই সে এরূপ অনুরোধ করে। পিঙ্গল আসিলে গল্প ছাড়িয়া উঠিতে চায় না।

পিঙ্গল হাসিয়া বলিল—আমার বুঝি আর কাজকর্ম্ম নেই?"

বেশ আর বলব না।

পিঙ্গল বলিল—অভিমান হ'ল বুঝি?

অভিমান করব কার ওপর। বলিয়াই নির্ম্মলা বাহির হইয়া গেল। পিঙ্গলও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠিল।

কতকগুলি সাদা পাতলা মেঘ পর্ব্বতের মালার মত আকাশের বুকে স্তরে স্তরে সাজানো।

ঠিক তার উপরে চাঁদ, চাঁদের আলোয় মেঘের পাহাড় ঝিকমিক করিতেছে। গাছপালা, লতা-পাতা সবই স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, জোছনার স্পর্শে যেন প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দূর হইতে ব্রজকান্ত চৌধুরীর বাড়ীর সদ্য চূণকাম করা চিলা কুঠরীটা দেখা যাইতেছে, ঠিক তার পিছনেই কতকগুলি গাছ ছবির ব্যাক গ্রাউণ্ডের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিঙ্গল ভাবিতেছিল, নির্ম্মলার কথা, সে তার উপর দাবী করে, অভিমান করে। কি যেন একটা অজানা গর্ব্বে তার মনটা ভরিয়া উঠিল। তার সঙ্গে ছিল একটা অব্যক্ত ব্যথা।

আট

রামনাথ বিদেশে যজমান বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন, সংসারের খোঁজ, খবর লওয়ার ভার পিঙ্গলের উপর। সেই সব তত্ত্বাবধান করে।

সেদিন দুপুরের দিকে পিঙ্গল বসিয়াছিল একটা তক্তপোষের উপর, পাশেই দেবু ঘুমাইয়া।

একটা থালায় পেয়ারা, শশা, নারিকেলের লাড়ু ও মিশ্রী সাজাইয়া আনিয়া নির্ম্মলা পিঙ্গলের কাছে দাঁড়াইল।

সে একটু আগেই স্নান করিয়াছে, পরণে তার একখানা লাল চওড়া পেড়ে শাড়ী। কাণের পাশে শাড়ীর পাড়টার উপর চূর্ণ কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে। তার রূপ দেখিয়া পিঙ্গলের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে হাত বাড়াইল, কিন্তু থালা না ধরিয়া খপ করিয়া নির্ম্মলার হাত ধরিয়া ফেলিল।

নির্ম্মলা এ অতর্কিত আঘাতের প্রত্যুত্তরে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়াছিল, দেবু উঠিয়া পড়িয়া তাহাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। সে বলিল, আমায় একটা লাড়ু......নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি তাহাকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল।

নয়

রামনাথ দেশে ফিরিলে শিরোমণি বলিলেন—যে তার বাড়ীতে ডাক্তারের আসা-যাওয়া লইয়া গ্রামে খুবই আলোচনা হয়। পদ্মঠাকরুণের ভ্রাতৃ-বধূ ও হরিমতি বোষ্টমী প্রভৃতি কে কে শিরোমনি-গিন্নীকে অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছে।

রামনাথকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল—ব্যাপার কি?

তিনি সব কথাই খুলিয়া বলিলেন। নির্ম্মলার মনে হইল, সেদিন পদ্মঠাকরুণকে অপমান করার কথা। সেদিন সে কি ভুলই করিয়াছে। ভয়ে তার মুখ শুকাইয়া গেল।

রামনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

নির্ম্মলা বলিল—বেশ, ডাক্তারকে নিষেধ ক'রে দিলেই হ'বে, তিনি আর আসবেন না।

তুমি পাগল হয়েছ? আমি একথা কখনও তার সামনে তুলতে পারি? সে অমন ভালমানুষ, অত উপকার করেছে। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন—আমি ভাবছিলুম গাঁয়ের লোকের কথা। কি ঘৃণিত জঘন্য প্রবৃত্তি তাদের।"

দশ

পরের দিন উঠানে কৃষ্ণচূড়া গাছ দু'টায় অসংখ্য লাল ফুল ফুটিয়াছে, পাতা আর দেখা যায় না। সব লালে লাল। চাঁদের আলোয় মনে হইতেছিল, গাছ দু'টার উপর যেন ফাগের গুঁড়া ছড়ানো। নীচে উঠানে রাশি রাশি ফুল, কে যেন বাড়ীটায় হোলী খেলিয়া গিয়াছে।

গাছ দু'টার পূর্ব্বে একটা সামান্য উঁচু ভিটা। বহুদিন পূর্ব্বে এখানে নাকি একখানা ঘর ছিল। ঠিক তার পিছনেই একটা পেয়ারা আর গোটা কয়েক আম গাছ। আমের বোলের একটা মিঠা গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

আমের কচি লালচে পাতার পাশে পেয়ারার সবুজপাতার শোভা। গাছগুলির নীচে নূতন-বৃষ্টি পড়িয়া কচিকচি দূর্ব্বা গজাইয়াছে। পিছনেই

একটা দীঘি, দীঘির বুকে জমাট কচুরীপানা ও প্রকুঘাসের দল।

রামনাথ ও পিঙ্গল বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। দু'জনের হাতেই হুঁকা। নির্ম্মলা ঘরে বসিয়া দোলমঞ্চের জন্য ফুলের মালা গাঁথিতেছে।

তার পরদিনই ফাগোৎসব। পিঙ্গল ভাবিতেছিল, ফাগ দিয়া নির্ম্মলাকে সাজাইবে। পিঙ্গলের স্পর্শে তার সুন্দর মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিবে, তার'পর ফাগের গুঁড়া মানাইবে ভাল।

এমন সময় জমিদার-বাড়ীর দারোয়ান আসিয়া রামনাথকে ডাকিল। রামনাথ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—বাবুদের বাড়ী ডাক পড়েছে, আমি একটু ঘুরে আসি।

ঘরের মধ্য হইতে নির্ম্মলা বলিল—আজ যে রাত্তির হ'য়ে গেল, কাল গেলে হয় না?

রামনাথ বলিলেন—কাজ বড় জরুরী। আজই যেতে হ'বে।

পিঙ্গল বলিল—এঁদের রেখে যা'বেন কার কাছে? সেখানে গেলে ত' আপনার ফিরতে রাত দুপুর।

রামনাথ বলিলেন—কেন তুমি ত' রয়েছ? আমার ফিরতেও দেরী হ'বে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এলুম বলে।

পিঙ্গল বিস্মিতভাবে বলিল—আমি?

রামনাথ বলিলেন—কেন, তোমার কি কোন অসুবিধে আছে?

পিঙ্গল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—না, আজ আমার হাতে কোন কাজ নেই।

তা হ'লে একটু তামাক খাও। আমি আসচি। বলিয়া রামনাথ একখানা নামাবলী গায়ে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

পিঙ্গল পাথরের মূর্ত্তির মত সেইখানে বসিয়া রহিল। সমস্ত ঘটনাটা যেন তাহার নিকট মিথ্যা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বেশীদিনের কথা নয়, আজই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে পাড়ার শিরোমণি-মশাইকে রামনাথের নিকট তাহাদের নামে কুৎসা রটনা করিতে সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তথাপি তাহারই উপর বিশ্বাস করিতে রামনাথ এতটুকু ইতস্ততঃ করিলেন না কিসের জোরে? ভাবিতে গিয়া অদম্য বেদনার কশাঘাতে তাহার সারা অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এই সময় ঘরের মধ্য হইতে পান আনিয়া নির্ম্মলা পিঙ্গলের নিকট দাঁড়াইল; পিঙ্গল কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যও করিল না, ছুটিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল॥

ঘণ্টাদেড়েক পরে রামনাথ বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, সমস্ত রাত জাগরণের পর মানুষের মুখে যেরূপ ম্লানিমার ছায়া পড়ে, চাঁদের আলোতে পিঙ্গলের মুখখানা ঠিক সেইরূপ দেখাইতেছিল।

রামনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বাইরে ঘুরছ যে?

ঘরের ভিতরটা বড় গুমট ঠেকছিল।

রামনাথ তাকে ঘরে আসিতে বলিলেন। রাত হয়েছে, আমি এখন যাই। বলিয়া পিঙ্গল চলিয়া গেল।

এগার

সেই হইতে পিঙ্গল আর রামনাথের বাড়ী যায় নাই। রামনাথ অনেক অনুযোগ করিয়াছেন। সে বলিয়াছে—হাতে বড্ড কাজ।

নির্ম্মলাও তার নাম মুখে আনে না। পিঙ্গলের প্রসঙ্গ উঠিলেই গম্ভীর হইয়া যায়। চুপ করিয়া থাকা যখন খুব খারাপ দেখায়, তখন বলে—বড় ডাক্তার তিনি। তাঁর কি আর সময় আছে গরীবের বাড়ী আসবার?

* * *

বদলীর জন্য পিঙ্গল বোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল। মাসখানেক পরে বদলীর হুকুম আসিলে সে তল্পীতল্পা বাঁধিয়া ফেলিল।

গ্রাম ছাড়িবার দিন সকালে সে রামনাথের বাড়ী দেখা করিতে গেল।

তিনি বাড়ী ছিলেন না। তিনি কি নির্ম্মলা কেহই পিঙ্গলের বদলীর খবর জানিতেন না।

পিঙ্গল ডাকিল—পণ্ডিত-মশায়। ভিতর হইতে খোকা বলিল—বাবা বাড়ী নেই।

পিঙ্গল কি করিবে বুঝিতে পারিল না। ইচ্ছা একবার নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়; কিন্তু কি বলিয়া তাকে ডাকিবে?

একটুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আবার ডাকিল—খোকা!

এবার নির্ম্মলার গলা শুনিতে পাইল। সে বলিতেছে—খোকা, জিজ্ঞেস কর না ডাক্তারবাবু কি চান?

খোকা চেঁচাইয়া উঠিল—আমি যে খেলছি মা।

পিঙ্গল বাড়ীর ভিতরে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—আমি বদলী হ'য়ে যাচ্ছি, তাই খবর দিতে এলুম।

নির্ম্মলা ঘরের ভিতর হইতে বলিল—খোকা বল গে, উনি বাড়ী ফিরলে খবর দেব'খন।

পিঙ্গলের দাঁড়াইবার আর প্রয়োজন ছিল না। প্রথমে নির্ম্মলার উপর সে একটু রাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পথে তার মনে হইল, কেন সে দেখা করিতে গিয়াছিল? এযে তার নিতান্তই অন্যায়।
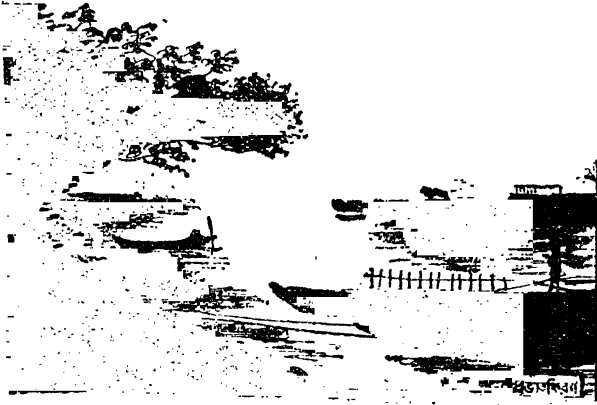
—চোর—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের মধ্যে তাহার তুল্য নগণ্য বুঝি আর কেহই ছিল না। ভাঙ্গা কুঁড়ে, কঞ্চির বেড়া, চালে তালপাতার ছাউনি; সূর্য্যের উত্তাপ, রাতের জ্যোৎস্না, বর্ষার জল, কিছুই তাহাতে বাধা পায় না। সবে একখানি ঘর; সংসারের আবশ্যকীয় যা' কিছু তাহাতেই সম্পন্ন করিয়া লইতে হয়—রান্না-খাওয়া, শয়ন সমস্তই। সে গৃহের অধিবাসী, দোলার কচিছেলেটীকে লইয়া সংখ্যায় সাত জন; আবার বেশী বৃষ্টি হইলে সবৎসা গাভীটীকেও তাহারি এক কোণে আশ্রয় দিতে হয়।

শ্রীপদ ওরফে পদা, এ পরিবারের অভিভাবক। রোজগার সে যে করে না, তা নয়; তবে তার আয়ের বেশীর ভাগ মথুর সার ধেনো মদের দোকানে গিয়া জমা হয়। গিন্নি টেঁপী, ছেঁড়া জামার জেব হাতড়াইয়া যা' কিছু সংগ্রহ করিতে পারে, ধুবড়ীর দুগ্ধের বিক্রয়লব্ধ অর্থের সহিত তাহা সংসারের অনাটন মিটাইতে ব্যয় করে। পল্লীর মেয়েমহলে এর জন্য অনেকে অনেক কথাই বলে। কাণ আছে কাজেই শুনিতে হয়; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক অদৃষ্ট ছাড়া কাহার উপর দোষ চাপাইতে সে পারে না, ইচ্ছাও করে না। তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া লইয়া মধ্যে মধ্যে সে চোখ মুছে, তারপর হাসিমুখেই কাজে লাগিয়া যায়।

পদার কাজ গোবদ্যিগিরি। গরু-ঘোড়ার চিকিৎসা-শাস্ত্রে সে নাকি অদ্বিতীয়—আরাম করা অপেক্ষা পশুজন্মের নীচতা হইতে সে বেচারীদিগকে মুক্তিদানে সে অধিকতর যত্নশীল। রোজগার কিছু কিছু যে হইত না, তা নয়; তবে সংসারে স্ত্রী-পুত্র খাইতে পায় না কেন, তা' পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাল্যে শ্রীপদ এক আস্তাবলে সহিসের তাঁবে ছোকরা চাকরের কাজ করিত। সে লোকটার মত চোর সে অঞ্চলে আর ছিল কি না সন্দেহ। তার অধীনে থাকিয়া কার্য্যে যতটা শিক্ষা পাক্ না পাক্, চুরী বিদ্যাটা সে বিনা আয়াসেই আয়ত্ব করিয়া লইয়াছিল। সে সময় বাধা দিবার কেহ না থাকায়, পরিণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে দোষটা তার চরিত্রগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এটীকেও সে রোজগারের একটা পন্থা ধরিয়া লইয়াছিল। পয়সা এপথে যত সহজে আসে, উৎকণ্ঠা ঠিক্ তত বা তার অপেক্ষা অনেক বেশীই থাকে; কিন্তু মনের মত কোন কিছু সম্মুখে পড়িলে হাত মানা মানে না, কাজেই তা' নিজস্ব করিয়া লইতে তাহাকে প্রাণপণ করিতেই হয়—এক্ষেত্রে ঠিক্ এই ভাবেই তার পতন হইয়াছিল। একবার, দুইবার, তিনবারের বার লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, দেওয়ানজী পুলিশের ভয় দেখাইয়া কত ধমক দিলেন, বেচারী টেঁপির চ'খে শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল, ব্যাপার দেখিয়া শ্রীপদ বলিয়া ফেলিল—"শপথ কর্‌ছি, এবার যদি ও ছাই আর মুখে তুলি; ওর জন্যেই ত এতটা···চোখ ছিঁড়ে ফেল্‌ব, কিন্তু পরের জিনিষে মর্‌তে মলেও আর তাকিয়ে দেখ্‌ব না।"

তিনদিনের পর তার সে প্রতিজ্ঞা কিন্তু অতল সাগরে তলাইয়া গেল—মদ খাইয়া এবার এমন ঢলাঢলি সে করিল যে, পথের লোক পর্য্যন্ত বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"এবার এত পয়সা ও পেলে কোথায়?"

ধরা পড়িল জমিদারের সোণার ঘড়িটা যখন

পাওয়া গেল না। ক্রুদ্ধ দেওয়ানজী সত্য-সত্যই এবার পুলিসে লোক পাঠাইলেন—লোকে বুঝিল, চোর পদার এ বার আর রক্ষা নাই।

যাহার জিনিষ তিনি কিন্তু সব ওলট্-পালট্ করিয়া দিলেন; বলিলেন—"ও ঘড়িটা আমি শ্রীপদকে দিয়ে দিয়েছি দারোগাবাবু। চুরী নয়, জিনিসটা ওর—নিজস্ব।—"

কি বলিয়া যে কৃতজ্ঞতা জানাইবে, শ্রীপদ তাহার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইল না; অবাক্ বিস্ময়ে শুধু বৃদ্ধ জমিদারবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তার সে বিস্ময়-আকুল ভাব দেখিয়া জমিদারবাবু হাসিয়া বলিলেন—"বুঝ্‌লে না শ্রীপদ, ঘড়িটা দিয়ে পাপের পথ থেকে চিরকালের জন্যে তোমায় কিনে নিলুম। কেমন পার্‌বে না এবার ভাল হ'তে ?"

শ্রীপদ মুখে কিছুই বলিতে পারিল না, বৃদ্ধ জমিদারের পা দু'টি আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ নীরবে পড়িয়া রহিল।

দুই

সেদিন ভোরে জমিদারের পাইক আসিয়া হাঁকাহাঁকি জুড়িয়া দিল—"এই পদ, পদ্মলোচন, ওরে ও হতভাগা পদা, ঘরে আছিস না মরেছিস্।"

আশ-পাশের কুঁড়ে হইতে এক সঙ্গে অনেক গুলি উৎসুক চক্ষু প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া রহিল। মৃদু গুঞ্জনের কানাকানি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া সবার মনের শ্রীহীন ভাষাটা তাদের স্বামী-স্ত্রীর কর্ণে তিক্তরস ছড়াইতে এতটুকু কাল বিলম্ব করিল না।

পড়শী নাপিত-বৌ মুখ বাড়াইয়া বলিল—"কেন গা এত ডাকাডাকি, ভদ্দরলোক আবার বুঝি কিছু হাতিয়েছেন? এবার আর অমনি নয়, পুরো বছরের নেমন্তন্ন ওই জেলখানায় বুঝ্‌লে ?"

পদ রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"কারুকে বল্‌তে হয় না।"

নাপিত বৌ হাসিয়া বলিল—"তবে বুঝি সহরে এক দোকান খুল্‌তে ডেকেছেন; এমন বিশ্বাসী লোকটী আর পাবেন কোথায়?...দেশে ত নেই! তা' দেখ গো দোকানী-মশায়, মিশি আর আলতা তোমার দোকান থেকেই এবার কিন্‌ব, এই কথা দেওয়া রইল। কিছু সুস্তা করে দিও।"

কথার ধারে বুকের পাঁজরাগুলা পর্য্যন্ত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শ্রীপদ কোনরকমেই আর মাথাটা উঁচু করিয়া তুলিয়া রাখিতে পারিল না। স্বামী বাহির হইয়া গেলে, টেঁপী হতাশভাবে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। রুদ্ধ অশ্রুবেগ আরও কি থামাইয়া রাখা যায়?

ছেঁড়া কাঁথাখানির নিম্ন হইতে কন্যা চাঁপা হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল—"আঃ! ছাড় না মা, সরে শোও, লাগে যে!"

টেঁপি ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল—"তোরা মর্, মর্ সবাই, আমি জুড়ুই! এ হাভাতের ঘরে ছেলে-পুলে জন্মান কেন?"

অখণ্ড কালের ক্ষুদ্র একটু সময় আধঘণ্টা হেলায় কাটিয়া গেল। দোলায় কোলের ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। টেঁপী ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া মাই দিতে বসিল। চোখ দু'টী তার নিষ্প্রভ দীপশিখার উপর স্থাপিত; ঠিক তেমনি নিষ্প্রভ, তেমনি বেদনাতুর—জলে ভরা—কিন্তু পল্লব বাঁধন উপ্‌ছাইয়া পড়িবার ক্ষমতাহীন। চিন্তার বিষ তখন তাহাকে ছাড়ে নাই; সে ভাবিতেছিল—বাপ-মা এ বিয়ে দিয়েছিলেন কেন! কেন আঁতুড়-ঘরেই লোকে মেয়ের মুখে নুন গিলিয়ে মেরে ফেলে না!

স্বামীর পদশব্দে চমকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; এক গণ্ডুষ জল চ'খে-মুখে দিয়া ক্ষণ পূর্ব্বের পতিত অশ্রুর চিহ্ন বিলোপ করিতে চাহিল। তারপর প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া স্বামীর

আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। শ্রীপদ উদ্‌ভ্রান্তের মত টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—"শুনেছ টেঁপু, বাবু হাজার টাকার চেক্ বিশ্বাস ক'রে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন; কাল সহরে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বিশ্বাস কর্‌বার কি এ কথা? হাতে পেয়েও আমি কিন্তু ভাবছি - এটা সত্যি ত নয়ই, স্বপ্নও নয়, আরও,আরও—উদ্ভুটে খেয়াল! দেখ্‌ত দেখ্‌ত মুখটা শুঁকে, আমি মাতাল হ'য়েছি কি না? সারাদিন এক ফোঁটাও...সারাদিনই বা বলি কেন, সেই, সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কই মনেও পড়ে না—তবু, তবু কেন—" কথাটা শেষ করিতে সে পারিল না, জিজ্ঞাসুভাবে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া 'হাঁ' করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

টেঁপী কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; উদ্‌ভ্রান্তভাবেই স্বামীর মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। খানিক পরে নিজে-নিজেই শমিত হইয়া শ্রীপদ বলিল—"কথাটা সত্যি টেঁপু,এই দেখ না। তার প্রমাণ, এই দেখ, লেখা রয়েছে হাজার টাকা। মনিব পড়িয়ে দিয়েছেন, এই এক, আর এই তিনটে শূন্য, হাজার। আচ্ছা, বল ত বল ত কি গুণে তিনি আমাকে এতটা বিশ্বেস কর্‌তে পার্‌লেন?"

টেপী হঠাৎ চঞ্চলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"যাতেই করুন, আমাদের কিন্তু সে বিশ্বাস কোনরকমেই ভাঙ্‌লে চল্‌বে না।"

"নিশ্চয়...শুনেছ, শুনেছ, তাঁর নিজের টমটম, আর যে কোন ঘোড়া আমি নিয়ে যেতে পার্‌ব। ভোরে পাখী ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমায় রওনা হ'তে হবে, নইলে ঠিক্ সময়ে পৌঁছুতে পারব না কি না, তাই নিজের গাড়ী পর্য্যন্ত তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।"

"ঈশ্বর তোমায় রক্ষে করুন; বিপদভঞ্জন মধুসূদন আমাদের সহায় হ'ন! কিন্তু, কিন্তু, মনে থাকে যেন, পথে মদ—"

"ক্ষেপেছ? আর কি ও ছাই-পাঁশ মুখে তুলি...আজ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ওই সব নাম নিতে ইচ্ছে হচ্ছে; কিন্তু, কিন্তু, না, কখন যা' নিই নি, আজও তা' নেব না। আজ আমার কাছে যে সবার বড়, সেই, সেই জমিদারবাবুর নাম নিয়ে শপথ করে বল্‌ছি—'না, মদ এক ফোঁটাও কেউ ঠোঁট দিয়ে গলাতে পার্‌বে না—এবার, এবার আমায় জয়ী হ'তেই হবে'!"

বুঝি তাদের মত কোন দম্পতিই সেদিন অত সুখে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। গভীর রাতে টেঁপি উঠিয়া দেখে পদ জাগিয়া চেকখানি বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে। ক্লান্ত-স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল গা?"

পদ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তার মুখ চাপিয়া ধরিল বলিল—"চুপ্, চুপ্, গরীবের কুঁড়েতে এসব নিয়ে নিশ্চিন্দি হওয়া কি যায় টেপী, না ঘুম আসে? তাই বসে আছি।"

তিন

শীতের আকাশ বর্ষার মেঘে থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্রের সম্বল যা' কিছু সাজ-পোষাক গায়ে চড়াইয়া এক অদ্ভুত বেশে শ্রীপদ তার গন্তব্য পথ অতিক্রম করিতেছিল। বাহির হইবার মুখে মণ্টু আর ঝুলন, তার বড় আর মেজ ছেলে দু'টী আবদার ধরিল, বাপের সঙ্গে কিছুদূর তাহারা যাইবেই-যাইবে, কিছুতেই ছাড়িবে না। আজকার মত প্রভাতে ছেলেদের এ আবদার সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই; গাঁয়ের শেষে, ডাইনি-বুড়ীর নারিকেলগাছের তলায়, ঠিক্ খালটীর ওপারে সে তাহাদের নামাইয়া দিল।

উঃ, সে কি আনন্দ, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে সে কি ছুটাছুটী! যাইতে যাইতে পথের ওই বুড়া অশত্থগাছটার পশ্চাতে লুকাইয়া কুক্ দেয়; একজন অন্যকে ধরিতে চায়, সে কিছুতেই ধরা দিবে না—নাচিয়া লাফাইয়া পগারের কাদা ছিটাইয়া ছুটিয়া চলে;

আবার উভয়ে ফিরিয়া চায়, বাপ তাহাদের দেখিতেছে কি না। একটী পথচারী কুকুর হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের গমন-পথ পানে খানিক চাহিয়া রহিল; তারপর আকাশে-বাতাসে কি যেন পাইবার আশায় বারবার আঘ্রাণ করিয়া হঠাৎ উভয় জানুর মধ্যে লাঙ্গুল গুটাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

কিয়ৎক্ষণ টমটমের উপর বসিয়া শ্রীপদ সে দৃশ্য উপভোগ করিল; তারপর পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে সহরের দিকে অগ্রসর হইতে যাইবে, ঠিক্ এই সময় পাড়ার মাতব্বর দু' চারজন হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল—যখন সে যাইতেছে, তখন তাহাদের বিশেষ আবশ্যকীয় কয়টী কাজের ভার তাহাকে স্কন্ধে লইতেই হইবে।

নবীন হাড়ী হাসিমাখা মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাবাজী, যাচ্ছ যখন বুড়োর একটা উপকার করা অনেক কষ্টে পাঁচসিকে বাঁচিয়েছি, তোমার মামির অমনি তা'তে চোখ পড়েছে; বলে—দাও, খুকিটা কাঁদ্‌ছে দাও একটা দোলাই কিনে। এ বয়সে সহরে যাওয়া কি আমার পোষায়? ঠেকিয়ে রেখেছিলুম তাই ব'লে। আজ তুমি যাবে শুনে চেপে ধরেছে; বলে—দাও পদকে, ওকে তোমরা চিন্‌তে না আমি চিনেছি লোক খাঁটী, কেবল শেওলা ঢাকা ছিল বলেই—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অখিল হালদার বলিল "সে আর বল্‌তে; শাস্ত্রে আছে—সঙ্গদোষে শত গুণ নাশে, এও তাই। যে যাই বলুক, আমি ত ব'লেই এসেছি, পাঁকে পড়ে আছে তাই ওর রঙ অমন, একবার ধুয়ে-মুছে নিলে দেখ্‌বে টকটকে পাকা সোণা—তা' পদ্মলোচন যাচ্ছ যখন এনো আমার জন্যে এই ফর্দ্দের জিনিস ক'টা। গাড়ীতে যাবে-আসবে, বইতে ত আর হবে না; কি বল চক্কোত্তি' হেঁ হেঁ।"

রামনাথ চক্রবর্ত্তী লাঠির ঠক্‌ঠক্ আর গলার খক্‌খক্ শব্দে বেশ একটা ঐক্যতানের সুর রাখিয়া বলিলেন—"তা' বই কি, কতদিন বলেছি—হাঁড়ির ভাত বেশী হয়, টেপীকে ডেকে দিবি। পদা যতই অভাগা হোক্, নষ্ট হবে না—দেখে নিস্, দেখে নিস্, ও ফিরবে। এতদিন হতচ্ছাড়া ছোঁড়া ছেলেগুলোর মুখ কি চেয়েছে, গাঁটের পয়সা খুইয়ে আমিই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি—"

জ্বলন্ত মিথ্যার প্রতিবাদে পদার চোখগুলা হয় ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া সে সামলাইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী এবার নিজের পায়ের ধূলা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বেশ করিয়া পদর মাথায় মাখাইয়া দিলেন; বলিলেন,—"এই তোর অক্ষয় বজ্জোর, এরই জোরে সকল আপদ-বিপদ কেটে যাবে তোর।"

তারপর গলা খাট করিয়া বলিলেন—"অম্বুরী তামাক একটু মিঠে-কড়া দেখে নিয়ে আসিস্ বাবা; পয়সা এলেই ফেলে দেব। রেখে-ছিলুম ভাঁড়েও খুঁজতে গিয়ে শুন্‌লুম তোর জেঠাই মাছ কিনে বরবাদ দিয়েছে। মাগীগুলোর ওই কেমন নোলার দোষ হালদার মাছ দেখ্‌লে আর থাক্‌তে পারে না।

সহরের অম্বুরী তামাক ইত্যাদি অন্যান্য কাজের ভার পাইয়া শ্রীপদ ভালরকমেই বুঝিল, দুঃখের ন্যায় সৌভাগ্যও একত্র জোট পাকাইয়া আসে, পথভ্রষ্টের মত একলা আসে না।

বাহ্যিক না হউক, শ্রীপদর অন্তরের ভিতরের অন্তরটা অবজ্ঞায় হাসিয়া উঠিল; চঞ্চল আবিলতা-ভরা-কণ্ঠে সে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "ক'দিন আগে এরাই না আমাকে থানায় পাঠাতে চেয়েছিল? আর আজ—আজ কিসের জন্য এ বিশ্বাস?"

কথাটা স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক দেব-মূর্ত্তি তাহার কল্পনার নয়ন-সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ভয়ে, উদ্বেগে, ভক্তিতে দু'হাত তুলিয়া সে সেই

তকলী — শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

অহেতুক কৃপালু লোকটীকে প্রকাশ্যে বারবার প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিল না।

যাত্রার পথ।

উঃ, কি শীত, তেমনি বর্ষাও! মেঠো পথের সুতীক্ষ্ণ উত্তুরে বাতাসটাও কি তেমনি ঠাণ্ডা! ঘোড়ার বল্গাটা কোলের উপর ফেলিয়া বেশ কড়া রকমের একটা চুরুট সে ধরাইয়া লইল; কিন্তু তাহাতে কি কাঁপুনি থামিতে চায়? একটু গা গরম না হইলে ত আর চলাই যায় না! ওই ত ভুলু মিঞার তাড়ির দোকান। অজ্ঞাতে হাতটা একবার বল্গায় গিয়া পড়িল—থামাইবে কি?

পর মুহূর্ত্তেই উন্মাদের মত ঘোড়ার পিঠে চাবুকের উপর চাবুক চালাইয়া সে ঝড়ের গতিতেই স্থানটা অতিক্রম করিয়া গেল। সে সময় চোখের সম্মুখে জমিদারবাবুর কাতর বিমর্ষ মুখখানির ছলছল চাহনিটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল কি না, কে জানে? পরের গ্রামের তাড়ীখানাটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল বটে, কিন্তু কোন প্রকার চঞ্চলতাই আনিতে পারিল না। কেবল একখানি মুখের কল্যাণে সে বিশ্বজয়ী বীরের মতই সব বাধা-বিঘ্ন-প্রলোভন অতিক্রম করিয়া চলিল।

মধ্যাহ্নে ব্যাঙ্কের ধারে আসিয়া সে গাড়ী থামাইল। কিয়ৎক্ষণ কর্ম্মব্যস্ত লোকগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে সে দলে যোগদান করিবে কি না বুঝি তাহাই ভাবিয়া লইল; তারপর ধীর-মন্থর গতিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। চেকারবাবুটী সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে খানিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিলেন, তারপর উঠিয়া গিয়া পার্শ্বের একটী লোককে কি বলিলেন। উভয়ে নিকটে আসিয়া সেইরূপ সন্দেহপূর্ণ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবুর তুমি কে?"

"প্রজা।"

এ সংক্ষিপ্ত উত্তরে বুঝি তাহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; শ্রীপদকে বসিতে বলিয়া সাহেবের নিকটে গিয়া কথাটা জানাইল। মৃদু হাসিয়া সাহেব তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিলেন, তারপর একখানা কাগজ টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া তাদের হাতে দিলেন। ইহার পর বিনা বাক্যব্যয়ে বাবুরা ফিরিয়া আসিয়া এক শত টাকার দশখানি নোট খামে ভরিয়া তার হাতে দিলেন।

চেকখানা প্রথম কর্ম্মচারীর হাতে দিবার পর হইতে শ্রীপদর বুক কেমন আকুল ভয়ে কাঁপিতেছিল; কেবলই মনে হইতেছিল, এইবার, এইবার নিশ্চয় ইহারা তাহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবে। কারণটা যদিও তেমন সুস্পষ্ট ছিল না, না বৃদ্ধ জমিদারের উপর তিলমাত্র অবিশ্বাসের ছায়া মনে জাগিবার অবকাশ পায় নাই, তথাপি সে ভয়কে কিছুতেই মর্ম্ম হইতে তাড়াইতে পারিতেছিল না। তারপর বারবার কর্ম্মচারীদের এভাবের যাতায়াতে মনের সন্দেহ বেশ পাকারকমেই বদ্ধমূল হইয়া গেল; ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া সে সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়।

হয় ত তাহা যাইতও; কিন্তু দ্বারের নিকট সশস্ত্র প্রহরী ও পুলিশ পদাতিক দেখিয়া বুকে সে জোর আর রহিল না—ঝুপ্ করিয়া সম্মুখের একটা কাষ্ঠাসনে সে বসিয়া পড়িল। পরে কর্ম্মচারী যখন ইঙ্গিতে ডাকিয়া তাহার হাতে নোট বোঝাই খামটী দিল, তখন নিজের চক্ষু-কর্ণকে পর্য্যন্ত সে বিশ্বাস করিতে পারিল না, বিভ্রান্তভাবে বলিয়া উঠিল—"আমি, আমি শ্রীপদ।"

কর্ম্মচারী হাসিয়া বলিল—"আমি তা জানি, নিয়ে যাও!"

শ্রীপদ বিহ্বলভাবে খানিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"কিন্তু, কিন্তু, আমি যে সেই লোক, আপনারা তা জান্‌লেন কি করে?"

কর্ম্মচারী হাসিয়া নিজের কাজে মন দিল; এ কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করিল না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কিয়ৎক্ষণ হাতের লেফাপাখানির দিকে খানিক চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ শ্রীপদ সেখানি পকেটের ভিতর পুরিয়া ফেলিল, তারপর চঞ্চল উদ্বেগপূর্ণ গতিতে দ্বারের নিকটে পাহারাদারদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অতি সন্তর্পণে সে বাহির হইয়া গেল।

চার

শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে না পড়া পর্য্যন্ত পকেটের হাতটী সে নামাইতে ভরসা করে নাই; খোলা বাতাসে আসিয়া কিন্তু তার পরিশোধ অন্ততঃ দশ-পনেরবারে সে করিয়া লইয়াছে। লেফাপাখানি একবার করিয়া বাহির করে, ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে নোটগুলি গণিয়া দেখে, তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া দ্রুত সেগুলি পুনরায় পকেটে রাখিয়া দেয়।

মনে কত সঙ্কল্প-বিকল্পই না উঠে; ভাবে, নিশ্চয় জমিদারবাবু এ কাজের পুরস্কার অন্ততঃ গোটা দশেক টাকাও দিবেন। সে টাকা লইয়া কি করিবে সে? সব ছেলেদের এক-একটা বড় বড় আলুর পুতুল, পুরো এক টাকার ক্ষীরেলা, বাকী পয়সা ঘি ময়দা মাছ-আনাজ।......

পরেই কিন্তু ভাবিল—না, না, এটা যে অপব্যয়; কেন সে তা' করিবে? তার চেয়ে ঘোষেদের ওই পুকুরটা জমা লইলে হয় না? মন্দ কি? বছরের খাজনা,তার জন্ত ভয়ই বা কিসের? জলের খাজনা জলই দিবে। মধ্য হইতে ষাট্-সত্তর টাকা লাভ, মন্দ কি? আচ্ছা কি ফেলিবে সে, ডিম না মাছ? মাছই ভাল। দেখিয়া-শুনিয়া লওয়া যাইবে; তাতে গাজিয়া নষ্ট হইবার ভয় ত নাই। কিন্তু যদি ডিম ফুটে,তবে মাছের অপেক্ষাও তাহাতে বেশী লাভ। দেখা যাক; এত লোকের ফুটে, তাহারই বা না ফুটিবে কেন?

হঠাৎ মনের খেয়ালে সে পকেটে আর একবার হাত দিল; টাকাগুলো আছে ত? না, না, আছে বৈ কি, এই যে, কোথায় আর যাইবে? গাড়ীতে সে ত একা। আবার পূর্ব্ব কল্পনা পাইয়া বসিল—পুকুর জমা ত লইবে, কিন্তু মাছ ধরাইবার মুখে পাঁচজনে যদি চায়, ছেলেরা পাঁচ-দশটা সমবয়সী ছেলেকে সঙ্গে লইয়া যদি পাড়ে আসিয়া দাঁড়ায়, কোন মুখে তাহাদের বিমুখ করিবে সে? কেন, তারা কি কেউ দেয়? এই ত উমেশ বদ্যির পুকুর লোচন দাস জমা লইয়াছিল, কা'কে ক'টা মাছ দিয়াছিল সে?

চটক ভাঙ্গিয়া গেল। তাই ত লোকগুলার দেওয়া জিনিষ ত কিনিয়া আনা হয় নাই? এতটা আসিয়া আবার ফিরিয়া যাওয়া, না, না, প্রয়োজন নাই; কিন্তু, কিন্তু, জমিদারবাবু যে বলেছেন—'বিশ্বাস ক'রে তোমার হাতে যদি কেউ কোন জিনিষ স'পে দেয়, সে বিশ্বাস হন্তারক হওয়া মানে হচ্ছে চুরী। আমার কাছে যখন কথা দিয়েছ, কি বলে আর সে পথে পা বাড়াবে বল ত তুমি' ?"

কথাটা স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘোড়ার মুখ ফিরাইল।

সবার মনোমত জিনিস কিনিয়া মস্ত বড় এক গাটরী লইয়া সে আবার যখন পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, তখন সে অনেকটাই নিশ্চিন্ত। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, না, আছে, আছে; তথাপি বিশ্বাসটা তেমন প্রবল না হওয়ায় থামিয়া হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া আবার গণিতে বসিল।

* * * *

সন্ধ্যার পর গ্রামে প্রবেশ মুখে সেই খালের উপরের কাঠের সেতুটী পার হইবার পথে হঠাৎ আর একবার পকেটে হাত দিয়া সে চমকিয়া উঠিল!—কই, নাই ত! কে লইল, কোথায় গেল?

ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া ক্রমাগত নির্দ্দয়ভাবে প্রহারের পর প্রহার করিয়া সে ঝড়ের গতিতে সেই ফিরিয়া আসা পথটীতে আবার ফিরিয়া চলিল।

পাঁচ

"তোমার সোয়ামি কই গো, এই ত বারবার তিনবার হ'ল, আর কতবার ফিরব?"

নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পরেও স্বামী না আসার সকল অপরাধ নিজের মুখে-চ'খে মাখাইয়া টেঁপী আড়ষ্টকণ্ঠে বলিল—"কি জানি, এখন ত ফেরেন নি।"

"হুঁ, সে আর ফিরেছে! বাবুর যেমন, ডাইনির কোলে পো সমর্পণ! একটা চোর-জোচ্চোরের হাতে দিতে গেলেন কি না হুণ্ডি। টাকা হাতে পড়লে এসব মানুষের কি আর কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান থাকে। তা' ছাড়া, সে সহর, আমাদের পাড়াগাঁ ত নয়, কত রকমের কত লোক আছে।"

নটবর পাইক ফিরিয়া গেল—অসন্তোষের একটা জলন্ত প্রতীকরূপে। কিন্তু তার গজগজানি বরং ছিল ভাল। নাপিত বৌ হাসি মাখা মুখে আসিয়া যখন বলিল—"এর ভেতর কেলেঙ্কারীটা দেখছি তোকেই সইতে হ'ল। কি আর করবি, যেমন লোকের গলায় মালা দিয়েছিলি। তাও বলি বৌ, এদানী যেমনটা হ'য়েছে, সহজে ওড়াবে বলে ত বোধ হয় না। তোরই পোয়া বার থাবি পাঁচ ব্যান্নন—"

টেঁপীর কিন্তু সেদিকে ততটা লক্ষ্য ছিল না; নটবরের শেষের কথাগুলা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই ত এ কথাটা ত ভাবা হয় নাই; এতক্ষণ মাতাল স্বামীর ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইয়া সে মনে মনে তাহাকে কতই না গালাগালি করিয়াছে; কিন্তু তখন স্বপ্নেও ত ভাবে নাই, এও হওয়া সম্ভব—জোচ্চোর-খুনের হাতে পড়িয়া স্বামী রিক্ত সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি উঃ, না, না, সে কথা সে ভাবিতেও যে পারে না গো!—

অস্থিরকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"হ্যা দিদি, সেখানকার খুনে-বদমায়েসেরা শুনেছি নাকি বড় ভয়ানক · যদি, যদি তারা .."

"তুমিও যেমন, অমন লোককে যমেও ছোঁবে না। সেও প্রাণের ভয় করে।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্য-ভঙ্গিতে হাত-মুখ নাড়িয়া প্রতিবেশিনী গৃহত্যাগ করিল।

হতভম্বের মত টেঁপী সম্মুখের পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

যাহারা খুচরা জিনিষ আনিতে দিয়াছিল, তাদের প্রত্যেকেই এবার তাড়া দিয়া গেল। নবীন হাতীর স্ত্রী মোক্ষদা আসিয়াই চার কথা বেশ করিয়া শোনাইল; বলিল—"আমাদের রক্ত ওঠা টাকায় কি তোর ছেলে-মেয়ের ছাদ্দ করেছিস টেঁপি?

ব্যাকুল-কণ্ঠে টেঁপী বলিল—"ফেরে নি দিদি, এলেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, নিজে গিয়ে যার যা' বুঝিয়ে দিয়ে আসবে।"

যাবে? কোন মুখে আর যাবে? টাকা গুলোর ছেরাদ্ধ করে এসে—"

টেঁপী একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না; নির্জ্জীবের মত সেইখানে বসিয়া রহিল।

খানিক পরে হঠাৎ ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া নাপিত-বৌ বলিল—"তুই কেমন লোক বল ত, সোয়ামি গলায় দড়ি দিয়ে মলো, আর তুই কি না শেকড় গেড়ে বসে আছিস! মাগো মা, আজকালকার এ ছোটজাতের মেয়েগুলোকে দেখলে গা কেমন করে? বাপ, কি রক্ষেটা পেয়েছি! আর একটু হ'লেই তার পা দুটো মাথায় ঠেকেছিল আর কি! হাঁ ক'রে কি দেখ্‌ছিস, বিশ্বেস হ'ল না বুঝি? দেখ গে যা, ওই অশত্থগাছে, সত্যি কি মিছে। উঃ, এমন বাপেই আমায় জন্ম দেয় নি, মিথ্যে মুখ দিয়ে বেরুবে!"

শুধু বারতিনেক একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ

করিয়া টে পি স্থির হইয়া গেল। নাপিত বৌ বলিল —"ওমা, এ আবার কি কাণ্ড! কে জানে বাপু, কত ভিটকিলিমিই আছে! মাগীর ভিরমী-টিরমী যাওয়া অভ্যেস আছে না কি? আগে জান্‌লে কেই বা আস্‌ত; ভাবলুম—এত বড় বিপদটা থেকে বাঁচ্‌লুম, যাই দিয়ে গিয়ে আসি একবার খবরটা। তা' তা' মিন্‌সে যা বলে তাই ঠিক - মরিস্ নিজের পাঁচ ঝঞ্ঝাটে, কাজ কি পরের হাঙ্গামে?"

* * *

বৃদ্ধ জমিদারের নিকট সহিস আসিয়া একটা লেফাপা দিয়া বলিল—"কোচবাক্সের নীচে পড়েছিল বাবু, গাড়ী সাফ করতে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

পরম আগ্রহে জমিদারবাবু সেখানি নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রোগীর শুশ্রূষারত লোকটীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,— "দেখ্‌লেন ডাক্তারবাবু, আপনাদের চেয়েও আমি বেশী গুণীন কিনা? এবার পাপ করে নয়, বদ্‌নাম নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে যাবার ভয়েই ও গলায় দড়ি দিয়েছিল। দেখুন, দেখুন, যেমন করে পারেন বাঁচাতে হবে ওকে!"

একটা আর্ত্তনিশ্বাস ফেলিয়া রোগী ঠিক্ সেই সময় চোখ তুলিয়া চাহিল; তারপর আকুল-কণ্ঠে বলিল—"আমি, আমি আপনার নাম ডুবিয়ে দিয়েছি বাবু, চুরী করেছি!"

হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে জমিদার বাবু বলিলেন—"কে বল্‌লে? এই দেখ সেই নোট, এগুলো তোমার, সব সব।"

তন্ময়-দৃষ্টিতে শ্রীপদ খানিক সেগুলির দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর ফিকে হাসি হাসিয়া বলিল—"এখন আর বৃথা লোভ, আমি পারের পথে চলেছি!"...

"আমি ছাড়্‌লে তবে ত, কই যা' ত দেখি!"

আদুরে ছেলেটীরই মত জমিদার তার অসাড় দেহটাকে টানিয়া কোলে লইয়া বসিলেন। একটা স্বর্গীয় বিজলীর আভায় বেচারীর সারা মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

আবেগ-চঞ্চল-কণ্ঠে জমিদার ডাকিলেন— "ডাক্তার, ডাক্তার!"

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমার চেয়েও ওর বড় ডাক্তার আপনিই রয়েছেন বাবু। এখন আর ভয় নেই; বেচারি এযাত্রা ফিরল।" *

* টলষ্টয়

মেরামত

শ্রীসুটবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি-এল্ রচিত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সরখেল বিচিত্রিত

কেউ কেউ বলে বাড়ীটার গায়ে 'ভিব্‌জিওরে'র সব কটা রংই আছে, তাই ওর নাম 'রঙ্গ-বাড়ী'; আবার কারুর মত হচ্ছে—উঁ-হুঁ, ওদের আদিনিবাস বোধ হয় রংপুর, তাই বাড়ীর নাম ঐ রকম রেখেছে; কিন্তু বাড়ীর নাম রঙ্গ-বাড়ী হওয়ার মূলে সত্যিই একটু সাহিত্যের ছোঁয়াচ আছে।

দ্বারিকানাথ ছিলেন সেকেলে রসিক তাই, যাত্রার দলের সব চেয়ে রসিকের পার্টটায় কারুর হাত দেবার জো ছিল না; 'সীতা-উদ্ধারে'র সব চেয়ে রসিকের পার্টে নেমে, ষ্টেজ্‌কে ষ্টেজ্ মায় আশপাশের দু'-তিনটে গোলাবাড়ী শুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই ক'রে ছেড়ে দিতেন, শ্রোতারা পালাতে পথ পেত না, ল্যাজের আগুন নেভায় সাধ্যি কার? তাও এ রকম ব্যাপার একবার ঘটান নি, দু'-দুবার। রসিকতায় রামায়ণকেও এক ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। একবার বেলগাঁয়ে আর একবার মসজিদপুরে। কেবল মসজিদপুরেরটায় তাঁকে একটু ভুগতে হয়েছিল, কারণ সেখানকার মহম্মদ পুত্রেরা রামায়ণের একটুও কদর রাখলে না, তিন-তিনটি বচ্ছর রাজ-অতিথি করিয়ে দিলে। রসিক তিনি সত্যিই ছিলেন। যেদিন তাঁর বিচার হ'ল সে এক দেখবার জিনিষ। তিন-চারটে গাঁয়ের লোকে মারামারি, শুধু কোর্টঘরে একটু জায়গা পাবার জন্যে। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি একাজ কেন করলেন?"

তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন—"হুজুর, বলেন কি? যাত্রাটা কি ছেলেখেলা? আপনি হ'লে আপনিও তাই করতেন। যদু বাগ্‌দেটাকে কি উদ্ধার করব? সীতা নেই তাই, তা নইলে ওটাও সেরে নিতুম।"

একবার বাড়ীতে ডাকাতের দল চিঠি দিলে—আমরা তোমার বাড়ীতে অমাবস্যার দিন রাত্রিতে পড়ছি। ব্যস্, চিঠি পাবামাত্রই তিনি, বাড়ীর সরকারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অসময়ের ফলমূল যা কিছু সব বাজার উজোড় ক'রে বাড়ীতে গাদা করলেন, বড় মেয়েটাকে পার করবার জন্যে পুকুরে মাছ ফেলেছিলেন—বিশ-পঁচিশ সেরী সব তোলালেন। সে কি হৈ হৈ ব্যাপার, এক বিরাট যজ্ঞি! ডাকাতি করতে এসে লোকগুলো ত ভেবেই অবাক! জামাই আদর আর বলে কাকে? রাত তখন বারোটা, অতিথিদের খাওয়া যখন শেষ হ'ল, সে কি আওয়াজ, ঢেঁকুরের ওপর ঢেঁকুর! যাবার সময় সকলের হাতে যাতায়াত রাহা-খরচা দিয়ে দিলেন। গাঁয়ের সবাই বল্লে—"হাঁ, রসিক বটে দ্বারিকে, তবে একটা ভুল করলে দাদা! যেমন বিশ-পঁচিশ সেরী মাছ খাওয়ালে, তেম্নি সঙ্গে একটী ক'রে মৎস্যগন্ধা দিয়ে দিতে পারতে, ত বেটাদের আর এমুখো হ'তে হ'ত না, ঘর-সংসার পেতে বসত। এ যা ক'রে দিলে ফিরতেও পারে!"

রসিকতা শুধু এ পর্য্যন্তই নয়। পঁচানব্বই বছর বয়সে যখন হাঁপানিতে শুইয়ে ফেললে, তখন তিনি বন্ধুদের ডেকে বল্লেন—"ছ্যাপ্, শেষকালে কি অকাল-মৃত্যু হ'বে নাকি? জীবনে রসের ফাঁক ত

কোথাও রাখি নি, তবে এ রকম বেরসিকের মত হঠাৎ হয়ে যাব কেন? বোধ হয় এক জায়গা রসিকতায় একটু গলতি হয়ে গেছে রে? তোদের বৌদি'টিকে একখানাও গয়না দিই নি। যা'ক্, পরের বারে শুধরে নেওয়া যাবে, কি বল্?"

হাঁপানির বেগ যখন চোখ দু'টিকে প্রায় উল্টে ফেলেছে, তখনও তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"একটা ঝুড়ি দে ত, চট্‌পট্ পটলটা তুলে নিই।"

তারপর সব ঠাণ্ডা।

বই-এর মাঝখান থেকে পাতা হারিয়ে গেলে যেমন ফাঁক থেকেই যায়, তেম্নি রসিক দ্বারিকার পর দু'পুরুষের খবর কেউ দিতে পারে না। মথুরানাথের বংশ তিন পুরুষের পালা। কি রকমভাবে সে কলকাতায় এসে পড়ল তা' সে নিজেই জানে না; তবে এইটুকু তার মনে আছে, যেদিন কলকাতায় সে প্রথম পা দিলে তার সম্বলের মধ্যে ছিল কিছু সেকেলে পুরোণ মোহর, আর দ্বারিকানাথের একখানা 'অটোবায়োগ্রাফি'। মোহরগুলো চট্ করে কাজে লেগে গেল, বছরখানেকের মধ্যে একটা মাঝারিগোছের বাড়ী কিনে ফেললে। বাপ-ঠাকুর্দ্দার মোহর-বেচা বাড়ী, মথুরানাথের বড্ড ইচ্ছে হ'ল—বাড়ীটার এমন নাম হয় যাতে বাপ-ঠাকুর্দ্দার ঋণটা বাড়ীর গায়ে লাগান থাকে, কিন্তু সে রকম জুৎসই নাম সে পায় কোথা? মহা-সমস্যা। শেষে দ্বারিকার অটোবায়োগ্রাফি কাজ দিলে। রসিক দ্বারিকার মর্য্যাদা রেখে বাড়ীর নাম রাখলেন—'রঙ্গ-বাড়ী'। কিন্তু মথুরানাথ নিজে হ'য়ে গেলেন যেমন গোম্‌ড়া, বাম্‌নাই-গিরিতে হ'লেন তেম্নি গোঁড়া। হ'লে হ'বে কি? বংশের ধারা কখনই চাপা থাকে না, এক সময়ে না এক সময়ে দেখা দেবেই, আর হ'লও তাই।

মথুরানাথের তিনটি ছেলে। তিনজনেই হ'ল জাবালির শিষ্য, কিছুই মানে না, তারা রসিকতা পেলে কিছুই চায় না, তবে তারা বাপের খাতির রাখে। বাপের সামনে হাজির হবার আগেই কোমরে গোঁজা ডেস্কে রাখা পৈতেটা কাঁধে তুলে নেয়, মুখটি চূণ ক'রে নীরস হ'য়ে হাজির হয়। আসল শিক্ষা তাদের হ'য়েছে কি না কে জানে, তবে বড়টি শিবপুর কলেজ থেকে বেরিয়েই বাপের চোখে ধূলো দিয়ে সাগর পারে ঘুরে এসেছে, এখানে সাতশ' টাকা মাইনের কি-একটা কাজ করে। মেজটিও গভর্ণমেণ্ট আফিসের তিনশ' টাকা মাইনের চাকুরে। ছোটটি এখনও কিছুতে ঢোকে নি। রসায়নশাস্ত্রে এম-এ পাশ ক'রে গবেষণা কচ্ছে। বাইরে থেকে তিনজনকে দেখলে মনে হয়, বেশ বৈদগ্ধ্য আছে, কিন্তু তারা বাড়ীতে যে আমোদটা উপভোগ করে সেটাকে আর যাই বলা যা'ক্, আজকালকার কথায় বেশ মার্জ্জিত বলা চলে না, তবে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সম্মানের জায়গা বজায় রেখে চলে, রসিকতা বা আমোদের মধ্যে আদিরসের ছোঁয়াচ থাকতে দেয় না। আমোদটা অনেক সময় 'প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক্'-এ দাঁড়িয়ে যায়। রসিকতা এই তিন ভায়ের ঘাড়ে ভূতের মত বিশেষ ক'রে চাপে তখনই, যখন কোন জানা-শোনা পাড়া-গাঁয়ের লোক এদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়। ছোটটির ধারণা, সে এই সব লোকের মুখ দেখলেই 'উইক্ পয়েণ্ট' ধরতে পারে। আর একটি তার বদ্অভ্যাস, সে বাজি রাখে কথায় কথায়। দু'টি কাক এক জায়গায় বসেছে, কি স'তে' বাজি ফেলে ব'সে আছে, ডান দিকেরটা আগে উড়বে কি বাঁ দিকেরটা আগে উড়বে? মেঝেয় ছারপোকা দেখেছে ত নস্যির ডিবে বাজি ফেলে ব'সেছে—টেবিলের কাছে যেতে ন' মিনিট তিরিশ সেকেণ্ড লাগবে। সে কথা এখন যা'ক্।

তখন সন্ধ্যে হ'য়েছে। বড় হরেন বল্লে—"দ্যাখ্ স'তে', গেল বছর বাঁকড়োর অম্বিকের কথা তোর মনে আছে? উঃ, তোরা বেচারিকে বাস্তবিক কাবু ক'রে দিয়েছিলি!"

মেজ দেবু কোচের ওপর ইংরিজি নভেলখানা উল্টে রেখে ব'ল্লে—"বাঃ বড়দা, আমাদের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাচ্ছ, আর নিজে যে বরকর্ত্তা সাজলে!"

স'তে' বড়দা'র বছরখানেকের ছোট ছেলেটাকে নিয়ে খেলা করছিল, দাদাদের কথা কাণে আসতেই বল্লে—"দোষ যদি বলতে হয় ত ভকুর। ভকু কিন্তু যা পার্ট প্লে করেছিল, আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছিল।"

ভকু, হরেনের বড় ছেলে, বছর এগার বয়েস। ব্যাপারটা এই—গত বছর বাঁকড়ো জেলার এক গেঁয়ো ধনী মেয়েসমেত তার বৌটিকে ইস্তফা দিয়ে দ্বিতীয়বার নতুন বউ গস্ত করতে কলকাতায় আসে। সারা কলকাতার মধ্যে রঙ্গ-বাড়ীটাই তার চেনা। তাই শুভক্ষণে এইখানে এসে ওঠে। এখানে এসেই হরেনকে ডেকে সে চুপিচুপি বল্লে—"বুঝেছ দাদা—ও আর চলল না, ত্যাগই করলুম। মার মুখের ওপর কি বলে জান? বলে—'ছেলে হচ্ছে না তা আমি করব? মেয়ে হচ্ছে সে কি আমার দোষ?' মাকে বলে—'তুমি বল, তাতে আমার দুঃখ নেই, পাড়ার পাঁচজনের মুখনাড়া সইব কেন?' নাও কথা, ছেলে হচ্ছে না, তা পাড়ার পাঁচজনে বলবে না? একদম রদ্দি, বুঝেছ? একটা দেখে-শুনে দাও দিকিন, দেখি। মা বলেছে—একটু ডাগর ডোগর হ'লেও চলবে। তোমার সন্ধানে জানাশোনা কেউ আছে নাকি?" ব'লে হরেনের মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল।

হরেন ত প্রথমে অবাক! তারপর ঝাঁ ক'রে কি-একটা মতলব ঠিক ক'রে বল্লে—"বটেই ত! শাশুড়ীর মুখের ওপর এ রকম জবাব! আস্পর্দ্ধা ত কম নয়। কলিকাল তাই রক্ষে, নইলে—হুঁঃ!—তা আর বিলম্ব নয়, শুভস্য শীঘ্রং। আমারই জানাশোনা একটি পাত্রী আছে।"

তারপর তিন ভায়ে কি পরামর্শ হ'ল। স'তে' বল্লে—"বাজি রাখ বড়দা,—ভকুর চাবুক আর কম্বয়ের গুঁতোয় ও পালাতে পথ পাবে না। আজই সন্ধেবেলা—ঠিক করে ফেল।"

পাত্র দেখে গেছে। বাইরের ঘরে আজ কনের বাপ, দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কথা কইতে আসবে, ঠিক হয় ত আশীর্ব্বাদটাও সেরে যাবে। ঘরের মধ্যে—ভাই তিনটি, ভকু আর পাত্র বাঁক-ড়োর অম্বিকাবাবু।

ওদের মাঝখানে একটা রূপোর থালার ওপর আশীর্ব্বাদের জন্য ধান, দুর্ব্বো আর চন্দন। অম্বিকেবাবু আনন্দাতিশয্যে আধইঞ্চিটাক পোড়া বিঁড়িটাকে ধরাতে গিয়ে ঠোঁট পুড়িয়ে ফেললে। ঠোঁটে একবার জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বল্লে—"হাঁ, হাঁ সেই ভাল কথা। নিজে স্বকর্ণে শোনাই ভাল, তোমারও দায়ীত্ব কমে যায় আর আমারও স্বকর্ণে শোনা হয়। দেনা-পাওনা—যা দেয়—বুঝেছ! ওতে কিছু এসে যাবে না। মেয়েটির গড়ন-টড়নের কথাটা তা হ'লে একবার তুলো—মোদ্দা ভুলে যেও না। আমি তা হ'লে লেপটার মধ্যেই থাকব। কি বল?"

সাতটা দশ মিনিটে শুভক্ষণ। তখনও সাতটা বাজে নি। বাইরে আওয়াজ হ'ল—"হরেন আছ না কি হে?"

হরেন তাড়াতাড়ি অম্বিকের দিকে চেয়ে বল্লে—"এসেছে, এসেছে—ঢুকে পড়, চটপট—"

অম্বিকাবাবু এক লাফে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ল, মুখ বাড়িয়ে বলে দিলে—"গড়নটা সম্বন্ধে—"

বাইরে জুতোর আওয়াজ কাছে আসতেই কচ্ছপের মত মুখটা লেপের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে, কথাটা আর শেষ করতে পারলে না।

কনের বাপ ঘরে ঢুকেই বল্লে—"তারপর, বাবাজীবন কোথায়? তিনি থাকলেই ভাল হ'ত না?"

হরেনবাবু গম্ভীরভাবে বল্লেন—"নাঃ—দেনা-পাওনা, টাকাকড়ি সম্বন্ধে ও বড়ই লাজুক। থাকবার জন্যে বলেছিলুম—বেচারী রাজি হ'ল না।"

কনের বাপ পকেট থেকে একটা বিঁড়ি বা'র ক'রে মুখে দিয়ে বল্লে—"ভায়া, একটা দেশলাই দিতে পার? দেশলাইটা কোথায় ভুলে এসেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে লেপটা একটু নড়ে উঠল। অম্বিকে আর একটু হলেই লেপের ভিতর থেকে দেশলাই দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে ফেলেছিল। হরেন দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বল্লে—"তারপর, কি বুঝছেন? যা হয় দেবেন। আপনার ক্ষমতায় যেমন কুলোয়—আর কি? আমাদের দিক থেকে 'প্রেস্যার' কিছু নেই। সে যা'ক্, তা হ'লে মেয়েটির গড়ন-পেটন বেশ ভালই। কি বলুন?"

লেপের মধ্যে দু'টি কাণ খরগোসের মত খাড়া হ'য়ে উঠল। কনের বাপ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন—"আপনারা ত দেখেইছেন। আমি নিজে তার বাপ, বল্লে বলবেন—'আরে ও ত সুখ্যাতি করবেই,বাপের কাছে মেয়ে আর কবে খারাপ হয়।' কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি,অমন গড়নও পাবেন না, অমন রংও খুব কম মেয়েরই আছে—তা আমি জোর করেই বলতে পারি। রুজ-টুজ আমার বাড়ীতে জ্ঞানতঃ কখনও ঢোকে নি,যা রং দেখলে ও আসল গোলাপী, ছুরি দিয়ে এক পর্দ্দা চেঁচে দেখতে পার। কি বলব বল—শুধু যা পয়সার অভাব, তা না হ'লে অমন মেয়ে—"

হরেন বল্লে—'আচ্ছা, রং এর কথা যা'ক্। গড়নটা—"

কনের বাপ বল্লে—"এ দম মাখনের মত—"

লেপের মধ্যে ঠোঁট চাটার আওয়াজ হ'ল—চপ্ চপ্।

হাফপ্যাণ্ট পরা ভকু, ডাকসাইটে ডানপিটে—ঘরে ঢুকল—মুখে গান, হাতে চাবুক। প্রথমে বাঁই বাঁই ক'রে শূন্যে ঘোরাতে লাগল, পরে দেওয়ালে, দেওয়াল থেকে টেবিলে, টেবিল থেকে ক্যালেণ্ডারে সপাসপ্ চালাতে লাগল। তারপর ক্যালেণ্ডার থেকে হঠাৎ লেপের ওপর প্রাণপণ শক্তিতে চালাতে লাগল। মুখের গান যত দুনে চলে, হাতের চাবুক তত দুনে তাল দেয়। লেপের মধ্যে উঃ, 'বাবারে' গানে আর তালে মিশিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে ভকু স'তে'র দিকে ফিরে বল্লে—"ছোট কাকাবাবু, দেখবেন আমাদের ইস্কুলের মাঠে কি রকম 'সামার্সল্ট' শিখেছি—" ব'লে পাশের উঁচু টুলের ওপর থেকে মারলে এক লাফ।

লেপের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হ'ল—"বাবাগো!"

আবার টুলে ওঠা, আবার লাফ। ফের আওয়াজ হ'ল—"গেছিরে! হাত ভেঙ্গেছে।"

কনের বাপ ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"হরেন—ও কিহে? কিসের আওয়াজ? অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে।"

হরেন বল্লে—"আজ্ঞে, ও কিছু নয়, ওদিকে কাণ দেবেন না।"

"শালা, ওদিকে কাণ দেবে না? আমি ম'লে, বিয়ে করবে কেরে শালা?" ব'লে যে বেরিয়ে এল - সে আর অম্বিকে নয়। মাথার চুল উস্কখুস্ক, মুখ-চোখ লাল, জামা-কাপড় যেন জলে চুবিয়ে আনা হয়েছে।

কনের বাপ অবাক হয়ে বল্লেন—"আরে, এ যে বাবাজি!"

হরেন—"কে? অম্বিকে? কি আশ্চর্য্য! -"

মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে অম্বিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"এম্বিকে, ব্যাবাজি! ঢের হয়েছে, চাই না আমি বিয়ে করতে! মরতে বসেছিলুম, সে খোঁজ রাখ? উঃ! মার কথা শুনে শেষে প্রাণটা খোয়াতুম আর কি? খুব বেঁচে গেছি। মাকে তখনই বল্লুম—এবার কোনও রকমে বৌটাকে মাপ কর। তা না—বিয়ে কর, বিয়ে কর। হাৎ

বৌ আমার সতীলক্ষ্মী, পয়মন্তর—তাই এ যাত্রা রক্ষে পেলুম, কটায় ট্রেন ? চুলোয় যা'ক ট্রেন !" বলেই নিজের ছাতা, ছড়ি, সুটকেশ সব বগলদাবা ক'রে,গজগজ করতে করতে একরকম ছুটে বেরিয়ে গেল। ভকু পেছনে পেছনে কের্ত্তনের সুরে গান ধরলে—

"লোকে বলে মাতৃভক্ত,
সেটা কিন্তু নয়ক সত্য,
আশা শুধু টাট্‌কা লভি—বা—া—র।"

আর বছরের এই ব্যাপারটি তিনজনেরই চোখের ওপর ভেসে উঠল। দেবু বইখানি তুলে নিয়ে বল্লে—"আচ্ছা বড়দা', অম্বিকে পৌঁছে একটা চিঠি দিয়েছিল, না ?"

হরেন খবরের কাগজটা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বল্লে—"হাঁ, লিখেছিল—'তোমাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আমি সে সব সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি—মা বলেছেন তোমাদের এখানে একদিন নেমন্তন্ন করতে—খোকার অন্নপ্রাশনে'।"

হরেনের সব কথা শেষ হ'ল না। ঠিক সেই সময় বাইরে আওয়াজ হ'ল—"এই ত, এই ত একান্নর তুই। উঃ, কি হয়রানটাই হয়েছি !"

যে ঘরে ঢুকল, তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, শরীর দেখে মনে হয় না, চিরকাল সমানভাবে অন্ন পেয়েছে, চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা—একেবারে কদমফুল, মুখে 'সম বেয়ার্ড', পাঁচ-সাতদিন বোধ হয় ক্ষেউরি হয় নি। হাতে একজোড়া হুড্‌বার্ণিশ জুতো। ঘরে ঢুকেই বল্লে—"কি হয়রাণটাই হলুম—কি বল চক্কোত্তি, উঁহুঁঃ, ওখানে নয়, একদম ঐ তাকে।"

সঙ্গের লোকটিই চক্কোত্তি, হাতে একটা সাদা ক্যাম্বিস্ ব্যাগ—ভেতরে কি আছে বলা শক্ত, তবে বাইরে একটা কড়িবাঁধা হুঁকো, মেঝে কার্পেটের ওপর হাতের বোঝাটা নামাতে গিয়ে বাধা পেয়ে ধাঁধাঁ লেগে গেল। বক্তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল—ভাবটা—কি যে মুস্কিলে ফেল ?

সঙ্গীটিকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে হরেনের দিকে ফিরে প্রথম আগন্তুকটি একটু হেসে বল্লে—"এই প্রথম কলকাতায় আসা, একটু ভ্যাবাচ্যাকা লাগে—আবার সামলেও নিতে হয়—তা ওর ঘটে আর সেটুকু বুদ্ধিও নেই। দাও—হুঁঃ, যেমন সব লোককে নিয়ে আসা—" বলেই ব্যাগটা সঙ্গীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাশের ঝককেঝ বুককেশে সাজান নতুন বইগুলোর ওপর রেখে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে হুড্‌বার্ণিশের জুতো জোড়াও চাপালে। জামা আর চাদরটা খুলে ব্যাগের সঙ্গে বেঁধে ফেলে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তিনটি ভায়ে এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল, হঠাৎ স'তে' জিজ্ঞাসা করলে—"কি খুঁজছেন ?"

আগন্তুকটি রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"খুঁজছি আমার মাথা আর মুণ্ডু—বলি একটা পেরেক-টেরেক কোথাও আছে ? ঘড়িটা রাখি কোথা ?"

হাতে একটা কাছির মত মোটা কালো কারে জড়ান একটা ঘড়ি—টাইমপিশ্ বল্লেও চলে। স'তে' বল্লে—"দিন, আমি রেখে দিচ্ছি।"

ভদ্দর লোকটি চমকে উঠে বাড়ান হাতটি টেনে নিয়ে বল্লে—"বটে হে ছোকরা। তুমি রাখবে কেন বল ত ? আমি কি রাখতে জানি না নাকি ?" বলে ঘড়িটি নিজের ট্যাকে গুঁজে নিয়ে বল্লে—"চক্কোত্তি, এইবার ধরাও হে।"

চক্রবর্ত্তী ব্যাগের গা থেকে হুঁকো খুলতে লাগল। লোকটি হরেনের দিকে ফিরে বল্লে—"পাজি জায়গা—এই কলকেতা। একটু বেকায়দা হ'য়েছ ত হাজার পেয়াদা পেছনে লেগেছে, হাবড়াতে যেন সপ্তরথীতে ঘিরল হে। যত বলি যাব না—ততই ছেঁকে ধরে।—যেন একটা মজা পেয়েছে। শেষ হাত ধরে টানাটানি—প্রাণ যায় আর কি। তাও হাবড়া থেকে কলেষ্টোট,

বেটারা বলে কিনা বা—র—আ—না—সব শিয়ালের এক রা—ভারি তোর মড়াখেকো ঘোড়া-হেঁটেই মেরে দিলুম। বুঝেছ? সে কথা যা'ক্—পরে হ'বে! এটা ত মথুরদা'র বাড়ী।"

জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বল্লে—"আর যার বাড়ীই হ'ক, তুমিও যেমন—কিছু মাল খরিদ করতে এসেছি, নিয়ে চলে যাব। ব্রাহ্মণের বাড়ী ত? ব্যস্, তা হ'লেই হ'ল।"

হরেন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ—মথুরানাথ আমার ঠাকুর হন—তিনি ওপরে আছেন, আপনারা আসুন—।"

"তাই চল, তাই চল, অতি পুণ্যাত্মা লোক, অতি স-ব্রাহ্মণ—এস হে চক্কোত্তি, ওপর থেকে একেবারে স্নানাহ্নিকটাও সেরে আসা যাবে—কি বল বাবাজি?"

হরেনের সঙ্গে স-চক্রবর্ত্তী লোকটি ওপরে চলে গেল।

স'তে'র স্বভাব, কিছু ভাবতে হ'লেই আঙুল কামড়ায়, এতক্ষণ ডানহাতের তর্জ্জনীটা কামড়ে ধ'রে ব'সে, মনের মধ্যে ডুবুরি নামিয়ে দিয়েছিল—কি যেন হাতড়ে খুঁজে বার করতে চায়। হঠাৎ একসময় চেঁচিয়ে উঠল—"মেজদা!"

দেবু বল্লে— "কিরে? অমন চেঁচাচ্ছিস কেন?"

স'তে' ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে—"বাজি রাখ মেজদা'! এই সেই কাঙালী গাঙ্গুলী—সেই যে, যার কথা তোমাকে বলেছিলুম—মনে নেই? ইণ্টার মিডিয়েট একজামিন দিয়ে এদের দেশে গিয়ে দিনকতক ছিলুম।"

ইতিমধ্যে হরেন নেমে এসেছে। ব'ল্লে—"কিরে স'তে'? কোথায় ছিলি?"

স'তে' হরেনের দিকে ফিরে বল্লে—"উঃ বড়দা'! এরা সাংঘাতিক লোক, আমাকে একবার ভয়ানক মুস্কিলে ফেলেছিল। আজ তার শোধ নিতেই হ'বে। ইনিই হচ্ছেন কাঙালী গাঙ্গুলী, তালিত গাঁয়ের চাঁই, সঙ্গের চক্রবর্ত্তীটাকে চিনি না। প্রথম দিন কি রকম ভাবে আলাপ করলে জান? বল্লে—'ওসব তুটো পাশ তিনটে পাশ বুঝি না ছোকরা, বল দিকিন—৮১৷৷/১০৷৷—ক্রান্তি ক'রে ঘিয়ের মণ হ'লে এক ছটাক সাত কাঁচ্চার দাম কত?' এক গাঁ লোকের সামনে আমার ঘাড় হেঁট ক'রে দিয়েছে। তারপর নিজের দেশে পেয়ে আমার ওপর সে কি লেক্‌চার! বলে—'আজকালকার লেখাপড়া মানে গণ্ডমুখ্যু হওয়া, আরে বাবা, যা ক'রে তুমুঠো খেতে পারবি, তাই শেখ্—'শেষকালে বলে—'বামুণের ছেলে পূজো করতে জান? বল দিকিন চণ্ডীর স্তব—বল দিকিন নারায়ণকে চান করাবার মন্তর—বল দিকিন ওঁ ভুর্ভুব মানে কি?' বলব কি বড়দা'—আমার তখন ইচ্ছে হ'য়েছিল ওর মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই। সে ত গেল—তারপরদিন ভোর হ'তে-না-হ'তেই এসে হাজির—'আছ নাকি বাবাজি? চল ত একবার মুনীষদের হিসেবটা চুকিয়ে দিই—পুকুর কাটাচ্ছি—'জিজ্ঞাসা করলুম—'কতখানি পুকুর কেটেছে—মেপে দেখেছেন?' বল্লে—'আহা মাপ নিতেই ত যাচ্ছি।' জিজ্ঞাসা করলুম—'তা কি দিয়ে মাপবেন?' হাতে একটা কঞ্চি ছিল, দেখিয়ে দিলে—'এই যে।' সর্ব্বনাশ, স্কোয়ারমেজার বেঞ্চিতে ব'সে খাতা পেন্সিলেই করে এসেছি, কঞ্চি দিয়ে আবার কি রকম মাপরে বাবা! বল্লুম—'আমার শরীরটা তত বেশ ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না—' বল্লে—'তা' ত হ'বেই না—কলকাতার শরীর কিনা—' ব'লে গজগজ করতে করতে চলে গেল। উঃ, বুড়ো কম শয়তান! আমাকে একদিন ডেকে বল্লে—'দেখ বাবাজি, কলকাতায় জীবনে কখনও যাই নি—তবে বাপ-ঠাকুর্দ্দার আশীর্ব্বাদে শিক্ষা আমরা পেয়েছি—আমার এই পুকুর দেখছ—তুমি আমাদের গাঁয়ের অতিথি—যত খুসী ছিপ ফেলতে পার—তোমার খুসীমত

মাছ ধরতে পার।' ভাবলুম—যা'ক্, বুড়ো তবু এ-দিকে ভাল। গাঁয়ে মাছ পাওয়া যায় না—ক'দিন খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হ'চ্ছে। সেই দিনই একটা ছিপ জোগাড় ক'রে, ব'সে পড়লুম। ওঃ, বলব কি বড়দা'—গাঁয়ে যেমন দেখতে দেখ্‌তে বসন্তর গুটি বেরয়, আধঘণ্টার মধ্যে পুকুরটা ছিপে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল! কে জানে সেটা ভাগের পুকুর—কারুর কারুর হাতে আবার দু'হাতে দু'গাছা ছিপ। ভয়ে ছিপ গুটিয়ে নিলুম—সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মত অপরাপর ছিপ উঠে গেল। পুকুরের পাড় একেবারে খালি—একটি লোকও নেই—একটি ছিপও নেই। বুঝলুম—এখানে থাকতে হ'লে—এ শিক্ষায় চলবে না। তারপরদিনই কলকাতা ফেরবার জন্যে বেরিয়ে পড়লুম। আসছি, ষ্টেশনে আসবার মাত্র একটি পথ—ধাঁটির সামনে দিয়ে আসতে হয়। বুড়ো ডাকলে—'কি হে বাবাজি, এত সকালেই?' বল্লুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ চল্লুম; বাড়ীতে ভয়ানক বিপদ—বাবার সন্ন্যাস রোগ। বল্লে—'ওঃ,বড় পাজি ব্যায়রাম হে! এমন পেট টেনে ধরে যে, আধঘণ্টা নিঃশ্বেস ফেলতে দেয় না। কড়া তামাকটা খেতে বারণ করে দিও। বুঝেছ?' বল্লুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বল্লে—'তোমার তামাক আসে?' বলে হুঁকোশুদ্ধ হাতটা এগিয়ে দিলে। বল্লুম—'আজ্ঞে না—ওটা এখনও আসে নি।' একটু অবাক হ'য়ে বল্লে—'বল কি!' একটা বছর চারেকের ছেলে দিগম্বর হ'য়ে সামনের রাস্তায় খেলছিল— ডাকলে—'হেবলো!' হেবলো হাজির হতেই হুঁকোটা তার দিকে এগিয়ে দিলে। বল্‌ব কি বড়দা', দু' হাত ছেলেটা আর তিন হাত হুঁকো। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! দু'টান দিতেই কল্‌কের মাথায় দপ্‌ দপ্‌ করে আগুণ জ্বলে উঠল। বুড়ো তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে বল্লে—'ধ্যেৎ শালা—সব পুড়িয়ে দিলি—ছাড়্‌, ছাড়্‌—'তারপর দু'জনে টানাটানি—সে দৃশ্য আর সহ্য হ'ল না। আস্তে আস্তে স'রে পড়লুম। বুড়ো চেঁচিয়ে বলে দিলে—'ভুলো না বাবাজি, পৌঁছে একটা চিঠি দিও, নইলে বড্ড ভাবিত হ'ব—একজোড়া বেশ শক্ত দেখে চটি, কুইনীন একশিশি—' আর শুনতে পেলুম না—ততক্ষণ গাঁ ছাড়িয়ে এসেছি। শোধ নিতেই হবে বড়দা'—আমাকে বড্ড ভুগিয়েছে!"

ইতিমধ্যে স-চক্রবর্ত্তী কাঙালীচরণ নেমে এল। ঘরে ঢুকেই বল্লে—"কি বল চক্কোত্তি, অতি স-ব্রাহ্মণ, তোমাকে তখনই ব'লেছিলুম—উঠেবা যেখানে দেখো, এখন নিজমুখে শুনলে ত—তিনবেলা তিনসন্ধ্যে না ক'রে জলস্পর্শ করেন না। তুমি এখন বেশ ক'রে এক কল্‌কে—তারপর বাবাজীবন—"

তিনজনেই উঠে গিয়ে প্রণাম করলে। হরেনের দিকে চেয়ে কাঙালীচরণ বল্লে—"তুমিই বুঝি বড়, হরেন—না? বেশ, বেশ, বাবাজীর কি করা হয়?"

স'তে' জবাব দিলে—"চাকরী করেন।"

কা—"বেশ, বেশ, মাস মাহিনা কিছু দেয় ত?"

স'তে' মুখটা কাঁচুমাচু করে বল্লে—"বড়দা' এই সেদিন মাত্র ঢুকেছেন—অল্প-স্বল্প যা হয় কিছু দেয়। বলেছে ফিরে মাস থেকে ন'শ' টাকা করেই দেবে—এখন সাতশ' ক'রেই পাচ্ছেন।"

কাঙালীচরণের চোখ দুটো হঠাৎ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়ল, বল্লে—"এ্যাঁ! কত?"

স'তে' ঘাড় না তুলেই বল্লে—"সাতশ'।"

কাঙালীচরণ হঠাৎ চটে উঠে বল্লে—"কি হে ছোকরা, তামাসা করবার জায়গা পাও নি। ডেঁপো কোথাকার! আমি তোমার পিতৃতুল্য তা জান!"

এরকম চটবার কারণ কি বুঝতে না পেরে হরেন একটু অবাক হ'য়েছিল। তারপর বুঝতে পেরে বল্লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ—গোড়ায় পেতুম পাঁচশ'।

তারপর ওখান থেকে ঘুরে আসবার পর সাতশ' করেই দিচ্ছে।"

কাঙালীচরণ মুখটি শুকনো করে বল্লে—"বেশ, বেশ, ভালই। তা একটা ছোটখাট জমিদারি বই কি! কি বল চক্কোত্তি ?"

চক্রবর্ত্তী উবু হ'য়ে বসে কলকেতে ফুঁ দিচ্ছিল—ঠোটটা সরু হ'য়ে আছে, কিন্তু ফুঁ অনেকক্ষণ বন্ধ হ'য়ে গেছে। এতক্ষণ ভক্তিগদগদচক্ষে হরেনের দিকে তাকিয়েছিল, কাঙালীর কথায় একটু চমকে উঠে আবার ফুঁ আরম্ভ ক'রে বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ, তা বই কি।"

চক্রবর্ত্তীর ফুঁ বন্ধ হ'য়ে গেছে।

'ওখান থেকে ঘুরে আশা' কথাটা এতক্ষণ কাঙালীচরণের খেয়ালে আসে নি, এই-বার ভুরু কুঁচকে বল্লে—"ওখান থেকে; মানে কোথা থেকে ?"

স'তে' বল্লে—"আজ্ঞে, বিলেত থেকে।"

কাঙালীচরণের মুখের কি রকম চেহারা হ'ল—তা দেখবার আর অবসর হ'ল না—বাইরে আওয়াজ হ'ল—ঘর্‌র্‌—ঘর্‌-র্‌—ঘ্যাচ্‌। স'তে' ছুটে বেরিয়ে গেল। গাড়ী থেকে নেমেই সতের বড় বৌদি' বাইরের ঘরে লোক দেখেই হাতখানেক ঘোমটা টেনে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল, স'তে' পেছন থেকে আঁচল ধরে টানতেই ঘুরে দাঁড়াল। স'তে' চুপিচুপি বল্লে—"বাইরের ঘরে একজন এসেছে—পাড়াগেঁয়ে গোঁড়া—তুমি সটান ঘোমটা খুলে ঢুকে পড়—ঢুকে প'ড়ে এমন কিছু বল, যা'তে গোঁড়ামিতে ঘা লাগে।"

বৌদি চুপিচুপি বল্লে—"সেকি ? ও কাজ আমি পারব না—বাবা জানলে ভয়ানক রাগ করবেন।"

স'তে' কাঁচুমাঁচু হ'য়ে বল্লে—"বৌদি! তোমার ছু'টি পায়ে পড়ি—চল, বাবা আদপেই জানতে পারবেন না।"

স্বামী আর দেওরদের এইরকম অদ্ভুত খেয়ালে আগেও দু'-একবার যোগ দিতে হয়েছে। স'তে'র আব্‌দার এড়ান শক্ত। বাধ্য হ'য়েই বৌদি' বল্লে—আচ্ছা—চল, দেখি।"

স'তে' আগেই ঢুকে গেল। একটু পরেই বৌদি' ঢুকল—যেমনি রং, তেমনি গড়ন। ঘরে ঢুকেই হরেনের দিকে ফিরে বল্লে—"দেখ, বায়স্কোপে যোগেনের সঙ্গে দেখা, বল্লে—এবার এক জাহাজের কাপ্তেনের কাছ থেকে পাঁচশো কিনেছে। মুর্গীগুলো নাকি খাঁটি 'সাসেক্স'। তবে যোগেনের কথায় আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না, ও এখনও মুর্গী ঠিক চিনতে শেখে নি। যাই হ'ক, সে বলেছে, সময় পায় ত এখানে একবার আসবে।"

কাঙালীচরণ স'তে'র দিকে চেয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বললে—"ইনি কে ?"

স'তে'—"বড় বৌদি'।"

কাঙালী—"তার মানে ?—হরেনের পরিবার ?" একটু চুপ ক'রে থেকে কি-একটু ভেবে নিয়ে বল্লে—"তা উনি ওসব অখাদ্যির কথা কি বলছেন ?"

বৌদি' গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম ক'রে কাঙালীচরণের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়ে বল্লে—"যোগেন আমার ছোট ভাই—তারই সঙ্গ

দেখা হ'ল—আমার বাবা ব্রাহ্ম—কানপুরে থাকেন—আমাদের সেখানে মুর্গীর চাষ আছে—যোগেন—"

কাঙালীচরণ দাঁড়িয়ে রুখে উঠে বল্লে—"কি, বেব্রাহ্ম! মথুরানাথের পুত্রবধূ বেব্রাহ্ম! আমার সঙ্গে পরিহাস।"

বৌদি' আর হাসি চাপতে পারবে না বুঝতে পেরে মুখের শুক্‌নো অবস্থা বজায় রেখেই বেরিয়ে গেল। হরেন তাড়াতাড়ি উঠে এসে কাঙালীচরণের হাত ধরে কোচের ওপর বসিয়ে দিয়ে বল্লে—"দেখুন, ওসব কিছু মনে করবেন না—আমার বিবাহের পর শ্বশুরমশায় ব্রাহ্ম হয়েছেন। ওকে আমরা সেমুখো হ'তে দিই না। আর আপনি ত কানপুর যাচ্ছেন না—আমাদের এখানে সে রকম নয়। মেদিনীপুরের খাঁটি ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়ী রান্নার কাজ করে। বলেন ত—আমি তাকে ডাকি, আপনার সামনে গায়ত্রী আগাগোড়া মুখস্থ ব'লে যাবে।"

কাঙালীচরণ কতকটা প্রকৃতিস্থ। চক্রবর্ত্তীকে বললে—"কি বল চক্কোত্তি, এতে দোষ হয় কি? বাবাজির বিবাহের পর যদি বেব্রাহ্ম হ'য়ে থাকে ত মারাত্মক কিছু নয়—দাও চক্কোত্তি হুঁকোটা—বাবাজী! তুমি পঞ্চগব্য টব্য খেয়ে একটা প্রাচিত্তি-টাচিত্তির করেছ ত?"

হরেন সবিনয়ে ডানদিকে প্রায় আধ হাত ঘাড় হেলিয়ে বললে—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

কাঙালীচরণ—"ব্যস। তা হ'লেই হ'ল।"

চক্রবর্ত্তী হুঁকো এগিয়ে দিতে দিতে বললে—"আজ্ঞে, হ্যাঁ—তা'ত বটেই"

কাঙালীচরণ মুখ নীচু ক'রে হুঁকো টানতে লাগল। একটু পরেই বাড়ীর ভেতরে খাবার ডাক পড়ল। কাঙালীচরণ এতক্ষণ চোখ বুজে তামাক টানছিল—দেওয়ালের গায়ে হুঁকোটা ঠেসিয়ে রেখে নলটি ঢেঁকে গুজে বললে—"ন্নাঃ, ওতে কিছু এসে যায় না। চল হে চক্কোত্তি, সকাল থেকেত একরকম উপবাসই হ'ল—কাঙালীচরণ আর যাই করুক, ট্রেণে খাওয়া—মেলেচ্ছামি কখনও করবে না—চল, দেখা যা'ক্—কি রকম যোগাড়টা করেছে।"

কাষ্ঠাসনটা নাকি ব্রাহ্মণদের জন্য শাস্ত্রসম্মত, তাই স'তে' খুঁজে-পেতে কয়লার ঘর থেকে দু'টি পিঁড়ে পেতে দিয়েছে—কাঙালীচরণ বসতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"উঁহু, পিঁড়ি ত আমার চলবে না, না—বাবাজী, আমাকে অন্য একটা এই কম্বল কিম্বা কুশ দাও—বদরিকার মাদুলি—ও নষ্ট হ'লে আর পাবার উপায় নেই—তা ছাড়া চট্‌ ক'রে সে সব সাধুর দেখা মেলে কই? নেহাৎ পুণ্যির জোর ছিল, মিলে গেছে—ওকি আর সকলের ভাগ্যে হয়, কি বল চক্কোত্তি? তুমি ত কত চেষ্টা করলে—পেলে?"

ইতিমধ্যে কার্পেটের আসন পেতে দেওয়া হ'য়েছে—খাওয়া চলতে লাগল। এক-একটি আহার্য্য বারতিনেক ক'রে ক'রে দেবার পর মেদিনীপুরী সদব্রাহ্মণটি একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের চৌকাটের ওপর বসতেই স'তে'র বড়বৌদি' হঠাৎ রান্নাঘর থকে বেরিয়ে এসে চটে উঠে বললে—"সর, সর ঠাকুর, ও সব তোমাদের কর্ম্ম নয়, একেবারে হাঁপিয়ে পড়লে যে—অম্বলটা কে দেবে শুনি?" বলে নিজেই ইলিশ মাছের অম্বলের জায়গাটা নিয়ে পরিবেশন ক'রে দিলে। প্রথমে চক্রবর্ত্তীর পাতে দিলে, পাতে পড়বামাত্রই চক্রবর্ত্তী দু' আঙ্গুলে খানিকটা মুখে দিয়েই জিভে আর তালুতে 'চটাক' ক'রে এক অদ্ভুত আওয়াজ করলে। তারপর কাঙালীচরণের পাতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কাঙালীচরণ তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল—বেঁচে গেছে—বেঁচে গেছে—মরে নি।

তিন ভায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ খাওয়ার তদারক করছিল—অর্থাৎ এই মজাটুকু দেখবার

জন্যেই দাঁড়িয়েছিল। কাঙালীচরণ দাঁড়িয়ে উঠতেই স'তে' ছুটে গিয়ে কাঙালীচরণের পা চেপে ধরে বললে—"উঠবেন না, বসুন, এখনও দই-মিষ্টি আছে।"

হরেন হাত ধরে বললে—কি, হ'ল কি? ব্যাপার কি? খাওয়া যে কিছুই হ'ল না—কি আশ্চর্য্য!"

দেবু বললে—"তাও কখন হয়, বৌদি' আপনাদের জন্যে সন্ধ্যে থেকে কত কষ্ট ক'রে হাত পুড়িয়ে রাঁধলেন, আর আপনি—"

দেবুর কথাটাই কাঙালীচরণের কাণে ঢুকল—বললে—"কে রেঁধেছে এসব?"

দেবু সোৎসাহে বললে—আজ্ঞে, সবই বৌদি'র হাতের, বড়বৌদি' খুব ভাল রাঁধেন-ছোট বৌমাও মন্দ রাঁধেন না, তবে—"

"কাঙালীচরণ দেবুর সব কথা আর শুনলে না, হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে উঠল—"কি বল চক্কোত্তি—তা হ'লে অনেকক্ষণ মরে ভূত হ'য়ে গেছে, একটা পিণ্ডি দিলেই হয়।" বলে রেগে বাইরে চলে গেল।

ভায়ারা বুঝলে—যে মরেছে, সে কোনও মানুষও নয়, কোনও জ্যান্ত জীবও নয়, সে হচ্ছে জাতি। স'তে' বললে—"বড়দা'—বেশ হয়েছে, জাতের পাত না হ'লে আমাদের অধঃপাত বন্ধ হয় না। তালিত গাঁয়ের পাইলট—এই কাঙালী। এ যা হ'ল, একদম বাজিমাৎ।"

হরেন বললে—"একবার যা দিকিন, চুপিচুপি দেখে আয়, রাত্রেই না তল্পীতল্পা নিয়ে সরে পড়ে।"

স'তে' ফিরে এসে বললে—"বড়দা', সর্ব্বনাশ, চক্কোত্তি মাথায় হাত দিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে আছে, আর কাঙালীচরণ—"একটু থেমে বললে—"তিনটে-চারটে নাগাদ খাবার দেবার সময় কখনও 'জু'তে গেছ? হায়নার ঘর দেখেছ? হায়না যেমন পায়চারি করে, কাঙালীচরণ ঠিক সেই রকমভাবে পায়চারি করছে, আর চক্কোত্তিকে শাসাচ্ছে—'চালকেটে আগুণ লাগিয়ে দেব, গাঁ থেকে বাস ওঠাব, যদি ঘুণাক্ষরেও এসব কথা কারু কাছে বলেছিস? এ বেটারা সব কটাই ম্লেচ্ছ। অনভ্যান!"

রঙ্গ-বাড়ীর বাইরে রাস্তার দিকের উঠোনটায় বরাবরই একটা চৌকি পাতা থাকে। কাজের শেষে বাড়ীর বামুন-চাকরে তারই ওপর বসে, তাস খেলে, আড্ডা দেয়, রসিকতা করে। মাঝে মাঝে অন্য বাড়ীর ঝি-এর আমদানিতে আড্ডাটি বেশ রসঘন হ'য়ে ওঠে।

মাঝরাত থেকেই কাঙালীচরণ আর চক্রবর্ত্তী সেই খবরের কাগজ পাতা, তাস ছড়ান, আধ-পোড়া বিড়ির টুকরো আর পাণের পিকে ভর্ত্তি চৌকির ওপর আশ্রয় নিয়েছে। কাঙালীচরণ উবু হ'য়ে ব'সে আর চক্রবর্ত্তী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে 'হাঁ' ক'রে ঘুমুচ্ছে। পাশে সেই ক্যাম্বিস ব্যাগ আর হুড্ বার্ণিশ জুতো। ভোর হয়েছে। স'তে' নেমে আসতেই কাঙালীচরণ চেঁচিয়ে উঠল—"এই যে বাবাজী, তোমাদের জন্যেই শুধু অপেক্ষা—আমরা তা হ'লে চললুম।"

স'তে' বললে—"সে কি কথা? বড়দা' নামুন, তা ছাড়া বাবার সঙ্গে দেখা করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন।"

কাঙালীচরণের আর ধৈর্য্যের সীমা রইল না। চেঁচিয়ে উঠল—"জাত ত গেছেই বাবাজি, তার জন্য নয়, আমার গাঁয়ে আমার কথার ওপর টুঁ শব্দ করে, সে লোক এখনও জন্মায় নি। তা না,—সে অত্যাচার বরং সহ্য হয়, কিন্তু আধি-ভৌতিক কাণ্ড সহ্য করা আমার কোষ্ঠীতে লেখে নি। ভূতের সঙ্গে সারারাত ঠেলাঠেলি ক'রে থাকা আমার পোষাবে না।"

স'তে' একটু আশ্চর্য্য হ'ল।—কই ভূতের ভয় দেখানর মত মৎলব ত তাদের

হয় নি। বললে—"সেকি? ভূত কি? কি বলছেন?"

কাঙালীচরণ বিরক্তিভরে চেঁচিয়ে উঠল—"বলছি আবার কি? যা সত্যি, তাই বলছি। আমাকে বিশ্বাস না কর, চক্কোত্তিকে জিজ্ঞেস কর। রাত্রে একবার কলতলায় যাবার দরকার হ'য়েছিল—ঐ যে মাঝের দরজা, যতবার আমি ঠেলেছি, ততবার ওদিক থেকে সমানে ঠেলেছে। পৈতে ঠিক ছিল—তবুও। তারপর ঘরে এসে কলটা টিপে আলো জ্বেলে সবেমাত্র কলকেটায় হাত দিয়েছি—অম্নি দমাস ক'রে এক বিকট আওয়াজ হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল, আর কাঁচের টুক্‌রো ছুঁড়ে মারতে লাগল। কি যে ওঁদের কাছে অপরাধ করলুম, তা ওঁরাই জানেন, আর জানেন ভগবান। যাই হ'ক, বাবাজী, তোমাকে বলে রাখছি—ওসব পুষে রাখা ভাল নয়, তোমাদেরও কোনদিন একটা সাংঘাতিক হানি হ'তে পারে। গয়ায় একটা বড় রকমের পিণ্ডি দিও।" একটু চুপ ক'রে থেকে আবার সুরু করলে—"উঃ, ভগবান্ কাল থেকে খুবই শাস্তি হচ্ছে! চল চক্কোত্তি, দুর্গা দুর্গা ব'লে এবার বেরিয়ে পড়া যা'ক্, বরাতে আরও কি যে আছে।—কলকাতায় আসা এই প্রথম আর এই শেষ।" বলেই কাঙালীচরণ এক হাতে তার তল্পী আর এক হাতে চক্রবর্ত্তীকে এক রকম জোর ক'রেই টেনে নিয়ে চলে গেল।

স'তে' ভাবলে—ভূতের ব্যাপারটা কি? বোধ হয় ঘরের আলোর ডুমটা ফেটেছে। ঘরে ঢুকে দেখলে—সত্যিই তাই, 'বাল্‌ব্'টা ফেটেছে—চতুর্দ্দিকে কাঁচ ছড়ান। দরজা ঠেলাটা আগেই বুঝেছিল—স্প্রীংটা নতুন, এক হাতে জোরে ঠেলে না ধরলে কলতলায় যাওয়া যায় না, দরজা আপনা হ'তেই বন্ধ হ'য়ে আসে। বড়দা'কে এই নতুন খবরটা দেবার জন্যে স'তে' লাফাতে লাফাতে ওপরে চলে গেল।

গাছের মাথায় বাজ পড়লে গাছের যে রকম চেহারা হয়, কাঙালীচরণ যখন গাঁয়ে ঢুকল তার চেহারা ঠিক সেই রকম। ভবানী চক্রবর্ত্তী, বিরিঞ্চি মোট, দাশুরথি মণ্ডল, দেবেন গুঁই—প্রভৃতি সকলে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ঠাকুর-বাড়ীর দালানে বেশ জমাটি হ'য়ে গল্প করছিল, কাঙালীচরণকে দেখেই একবার এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিলে। ভাবটা—ব্যাপার কি? পশুরাজের অসুখ করল নাকি? কিন্তু কারুর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস হ'ল না—হয়ত এখনিই প্রশ্ন-কর্ত্তার কয়েক পুরুষকে যমপুরী যাবার উপদেশ দেবে।

গাঁয়ের অতবড় একজন মাথা—কাঙালীচরণ, তারই স্ত্রী সারদা বাম্নীর একটু হাঁক-ডাক থাকা উচিত ছিল—কিন্তু ও স্বভাব তার ছিল না—তবে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে পারলে আর তার বামুনটাকে নিজের কথামত 'ওঠ-বোস' করাতে পারলেই সে সন্তুষ্ট। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সে চলে, কিন্তু শেষেরটা হয় না ব'লেই কাঙালীচরণের সঙ্গে তার বনে না।

কাঙালীচরণ নিজের বাড়ীতে যখন পা দিলে তখন সন্ধ্যে। সারদাবাম্নী সেই সময় বাইরের চৌকাঠে গঙ্গাজল ছড়াতে এসেছিল, কাঙালী-চরণকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—"উঃ, তুমি, আচ্ছা মানুষ যা হ'ক, একটা খবরও দিতে নেই, আমি ভেবে মরি—কলকাতার সহর, ছেলেগুলো হচ্ছে মুখ্যুর শেষ, বললুম—'যা—ডাক এল কি একবার দেখে আয়—সে মানুষ পেঁছেই খবর দেবার কথা—'যদি একটা কথা কাণে তোলে। সুভালয়-ভালয় ফিরে এসেছ, এই আমার—দাঁড়াও, দাঁড়াও, সাত রাজ্যি ঘুরে আসছ—"ব'লেই বাঁ হাতের শাঁখটা মাটিতে নামিয়ে ডান হাতে প্রায় সমস্ত ঘটির জলটা কাঙালীচরণের মাথায় কাপড়ে ঢেলে দিলে।

কাঙালীচরণ দাওয়ায় উঠে জুতাসমেত

ক্যাম্বিশ ব্যাগ ধপাস্ ক'রে ফেলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বেস ছাড়লে—"আঃ।"

সারদা বামী মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"আহা, একদিনে কি ছিরিই হয়েছে!"

কাঙালীচরণ খিচিয়ে উঠল—"আঃ! থাম্ না মাগী, থাম্—জিরুতে দে।" বলে দাওয়ার একদিকে চেপে বসল। চক্রবর্ত্তী মাঝ পথ থেকেই নিজের বাড়ী চলে গেছে।

আ! থাম্ না মাগী, থাম্—জিরুতে দে।

কাঙালীচরণ সারারাত মনে মনে ঠিক ক'রতে লাগল—গাঁয়ের যে বেটা কলকাতায় যাবে, তাকে আর এ গাঁয়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না—সব বেটা সেখানকার ম্লেচ্ছ, লেখাপড়া না গুষ্টির মাথা। সারারাত ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। ভোর হ'তে না-হ'তেই তড়াক ক'রে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, মনে মনে একবার রাতের সঙ্কল্প আউড়ে নিলে। হাতমুখ ধুয়ে এসে ব্যাগটি খুলে বসল—খড়ম জোড়া বার করবার জন্যে। ব্যাগের ভেতর কাপড়টা নামাবলীটা নাড়তেই, দেখতে পেলে একটা চকচকে সাদা শক্ত কাগজ। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল—এটা আবার কি? টেনে বার ক'রতে গিয়ে দেখলে—শক্ত কাগজের এককোণে সুতো বাঁধা—সুতোয়—সর্ব্বনাশ—এ যে একরাশ নোট। টপ্ ক'রে ব্যাগ বন্ধ ক'রে ফেললে। উঠে গিয়ে খিল এঁটে দিয়ে সন্তর্পণে গুণে দেখলে—পাঁচ খানা - প্রত্যেকটা একশ' টাকার। শক্ত কাগজটার ওপর নজর পড়তেই দেখলে কি লেখা। বাঁ হাতে নোটের তাড়াটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে কাগজটা তুলে পড়লে—

"কাঙালীচরণ বাবু, নমস্কার! এই পাঁচশ' টাকা আপনার জাতিপাতের খেসারৎ। যে রান্না মাংস খেয়ে গেছেন, সেটা ঠিক ছাগের নয়—সে এক নধরকান্তি কুক্কুটির—অপরাধ মার্জ্জনীয়—নিবেদন ইতি—

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

পুনশ্চঃ—নোটের নম্বর আমরা টুকিয়া রাখিলাম। এক বৎসর ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিবেন না—হাজতে যাইতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে আপনার শিক্ষা-দীক্ষা, ব্রাহ্মণত্ব, সংস্কার, জাতি বজায় রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধে মত বদলাইলে—উহা নির্ব্বিঘ্নে লইতে পারেন। কেবলমাত্র ধারণা বদলাইলে চলিবে না, কার্য্যে দেখান চাই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

ও

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা"

কাঙালীচরণ মহা-সমস্যায় পড়ল। কি করবে কিছুই স্থির ক'রে উঠতে পারলে না। মনে মনে বললে—"বেটারা আচ্ছা আহাম্মক ত।"

বাড়ীর হিসেব লেখে দেবু, বছরের শেষে মথুরানাথ একবার খাতা দেখেন। দেবু বড়দার দিকে চেয়ে বললে—"বড়দা', কাঙালীচরণের পাঁচশ' টাকা, কি খরচ বাবৎ ধরব?"

বড়দা' একটু ভেবে বললে—"যা হয়-লেখ না। লেখ মেরামতি খরচা।"

মথুরানাথ বছরের শেষে খাতা দেখতে গিয়ে ঠিক ঐ জায়গাটা এসে অবাক হ'ল—ভাবলে, কই, বাড়ীতে মিস্তিরি খাটতে ত দেখি নি? তারপর খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে খট্‌খট্ করতে করতে নেমে গেল—যদি ছেলেদের কারুকে দেখতে পায় ত জিজ্ঞাসা করবে। ছেলেরা আগে থাকতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছে। অগত্যা মথুরানাথ ভাবলেন, বোধ হয় বাইরেটা মেরামত হয়েছে, তাই রাস্তায় এসে বাড়ীর চতুর্দ্দিক বেশ করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

—নেপথ্য—

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[গল্পের গোড়ার দিকের কথা সঙ্ক্ষেপে এই : বীরেন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, হাঁসপাতালে অসুস্থ সুধার সঙ্গে আলাপ ও প্রেম হয়। সুধা মামাবাড়িতে প্রতিপালিত হইতেছিল, সেইখান হইতে সুধাকে নিয়া সে সরিয়া পড়ে। ঘুঁটের পাহাড়ের তলায় লুকাইয়া থাকিয়া তাহার দুর্ভোগের আর সীমা ছিল না। সুধার মামার শালা পরেশ বীরেনের বন্ধু। সে চালাকি করিয়া বীরেনের এই elopement এর সুবিধা করিয়া দেয়। এমন কি কাশী যাইবার খরচ-পত্রও সেই করে। কাশীতে আসিয়া বীরেন ও সুধার ভাল জমিতেছে না; পরস্পরকে সবিস্তারে জানিবার সুযোগ ও ধৈর্য্য ছিল না বলিয়াই তাহাদের এমন অবনিবনা হইতেছে। কাশীতে তাহারা একটা মেস্‌এ আসিয়া উঠিয়াছে। সুধার প্রতি সেই মেস্‌এর ম্যানেজারের নজর ভাল নয়। বীরেন সুধার অনুরোধে সন্ধ্যায় মুন্সির ঘাটে তাহার মাসি-বাড়ির সন্ধানে চলিয়াছে। সুধা ইতিমধ্যেই সিঁদুর পরিয়া বউ সাজিয়া বসিয়াছে কিন্তু।]

পাঁচ

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কি-একটা কথা ভাবিতে গিয়া বীরেনের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। কলিকাতা ছাড়িবার আগে সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই যে, কাশীতে সুধার এমন আশ্রিতবৎসলা মাসি আছে। বেনারস ক্যান্টনমেন্টের ওভারব্রিজএর উপর দাঁড়াইয়া যখন সে একটা হোটেলওয়ালার খোঁজে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তখনো ত' সুধা বলিয়া উঠে নাই : ভয় কি, এক্কা একটা নিয়ে মুন্সির ঘাটে চল, সেখানে আমার মাসি আছে। বামুন-দিদি বল্‌লে সবাই তাঁকে চিনতে পারে। তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বীরেনেরই হাতের মুঠায় সে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিল, বীরেনের সহযাত্রিনী হইয়া মৃত্যুকেও সে অমৃত করিতে পারিত। কিন্তু আজ সে বীরেনেরই হাত থেকে আত্মরক্ষা করিতে চায়, কোথাকার কে এক মাসি খাড়া করিয়া তাহার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে। বীরেন তাহার কত পর হইয়া গিয়াছে, কত পর বা না-জানি গোড়া হইতেই ছিল! তাই, একবার মাসির আঁচলের তলায় গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে সুধা স্বচ্ছন্দে তাহাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিতেও সঙ্কোচ করিবে না। নির্লজ্জ রূঢ়তায় এমন-সব কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া বসিবে হয় ত' যে, সে-ই আগাগোড়া পরিচ্ছন্ন, যত আবিলতা বীরেনের ব্যবহারে। সামাজিক খ্যাতি বাঁচাইতে মেয়েমানুষ বলিতে না পারে এমন মিথ্যা কথা ভাবা যায় না। বীরেন তাহা জানিত। সুধা এত সহজেই গুটি-গুটি দু'-চারটি পা ফেলিয়া এই মহাসমুদ্র পার হইয়া যাইতে চায়! কাশীতে তাহার মাসি থাকিলেও বীরেনের কাছে সে মামাবাড়ির বায়না না ধরিলেই ভালো করিবে। সে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এখানে শিবের মাথায় হাত বুলাইতে আসে নাই। সুধাকে যদি এত সহজেই ফস্‌কাইতে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে কলিকাতায় থাকিতেই ত' তাহার কপালে কলঙ্কের চিহ্ন আঁকিয়া সে আস্তে সরিয়া পড়িতে পারিত—এত কঠিন হইয়া চাকরটার সঙ্গে সিঁদুরের দর লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিবার দরকার ছিল না। কাশী থাকিত চুলোয়, পরেশ থাকিত জাহান্নমে। কিন্তু অত সহজে সুধাকে সে ফুরাইতে দিতে চাহে নাই

বলিয়াই ত' এতখানি তপস্যা করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রেমে প্রতীক্ষাই ত' তপস্যা। বীরেন দেহতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কবির অশরীরী কল্পনা-কেই প্রাধান্য দিয়াছিল কি বলিয়া, সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সেই কথাই সে ভাবিতে লাগিল।

একবার ভাবিল সুধাকে ফেলিয়া সোজা সরিয়া পড়িলে কী এমন ক্ষতি হইবে! তাহার প্রতি যাহার পদে-পদে এমন অসন্তোষ ও অবি-শ্বাস তাহাকে শাসন করিবার দরকার আছে। এবং সে-দণ্ড নির্ম্মম হোক্। তখন সুধা কাটা-ছাগলের মত দাপাইয়া মরুক। বীরেন্ মনে-মনে একটা হিংস্র আনন্দের স্বাদ পাইল। কিন্তু ক্ষতি কিছু হয় না বটে, লাভ-ই বা কী হয়! সুধাকে জব্দ করাই যদি ইচ্ছা ছিল, তবে সেই রান্নাঘরে মামিমার সামনে ঘুঁটের পাহাড় ভেদ করিয়া উঠিয়া আসিলেই তাহার মুখ থাকিত কোথায়! কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই যে তাহাদের মধ্যে এমন-সব জটিল গিঁট পড়িতে থাকিবে ইহা বীরেনের হিসাবেই আসে নাই। একেবারে খোলা আকাশের তলায় সান্নিধ্যের অবারিত মুক্তিতে তাহাদের কি চেনা হইবে না?

বীরেন দশাশ্বমেধের দিকেই পা চালাইল। ঘাটের মুখে বহুবিচিত্র নর-নারীর মেলা; ধাপে ধাপে অজস্র জনতা। এত সব ভিড় ও কোলা-হলের মধ্যেও তাহার মনে একটি মুখ ও একটি কণ্ঠস্বর অতিস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অমন এক-খানা সাদাসিধে করুণ মুখে এত বিষ উঠিবে ইহা সে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? তবু, এতটা পথ ডিঙাইয়া আসিয়া পারে আনিয়া নৌকা ডুবাইবে সে এত ভাবপ্রবণ নয়। নাই-মামার চেয়ে কাণা-মামা ভাল বৈ কি। সুধাকে পিছ্-লাইয়া যাইতে না দিয়া সেই বরং আর পিছাইবে না। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া সে একটা বন্য সুখ পাইল,—চোখ দুইটা তার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সিঁড়ির ধাপে কোথাও কীর্ত্তন, কোথাও বা ন্যাংটা-সন্ন্যাসী ঘিরিয়া মোক্ষপ্রার্থিনীদের স্তবগান, কোথাও বা কথকতা চলিয়াছে, কাতারে কাতারে মেয়ে-পুরুষের অজস্র স্রোত—তাহারই মধ্য দিয়া বীরেন দুয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেকগুলি ঘাট ডিঙাইয়া মুন্সির ঘাটে উঠিয়া আসিল। খাড়া সিঁড়ি উঠিয়াছে। তাহাই এইবার ভাঙিতে হইবে। মাসির দেখা পাইলে যদি কিছু এ-দুঃসময়ে হাত্ ড়ানো যায় তবে ত' তা কাশীপ্রাপ্তির চেয়েও দামি।

—এখেনে বামুন-দিদি বলে' কেউ থাকে?

পথে বিশেষ কেউ ছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। যাহাকে বীরেন্ প্রশ্নটা করিল সে সাত-পাঁচ কিছু না বুঝিয়া হাঁ করিয়া রহিল। পরে কহিল,—বামুন-দিদি? বামুন গেছে রাঁধ্তে, দিদি গেছে বাগ্দিপাড়ায়।

লোকটা নেশা করিয়াছে।

বীরেন কহিল—এটা মুন্সির ঘাট ত'?

—মুন্সির ঘাট? বলেন কি মশাই। সে ত' বহুদিন লোপাট্ হ'য়ে গেছে—এটা মুহুরির ঘাট।

একে দিয়া কিছুরই কিনারা হইবে না। কিন্তু আর কাহাকেও প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর পাইতে পারে এমন একটা মুখও চোখে পড়িল না। অগত্যা বীরেন্ সামনের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়িল। কোনো সাড়া শব্দ নাই। এই ত' এক ফোঁটা মোটে রাস্তা—খানকয়েক বাড়ি, এর মধ্যে কেহ-না-কেহ নিশ্চয়ই সন্ধান দিতে পারিবে। নাম মোক্ষদা, পদবী বামুন-দিদি। বিধবা, যৌবনে রূপসী ছিলেন। সুধা আর কোন্ ন্যাকামি করিয়া এমন জল্জ্যান্ত মিথ্যা কহিবে! দেখা যাক্।

বীরেন দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিল।

এই বাড়িটারই রাস্তার উপরে দরজা ছিল। অন্যান্য বাড়িগুলিতে ঢুকিবার পথই বা কোথায়! না, ভিতর হইতে যখন বন্ধ আছে, তখন জবাব না

লইয়া আর বীরেন ফিরিবে না। জুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়া দরজায় এইবার সে লাথি মারিল।

ভেতর হইতে গলা এইবার শোনা গেল যা হোক্। যেন কে দুইটা চাঁছা বাঁশের কঞ্চি ঘসিতেছে তেমনি গলা : কে রে আবাগির বেটা মিন্‌সে ? কে রে হারামজাদা সন্ধ্যের সময় এসে দোর ঠেলিস্ ? মর্‌তে আর জায়গা পাস্ নি ?

স্বরটা দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরেন মিনতি করিয়া কহিল,—দরজাটা খুলুন্। আমি ভদ্রলোক, একটু বিপদে পড়ে' এসেছি।

—কেমনতর তুমি ভদ্রলোক গা ? বলা নেই কওয়া নেই দরজার ওপর যে বাঘের মত লাফিয়ে পড়েছ ? অমন ভদ্দরলোকের চৌদ্দপুরুষের মুখে আমি ঝাটা মারি।

বীরেন হঠাৎ চটিয়া উঠিল। কিন্তু দরজা খোলা না পাইলে চলিবে না ত'। তাই সে স্বর মোলায়েম করিয়াই কহিল,—বড় বিপদ, একটু-খানি খুলুন্ না দরজা। আপনার কিছু ভয় নেই।

—ওঁর বিপদ, দেহ আমার জুড়িয়ে গেল আর কি। বিপদ হতভাগা, ধর্ম্মশালায় যেতে পারিস্ নে ? এখেনে মরতে এসেছিস কেন ? নেমে যা না পুব দিকে সরে'—সাম্‌নেই গঙ্গা। মরণ হয় না তোর—সন্ধ্যেবেলায় ভদ্দরলোকের বাড়ির দরজায় ধাক্কা মারিস্!

বীরেন ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—দরজা না খুলুন, কিন্তু বামুন-দিদি এ-পাড়ায় কোথায় থাকে বলে' দিতে পারেন ?

—বামুন-দিদি ? তার খোঁজে তোর কী দরকার রে আবাগির বেটা ? সে তোর খায় না পরে, যে ভর্-সন্ধ্যেয় এমন জুলুম চালাবি ? যা যা বেরো।

বীরেন নাছোড়বান্দা : যদি জানেন ত' বলুন, আমি তাঁর জামাই।

—জামাই ?

দরজা এইবার খুলিল।

বীরেন দেখিল তাহার সাম্‌নে একটি বিধবা নারীমূর্ত্তি, চোখ কটা, চুল শাদা, চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া আসিয়াছে। বয়সের ভারে দেহটা বাঁকানো। চেহারাটার মধ্যে একটা প্রখর রূঢ়তা আছে। বীরেন ঘাব্‌ড়াইয়া গেল। বলিল,—আপনিই কি বামুন-দিদি ?

বামুন-দিদি স্তম্ভিত হইয়া ছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—কেন ?

—ও!

মাসি বলিতে যে-চেহারাটি মনে-মনে মূর্ত্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সঙ্গে তাহার প্রতি রোমকূপে অমিল রহিয়াছে। কিন্তু চেহারার বিচার এখন থাক্, বীরেন তাড়াতাড়ি বামুন দিদির পায়ের কাছে প্রণত হইয়া কহিল,—যাক্, তোমার দেখা পেয়ে একটা মহা ভাবনার দায় থেকে উদ্ধার পেলাম, মাসিমা।

বামুন দিদি দাঁত খিঁচাইলেন : উদ্ধার তোমাকে পাওয়াচ্ছি। ও বিশে, তোর বাসন-মাজা ফেলে আয় ত' একবার ইদিকে, এই হত-চ্ছাড়া বে-আক্কেল বেটাকে ঘাড় ধরে' বার করে' দে দিকি!

অদূরে একটা চৌব্বাচার পাড়ে বসিয়া বিশ্বনাথ তেওয়ারি তাহার লোটায় নারকেলের ছিব্‌ড়ে ঘসিতেছে। তাহার ভুঁড়ির বহর ও গর্দ্দানের নমুনা দেখিয়া বীরেনের প্রাণে আর জল নাই। প্রথম সাড়াতেই সে উঠিয়া আসিল না বটে, কিন্তু চক্ষু পাকাইয়া একদৃষ্টে তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। তাহার ঐ উদ্যত ভঙ্গিটা বীরেনের একটুও ভাল লাগিল না, যেন দরকার হইলে সে এখনই ছোঁ দিয়া তাহার মুণ্ডুটা ছিঁড়িয়া লইবে। কিন্তু গুটি-সুটি পিছাইয়া গেলেই বা সে কি করিয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিত! পকেটে যে ওটা আছে সে কি শুধু একটা খেল্‌না নাকি ?

বীরেন হাসিয়া কহিল,—তাড়িয়ে দেবে কি মাসিমা? তুমি আমার মাসি হও, আমি তোমার জামাই।

—মাসি, মাসি কি রে শতেকখোয়ারের বেটা? কাশীর ঘাটে কোন্ মাগীটা মাসি নয়? মা নেই তোর, মাসির বাড়ি ধন্না দিতে এসেছিস্? বেরো, বেরো। জামাই-গিরি ফলাবার আর জায়গা জোটে নি! 'আমি তোমার জামাই'—কথার কি ছিরি দেখ না! আমার আবার মেয়ে কোথায় রে যে তুই জামাই হ'তে যাবি, পাজি? জামাই! তোর মত জামাই কাশীর রাস্তায় পাঁচশোগণ্ডা গড়াগড়ি যাচ্ছে। যা, যা, দরজা আগ্‌লায় না। ভালয় ভালয় বিদেয় হ পোড়ার মুখো। কৈ রে বিশে, হ'ল?

তেওয়ারি হাত ধুইতেছে। আসিয়া পড়িল বুঝি।

বীরেন কহিল,—তোমার আপন জামাই হবার সৌভাগ্য হয় নি, মাসিমা। কল্‌কাতায় তোমার এক ভাই আছেন না—যোগেন বাঁড়ুয্যে, উকিল,—ঠিক কিনা?

—যোগেনের নাম আবার বেঠিক হ'তে যাবে কেন? ভূ-ভারতে তাকে না চেনে এমন জানোয়ার আছে নাকি কোথাও? তার নাম কল্‌কাতা-কাশী উলুবেড়ে-উল্টাডিঙি—সব্বাইর মুখে-মুখে। তেরো বছর আগে বিশুই ত' লগ্নি-পত্তনি কর্‌তে কল্‌কাতা গিয়েছিলো। হাওড়ায় নেমে কাউকে আর কিছু বল্‌তে হ'ল না, যেই বল্লে—যোগেনবাবুর বাড়ি যাবো, অম্‌নি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে' একেবারে হাওয়ার উড়িয়ে নিয়ে গেলো। বিশ্বেস না হয় বিশুকেই জিজ্ঞাসা কর্ না।

বিশু কাছেই দাঁড়াইয়াছে। নাকের সাহায্যে সে একটা হুঙ্কার করিল। বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি?

বীরেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—তোমার আরেক বোন ছিল না? একটি মেয়ে হ'তে মারা যান,—ঠিক কি না?

—সে ত' কোন্ আদ্যিকালের কথা। আমার সৈরভিকে জামাই কী ঠ্যাঙানটাই না ঠ্যাঙাত! হ'তাম আমি, হামান্‌দিস্তে দিয়ে দিতাম অমন সোয়ামির দাঁত গুঁড়ো করে'।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বোনেরই এক মেয়ে আছে। যোগেনবাবুর বাড়িতে বড় হচ্ছিল। আমারই সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। নাম সুধা। মাসি বল্‌তে অজ্ঞান। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাগল।

বামুন-দিদি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বীরেনের আপাদ-মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন: তুমি আমার সৈরভির জামাই? বল্‌লেই হ'ল? নচ্ছার, ছুঁচো কোথাকার! সৈরভির মেয়ের নাম কখনো সুধা হয়? মেয়ের বিয়ে দিল, আর যোগা আমাকে কোনো চিঠি লিখ্‌লে না? এ কখনো হ'তে পারে?

বীরেন বলিল,—বড্ড তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেল কি না, তাই তোমাকে জানানো হয় নি। বেশ, আমাকে বিশ্বাস না কর, সুধাকে আমি নিয়ে আস্‌ছি।

বামুন-দিদি চেঁচাইয়া উঠিলেন: ধর্ ধর্ ত' বিশু বেটাকে। কা'কে একটা মেয়েমানুষ কুড়িয়ে নিয়ে এনে দিব্যি জামাই-মেয়ে সেজে মৌরসিপাট্টা করবে, বেটা মতলোব মন্দ করে নি। ধর্ শিগ্‌গির।

অনন্যোপায় হইয়া বীরেন রাস্তায় নামিয়া আসিতেছিল, তেওয়ারি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

হাতটা সজোরে ছিনাইয়া নিয়া বীরেন কহিল,—ওর মুখ দেখে তুমি তোমার বোনঝিকে চিন্‌তে পারবে না?

—চিন্‌তে পারবে না! বামুন-দিদি মুখ-বিকৃতি করিয়া কহিলেন,—সৈরভী মরেছে বোল

সতেরো বছর হ'ল, আমি তখন রামেশ্বরে। তার গুষ্টিগোত্রের মুখ-চোখ আমার মুখস্থ কি না। কোন্ একটা বেউশ্চে ধরে' এনে এখানে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবার মতলোব আমি বার করছি। ঘাড় গুঁজ্ড়ে দেনা বেটাকে গঙ্গার জলে চুবুনি দিয়ে। চলাবার আর জায়গা পায় নি।

বিশু এইবার বীরেনের ঘাড়ের উপরই হাত রাখিল।

তেওয়ারি চক্ষু খুলিয়া কিছুই আর দেখিতে পাইল না, পৃথিবীর আহ্নিক গতি তাহার কাছে দিবালোকের মত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। নাকের উপর প্রকাণ্ড ঘুসি খাইয়া তেওয়ারি টাল সাম্লাইতে রাস্তায় ছিট্কাইয়া পড়িল। বামুন-দিদি একটা পাথর তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; ডাকাত পড়েছে গো, ডাকাত। হারামজাদা জামাই সেজে এসেছে গো—ওরে হরকিষণ, ওরে রামলাল, ওরে গণপতি—

বীরেন দিগ্বিদিক্ চাহিয়া দেখিল না। পা তুলিয়া বুড়ির পেটে এক লাথি মারিয়া তাহাকে উঠানের উপর উল্টাইয়া ফেলিল। মর্ বুড়ি; বুড়ি মরে' রইল হে বিশে, তোমার জ্ঞান হ'লে গঙ্গায় ওটাকে ভাসিয়ে দিয়ো।

বীরেন চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া আবার ফিরিল। রাস্তায় একেবারে লোক নাই বলিলেই চলে। ধারে-কাছে অলি-গলির অন্ত নাই। গা-ঢাকা দিতে বেগ পাইতে হইবে না। বীরেন মরিয়া হইয়া উঠিল।

কাল ভোর হইলেই অর্থাভাবের জন্ত সুধার কাছে যদি অপমানসূচক ব্যঙ্গোক্তি শুনিতে হয়, তাহা তাহার সহিবে না। কিছু একটা আব্দার করিয়া চাহিলে বীরেনকে ঘাড় চুল্কাইতে হইবে। না, পরেশের কাছে সে হাত পাতিবে কোন্ লজ্জায়? তাহার এইটুকু নির্ভীক পুরুষকার না থাকিলে সে তাহার নাম বদ্লাইয়া রমণীরঞ্জন রাখুক। সে জানে সুধা তাহাকে কখনই এত ভালবাসে না যে, তাহার জন্ত দময়ন্তী সাজিয়া বসনাঞ্চল ভাগ করিয়া নিবে। প্রেয়সীর জন্ত দেশজয় যদি করা যায়, তবে তার হৃদয়জয়ের জন্ত সামান্ত ডাকাতি করা যাইবে না তাহাতে যুক্তি কোথায়? অন্যায় হয় ত' সে করিবে, কিন্তু এই অর্থসঞ্চয়ে বামুন-দিদি তাহার চেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণা ছিলেন না হয় ত'। কিছু টাকা হইলে বীরেন যদি সুধার আরো সমীপবর্ত্তী হইতে পারে, তাহা হইলে মাসি হইয়া বামুন-দিদিরই ত' বরং কিছু ঠুট্‌রা খুন্সুড়ির সহিত মোটা রকম একটা যৌতুক দিয়া ফেলা উচিত ছিল। ভূপতিতা বামুন-দিদির দিকে চাহিয়া বীরেন একটু হাসিল।

তেওয়ারি উঠিয়া বসিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে-ছিল, বীরেনকে দেখিয়াই আবার রুখিয়া আসিল। বীরেন তাহাকে তর্জ্জনী তুলিয়া সাবধান করিল। তেওয়ারি দুই পা পিছাইয়া গেল।

বাঁ হাত দিয়া তেওয়ারির একটা হাত ধরিয়া বীরেন কহিল,—আয় আমার সঙ্গে ভেতরে। বুড়ি কোথায় তার টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখে দেখিয়ে দে শিগ্‌গির—

তেওয়ারিকে লইয়া বীরেন বাড়ির মধ্যে চলিয়া আসিল। উঠানের উপর মূর্চ্ছিত বামুন-দিদি যে গোঙাইতেছে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ পর্য্যন্ত করিল না। একটা প্রায়ান্ধকার কুঠুরির মধ্যে আসিতেই তেওয়ারি কহিল,—বেটি কি কম জমিয়েছে মশাই, হাঁড়ি-হাঁড়ি, এই প্যাঁটরার মধ্যে কোম্পানির কাগজ, এটার মধ্যে গয়না-গাটি। কিন্তু কিছু নগদ টাকা-কড়ি হ'লেই ত' আপনার ভাল হয়, না?

বীরেন কহিল,—বিশু বেশ রসিক আছ দেখ্‌ছি। এ-সব বিষয়ে তোমার হাত বোধ হয় আরো পাকা। মাসির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে'ও যখন পেলাম না কিছু, তখন কিছু লুট না করে' যাই কি করে'? কি বল?

অন্ধকারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে বীরেন বলিল, আমি অকৃতজ্ঞ নই, বিশ্বনাথ। তোমাকে নিশ্চয়ই আমি ভাগ দেব। চল,—কোথায় নগদ টাকা-কড়ির বাক্স।

—সত্যি? বিশ্বনাথ লাফাইয়া উঠিল: তা' হ'লে এখানে একটু দাঁড়ান, বাক্সটা আমি নিয়ে আস্ছি।

বলিতে বলিতেই বিশ্বনাথ কি-একটা দরজা খুলিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। বিশ্বনাথও অকৃতজ্ঞ নয়। সে আর ফিরিয়া দেখিল না, বামুন-দিদিকে জাগাইয়া দিয়া সোজা ছুট্ দিল। একেবারে থানায় আসিয়া হাজির।

কেন যে বিশ্বনাথ তাহাকে সঙ্গে না নিয়া হঠাৎ নিজেই বাক্স আনিবার শ্রম স্বীকার করিতে গেল, আনাড়ি বীরেন প্রথমটা বুঝিল না। বুঝিল, যখন দেখিল বিশ্বনাথ আর শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছে না। বীরেন ঘাড়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে সেই অন্ধকার গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু একটি নিশ্বাস মাত্র।

সাম্নেই ফটকের সাম্নে বামুন দিদি চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বেশ একটা ভিড় জমাইয়াছে। লাঠি হাতে ঐ দুইটা গুণ্ডাই হয় ত' গণপতি আর রামলাল। বীরেনের মুখ শুকাইয়া গেল। এ ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার আর সুধার হৃদয়ে প্রবেশ করা হইয়া উঠিল না বুঝি। কিন্তু কিছু ত' একটা করিতে হইবে! কি করা যায়! .

বীরেনকে কাঠের মূর্ত্তির মত অদূরে খাড়া দেখিতে পাইয়া সৈন্য পুরোভাগে সেনাপতির মত বামুন-দিদি চেঁচাইয়া উঠিলেন: ঐ যে বেটা ডাকাত। ধর্ বেটাকে, মার্ গণপতি ওর মাথায় লাঠি। ঘিলু বার' দে। থেঁৎলে দে হাত-পা। চ্যাং-দোলা করে' গঙ্গায় ডুবিয়ে মার্ শালাকে।

জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া ঢেউয়ের আকারে বীরেনের উপর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সহসা তাহার পাংশু মুখে স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালেখার মত একটি শীর্ণ হাসি উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া সবাই একটু চমকিত হইল! বীরেন হাসিয়া কহিল,—জামাইকে কোন শাস্ত্রেই শাশুড়ি শালা বলে নি, মাসিমা। এ জন্মের পুণ্যফলে আস্চে-জন্মে যদি তুমি কাছা পরে জন্মাতে পার, তবে আমার বড় দিদির সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার বিয়ে দেব। কিন্তু এত সব লোক ডেকেছ কেন?

—লোক ডেকেছি কেন? শুয়োরের বেটা শুয়োর, আমার বাড়ি ঢুকেছিস্ ডাকাতি কর্‌তে,—সব আমার কেড়ে-কুড়ে নিলে রে; তোরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখ্ছিস্ রামলাল, মার্ না লাঠি, হারামজাদার মাথাটা চৌচির করে' দে, গল্‌গল্ করে' রক্ত বেরুক্—

লাঠিগুলি নাচিয়া উঠিল।

বীরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রামলাল গণপতি প্রভৃতি যেখানটায় ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারই কাছে আসিয়া সে কহিল,—ডাকাতি কর্‌তে এসেছি শ্বশুর-বাড়ী? কেন, নতুন বিয়ে করেছি, মাসিমাই ত' কত টাকা-কাপড় দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। কষ্ট করে' ডাকাতি কর্‌তে যাব কেন? আমি জামাই কি না, এই মাসিমা সন্দেহ কর্‌ছেন। বেশ, আমার সঙ্গে চল, বৌকে নিয়ে আসি; শ্বশুরকেও কল্‌কাতায় টেলি করে' দি। তাঁরা সবাই আসুন। তা' হ'লে ত' আর লুকোছাপার কিছু থাক্‌বে না। তখন লেঠেল ভাড়া করে' জামাইকে ঠ্যাঙানোর লজ্জায় মুখ দেখাবে কি করে', মাসিমা?

লোকগুলি কিছু প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু বামুন-দিদি আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন: তবে তুই আমাকে তখন পেটে লাথি মারলি কেন গুখোর বেটা?

—তোমাকে লাথি! ছি! কী যে বল' মাসিমা। তুমি আমার গুরুজন না? মা মারা যাবার পর তোমাকেই ত' মনে-মনে পুজো করে'

আস্‌ছি। ও কথা মুখেও এনো না! ছি ছি! বলিয়া বীরেন নীচু হইয়া বুড়ির পায়ের ধুলা কপালে, বুকে ও জিভে ঠেকাইল।

কথা বলিতে বলিতে বীরেন ক্রমশঃ ফটকের দিকে আগাইয়া আসিতেছে: নতুন বিয়ে হ'ল, ভাব্‌লাম বিদেশে এসেছি, মাসিমার খোঁজ নিগে। ও বাবা, এখানে এসে যে এমন কাণ্ড-কারখানা বেধে যাবে এ স্বয়ং মুণি-ঋষিরাও ভাব্‌তে পারতেন না। তোমার বোন্‌ঝি শুন্‌লে আত্মহত্যা কর্‌বে মাসিমা, ভাই শুন্‌লে কপাল কুট্‌বেন। জামাইকে কৈ পঞ্চ ব্যান্নন রেঁধে খাওয়াবে, না তার ওপর লাঠিবাজি!

বলিতে বলিতে সিঁড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, একজন থপ্‌ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল,—দেখি পকেটে তোমার কি আছে?

বামুন দিদি চেঁচাইয়া উঠিলেন:—ওগো, আমার তাগা-বাজু, বিছে-চিকু—সব নিয়ে চল্‌লো গো—

বুড়ির কান্নায় আরো অনেকে বীরেনকে চাপিয়া ধরিল।

বীরেন পরুষস্বরে কহিল,—দেখাচ্ছি। সরে' দাঁড়াও। কিন্তু পকেটে ঐ শুকনি-বুড়ির গয়না-পত্র যদি কিছু না থাকে, তবে মজাটা টের পাওয়াবো।

এক মুহূর্ত্তের জন্য রামলাল ও গণপতির লাঠি সংজ্ঞা হারাইল। এবং সেই ক্ষীণতম দোদুল্যমান মুহূর্ত্তটিতে বীরেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের দিকে ছুট্‌ দিল।

বীরেন ছুটিতেছে—

এইবার সকলের হুঁস হইল। চীৎকার করিতে করিতে বামুন-দিদিও পিছু নিলেন।

ঘাটের সমস্ত জনতা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ওদিক হইতে বিশুও এক পাল পুলিশ লইয়া আসিয়াছে। বীরেনের আর পথ নাই। সে এমন অন্যায় কাজ করে নাই যে গঙ্গায় ডুবিবে। সে স্বচ্ছন্দে ধরা দিল।

দারোগা বলিল,—আপনার স্ত্রী কোথায় আছেন?

— ত্রিপুরা-ভৈরবীর একটা বাঙালি মেসএ।

—তাঁর জবানবন্দি চাই।

—সেখানে যাবেন? চলুন্‌।

ত্রিপুরা ভৈরবীতে পৌছিতে প্রায় বারোটা।

সদর-দরজা শেষকালে ভাঙিয়া খুলিত হইল। বাড়িটা যেন অন্ধকারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে। বীরেনের নির্দ্দেশমত সবাই উপরে উঠিয়া আসিল।

উহাদের ঘরটা খোলা পড়িয়া আছে, জিনিস-পত্র ছত্রখান্‌। সুধা নাই। কেহ কোনো খবর দিতে পারিল না। ম্যানেজার অদৃশ্য।

বীরেনের আর মুখ রহিল না। সে এমন একটা নিদারুণ মিথ্যা কথা বানাইল কি করিয়া? ক্রমশঃ

তর। সেদিনকার জয়দৃপ্ত কটাক্ষের তলে উহার ব্যথিত মুখের কল্পনায় যে অজস্র সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ মনে হয়,—তাহাতে যেন আমারই মনের ক্ষুব্ধ বেদনার সান্ত্বনা প্রত্যাশা অতি সঙ্গোপনে লুকাইয়া ছিল।

দোকানে বসিলাম—পরিচয় পাইলাম। ছোট্ট এতটুকু অপরিসর পথ বহিয়া,—কতকষ্ট অর্দ্ধাহার অনাহার সহিয়া ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তবে সে আজ এই ভাগ্যলক্ষ্মীর সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। তাহারও পশ্চাতে সংসার ছিল,—কিন্তু একমুষ্টি চানা বা আটহাতি একখানি কাপড় তাঁহারাই যোগাড় করিয়া লইয়াছেন। দুঃখ-কষ্টের পাষাণ ভার চাপাইয়া তাহার পরিজনেরা নিজেদের সঙ্গে নবীন যাত্রীকেও পিষিয়া মারে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—অনেকটা পাটের চাষের মত। ফসল বেশী, চাহিদা কম। উপার্জ্জনেরও ওই একটি মাত্র পন্থা ভিন্ন আমাদের জানা নাই।

পরীক্ষান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপা সনন্দ লইয়া অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া যদি ত্রিশ টাকা বেতনের একখানি সুখাসন মিলে ত—মার দিয়া কেল্লা! বিনা মূলধনে এতবড় লাভের ব্যবসা যে আর নাই!—

'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—তদর্দ্ধে' কিন্তু থাক ও সব কথা। বাণিজ্য করিবার মত কষ্ট-সহিষ্ণুতা আমরা এখনও অর্জ্জন করি নাই। লাভের আশায় ও পথটাকে যেমন মনোরম বলিয়া ভাবি, লোকসানের কণ্টকে বিঘ্নবহুল বলিয়া ভাবিবার প্রবৃত্তি মোটেই নাই। তারপর মূলধন,—সর্ব্বোপরি সততা। পশ্চাতের সংসার শিলাখণ্ড—এই সকল সহিষ্ণুতা সততা সঞ্চয়কে প্রতিনিয়ত স্রোতের প্রতিকূলে নিম্নমুখী করিতেছে।

আর কৃষি কর্ষণ? ছ্যা! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া লাঙ্গল ধরিব ওই সব জলকাদাভরা বিশ্রী মাঠে গিয়া!

চাকুরীই ভাল। এই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে আমাদের সমতুল্য কেহ নাই।

ভগবৎ সিংয়ের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মনে হইল, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্র যেন জীবন ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ কয়েক দণ্ডের মধ্যে চুকাইয়া ফেলার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর নাই।

ছয়

একদিন আলিগড় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ভগবৎ সিং তাহার মোটরে আমাদের কাশীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কিছুই দেখাইতে বাকি রাখে নাই। প্রতিযোগিতার কথা উহারও মনে মনে আঁকা ছিল। তাই আমাদের পরীক্ষা দিনের সমবেদনা দ্বিগুণ হইয়া উহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অবশেষে স্থির হইল—আলিগড়ে যাইতে হইবে। দেখা যাউক, এই বিরাট্ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে রহমান্ বিন্দু কোথায়—?

সাদরে অভ্যর্থিত হইলাম।

রহমান্ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্র। পিতার তার বৃহৎ তালার কারখানা। সেখানে অনেক মিস্ত্রী মজুর খাটে। দিনান্তে রহমন একবার মাত্র কারখানায় যায়।—কোনদিন বা যায় না। হাতে কাজও কিছু নাই। শীকার করিয়া গান-বাজনার আসর বসাইয়া এবং আরও অনেক খেয়াল লইয়া তাহার দিনগুলি কাটে।

সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহার ঐশ্বর্য্যসম্ভার দেখাইল। কতবার জয়তৃপ্ত কটাক্ষে আমাদের পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। প্রতিযোগিতার কথা রহমান্ও ভুলিতে পারে নাই। আমাদের সেই দিনের সমবেদনাকে সুদে-আসলে এই সব অনাবশ্যক জাঁক-জমকের মধ্য দিয়া শাণিত করিয়া ফিরাইয়া দিল।

পরীক্ষায় সে জয়ী হইলে তাহার নিকট যাহা পাইতাম, আজ পরাজয়কে ঢাকিতে তাহার দ্বিগুণ করিয়াই সে তাহা ফেরৎ দিল।

ভাগ্যে শ্রীনিবাসমের পদে রহমান্ বসে নাই। সুখী রহমান! কমলার কল্যাণ কর তাহার চারিদিকে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বিলাইতেছে। কিন্তু— প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রহমানের দুঃখ রাখিবার ঠাঁই বুঝি আর নাই।

ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল আবরণে সে অতীতের পরাজয়-কালিমা ঢাকিয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

পরাজিত রহমান্ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে আজ বহু দূরে।

সাত

দু'টি মাস কাটিয়া গেল। ভগ্ন স্বাস্থ্য কোন রকমে তালি-জুলি লাগাইয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিলাম।

অফিসে আসিয়া দেখিলাম,—শ্রীনিবাসমের মুখ প্রসন্ন। সে জানাইল,—উচ্চতর পদমর্য্যাদা লাভ করিয়া শীঘ্রই সে বর্ম্মা যাইতেছে। তাহার গৃহে আমাদের আনন্দ-সম্মিলনের নিমন্ত্রণ।

শ্রীনিবাসমের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার হইতেছে। বর্ম্মা বুঝি অর্গলাবদ্ধ বিশ্বেরই ঈষদুন্মুক্ত দ্বার। দ্বারপথে যশের প্রভাতরশ্মি কয়েকটি উজ্জ্বল রেখা পাঠাইয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিতেছে। বরদায়িনী কমলার আ র্ব্বাদ।

কাশীর দোকানে বসিয়া ভগবৎ সিং ও এই রশ্মিরেখার সন্ধান পাইয়াছে। বিশ্বের বিপুল কলকোলাহল তাহারও অঙ্গনে বিরাট্ জীবনের বেগধারা বহন করিয়া ফিরিতেছে। সার্থক ভগবৎ সিং!

রহমান? বিশ্ব তাহাকে চারিদিকে ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া কোলে টানিতে সমুৎসুক। তাহার যাহা আছে,—বিশ্ব-দ্বারে তাহার মূল্য আছে এবং সেই মূল্যে জীবনের মূল্যও বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া চলে। কিন্তু বেচারী রহমান সেই মূল্যের তীব্রচ্ছটায় দু'টি নয়ন বন্ধ করিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়াছে। বেচারী রহমান!

আর আমি শ্রীমান্ সত্যব্রত সেন ভ্রমণ প্রতিযোগিতার প্রথম ভাগ্যবান—পরীক্ষা সাগরের মুক্তামণি—আমার স্থান কোথায়? . .

বিপুল পৃথিবীতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। সেই পথরেখা বহিয়া চলিতেছে অসংখ্য জাতির অসংখ্য মানব।

কিন্তু আমরা ওই চলমান্ পথিকদের গতি লক্ষ্য করিতে গ্যালারীর টিকিট কিনিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি।

কবে যে গ্যালারী হইতে নামিয়া পথের পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইব এবং কোন্ সে শুভ মুহূর্ত্তে ওই সব পথিকদের পদরেখায় পদরেখা মিলাইয়া চলিতে আরম্ভ করিব—তাহা জানেন রহস্যময়ী প্রকৃতির রহস্যময় স্রষ্টা যিনি—তিনি!

মণিমোহনও বসিয়া আছে—আমার পাশে দর্শকদের আসনে। আরও আছে—অসংখ্য পথহারা!

চলার পথে

শ্রীহাসিরাশি দেবী

শ্রাবণ সন্ধ্যা।

সকাল হইতে সেই যে বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিয়াছিল,তাহার যেন আর বিরাম বিশ্রাম ছিল না।

ছোট দোকান ঘরটীর দুয়ার খুলিয়া করবী অন্যমনস্কভাবে মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল; এখনই আবার খুব জোরে বৃষ্টি আসিবে, বাতাস তাহা জানাইয়া দিতেছে। বাহিরের চেয়ে ঘরের ভিতর যেন আরও অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে, আলো জ্বালিলেই হয়,—কিন্তু উঠি উঠি করিয়াও যেন আর উঠিতে ইচ্ছা করিতে ছিল না,—যেন কিসের একটা গভীর শ্রান্তিতে হাত পা-পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

বৃষ্টি আসিল।

পথের ধারের একটী গাছতলায় এই পাণের দোকানটি; আরও দুই একটা দোকান এ-পথে আছে বটে, কিন্তু কাছাকাছি নহে, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত ছাড়াছাড়ি; তবে বাজার আধ মাইলের মধ্যে সেখানে জিনিষের অভাব নাই। বাতাসের শব্দের সহিত টিনের ছাদে জল পড়িবার অবিরত টপ্ টপ্ শব্দে ও জলের ছাটে বিরক্ত হইয়া করবী উঠিয়া দাঁড়াইল—ইচ্ছা—দ্বার রুদ্ধ করিয়া আলো জ্বালিবে, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিতে গিয়াই সে যাহাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল,—তাহার বয়স কুড়ি হইতে বাইশের মধ্যে; কৃশকায়, মুখের মধ্যে উজ্জ্বল চোখ দুইটাই সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে, মাথার চুল অসংযত।

বেশের মধ্যেও তেমন কিছুই নাই, গায়ের টুইলের সার্ট পরণের কাপড়খানাও খুব পরিষ্কার নয়; পদদ্বয় পাদুকাহীন।

আশ্রয়ের আশায় দমকা হাওয়ার মত সেও দোকানঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল; করবীর মুখের দিকে ক্ষণকাল নির্ব্বাকে চাহিয়া থাকিয়া সে পুনরায় পথে নামিয়া পড়িতে উদ্যত হইতেই কুণ্ঠিত স্বরে করবী বাধা দিল। "বসুন না বাবু—"

পথিককে আদর-আপ্যায়ন করিয়া বসাইবার অভ্যাস তাহার আছে, কারণ সে যে মায়ের মেয়ে—সেও তাহার সমস্ত জীবনটাই এই আদর-আপ্যায়ন এবং সময়ে সময়ে তাহারই প্রত্যুত্তরে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ এবং অবহেলা সহ্য করিয়াও আজ জীবনের অপর প্রান্তে পৌঁছাইয়া তাহারই দর্শিত পথে কন্যাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে; তাই আজ ঐ পথিকটীর চেয়ে বয়সে ছোট হইলেও করবী তাহার জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ছিল, তাহার সিকিও যে ও পারে নাই, তাহা তাহার এই দুর্য্যোগের আশ্রয় ত্যাগের ইচ্ছা দেখিয়াই করবী বুঝিয়াছিল, এবং তাহার আহ্বানে বাধা পাইয়া লোকটী ফিরিয়া দাঁড়াইতেই পুরাতন বেতের মোড়াটা তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া করবী শুধু কহিল—"বসুন।"

তাহার পরে আলো জ্বালিয়া ফেলিল।

পথে আজ লোক চলাচল ছিল না, গাড়ীও না, শুধু বৃষ্টি ও বাতাসের মাতামাতির সঙ্গে মেঘের গুরু গর্জ্জন ক্ষণে ক্ষণে বুক পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছিল। মোড়ার উপরে যে স্থানে ছেলেটী বসিয়াছিল, তাঁহারই হাতকয়েক দূরে দাঁড়াইয়া করবী চাহিয়া দেখিল, বৃষ্টির জলে

লোকটির জামা-কাপড়ের কিছু অংশ ভিজিলেও যে অংশটা শুষ্ক ছিল, খোলা দরজা দিয়া ঝাট্ আসিয়া তাহাও ভিজাইয়া দিতেছে, অথচ লোকটা নির্ব্বিকার। বৃষ্টির ঝাট্ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার এতটুকু চেষ্টাও তাহার নাই,—নিশ্চলভাবে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে।

তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিতে করবী দেখিল, তরল অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া এইটুকু সময়ের মধ্যেই বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। সেই অন্ধকার সরাইয়া তাহারই ঘরের আলো পথের উপরে যেটুকু স্থানে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে শুধু দেখা যায় বৃষ্টির জলস্রোত; আর কিছু নয়।

করবী কহিল—"দরজাটা কি বন্ধ ক'রে দেব বাবু?—জলের ঝাট্ আস্‌ছে।"

'বাবু' যেন চমকিয়া চাহিল; তাহার পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—"না, বৃষ্টি একটু ধর্‌লেই চ'লে যাব।"

ঘরটা লম্বায় এবং চওড়ায় হয়তো হাত দশ-বারো হইবে; ইহারই সম্মুখ দিকে কতকগুলি ঝুড়িতে আস্তপাণ, এবং কাঠের বারকোষে সাজা পাণ স্তূপাকার করা; পার্শ্বে কতকগুলি কাঠের ও টিনের বাক্সে বিড়ি-দেয়াশালাই ভর্ত্তি; দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি টাঙান—কালী, দুর্গা এই সবের। সিগারেট এবং দেয়াশালাই বাক্সের উপরের ছবিও আছে।

এক পার্শ্বে মাটির প্রদীপটী জ্বলিয়া যে মলিন অলোক বিতরণ করিতেছিল, তাহারই খানিকটা করবীর হাতের রেশমী চুড়ী ও সোণা বাঁধান শাঁখার উপরে পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতেছিল।

গহনা বলিতে হাতের ঐ শাঁখা, কাণের পাশী মাকড়ী এবং নাকছাবিটী ছাড়া তাহার আর কিছু ছিল না; দেহে অতি সাধারণ কাপড় শাড়ী সেমিজ ছাড়া অন্য কিছুই নাই, অথচ তাহাতে তাহাকে মানায়ও বেশ। বয়সোচিত মুখের কোমলতা আজ সঙ্কোচের সহিত লজ্জার মিশ্রণে যেন অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বাবুর উত্তর শুনিয়া করবী আড়ষ্টের মত শুধু দাঁড়াইয়া রহিল; ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিতেও পারিল না, এবং অন্য খরিদ্দারের মত তাহাকে পাণ-বিঁড়ি খাইবার অনুরোধ করিতেও সাহসে কুলাইল না; ঐ মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর ও অচঞ্চলতা তাহার মনে যেন তাহার জন্মগত চঞ্চলতা এবং সাহসের বিরুদ্ধে আজ নূতন করিয়া কুণ্ঠা-লজ্জার প্রাচীর গড়িয়া তুলিল, যে প্রাচীর ভাঙ্গিবার মত সাহস এবং শক্তির অভাব জীবনে এই প্রথম বুঝিয়া সে নির্ব্বাকে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল, একটা কথাও বলিবার মত সাহস তাহার হইল না। কতক্ষণ যে এমনি নীরবতার ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার জ্ঞান ছিল না; যখন চমকিয়া চাহিল, তখন দেখিল, তাহার 'ক্ষণিকের অতিথি' উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিতেছে—"বৃষ্টি ধ'রে এসেছে।"

করবী শুনিল, সত্যই বাহিরে বৃষ্টিপাতের শব্দ কমিয়া আসিয়াছে, শুধু মাঝে মাঝে বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছটার শাখা-প্রশাখাসহ পাতা নড়িবার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

সে কহিল—"আমি তবে চললুম;—কিন্তু দরজাটা…"

সমস্ত সাহস যেন একত্র করিয়া করবী জোর দিয়া বলিয়া ফেলিল—"একটা পাণও খাবেন না, বাবু?"

একটু হাসির সহিত জবাব আসিল—"না, পাণ আমি খাই নে;—ভাব্‌ছি, ভাগ্যে তোমার দোকানের দরজাটা খোলা ছিল, তাই বৃষ্টি থেকে খুব বেঁচেছি।"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে সে পকেট হাতড়াইয়া কি-একটা চকচকে জিনিষ বাহির

করিয়া মোড়ার উপরে রাখিয়া দিল; পরে কহিল —"আনাকয়েক পয়সা রইল, নিও।"

ধীরে ধীরে সে পথের উপরে নামিয়া পড়িতেই পশ্চাৎ হইতে কাতরস্বরে ডাক আসিল— "বাবু—"

মুখ ফিরাইয়া সে উত্তর দিল—"কেন ?"

পূর্ব্ববৎ স্বরে করবী কহিল—"দোকানের প্রতিদিনকার আয়-ব্যয়ের হিসাব আমার মাকে দিতে হয় কি না ;—তাই আপনার নামটা—"

"আমি তো কিছু কিনি নি।"

"কিন্তু পয়সা দিয়েছেন যে—"

"বলো, আমার নাম অজয়।"

উত্তর দিয়া সে দ্রুতপদে পথ চলিতে আরম্ভ করিল এবং ক্ষণপরে পথের বাঁক ঘুরিয়া অদৃশ্য হইতেই করবী সেইদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইল।

দুই

ছোট দোকানটী, ইহার আয়ে মা-মেয়ের চলে না; তবু ইহারই লাভের আশায় দোকান চালাইতে হয়। পরিশ্রমও করিতে হয় মন্দ নয়, কিন্তু বিশেষ কিছু লাভ হয় না।

মায়ের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, এবং মেয়ের বয়স সতের হইতে উনিশের কোঠার মধ্যে; কিন্তু দুইজনই সমস্তদিন খাটে। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত মেয়ের দোকানের কাজ, মায়ের কাজও কম নয়। সমস্তদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর মা-মেয়ে যখন ঘরে ফেরে,—তখন শুধু দেহ নহে, মনও যেন গভীর শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে। দোকানের কিছু দূরে মাটির দেওয়ালে ঘেরা মা ও মেয়ের খোলার ঘর। সম্মুখের ছোট অঙ্গনটীর পরেই সেই সরকারী পথ,—যে পথ ঘুরিয়া-বাঁকিয়া ষ্টেশন হইতে সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

কত পথিক এই পথ দিয়া নিত্য আসে, নিত্য যায়; কেই বা তাহার খোঁজ রাখে! মা সহরের কোন এক বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে—এবং মেয়ে সমস্ত দিন দোকানের কেনা-বেচার পরে যখন রাত্রে বাড়ী ফেরে, তখন দেখে, মা মনিব বাড়ী হইতে একজনের মত ভাত আনিয়া আর একজনের মতো হয়তো চড়াইয়াছে; নয়তো আনা ভাত-তরকারী মেয়ের জন্য রাখিয়া নিজে কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িয়াছে।

মেয়ে আসিয়া বকে—ভাত রাঁধিতে রাঁধিতে বলে—"এই বুড়োশরীরে রাত উপোসী থেকে কোনদিন মরে থাকবে।"

সব সম্বন্ধ ছিন্ন হইতে পারে—কিন্তু নাড়ীর সম্বন্ধ নাকি অচ্ছেদ্য, তাই মায়াও ছাড়া যায় না।

এমনি করিয়াই ছোট সংসারটী চলিত; কিন্তু একদিন হঠাৎ মেয়ের মত বদলাইয়া গেল, কহিল—"আর আমি পাণ-বিড়ি বেচবো না মা, —বরং ঝি খাট্‌বো।"

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের স্বভাব খেঁকা মত হইয়াছে, চটিয়া উত্তর দিল—"আ মর্, দিন্ দিন্ বুদ্ধি খুলছে, নয়! এতদিন যদিও বা মুখে হাত উঠছিল, এবার আর ভাত জুটবে না,—তখন কি করবি শুনি ?"

করবী চুপ করিয়া গেল, মায়ের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর করিল না; শুধু নির্ব্বাকে জ্বলন্ত উনান-টার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে যে মেয়ের সমস্ত কাজের মধ্যেই কেমন একটা অবসাদ ধীরে ধীরে জড়াইয়া উঠিতেছিল, তাহা মায়ের দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সে কোনও দিন মেয়েকে একটা প্রশ্নও করিতে পারে নাই। আপনার গত জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার ইতিহাস এক এক করিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে সে নিজেই শিহরিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আর পথ কই ? জীবনটাকে ঐ একটানা পথ হইতে সরাইয়া লইবারও আর তো কোনও উপায় নাই,—গতানুগতিকভাবে চলিতেই হইবে যে! মেয়ের ঐ অবসাদের ভার যে গোপনে মাকেও উত্যক্ত

করিয়া তুলিতেছিল, তাহা করবী জানিত না, তাই যেদিন মায়ের তিরস্কারটা বড় তীক্ষ্ণভাবে আসিয়া বক্ষে বিঁধিল—'দিন দিন 'সন্নেসিনী' হ'লে পেট চলবে না।' সেদিন সে চমকিয়া উঠিলেও—দুইহাতে আহত বুকখানাকে চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—সম্মুখের অসীম জীবন-পথের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে বৃক্ষছায়াও নাই, আছে রৌদ্রের উষ্ণতা। মাস কয়েক পূর্ব্বের একটা বাদল-রাত্রের কথা সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল, যেদিন দুর্য্যোগে অজয় আসিয়া তাহার দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল! তাহার পরে আজ কতদিন গিয়াছে, অনেকদিন নয়!

অজয় আর আসে নাই, কিন্তু করবী তাহাকে ঐ পথে প্রায়ই যাতায়াত করিতে দেখে। অজয়ের হাতে থাকে কতকগুলা বই;—হয়তো লেখাপড়া করে, তাড়াতাড়ি সে যায় আসে, কোনও দিকে ফিরিয়া চাহে না, হয়তো প্রয়োজনও বোধ করে না।

সেদিনও অজয় সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ পথিপার্শ্বস্থ দোকান হইতে ব্যঙ্গহাস্যের খিল্‌খিল্ শব্দ কাণে আসিতেই চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহারই দিকে চাহিয়া যে দুইটি নরনারী হাসিতেছে, তাহাদের একজন তাহার অপরিচিত হইলেও অপরা তাহার পরিচিতা,—সে করবী।

আজ যে তাহার সাজ-পোষাকের বেশ একটু ঘটা আছে, তাহা তাহার সাক্ষী শুধু কপালের কাঁচপোকার টিপই দিতেছে না, কাপড়-ব্লাউসও দিতেছে। মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে ডাক আসিল—"বাবু।"

অনুমানে অজয় বুঝিল, এ কণ্ঠস্বর করবীর নহে; ফিরিয়া উত্তর দিল—"কেন?"

পুরুষটী নামিয়া আসিয়াছিল; তাহার পরিধানে পরিষ্কার মিহিধুতি গায়ে আদ্দির চুড়িদার এবং পায়ে লপেটা।

মুখের সিগারটা বাম হাতে নামাইয়া সে ইঙ্গিতে অদূরোপবিষ্টা করবীকে দেখাইয়া সবিনয়ে কহিল—"আপনি যে একদিন দয়া ক'রে আমাদের দোকানে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন, তা' ওর কাছে শুনেছি; আর প্রায়ই যে এ পথে যাতায়াত করেন, তাও দেখেছি। কিন্তু আর তো কোনওদিন পায়ের ধূলো দিলেন না। তাই এই গিয়ে···এই গিয়ে···"

এসেন্সের গন্ধেও যে লোকটীর মুখ ও সর্ব্বাঙ্গের উগ্রমাদকের গন্ধ ঢাকিতে পারিতেছিল না, তাহা অজয় বুঝিয়াছিল; তাই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লোকটির কথায় মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সুগৌর মুখখানা আরক্ত হইয়াই স্বাভাবিক হইয়া গেল। তীব্র দৃষ্টিতে একবার করবীর দিকে চাহিয়া সে দৃষ্টি ফিরাইল; তাহার পরে শান্তস্বরে জবাব দিল—"পায়ের ধূলো দেবার দরকার আমার নেই,—থাক্‌লে দিতাম।"

আর কোনও উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে দ্রুতপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল।

লোকটা ফিরিয়া আসিয়া যখন কি-একটা রসিকতা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তখন করবী নতমুখে পাণের ঝুড়ি ও বিড়ির বাক্সের পার্শ্বে কি যেন খুঁজিতেছিল,—উত্তর দিল না, মুখও তুলিল না। কহিল—"তাইতো ইয়েটা যে হাত থেকে কোথায় ছিট্‌কে পড়্‌লো··· কিছুতেই আর খুঁজে পাচ্ছি নে।"

তিন

অজয় ধনীর দুলাল নয়, বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। অবস্থাও মন্দ রকমের। তাই, আপনার উৎসাহ এবং মায়ের ইচ্ছায় দশজনের মধ্যে একজন হইবার আশায় যে খরচে লেখাপড়া শিখিতেছিল,—তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ

হইত মায়ের গহনা বিক্রয় ও তাহার জলপানির টাকা হইতে। মায়ের ইচ্ছা, পুত্র হইতে বংশের নামোজ্জ্বল হইবে, এবং পুত্রের ইচ্ছা, মাকে কিসে সুখী করিবে।

এমনি করিয়া যখন মাতাপুত্রের দিন কাটিতেছিল, তখন একদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত উপাধিগুলি নামের পশ্চাতে লইয়া পুত্র মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল এবং মায়ের ইচ্ছায় যে মেয়েটি বধূরূপে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সে শুধু রূপের ডালাই সাজাইয়া আনিল না, রৌপ্যমুদ্রাও থলি ভর্ত্তি করিয়া লইয়া আসিল।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অজয় বড় কাজ পাইয়া সস্ত্রীক বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল;—মা আজ বাঁচিয়া নাই,—তাই দিনে দিনে দেশ ও ভিটার মায়াও কমিয়া আসিয়াছে,—বড় জোর বৎসরে একবার বাঙ্গালায় আসে, তাও বাস করিতে নহে, বেড়াইতে—হায় বাঙ্গালার প্রবাসী সন্তান!

বাঙ্গালী সতীশ চৌধুরী সম্প্রতি কার্য্যোপলক্ষে এদেশে আসিয়াছিলেন।—তাহারই মাতৃশ্রাদ্ধে যেদিন আবার বহুদিন পূর্ব্বের মত অজয় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিল, সেদিন তাহার মনের মধ্যে গত জীবনের এমনি অনেকগুলি ছবি পর পর ভাসিয়া উঠিল।

বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালী কীর্ত্তনীয়া আসিয়াছিল এবং নিমন্ত্রিত বাঙ্গালীদের বেশীর ভাগই সেই স্থানে জমা হইয়াছিলেন। অজয় ধীরে ধীরে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেই চৌধুরী একখানা চেয়ার আগাইয়া দিলেন। সহাস্যে কহিলেন—"আপনার আসাতে দেরী দেখে ভাব্‌ছিলুম যে…"

অজয় অন্যমনস্কভাবে কি-একটা উত্তর দিয়া বসিয়া পড়িল; তখন তাহার কাণে আসিতেছিল—

"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব,
আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।'

ও মুখ যেন চেনা,—কণ্ঠস্বর অপরিচিত নয়!

বহু বৎসর পূর্ব্বের একটী সন্ধ্যা এবং তাহার পর আর একটী দিনের কথা অজয়ের মনে পড়িয়া গেল—সেই পথ…সেই দুর্য্যোগ-সন্ধ্যায় আশ্রয়-গ্রহণ! কিন্তু না,—মানুষের মত মানুষ হওয়াও তো বিচিত্র নয়; হয়তো তাহার ধারণা ভুল।

কীর্ত্তনীয়া তখন তাহার দিকে চাহিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছিল—

"না পোড়োয়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়ে রেখ' তমালেরই ডালে।
যেন পুড়ায়ো না;—
একে মন অনলে পুড়ি—
আর আমারে পোড়ায়ো না—
যেন ভাসায়ো না;—
একে নয়ন জলে ভাসি -
আর আমারে ভাসায়ো না…"

মনের মধ্যে এমনি একটা সন্দেহ বহিয়া আহার দির পরে অজয় যখন গেট পার হইয়া যাইতেছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাক্ আসিল—"বাবু!'

রাত্রি গভীর হওয়ায় এবং নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশ বিদায়-গ্রহণ করায় এদিকটা প্রায় নির্জ্জন হইয়া পড়িয়াছিল। কীর্ত্তনও বহুক্ষণ পূর্ব্বে থামিয়া গিয়াছিল।

মুখ ফিরাইয়া অজয় দেখিল, একটী লোক, সম্ভব তাহাকেই ডাকিতেছে। কহিল—"কি চাও?"

অদূরস্থ একখানি আলোকজ্জ্বল কক্ষ দেখাইয়া লোকটী কহিল—"আপনাকে দিদিমণি একবার ডাকছেন।"

"দিদিমণি ডাকছেন? আমাকে?…

অজয় বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতে লোকটি কহিল—

"হ্যাঁ, যিনি গান গাইতে ক'লকাতা থেকে এসেছেন, তিনিই।"

অজয়ের বিস্ময় কাটিল না; কি কর্ত্তব্য তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতের মত দাড়াইয়া রহিল; তাহার পরে বিরক্তি-মিশ্রিত-স্বরে কহিল—"বলগে যাও,—আমি যেতে পারব না; আর আমার কাছে তাঁর এমন কোনও দরকারও থাক্‌তে পারে না।

সে উত্তরের আশায় না দাড়াইয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই লোকটি বাধা দিল—"বাবু, একটিবারের জন্য আপনাকে যেতেই হবে..."

বিরক্তি চাপিয়া অজয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিতেই যে নত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল এবার তাহাকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। করবী কহিল—চিনতে পারেন অজয়বাবু?..."

অজয় অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল।—"আগে চিনতে না পারলেও এখন পেরেছি; কিন্তু আমার কাছে তোমার এমন কি দরকার থাকতে পারে—তাতো বুঝতে পারছি না..."

আজ অজয়ের দৃষ্টি করবীর মুখের উপরে। স্থির, সে দৃষ্টির সম্মুখে করবী কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, শুষ্ক স্বরে জবাব দিল—"দরকার?...না, দরকার এমন কিছুই নয়। তবে অনেকদিন পরে বিদেশে পরিচিতদের মধ্যে শুধু আপনাকেই দেখলাম কি না তাই..."

অজয় কোনও উত্তর দিল না, করবীও নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল; কতক্ষণ যে এভাবে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা কাহারও খেয়ালই ছিল না; হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া অজয় যেন একটু বেশী জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা তা' হ'লে চললুম।"

সে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই রুদ্ধস্বরে ডাক আসিল—"একটু দাড়াও—"

করবী যখন আর একবার তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন অজয় যেন ইচ্ছা করিয়াই অন্যদিকে চাহিয়াছিল; করবী উঠিয়া দাঁড়াইতেই দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিল,—আর একবারও পশ্চাতে চাহিল না।

পরদিন সকলেই শুনিল,—কীর্ত্তনীয়া আর দুই দিনের গাহিবার টাকা ফিরাইয়া দিয়া পূর্ব্বদিন ভোরের ট্রেণেই কলিকাতায় রওনা হইয়াছে।

মাসিক সাহিত্যের গল্প সমালোচনা

প্রবাসী—চৈত্র—১৩৩৭

দীপশিখা—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়—গল্পটি তেমন না জমিলেও বিষয়নির্ব্বাচনে নূতনত্ব চোখে পড়িল। একটা কল লইয়া গল্প, আখ্যানভাগটি কারখানার অভ্যন্তর লইয়া নয়, তাই বর্ণনা বাহুল্যের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই গল্পটি উজ্জ্বল হয় নাই। আধুনিক কেরাণী-জীবনের দারিদ্র্য, দাম্পত্য-কলহ, ধর্ম্মঘট ও নিরন্ন কুলিদের আত্মসমর্পণ—সমস্ত ব্যাপারগুলি লেখাই হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে পাঠকের মনে বিশ্বাসসঞ্চার করিবার চেষ্টা নাই। ভাষাও নানা স্থানে জটিল হইয়া পড়িয়াছে। 'দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস আনন্দের তুফানে তরতর করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়', 'কালের অনলে আয়ু হবি উপহার দেয়', ইত্যাদি ভাষাপ্রয়োগ অচল। হঠাৎ মাঝখানে 'ভূমিলক্ষ্মীর পরমায়ু-প্রদীপে নিরন্তর তৈল-প্রদান' লইয়া যে একটি দীর্ঘ অবান্তর আলোচনা আছে, তাহা গল্পের গতিকে বাধা দিয়াছে। অমন একটা বক্তৃতার কিছু দরকার ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবু গল্পের মধ্যে জায়গায়-জায়গায় মুন্সিয়ানা আছে। অহিংসাব্রতধারী কমলের চরিত্রটি মন্দ হয় নাই। যন্ত্র-সভ্যতার কলুষের প্রতি লেখকের জাগরূক দৃষ্টি তাঁহাকে আরো অনেক রচনা উপকরণের সন্ধান দিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

হার জিত—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ও পুনর্মিলন লইয়া একটি সাধারণ অনাড়ম্বর গল্প। গল্পের সৌন্দর্য্য যে আখ্যানভাগে নয়, তার বিন্যাসে ; লিখনচাতুর্য্যে নয়, তার ভঙ্গিতে; গল্পটি পড়িয়া তাহা আরো স্পষ্ট হইল। স্ত্রী স্বামীর উপর রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যাইতেছেন। তাহার আগে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে যথেষ্ট সজীবতা ও নাটকীয় উপাদান আছে। কিন্তু স্বামী যখন স্ত্রীর পৌঁছিবার আগেই শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই হইতেই গল্পের কথা-বার্ত্তায় কৃত্রিমতা ঢুকিয়াছে। এবং এই কৃত্রিমতাটুকু গল্পের রংসাছায়াকে হঠাৎ নষ্ট করিয়া দিল। সমস্ত কৌতূহল ও suspense নিমেষে অন্তর্হিত হইতেই গল্পটি নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল। তবু লেখকের বর্ণনাকৌশলের কৃতিত্বটুকু শেষ পর্য্যন্ত মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখে।

মেঘ ও রৌদ্র—শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্ত—এটি ঠিক গল্প নয়, চরিত্র-চিত্র। এই চিত্রটি খাঁটি সোণার মত উজ্জ্বল। একটা পথচারী কুকুর লইয়া প্রাদেশিক এক ছোট দারোগার বিভিন্ন মনোভাবের একটি হুবহু ছবি। হাত কামড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া কুকুরটাকে বংশী-লোচন কর্ম্মকার অনেক কষ্টে পাকড়াও করিয়াছে। ছোট দারোগা হাফিজুদ্দিন সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত। যেই শুনিতেছেন এ কুকুরটা পুলিশ-সাহেবের, তখনই এর দংশন-বৃত্তান্তটা নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, আবার যেই শুনিতেছেন কুকুরটা বেওয়ারিশ, তখনই মিথ্যাবাদী বংশীলোচনের প্রতি দারোগাবাবুর সে কী আস্ফালন! ছবিটি এই ছোট ঘটনাটুকুকে লইয়াই, কিন্তু লেখকের এমন একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় যাহা সচরাচর চোখে পড়ে না। গল্পটির নীচে ফুটনোট লেখা—লেখক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী।

পুরুষস্য ভাগ্যং—শ্রী অপূর্ব্বমণি দত্ত—একটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোকের রাতা-রাতি বড়লোক হইবার করুণ কাহিনী। গল্পের মধ্যে চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা আছে এবং স্বার্থপর পঞ্চানন সেই হিসাবে স্পষ্ট ও পরিচিত হইয়া উঠি-য়াছে। দুঃখের গল্প বাঙলা দেশে বেশী চলে, সেইটা বাঙলা দেশের মাটির দোষ। কিন্তু যেই দুঃখের অন্তরে বলশালিতা নাই, নির্ভীক তেজস্বিতা নাই, সে দুঃখ সাহিত্যিক সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারে না। সদানন্দের জীবনে এতগুলি ক্ষতি ও দুঃখের বোঝা না চাপাইয়াও লেখক তাহাকে মহনীয় করিতে পারিতেন। ভাগ্যের কাছে

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ | দ্বিতীয় সংখ্যা

—নিশাচর—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

দশ বৎসর আগে বাঙ্গালার দু'টি স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ একটি দাম্পত্য কলহের যে নিদারুণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহার কথাই বলি।

বাড়িটি তেমন ভালো নয়—অত্যন্ত জীর্ণ। সংস্কার অভাবে তাহার চারিধারের দেয়াল নানা জায়গাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁক দিয়া সুদূর নীল পাহাড় আর শালের জঙ্গল যখন চোখে পড়ে, তখন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়।

ছোট খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়িটির সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া কতদিন অমলা দূরের নীল পাহাড়শ্রেণীর দিকে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারে নাই। এমনটি আর সে কখন দেখে নাই। বাঙ্গলার সমতল আগাছাআচ্ছন্ন পল্লীর সে মেয়ে। পৃথিবী যে এত বিশাল এমন সুন্দর এ ধারণাই তাহার ছিল না। কাজ করিতে করিতে দিনে অন্ততঃ একশতবার সে বারান্দায় খানিক-ক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাকে। স্বামীকে অন্ততঃ একশতবার দিনে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সেই এক কথাই বলে,—"ভারী সুন্দর দেশ, না গা ?"

বিভূতিভূষণের অত উৎসাহ নাই। সে শুধু সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া সায় দেয়। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া তারিফ করিবার তাহার সময় নাই। তাহাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয়। এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তাও আধা মাহিনায়। ছুটি ফুরাইলে আরেকটা দরখাস্ত করিতে হইবে ; কিন্তু মনিবেরা আর তাহা গ্রাহ্য করিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অমলা এক মাসে কিই বা এমন সারিবে। দিন কুড়ি হইয়া গেল, তবু নিয়মিত জ্বর ত এখনও আসিতেছে। এখানকার লোকেরা বলে অন্ততঃ তিন মাস না থাকিলে না কি এখানকার জল ভালো করিয়া গায়েই বসে না। কিন্তু তিন মাস ছুটি যদি বা দিলে, এখনকার খরচ কুলাইবে কেমন করিয়া ? সাহস করিয়া ভগবান ভরসা করিয়া সে রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে, কিন্তু সাহসেরও একটা সীমা আছে। চেঞ্জের জায়গা হিসাবে বাড়িটির ভাড়া অত্যন্ত অল্পই বটে, কিন্তু সেই অল্পও যে তাহার কাছে দুর্বহ বোঝা।

অমলা ইতিমধ্যে আর একটা কি মন্তব্য করে, সে শুনিতে পায় না।

হইত মায়ের গহনা বিক্রয় ও তাহার জলপানির টাকা হইতে। মায়ের ইচ্ছা, পুত্র হইতে বংশের নামোজ্জ্বল হইবে, এবং পুত্রের ইচ্ছা, মাকে কিসে সুখী করিবে।

এমনি করিয়া যখন মাতাপুত্রের দিন কাটিতেছিল, তখন একদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত উপাধিগুলি নামের পশ্চাতে লইয়া পুত্র মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল এবং মায়ের ইচ্ছায় যে মেয়েটি বধূরূপে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সে শুধু রূপের ডালাই সাজাইয়া আনিল না, রৌপ্যমুদ্রাও থলি ভর্ত্তি করিয়া লইয়া আসিল।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অজয় বড় কাজ পাইয়া সস্ত্রীক বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল ;—মা আজ বাঁচিয়া নাই,—তাই দিনে দিনে দেশ ও ভিটার মায়াও কমিয়া আসিয়াছে,—বড় জোর বৎসরে একবার বাঙ্গালায় আসে, তাও বাস করিতে নহে, বেড়াইতে—হায় বাঙ্গালার প্রবাসী সন্তান!

বাঙ্গালী সতীশ চৌধুরী সম্প্রতি কার্য্যোপলক্ষে এদেশে আসিয়াছিলেন।—তাহারই মাতৃশ্রাদ্ধে যেদিন আবার বহুদিন পূর্ব্বের মত অজয় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিল, সেদিন তাহার মনের মধ্যে গত জীবনের এমনি অনেকগুলি ছবি পর পর ভাসিয়া উঠিল।

বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালী কীর্ত্তনীয়া আসিয়াছিল এবং নিমন্ত্রিত বাঙ্গালীদের বেশীর ভাগই সেই স্থানে জমা হইয়াছিলেন। অজয় ধীরে ধীরে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেই চৌধুরী একখানা চেয়ার আগাইয়া দিলেন। সহাস্যে কহিলেন—"আপনার আসাতে দেরী দেখে ভাব্‌ছিলুম যে..."

অজয় অন্যমনস্কভাবে কি-একটা উত্তর দিয়া বসিয়া পড়িল; তখন তাহার কাণে আসিতেছিল—

"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব,
আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।'

ও মুখ যেন চেনা,—কণ্ঠস্বর অপরিচিত নয়!

বহু বৎসর পূর্ব্বের একটী সন্ধ্যা এবং তাহার পর আর একটী দিনের কথা অজয়ের মনে পড়িয়া গেল—সেই পথ...সেই দুর্য্যোগ-সন্ধ্যায় আশ্রয়-গ্রহণ! কিন্তু না,—মানুষের মত মানুষ হওয়াও তো বিচিত্র নয়; হয়তো তাহার ধারণা ভুল।

কীর্ত্তনীয়া তখন তাহার দিকে চাহিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছিল—

"না পোড়োয়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়ে রেখ' তমালেরই ডালে।
যেন পুড়ায়ো না ;—
একে মন অনলে পুড়ি—
আর আমারে পোড়ায়ো না—
যেন ভাসায়ো না ;—
একে নয়ন জলে ভাসি -
আর আমারে ভাসায়ো না..."

মনের মধ্যে এমনি একটা সন্দেহ বহিয়া আহার দির পরে অজয় যখন গেট পার হইয়া যাইতেছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাক্ আসিল—"বাবু!"

রাত্রি গভীর হওয়ায় এবং নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশ বিদায়-গ্রহণ করায় এদিকটা প্রায় নির্জ্জন হইয়া পড়িয়াছিল। কীর্ত্তনও বহুক্ষণ পূর্ব্বে থামিয়া গিয়াছিল।

মুখ ফিরাইয়া অজয় দেখিল, একটী লোক, সম্ভব তাহাকেই ডাকিতেছে। কহিল—"কি চাও?"

অদূরস্থ একখানি আলোকজ্জ্বল কক্ষ দেখাইয়া লোকটী কহিল—"আপনাকে দিদিমণি একবার ডাক্‌ছেন।"

"দিদিমণি ডাক্‌ছেন? আমাকে?...

অজয় বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতে লোকটী কহিল—

"হ্যাঁ, যিনি গান গাইতে ক'লকাতা থেকে এসেছেন, তিনিই।"

অজয়ের বিস্ময় কাটিল না; কি কর্ত্তব্য তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পরে বিরক্তি-মিশ্রিত-স্বরে কহিল—"বলগে যাও,—আমি যেতে পারব না; আর আমার কাছে তাঁর এমন কোনও দরকারও থাক্‌তে পারে না।

সে উত্তরের আশায় না দাঁড়াইয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই লোকটি বাধা দিল—"বাবু, একটিবারের জন্য আপনাকে যেতেই হবে"

বিরক্তি চাপিয়া অজয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিতেই যে নত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল এবার তাহাকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। করবী কহিল—চিনতে পারেন অজয়বাবু?…"

অজয় অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল।—"আগে চিনতে না পারলেও এখন পেরেছি; কিন্তু আমার কাছে তোমার এমন কি দরকার থাকতে পারে—তাতো বুঝতে পারছি না…"

আজ অজয়ের দৃষ্টি করবীর মুখের উপরে। স্থির, সে দৃষ্টির সম্মুখে করবী কুন্ঠিত হইয়া পড়িল, শুষ্ক স্বরে জবাব দিল—"দরকার?… না, দরকার এমন কিছুই নয়। তবে অনেকদিন পরে বিদেশে পরিচিতদের মধ্যে শুধু আপনাকেই দেখলাম কি না তাই…

অজয় কোনও উত্তর দিল না, করবীও নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল; কতক্ষণ যে এভাবে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা কাহারও খেয়ালই ছিল না; হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া অজয় যেন একটু বেশী জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা তা' হ'লে চললুম।"

সে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই রুদ্ধস্বরে ডাক আসিল—"একটু দাঁড়াও—" . .

করবী যখন আর একবার তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন অজয় যেন ইচ্ছা করিয়াই অন্যদিকে চাহিয়াছিল; করবী উঠিয়া দাঁড়াইতেই দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিল,—আর একবারও পশ্চাতে চাহিল না।

পরদিন সকলেই শুনিল,—কীর্ত্তনীয়া আর দুই দিনের গাহিবার টাকা ফিরাইয়া দিয়া পূর্ব্বদিন ভোরের ট্রেণেই কলিকাতায় রওনা হইয়াছে।

মাসিক সাহিত্যের গল্প সমালোচনা

প্রবাসী—চৈত্র—১৩৩৭

দীপশিখা—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়—গল্পটি তেমন না জমিলেও বিষয়নির্ব্বাচনে নূতনত্ব চোখে পড়িল। একটা কল লইয়া গল্প, আখ্যানভাগটি কারখানার অভ্যন্তর লইয়া নয়, তাই বর্ণনা বাহুল্যের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই গল্পটি উজ্জ্বল হয় নাই। আধুনিক কেরাণী-জীবনের দারিদ্র্য, দাম্পত্য কলহ, ধর্ম্মঘট ও নিরন্ন কুলিদের আত্মসমর্পণ—সমস্ত ব্যাপারগুলি লেখাই হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে পাঠকের মনে বিশ্বাসসঞ্চার করিবার চেষ্টা নাই। ভাষাও নানা স্থানে জটিল হইয়া পড়িয়াছে। 'দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস আনন্দের তুফানে তরতর করিয়া ভসিয়া বেড়ায়', 'কালের অনলে আয়ু-হবি উপহার দেয়', ইত্যাদি ভাষাপ্রয়োগ অচল। হঠাৎ মাঝখানে 'ভূমিলক্ষ্মীর পরমায়ু প্রদীপে নিরন্তর তৈল-প্রদান' লইয়া যে একটি দীর্ঘ অবান্তর আলোচনা আছে, তাহা গল্পের গতিকে বাধা দিয়াছে। অমন একটা বক্তৃতার কিছু দরকার ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবু গল্পের মধ্যে জায়গায়-জায়গায় মুন্সিয়ানা আছে। অহিংসাব্রতধারী কমলের চরিত্রটি মন্দ হয় নাই। যন্ত্র-সভ্যতার কলুষের প্রতি লেখকের জাগরূক দৃষ্টি তাঁহাকে আরো অনেক রচনা উপকরণের সন্ধান দিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

হার জিত—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ও পুনর্মিলন লইয়া একটি সাধারণ অনাড়ম্বর গল্প। গল্পের সৌন্দর্য্য যে আখ্যানভাগে নয়, তার বিন্যাসে ; লিখনচাতুর্য্যে নয়, তার ভঙ্গিতে; গল্পটি পড়িয়া তাহা আরো স্পষ্ট হইল। স্ত্রী স্বামীর উপর রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যাইতেছেন। তাহার আগে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে যথেষ্ট সজীবতা ও নাটকীয় উপাদান আছে। কিন্তু স্বামী যখন স্ত্রীর পৌঁছিবার আগেই শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই হইতেই গল্পের কথা-বার্ত্তায় কৃত্রিমতা ঢুকিয়াছে। এবং এই কৃত্রিমতাটুকু গল্পের রঙসাছায়াকে হঠাৎ নষ্ট করিয়া দিল। সমস্ত কৌতূহল ও suspense নিমেষে অন্তর্হিত হইতেই গল্পটি নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল। তবু লেখকের বর্ণনাকৌশলের কৃতিত্বটুকু শেষ পর্য্যন্ত মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখে।

মেঘ ও রৌদ্র—শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্ত—এটি ঠিক গল্প নয়, চরিত্র চিত্র। এই চিত্রটি খাঁটি সোণার মত উজ্জ্বল। একটা পথচারী কুকুর লইয়া প্রাদেশিক এক ছোট দারোগার বিভিন্ন মনোভাবের একটি জ্বলন্ত ছবি। হাত কামড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া কুকুরটাকে বংশী-লোচন কর্ম্মকার অনেক কষ্টে পাকড়াও করিয়াছে। ছোট দারোগা হাফিজুদ্দিন সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত। যেই শুনিতেছেন এ কুকুরটা পুলিশ-সায়েবের, তখনই এর দংশন-বৃত্তান্তটা নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, আবার যেই শুনিতেছেন কুকুরটা বেওয়ারিশ, তখনই মিথ্যাবাদী বংশীলোচনের প্রতি দারোগাবাবুর সে কী আস্ফালন! ছবিটি এই ছোট ঘটনাটুকুকে লইয়াই, কিন্তু লেখকের এমন একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় যাহা সচরাচর চোখে পড়ে না। গল্পটির নীচে ফুটনোট লেখা—লেখক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী।

পুরুষস্য ভাগ্যং—শ্রী অপূর্ব্বমণি দত্ত—একটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোকের রাতা-রাতি বড়লোক হইবার করুণ কাহিনী। গল্পের মধ্যে চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা আছে এবং স্বার্থপর পঞ্চানন সেই হিসাবে স্পষ্ট ও পরিচিত হইয়া উঠি-য়াছে। দুঃখের গল্প বাঙলা দেশে বেশী চলে, সেইটা বাঙলা দেশের মাটির দোষ। কিন্তু যেই দুঃখের অন্তরে বলশালিতা নাই, নির্ভীক তেজস্বিতা নাই, সে দুঃখ সাহিত্যিক সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারে না। সদানন্দের জীবনে এতগুলি ক্ষতি ও দুঃখের বোঝা না চাপাইয়াও লেখক তাহাকে মহনীয় করিতে পারিতেন। ভাগ্যের কাছে

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ { দ্বিতীয় সংখ্যা

—নিশাচর—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

দশ বৎসর আগে বাঙ্গালার দু'টি স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ একটি দাম্পত্য কলহের যে নিদারুণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহার কথাই বলি।

বাড়িটি তেমন ভালো নয়—অত্যন্ত জীর্ণ। সংস্কার অভাবে তাহার চারিধারের দেয়াল নানা জায়গাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁক দিয়া সুদূর নীল পাহাড় আর শালের জঙ্গল যখন চোখে পড়ে, তখন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়।

ছোট খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়িটির সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া কতদিন অমলা দূরের নীল পাহাড়শ্রেণীর দিকে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারে নাই। এমনটি আর সে কখন দেখে নাই। বাঙ্গলার সমতল আগাছাআচ্ছন্ন পল্লীর সে মেয়ে। পৃথিবী যে এত বিশাল এমন সুন্দর এ ধারণাই তাহার ছিল না। কাজ করিতে করিতে দিনে অন্ততঃ একশতবার সে বারান্দায় খানিক-ক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাকে। স্বামীকে অন্ততঃ একশতবার দিনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই এক কথাই বলে,—"ভারী সুন্দর দেশ, না গা?"

বিভূতিভূষণের অত উৎসাহ নাই। সে শুধু সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া সায় দেয়। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া তারিফ করিবার তাহার সময় নাই। তাহাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয়। এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তাও আধা মাহিনায়। ছুটি ফুরাইলে আরেকটা দরখাস্ত করিতে হইবে; কিন্তু মনিবেরা আর তাহা গ্রাহ্য করিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অমলা এক মাসে কিই বা এমন সারিবে। দিন কুড়ি হইয়া গেল, তবু নিয়মিত জ্বর ত এখনও আসিতেছে। এখানকার লোকেরা বলে অন্ততঃ তিন মাস না থাকিলে না কি এখানকার জল ভালো করিয়া গায়েই বসে না। কিন্তু তিন মাস ছুটি যদি বা দিলে, এখনকার খরচ কুলাইবে কেমন করিয়া? সাহস করিয়া ভগবান ভরসা করিয়া সে রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে, কিন্তু সাহসেরও একটা সীমা আছে। চেঞ্জের জায়গা হিসাবে বাড়িটির ভাড়া অত্যন্ত অল্পই বটে, কিন্তু সেই অল্পই যে তাহার কাছে দুর্বহ বোঝা।

অমলা ইতিমধ্যে আর একটা কি মন্তব্য করে, সে শুনিতে পায় না।

অমলা একটু গলা চড়াইয়া বলে,—"হাঁ গা, কালা হয়েছে না কি! অত কি ভাবছ বল দেখি?"

বিভূতি একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলে,—"তোমার ও একঘেয়ে এ সুন্দর তা সুন্দর শুনতে আর ভালো লাগে না বাপু! সুন্দর দেখে ত আর পেট ভরবে না।"

অমলা উচ্ছ্বাসের মধ্যে বাধা পাইয়া লজ্জিত হইয়া ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণও হয়। স্বামীর ভাবনা যে কি তাহা সে জানে না এমন নয়, কিন্তু স্বামী নিজেই তাহাকে বারবার সকল ভাবনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছে। চেঞ্জে আসার কথায় খরচের কথা ভাবিয়া সেই আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু স্বামী নানাভাবে বুঝাইয়া তাহার সে আপত্তি দূর করিয়াছে। সে সম্বন্ধে কোন কথা পাড়িলে স্বামী বলিয়াছে,—"ভাবনা-টাবনা ছেড়ে তুমি শুধু তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার চেষ্টা কর দেখি।"

প্রথম প্রথম তাহাদের দিন কি সুখেই কাটিয়াছে। নূতন দেশের সৌন্দর্য্য ও বিস্ময় মুগ্ধ চোখে শুধু দেখিয়া নয় পরস্পরকে বলিয়া যেন তারা ফুরাইতে পারে নাই। কিন্তু গত কয়দিন হইতে স্বামীর ভাব কেমন যেন বদলাইতে সুরু করিয়াছে। অমলার মনে হয়, অবশ্য দোষ তাহারই। চেঞ্জে আসিয়াও তাড়াতাড়ি না সারিয়া ওঠা তাহার অন্যায়। না সারিলে এত টাকা খরচ বৃথাই হইবে।

তবু স্বামীর এই বিরক্তি সে আশা করে নাই। মুখখানি ম্লান করিয়া সে ঘরের ভিতর চলিয়া যায়। ভাবে, স্বামীর এ বিরক্তি নিশ্চয়ই ক্ষণিকের; এখনি সে অনুতপ্ত হইয়া হয় ত ক্ষমা চাহিতে আসিবে। না রাগ করিয়া সে থাকিবে না; কিন্তু একটু মজা করিবে। শুধু সৌন্দর্য্য দেখিয়াই একদিন কে সব ভুলিত, পেট ভরাইবার জন্য ব্যস্ত হইত না, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলেও বিভূতির আসিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অমলা রাগ করিবে না ভাবিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় তাহার অভিমান হঠাৎ প্রচণ্ড হইয়া ওঠে। অকারণে স্বামীর সামনে দিয়া দু'-চারবার যাতায়াত করিয়া সে ঘরে আসিয়া হঠাৎ খিল দেয়।

"দরজায় খিল দিলে কেন গো! কি হ'ল আবার?"

অমলা সাড়া দেয় না। বিভূতি দু'-চারবার কড়া নাড়ে, খুলিবার জন্য অনুরোধ করে, তাহার পর নিজে হইতেই বিরক্ত হয়। মেয়েদের কোন কাজের যুক্তি খোঁজার নিষ্ফলতা সে অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করিয়াছে।

খিল খুলিতে পেড়াপেড়ি করিলেই যে খুলিতে বেশী দেরী হইবে একথা বুঝিয়া সে নীরবে খানিক বাদে নিজের কাজে চলিয়া যায়।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদেও ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া তাহার রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি কিসের জন্য। বিরক্ত হইয়া বলে,—"সন্ধ্যা হয়ে এল, বেড়াতে যেতে হবে না? খিল দিয়ে ঘরে বসে থাকলেই শরীর সারবে না কি?"

এবার ভিতর হইতে অমলা উত্তর দেয়,—বেড়াইতে সে যাইবে না, এ পোড়ার শরীর তাহার চিতায় পুড়িলেই একেবারে সারিবে।

বিভূতির রাগ বাড়ে—কড়া নাড়িয়া উচ্চস্বরে বলে,—"ও সব ন্যাকামি রেখে তাড়াতাড়ি সাজ-পোষাক শেষ ক'রে ফেল দিকি; অন্ধকার ত হয়ে গেল, আর বেড়াবার সময় কই?"

অমলা তথাপি দরজা খোলে না। ভিতর হইতে তাহার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়,—"আমি হয়েছি তোমার আপদ-বালাই, মরলেই তোমার হাড় জুড়োয়। উঠতে-বসতে দাঁত খিচোবে যদি,

তা' হ'লে চেঞ্জে আনবার দরকার ছিল কি! কি হবে আমার শরীর সেরে?"

বিভূতির আর সহ্য হয় না। "বেশ কাঁদ তা' হ'লে ঘরের ভিতর বিনিয়ে বিনিয়ে। আমি একাই যাচ্ছি বেড়াতে।" বলিয়া রাগে সে বাহির হইয়া যায়।

বেড়াইতে অবশ্য তাহার ভালো লাগে না। বাড়ীর অদূরে একটা পাথরের উপর বসিয়া মেয়েটার এই অবুঝ অভিমানের কথাই সে ভাবে। এত রাগারাগি করিবার মত কি কথা সে বলিয়াছে; আর যদি একটা রূঢ় কথা বাহির হইয়াই গিয়া থাকে, তাহার জন্য কি সন্ধ্যাটা মাটি করিতে হয় এমন করিয়া। আর ক'টা দিনই বা আছে। এখানের প্রত্যেকটি দিন যে তাহাকে কি মূল্যে কিনিতে হইয়াছে সে ভালো করিয়াই জানে। এই ক'টি দিনের উপর সে ভরসা করিয়া আছে। অমলার জ্বর সারান চাইই তাহার ভিতর। এই মূল্যবান দিনের একটি নষ্ট হইয়া গেল ভাবিয়া দুঃখের তাহার আর সীমা থাকে না। কে জানে কতটা উপকার এই দিনটিতেই হইতে পারিত। হয় ত কাল আর জ্বর আসিত না!

অন্ধকার হইতেই সে বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরিয়া আসে।

অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। বেড়াইতে না যাক্, উনুন ধরাইয়া রান্না চড়াইতে সে ভোলে নাই। বিভূতির রাগ পড়িয়া তখন ক্ষোভ আসিয়াছে। কাছে গিয়া সে অত্যন্ত স্নেহের স্বরে বলে,—"মিছিমিছি রাগ ক'রে আজ বেড়ানটা কেন নষ্ট করলে বল দেখি। তুমি ভারী অবুঝ।"

অমলা কিন্তু ফোঁস করিয়া তিক্তকণ্ঠে জবাব দেয়,—"যাও, আর সোহাগ জানাতে হবে না। নিজে বেড়িয়ে এসেছ ত তা' হলেই হ'ল।"

বিভূতি আঘাত পাইয়াও হাসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলে,—"বাবারে, এখনও রাগ যায় নি তোমার! তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, লক্ষীটি, রাগ ক'রে শরীরের ক্ষতি এমন ক'রে করতে আছে!"

অমলা রাগিয়া বলে,—"আমার ভালো ত তুমি কত চাও। চেঞ্জে আনতে টাকা খরচ হয়েছে বলে তোমার বুক টনটন্ করছে; উঠতে বসতে মুখনাড়া দিচ্ছ তাই।"

অন্যদিন হইলে ইহার চেয়ে অনেক বেশীই হয় ত বিভূতি সহ্য করিত। হয় ত আর একটু মান ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলেই সব গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজ হঠাৎ আবার তাহার রাগ চড়িয়া যায়; উচ্চস্বরে বলে,—"তোমার জন্যে টাকা খরচ হয়েছে ব'লে আমার বুক টনটন করছে—নয়?"

"করছেই ত।"

বিভূতি গলা চড়াইয়া বলে,—"করবে নাই বা কেন! টাকা রোজগার করতে মেহনৎ হয় না? অমনি আসে? চেঞ্জে এসে ঘরে খিল দিয়ে থাকবে ত টাকা খরচ করাবার কি দরকার ছিল?"

"আমি তোমায় চেঞ্জে আনতে ত সাধি নি।"

বিভূতি সে কথায় কান না দিয়া চরাগলায় বলিয়া যায়,—"বিয়ে হওয়া ইস্তক ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে! মরবে ত জানি, তা' সোজাসুজি আগে থাকতে মরলে ত আর আমায় এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।"

অমলা সবেগে স্বামীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়,—"আমার জন্যে তোমায় ঝঞ্ঝাট পোহাতে হচ্ছে?"

অন্ধকারে বিভূতি মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উত্তর দেয় না।

স্বামীর দিকে চাহিয়া খানিক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা রুদ্ধকণ্ঠে বলে,—"বেশ, আজই তোমার সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিচ্ছি।"

অন্ধকারে অমলা খোলা দরজা দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়। বিভূতি আগাইয়া ধরিতে

গিয়াও বোধ হয় সঙ্কোচে আবার ফিরিয়া বসিয়া পড়ে। অমলা ছেলেবেলা হইতে ভয়কাতর সে জানে। রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেও বেশীক্ষণ সে থাকিতে পারিবে না। এখনই ফিরিবে।

কিন্তু একটু একটু করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। তবু অমলা ফেরে না। বিভূতি এবার ভীত হইয়া ওঠে। দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মৃদুস্বরে ডাকে,—'অমলা।' কোন সাড়া-শব্দ নাই। বিভূতি আরো জোরে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকে। তবু কোন উত্তর মিলে না। এক অজানিত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে। ঘরে আসিয়া লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া সে দ্রুতপদে অমলাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া যায়।

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। তাহারই মাঝে সুদূর পথে বিভূতিভূষণের ব্যাকুল কাতর আহ্বান শোনা যায়,—"অমলা!"

* * *

ঘাটশীলার ষ্টেশনে বসিয়া গভীর এক অন্ধকার রাত্রে আমরা বিভূতি ও অমলার দাম্পত্য কলহের এই কাহিনীটি শুনিয়াছিলাম। কেমন করিয়া কি অবস্থায় শুনিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ বড় অদ্ভুত।

ছিলাম চক্রধরপুরে। হঠাৎ রমেশের খেয়াল হইল অন্ধকার রাত্রে মোটরে করিয়া গেলুড়িতে গিয়া বিভাসকে চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে। আগের দিন সকালবেলা বিভাসের বাড়ী হইতেই তিনজনে মোটরে করিয়া চক্রধরপুরে রওনা হইয়াছিলাম। হঠাৎ পরের দিন গভীর রাত্রে তাহার দরজায় গিয়া ডাক দিলে বিস্মিত হইবারই কথা। শুধু বিভাসকে চমকাইয়া দিবার জন্য এই রাত্রে এতখানি পথ যাইবার তেমন স্পৃহা আমার বা বীরেনের কাহারও ছিল না, কিন্তু রমেশের উৎসাহ দমাইয়া রাখা কঠিন। শেষ পর্য্যন্ত তাহার প্রস্তাবে রাজীই হইতে হইল। গোল বাধিল শুধু সোফারকে লইয়া। স্পষ্ট না বলিলেও ভাবে বোঝা গেল এই অন্ধকার রাত্রে মোটর হাঁকাইয়া যাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি আছে। সে সম্বন্ধে সবিশেষ প্রশ্ন করিয়া মনে হইল, ভয়টা তাহার পার্থিব কোন প্রাণী বা দ্রব্যবিশেষের জন্য নয়—তাহার ভয় ভৌতিক। এ পথে রাত্রে মোটর চালান না কি মোটেই নিরাপদ নয়।

কিন্তু তাহার কোন আপত্তিই রমেশ টিঁকিতে দিল না। সন্ধ্যার খানিক বাদেই রওনা হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার সোজা পথ। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের প্রখর হেড লাইট সে পথ ভেদ করিয়া চলিয়াছে—মনে হয় যেন অন্ধকারের ভিতর হইতে আমাদের আলোর পথ প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। যে বেগে মোটর চলিতেছিল, তাহাতে পৌঁছিতে অতিরিক্ত দেরী হইবার কথা নয়।

রমেশ পা টা সামনের সীটের উপর তুলিয়া দিয়া আরামে মাথা হেলান দিয়া বলিল,—"কি আরাম বল দেখি। অন্ধকার রাত্রে মোটর চালাবার মত মজা আছে, বিশেষতঃ, এমনি পথে!"

বীরেন বলিল,—"কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার বল দেখি? মনে হয় যেন আমাদের হেড লাইটকে সবলে ঠেলে এগুতে হচ্ছে।"

রমেশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। হঠাৎ সার্চ্চ লাইটটা নিভিয়া গেল; আর সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল,—আমাদের চারিধারে অন্ধকার যেন ওৎপাতিয়া বসিয়াছিল, আলো নিভিতে না নিভিতে একেবারে সবেগে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

বীরেন বলিল,—"একি?"

সোফার গাড়ী থামাইয়া নামিয়া বলিল,—"কি জানি বুঝতে পারছি না।" তার কণ্ঠস্বরে

সম্মানের চেয়ে ভয় ও বিরক্তির পরিচয়ই বেশী পাইলাম।

দু'ধারে ঘন জঙ্গল ; তাহার মাঝে সেই নির্জ্জন পথে অন্ধকারে শুধু দেশলাইয়ের আলোক সম্বল করিয়া অনেকক্ষণ সোফার হেড লাইট জ্বালিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিল,—"না, এ জ্বলবে না।"

"তা' হ'লে উপায়!"

সোফার বলিল,—"গাড়ীর অন্য আলো জ্বলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাতে পথ দেখা ভালো যাবে না।"

রমেশ বলিল,—"তাই জ্বেলেই চল, এখান থেকে আর ফেরা যায় না।"

তাহাই হইল। মোটরের সে সামান্য আলোয় সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার যতটুকু দূর করা যায় তাহাই করিয়া আবার অগ্রসর হইতে স্বরু করিলাম। আলোর জোর নাই, সুতরাং গাড়ীর বেগ একটু কমাইয়াই চলিতে হইল।

বীরেন বলিল,—"পথ চিনে ঠিক যেতে পারবে ত?"

প্রশ্নটা সকলের মনেই উঠিয়াছিল। সোফার বলিল,—"তা' কেমন ক'রে বলি বাবু! একবার মাত্র ত এ পথে এসেছি, তাও দিনের বেলায়!"

তাহার গলার বিরক্তির স্বর এবার স্পষ্ট। কিন্তু তখন তাহা লক্ষ্য করিবার সময় নাই। ভীত-ভাবে বলিলাম,—"কিন্তু পথ ভুল হ'লে এই অজানা জায়গায় কি উপায় হবে বল ত?"

সোফার কথা বলিল না। মনে মনে রমেশের উপর রাগ হইতেছিল। গোয়ার্ত্তুমী করিয়া অন্ধকার রাত্রে অজানা বিপদসঙ্কুল পথে এমন করিয়া তাহার জেদেই ত বাহির হইতে হইয়াছে।

বীরেন বলিল,—"ধর, যদি ইঞ্জিনটাই কোন রকমে খারাপ হয়ে যায়!" এবং এই সম্ভাবনা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার আগেই আবার বলিল,—"এসব বনে বাঘ আছে জান ত?"

রমেশ আশ্বাস দিবার জন্য হাসিয়া বলিল,—"মোটর খারাপ হবে, এমন আজগুবি কথা ভাবছই বা কেন!" কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইল, তাহার নিজের কথায় নিজেরই আস্থার একান্ত অভাব।

তাহার পর খানিক সবাই নীরবে চলিলাম। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার আমাদের ছোট মোটরের শব্দ ও আলোয় আমরা ক্ষীণ ভাবে ভেদ করিয়া চলিয়াছি। পাশের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গলের আবছা মূর্ত্তি যেন এই উপদ্রবে প্রতিপদে ভ্রূকুটি করিতেছে মনে হইতেছিল। মোটরের সামান্য একটু বেয়াড়া শব্দেই বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল—এই বুঝি বন্ধ হইয়া যায়!

কিন্তু মোটর বন্ধ হওয়ার সমান বিপদই শেষ পর্য্যন্ত হইল। কত মাইল কতক্ষণ ধরিয়া তখন আসিয়াছি বলিতে পারি না। হঠাৎ একজায়গায় আসিয়া মোটর থামাইয়া সোফার বলিল, "কিন্তু পথ যে সত্যি চিনতে পারছি না বাবু! ঠিক পথে এলে এতক্ষণ একজায়গায় রেল লাইন পার হবার কথা ব'লে মনে হচ্ছে।"

রমেশ বলিল,—"পার হয়ে আস নি দেখেছ ঠিক!"

"দেখেছি বই কি!"

ইহার পর আর কি করা হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এখান হইতে আগান বা পিছান সমান বিপদ। এই অন্ধকার রাত্রে গহন জঙ্গলের মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া যদি মাঝপথে পেট্রোল ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! কি করা উচিত ভাবিতেছি, এমন সময় বীরেন বলিল,—"রোসো রোসো—একটা আলো দেখা যাচ্ছে না? দেখ ত?"

সত্যি আলোই ত বটে। অদূরে কে একজন লণ্ঠন হাতে করিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছে

মনে হইল। কাছে আসিতে দেখিলাম, লোকটি আর যাহাই হোক প্রিয়দর্শন নয়। অন্ধকার রাতে তাহাকে হঠাৎ পথে দেখিলে আঁৎকাইয়া উঠিবার কথা। শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, তাহার ঝাঁকড়া চুল সেই শীর্ণ মুখের উপর ফণার মত উঁচাইয়া আছে। হাড় বাহির করা মুখে সব চেয়ে অদ্ভুত তাহার কোটরনিবিষ্ট চোখ দু'টি। হঠাৎ মনে হয় বুঝি উন্মাদ। কিন্তু তখন অত বিচারের সময় ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই রাস্তায় কি গেলুডি যাওয়া যায় জান ?"

লোকটার ধরণ-ধারণও অদ্ভুত। খানিক সে আমাদের কথায় কোন উত্তরই দিল না। হয় ত শুনিতে পায় নাই ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় অত্যন্ত গম্ভীরগলায় বলিল,—"এই পথই বটে।"

লোকটার কথার ধরণ দেখিয়া কিন্তু কেমন সন্দেহ হইল; বলিলাম, "ঠিক জান ত!"

এতক্ষণ সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, আমার কথায় হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"এইখানে বিশ বছর ধরে আছি, আর গেলুডির পথ জানি না।"

যাক্, হয় ত কথা তাহার সত্য। সোফার আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বলিলাম,—"যা' হবার হয়ে গেছে, এখন চল সামনে যতদূর পথ মেলে।"

বহুক্ষণ—প্রায় ঘণ্টা দুয়ক হইবে—এইভাবে চলিবার পর এক জায়গায় আসিয়া কিন্তু বিষম ঠেকিয়া গেলাম। সামনে পথ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সোফার বলিল,—"কোন্‌টায় যাব বুঝতে ত পারছি না।"

এবার সমস্যা সত্যই দারুণ। দুইটা পথই যে ঠিক নয় এটুকু বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার নাই। কিন্তু কোন্ পথে যাওয়া যায়? গাড়ী থামাইয়া আমরা সেই তর্কই করিতেছি, এমন সময়ে বীরেন বলিল,—"না, বিধাতা আমাদের সহায়। এই আরেকটা আলো দেখা যাচ্ছে!"

এবারেও একটা লোক আলো লইয়া আসিতেছিল বটে! বলিলাম,—"এই জঙ্গলের মাঝে মানুষ থাকতে পারে ভাবি নি—"

এবারের লোকটা কাছে আসিতে সোফারই তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিল। লোকটা বিড় বিড় করিয়া কি তাহাকে বলিল শুনিতে ভাল পাইলাম না। কিন্তু সোফারকে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইয়া দিতে দেখিয়া বুঝিলাম সে এবার রাস্তা বুঝিয়াছে।

হঠাৎ বীরেন বলিল,—"দাড়াও দাড়াও, গাড়ী একটু থামাও ত।"

তাহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিলাম, —"কেন!"

বীরেন কম্পিত গলায় বলিল,—"লোকটাকে লক্ষ্য করেছ তোমরা।" এবং আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল,—"প্রথম যে লোকটা আমাদের পথ বলে দেয় একেবারে অবিকল সেই লোক!"

ঠিক অমনি একটা সন্দেহ আমারও হইতেছিল, কিন্তু ভয় ধরা পড়িবার লজ্জায় বলিতে পারি নাই। বীরেনের কথায় সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল—শেষে সাহস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম,—"কিন্তু তাকে ত প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে ফেলে এসেছি।"

"সেই ত আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই জনমানবহীন জঙ্গলের পথে দু'-দু'বার মানুষের দেখা পাওয়াই অদ্ভুত ব্যাপার! তার ওপর চল্লিশ মাইল পার হয়ে এসে সেই একই লোক!"

সোফার হঠাৎ গীয়ার বদলাইয়া দ্বিগুণ-বেগে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বলিলাম,—"ও কি করছ?"

সে তিক্তকণ্ঠে বলিল,—"কি করব বাবু, আমার প্রাণের ভয় নেই!"

বলিলাম,—"তুমিও দেখেছ নাকি!"

সোফার পিছন না ফিরিয়াই ভীতস্বরে বলিল,—"দেখেই না অত তাড়াতাড়ি গাড়ী ছেড়ে দিলাম।"

পরমুহূর্ত্তে আমরা সকলে একসঙ্গে হৈ হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সোফার প্রাণপণে ব্রেক কষিয়া গাড়ী রুখিতে গেল। গাড়ী থামিল না। ষ্টীয়ারিং হুইল, ঘুরিয়া একেবারে পাক খাইয়া পাশের গড়ানে খাদ দিয়া হুড়হুড় করিয়া নামিয়া চলিল। সামনের দিকে চাহিয়া সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তেও দেখিতে পাইলাম গভীর জল তারার আলোয় সামান্য চিকচিক করিতেছে। বুঝিলাম, তাহার তলেই আমাদের সমাধি হইতে চলিয়াছে। ভয়ে চোখ বুজিলাম।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পাইলাম। সামনে বুঝি উঁচু একটা তারের জাল ছিল, তাহাতে গাড়ী আটকাইয়া গেল। এ রকম অবস্থায় গাড়ী উল্টাইয়া যাইবার কথা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা যায় নাই। চোখ খুলিয়া দেখিলাম, প্রবল ঝাঁকানি খাইয়াও অক্ষত শরীরেই সবাই রক্ষা পাইয়াছি।

প্রথম কথা কহিল বীরেন; আতঙ্কের স্বরে বলিল, —"লোকটার একেবারে কি বুকের ওপর দিয়ে গাড়ী গেছে সোফার!"

সোফারের পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল; খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহির হইয়া বলিল,—"কি জানি বাবু, ব্রেক কষতে কষতেই গাড়ী ঘুরে গেছে। দেখবার সময় পাই নি।"

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া বলিলাম, —"এখনই দেখতে হবে, চল।"

সবাই মিলিয়া উপরে উঠিয়া আসিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য! তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক খুঁজিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সামান্য কিছু নয়, একটা জোয়ান মানুষ; সবাই মিলিয়া স্পষ্ট তাহাকে গাড়ীর ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। তাহার দেহ এই এক মিনিটের ভিতর কোথায় যাইতে পারে। যেদিকে খাদ সেদিকেও সে পড়ে নাই। পড়িয়াছে একেবারে সম্পূর্ণ অন্য দিকে—সেখান হইতে মৃত বা জীবন্ত কাহারও এক মিনিটে অন্তর্ধান হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

বীরেন বলিল,—"তা' হ'লে কি?—"

তাহার কথা আর শেষ করিতে হইল না। একই নামহীন আতঙ্কে সবারই বুক তখন কাঁপিতেছে। বলিলাম,—"ও মোটর আজ আর ওঠান যাবে না। চল, সবাই মিলে এগিয়ে যাই।"

রমেশ বলিল,—"কিন্তু কোথায়?"

বলিলাম,—"ওই দূরে ক'টা লাল আলো দেখা যাচ্ছে, বোধ হচ্ছে যেন ষ্টেশন একটা হবে।"

বীরেন বলিল,—"কিন্তু আবার আলো?"

* * *

সেদিন অনেক হায়রাণীর পর অবশেষে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়াছিলাম। পথ ভুল যে কতখানি হইয়াছে ষ্টেশনের নাম দেখিয়াই বোঝা গেল। গেলুডি আসিতে একেবারে ঘাটশীলায় আসিয়াছি। গভীর রাত্রে ষ্টেশনে তখন একা টেলিগ্রাফ মাষ্টারই জাগিয়াছিলেন। লোকটি অত্যন্ত ভদ্র। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিয়া বলিলেন,—"আজকের রাতটা এখানে থাকুন, কাল আপনাদের মোটর তোলবার ব্যবস্থা করিয়ে দেব।"

ঘুমাইবার ব্যবস্থা একপ্রকার তিনি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর ঘুমাইবার প্রবৃত্তি নাই। তাঁহাকে সমস্ত দুর্ঘটনার কাহিনীই বলিলাম।

ভদ্রলোক গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"আপনারা জানেন না তাই; নইলে এ অঞ্চলে সাহেব-

সুবোরাও রাত্রে ও পথে মোটর নিয়ে বেরোয় না! আপনারা তবু প্রাণে বেঁচেছেন। পাঁচ-ছটা মোটর লোকজন সমেত এই পথে রাত্রে আশ্চর্য্যভাবে চুরমার হয়ে গেছে।"

সভয়ে বলিলাম,—"কিন্তু কি ব্যাপার মশাই?"

"শুনি, মোটরের উপরই তার যত আক্রোশ! সারারাত না কি অমনি লণ্ঠন নিয়ে এই পথে ঘুরে বেড়ায়।"

ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে?"

সীগ্‌ন্যলার মশাই ধীরে ধীরে বলিলেন,—"দশ বৎসর আগে এখানকার একটি লোক রাত্রে তার স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল—আর বাড়ী ফেরে নি।"

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন,—"ওই পথে সে মোটর চাপা পড়ে মারা যায়। তবে শুনুন…"
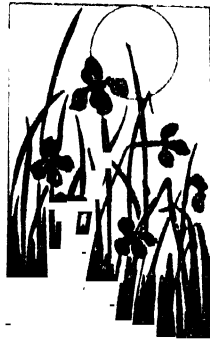
—মামা—

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

এক

জীবন-যুদ্ধে নানা দিকে বিফল মনোরথ হইয়া সদর রাস্তার একদম উপরে সাইনবোর্ড লটকাইয়া একখানি ছোটখাট মণিহারীর দোকান খুলিয়া বসিলাম। প্রাতঃকালে ঈষদুষ্ণ চা পান করিয়া দোকানে গিয়া উঠিতাম। সম্মুখে দেবদারুবৃক্ষের ফাঁক দিয়া প্রাতঃ-সূর্য্যরশ্মি আমাকে অভিনন্দন জানাইত; প্রাণের তারটিতে প্রভাতের সেই পুলক বহন করিয়া ধূপধুনা গঙ্গাজল সহযোগে একটি ধূলিমলিন গণাধিপ-মূর্ত্তির অর্চ্চনা শেষ করিয়া প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির পরিচয় গ্রহণ করিতাম।

লজেঞ্চুষ, বিস্কুট, চুরুট ও নস্য বেশ ভালো করিয়া সাজাইয়া সম্মুখে রাখিয়া দিতাম। প্রাতঃকালে আবার এই কয়টি জিনিষের খরিদ্দার আসিত বেশী। কিন্তু কেবলমাত্রনস্য বিক্রয়লব্ধ তাম্রখণ্ডে একখানি কলাই-করা ডিস দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেই ভরিয়া উঠিত; নস্যের জয় হউক—প্রাচীন ভারতের আপামর জনসাধারণ নস্য গ্রহণ করিত; বোরোবুদুর অজন্তা প্রভৃতির শিল্পীগণ নস্য গ্রহণ না করিলে অমন সূক্ষ্ম কারুর নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, রাজনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতির প্রণেতা কামন্দক, চাণক্য, কবিকেশরী কালিদাস, কবিরাজ ভবভূতি প্রভৃতি সকল মনীষিগণই যথারীতি নস্য গ্রহণ করিতেন। আজ যাঁহারা প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, যে, তাঁহারা সকলেই ভারতের সেই চিরপুরাতন পন্থার অনুসরণ করিয়া নস্য ধরিয়াছেন।

আমার দোকানে মাঝে মাঝে অনেকে সিগারেটের খোঁজে আসিতেন। সেদিন একটি তরুণ দক্ষিণ হস্তখানি লীলায়িত করিয়া অতি বিনীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—সিগারেট রাখেন কি মশয়?

আমিও বিনীতকণ্ঠে উত্তর দিলাম—আজ্ঞে না; সিগারেট প্রোস্ক্রাইব্‌ড্‌ হ'য়েছে; নস্য কিংবা চুরুট নিতে পারেন।

—প্রোস্ক্রাইব্‌ড্‌ কি মশয়?—সিগারেট? প্রোস্ক্রাইব্‌ড্‌?

—আজ্ঞে হাঁ, সিগারেট বহুপূর্ব্বেই প্রোস্ক্রাইব্‌ড্‌ হ'য়েছে; আপনি চুরুট নিতে পারেন! কিন্তু চুরুট ধর্‌লেই লুঙী পর্‌তে হ'বে; বার্ম্মিজ শ্লিপার একজোড়া তখন নিতান্তই আবশ্যক হবে; দরকার কি অত হাঙ্গামায়? তার চেয়ে নস্য নিন্‌—এস্‌ট্যাবলিশমেণ্ট খরচা বেশী নেই—একটি ডিবে, আর তিরিশ দিনে তিরিশ পয়সা—বাস্‌!

তরুণ কথাটি কহিল না। তৎক্ষণাৎ এক পয়সার নস্য লইয়া চলিয়া গেল। নস্য জয়যুক্ত হউক্‌—নস্য-পরিপুষ্ট শরীরস্থ সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুজালের জয় হউক্‌—সসাগরা ভারতবর্ষ আবার নস্যলব্ধ প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

দুই

সেদিনের 'বঙ্গবাণী'তে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। 'বঙ্গসাহিত্যে বিড়ীর দান'—লেখক প্রবোধ সাণ্ডেল। পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি কিছুই

মনে নাই। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড চীৎকারে আঁৎকাইয়া উঠিয়া দেখি, আমার দোকানের সম্মুখে একেবারে জনসমুদ্র—'বন্দেমাতরং' 'মহাত্মাজীকি জয়'; একদল তরুণ ওয়ালফোর্ড দ্বিতল বাসে উঠিয়া নির্ভয়ে চীৎকার করিতেছে এবং আমাদের সকলকেই দোকান ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। জানি না কখন উন্মত্ত জনসমুদ্র দোকানের উপর টাল খাইয়া পড়ে বা—কাজেই দোকানের দরজা ভেজাইয়া দিয়া ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া তাণ্ডবলীলা দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ 'ঐরে, আস্‌ছে' বলিতে বলিতে জনসমুদ্র স্রোতোমুখর হইয়া উঠিল। যে যেদিকে পারিল তীরবেগে দৌড়াইয়া পলাইল। সভয় বিস্ময়ে ঘুলঘুলির মধ্য দিয়া দেখিলাম,—পাঁচটি গোরা সৈন্য সঙ্গীন্ সম্মুখে আগাইয়া দিয়া বুটের 'খট্‌মট্' শব্দে রাজপথ চকিত করিয়া সম্মুখ দিয়া সবেগে চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে সব নিঃস্তব্ধ; কিন্তু ও কি ?—আবার দরজা ধীরে ধীরে খুলিয়া ও কে আসিল ?

গলদেশে ত্রিকণ্ঠি, ঈষৎ ভুঁড়ি, কেশ কদমকুসুমবৎ ছাঁটা, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক মূর্ত্তি—পরিধানে আটহাতি ধুতি—কোঁচাটি উল্টাইয়া কোমরে গোঁজা—স্থির গম্ভীর প্রশান্ত দর্শন—ওষ্ঠাধর দৃঢ়সংবদ্ধ; জনসমুদ্রের উৎকট বিক্ষোভ তাহাকে যেন স্পর্শ করে নাই।

মূর্ত্তি আমার বিহ্বল ভাবগতিক দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে অভয় দিয়া বলিলেন—ভয় পেয়েছিস্ ?

সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বলিলাম—না, আপনি ?

মূর্ত্তি অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—চিন্‌তে পারলি নে ? আমি যে তোদের মামা !

পরিহাস মনে করিয়া উদাসীন হইব ভাবিতেছি; দয়ার্দ্র কণ্ঠে মামা প্রশ্ন করিলেন—নস্য রাখিস্ ত ! দে দেখি—

এক পয়সার নস্য কাগজে ঢালিয়া মোড়ক বাঁধিতে যাইতেছি; হঠাৎ মামা বলিলেন—উঁহু, এক পয়সার নয়—এক পিঞ্চ হ'লেই চল্‌বে। কি মনে হইল,—এক পয়সার মোড়কটি মামার হাতে দিয়া দিলাম; হাসিয়া বলিলাম—মনে রাখবেন মামা !

মামা ঘোলাটে চক্ষু দু'টি মুহূর্ত্ত মধ্যে উল্টাইয়া ফেলিলেন—বলিলেন—হুঁ, এমনি ক'রেই ব্যবসা রাখবি ! চাইলাম এক পিঞ্চ, দিলি এক পয়সার ! টেক্ কেয়ার ব'লে দিচ্ছি—বলিয়া মামা দু'টি আঙ্গুলে যতটা পারিলেন নস্য লইয়া বাকীটা ফেরৎ দিলেন ! তারপর আমার দিকে নস্য গ্রহণান্তর তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—ছেলে ছোক্‌রা কি না ! গোলমাল কর্‌ছে, কর্‌তে দাও; কিন্তু খবরদার ! ছেড়েচ কি গিয়েছ—যাইও ছাট্ !

বলিয়া দরজা আবার ভেজাইয়া দিয়া মামা চলিয়া গেলেন।

তিন

বহুদিন সুবল মুখুয্যেকে দেখি নাই। সেদিন দেখা হইলে মামার কথা তাহাকে বলিলাম। সুবল সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিল—মামা ? না, কৈ মামাকে দেখেচি ব'লে মনে হচ্ছে না ত ! 'ভূশণ্ডীর মাঠে'র 'বন্দকী তমসুক দাদা'কে মনে পড়ে। তা ছাড়া প্রবোধ চাটুয্যের কামিনী দা'কে জানি; কামিনী দা' এ সংসারে এক মাত্র দাদা আর বৌদিকে জানত; পঞ্চাশ বছর বয়েস হ'ল কামিনী দা'র—এখনো দাদা দাদা বলতে অজ্ঞান !

আচ্ছা তার বৌটো—বিরক্ত হইয়া বলিলাম —আরে রাখো তোমার কামিনী দা'; মামাকে দেখলেনা, ত দেখলে কি ?

সুবল প্রবলবেগে নস্য লইয়া বলিল—মামাটা কে আবার ? কামিনী দা'র ব্যাপারটার মধ্যে **কতখানি হিউম্যান ইণ্টারেষ্ট আছে, জানেন ?**

চোর দু'টো যখন এল, কামিনী দা' বল্লে, দাঁড়া, আগে দাদাকে জিগ্যেসে ক'রে আসি !

বলিলাম—আরে রাখো তোমার হিউম্যান ইণ্টারেষ্ট ! নরেন বাড়ুয্যেকে নিয়ে একদিন যেয়ো—মামাকে দেখে আসবে'খন !

চার

সেদিন আকাশে ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া মেঘ নামিল : দেবদারু বৃক্ষটি সবেগে আন্দোলিত করিয়া মজুমদার বাটির মাধবীলতার পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবক ছিন্নভিন্ন করিয়া দুরন্ত ঝটিকা সবে মাত্র পক্ষঝাপট থামাইয়াছে, এমন সময় দড়বড় করিয়া জোর এক পশলা বৃষ্টি নামিল।

বৃষ্টি নামিয়াছে কি অমনি একখানি ভাঙ্গা ট্যাক্সি হইতে মামাকে নামিতে দেখিলাম। পুঁথিপাতাপত্র বগলে করিয়া মামা সটান্ একেবারে আমার দোকানে আসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন—এক পিঞ্চ দাও ত ভায়া !

সুবল বলিল—মামা, ভাগনেদের কি ভায়া বলতে আছে ?

মামা জলদনির্ঘোষে কহিলেন—জানি, জানি হে তোমাকেও ; হর্তুকিবাগানে থাকো ত ! কর্ কর্ ক'রে ইংরেজী বল্তে পারো তুমি—তোমাকে জানি !

আমি বলিলাম—মামা, সে এ নয় ; সে ভবা !

মামা বলিলেন—ভবা ফবা বুঝি নে—ইংরেজী বলাটা শুনেছি ; বেশ বলে !

মামা নস্য লইয়া চলিয়া গেলেন ; বলিয়া গেলেন—বৃষ্টি-বাদ্লার দিনে বেগনী-ফেগনী খেয়ো না—আজ শুধু মুড়ি আর কড়াইশুঁটি খেতে পারো ; উত্তম জিনিষ—তোমাদের সেই ভিটামাটি না কি আছে ওর মধ্যে।

মামা চলিয়া গেলে নরেন বাঁড়ুয্যে বলিল—ওয়াণ্ডারফুল ! বলা নাই কহা নাই একেবারে মামা সেজে বেশ চালাচ্ছে ত !

সুবল বলিল—মামার কোনো স্ক্রু বোধ হয় আলগা আছে।

আমি বলিলাম—স্ক্রু সবারই আল্গা ; একেবারে চারিদিক আঁটা হ'লে দম বন্ধ হ'য়ে যা'বে যে !

নরেন বাড়ুয্যে বলিল—ঠিক কথা, স্ক্রু একটু আধটু আল্গা থাকা মন্দ নয়—বড় বড় জিনিয়াস্‌দের সবাই অল্প সল্প ছিটগ্রস্ত।

সুবল বলিল—তা' হ'লে মামাও জিনিয়াস্ !

আমি বলিলাম—নিশ্চয়ই, মামা একটা পথ-ভ্রান্ত জিনিয়াস্ ! আমার দোকানের গণেশমূর্ত্তি দেখ্‌ছ ত—ওর সঙ্গে মামার একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। শুঁড়টুকু ছেড়ে দাও ; আর অতিরিক্ত সূর্য্যদগ্ধ (Sunburnt) হ'লে গণেশ যা' হবেন মামা ঠিক তাই।

সুবল হাসিয়া বলিল—তা' হ'লে মামাকে তাকের ওপর তুলে ধূপধুনো—

সুবলের কথা শেষ না হইতেই মামা পুনরায় দর্শন দিলেন। ভাঙ্গা মোটাগলায় বলিলেন—সর্দ্দি হ'য়েছে বে, আর এক পিঞ্চ্ দে ত ! বলিয়া মামা আসন গ্রহণ করিলেন—নরেন বাড়ুয্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওয়াই-এম্-সি-এতে যাও নি ? সেখানে গিয়ে খুব ত চা বানিয়ে বানিয়ে খাওয়া হয় ! থাকো ত লেক রোডে—কেমন ?

নরেন বিস্মিত হইয়া বলিল—কেমন ক'রে জানলেন ?

—পাকামি রাখ্ ; থাকিস্ ত লেক রোডে ; আর চা খেতে আসিস্ কলেজ ষ্ট্রীটে ; পরের দু'পয়সা যা'তে বেরিয়ে যায়, সেইদিকে কেবল চেষ্টা। —বলিয়া কটমট করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—খেয়েছিস্ ?

আমি বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—কি ?

—সেই যে ব'লে গেলাম ; কড়াইশুঁটি আর মুড়ি ! খাস্ নি ত ! তা' খাবি কেন ? বলিতে বলিতে মামা চলিয়া গেলেন।

নরেন বাঁড়ুয্যে বলিল—ওয়াণ্ডারফুল! লোকটা দেখ্‌ছি সবাইকে জানে। সি-আই-ডি নয় ত?

আমি বলিলাম—আরে রামচন্দ্র; সি-আই-ডি হ'তে যা'বে কেন? কালেভদ্রে ও রকম লোক মেলে; কতদিনের ঘা-খাওয়া লোক, চেহারা দেখে বুঝ্‌তে পারো না?

পাঁচ

সেদিন হর্ত্তুকিবাগানের মোড় দিয়া চলিয়াছি। এমন সময় মামার কণ্ঠস্বর কানে গেল। দেখিলাম, একতলাবাড়ীর ছোট একটি জানালা দিয়া মামা আমাকে ডাকিতেছেন। কাছে গেলে মামা বলিলেন—এ পথে কেন?

হাসিয়া বলিলাম—মামার বাড়ীর সন্ধানে।

মামা বলিলেন—আয়, ভেতরে আয়!

ভিতরে আসিয়া বসিলাম। ঘর নয় ত অন্ধকূপ। একখানা মলিন সতরঞ্চি বিছাইয়া মামা একরাশ খাতাপত্রে কি যেন লিখিতেছিলেন। আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া মামা বলিলেন—একখানা গ্রন্থ লিখ্‌ছি।

চাহিয়া দেখিলাম মামা জাব্‌দা-খতিয়ান্ লইয়া ব্যস্ত; বলিলাম—কই মামা, গ্রন্থ কই? এ যে জমা-খরচ!

মামা বলিলেন—জমা-খরচের তুল্য গ্রন্থ আর নেই! এ রসের রসিক হ'তে হ'লে অনেক সাধনার দরকার!

আমি বলিলাম—মামা, গ্রন্থ ত আজকাল সবাই লিখ্‌ছে; আপনিও একখানা লিখে ফেলুন না!

মামা হাসিয়া বলিলেন—সময় আসে নি এখনো! দু'জন গ্রন্থকারকে জানি; হ্যাঁ, তা'রা লিখেছে বটে! এক, সেই কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম চাটুয্যে,—আহা কি লেখাই লিখেছে—আর, সেই সাগরদাঁড়ির মাইকেল—আহা, কি লেখা রে!—বলিয়া মামা খাঁকের কলম রাখিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন। তারপর ঘোলাটে চক্ষু পূর্ব্ববৎ উল্‌টাইয়া ফেলিয়া বলিলেন—একটা প্রবলেম আছে, লিখতে পারিস? এই যে সব আজকাল মহিলা-আন্দোলন,মহিলা-মজলিস চল্‌ছে, এই সব মহিলা খুব উপরের থাকে উঠেছেন, আর এক থাক আছেন, তাঁরা খু-উ-ব নীচে, অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে; আর মাঝখানে রইলেন যাঁরা—না এদিক্, না ওদিক্—তাঁদের কথা যদি লিখতে পারো, তবে একটা লেখা হয়!

উপর থাক্, মাঝখানের থাক এবং নীচের থাক—এই তিনথাকী ব্যাপারে মাথার থাক্ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মামাকে বলিলাম—মামা, আজ উঠি!

মামা বলিলেন—লিখ্‌তে যদি পারো, ত দেখিয়ো একদিন! এক পিঞ্চ দিয়ে যা'। মামাকে নস্য দিয়া চলিয়া আসিলাম।

ছয়

মামা বলিয়াছিলেন—keep your shop, and your shop will keep you (দোকান চালাও, ভবিষ্যতে দোকান তোমাকে চালাইবে); কিন্তু দোকান চালানো একটা সমস্যা হইয়া উঠিল। প্রতিদিন খবর আসিতে লাগিল, পাটের দর নাই, ধানের দর নাই—লোকের ঘরে পয়সা নাই। চারিদিকে হা-হা রব পড়িয়া গিয়াছে। পয়সা না থাকিলে খরিদ্দার বিরল হইবে। সুবল মুখুয্যে বলিল—Back to the village (গ্রামে ফিরিয়া যাও);' দয়াহীনা নাগরিক সভ্যতায় আর অন্ন জুটিবে না।

মামাকে বড় একটা আর দেখিতে পাওয়া যাইত না। নরেন বাঁড়ুয্যে হাসিতে হাসিতে বলিল—গণেশ মূর্ত্তি থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে মামা অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, আবার পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখে মামা গণেশ মূর্ত্তিতে বিলীন হ'য়েছেন।

বলিলাম—নরেন, ঠাট্টা রাখো; মামা লোকটা sincere (সরল)।

সেদিন শ্যামবাজারের দ্বারিক ঘোষের দোকানের পাশ দিয়া চলিয়াছি। সুবল মুখুর্জ্জে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—মামা!

চাহিয়া দেখিলাম—সত্যই ত! গ্যাসপোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া মামা একদৃষ্টে দ্বারিক ঘোষের বিরাট সাইনবোর্ডের দিকে চাহিয়া আছেন।

মামার সম্মুখ দিয়া তিন-চারবার হাঁটিয়া গেলাম। মামা সেদিন আর চিনিতেই পারিলেন না। মামা হর্ত্তুকিবাগান হইতে দ্বারিক ঘোষ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

পরদিন দোকান উঠাইবার সঙ্কল্প লইয়া দোকানে আসিয়াছি। হঠাৎ মামা দর্শন দিলেন—বলিলেন—ব'লেছিলাম কি না! দোকান ছেড়েছ কি গিয়েছ।

বলিলাম—উপায় নেই মামা, দোকান ছাড়্‌তেই হ'বে।

মামা গম্ভীরভাবে বলিলেন—প্রকারান্তরে তোকে কত পরামর্শ দিলাম, সে ত শুন্‌লি নে; ধর, এক নম্বর এক পিঞ্চ নস্যি; দু' নম্বর মুড়ি-কড়াইশুঁটি; তিন নম্বর, জমা-খরচ; যত্র আয় তত্র ব্যয় কর্‌লে কি চলে? খরচ কমাও, মূলধন বাড়াও তবে গিয়ে ব্যবসা—তা' না—কেবল ঘুমোবি!

হাসিয়া বলিলাম—মামা, সে আর এজন্মে হ'ল না!

মামা মুখ বিকৃতি করিয়া বলিলেন—Then fry verandas (তবে ভেরান্দা ভাজ) দিয়ে যা' এক পিঞ্চ যা'বার আগে।

* * *

মামার সঙ্গে এখনো দেখা হয় মাঝে মাঝে। দোকান উঠাইয়া দিয়াছি। দেখা হইলে মামা এক পিঞ্চ চাহিয়া ল'ন—সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

—প্রতিক্রিয়া—

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

ললাটলিপি ?—হ্যাঁ, অন্য কৈফিয়ৎ যখন নাই, তখন ইহা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

নৃত্যকালীর তের বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, পনের বৎসরে সে বিধবা হইল। সকলেই বলিল, ললাটলিপি।

তাহার পিতা হরিগোপাল চট্টোপাধ্যায় অতি সামান্য অবস্থার লোক। গোলাগাঁয়ের বাজারে কয়েকটী দোকানে খাতা লিখিয়া যৎসামান্য কিছু পাইতেন, সেই কয়েকটী টাকা ছাড়া কয়েক বিঘা মাঠান জমি ছিল, তাহাতেই সংসারটা কায়ক্লেশে চলিয়া যাইত।

মেয়ের বিবাহের দুর্ভাবনায় বৎসরখানেক নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে এমন একটী পাত্র পাওয়া গেল, যাহার কুল-শীল, বিদ্যা কোনটীরই অভাব ছিল না। হরিগোপালের স্ত্রী ঠাকুরতলায় সিন্নি দিলেন, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন সংশয়ের দোলায় কাঁপিয়া উঠিল, গরীবের ঘরের মেয়ের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য সহ্য হয় তবেই ভাল।

সহ্য হইলও না। বিবাহের কথাবার্ত্তা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে গ্রামের দীনু ভট্টাচার্য্য আসিয়া হরিগোপালকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বছর তিনেক পূর্ব্বে দীনুর নিকট তমসুক লিখিয়া দিয়া হরিগোপাল তিনশত টাকা ঋণ লইয়াছিলেন, সেটা এপর্য্যন্ত পরিশোধ করিবার উপায় করিতে পারেন নাই। দীননাথ জানাইলেন যে, টাকাটা অবিলম্বে না দিলে হরিগোপালকে বিপদগ্রস্থ হইতে হইবে।

সমস্যাটার মীমাংসা হইবার যখন কোন উপায়ই দেখা যাইতেছিল না, তখন একদিন দীনু ভট্টাচার্য্য হরিগোপালকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, টাকার জন্য তিনি এখন পীড়াপীড়ি করিবেন না, কিন্তু একটী কার্য্য করিতে হইবে।

টাকার তাগিদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য হরিগোপাল করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কার্য্য বোধ হয় পৃথিবীতে কিছুই ছিল না, কাজেই ভট্টাচার্য্যের কথায় তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। ভট্টাচার্য্য জানাইলেন যে তাঁহার বড় শ্যালকটীর তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী সম্প্রতি গত হইয়াছেন, চতুর্থপক্ষে আবার নূতন সংসার করিবার জন্য লোকটী বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে অনেক চেষ্টা করিয়া তবে আশ্বস্ত করা হইয়াছে, এখন নৃত্যকালীর সহিত তাহার বিবাহ না দিলেই নয়।

বিজ্ঞানে বলে, সব ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে, কিন্তু দীননাথের সমস্ত কথা শুনিবার পূর্ব্বে হরিগোপালের মুখটা যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, এই প্রস্তাবটী শুনিবার পর তাঁহার মুখের যে অবস্থা হইল তাহা প্রতিক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশী। কতকটা কাঁদো-কাঁদোভাবেই হরিগোপাল বলিলেন, "সে কি ক'রে হবে খুড়ো, আমার মেয়ের বিয়ের কথাবার্ত্তা তো আমি একরকম পাকা করেই ফেলেছি।"

দীননাথ খুব বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কি আর জানছি নে হরিগোপাল, কিন্তু সে পাকাকথা আর কাঁচিয়ে ফেলতে কতক্ষণ ? আর আমার সম্বন্ধী তো পাত্তর কিছু মন্দ নয়। বয়স অবিশ্যি একটু বেশী হ'তে পারে, কিন্তু সংসারের কি রকম জমজমাট তা তো জানো ? পাঁচগোলা ধান বাড়ীতে মজুত ; ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের

মাছ—বলি তুমি তো জানো তাদের। কাজিরবেড়ের বাঁড়ুয্যেরা কি রকম বৃহৎ গুষ্ঠী তা' কি আর—"

সে খবর হরিগোপালের অজানা ছিল না। কাজিরবেড়ের বন্দ্যোপাধ্যায়েরা যে এক সময়ে সমৃদ্ধির শিখরে উঠিয়া বর্ত্তমানে কতদূর দৈন্যদশায় পড়িয়াছেন, এ খবর ও অঞ্চলে সুপরিচিত।

হরিগোপাল বলিলেন, "তোমার সম্বন্ধীর জন্যে বরং অন্য কোন একটা সম্বন্ধ দেখলে হয় না খুড়ো?"

ইঙ্গিতটা খুড়ো বুঝিলেন। মুখখানিকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "তোমার মেয়ের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যে থাকলে তবে তো সে কাজিরবেড়ের বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বউ হবে! যাক্, অদৃষ্ট ছাড়া আর তো পথ নেই বাবাজী। তা' হ'লে, টাকাটা কি এমনি মিটিয়ে দেবে, না কাল রুজু করে দিয়ে আসবো এক নম্বর?" বলিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার হরিগোপালের মুখের দিকে চাহিলেন।

'এক নম্বর' রুজু করিয়া দিবার ভিতরে যে কতখানি সর্ব্বনাশ লুক্কায়িত আছে, তাহা বুঝিতে হরিগোপালের বিলম্ব হইল না। দীননাথ বলিতে লাগিলেন, "তিনশো টাকা আসল, তিন বছরের সুদ একশো টাকারও বেশী, তারপর মোকদ্দমার খরচ, ডিক্রীর খরচ সবশুদ্ধ জড়িয়ে ধরলে পাঁচশো টাকা। তারপর? তার পরিণামটা জানো? তোমার ঐ মাটীর দেওয়াল আর খড়ের চাল আর বিঘে কতক ধানজমি নিলেমে উঠলে আর কত হবে? দুশো হোক, না হয় তিনশো হোক। তারপর? বাকী টাকার জন্যে ঘটী-বাটী যা আছে বিক্রী ক'রে নয়তো বডিওয়ারেন্ট জারি করে জেলখানায় —হা হা হা! হরিগোপাল, বুড়োবয়সে মেয়ের জন্যে তাই দেখছি তোমার কপালে আছে। তার উপরেও আবার মেয়ের বিয়েতে দেনা করতে হবে। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট আর কি!"

হরিগোপালের কপালে ঘাম দেখা দিল। ভবিষ্যৎটা তিনি যেন আর ভাবিতেও পারিলেন না। মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। দীননাথের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা খুড়ো, আমাকে একটু ভাবতে দাও। কাল তোমাকে আমার শেষ জবাব দেব।"

খুড়ো হাসিলেন! বিজয়োল্লাস! বলিলেন, "সেই ভাল কথা। কালই জবাব দিও। আজ আর তাড়াতাড়ি কি? বাপু হে, পূর্ব্বজন্মে কত তপস্যা করলে তবে কাজিরবেড়ের বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বউ হওয়া যায়। বয়স বেশী? —তা'তে হয়েছে কি? স্বয়ং মহাদেবের কত বয়স হিসেব ক'রে বলতে পারো?—হা হা!"

সারারাত্রি হরিগোপাল ছটফট করিতে লাগিলেন। ভাবিবার কিছুই ছিল না, আবার দীনু ভট্টাচার্য্যকে অসন্তুষ্ট করিবারও উপায় ছিল না। নিজেও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, গৃহিণীর কাছেও চোখের জল ছাড়া আর অন্য উত্তর পাওয়া গেল না।

একটীমাত্র মেয়েকে চিরন্তন সর্ব্বনাশের মুখে পাঠাইয়া দিয়া হরিগোপাল আসন্ন সর্ব্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। ষাট বৎসরের বৃদ্ধের সহিত তেরো বৎসরের নৃত্যকালীর বিবাহ তাহার পূর্ব্বজন্মের তপস্যার জয়ঘোষণা করিল। নৃত্যকালী বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বউ হইয়া কাজিরবেড় চলিয়া গেল। সে নিজেও কাঁদিল, বাপ-মাকেও কাঁদাইল।

দুই

দুই বৎসর পরে বিধবা হইয়া নৃত্যকালী মনে মনে ভাবিল যে, এতদিনে বুঝি একটু শান্তি লাভ করিলাম।

কিন্তু পূর্ব্বজন্মের যে তপস্যার ফলে সে বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বধূর আসন [illegible]ইয়াছিল, সে তপস্যার পরিণতির কোথাও বোধ হয় শান্তির নামগন্ধ ছিল না।

তাহার স্বামী রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বেকার তিনটী স্ত্রীর পাঁচটী পুত্র এবং সেই পঞ্চপাণ্ডবের ছোটবড় যতগুলি বংশধর ছিল, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য নয়।

বৃদ্ধ বয়সে কর্ত্তা এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করিলেন, ইহাতে পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্রেরা— ইহাদের কাহারও খুসী হইবার কথা নয়, সুতরাং নৃত্যকালী এতগুলি নরনারীর চক্ষুশূল হইয়াই এই সংসারে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

ষাট বৎসরেরও অধিক বয়সে মৃত্যু হওয়াটা আজকালকার বাঙ্গালীর সংসারে অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে, কিন্তু বাষট্টি বৎসর বয়স্ক স্বামীটীকে এই পনের বৎসরের সর্ব্বনাশী রাক্ষসী বধূ তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার অনলে আহুতি দিল, এই মন্তব্যে সারা বাড়ীটা যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

বড় ছেলে বিশ্বম্ভর নৃত্যকালীকে শুনাইয়া নিজের স্ত্রীকে বলিতে লাগিল, "ও হারামজাদীকে যদি জুতো মারতে মারতে না বিদেয় করি, তা' হ'লে নিজের পৈতে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।"

বিশ্বম্ভরের ছোট ছেলেটীর বয়স পাঁচ বৎসরের বেশী নয়, সে কাহার কাছে শিক্ষা পাইল বলা যায় না, সেও আসিয়া নৃত্যকালীর সম্মুখে হাত নাড়িয়া একদিন বলিয়া গেল, "রাক্কুসী, ডাইনী।"

দুপুরবেলা জল খাইয়া নৃত্যকালী গেলাসটাকে বোধ হয় ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিয়াছিল, মেজ বউ আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ও নবাবের ঝি! তোমার বাবা কি সাতটা দাসী-বাঁদী পাঠিয়েছেন যে, তোমার গেলাস থালা তুলে রেখে দেবে!"

চোখের জল তো রাতদিন আছেই, তারই মধ্যে বাদলার আকাশে রৌদ্রদীপ্তির মত সময়ে সময়ে হাসিও যে না পাইত তাহা নয়। ভাবিত, যে অনেক তপস্যা থাকিলে তবে এই সংসারের বধূ হওয়া যায়ই বটে! হায় রে, কাজীরবেড়ের বাঁড়ুয্যে বাড়ী! কত অসহায়া নারীর মর্ম্মন্তুদ অভিশাপ, কত অশ্রুরাশির ফলে আজও তুমি অতীতের কঙ্কাল লইয়া মাথা তুলিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছ? এ বংশের, এ সংসারের ইতিহাস চিরদিনের জন্য লীন হইতে আরও কত সতীর ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাসের প্রয়োজন?

তিন

গালাগালি ও গঞ্জনা একরকম গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সহ্যের সীমাও একদিন ছাড়াইয়া গেল।

দিনটা ছিল একাদশী। হিন্দুর ঘরের বিধবাকে এ দিনে জলবিন্দু পান করিতে দেওয়াও না কি শাস্ত্রের বিধান নয়। সুতরাং বাঁড়ুয্যে-বাড়ীতে শাস্ত্রের এই পরমবিধান না মানিবার কোন কারণ ছিল না।

সংসারের কি একটা ব্যাপারে পূর্ব্বরাত্রে নিত্যনিয়মিত কলহ বোধ হয় সাধারণ মাত্রা ছাড়াইয়া একটু উপরে উঠিয়াছিল, তাহার ফলে সে রাত্রে নৃত্যকালী কিছুই খায় নাই, কেহ সেজন্য পীড়াপীড়িও করে নাই।

তার উপর একাদশীর সারাদিনের কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে সন্ধ্যার সময় তাহার হাত-পা যেন ঝিমঝিম করিতে লাগিল। কণ্ঠতালু অনেক আগেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এবং মর্ম্মস্থলের একটা অব্যক্ত কাতরতা মুখ ফুটিয়া বাহির হইবারও পথ পাইতেছিল না।

পাড়াসম্পর্কে এক ঠানদিদি মাঝে মাঝে এই ভাগ্যহারা মেয়েটীর কাছে আসিয়া দু'-একটা গল্প-সল্প করিতেন। তাঁহার গাছে একটা বড় পেঁপে পাকিয়াছিল, দ্বাদশীর সকালের জলযোগের জন্য সেইটীই নৃত্যকালীর জন্য কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া তিনি যখন রাত্রে আসিলেন, নৃত্যকালীর চক্ষু তখন কপালে উঠিয়াছে। ঠানদিদির হৃদয়টা পাষাণ দিয়া গড়া ছিল না, তাঁহার চোখে জল আসিল। পেঁপেটী রাখিয়া নৃত্যকালীর মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি বলিলেন, "ছেলেমানুষ,

তোমার এতে কোন দোষ হবে না ভাই, একটু গঙ্গাজল মুখে দাও।”

ঘরের একটা কুলুঙ্গীতে ঘটীপোরা গঙ্গাজল ছিল, নৃত্যকালী আঙ্গুল দিয়া ঠানদিদিকে দেখাইয়া দিল। ঘটীটা তিনি আনিয়া দিলেন; এক নিঃশ্বাসে এক ঘটী জল পান করিয়া একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, আঃ!

বাড়ীর সেজ-বৌ হঠাৎ কি দরকারে সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, ঘরে কাহার কথার শব্দ শোনা যাইতেছে বুঝিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিলেন। গোপন করিবার কিছুই ছিল না, গঙ্গাজলের ঘটী এবং পাকা পেঁপে দেখিয়া তিনি অনেকখানি অনুমান করিয়া গেলেন। ঠানদিদি চলিয়া গেলেন, কিন্তু তারপরে এক ভয়ানক ব্যাপার! বাড়ীর বড়, মেজ, সেজ, ন, নূতন প্রভৃতি মেয়ে ও পুরুষ যতগুলি ছিল, সবগুলি জটলা করিয়া সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বড়-বৌ এক লাথি মারিয়া পেঁপেটাকে ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘটীটাকে হাতে করিয়া অনর্গল ভাষায় যাহা বলিয়া গেলেন, আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুধারার চেয়ে তাহার উষ্ণতা কিছুমাত্র অল্প নহে। মেজ বৌ আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি নৃত্যকালীর চুল ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া বলিলেন, “ওলো, অ সর্ব্বনাশী, রাক্ষুসী, একাদশীর দিন ঘটীপোরা জল আর পাকা পেঁপে খেয়ে তুমি বাড়ীর অকল্যাণ করবে—সৃষ্টিখাগী—”

এ রহস্যের আবিষ্কারকর্ত্রী সেজ-বৌ—তিনি বড় বেশী কথা কন না, তিনি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া জানাইলেন যে, স্বামীকে ভক্ষণ করিয়াও যাহার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই, একটা পেঁপে ও এক ঘটী জল ত তাহার কাছে তুচ্ছ জিনিষ! এই বাড়ীটাকেই কোন্‌দিন সে তাহার জঠরে দেয় তাহাই ভাবনা।

আর বেশী কিছুর প্রয়োজন ছিল না, নৃত্যকালী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

তাহার মূর্চ্ছা সত্য কিংবা ভাণ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কেহ তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া দেখিল, কেহ চিমটী কাটিয়া কৌতুক অনুভব করিল।

চার

মূর্চ্ছাটা যখন ভাঙ্গিল, রাত্রি তখন নিশুতি। ঘরে আলো জ্বালিবার প্রয়োজন কেহই অনুভব করে নাই। নৃত্যকালী আস্তে আস্তে বসিতে চেষ্টা করিল—মাথাটা তখনো ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে; সর্ব্বাঙ্গ বেদনায় টলটল করিতেছে।

এই সংসারের ছোটবড় সবগুলি কাহিনী তাহার মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই জীবন?—কোথায় কি ভাবে ইহার পরিণতি? এই রকম করিয়াই কি সারা জীবনের দিনগুলি কাটাইতে হইবে? চক্ষে তাহার জল ছিল না, চোখ দু'টা যেন অস্বাভাবিক রকমের জ্বালা করিয়া উঠিল। একবার ভাবিল, বাপের কাছে যাই, কিন্তু দরিদ্র পিতার গৃহস্থালীর কথা মনে হইল, এবং সেখানে গেলে তাঁহাকে যে কতখানি বিপন্ন করা হইবে, সে কথাও ভাবিতে দেরী হইল না। তবে? গঙ্গার শীতল জল? সেই কি সবচেয়ে ভাল?

নৃত্যকালী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; সর্ব্বশরীর তাহার তখনও কাঁপিতেছে। বাহিরে আসিয়া চারিদিক একবার চাহিল, তারপর বাড়ীর সদর দরজাটা আস্তে আস্তে খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইল।

গঙ্গার ঘাট বেশী দূরে নয়; পথও তাহার অজানা নহে। ঘাটের কাছে আসিয়া দেখিল, একটা জেলে নৌকায় আলো জ্বালিয়া বোধ হয় মাছ ধরিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অন্ধকারে হঠাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, “কে গা! কোথায় যাবে?”

নৃত্যকালীর মুখ দিয়া যেন আপনা হইতেই

বাহির হইল, "গোলাগাঁয়ে যাব। কোন্ রাস্তা দিয়ে যাব গো ?"

"গোলাগাঁয়ে ? এই তো রাস্তা গঙ্গার ধার দিয়ে গিয়েছে। এইমাত্র তো গোলাগাঁয়ের কাদের মোল্লার গাড়ী এই পথে গেল।"

গোলাগাঁয়ের কাদের মোল্লা ! নৃত্যকালীর মন যেন নাচিয়া উঠিল। তাহার বাপ তো তাহার দোকানেও খাতা লেখেন। বৃদ্ধ কাদের বহুবার তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে। তাহার ছেলেবেলায় কতবার তাহাকে কোলে করিয়া আদর করিয়াছে, কত পুতুল দিয়াছে। সেই কাদের মোল্লার গাড়ী এই পথ দিয়াই একটু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে ! নৃত্যকালীর দেহে যেন শক্তি ফিরিয়া আসিল, সে রাস্তা দিয়া দ্রুত চলিল।

জেলেটা অবাক হইয়া গিয়াছিল। নৃত্যকালী চলিয়া যাইবামাত্র তাহার খেয়াল হইল যে, এত রাত্রে ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, গঙ্গার ঘাটে, ব্যাপারটা কি ?—চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাদের বাড়ীর গা ?"—কিন্তু নৃত্য তখন অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে। জেলেটা একবার ভাবিল অনুসরণ করি, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে একটা মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিবার অভিজ্ঞতালাভ তাহার হইয়াছিল, সেই কথা মনে করিয়া সে নৌকার দড়ি খুলিয়া নিজের কাজে গেল।

পাঁচ

দীনু ভট্টাচার্য্যের নিত্য অভ্যাস ছিল সকাল-বেলা নদীর ধারে অপেক্ষা করিয়া জেলেদের নিকট হইতে বিনামূল্যে কিছু মৎস্য সংগ্রহ করা। অনেকে এজন্য বিরক্তও হইত, কিন্তু বৃদ্ধব্রাহ্মণের মুখের উপর কেহ কিছু বলে নাই।

অভ্যাসমত দীননাথ একটী কচুর পাতায় মাছগুলি লইয়া সাবধানে আসিতেছিলেন, হঠাৎ পশ্চাতে গরুর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া পথ ছাড়িয়া একপাশে দাঁড়াইলেন।

গাড়ীখানি তাঁহার সম্মুখে আসিলে আরোহীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীননাথ বলিলেন, "মোল্লা-সাহেব দেখছি। কোথা থেকে ? সদরে গিছলেন নাকি ?"

বৃদ্ধ কাদের মোল্লা আদাব জানাইয়া বলিলেন, "না, সদরে নয় ভটচায্যি-মশায়। গিয়েছিলাম একবার কাজিরবেড়ের আড়তে। কতকগুলো দেনা-পাওনার ব্যাপার—"

গাড়ীর ভিতরের দিকে একবার কৌতুহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দীননাথ বলিলেন, "সঙ্গে কে ? ছেলের বউ বুঝি ?"

"না। ওটী হচ্ছে আপনাদের হরিগোপাল চাটুয্যের মেয়ে।"

মাছের পাতাটা আর একটু হইলেই পড়িয়া যাইত, দীননাথ সেটীকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "কার মেয়ে বল্লেন ?"

"আপনাদের গাঁয়ের হরিগোপাল চাটুয্যের।"

"হরিগোপাল চাটুয্যের ? আমাদের হরিগোপালের ?—কোন্ মেয়ে ?—তার তো—আপনি—কি রকমটা—" দীননাথের কথাগুলি জড়াইয়া গেল।

"কাজিরবেড়ের যার বিয়ে হয়েছিল, সেই মেয়ে ?"

দীননাথের চক্ষু কপালে উঠিল। "অ্যাঁ! তা', আপনার সঙ্গে—"

একটু হাসিয়া কাদের মোল্লা বলিলেন, "হ্যাঁ, সে অনেক কথা ভটচায্যি-মশায়। এরপর শুনবেন 'খন।" বলিয়া গাড়োয়ানকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

"অনেক কাহিনী ? কিন্তু—" দীননাথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল।

ছয়

হরিগোপালের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দীননাথ যখন পৌছিলেন, তখন একটা অস্বাভা-

বিক উত্তেজনায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। অনেকটা পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়, কাজেই যখন আসিলেন, কাদের মোল্লা তখন গাড়ী লইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিয়া দীনু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এসব কি হরিগোপাল?"

হরিগোপাল কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দীননাথ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কোন কথা আমি শুনতে চাই নে, কাজীরবেড়ের বাড়ুয্যে-বাড়ীর মুখে যে কালী দেয়, সদর রাস্তা দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে এক গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যার প্রবৃত্তি হয়, সেই মেয়েকে তুমি ধুলো পায়ে বিদেয় করবে কি না তাই আমি জানতে চাই। উঃ! এই সব বেঁচে থেকে দেখতে হবে?"

নৃত্যকালী তখনও হতভম্বের মত সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল, বাপ একবার মেয়ের দিকে, আর একবার দীনু ভট্টাচার্য্যের দিকে সভয়ে চাহিলেন। মেয়েটী বলিল, "আমাকে আগে একটু জল দিয়ে বাঁচাও বাবা, তারপর তাড়িও। আমার গলা শুকিয়ে গেল!"

দীনু মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "শুকিয়ে গেল বই কি! খবরদার হরিগোপাল, একফোঁটা জল নয়। এই অজাতে মেয়েকে যদি তুমি একফোঁটা জল দাও, কিংবা ওর সঙ্গে একটা কথা কও, তা' হ'লে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রে তবে আমি ছাড়বো তা' বলে দিচ্ছি। হারামজাদী, সয়তানী! আবার জল খেতে এসেছে! বিষ খেতে পারিস নি? জলে ডুবে মরতে পারিস নি? বাঁড়ুয্যে-গুষ্ঠীর নাম ডুবিয়ে,—থাকতো আজ নবাবী-আমল, ওকে কোমর পর্য্যন্ত পুঁতে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়ালে তবে গায়ের জ্বালা যেত।"

হরিগোপাল আস্তে আস্তে উঠিলেন। মেয়েটীর হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন।

দীনু ভট্টাচার্য্য আবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গেরাহ্যি হলো না আমার কথা। এক্ষুনি পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দিয়ে সব ছারে-খারে দেব তা' জানো হরিগোপাল?

কিন্তু সময়ে সময়ে অঘটনও ঘটিতে দেখা যায়। নিরীহ ভালমানুষ হরিগোপাল হঠাৎ আবার ফিরিয়া আসিয়া এক হাতে দীনু ভট্টাচার্য্যের কাণ আর এক হাতে তাহার গলাটী ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে আনিয়া রাস্তার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া দিলেন।

পরদিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—হরিগোপালের বাড়ীর সদরদরজায় তালা বন্ধ।

—কবিতা—

শ্রীবগলা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বাপ বলিলেন—তা' হ'লে মামার বাড়ীই যাও, —কোলকাতায়।

সুকুমার তার ম্লান দৃষ্টি পিতার মুখের উপর তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

কেন? এখানে থাকলে তোমার পড়াশুনা কিছুই হবে না—সেইজন্যে। কবিতা লিখতে পার—সে ভাল কথা, কিন্তু তা' দিয়ে পেট ভরবে না। ম্যাট্রিক পাশটা করো, কলেজে যাও, অক্ষর গুণবার দিন আপনিই পাবে।

সুকুমার নতনেত্রে চুপ করিয়া রহিল। বাপ বলিয়া চলিলেন—এখন ওসব বাজে কাজে হাত দেবার আগে, এই কথাটা ভুলো না, তোমার মাকে, আমাকে, ভবিষ্যতে বাঁচিয়ে রাখবার দায়ীত্ব তোমারই। এই বয়েসেই কাব্যির খপ্পরে পড়ো না।

সুকুমার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—যাবো আমি কোলকাতা।

হ্যাঁ, যাবেই ত। সেইজন্যেই আমার আরো বিশেষ চেষ্টা করে পাঠানো। নইলে লেখাপড়া এখানে তোমার যা হ'তো, তা নেহাৎ মূর্খের মত নয়। কিন্তু তোমার কাঁধ থেকে ওই ছন্নছাড়া ছন্দ-ভূতটাকে না তাড়াতে পারলে, তোমার আর রক্ষে নেই। আর আশ্চর্য্যের কথাও বটে,—যত রাজ্যের কবিত্ব কি এই পাড়াগাঁয়েই ফোটে, কোলকাতায় ত এসব কিছু নেই। আর হবেই বা কোত্থেকে,—সেটা হ'লো গিয়ে রাজধানী, গরুর গোয়াল ত নয়।

একটা উদ্ধত প্রতিবাদের ভঙ্গীতে মাথা তুলিতেই সুকুমার দেখিল,—তাহার মা, সম্মুখস্থিত রান্নাঘরের দাওয়া হইতে, তাহাকে স্থান ত্যাগের ইঙ্গিত করিতেছেন। আর একটীও কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সত্যিই সুকুমারের প্রতিভা ছিল।

ছেলেবেলা হইতে, মা বাপের একমাত্র সন্তান বলিয়া, পরিপূর্ণ প্রশ্রয়ের দ্বারা লালিত হইয়া, তাহার মধ্যে একটা অবাধ কল্পনা শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল। সহজাত রসবোধের রূপকাঠিতে তাহাকে ছন্দের আকারে গাঁথিয়া তুলিয়া, সে একটী বিস্ময়কর অপরূপ জগতের সন্ধান পাইল, এবং সেইদিন হইতে দৃশ্য কায়ালোক হইতে তাহার মন কেবলই অদৃশ্য মায়ালোকের মর্ম্ম-কোষের চারিধারে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

কিন্তু শিক্ষক বলিয়া একশ্রেণীর মানুষ সংসারে আছে। দুর্নিবার নিষ্ঠুর নিয়তির মতই, সকল ব্যথা, বেদনা ও মমতাকে অতিক্রম করিয়া, কল্পনাবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া, ঝুনা নারিকেল যেমন করিয়া কচি ডাবের ধর্ম্মনষ্ট করে,—তেমনই করিয়া, শৈশবের বৈচিত্র্যময় লীলাকে, বস্তুতন্ত্রের প্রাচীন খাদে প্রবাহিত করিয়া দেওয়াই ইঁহারা কর্ত্তব্য মনে করেন। দিনের পর দিন ধরিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার মত একটা শাশ্বত অধিকা-রের দম্ভে রক্ত মাংসের মানুষকে অগ্রাহ্য করিবার মোহ।

ইঁহারা যখন বুঝিলেন,—সুকুমার কবিতা লিখিতে শিখিয়াছে এবং ভাল লিখিতে শিখিয়াছে,—তখনই স্থির হইয়া গেল যে, অতঃপর

সুকুমারের দ্বারা পৃথিবীর কোন সৎকাজই সম্ভব নয়। সহকারী প্রধান শিক্ষক মশায় ত স্পষ্টই বলিলেন—ও যদি ম্যাট্রিক পাশ কোরতে পারে তো আমার নাম বদ্‌লে দিও।

এমনই একদিনে সুকুমারের পিতা, পুত্রের পড়াশুনার থবর লইতে গিয়া জ্ঞানচক্ষু লাভ করিলেন। প্রধান শিক্ষক বলিলেন—

সুকুমারকে কোন রকমে কোলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা কোরতে পারবেন না ?

কেন ?

—কারণ এখানে ওর আর কিছু হবে না।

—হেতু ?

—কবিতা।

কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া সুকুমার ফেল্ করিল।

কলিকাতার মত সহর, লেখাপড়ার চরম উৎকর্ষতা যেখানে,—সেখানে যে-ছেলে ফেল্ করে,—ভবিষ্যতে তাহার হইবে কী !

কারণটা কিন্তু সামান্য।

উন্মুক্ত পল্লী-জীবন হইতে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া, সুকুমার অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল। বেশী কষ্ট পাইতে হইল না, কতকগুলি সমপর্য্যায়ের আধুনিক সাহিত্যিকের সাহচর্য্যে তাহার কবি-চিত্ত তৃপ্ত হইল।

গেল পড়াশুনা, গেল তাহার নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি।

অবিশ্রাম শব্দের পর শব্দ যোজনা করিতে করিতে দেখা গেল, প্রবেশিকা পরীক্ষা হু হু শব্দে দিন-রাত্রির বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া আসিতেছে। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পরীক্ষা দিয়া সে ফেল করিল।

কিন্তু এই যে ফেল্ হওয়া, যাহার মত লজ্জার ব্যাপার আর দ্বিতীয় নাই—তাহা সুকুমারকে লজ্জিত করিতে পারিল না। মামা লজ্জিত হইলেন, দেশে বাপ-মা লজ্জিত হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, এত বড় একটা অপদার্থ পুত্রের জন্ম দিয়া হয় ত জগতের বিপুল ক্ষতিই তাঁহারা করিয়াছেন।

মামা বলিলেন—আবার পড়ো।

সাহিত্যিক বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে—কি হে সুকুমার, ফেল কোরলে কেন ?

সুকুমার বলে—দেখুন, মানুষের ফেলের পরিমাণে তার প্রতিভা প্রমাণিত হয়—বিশেষতঃ কবির। বস্তুতন্ত্রের মোহ আজও যে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ গ্রাস কোরতে পারে নি—আমি তারই একটা উদাহরণ দিলাম।

বন্ধুরা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে—আর যে কবি একেবারেই পাশ কোরতে পারলে না ?—

সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

বাপ মামাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "পরীক্ষায় শ্রীমানের অকৃতকার্য্যতার জন্য মর্ম্মাহত হইয়াছি। যাহা হউক, আর একবার সে চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক কি না জানাইও! আর একটা কথা, তোমার ভগ্নীর একান্ত ইচ্ছা, এই সময় তাহার বিবাহ দেন। কলিকাতায় একটী সুন্দরী অল্পবয়স্কা পাত্রীর সন্ধানে থাকিও।"

এটা নূতন।

রক্ত-মাংসের সজীব নারী, আর অক্ষরব্যূহের কল্পিত নারী—অনেকখানি তফাৎ। তাই সুকুমার বিবাহের প্রস্তাব শুনিবামাত্র, সমস্ত দেহের শিরা-উপশিরার মধ্য হইতে একটী আকাঙ্ক্ষিত আবেদন শুনিতে পাইয়া প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। পাত্রী স্থির হইয়া গেল।

বিবাহের রাত্রেই সুকুমারের পিতা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শ্যালককে বলিলেন—একটা ব্যাপারে আমি সুকুর ওপর হাড়ে চটে গেছি। ছি—ছি—ছি,—ব্যাটা আমার বংশের নাম ডোবালে! ওই এক-সভা লোকের মাঝে—তারা কি ভাবলে বল ত? মেয়েটা সভায় আস্‌বামাত্তর ব্যাটা সেই যে ড্যাব্‌ড্যাব্ ক'রে চেয়ে রইল, তা' আজও রইল, কালও রইল—যেন পুরীতে সূর্য্যোদয় দেখছে। এই ব্যাপার দেখে সকলেই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। আমার এক নিজের মৃত্যু কামনা ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না।

মা'ও চুপ, মামা'ও চুপ।

কিন্তু বকুনির বিরাম নাই,—আরে বাবা বিয়েতো আমরাও করেছি। কিন্তু কই এমনতরো ফ্যাসাদে ব্যাপার তো জানতাম না। হাভ্তোর ছেলের নিকুচি করেছে। অনেকক্ষণ পরে মা জিজ্ঞাসা করিলেন—

—আচ্ছা এর মানে কী? মামা একটু হাসিলেন—তারপর ছোট্ট করিয়া বলিলেন—মানে আবার কী,—কবিতা।

পাঁচটী বছর পরে।

সুকুমার বি-এ পাশ করিয়াছে—কলিকাতায় খানতিনেক ঘর ভাড়া করিয়াছে, বাপ-মা দুই-ই হারাইয়াছে,—পরিবর্ত্তে শ্বশুর-শাশুড়ী পাইয়াছে, এবং আরও অনেক কিছু হারাইয়াছে ও পাইয়াছে। জীবনের রথখানি সমতল ও সহজ রাস্তা ছাড়িয়া, অসমতল ও বন্ধুর পথে প্রবেশ করিয়াছে।

সুকুমারের শ্যালক তারাপদ আসিয়া বলে—কিছুই যে করছো না সুকুমার, তোমার হবে কী বল ত? সুকুমার হাসে।

তারাপদ বলে,—তোমার ওই নির্ব্বিকার হাসি দেখলে আমার রাগ ধরে। দায়ীত্ব জিনিষটা কি হেসে উড়িয়ে দেবার হে? স্ত্রী, পুত্র, জানি এদের দাম তোমার জীবনে নেই। তা' সত্বেও এই অনুরোধ করছি, যে ওরা তোমার চোখের ওপর না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, এটা তুমি দেখো না।

সুকুমার বলিল—এখনও আপনার বোধ হয় চা খাওয়া হয় নি দাদা? না-না সে কি হয়! ও ইন্দু-দাদাকে একটু চা দাও না।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই সুকুমারের স্ত্রী ইন্দু চা লইয়া আসিল। তারাপদ সবে একটীমাত্র চুমুক দিয়াছে—এমন সময় সুকুমার বলিয়া উঠিল—দাদা বোধ হয় আমার নতুন লেখাটা দেখেন নি—যেটা "রক্ত-উষা"য় বেরিয়েছে? বলিয়াই তাহাকে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া কাগজখানা টানিয়া লইয়া, তাহার নব-প্রকাশিত কবিতা "কবিতাময়ী" পড়িতে লাগিল।

তারাপদ আবিষ্কার করিল,—বাজারে জোচ্চুরী চলিতেছে, নিমপাতা শুকাইয়া কেহ কেহ চা বলিয়া চালাইতেছে।

কিন্তু এই রকম ভাবে চাকরীকে অস্বীকার করিয়া আর বেশীদিন চলিল না, শীঘ্রই এমন দিন আসিয়া পড়িল, যখন সুকুমারকে বুঝিতে হইল, সংসারে ছন্দের চেয়ে অর্থের প্রয়োজনই বেশী।

তারাপদরই দেওয়া একটী চাকরীতে সুকুমার ঢুকিল। মাহিনা খুব বেশী না হইলেও, তাহাতে দুইটি প্রাণীর অকুলান হয় না। চক্রে তৈল পড়িতেই দিনগুলি বেশ অবারিত গতিতে কাটিতে লাগিল।

মাসের প্রথম, সুকুমার মাহিনা পাইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া টাকাগুলি স্ত্রীর হাতে দিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ গা, দশটা টাকা কম কেন?

সুকুমার তখন একমনে একটী নূতন প্যাকেটের বন্ধনমোচন করিতেছিল, বলিল—খাবোই না।

ইন্দুর মনে হইল, কয়েকদিন পূর্ব্বে সে স্বামীকে একটী ব্লাউসের কথা বলিয়াছিল, হয় ত—

আগাইয়া গিয়া দেখিল—প্যাকেটের ভিতর কয়েকখানি টাট্‌কা কবিতার বই। চোখে বোধ হয় জল আসিতেছিল, তাহাই রোধ করিতে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুকুমার আপন-মনে বইগুলির পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

কিন্তু কবিতার রস একবার যাহার ভিতর ক্রিয়া আরম্ভ করে,—তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট রাখে—সংসারের প্রয়োজন পূরণের কাজে তাহা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।

প্রত্যেকদিন আপিসে গিয়াই তাহার মনে হয়, সে শুধু পণ্ডশ্রম করিয়া মরিতেছে মাত্র। অনুরাগ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, উৎসাহ নাই,—কেবল কাজের খাতিরে কাজ করিয়া সে বিধাতার কাছে অপরাধীই হইতেছে।

ভাবে,—ঈশ্বর বৃদ্ধ হইয়া, বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। নহিলে কবিকে তিনি করিলেন দরিদ্র—উদয়াস্ত খাটিয়া তাহাকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, আর ধনীকে করিলেন অ-কবি।

বিপরীত চিন্তার গোলমালে হিসাবের খাতায় এক লাইন কবিতা লিখিয়া ফেলিয়া—তাহার পরদিনই তার চাকরী গেল।

শ্বাশুড়ী শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—পুত্র তারাপদকে ডাকিয়া বলিলেন—আমার ইন্দু যে এমন একটা অপদার্থের হাতে পড়বে—এ যে আমি স্বপ্নেও জানতুম না বাবা। লেখাপড়া শিখল—বি-এ পাশ কোর্‌ল,—কিন্তু কী যে ওর হ'লো, কোনখানেই কি টিকতে পারছে?

তারাপদ বলিল—পারবেও না। রোগের ধাত কি না।

শ্বাশুড়ী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—রোগ! সে আবার কী?

কবিতা।

সুন্দরী ধরণী বৎসরে বৎসরে রূপে রসে গানে গন্ধে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। দিনযাপনের আনন্দ কলরব। অন্ধকার তমসার একপারে চলে উৎসব—অন্যপারে আর্ত্ত-রোদন।

সুকুমার কবি। সত্যিকারের কবিত্ব প্রতিভা লইয়াই সে জন্মিয়াছিল। যে গোপন সঙ্কেতে ইন্দ্রধনু উঠে,—বনে বনে বসন্ত হিন্দোল জাগে, তাহার মর্ম্মকথাটী সুকুমার জানে। কিন্তু বাস্তব জীবনে কোন প্রয়োজনেই ইহা লাগিল না। জনমতের কষ্টিপাথরে সে মেকী প্রমাণ হইয়া গেল। লোকে বলে—কবিতাতে লোকটাকে একেবারে গ্রাস করেছে—ওর চলনে কবিতা, বলনে কবিতা,—দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা ওর ছন্দে বাঁধা। কিন্তু কবি হওয়া কি একটা খেলা? কবিত্ব কি এতই সুলভ যে, যখন তখন, যেখানে সেখানে কবিকে বাদ দিয়াও মানুষটা লাঞ্ছিত হইবে? যখন সুকুমারের শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, হিতৈষী বন্ধুবান্ধব মিলিয়া সুকুমারকে তাহার ওই দুষ্প্রাপ্য কবিত্ব সম্পদের জন্য লাঞ্ছিত করেন,—যখন ওর অক্ষমতার,—ব্যর্থতার অজুহাতে কাব্যকে অভিশাপ বলিয়া বর্ণনা করেন, তখন সে কিছুই বলে না, কেবল মুখখানি ম্লান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে বলে—

—ভাললোকের জন্যে পৃথিবী কবে নিরাপদ হবে ইন্দু?

ইন্দু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে।

সেদিন ছিল রবিবার।

বর্ষাকাল। সারাটাদিন আকাশ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, সন্ধ্যার পরও থামিবার কোন লক্ষণ নাই।

সুকুমার তার নিজের ঘরটীতে চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল। কী যে ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে। ইন্দু ইতিমধ্যে দুই-তিনবার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কিছু বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া, ফিরিয়া আসিয়া সুকুমারের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল,—বলিল,—কি ভাবছ?

সুকুমার চমকিয়া উঠিল,—বলিল, না, ভাবছি নে কিছু। কাজ সারা হ'ল?—

—হয় নি এখনও,—ভাত চড়িয়ে এসেছি।

—তা হলে বোস,—একটা কবিতা শোনাই আজ তোমাকে।

—শোনাও,—কিন্তু আমাকে আবার এখুনি উঠ্‌তে হবে যে?

সুকুমার 'চয়নিকা' খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়,
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

পড়িতে পড়িতে সুকুমার স্থান কাল ভুলিয়া গেল।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব;
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে;
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।
আঁধারে মিশে গেছে আর সব॥

ভাত পুড়িয়া যাইবে বলিয়া ইন্দু উঠিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—স্বামী তখনও ঠিক সেই জায়গায় বসিয়া সুর করিয়া করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন।

তাহার রাগ হইয়া গেল। এ কি, এক অনাছিষ্টি মানুষের সঙ্গে বাপ-মা তার বিবাহ দিয়াছে বাপু! স্ত্রী গেল, সংসার গেল চুলোয়, কেবল বসিয়া বসিয়া ওই পদ্যগুলা মুখস্থ করিতে দাও—ব্যস্, তা' হইলে আর কিছুরই দরকার নাই।

ধীরে ধীরে স্বামীর নিকট গিয়া, একটু কঠোর-কণ্ঠেই বলিল,—"বলি খেতে-দেতে আজ হবে—না, না? সুকুমার চাহিল—বলিল,—উঠে গেছ কখন?

ইন্দু হাসিয়া ফেলিল—বেশ! তোমার আর কোন আশা নেই। দাদা কি আর সাধে বলে যে, ঐ এক জিনিষেই তোমাকে মাটী করেছে।

—কি জিনিষ?

—আমি জানি না বাপু—যাও।

—আমি কিন্তু বল্‌তে পারি ইন্দু। ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমার অনেকক্ষণ জানালার বাহিরে বর্ষা-সিক্ত অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল— কবিতা—না ইন্দু?

ইন্দু সবিস্ময়ে দেখিল,—তাহার স্বামীর চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল ঝরিতেছে।

যে অদৃশ্য দেবতার ক্রুর ইঙ্গিতে সুকুমারের জীবন-নাট্য এইরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছিল—তাঁহার শেষ আঘাত আসিয়া পড়িল—কবির জীবনে ছন্দ-পতনরূপে।

প্রসব করিবার পরদিন হইতে সেই যে ইন্দু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সতেরো দিন পরেও তাহার অবস্থার একটুও ব্যতিক্রম হয় নাই। অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতেছে।

সুকুমারের শ্বশুর-শাশুড়ী এই অসময়ে জামাতাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু লজ্জায় তাঁহার মেয়ের নিকট যাইতে পারেন নাই।

কারণ, সুকুমার চব্বিশ ঘণ্টা ইন্দুর কাছটীতে বসিয়া রহিয়াছে।—হাজার হোক্ জামাই ত।

অত্যধিক রাত্রি জাগরণে সুকুমারের চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। সময়ে খায় না, নায় না,—যেন মরিয়া।

শ্বশুর আসিয়া বলিলেন—তুমি একটু ঘুমোও গে বাবা—আমি ততক্ষণ বসি।

সুকুমার হাসিল, বলিল—না, আমার কষ্ট হচ্ছে না। আপনারা ত রয়েছেনই, দরকার হ'লে ডাক দেব।

শ্বশুর, শ্বাশুড়ীকে গিয়া বলিলেন—গ্যাখ সুকুমার কবিতা লিখুক আর নাই করুক—ইন্দুর সেবাটা যা' করলে—আশ্চর্য্য।

শ্বাশুড়ী চোখের জল মুছিলেন—আহা! তা' আর করবে না—স্ত্রী ত।

সেইদিন বৈকাল হইতেই ইন্দু ভুল বকিতে সুরু করিল। একবার সুকুমারকে বলিল—আমি মরে গেলে আবার বিয়ে করবে তো? আবার বলিল—তা' কোরো, কিন্তু গ্যাখো,—কবিতা লেখা তুমি ছেড়ো না। শুনছো? ছেড়ো না।

লক্ষণ ভাল নয় বুঝিয়া তারাপদকে খবর দেওয়া হইয়াছিল। সে যখন আসিয়া পৌঁছিল, সুকুমার তখন ইন্দুর বুকের উপর পড়িয়া 'ইন্দু', 'ইন্দু' করিয়া ডাকিতেছে। তারাপদকে দেখিয়া বলিল—দাদা, আপনি একটু বসুন—আমি এক্ষুণি আসছি। বলিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নবজাত সন্তানটী আগেই মরিয়াছিল। তাহার অনুসরণ করিতে ইন্দুও দেরী করিল না। বাড়ীময় কান্নার রোল উঠিল। পরিচিত প্রতিবেশীরা সময় হইয়াছে বুঝিয়া, গামছা কাঁধে লইয়া,—একে একে উপস্থিত হইলেন! কিন্তু সেই হট্টগোলে সুকুমারকে কোথাও পাওয়া গেল না।

শ্যালক বলিল—আমি একটু দেখি সুকু গেল কোথায়?

ছাদের যে কোণটীতে চাঁদের আলো পড়ে নাই, সেইখানে বসিয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া সুকুমার আবৃত্তি করিতেছিল—

যত ব্যথা পাই তত গান গাই গাঁথি যে
সুরের মালা।
ওগো সুন্দর নয়নে আমার নীল
কাজলের জ্বালা॥
এই ধরণীর বেদনানিবিড় সবুজ অন্ধকারে
পথ ভুলি বারেবারে—
কণ্টকে ফোটে রক্তকুসুম বাসনা সুরভি ঢালা॥

তারাপদ আসিয়া ঠিক পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে সুকুমারকে কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়া রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সেখানে আর মুহূর্ত্ত মাত্র না দাঁড়াইয়া, দ্রুতবেগে,—যেখানে ইন্দুর মৃতদেহ লইয়া, আত্মীয়-প্রতিবেশীগণ বিলাপ করিতেছিল—সেইখানে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল—পিশাচ কোথাকার!

সকলে কান্না ভুলিয়া—কথাটার অর্থ খুঁজিবার জন্য তারাপদর মুখের দিকে চাহিল।

শ্বশুর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সুকুকে পাওয়া গেল না?

তারাপদ ফাটিয়া পড়িল।

—পাওয়া যাবে না কেন, বাবুসাহেব ছাদের কোণে বসে বসে কবিতা আওড়াচ্ছেন।

—ক-বি-তা!

যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা তখনও দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও স্তম্ভিত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

—নৈপথ্য—

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছয়

বীরেন সেই যে জামাই সাজিয়া বাহির হইয়া গেল আর তাহার ফিরিবার নাম নাই।

সমস্ত মেস্‌টা নিঝুম—কেহই ফিরে নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সুধাকে এই সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখিয়া এত ঘটা করিয়া বীরেনের এখন গঙ্গার হাওয়া না খাইলে কোনো ক্ষতি ছিল না। হয় ত' মাসির বাড়ি সে একা-ই সন্দেশের থালা সাবাড় করিতেছে। এত বড় স্বার্থপর দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের কথা আগে কখনো শুনিয়াছে বলিয়া সুধার মনে হইল না।

চাকর টেবিলের উপর একটা ভাঙা লণ্ঠন রাখিয়া সেই কখন অদৃশ্য হইয়া গেছে। আর তাহার টিকি-টিও দেখা যাইতেছে না। গলা বাড়াইয়া যে ডাকিবে এমন সাহসটুকুও সুধা হারাইয়া বসিল। তাহাকে পাইলে কিছু বক্‌শিস কবুল করিয়া একবার গঙ্গার ঘাটে পাঠাইয়া দিত। চুপি-চুপি সে নিজেই বাহির হইয়া পড়িবে নাকি? ভাবিতেও সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠে।

স্বল্পালোকিত বিশৃঙ্খল ঘরের মধ্যে বন্দিনী সুধা বীরেনের প্রতীক্ষায় ঘামাইয়া উঠিতেছে। গলির ও-প্রান্তের ঘরটির কোলাহল মুহূর্ত্তর হইতে হইতে স্তব্ধ হইয়া গেল। জানালায় ও-বাড়ির বউটিই বোধকরি আসিয়া দাঁড়াইল—সমস্ত দিন-রাত্রির পরিশ্রমের পর ঐ জানালাটুকুই বোধ করি তার মুক্তি! তাহাকে পাইয়া সুধা যেন শূন্য প্রান্তরে দীপ দেখিল। তক্তপোষটা ডিঙাইয়া জানালার সমীপবর্ত্তী হইতে না হইতেই বধূটি কি ভাবিয়া যে সহসা তাহার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল সুধা বুঝিল না। মনে হইল সে ভয় পাইয়াছে।

ভয় পাইয়াছে! সত্যিই ত'। বীরেন যদি আর ফিরিয়া না আসে, যদি সোজা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতার মুখে উধাও হয়! ভয়ে সুধার মেরুদণ্ড শিব্‌শিব্ করিয়া উঠিল। পূরা একটা দিন হয় নাই, ইহারই মধ্যে তাহারা মুখোস্ খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল কেন? এত স্পষ্ট এত রুক্ষ! কিন্তু এ সংসারে বীরেন ছাড়া তাহার আর গতি কৈ? সে খামোকা এমন মেজাজ দেখাইতে গেল কোন্ সাহসে? জুতায় পেরেক্ উঠিলে তাহাকে ঠুকিয়া সমান করিয়া নিতে হয়; পেরেক্ যদি বরাবর রুখিয়া থাকে তবে পা তাহাকে বহন করিবে কেন,—ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। নিশ্চয়।

তাড়াতাড়ি পেছন চাহিতেই সুধা দেখিল পেছনের দেয়ালে তাহার প্রকাণ্ড একটা ছায়া পড়িয়াছে। ছায়াটা যেন তাহার ভবিষ্যতের ভয়াবহ অনিশ্চিততার প্রতীক। ভয় পাইয়া সে তাড়াতাড়ি বালিশের তলা হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া সেমিজের তলায় বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিল। সে সত্যিই কি মনে মনে বীরেনকে এতখানি আকর্ষণ করে না যে, সে নিতান্ত বিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই তাহার দেহের দুয়ারে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে? সুধার এত সুনিবিড় সাধনা কি একেবারেই উড়িয়া যাইবে নাকি? সে যাহার জন্য পরিচিত ঘর-দোর ছাড়িয়া বাঁকা অচেনা পথে পা ফেলিল, যাহার জন্য ললাটের সিঁন্দুরে

কুলটার কলঙ্ককে মহীয়ান ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, বিবাহের সমস্ত লৌকিক সাক্ষী ও উপচার অস্বীকার করিয়া সে যাহাকে তাহার জীবনে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের প্রতিভূজ্ঞানে গ্রহণ করিল—সেই স্বামী এত বড় একটা আত্মসমর্পণের মর্য্যাদা রাখিবেন না ইহা সুধা মরিয়া গেলেও মানিতে পারিবে না। হাঁ, স্বামীই ত' তিনি! এত বড় নির্ম্মুক্ত আনন্দোদ্ভাসিত আকাশের দর্পণে কোন্ মেয়ে ইহার চেয়ে সত্য করিয়া স্বামীর শুভদৃষ্টি লাভ করিয়াছে শুনি। বিপদের মধ্যে, বিপুল সম্ভাবনার মধ্যে, ফিরিয়া স্বপ্নময় স্বর্গের সৌধতলে ইহার আগে কবে কাহারা মিলিতে পারিয়াছিল! নিশ্চয়ই তিনি আসিবেন। এই আসিলেন বলিয়া। খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকিলেই সে দরজায় বীরেনের টোকা শুনিবে। হাঁ, ঐ ত' সিঁড়িতে তাঁহার জুতার শব্দ হইতেছে। আসুন, সুধা কক্খনো তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবে না, আদর করিয়া চুমা খাইতে চাহিলে বালিশে মুখ ডুবাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

তবু, দেয়লে তাহার সেই ঝাপ্সা ছায়াটা দেখিয়া কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, অমন করিয়া বাহির হইয়া না পড়িলেই বুঝি ভালো হইত। এক ফুঁয়ে সে কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া আসিয়াছে। এক ঘুমের পর সে যদি উঠিয়া দেখিতে পারিত যে কাল্‌কের রাত্রিটা ঝড়ের মুখে হাল্‌কা মেঘের মত উড়িয়া গেছে, আর সে, —কাশীতে ত্রিপুরা-ভৈরবীর মেস্‌এ নয় তাহাদেরই পটুয়াটোলা লেন্‌এর বাড়িতে দোতলায় মা'র ফটোর নীচে মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া সে শুইয়া আছে; এবং অবেলায় শুইয়া আছে বলিয়া পাশের ঘর হইতে মামিমা গলা চিরিতেছেন তাহা হইলে—দূর ছাই বিশ্বেশ্বর, সুধা মামিমার বকুনিকেই আরতির স্তোত্রের চেয়ে বেশি দামি মনে করিত। নিজের পেটের মেয়ে খোয়া গেলে মামিমা এমন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন নাকি? তিনি হয় ত' এখন আবার কেৎলিতে জল চাপাইয়া হাই তুলিতেছেন। ঘুণ্টু হয় ত আলো জ্বালিয়া উপক্রমণিকা পড়িতেছে। আজকে হয় ত' ধূনা জ্বালাইয়া সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই, রেলিঙের উপর শুকাইতে দেওয়া কাপড়গুলা হয় ত' তেমনি ঝুলিতেছে, মামাবাবুকে আজ কে তামাক সাজিয়া দিল? তাহার আজ কত কাজ বাকি, সে কি না বিছানায় গড়াইয়া গড়াইয়া আড়মোড়া ভাঙিতেছে? সুধা ধড়ফড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

যাক্, বাবুর এতক্ষণে হাওয়া খাওয়া শেষ হইল। জুতা মস্‌মসাইয়া সিঁড়ি ভাঙিতেছেন। আলোটা উস্কাইয়া সুধা যতদূর সম্ভব ভয়গ্রস্ত মুখখানা গম্ভীর করিয়া বীরেনের পরিচিত স্বর শুনিবার নিদারুণ আকাঙ্ক্ষায় কান দুইটা খাড়া করিয়া রহিল। সিঁড়ির জুতার শব্দ কোন্ দিকে আবার মিলাইয়া গেল না-জানি। কিন্তু না, দেরি করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই হয় ত' সে এখন চোরের মত অগ্রসর হইতেছে।

দরজাটা খুলিয়া গেল। সুধার বুক ঠেলিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস উঠিতে না উঠিতেই গলার কাছে আসিয়া আট্‌কাইয়া রহিল। ঘরে বীরেন নয়—ম্যানেজার, হেমন্ত। দুই মুঠার মধ্যে বিছানার চাদরটা আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া সুধা এই ব্যর্থ প্রত্যাশার ঘা সাম্‌লাইল। সে যেন এতক্ষণ এমনি একটা আতঙ্কময় আবির্ভাবের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল। সুধা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। লোকটা কোন কথা না কহিয়া নিতান্ত অভদ্রের মতন দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া চক্ষু দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিতেছে অনুভব করিয়া সুধা খেপিয়া উঠিল: হঠাৎ দোর ঠেলে আমার ঘরে ঢুকলেন যে—কি চাই আপনার?

হেমন্ত সামনের উঁচু দাঁত কয়টা বিকশিত করিয়া কহিল,—হেঁ হেঁ, আমার আবার কি

চাই? বল্‌তে এসেছিলাম যে আপনার বাবু ত' এখনো এলেন না—আপনার খাবারটা কি পাঠিয়ে দেব ওপরে? সবাই ত' খেয়ে-দেয়ে সাফ হয়েছে। আপনাদের জন্যে মেস্ আমি কতক্ষণ খোলা রাখ্‌বো? অত চোখ রাঙাবেন না গো, ঠাকরুণ, বুঝ্‌লেন?

সুধা দমিল না; কহিল,—মেস্ আপনাকে কে খোলা রাখ্‌তে বল্‌ছে? রাত্রে আমরা কেউ খাবো না; আমার স্বামী নেমন্তন্ন রাখ্‌তে গেছেন, এখুনি ফিরে এলেন বলে'।

—নেমন্তন্ন রাখ্‌তে গেছেন? হেমন্ত ভূতের মত হাসিয়া উঠিল: তিনি আর ফিরছেন না গো, ফিরছেন না।

সুধা লাফাইয়া উঠিল: ফির্‌ছেন না মানে? কি বল্‌ছেন আপনি?

চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিয়া হেমন্ত বলিল, —বল্‌ছি সত্যি কথাই। স্বামী! কত হেঁয়ালিই যে তোমরা জানো ঠাক্‌রুণ—হেমন্ত আবার বিকট কণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সুধা তবু ভড়কাইল না, রুক্ষস্বরে কহিল,— ভদ্র মেয়ের সঙ্গে সংযত হ'য়ে কথা বলতে শেখেন নি? কি শুনেছেন আমার স্বামীর সম্বন্ধে? বলুন শিগ্‌গির। বলুন।

আরেক চোট হাসি থামিলে হেমন্ত কহিল,— সোহাগপণা করে' কী সোয়ামিই যে পাক্‌ড়েছিলে! বেটা ডাকাত, গুণ্ডা—গেছল মুন্সির ঘাটে দিন-দুপুরে ছুরি বসাতে। পড়ল পুলিশের হাতে— যাবে কোথা? থানায় নেমন্তন্ন রাখতে গেছে ঠাক্‌রুণ, পিঠে খেলেই পেটে সইবে এবার।

—মুন্সির ঘাট! সুধা আঁৎকাইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ গো, মুন্সির ঘাট। খবরটা এই ত কানে এল। এখন পুলিশ-শালারা এখানে এসে কোনো হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ না বাধায়। বলি, তোমাকেও কি ও হাত-সাফাই করেছে নাকি? এসেছিলে ত বাঁড়ির মত, এখন ত' সিঁথেটাকে দিব্যি চক্‌চকে করে' তুলেছ? সতীপণা রাখো ঠাক্‌রুণ, এখন ধাতে এস। ও বেটা তোমার কে? জামাই বাবু? না, পিসেমশাই?

সুধা বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া আসিল। দেহ-ভঙ্গী কঠিন ও ঋজু, চক্ষু প্রদীপ্ত। দৃপ্ত নির্ভীকের মত ধমক দিয়া কহিল,—মুখ সাম্‌লে কথা বলুন বল্‌ছি। কোন্ সাহসে আমার ঘরে ঢুকেছেন আপনি। বেরিয়ে যান্, এক্ষুণি বেরিয়ে যান্। গেলেন?

হেমন্ত নড়িল না, মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল,—বেরিয়ে যাব কি ঠাক্‌রুণ? আমার বাড়ি, আমার ঘর-বেরুতে বল্‌লেই ত' আর বেরনো চলে না।

সুধা কহিল,—তবে দরজা থেকে সরে' বসুন দয়া করে'। আপনার ঘর-বাড়ি নিয়ে রাজত্ব করুন, আমিই বেরই। বলিয়া সুধা এক পা অগ্রসর হইল।

দরজার কাছে আগাইয়া আসিতেই হেমন্ত হঠাৎ হাত বাড়াইয়া দিয়া সুধাকে ধরিয়া ফেলিল, কহিল,—এত বা'র-মুখো হ'লে কি চলে ঠাক্‌রুণ? বোস, দুটো খোস্‌গল্প হোক—তারপর এক সাথেই বেরুনো যাবে'খন। বোস। বলিয়া হেমন্ত সুধাকে বলপূর্ব্বক নিজেরই কাছে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল—

পলকে যে কি হইয়া গেল হেমন্ত স্পষ্ট করিয়া ধারণা করিতে পারিল না। ভয়হীন গোঁয়ার মেয়ে হেমন্তর কলুষিত স্পর্শ হইতে সবেগে নিজেকে ছিঁড়িয়া নিয়া সহসা তাহার গালের উপর প্রবল এক চড় বসাইয়া দিল। রাগে অপমানে দুঃখে মুখ দিয়া তার কোনো কথাই বাহির হইল না। থর্‌থর্ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—পাংশুমুখে অটল তেজস্বিতা। হেমন্ত চেয়ার হইতে একেবারে ছিটকাইয়া পড়িল।

কী নিষ্ঠুর তেজে সামান্য নিরাশ্রয় মেয়ে আততায়ীকে এমন করিয়া শাসন করিতে পারে

মুহ্যমান হেমন্ত তাহার হদিস্ পাইল না। আঘাতটা সাম্‌লাইয়া লইতে তাহার একটু সময় লাগিল। এই আঘাতের শাস্তি দিবার জন্য প্রবলতর লোলুপতায় সে তাহার বাহু বিস্তার করিয়া দিবে, হঠাৎ টের পাইল সুধা দোর ডিঙাইয়া সিঁড়ির নাগাল পাইয়া একেবারে তর্‌তর্ করিয়া নামিয়া যাইতেছে। না বা করিল স্বামীর প্রতীক্ষা, না বা দাঁড়াইল তাহার জিনিষ-পত্রগুলি গুছাইয়া লইতে। বান্ধবহীন কাশীর পথে সে একাকিনী পা বাড়াইল।

একটা অকথ্য গালি পাড়িয়া বড় বড় পা ফেলিয়া হেমন্ত সুধার পশ্চাদ্ধাবন করিল। সুধা এতক্ষণে রাস্তা নিয়াছে। নির্জ্জন রাস্তা-বিশ্বেশ্বরের গলির মোড়ে টাঙাও একটা চোখে পড়িল না। সুধা ব্যাধানুসৃতা মৃগীর মত শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিতে লাগিল। পায়ে হাঁটিয়াই ষ্টেশনে যাইতে হইবে। সে না-জানি কতদূর! কে তাহাকে পথ বলিয়া দিবে? ইহার চেয়ে থানায় চলিয়া গেলেই হয় ত' ভালো হয়। বীরেনের সেখানে দেখা পাইতে পারে। কিন্তু ঐ ইতর ম্যানেজারের কথাই যে ঠিক এমন বিশ্বাসে সুধার জোর নাই। তবু, থানায় গেলেই শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয় একটা সুরাহা হইবে। কতদূরে আগাইলে বিটের একটা কনেষ্টবলও কি সে দেখিতে পাইবে না?

দ্রুত পা ফেলিয়া সুধা সামনের দিকেই প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছিল, হঠাৎ মগ্নানুভূতিতে তাহার জ্ঞান হইল কে তাহারই পিছু নিয়াছে বুঝি। সত্যই। সুধা পেছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মালকোঁচা বাঁধিয়া হোটেলের সেই ম্যানেজারটাই এই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। দুয়ের মধ্যেকার ব্যবধানটা সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেই হেমন্ত নির্লজ্জের মত চীৎকার করিয়া উঠিল: পাকড়ো শালিকে।

সম্মুখের সমস্ত পৃথিবী সুধার চোখের কাছে সহসা যেন ফুরাইয়া গেল—পায়ের নীচে প্রকাণ্ড একটা সমুদ্র যেন হাঁ করিয়া আছে। ইহার পর কি করা যায় সুধার হিসাবে আর কুলাইয়া উঠিল না। সামনে যে বাড়ি পাইল তাহারই বন্ধ দরজায় সে সজোরে করাঘাত সুরু করিল। দরজা তবু খোলে না। লাথির পর লাথি, শেষ-কালে সে দরজায় মাথা ঠুকিতে লাগিল। হেমন্ত একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

ক্রমশঃ

অশ্লীল

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

ফট্ করিয়া যেটি ফাটিল, সেটি বোমা নয়—রবারের একটি বেলুন। চম্‌কাইয়া শিশির বই হইতে মুখ তুলিতেই চপলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই যে সকাল হইতে শিশির বই লইয়া পড়িয়াছে, আর উঠিবার নাম নাই! ডাকাডাকির পালা অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছিল—আর ধৈর্য্যও ছিলো না। সত্যি-কারের বোমা ফাটাইয়া আক্কেল দিতে হইলে, নিজের আক্কেলও বড় কম হইত না। তাই—

শিশির কিছু বলিবার আগেই চপলা বলিল, বেলা বারটা বাজে।

শিশির লাফাইয়া উঠিল, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নান সারিয়া ভিজা মাথায় উপরে উঠিয়া আসিয়াই হাঁকিল, ভাত দাও বৌদি!

দুটি স্নিগ্ধ চোখ তুলিয়া চপলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়িল। এই তো সেদিনও—কলিকাতা যাইবার আগে, ঠিক এম্নি করিয়া ভিজা মাথা লইয়া শিশির তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সেদিনকার সেই অগোছাল-দেবরটির আজও কোন পরিবর্ত্তন হয়নি দেখিয়া, কৃতজ্ঞতায় তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল! যেন এক অক্ষম-শিশু, দেবতার বরে চির অক্ষমত্ব লাভ করিয়া তাহার কোলে এইমাত্র ফিরিয়া আসিল! শিশির একদিন বড় হইবে—মানুষ হইবে, তাহার মুখ চাহিয়া থাকিবে না, নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করিয়া লইবে,—ইহা অপেক্ষা চপলার বড় বেদনা আর নাই! চির-পরাধীন দেখিবার গোপন-ব্যগ্রতা চপলাকে পাইয়া বসিয়াছিল!—এইখানেই তাহার যত লোভ!—

চপলার ইচ্ছা করিতেছিল, শিশিরের ঐ ভিজা মাথার উপরে তাহার ডান-হাতখানি একবার রাখে। বলিল, তুমি তেম্নিটি আছো ঠাকুরপো!—সে কণ্ঠ হইতে যেন শুধু স্নেহই ঝরিয়া পড়ে!

—কেমন বৌদি?

—ভাবি, কল্‌কাতায় তোমার এতদিন কি ক'রে কাট্‌লো! বলিয়া চপলা স্নিগ্ধ হাসিতে ঘর ভরিয়া তুলিল।

—কল্‌কাতার কথা থাক্ বৌদি,—বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

চপলা হাসিতে হাসিতে তোয়ালে লইয়া তাহার মাথা মুছাইয়া, কাপড় ছাড়াইয়া—আজ অনেকদিন পরে, আবার তেম্নি করিয়া শিশিরকে খাওয়াইতে বসিল।

মা মরিয়া যাইবার পর হইতেই এই দেবরটিকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। শিশিরও পরম নির্ভরের সহিত এই নূতন বৌদিটির হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছিল। চপলা তখন নূতন শ্বশুর-ঘর করিতে আসিয়াছে। নববধূ হইয়া আসিয়াই, একদিন অতর্কিতে—সংসারের সকল্ ভার তাহাকেই লইতে হইয়াছিল। লইয়াও ছিলো,—পাকা-গৃহিণীর মত!

সেই-যে একদিন দেবরের চোখের জল মুছাইয়া, কাছে টানিয়া, নিজের হাতে তাহাকে ভাত খাওয়াইয়া দিয়াছিল,—সেই হইতে প্রতি-দিন সহস্র কাজ ফেলিয়াও তাহাকে ছুটিয়া আসিতে হইত। তাহার কেবলই মনে হইত, খাওয়াইয়া না দিলে শিশিরের কখনই পেট ভরিবে না!

স্নান করিয়া ভিজা মাথায় শিশির যেদিন প্রথম তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিনের কথা চপলা আজো ভুলিতে পারেনি! বয়সে প্রায় সমবয়সী হইলেও, তাহার বুকটা মোচড়াইয়া উঠিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, এই স্নেহ-ভিক্ষু ছেলেটিকে কোন দিক দিয়া ফাঁকি দেওয়া চলিবে না।—উহারা স্নেহ কাড়িয়া লইতে জানে যে!

তারপর—একে একে শিশিরের সকল ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাকে মুক্তি দিল। স্বামী বলিতেন, তুমিই ওর পরকালটি খেলে—এর পর নিজে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।

একদিন চপলা আসিয়া দেখিল, শিশির সত্যই তেলের বাটি নামাইয়া তেল মাখিতে বসিয়াছে, আর তাহার স্বামী শাসনকর্ত্তার মতই অপরূপ ভঙ্গীতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! চপলার হাসি আর ধরে না!—মাথার সামনের চুলগুলি হইতে তেল গড়াইয়া পড়িতেছে, পিঠটা নাগালের বাহিরে বলিয়া একবিন্দুও তেল পড়েনি, মাটি এবং বাটি কোন্‌টি যে তেলের আধার বুঝিবার উপায় নাই! টান্‌ মারিয়া বাটিটা ফেলিয়া দিয়া চপলা বলিল, হয়েছে,—ওঠ! তারপর স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল, কি ক'রে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখ্‌ছো! তুমি যাও তো এখান থেকে!

শিশির লজ্জায় বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিল।—লজ্জা করিবার কথা বটে,—বৌদি তাহারই সমবয়সী!—কিন্তু কি করিবে, সে যে কিছুই পারে না!

—সবাই সব পারে বুঝি! তুমি নিজের হাতে কোন কিছু কর্‌তে যাবে যদি, আমি গলায় দড়ি দেবো। বলিয়া চপলা শিশিরকে লইয়া দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তারপর—একদিন, স্কুলের পড়া শেষ হইল। শিশিরকে কলিকাতা পাঠাইবার জন্য স্বামী জিদ ধরিলেন। বলিলেন, আর ওর মাথা খেও না, একটু ছেড়ে দাও—বাইরে একবার ঘুরে আসুক। —ঘা খেয়ে খেয়ে যদি কিছু শেখে।

কিন্তু শিখিবার মধ্যে শিশির পড়াশুনাই শিখিয়া আসিল, আর কিছু শিখিল না! সেই শিশির—আজ পূর্ণ যুবক, কিন্তু আজো ভাল করিয়া কাপড়টি পর্য্যন্ত পরিতে পারে না!

দুপুরবেলা।—শিশির সবেমাত্র একখানি বই খুলিয়া বসিয়াছে। চপলা আসিয়া বলিল, ঠাকুরপো, তোমাকে আমার বন্ধুরা দেখতে এসেছেন।

শিশির ব্যস্ত হইয়া উঠিল।—কী সর্ব্বনাশ! সে কি করিয়া অতগুলি মেয়ের সামনে বাহির হইবে?

চপলা হাসিয়া উঠিল। বলিল, লজ্জা করছে বুঝি?

—হঁ্যা। বলিয়া শিশির ঘামিয়া লাল হইয়া গেল।

চপলা চলিয়া গেলে, শিশির তাড়াতাড়ি বিছানায় আসিয়া চোখ বুজিল। নিষেধ না মানিয়া যদি তাহারা এই ঘরেই আসিয়া পড়ে?

পাশের ঘরে মেয়েদের হাসি তখন প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

—বৌদি যেন কি!—চোখ বুজিয়া শিশির ভাবে।

ও-ঘরে ললিতা বলে, আচ্ছা ভাই, ওর যদি এখন বিয়ে দেওয়া যায়?

—পরখ্‌ ক'রে দেখবি না কি লো? বলিয়া চারুশীলা ললিতার গাল টিপিয়া দেয়।

—না ভাই,—আমি ভাত খাইয়ে দিতে পার্‌বো না। বলিয়া ললিতা হাসে।

শিশিরকে লইয়া অনেকে অনেক কথাই বলে,—ললিতার কিন্তু এই লোকটিকে বেশ লাগে! সবজান্তা-পুরুষের উপর ললিতার কেমন

যেন রাগ ছিলো।—তাহারা যেন খুব বেশী স্পষ্ট, খুব বেশী উগ্র! আর সকল তাতেই বাড়াবাড়ি: —এই ক'রো না, ঐ কর। যেন তার নির্দ্দেশমত না চলিলে, পৃথিবীতে একটা ওলট-পালট হইয়া যাইবে! তাহার ইচ্ছা করে, এই নম্র-শান্ত লোকটিকে চুপি চুপি জানাইয়া আসে,— তোমাকে আমার ভাল লাগে।

বৈকালে সভা ভাঙিল।—চপলা ঘরে আসিয়া দেখিল, শিশির বিছানায় কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! দিনে ঘুমান তাহার অভ্যাস নাই। কিন্তু আজ তাহারাই সকলে মিলিয়া এই নিরীহ লোকটিকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে, মনে করিয়া চপলার কষ্ট হইল।

স্বামী আসিয়া বলিলেন, একি!—শিশির এখনো বিছানায় শুয়ে!

—চেঁচিও না—ষাঁড়ের মত অমন ক'রে চেঁচিও না তুমি!—কি হয়েছে তা? রাতদিন বই মুখে ক'রে ব'সে থাকার চেয়ে একটু ঘুমোনো ভাল।

স্বামী হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, হাঁ, তা বটে! লোকে হাজারিবাগ আসে হাওয়া খেতে, আমি ভাগ্যক্রমে বদলি হ'য়ে এলাম যদি, তা ভায়া আমার—

—থাক্, তোমাকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না,— ও তো রোগী নয়।

—রোগের তবু চিকিৎসা আছে চপলা! —কিন্তু এ দুশ্চিকিৎস্য!

গোলমালে শিশিরের অনেকক্ষণ ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিন্তু উঠিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল। সে যে জাগিয়া-জাগিয়া দাদার কথাগুলি শুনিয়াছে, দাদা বুঝিতে পারিলে, হয়ত হাসিয়াই উঠিবে! কিন্তু তাহার লজ্জার আর অবধি থাকিবে না! সুতরাং শিশির চোখ বুজিয়াই পড়িয়া রহিল।

শিশির যখন উঠিবার সুযোগ পাইল, তখন সন্ধ্যা। বাহিরে অন্ধকার তখনো নিবিড় হইয়া নামেনি। চপলা ঘরে আলো দিতে আসিয়া দেখিল, শিশির জানালার দিকে মুখ করিয়া,—দূরে—কি যেন দেখিতেছে! বলিল, ঠাকুরপো. ক্ষিদে পেয়েছে?

—আচ্ছা বৌদি, ঐ পাহাড়টায় খুব বড় বড় বাঘ—নয়?

—দূর্! বাঘ কেন থাক্‌বে। ওখানে যে সবাই বেড়াতে যায়,—তুমি যাবে?

—না, না—আমি যাব না। ওখানে মেয়েরা যায়—

—তোমার বুঝি সেই ভয়? আচ্ছা, আমি সব মেয়েকে বারণ ক'রে দেবো,—কেউ যেন সেদিন না যায়। বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া চপলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মেয়েরা আসিলে সত্যই চপলা বলিল। তাহারা হাসে। বলে, ভারী মজা তো!

পাশের ঘর হইতে শিশির সমস্তই শুনিতেছে মনে করিয়া, তাহারা বেশ টিপিয়া টিপিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল। কিন্তু শিশির তখন সদর দরজা পার হইয়া রাস্তায় গিয়া নামিয়াছে।

মেয়েদের সম্বন্ধে শিশির একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়াছে,—তাহারা বেশী কথা বলে, এবং ততোধিক নির্লজ্জ! আরো একটা কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল, মেয়েরা বড় কৌতূহলী!

রাস্তায় তখনো বিশেষ লোক চলাচল সুরু হয়নি। সোজা রাস্তা কেমন উঁচু হইয়া আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে! শিশির একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া থাকে! হঠাৎ মনে হইল, সে ঘর ছাড়িয়া আসিয়া ভালই করিয়াছে। এই দুপুরটুকুই তো মেয়েদের অবসর। এই সময়ও যদি সে ঘর জুড়িয়া বসিয়া থাকে—কিন্তু তাহাতে তাহারা

কোন অসুবিধাই তো বোধ করে না! বরং সে-ই লজ্জায় পালাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে গল্প করিবার সুযোগ দেওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই!

শিশিরের পৌরুষে ঘা লাগিল। সে শব্দ করিয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিল। মেয়েদের মজলিস তখন তাহারই ঘরে বসিয়াছে।

—এই যে আসুন শিশিরবাবু! আপনার ঘর আমরা দখল ক'রে নিয়েছি।

শিশির দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।—আচ্ছা ফাজিল মেয়ে তো!

চপলা ডাকে, ভেতরে এসোনা ঠাকুর পো!

আসিতেই হইল। কুণ্ঠিত নববিবাহিতের মত প্রকাণ্ড চৌকিখানার একপাশে জড়সড় হইয়া বসিল।

—আপনি কি বেথুন কলেজে পড়্‌তেন?

সেই ফাজিল মেয়েটি! শিশিরের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, না, ওখানে মেয়েরা পড়ে।

প্রচণ্ড হাসি।

ইহার কয়েকদিন পরে—অকস্মাৎ একদিন নীচে হইতে ডাক আসিল, শিশির! শিশির!

চপলা এবং শিশির উভয়েই বিস্মিত হইল! —এখানে শিশিরকে নাম ধরিয়া ডাকে কে!

শিশির নীচে আসিতেই হীরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—তুমি!

হীরেনও বলিল, তুমি?

তারপর, আর কোন কথা নয়,—হীরেনকে টানিয়া শিশির একদম উপরে হাজীর করিল।

চপলা মুস্কিলে পড়িয়া গেল,—একজন অপরিচিত যুবককে, বলা নাই কওয়া নাই—

কোনরকম ভূমিকা না করিয়া, শিশির বলিল,—বৌদি, এ আমার বন্ধু—কল্‌কাতায় এক মেসে থাকৃতাম।

হীরেনও প্রথমটা অপ্রতিভ হইয়াছিল।—শিশির যে এমন করিয়া তাহাকে উপরে লইয়া আসিবে ভাবেনি। কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, আপনি আমাকে লজ্জা করবেন না, আমি ললিতার দাদা।

শিশির হাসিয়া উঠিল।—দূর্, বৌদি কখন লজ্জা করে।

চপলাকেও হাসিতে হইল। বলিল, হাঁ,—লজ্জা করবে ঠাকুরপোর দল,—কেমন?

—দূর্!—তাই কেন!—

কিন্তু আর কিছুই শিশির বলিতে পারিল না। তার কান দুটো গরম হইয়া উঠিল।

—আমি কি ক'রে আবিষ্কার করলাম জানেন বৌদি? কাল্ ললিতার মুখে শিশিরের যা বর্ণনা শুন্‌লাম,—বলিয়াই হীরেন শিশিরের মুখের দিকে চাহিল।

শিশির ঘামিতে সুরু করিয়াছে।

—তখনি বুঝ্‌লাম, এ আমাদের পাগ্‌লা-শিশির ছাড়া কেউ নয়!

—পাগলা শিশির!

—ও, জানেন না বুঝি? তবে, ওর কলকাতার গল্প বলি শুনুন।

শিশির মুখ লুকাইয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

—চার বচ্ছর শিশির কল্‌কাতায় ছিলো,—চারটি লোকের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে। এক-ঘরে থাক্‌তাম ব'লে আমি, মেসের ঠাকুর, ম্যানেজার,—আর—আর কার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল শিশির?

—জানি না।

—হাঁ, হাঁ,—মনে পড়েছে। পাশের ঘরের সেই হোমিও-পুলিন। একদিন চুপ্ চুপ্ ক'রে

এসে বল্‌ছে, আপনার ঘরের ঐ শিশির বাবুকে একটু watch কর্‌বেন তো! ব্যাপারটা প্রথমে বুঝ্‌তে পারিনি। তারপর যখন দেখ্‌লাম,—শিশিরের 'সিম্‌টম্‌' নিয়ে বই-এর পাতা উল্টোচ্ছে, তখন কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলাম! বল্লাম, সে কি মশায়? বল্লেন, হাঁ,—একটু সাবধানে থাক্‌বেন, নইলে কাম্‌ড়াতে পারে।

চপলা হাসিয়া পেটে খিল্‌ ধরাইয়া ফেলিল।

—প্রথম প্রথম আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। ভাব্‌তাম, এ আবার কোত্থেকে এক জংলা এলো আমার ঘরে!—স্নান নাই—কাপড় ছাড়া নাই,—বিছানাটাও হয়েছে তেম্নি,—বইগুলো আছে চৌকি জুড়ে ছড়ানো—শোবার সময় ঐ গুলোই একটু সরিয়ে নিজের জায়গা ক'রে নেয়! ঠাকুর ডাক্‌লে তো খাওয়া হ'লো, নইলে অম্নিই ব'সে রইলো বই মুখে ক'রে। সত্যি পুলিন ডাক্তারের বড় দোষ দেওয়া যায় না। বলিয়া হীরেন হাসিতে লাগিল।

চপলার বুকের ভিতরটা টন্‌ টন্‌ করিয়া ওঠে! কলিকাতার সেই চারিটি বৎসর তাহার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হইয়া ভাসিতে থাকে।—হয়ত, কতদিন খাওয়া হয়নি,—নিরুপায়ের মত সারা-রাত্রি নীরবে কাঁদিয়াই কাটাইয়াছে!—

—মেসের সকলে হৈ হৈ ক'রে একটা না একটা কিছু কর্‌ছেই;—কিন্তু শিশির আমাদের সেই নিরালা-ঘরটিতে চুপ ক'রে ব'সে! বড় অস্বস্তি বোধ হ'তো! ভাব্‌তাম, এই বিধবাটিকে নিয়ে কি কর্‌বো? আপনি হাস্‌ছেন, কিন্তু সত্যিই একদিন ওকে ভালবেসে ফেল্‌লাম! বিধবাকে বোধ হয় এইজন্যই চট্‌ ক'রে পুরুষের ভাল লেগে যায়!

চপলা বড় মুস্কিলে পড়িয়া গেল! ইহার পর 'হাঁ' 'না' করিয়া গল্পকে আগাইয়া দিতেও কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল।

মুস্কিল আসান্‌ হইল। ললিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। চপলা হাসিয়া বলিল, ব্যস্‌—এইবার তুমি এদিক্‌টায় ব'সে আরম্ভ ক'রে দাও।

ললিতাও হাসিল। বলিল, শিশিরবাবুর গল্প হচ্ছে বুঝি? আমি সব শুনেছি।

কিন্তু ওদিকে শিশিরবাবু লোকটিকে আর কাহারও মনে নাই! তাহার গল্প লইয়াই সকলে মাতিয়াছে! আর শিশির?—শিশিরের তখন এই লজ্জাটাই বেশী করিয়া হইতেছিল, পৃথিবী শুদ্ধ লোক আজ তাহাকে জানিয়া গেল!

ললিতার কিন্তু এসব ভাল লাগিতেছিল না। কি বাপু,—একটা লোককে লইয়া—

বলিল, তোমার সবতাতেই বড় বাড়াবাড়ি দাদা! ঐ জন্যেই তো কারুর সঙ্গে বনে না তোমার!

—ইস্‌! ভারী দরদ দেখ্‌ছি! বলিয়া হীরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ললিতা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, সহানুভূতিকে তোমরা যে নামেই দাও,—আমি শিশির বাবুর মত লাল হ'য়ে উঠ্‌বো না।

ললিতাকে আর যে দোষই দেওয়া যাক্‌, তাকে অস্পষ্টতার দোষ কিছুতেই দেওয়া যাবে না—কেমন না বৌদি? বলিয়া হীরেন হাসিতে লাগিল।

—তবুও এই স্পষ্টতার যে একটা প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য ছিলো, তুমি তা নষ্ট কর্‌লে বেরসিক! বলিয়া দৃপ্তার মত চপলার হাত ধরিয়া ললিতা বাহির হইয়া গেল।

শিশিরের দাদা বলিলেন, যাক্‌—ভালই হ'লো, শিশিরের তবু একজন সঙ্গী জুটলো! শিশিরের কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না। কী রাতদিন ব'সে ব'সে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করা! তার চেয়ে বই পড়া ভাল। কিন্তু আজ দুদিন

হইতে বই-এর একটি লাইনও সে পড়িতে পারিতেছে না! ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ললিতা-মেয়েটা মনের মধ্যে আসিয়া পড়ে!—কই, আজ তো ললিতা এলো না, কাল তো এমনি সময় এসেছিলো—বড় ফাজিল,—অত ভাল নয়—হ'লোই বা হীরেনের বোন;—হীরেনের শাসন করা উচিত,—মেয়েটা কিন্তু বোঝে সোঝে,—কতদূর পড়েছে কে জানে! যাক্ ভালই হ'লো—আজ আর আসবে না, বইটা তাহ'লে শেষ করা যাবে; দোরটা বন্ধ কর্‌বো? থাক্—

শিশির শক্ত হইয়া বসিয়া জোরে জোরে পড়া সুরু করিয়া দিল। একটু পরেই হীরেন আসিল। বলিল, সর্ব্বনাশ!—এ যে পাঠশালার পড়া সুরু করেছো!

শিশির গলা বন্ধ করিল বটে, কিন্তু পড়া বন্ধ করিল না। চপলা আসিয়া বলিল, পড়াটা না হয়—একটু বন্ধই রাখো ঠাকুরপো!

—গ্রীক যুগের কোন্ কোন্ শিল্প আজো পৃথিবীতে অমর হ'য়ে আছে শিশির? বলিয়া হীরেন চপলার দিকে চাহিয়া হাসিল।

বইখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শিশির বলিল, তোমার মাথা!

—শিশির কি পড়ে জানেন বৌদি? কোন্ দেশের সভ্যতা কোন্ দেশের চাইতে কত বেশী, কোন্ দেশের মেয়েরা পুরুষকে বাঘের মত ভয় করে,—

শিশির উঠিয়া চলিয়া গেল।

চপলা বলিল, চা আন্‌বো ঠাকুরপো?

—হাঁ, হাঁ। শিশিরের মত ভাল ছেলে হবার আমার প্রচেষ্টা নাই।

—প্রচেষ্টা কি রকম?

—প্রচেষ্টা নয়? ভালছেলে,—বেশ তো! নিজেকে অত জাহীর কর্‌বার চেষ্টা কেন বাপু?—দেখ তোমরা আমি চা খাই না—আমি পান খাই না—

শিশির লাফাইয়া ঘরে ঢুকিল। এবং প্রায় গর্জ্জন করিয়াই বলিল, আমি চা খাবো বৌদি!

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঝড়ের মত ললিতা আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, পাশের বাড়ীতে লোক বাস করে দাদা।

হীরেন চোখ দুটি ছোট করিয়া ললিতারই স্বরে বলিল, ঠিক শোনা যাচ্ছিলো না বুঝি?

—হাঁ, শোনা যাচ্ছিলো—এবং খুব তীব্র-ভাবেই শোনা যাচ্ছিলো।

এই কথাটা ললিতা আবৃত্তি করিল বটে, কিন্তু চপলার প্রচণ্ড হাসিতে শোনা গেল না

চা আসিলে, হীরেন আবার ভাল হইয়া বসিল। ললিতা বলিল, হয়েছে! তুমি যে দেখ্‌ছি, নতুন ক'রে বস্‌লে?

—থাম্, থাম্,—তুই যে দেখছি, আমার মাষ্টারমশায় হ'য়ে উঠ্‌লি! জানেন বৌদি, শিশিরকে নেমন্তন্ন কর্‌বো ব'লে এসেছি,—তা ও কিছুতেই আমাকে বল্‌তে দেবে না! বলে, আমি বল্‌বো।

—কখন আবার বল্লাম ও-কথা! বলিয়া ললিতা লাল হইয়া উঠিল।

হীরেন অমনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই
কিছু নাই তোর ভাবনা।
দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কাণ
জেনেছে রে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।

হীরেনের এই কবিতা-আবৃত্তিকে উপেক্ষা করিবার মত নির্লজ্জতা ললিতা চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারিল না। সুতরাং ঘর ছাড়িয়া তাহাকে উঠিতেই হইল।

শিশির বলিল, ওটা কার কবিতা হে?

—রবিবাবুর।

—লেখে তো মন্দ না।

হীরেন চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। চপলাকে ডাকিয়া বলিল, শিশিরের জন্যে আর আপনার কোন ভয় নাই বৌদি,—ওর এবার কবিতা ভাল লাগছে!

শিশির সত্যই মাতিয়া উঠিল। কবিতা এবং ললিতা যেন ছন্দ রক্ষা করিতেই—জোড় মিলিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

চপলা বলিল, দেখো ঠাকুরপো,—আমরা যেন ভেসে না যাই!

চপলা উত্তর শুনিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে না।—কিন্তু শিশিরের কোথায় যেন আঘাত লাগে! হয়ত সে অন্যায়ই করিতেছে!

সারাদিন আর সে তাহার বৌদির সামনে মুখ তুলিতে পারে না। ইচ্ছা, যে তাহার বৌদি একটা বড়-রকম শাস্তি দিয়া তাহাকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অপরাধ করিয়া শাস্তি পাইলেই যে তাহার ভোগ চুকিয়া যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে শিশির চুপি চুপি রান্নাঘরে গিয়া ডাকিল, বৌদি!

—কি ভাই ঠাকুরপো?

শিশির নত মুখে দাঁড়াইয়া থাকে,—কিছু বলে না।

চপলা এবারও ঠাট্টা করিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। বলিল, আজ ললিতা আসেনি বুঝি?

—বৌদি!

চপলা চম্‌কিয়া উঠিল!—এতো স্বর নয়,—এ যে কান্না! কাছে আসিয়া হাত ধরিতেই শিশির ভাঙিয়া পড়িল। বলিল, অন্যায় করেছি—শাস্তি দাও।—ললিতাকে তুমি তো বারণ ক'রে দিলেই পার বৌদি!

চপলা হাসিল। বলিল, এই কথা!

—তোমার চেয়ে আমার আপনার কেউ নেই বৌদি,—একি তুমি জান না? বলিয়া শিশির হাঁপাইতে লাগিল।

—তা কি জানি না ভাই,—ঠাট্টাও বোঝ না!

—সে যা হোক্, তুমি তাদের আস্‌তে বারণ ক'রে দিও। বলিয়া শিশির দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

পরদিন ললিতা আসিতেই, চপলা হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার প্রবেশ নিষেধ—ঠাকুরপোর হুকুম।

—অপরাধ?

—অপরাধ?—বলিয়া চপলা ললিতাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলে, অনুরাগ।

—ধেৎ!

—কেন জানিস না—যে যাকে যত বেশী ভালবাসে, সে তার প্রতি তত কঠোর? নইলে, এমন ক'রে অপমান কর্‌তে তার ভদ্রতায় বাধতো।

ললিতা আর দাড়ায় না,—ছুটিয়া পলাইয়া যায়!

অল্পক্ষণ পরেই শিশির আসিয়া প্রশ্ন করে,—হীরেন এসেছিলো না?

—কই না!

—কিন্তু আমি যেন—

একটা উদ্গত হাসিকে চপলা আঁচল দিয়া যেন মুছিয়া ফেলিল। বলিল, তাবে তার বোন এসেছিলো বটে,—আমি তোমার আদেশ জানিয়ে দিয়েছি।

শিশির কাঁপিয়া উঠিল!—বৌদি একি করিয়াছে আজ! সে না হয় বলিয়াছিল,—কিন্তু তাই বলিয়া—

শিশিরের মুখের রক্ত কে যেন অলক্ষ্যে শুষিয়া লইয়াছে! একই সঙ্গে নানা প্রশ্ন তার মনের মনের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল!—যদি সে আর না আসে? হীরেনও তো তাহাকে অপমান মনে করিয়া তাহার আসার পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে! ললিতাই বা কি মনে করিল?—সে কি আর ক্ষমা করিতে পারিবে?

চপলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিশিরের এই পরিবর্ত্তন উপভোগ করিতেছিল। একটা প্রচ্ছন্ন হাসি অধর-কোণে লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরিতেছে!

ঠিক এই সময় হীরেন গম্ভীর হইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। এই অসহ্য নীরবতা হইতে মুক্তি পাইয়া শিশির যেন বাঁচিয়া গেল! বলিল, এসো!

চপলা হাসিয়া চলিয়া গেল।

শিশির মুহূর্ত্তে উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিল। বলিল, তোমাকেই আমি এতক্ষণ ধ'রে কামনা কর্‌ছিলাম।

—সৌভাগ্য! বলিয়া হীরেন গম্ভীর হইয়া শিশিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

সেই অপ্রীতিকর ঘটনাকে এইবার কি বলিয়া সহজ করিয়া আনিবে, শিশির তাহাই ভাবিতে-ছিল। কিন্তু কোন কথাই তাহার মনে পড়ে না! হঠাৎ হীরেনকে একসময় উঠিতে দেখিয়া, শিশিরের চমক্ ভাঙিল! বলিল, উঠ্‌লে যে?

—যাই, কাজ আছে।

শিশির ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল, আমাকে ক্ষমা কর ভাই,—বৌদি' না বুঝে—

—তা'তে কি!

—তুমি ললিতাকে বুঝিয়ে ব'লো,—

—প্রয়োজন নাই,—সে আর এ-বাড়ীতে আস্‌তে পার্‌বে না।—তার বিবাহ স্থির হয়েছে। বলিয়া হীরেন দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।—গেল,—কিন্তু শিশিরের মাথায় হীরেন যেন লাঠি মারিয়াই গেল!

চপলা আসিয়া বলিল, কি হয়েছে ভাই?

—কিছু হয় নি। বলিয়া শিশির বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

—ললিতার বিয়ে,—হীরেন ঠাকুরপো নেমন্তন্ন ক'রে গেল।

—হুঁ। বলিয়া শিশির গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

—বেশ ভাল বিয়ে হচ্ছে, ছেলেটি ভাল—ললিতারও পছন্দ হয়েছে।

শিশিরের কান দু'টি যেন পুড়িয়া গেল!—এই ললিতাকে সে ভালবাসিয়াছে! কেন, সে কি বলিতে পারিত না,—অন্যকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না?—সে কি বলিতে পারিত না, শিশিরকে সে ভালবাসে?—বিতৃষ্ণায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল! কিন্তু কেহ আসিয়া যদি প্রশ্ন করে, তুমিই বা তাহাকে কি আশ্বাস দিয়াছ? মুখ ফুটিয়া তুমিও তো কোনদিন কিছু বল নি! আজ অকারণ—কেবলমাত্র তাহাকেই দোষী করিলে চলিবে কেন!—উত্তর হয় ত কিছুই নাই। কিন্তু তবু ললিতাকে সে ক্ষমা করিতে পারিল না।

চপলা বলিল, আজ কত আনন্দ হ'তো,—যদি তোমার সঙ্গে তার—ওদেরও সে ইচ্ছা ছিলো,—

—বৌদি'!

—জানি ভাই,—ঐ ভয়েই তো মত দিতে পারি নি।

শিশিরের পায়ের নীচে—পৃথিবী যেন টলিতে লাগিল!—ললিতার তবে দোষ নাই,—সে তো আসিয়াই ছিল নিজেকে নিবেদন করিতে! তাহার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল—ললিতার এ বিবাহ নয়,—আত্মহত্যা!

আয়োজন চাপা থাকিল না। শেষে শিশিরও একদিন বুঝিয়া ফেলিল, ললিতার এ আত্ম-হত্যা নয়—বিবাহই,—আর সে বিবাহ তাহারই সঙ্গে! ললিতা আর আসিল না বটে; কিন্তু আজিকার এই না-আসা, গোপন-অভিসারিকার সলাজ-পদশব্দের মত মধুর হইয়া শিশিরের বুকে ফিরিতে লাগিল।

চপলা আসিয়া বলিল, আর তো দেরী নেই ভাই,—ললিতার কাপড়-জামা তুমিই পছন্দ ক'রে নিয়ে এসো।

শিশিরের ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার দুই পায়ে মাথা রাখিয়া একবার বলে,—জন্মে জন্মে মাতৃ-হারা হইয়া যেন সে তাহারই স্নেহ-কোলে ফিরিয়া আসে।

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মহিলারা এবার জোট্ পাকাইয়া শিশিরের ঘরেই আড্ডা পাতিয়া বসিল। চপলা বলে, এবার আর শিশির একা নয়,—ললিতাও বিরক্ত হবে।

ললিতাও অম্নি ঠোঁট বাকাইয়া বলে, হবোই তো।

—বরটি গেল কোথায়?—যে লাজুক! আবার না কারুর ফাঁদে পড়েন!—আঁচলে বাঁধ্ ললিতা! বলিয়া চারুশীলা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিমলা একপাশে বসিয়া আপন মনে কাঁথা সেলাই করিতেছিল। কি-একটা বলিতে যাইতেই, ললিতা বাধা দিয়া বলিল,—তুমি আর কিছু ব'লো না বিমলা-দি', চিরটা কাল তো কাঁথা সেলাই করেই গেল!

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

বিমলা একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার মেয়ে,—ঠকিবে না; বলিল,—এ কাঁথা যে ভাই তোর জন্যেই বুন্‌ছি।

আবার হাসি।—

শিশির আসিয়া দাঁড়াইতেই, অম্নি চপলা বলিয়া উঠিল,—এই যে ভাই ঠাকুরপো!—আমরা তোমার অপেক্ষাই কর্‌ছি। দেখ তো, ললিতার এ কাঁথা পছন্দ হচ্চে না! বল্‌ছে, একি আবার একটা কাঁথা হয়েছে!

—কেন, কাঁথা কি হবে?

—বিমলা এ কাঁথা তোমাদের উপহার দিচ্চে। বল্‌ছে, কোথায় থাকি—কোথায় না, খোকা হ'লে—

—ধ্যাৎ,—অশ্লীল! বলিয়া মুখখানাকে লাল করিয়া শিশির ছুটিয়া পলাইল।

সমস্ত ঘরখানি হাসিতে যেন ভাঙিয়া পড়িল!
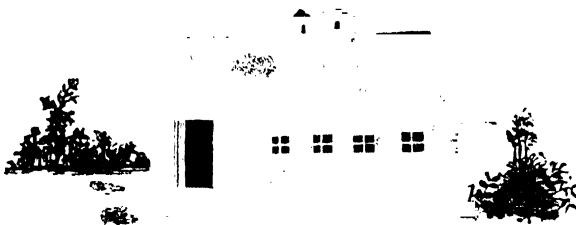
—অন্ধকার—

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

—বাবু!

—কি রে, কেনা?

—বাবু, গা ছম্‌ছম্ ক'র্‌চে না?

—কই, না।

—আমার কেমন ভয় লাগ্‌চে, গা ছম্‌ছম্ ক'র্‌চে।

—কেন রে? ভয় পেলি কেন?—এটা ত' শ্মশান-টশান নয়; তেমন রাতও ত' হয় নি, ভয় কিসের?···তুই না চাষার মদ্দ!

—বাবু, এ-পথটা দিয়ে চ'ল্‌তে গেলে আমার গা ছম্‌ছম্ করে। মনে হয়, আমার পেছন্ পেছন্ কে যেন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে আস্‌চে। খুব কচিগলার কান্না···

—ও সব কিছু না। ভয় কি?—রামনাম কর্, ভূতপ্রেত সব পালিয়ে যাবে।

—বাবু, একটা কতা বল্‌বো?

—কি, বল্ না!

—কাউকে কখনো ঘুণাক্ষরেও জান্‌তি দিই নি বাবু। আজ আপনাকে নাজানিয়ে থাক্‌তে পার্‌চি না। বাবু—

—বল্!

—কারু কাচে যেন একটি কতাও বোলোনি বাবু?

—না রে না, ব'ল্‌বো না। কি ব'ল্‌চিস্ তুই বল্ না!

—বচর বিশেক্ আগেকার কতা। আমি তখন মাঝের-গাঁর জমীদার বাড়ীর জুড়ী হাঁকাই। সে-দিন বার্‌টা কি ছিল ঠিক্ মনে নেই। বোধ হয় বেস্পতি। সন্ধ্যে উৎরে গেছে, আমা-বস্যা তিথি কি না, তাই তখনই চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ছোটবাবুকে ইষ্টিশানে পৌছে দিয়ে গাড়ী নিয়ে ফিরে চলেচি। খালি গাড়ী নতুন জুড়ী। খুব জোরেই ছুটে ফির্‌ছিল: কতায় বলে—'ঘর মুকো ঘোঁড়া'।—

—চুপ ক'র্‌লি কেন? বল্ না?

—থানা-পুলিশি কাণ্ড। কোনোরকমে বেফাঁশ্ হ'লেই মুসকিল্।—হ্যাঁ, ঐ যে খানিক্ আগে কুলতলার ডোবাটা পেরিয়ে এলুম না, ঐখানটায়। একটা ছেলে যে পথের মাঝ্‌খান দিয়ে চ'ল্‌ছিল তা টের্ পেলুম যখন গাড়ীখানা আচম্‌কা একেবারে তার ঘাড়ের ওপর গিয়ে প'ড়্‌লো। 'বাবা গো' ব'লে ছোঁড়াটা মাত্তর একটিবার চেঁচিয়ে উঠেছিল। কচিছেলে, বছর সাতেক 'আন্দাং' বয়েস হ'বে বাবু। আহা! মাথাটা একেবারে—গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে গেল!

—তারপর?

—তারপর আর্ কি? গাড়ী রুকে ধাঁ ক'রে একবার চারিদিকে দেখে নিলুম কেউ কোতায় আচে কি না।! তারপর—ছোঁড়াটাকে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে ঐ কুলতলার ডোবাটার মধ্যে ফেলে দিলুম। ডোবার জলে ভালো ক'রে হাত-পা ধুয়ে আস্তে আস্তে ফির্‌লুম। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। বাবুদের আস্তাবলে গাড়ী রেখে যখন বাড়ী ফির্‌লুম তখন প্রায় রাত্তির ন'টা। মা আর্ বউ আমার পথ চেয়ে ঘর আর বার ক'র্‌চে। যেতেই বউ কেঁদে উঠ্‌লো, ও গো, খোকা যে খালি বাহ্যে আর্ বমি কর্‌চে, শীগ্‌গির ডাক্তার আনো। ছুটে বেরিয়ে পড়্‌লুম বাড়ী থেকে—

—হুঁ। তারপর।

—অনেক চেষ্টা ক'রেও বাঁচাতে পার্লুম না বাবু! সেই রাত্তিরেই খোকন্ আমার সব অন্ধকার ক'রে পালিয়ে গেল।—আশ্চয্যি বাবু, যেদিকেই তাকাই চোকের সাম্‌নে পাশাপাশি ভেসে ওটে একসঙ্গে দু'টি মুখ, আমার পাঁচ বচরের মাণিকের মুখের পাশে সেই সাতবচরের ছোঁড়াটার চেপ্‌টে-যাওয়া রক্তমাখা মুখখানা। একজনকে টানিয়া আন মনে করতে গেলেই দু'জনে একসঙ্গে এসে দাঁড়ায়।—আর্ এই পথটা দিয়ে চল্‌তে গেলেই মনে হয়, কে যেন কেঁদে কেঁদে আমার পেছন পেছন ছুটে চলে, কচিগলার কান্না—

—হ্যাঁ, কোতায় এলুম রে আমরা?

—এসে প'ড়েচি আর্ কি! এই যে বাবু, আর্ একটা মোড় ঘুর্‌লেই ত বিশেলক্ষীতলা।

—তোর হাতের লণ্ঠনটা একটু বাড়িয়ে দেত রে কেনা, বড় অন্ধকার··

—বিভীষিকা—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম-এ

এক

বড়দিনের ছুটী আগত প্রায়। কলিকাতায় চতুর্দ্দিকে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সার্কাস কার্ণিভ্যালের ছড়াছড়ি, বায়োস্কোপের নূতন প্রোগ্রামের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন থিয়েটারের নূতন নাটক অভিনয়ের সচিত্র হ্যাণ্ডবিল কিছুই আমাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতে ছিল না। বিদেশ হইতে কত নরনারী এই সময়ে কলিকাতার আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে দলে দলে আসিতেছে, কিন্তু আমি কলিকাতা কবে ত্যাগ করিতে পারিব তজ্জন্য দিন গণিতেছি। এম্-এ পাশ করিয়া বি-এল্-এর শেষ পরীক্ষার জন্য কলিকাতার মেসে থাকিয়া প্রস্তুত হইতে-ছিলাম—এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগিতেছিল না। দেড় বৎসর হইল রেলওয়ে বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এই ভবিষ্যৎ রাসবিহারী ঘোষকে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু আজিকালি এম্-এ, বি-এল পাশ করিয়াও যে জীবনযুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়া কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা বোধ হয় তিনি ভাবিয়াও দেখেন নাই। সে যাহা হউক, আমি মনোমত সুশিক্ষিতা পত্নী লাভ করিয়া নিজেকে সৌভাগ্য-বান মনে করিয়াছিলাম এবং আগামী ছুটীতে সেই প্রিয়া মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার শ্বশুর-মহাশয় আমাকে রেলওয়ের একখানি প্রথম শ্রেণীর পাশ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং বড়দিনের ছুটী হইলেই আমি ঢাকায় শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিব স্থির করিয়া ছিলাম।

প্রিয়তমার জন্য কতকগুলি উপহার দ্রব্য ক্রয় করিয়া রাত্রির মেলেই যাত্রা করিলাম। প্রথম শ্রেণীতে আরোহী প্রায় থাকে না এবং সেদিনও দুই-একটি ষ্টেশন পরে গাড়ীতে আমি একাকী রহিলাম। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, একাকী যাইতে যাইতে একটু গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে 'গল্প-লহরী'তে পড়িয়াছিলাম এক-একটী গাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হইয়া থাকে। যদিও এম্-এ পাশ করিয়াছি, তথাপি ভূত নাই একথা এখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। গল্প-লহরীতে অনেক সত্যঘটনামূলক ভূতের গল্প পড়িয়াছি এবং আমার মনে হয় না যে, সেগুলি নিছক কল্পনামূলক এবং আমাদিগকে ভূতের ভয় দেখানই লেখকের উদ্দেশ্য। দিবালোকে অনেকেই ভূতের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন বটে, কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে পল্লীগ্রামের নির্জ্জন রাস্তায় চলিবার সময়ে গা ছম্‌ছম্ করে না এরূপ লোক আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। যদিও ভূতেরা যে কোনও স্থানে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারে,তথাপি যতদূর সম্ভব সতর্কতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি জানালাগুলির খড়খড়ি ও সার্শী উভয়ই বন্ধ করিয়া দিলাম এবং রেলওয়ের চাবীদ্বারা দরজাটীও বন্ধ করিয়া দিলাম। তৎপরে বিছানা পাতিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলাম।

সবে তন্দ্রা আসিয়াছে, হঠাৎ খুট্ করিয়া শব্দ হইল। চাহিয়া দেখি দরজা খুলিয়া লম্বা চেষ্টারফীল্ড কোট গায়ে দিয়া একটি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। এখানে ত কোনও ষ্টেসন নাই এবং মেলট্রেণ আরও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোথাও থামিবারও কথা ছিল না। এ লোকটি কি করিয়া এখানে আসিল ভাবিয়া ঠিক পাইলাম

না। লোকটির বয়স একশতও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে। আমি একবার বিরক্তি সহকারে তাহার দিকে চাহিতে তাহার দন্তবিহীন আস্যে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এখানে ষ্টেশন নাই, আপনি কি করিয়া উঠিলেন?"

সে একপ্রকার অদ্ভুত ভাবে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিল; কোনও কথা কহিল না। আমার সন্দেহ হইল, এই ব্যক্তি প্রকৃত রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট মানুষ, না ভূত? ভয়ে নিজেরই গা ছমছম করিতে লাগিল। আমি বালাপোষটি মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিলাম—যদি ঘাড় মট্‌কায়, তাহা হইলে এই অবস্থাতে মট্‌কানই ভাল। কিন্তু ভূতটি ভদ্র, সে আমার ঘাড় মট্‌কাইল না; পকেট হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। ভূতেরা তাহা হইলে পড়ে? তাহারা ভূতের গল্প পড়িয়া কি আমোদ পায়? আচ্ছা, কোন ভদ্র ভূত আমাদের মাসিক-পত্রে ভূতের গল্প লিখিলে ত বেশ হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিঞ্চিৎ সাহস হইল। আমি বালাপোষ হইতে মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের বাঙ্গালা লেখাটেখা অভ্যাস আছে?"

এবারেও বৃদ্ধ ভূতটি কোনও উত্তর দিল না, মৃদুহাস্য করিতে লাগিল। আধঘণ্টাটাক কোনও উপদ্রব করিতে না দেখিয়া একটু সাহস হইল। পুনরায় নিদ্রার আয়োজন করিলাম। সমস্ত দিন বাজারে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলাম, ভূত থাকা সত্ত্বেও নিদ্রাদেবী আমার প্রতি কৃপা করিলেন। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে ও মস্তকে দারুণ আঘাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিকে চীৎকার ও ক্রন্দনধ্বনি—পুল ভাঙ্গিয়া এঞ্জিন জলগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে—গাড়ীগুলি লাইন হইতে ছুট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম ভূতটী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

প্রথম শ্রেণীর আরোহী বলিয়া আমি রেলকর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা পাইলাম এবং পরদিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। রেলকর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, এনার্কিষ্টরা ট্রেনের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, কোনও কোন সংবাদপত্র সম্পাদক লিখিলেন, উচ্চবেতনভোগী রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ারদের কর্ত্তব্যে অমনোযোগিতার জন্য এই দুর্ঘটনা হইয়াছে, কিন্তু আমার স্থির ধারণা, এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সেই বৃদ্ধ শ্বেতশ্মশ্রু ভূতটি। যদিও হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে আমি আমার এই স্থির ধারণার কথা নিকটতম আত্মীয় বন্ধুকেও বলি নাই—এমন কি আমার সুশিক্ষিতা পত্নী মৃণালিনীর নিকটেও গোপন রাখিয়াছিলাম,তথাপি যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। আমি দিবারাত্র আমার মানসনয়নে সেই বৃদ্ধ ভূতটিকে দেখিতে পাইতাম, নিদ্রাকালে স্বপ্নেও কখন কখন তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতাম। অনেক সময় মনে হইত তাহার স্মৃতি মন হইতে দূর করিয়া দিব। অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু যতই তাহার স্মৃতি মন হইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম, ততই যেন তাহার স্মৃতি অধিকতর দৃঢ়ভাবে আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া উঠিত।

দুই

একবৎসর পরে আবার সেই ঢাকা মেলে যাইতেছি। আমার শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশন। এবারেও অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি। আমার মনে কেবল সেই একবৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনাটি উদিত হইতেছে। এবারেও প্রথম শ্রেণীতে আমিই এক মাত্র আরোহী। •

ট্রেন দুই-তিনটি ষ্টেশন পার হইবার পর আমি নিদ্রার আয়োজন করিলাম। এক ঘুমের পর

চাহিয়া দেখি, অপর বেঞ্চে সেই বৃদ্ধ ভূতটি—যাহাকে একবৎসর ধরিয়া প্রতিদিন আমি মানস-নয়নে দেখিয়া আসিতেছি। আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া দিলাম—"এবার কি মনে করিয়া আসিয়াছ? এবারেও কি ঢাকা মেলের দুর্ঘটনায় গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠাইবে?

সে শুধু হাসিল,—সেই কাষ্ঠ হাসি! প্রাণ ত যাইবেই, একবার নিকটে গিয়া ভূতের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করা যাউক না! আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনার বাড়ীটি কি নাকেশ্বরী ভূতিনীর বাড়ীর ঐ দিকে?"

লোকটি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না। কিছুক্ষণ পরে পকেট হইতে একটি নোটবহি বাহির করিয়া পেন্সিল দিয়া তাহার উপর বড় বড় করিয়া লিখিল:—"কালরাত্রিতে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

"কালরাত্রি!" সে কবে? আমার কি অন্তিম সময় নিকটবর্ত্তী। আমার শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যাইতেছি, তাহাকে কি মৃত্যুর পূর্ব্বে দেখিতে পাইব? আমার প্রিয়তমার সঙ্গে কি আর দেখা হইবে? না নদীগর্ভে ট্রেণসহ সলিল-সমাধি লাভ করিব?

"কালরাত্রি!" কথাটা শুনিলেই ভয় হয়। রাম নাম জপিতে জপিতে নিজের বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম। ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, শীতে না ভয়ে? এবারেও কিন্তু নিদ্রাদেবী আমাকে বরণ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, ভূতটী অদৃশ্য হইয়াছে। গাড়ী এক মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া; এঞ্জিন অবিরত বাঁশী বাজাইতেছে। বোধ হইল, যেন মৃত্যুর আশঙ্কায় এঞ্জিন আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই স্থানেই কি পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় দুর্ঘটনা ঘটিবে? কালরাত্রি কি সমাগত হইল? আমাদের মৃতদেহের উপর তাণ্ডব করিবার জন্য কি বৃদ্ধভূতটি তাহার আত্মীয়জনকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল?

রাম নাম জপিতে লাগিলাম। রাম নামের মহিমাতেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক কোনও বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটিল না, কেবল মেল তিন-চারি ঘণ্টা লেট করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। প্রিয়তমার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া আমি 'কালরাত্রির' কথা ভুলিয়া গেলাম।

পরদিন আমার শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমার শ্বশুর-মহাশয় প্রীতিভোজ দিলেন। তাঁহার বহু পদস্থ বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহার দৌহিত্রকে নানাপ্রকার অলঙ্কারাদি উপহার দিয়া গেলেন।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমিও আহারাদি সারিয়া লইয়া আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, আমার গৃহের একটি কোণে আরাম কেদারায় বসিয়া—সেই বৃদ্ধ ভূতটি। আমার পত্নী মৃণালিনী—আমার শিশুপুত্রটীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—"মিনু, মিনু, ওদিকে যেও না, ভূত, ভূত, তোমার ছেলেকে মারিয়া ফেলিবে,—যেও না—যেও না।"

কিন্তু ভূতেদের কি অপূর্ব্ব আকর্ষণ শক্তি! যে স্ত্রী কখনও স্বামীর অবাধ্য হয় নাই, সে আমার কথা অমান্য করিয়া অবিকম্পিত চরণে সেই ভূতের দিকে অগ্রসর হইল এবং তাহার পায়ের নিকটে শিশুটিকে শোয়াইয়া দিল! আমি সবলে স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলাম। বলিলাম, "কি করিলে! সর্ব্বনাশ করিলে! মানুষ মনে করিয়া ভূতের কাছে ছেলেটীকে ফেলিয়া দিলে। ওঃ! কালরাত্রি! কালরাত্রি!"

আমার স্ত্রী মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি বলিতেছ! তুমি ছোট ঠাকুর্দ্দাকে চিন না? উনি যে আমাদের জ্ঞাতি ঠাকুর্দ্দা—আমাদের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। উনি বোবা ও কালা। অগাধ বিষয় ওঁর। ওঁর বড় ভাই বিষয় হস্তগত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমার ঠাকুর্দ্দার বুদ্ধির কাছে তাঁকে পরাজয়

মানিতে হয়। আমার ঠাকুর্দ্দার চেষ্টায় উনি সমস্ত বিষয় ফিরাইয়া পান এবং হাবা-কালার স্কুলে থাকিয়া লিখিতে ও পড়িতে শিখেন। ওঁকে এ অঞ্চলে সকলে চিনে; কারণ, সকল সৎকার্য্যে উনি অজস্র টাকা দেন। উনি রেলকর্ত্তৃপক্ষকে পূর্ব্বে খবর দিলে যেখানে মেল ট্রেণ থামে না, সেখানেও গাড়ী থামে। আমাদের বিয়ের সময় আসিতে পারেন নাই তাই বলিয়াছিলেন, ছেলের ভাতের সময় নিশ্চয় যাইব। শরীর অসুস্থ থাকায় উনি বাড়ীর ভিতরেই বিশ্রাম করিতেছিলেন। দেখ না, খোকার জন্য কি সুন্দর হীরার কণ্ঠি উপহার আনিয়াছেন।"

এতক্ষণে আমার নিকট সমস্ত সরল হইয়া গেল। আমি শ্রদ্ধাসহকারে এইবার সেই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, উজ্জ্বল হীরক কণ্ঠহার পরিয়া আমার শিশুপুত্রটি তাঁহার কোলে বসিয়া তাঁহার দাড়ী ধরিয়া টানিতেছে, বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে এক পবিত্র স্বর্গীয় স্নেহ ও মমতার জ্যোতি বিকীরিত হইতেছে।

—যবনিকার অন্তরালে—

শ্রীসুশান্তকুমার সিংহ

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটী ত্রিতল অট্টালিকার দ্বিতল কক্ষে 'তরুণ সাহিত্য সভা'র দৈনন্দিন সান্ধ্য-অধিবেশন বসিয়াছে। গৃহস্বামী ও সভার সম্পাদকের পয়সার চিন্তা করিতে হয় না বলিয়া সাহিত্যরসের সহিত চা ও অন্যান্য খাদ্যরসের বিতরণ বেশ ভালভাবে হয়; সুতরাং সভ্যেরা নিয়মিত হাজিরা দিয়া সাহিত্য, তাস, দাবা হইতে শিশির ভাদুড়ী, লয়েড জর্জ্জ পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

সেদিন সন্ধ্যা হইতে বিরহ-বিধুরার অশ্রুর মত বর্ষা কলিকাতা সহরকে সিক্ত করিতেছিল। সাহিত্য-সভার সভ্যেরা মুড়ি আদার কুচি ও পেঁয়াজ সহযোগে একপ্রস্থ চা পান শেষ করিয়া সিঙ্গাড়া সহযোগে আর এক প্রস্থের আশায় আছেন। দুইজন দাবা খেলিতেছেন, একজন সাপ্তাহিক ও মাসিক-পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন বাকী কয়েকজন গান্ধী-আরউইন সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। জয়ন্ত নামক যে যুবকটী সাময়িক পত্রপাঠে রত ছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"চমৎকার!"

একজন তহার মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"ব্যাপার কি হে?"

"কবিতা।"

দাবা—পাশা যে যাহার কার্য্য বন্ধ রাখিয়া সোজা হইয়া বসিল।

—"কবিতা চমৎকার কার হে?"

বিনা ভূমিকায় চশমা উত্তমরূপে মুছিয়া তালগাছ সদৃশ শীর্ণকায় হবু কবি হরেন জলদগম্ভীর স্বরে 'জয়যাত্রা' পড়িতে আরম্ভ করিল। সত্যই কবিতাটী অতি সুন্দর; কবি তাঁহার সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া বাংলার তরুণদের স্বাধীনতার জয়যাত্রায় আহ্বান করিয়াছেন। কবি তাহার সরল প্রাঞ্জল ভাষার ঝঙ্কারে ভাবকে এমন সুন্দরভাবে ফোটাইয়াছেন যে, পড়া শেষ হইলেও একটা নিস্তব্ধতায় তাহার রেশ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিখিলবাবু বলিলেন, "চমৎকার!—লেখকের নামটা কি বললে হে?"

হরেন ধীরকণ্ঠে উত্তর করিল, "শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দোপাধ্যায়।"

কিশলয় বলিল—"শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়—হাঁ, নিতান্ত নূতন কবি নয়—এর আগে দু'-চারটে লেখা আমি পড়েছি—লেখে মন্দ নয়—"

তাহাকে বাধা দিয়া অন্য একজন বলিল,—"মন্দ! অন্যদেশ হ'লে এই এক কবিতায় কবি অমর হতেন।"

কিশলয় বলিল—"আমরা আবার স্বরাজ চাই, দেশের এতবড় একজন কবি এঁর খোঁজই আমরা রাখি না—অথচ হ'ত যদি, আজ বিলেত—"

রবীন্দ্র তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,—"বিলেতের কথা তুলো না, এটা বাংলাদেশ। গিরীশ ঘোষের পাথরের মূর্ত্তিটা এতদিনে গিরীশ পার্কে একটু স্থান পেয়েছে—জান হে, এটা বাংলা-দেশ বাংলা—"

নিখিলবাবু বলিলেন—"এটা বাংলাদেশ তা' আমি স্বীকার করি, আর মাইকেল, গোবিন্দদাসের প্রতি যে অবিচার হয়েছে তাও স্বীকার করি, কিন্তু তখন আমরা—তরুণেরা ছিলাম না—আমরা বাংলার এ কলঙ্ক অপনোদন করব—

সকলে তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল,—"ঠিক

ঠিক। 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি ত মেষ।

"নিখিলবাবু বলিলেন,—"তরুণেরা গুণের সম্মান করতে জানে—আর জানে ব'লে আজ দেশ এত উন্নত হয়েছে—এস আমরা তরুণ সাহিত্য-সভার পক্ষ হতে এই নবীন কবিকে অভিনন্দিত করি।"

সকলে করতালি দিয়া তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিল।

এক সমস্যা, কবির ঠিকানা কোথায় পাওয়া যাইবে?

একজন বলিল,—"তার আর ভাবনা কি? 'মাধুরী' সম্পাদকের নিকট ঠিকানা পাওয়া যাবে।

কিশলয় বলিল,—"ঠিক। কবিবর হরেন্দ্র ঠিকানা আনবে আর, সঙ্গে সঙ্গে পারে যদি ওর কবিতাও দু'-একটা গছিয়ে দিয়ে আসবে।

একটা হাসির রোল উঠিল।

কয়েকজনকে লইয়া অভিনন্দন কমিটী গঠিত হইল। হরেন মাধুরী সম্পাদকের নিকট হইতে কবির ঠিকানা আনিবার ও এলবার্ট হল বন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করিল।

* * *

জয়যাত্রার কবির জীবনযাত্রা বিশেষ সচ্ছল-ভাবে নির্ব্বাহ হয় না। কোনও সওদাগরী অফিসে মাসিক ত্রিশ মুদ্রার চাকরীর ভরসায় স্ত্রী আরতিকে লইয়া কলিকাতায় সংসার চালায়। প্রথম প্রথম তাহাদের দিনগুলি কাব্য-কূজনের মধ্যে দিয়া বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল, কিন্তু দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণ অন্ধকূপের দ্বিতীয় সংস্করণ ঘরটীতে আবদ্ধ থাকায় আরতির শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ক্রমে ক্রমে সে শয্যাশায়ী হইল।

ত্রিশ টাকার মধ্যে বাড়ী ভাড়া দিয়া আহারের খরচ রাখিয়া আর ঔষধ কিনিবার সামর্থ্য না থাকায় প্রথম প্রথম উপবাস ও পরে হোমিও-প্যাথিক ঔষধ দিয়া আরতির জরাজীর্ণ কাঠামোটাকে খাড়া করিবার ব্যর্থ চেষ্টা চলিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—তাহার সে স্বর্ণ-লতাসম দেহ ক্রমশঃ শুকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিল।

পাড়ার ডাক্তারকে হাতে-পায়ে ধরিয়া আনিয়া প্রদীপ আরতিকে দেখাইল। ডাক্তার রোগিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "থাইসিস্। এ ঘরটা চেঞ্জ করুন, আর ভাল ভাল খেতে দিন, আর এই ঔষধটা—"

"প্রেসক্রিপসনখানা লইয়া ডাক্তারখানায় যাইয়া শুনিল, এই ঔষধগুলির দাম ছয় টাকা। সে হতাশভাবে গৃহে ফিরিল। ছয় টাকা!—ছয় পয়সার সংস্থান তাহার নাই। অথচ, সামান্য এই ছয় টাকার জন্য তাহার আদরের, নয়নের মণি আরতি বিনা চিকিৎসায় তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—নানা সম্ভব-অসম্ভব স্থানের কথা তাহার মনে আসিল—সে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিলে আরতি তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"কোথায় যাচ্ছ—হ্যাঁ দেখ, ওষুধ এনো না—পার যদি একটা আনারস এনো—বুঝ্‌লে—ওষুধ এনো না—"

নানাস্থানে ঘুরিয়া ঔষধের দাম ত দূরের কথা একটা টাকাও প্রদীপ যোগাড় করিতে পারে নাই, যাহা দিয়া সে আরতির জন্য একটা আনারস লইয়া যাইবে। অফিসের দরওয়ানের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে সে টাকা ধার করিত; আজ তাহার কাছে টাকায় চার আনা সুদ স্বীকার করিয়াও একটাকা সে পায় নাই, উপরন্তু পূর্ব্বের ঋণ শোধ না করার জন্য বেশ দু'কথা শুনিতে হইয়াছে। অফিসের বড়বাবুর নিকট হইতে কিছু টাকা অগ্রিম চাহিয়া পায় নাই, লাভের মধ্যে বড়বাবু তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, অত

কামাই করিলে চলিবে না, আফিস ত আর তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি নয়। সুতরাং—

স্খলিত চরণে সে গৃহে ফিরিল। আরতির অবস্থা অতিশয় শঙ্কাজনক। সে অতি ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "আমার আনারস?"

প্রদীপের মাথার ভিতরে যেন আগুণ জ্বলিতে লাগিল, সে বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"এই যে আনি।" বলিয়া পুনরায় বাহিরে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

যাইবেই বা কোথায়? কোথাও ত সে বাকী রাখে নাই, তবে—হঠাৎ তাহার নজর পড়িল একখানা পোষ্টকার্ডের উপর। পিয়ন কোন সময় জানালা দিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি চিঠি লইয়া সে পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল—

নির্ব্বাণ কার্য্যালয়

সবিনয় নিবেদন, ১৩ই ফাল্গুন

আপনার কবিত্ব প্রতিভায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। যদি আমাদের বৈশাখ সংখ্যার জন্য একটী হাসির কবিতা দেন তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব! নমস্কার জানিবেন। ইতি

বিনীত

সম্পাদক।

আনন্দের আতিশয্যে প্রদীপের চক্ষু দুইটী জ্বলিয়া উঠিল। সত্যই এই একটা দিকের কথা তাহার মনে পড়ে নাই—দিনের পর দিন ধরিয়া ভাষা জননীর পদতলে যে অর্ঘ্য সে দান করিয়াছে তাহার কি কোন মূল্য নাই, সারা-দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রামহীন অবস্থায়, দেশের রসপিপাসু অধিবাসীদের মুখে হাসির ফোয়ারা ফুটাইবার জন্য তাহাদের কর্ম্মক্লান্ত চিত্তে শান্তির প্রলেপ দিবার জন্য অবসর বিনোদনের জন্য সে যে সাহিত্য সম্ভার উপহার দিয়াছে তাহার কি কোন প্রতিদান নাই—না তাহা হইতে পারে না। সে উন্মত্তের মত আরতির মাথার কাছে যাইয়া বলিল, "আরতি এইবার তোমার আনারস আনব। আরতি নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেও সে একখানা কাগজ লইয়া হাসির কবিতা লিখিতে বসিল।

প্রদীপ তাহার স্বভাবসুলভ প্রমোদন লেখনীর মোহন স্পর্শে ভাষার ঝঙ্কারে কবিতার মধ্যে হাস্য কৌতুকের বিদ্যুৎ সঞ্চারণ করিল। লেখা শেষ হইলে সে আরতিকে বলিল, "আরতি, আমি তোমার আনারস আনতে যাচ্ছি, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে দ্রুতপাদক্ষেপ নির্ব্বাণ কার্য্যালয়ের দিকে অগ্রসর হইল।

সম্পাদককে পরিচয় দিয়া কবিতাটী তাঁহার হাতে দিল। সম্পাদক মহাশয় কবিতাটী পড়িয়া বলিলেন, "অতি সুন্দর হয়েছে, আপনি কথার ফাঁকে হাসির প্রমোদ উল্লাসের সৃষ্টি করেছেন—হ্যাঁ, তা চা—চা খাবেন।"

বিনীতভাবে প্রদীপ জানাইল যে সে চা খায়না তবে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার লেখার বিনিময়ে কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিলে সে কৃতার্থ হইবে। কথটা এত নূতন যে সম্পাদক মহাশয় কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পরে বলিলেন, "পয়সা—কবিতা লিখে—বাংলা দেশে—না কবিতা বা লেখার বিনিময়ে আমরা নূতন লেখককে কিছু দিই না—"

প্রদীপ স্খলিতচরণে নির্ব্বাণ কার্য্যালয় ত্যাগ করিয়া মাধুরী কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল।

সম্পাদক মহাশয় তাহার কথা শুনিয়া খানিকটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন, "বাংলা দেশে কবিতা লিখে পয়সা পাওয়ার সৌভাগ্য একমাত্র রবীন্দ্রনাথের হয়েছে।"

প্রদীপ তাঁহার কাছে দুইটী টাকা ধার চাহিলে তিনি জানাইয়া দিলেন যে সাহিত্য মন্দির মহাজনের আবাসস্থল নয়।

বাল্যে পড়িয়াছিল যে পৃথিবী ঘুরিতেছে। আজ যেন সেই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার পায়ের তলায় মাটী সরিয়া যাইতেছে—সে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘরে ফিরিয়া ডাকিল "আরতি।" আরতি যেন এই আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিল সে ধীরে ধীরে বলিল "আনারস।"

তাহার কথা আর শেষ হইল না—কাল তাহার শান্তিদায়ী হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহার শেষ নিশ্বাস গ্রহণ করিল! প্রদীপ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উন্মত্তের মত আরতির বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল—তাহার চক্ষু দুইটী স্থির, নিথর হইয়া গেল। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে—রূপালী আলোয় সমস্ত সহরটী এক অপূর্ব্ববাসে সজ্জিত হইয়াছে।

* * *

সেইদিন সন্ধ্যার সময় তরুণ সাহিত্য সভায় অভিনন্দন পত্রখানি খদ্দরে অথবা তুলট কাগজে মুদ্রিত করা হইবে তাহা লইয়া সভ্যগণের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছিল।

—টিউবওয়েল—

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

দুই

সোমবারে রমেশকে মীরা প্রেসে কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। প্রেসের কর্ত্তা বলেছিলেন যে, সাত দিন কাজ দেখে মাইনে ঠিক করে দেবেন।

শনিবার সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল, তবুও রমেশকে বাড়ী আস্‌তে না দেখে আমার গৃহিণী বল্‌লেন, কই, রমেশ ত এখনও এলো না। এ কয়দিন ছটা বেজে দশমিনিট হ'তে না হ'তেই সে বাড়ী এসেছে, কোথাও একটুও বিলম্ব করে নাই। আজ কি হোলো। সহরে ত কখন আসে নাই, এখানকার কিছুই জানে না। তাই আমার সকল সময়ই ভয় হয়।

আমি একটু হেসে বল্‌লাম, তোমার রমেশ ত আট বছরের ছেলে নয়, আর তার গায়ে হাজার টাকার অলঙ্কারও নেই যে, ছেলেধরারা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। রমেশকে যে তুমি চোখের আড়াল করতে চাও না।

গৃহিণী বল্‌লেন, আহা, গরীবের ছেলে! এখানে ওকে কে দেখ্‌বে? নিতান্ত কষ্টে আর অভাবে পড়েই এই ছেলেবয়সে চাকুরী করতে এসেছে। আর ছেলেটি যে কি সুন্দর স্বভাবের, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ। এমন ছেলের উপর মায়া না হয়েই পারে না।

আমি বল্‌লাম, সে ঠিক কথা, কিন্তু তা ব'লে প্রেস থেকে আসতে তার আধ ঘণ্টা দেরী হ'লেই যে তুমি অধীর হয়ে পড়, এও ত ভাল নয়! হয় ত আজকে তাকে ওভারটাইমে কাজ করতে হবে। এও ত হ'তে পারে।

গৃহিণী বল্‌লেন, না, না, রমেশ বলেছে তাকে পাকা না করা পর্য্যন্ত ওভার-টাইমে কাজ করতে দেবে না। সেই জন্যই ত ভাবছি, সাতটা বেজে গেল, এখনও—

গৃহিণীর মুখের কথা শেষও হোলো না, রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই আমার গৃহিণীকে প্রণাম করল; তার পর সেই উদ্দেশ্যেই আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে দেখে আমি তার হাত চেপে ধরে বল্‌লাম, কি হে রমেশ, আমি ত শুনেছি, আর দেখেছিও, কাজে বেরুবার সময় তুমি ওকে প্রণাম ক'রে পদধূলি নিয়ে যাও। এখন কি ওটা বাড়িয়ে দিলে? এখন নিরাপদে তোমার মায়ের কাছে ফিরে এসে প্রণাম করার ব্যবস্থা করেছ না কি?

রমেশ বল্‌ল, আগে আপনার পায়ের ধূলো নিই, তার পর কথা বল্‌ব। মা উপস্থিত থাক্‌তে ত আগে আপনার পায়ের ধূলো নিতে পারিনে! কেমন মা, তা কি ঠিক্‌?

আমি বললাম, তুমি ঠিক বলেছ। উনি হচ্ছেন, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, ওঁর পূজা ত আগেই হবে। তারপর অন্য কথা।

রমেশ বল্‌ল, তা' আমি জানি নে, আমি জানি আগে মা, তারপর বাবা।

আমি বল্‌লাম, বাবা না থাকলেও চলে রমেশ। শোন নি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এর মধ্যে বাবার নাম গন্ধও নেই।

রমেশ বল্‌ল, তা না থাকুক। মা আপনি যে বলেছিলেন, আমার কাজ তাঁদের পছন্দ হবে না, তাঁরা আমাকে রাখবেন না। তা হয় নি মা! তা হয় নি মা! তাঁরা এই ছয় দিন কাজ দেখে

আমাকে আজ একেবারে বহাল ক'রেছেন। আর শুনে অবাক হবেন মা, আমাকে মাসে চব্বিশ টাকা মাইনে ঠিক ক'রে দিয়েছেন, একেবারে চব্বিশ টাকা। আমি কিন্তু মা এত মাইনের কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। আমি ভেবে-ছিলাম, বারো টাকা দেবে. আর যদি বেশী অনুগ্রহ করে, তা হ'লে পনের টাকা। তা, নয়, এ-কে-বা-রে চব্বিশ টাকা! খুব বেশী হয় নি মা, আপনিই বলুন। আর দেখুন মা, আমার প্রবল সন্দেহ হয়েছে, এই এত টাকা মাইনে দেবার ব্যবস্থার মধ্যে বাবুর হাত আছে, নইলে কি এত বেশী দেয়। আমার কথা ঠিক কি না বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন না মা।

আমি বললাম, জিজ্ঞাসা করতে হবে না। মীরা প্রেসের ম্যানেজার তারকবাবুর সঙ্গে আজ সকালে দেখা হয়েছিল। তিনি রমেশের কাজের খুব প্রশংসা ক'রে আমাকেই মাইনে ঠিক ক'রে দিতে বল্লেন। আমি কুড়ি টাকা বল্‌তে, তারক-বাবু বল্লেন, না, না, অমন কাজের লোককে অত কম দেওয়া ঠিক নয়। ওকে আপাততঃ চব্বিশ দিই। তিন মাস পরে ত্রিশ করে দেব। আর ওভারটাইম দিয়ে আরও কিছু পাইয়ে দেব। সুতরাং হে শ্রীমান রমেশচন্দ্র, আমি তোমাকে চার টাকা কম দেবারই প্রস্তাব ক'রে ছিলাম; সুতরাং, তোমার প্রণাম আমার প্রাপ্য নয়। বরঞ্চ তোমার মাকে আর একবার প্রণাম কর; কারণ, উনি তোমার প্রণাম পেলে সোনার দোয়াত-কলম হোক বলে আশীর্ব্বাদ করেন! চব্বিশ টাকাতে ত আর সোনার দোয়াত-কলম হয় না। ওঁকে বারবার প্রণাম কর, তা' হ'লে চাই কি দু'-চার বছরের মধ্যেই তোমার সোনার দোয়াত-কলম হবে। ওঁর আশীর্ব্বাদ বড় ফলে রমেশ। এই দেখ না, ওই সোনার দোয়াত-কলম হোক্ বলে আমার নরেশ আর পরেশকে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করতেন কি না, সেই আশীর্ব্বাদের ফলে নরেশ এম-এস্-সি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হয়ে সরকারী হিসাব বিভাগের এমন বড় চাকুরী পেয়েছে; তার সোনার দোয়াত হয় নি, কিন্তু সোণার কলম হয়েছে। মেজ ছেলে পরেশ যে এবার বি-এ অনারে ইংলণ্ডে ফার্ষ্ট হয়েছে, তাও ওঁর ওই সোনার দোয়াত-কলম হোক্, এই আশীর্ব্বাদের ফল।

গৃহিণী হেসে বল্লেন, সুধু সে আশীর্ব্বাদ ফল্‌ল না আমার দীনেশের বেলায়, সে কোন রকমে আই-এস-সি পার হয়েছে।

রমেশ বল্‌ল, দেখ্‌বেন বাবু, মায়ের আশীর্ব্বাদ ফলবেই, ছোট্‌-দা বি-এস-সিতে সবার উপরে যদি না হন, তা হলে আমি মা, আপনার ছোট ছেলেই নই। যাক্‌গে সে কথা। এই দেখুন না, এই ছয়দিনের মাহিনের টাকা পেয়েছি। এই বলে রমেশ কয়েকটা টাকা আর গোটাকয়েক এক-আনি আমার গৃহিণীর পায়ের কাছে রেখে দিল। তিনি সবগুলি কুড়িয়ে নিয়ে রমেশের মাথায় ঠেকিয়ে, তারপর নিজের মাথায় ঠেকিয়ে রাখ্‌লেন।

আমার বড় ছেলে নরেশ আমার পাশেই এক-খানি ইজি চেয়ারে বসেছিল। সে বল্‌ল, মা, রমেশ কত পেলে?

গৃহিণী বল্লেন, কত পেলে, সে হিসেব তুমি এতবড় হিসেব-নবীশ হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছ!

পরেশ হেসে বল্‌ল, আমি বল্‌ব মা, এ মাস ত্রিশ দিন, তা' হ'লে চব্বিশ টাকা হিসেবে ছয় দিনের মাইনে—এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকেই বল্‌ল, চার টাকা, বারো আনা, তিন পয়সা। দেখ দেখি গণে মা, ঠিক হয়েছে কি না।

গৃহিণী টাকা গণে বল্লেন, ঠিক হবে না কেন? এই সামান্য হিসেব, এ যে আমি ও কর্‌তে পারি; তুমি ত চার-শো টাকা মাহিনের অডিটর!

নরেশ বল্‌ল, বাবা, এক কাজ কর্‌তে হবে।

রমেশকে মা ত পোষ্যপুত্রই নিয়েছেন, সুতরাং ওর একটা ব্যবস্থা এখন থেকেই করতে হবে।

আমি বললাম, সে ব্যবস্থা ত তোমার মা ক'রে ফেলেছেন, আমি ও তোমরা কয়ভাই যতদিন বেঁচে থাক্‌ব ও থাক্‌বে, ততদিন রমেশ তোমাদের ছোট ভাইয়ের মতই থাক্‌বে। আর কয়েক দিন যাক্, পরেশের যখন বিয়ে দেব, তখন রমেশেরও বিয়ে দিয়ে ওর বৌকে এনে এখানে রাখা যাবে।

নরেশ বলল, সে ত বেশ কথা। আর কিছু ?

রমেশ বলল, আরও কিছু বলুন মা! বড় দা' চুপ করলেন যে, বলুন, রমেশকে বর্দ্ধমানের রাজার জমিদারী কিনে দেবেন। আচ্ছা মানুষ ত আপনারা! কোথাকার কে এক পিতৃহীন মাহিন্যের ছেলে, তাকে নিয়ে এত করা কেন? চব্বিশ টাকা মাহিনের কম্পোজিটর যে আমি, সে কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন। কেমন মা, ঠিক কথা নয়।

নরেশ হেসে বলল, তুমি এই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান কর ত রমেশ। যাও হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জল খাও গে।

গৃহিণী বললেন, দেখেছ, সে কথা ভুলেই গিয়েছি। ও যে ছ'টার পরেই এসে যা হয় খায়, আজ সাতটা বেজে গেল, তবুও ওকে না দেখার ভাবনায় ও কথাটা মনেই আসে নি।

রমেশ বলল, মা, আমি ইচ্ছে করে দেরী করি নি। ছুটি হবার একটু আগেই ম্যানেজার-বাবু বলে পাঠালেন, তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেন আমি চলে না আসি! অন্য কম্পোজিটারবের মুখে শুনলুম, আজ তারা হপ্তা পাবে; তাদেরও বাসায় যেতে দেরী হবে। তারা না হয় হপ্তা পাবে, আমি ত পাব না, এখনও চাকরীই হয় নি। তা' কি করব ম্যানেজারবাবুর হুকুম, থাকতে হলো। ছটার পর সকলের হপ্তা দেওয়া শেষ হয়ে গেলে ম্যানেজার-বাবু আমাকে ডেকে বললেন যে, তিনি আমাকে চব্বিশ টাকা ক'রে মাইনে দেবেন। তার পরই এই হপ্তার মাইনে আমাকে দিলেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে আমি ছুটে এসেছি; পথে একটুও দেরী করি নি মা। প্রেসেই যে দেরী হয়ে গেল, তার আর কি করব, কেমন মা?

গৃহিণী বললেন, সে ত ঠিক কথা। এখন হাত-মুখ ধুয়ে এসো।

নরেশ বলল, বাবা, মা তুমিও শোন, এই ছেলেটি যাদুবিদ্যা জানে। তোমাদের ত যাদু করেছেই এই সাত-আটদিনের মধ্যে। আমি যে এমন জানোয়ার, আমাকেও রমেশ বশ করে ফেলেছে। এই কয়দিনে দেখছি, বাড়ীসুদ্ধ সবার মুখেই রমেশ! যাক গে সে কথা। আমি বলছিলাম কি বাবা, এক কাজ করা যাক্, রমেশ যা' মাইনে পাবে, সে টাকা ও মাসে মাসে ওর মাকে পাঠিয়ে দেবে; এখানকার ওর সব খরচ বাবা, আপনি চালাবেন। আমি কি করতে চাই জানেন। ওদের প্রেসে ত প্রভিডেণ্ট ফণ্ড নেই। আমি ওর জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড করব। ও মাসে যে টাকা মাইনে পাবে, আমি ঠিক সেই পরিমাণ টাকা আপাততঃ পোষ্ট অফিসের সেভিং ব্যাঙ্কে ওর নামে রেখে দেব। একটু বেশী জমা হ'লেই ইম্পিরিয়ালে একটা একাউণ্ট খুলে দেব কি বলেন বাবা।

আমি বললাম, অতি সুন্দর প্রস্তাব!

রমেশ লাফিয়ে উঠে বলল, অর্থাৎ রমেশচন্দ্র আজই রাত্রির গাড়ীতে দেশে চল্লেন। গরীবের ভাগ্যে এত সইবে না মা, সইবে না। এই ব'লে রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

—ঘরোয়া ভূত—

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কত রকমের কত ভূতের কথা আমরা শুনিয়াছি। প্রথম একটি অতি সাধারণ হইতে আরম্ভ করা যাক।

আমাদের গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটা পুকুরের পাড়ে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ আছে, অনেকে বলে গাছটায় না কি ভূতের আড্ডা। শ্যাম কবিরাজ একদিন অন্য গ্রামের রুগী দেখিয়া রাত্রে ওই পথ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। অন্ধকার রাত্রি। সঙ্গে লোকজন কেহ নাই। যেই সে বটগাছটার তলায় আসিয়াছে, পিছনে শব্দ হইল 'ঝুপ্।' কবিরাজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। ভয়ে ভয়ে চারিদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় আবার সাহস করিয়া অগ্রসর হইলেন। অমনি কে যেন ডাকিল, 'কোবরেজ ?'

কবিরাজ পিছন ফিরিয়া বলিল, 'কে রে ?'

আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই। দেখিল, প্রকাণ্ড লম্বা কালো রঙের একটা লোক তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। অন্ধকারে ভাল চিনিতে পারা গেল না।

কবিরাজের সাহস একটুখানি বেশী। আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কে রে তুই ?'

লোকটা অত্যন্ত কাছে আসিয়া বলিল, 'আঁমি !'

গলার আওয়াজ শুনিয়া কবিরাজের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। অনুনাসিক হইলেও স্পষ্ট পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল, এ কণ্ঠস্বর গ্রামের রতন স্যাকরার। অথচ দিন কুড়ি-পঁচিশেক আগে রতন স্যাকরা মরিয়াছে। অসুখের সময় সে তাহারই ঔষধ খাইতেছিল। মৃতদেহটা সে তাহার নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। কবিরাজের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। গলার ভিতরটা পর্য্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। মনে মনে 'রাম রাম' বলিতে বলিতে সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

দৌড়ের অন্ত নাই, পিছনে পদশব্দেরও শেষ নাই। কবিরাজ দু-একবার চাহিয়া দেখিল,—নাগাল কতদূর; কিন্তু প্রথমবারের সেই হাত-খানেক ব্যবধানকেই প্রাণহীন প্রাণীটি যেন কিসের একটা বাধায় অতিক্রম করিতে পারিতেছিল না।

অন্তরের ভয় এ অবস্থায় কেবল এইটুকুতে শান্ত হইবার নহে। কাজেই কবিরাজের গতি দ্বিগুন বৃদ্ধি হইল। পশ্চাতের পদশব্দও সমান তালে আসিতে লাগিল।

ভূত বলিয়া কোনও জীবন্ত জীবের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে কি না কে জানে; অথচ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ভূতের কাহিনী প্রচলিত। কাহারও বা নিজের চোখে দেখা, কাহারও বা পরের কাছে শোনা। সে যাহাই হোক্, যে বস্তু আমরা সচরাচর চোখে দেখিতে পাই না, যাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচর, তাহার সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের আর অন্ত নাই। তাই ভূতের কাহিনী শুনিয়া আমরা ভয়ও পাই, আবার শুনিতে ভালও বাসি।

কিছুদিন হইতে আমরা নানা দেশ-বিদেশের ভূতের কাহিনী সংগ্রহ করিতেছি। 'গল্প-লহরী'র পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কাহারও যদি ভূতের কাহিনী জানা থাকে এবং তিনি যদি দয়া করিয়া তাহা আমাদের পাঠাইয়া দেন ত' বড় ভাল হয়। কাহিনী ভাল হইলে তাহা আমরা প্রেরকের নাম-ধাম-সহ পত্রস্থ করিব। ইতি,

সম্পাদক—গল্প-লহরী

খানিকদূর ছুটিয়া আসিয়া যেই সে গ্রামে ঢুকিয়াছে, পশ্চাতে একবারে পিঠের কাছে শুনিল রতন যেন 'হি হি' করিয়া হাসিতেছে! এবার পিছন ফিরিতে কবিরাজের আর সাহস হইল না। 'বু বু' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে আবার সে ছুটিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ গ্রাম। কোথাও কাহারও সাড়া শব্দ নাই। হঠাৎ দেখিল, সম্মুখে একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া কে যেন তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। এতক্ষণে কবিরাজের ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। পশ্চাতে শোনা গেল, রতন বলিতেছে, 'তোমার সঁঙ্গে এঁকটা কঁথা ছিঁল কোঁবরেজ, আঁচ্ছা, আঁজ যাঁও।'

লণ্ঠন লইয়া কেদার চাটুয্যে ওপাড়া হইতে দাবা খেলিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। কবিরাজ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।—'বাঁচালে ভাই, আজ তুমি আমায় বাঁচালে।'

তাহার পর অনেক কথা। কেদার চাটুয্যে সেদিন তাহাকে লণ্ঠন লইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

সেই দিন হইতে সন্ধ্যা হইলে কবিরাজকে কেহ আর বাড়ীর বাহির করিতে পারে না। হাজার কাজ থাকিলেও আজকাল দেখি, কবিরাজ অধিকাংশ সময় ঘরের মধ্যে লোকজন জড়ো করিয়া বসিয়া বসিয়া গল্প করে।

ঘরের বাহিরে, এম্‌নি কোথাও হয় ত কোনও মাঠের মাঝে, কিংবা কোনও নদীর ধারে, কিংবা কোনও পথের পাশে ভূতের আস্তানার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। আজ আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ বাহিরের যে গেছো-ভূতটির কথা বলিলাম, ইহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। এম্‌নি আরও অনেক অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর কাহিনী আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

এই সব বাহিরের ভূতগুলা বরং পথে আছে, সে পথ দিয়া না চলিলেই হয়, কিন্তু আর এক রকমের ভূতের কথা আমরা জানি, যাহারা বাড়ীর মধ্যেই বাস করে। ইহারাই সব চেয়ে বেশি ভয়াবহ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যে ঘরে দিবারাত্রি মানুষ বাস করিতেছে, সেই ঘরেই যদি ভূতের উপদ্রব সুরু হয়, তাহা হইলে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবারই কথা।

এমনি একটি ঘরোয়া ভূতের কাহিনীই আজ আপনাদের বলিব।

দূর-সম্পর্কের আমার এক পিসে-মশাই মাইল চারেক্ দূরের একটি গ্রামে ডাক্তারী করেন। ছোট-খাটো গ্রামখানিও যেমন, পিসে-মশাই আমার ডাক্তারও তেম্‌নি। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষায় ফেল্ করিয়া রাণীগঞ্জের কোন্ একটা কলিয়ারীতে প্রথমে ডাক্তারী করিতেন, সেখানে তেমন পসার-প্রতিপত্তি না হওয়ায় এই গ্রামখানিতে আসিয়া ডাক্তারখানা খুলিয়া বসিয়াছেন। এখানে পসার তাঁহার বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তিন বছরের প্র্যাক্‌টিস, ইহারই মধ্যে ছোট সেই গ্রামখানির পূর্ব্বদিকে একতলা একটি দালান বাড়ী তৈরি করিয়া পিসিমা এবং ছেলেমেয়ে সকলকে আনিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাইতেছেন।

হঠাৎ একদিন শুনিলাম, আমার সেই পিসে-মশাইএর নাকি ভয়ানক অসুখ। আমাকে তিনি একবার দেখিতে চান। খবর যখন পাইলাম, তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। স্ত্রী বলিলেন, 'যাওয়া তোমার উচিত।'

তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম। শীতকালের বেলা। গ্রাম পার হইয়া বেশীদূর যাইতে না-যাইতেই সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার রাত্রি। জোরে-জোরে পা চালাইয়া পথ চলিতেছি। সুমুখে ছোট একটি খালের মত নদী। বর্ষাকাল ছাড়া জল তাহাতে থাকে না। শুকনো বালি ভাঙ্গিয়া পার হইতে হয়। নদীটা পার হইয়া ওপারে কয়েকটা

কাঁঠাল-গাছের মাঝখান দিয়া পথ। একে অন্ধকার, তাহার উপর গাছের তলায় অন্ধকার যেন বেশ একটুখানি গাঢ় হইয়াছে।

হঠাৎ সেই গাছের তলায় পিসে-মশাইএর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা! একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়া মিনিটখানেক 'হাঁ' করিয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলাম 'বা, এই না শুনলাম আপনার ভয়ানক অসুখ। আপনার সঙ্গে দেখা করতেই ত' যাচ্ছি।'

পিসে-মশাই বলিলেন, 'ভুল শুনেছিস্, অসুখ তোর পিসিমার। তারই জন্যে ভাল একটি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি শহরে।'

বলিয়া তিনি আমার মুখের পানে অন্ধকারেই কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন,তাহার পর বলিলেন, 'যা' তা'হ'লে তোর পিসিমাকেই একবার দেখে আয়। কাছেই রয়েছিস, ওদের তুই দেখাশোনা করিস্ বাবা।'

বলিয়াই তিনি আর আমার জবাবের অপেক্ষা না করিয়া হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গ্রামে পৌঁছিতে রাত্রি হইল। কিন্তু অবাক্ কাণ্ড! শুনিলাম গত রাত্রে পিসে মশাই মারা গিয়াছেন। ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিল। বড় মেয়ের বয়স বছর পনের বিবাহ এখনও হয় নাই, নাম—সাবিত্রী। কাঁদিল সেই সবার চেয়ে বেশী। দেখিলাম, পিসিমার সত্যই অসুখ। একসঙ্গেই তাঁহারা দু'জনে অসুখে পড়িয়াছিলেন। পিসে-মশাই মারা গেলেন। পিসিমার বাঁচিবার আশা এখনও খুব কম। অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছেন। পিসে-মশাইয়ের মৃত্যু সংবাদ এখনও তাঁহাকে জানানো হয় নাই।

আহা বেচারা সাবিত্রী! ওইটুকু মেয়ে ছোট ছোট ভাই-বোন গুলিকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে! একদিকে মরণাপন্ন মা'র দেখাশোনা অন্যদিকে ভাই বোনগুলির জন্য রান্না করা, খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো—নাকালের এক শেষ!

মনে পড়িল, পিসে-মশাই আমায় সেই জন্যই আজ সন্ধ্যায় দেখা দিয়া বলিলেন, 'কাছেই রয়েছিস্ ওদের তুই দেখাশোনা করিস্ বাবা।'

কথাটার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। এতক্ষণে বুঝিলাম, কেন তিনি সে কথা আমায় বলিয়াছিলেন।

পিসে-মশাইয়ের সঙ্গে যে আমার দেখা হইয়াছে কাহাকেও তাহা জানাইলাম না। ভাবিলাম কি জানি, নিতান্ত ছেলেমানুষ, ইহারা হয়ত' কথাটা শুনিয়া ভয় পাইতে পারে।

সাবিত্রী ষ্টোভ জ্বালিয়া আমার জন্য চা তৈরি করিতেছে। বলিলাম, 'বড় কষ্ট তোর সাবিত্রী, কাল তোর বৌদিকে এখানে পাঠিয়ে দিই, পিসিমা যতদিন সেরে' না ওঠেন ততদিন সে এইখানেই থাক্।

সাবিত্রী হেঁটমুখে চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিল। ভাবিয়া ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'বৌদিরও ত' কষ্ট হবে দাদা, তার চেয়ে কাল সকালে তুমি একটি কাজ যদি করতে পার ত' বড় ভাল হয়। এ-গাঁয়ের একটি চাষাদের মেয়ে সারাদিন আমার কাছে থাকে, কাজকর্ম্ম করে' দেয়। রাত্রেও সে থাকতে পারে কিন্তু তার বাড়ীতে এক কাকা আছে তাকে বলতে হবে! তুমি যদি তার কাকাকে কাল একবার বুঝিয়ে বল! গরীব মানুষ, দু'চার টাকা মাইনে পেলেই রাজি হবে। আর একজন ভাল ডাক্তার···।'

ডাক্তার আমি কাল সকালে শহর হইতে লইয়া আসিব ঠিক করিয়াছিলাম। বলিলাম, 'বেশ, তাই হবে। কিন্তু টাকাকড়ির ব্যবস্থা কেমন করে' হচ্ছে···।

কথাটা আমাকে শেষ করিতে হইল না।

সাবিত্রী বলিল, 'বাবা কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু দাদা, মাও যদি না বাঁচে!...'

বলিতে বলিতে ঠোঁটদুইটি তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল।

সান্ত্বনা দিবার কিই-বা আছে! বলিলাম, 'চুপ কর্ সাবিত্রী, কাঁদিস্‌নে, পিসি-মা সেরে' উঠবেন। ভাল একজন ডাক্তার কাল আমি সকালেই নিয়ে আসব।'

বসিয়া বসিয়া কাঁদিলে সাবিত্রীর চলে না। দেখিলাম, সে কথা সে জানে। এক দুঃখেও তৎক্ষণাৎ সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ও-ঘরে তাহার মাকে একবার দেখিয়া আসিয়া আমায় চা দিতে বসিল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিসিমার কাছে আমিই বসিয়াছিলাম। সাবিত্রী এই বয়েসেই পাকা গৃহিণী হইয়া পড়িয়াছে। কোন্ সময় সে যে খাবার তৈরি করিয়াছে বুঝিতেই পারি নাই। ভাই বোনগুলিকে খাওয়াইয়া, শোয়াইয়া, আমাকে খাইতে দিয়া নিজে আবার সে মা'র কাছে গিয়া বসিল।

সাবিত্রী ও আমি—দু'জনে পালা করিয়া রাত্রি জাগিব কথা হইল! সাবিত্রী প্রথমে রাজি হয় না। বলে, 'না দাদা, তুমি শোওগে। আমার এ-সব অভ্যেস্ হয়ে গেছে।'

হাসিয়া বলিলাম, 'পাগল!'

পিসিমার কপালে জলের পটি দেওয়া হইয়াছে। মাঝে-মাঝে একবার করিয়া জ্ঞান হয়, আবার কিয়ৎক্ষণ পরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন।

আহারাদির পর সাবিত্রীকে জাগিতে বলিয়া আমি নিজে একটুখানি গড়াইয়া লইলাম। চোখে ঘুম আসিল না। খানিক্ পরে উঠিয়া পিসিমার ঘরে গিয়া বলিলাম, 'যা সাবিত্রী, ঘুমোগে যা।'

সাবিত্রীর উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, তবু তাহাকে উঠাইয়া দিলাম! কত রাত্রি পর্য্যন্ত রোগিণীর শিয়রে বসিয়াছিলাম জানি না, সাবিত্রী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'যাও দাদা, এবার তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

আমিও উঠিব না, সেও ছাড়িবে না! অবশেষে কি আর করি, সাবিত্রীকে বসাইয়া রাখিয়া আমার যে-ঘরে বিছানা হইয়াছিল, সেই ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। বাহিরে ডিস্‌পেন্সারী ঘরে ঘড়ি ছিল। ক'টা বাজিয়াছে ঠিক বুঝি-লাম না। তবে রাত্রি যে অনেক, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। চারিদিকে সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে। শীতে একেবারে জড়সড় হইয়া লেপ্ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। আলো নিভাইয়া দিয়াছি। ঘর অন্ধকার। দরজা খুলিয়াই রাখিয়াছিলাম। যদি কোনও প্রয়োজন সাবিত্রী ডাকিতে আসে!

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না! একে শীতকাল, তায় আবার রাত্রি জাগিয়াছি। ঘুম বোধকরি একটুখানি বেশিই হইয়াছিল। কি যেন একটা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। হঠাৎ কে যেন আমায় একটা ঝাঁকানি দিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। ঘুমের ঘোরেই বলিলাম, 'কে?'

সাবিত্রীর কথা আমার মনে ছিল না। আমি যে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছি সেকথাও হয়ত স্বপ্নের ঝোঁকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আবার কে যেন আমায় জাগাইবার জন্য নাড়া দিল। এবার ঘুমটা আমার একটুখানি ভাঙ্গিল বলিয়া মনে হয়। হাত বাড়াইতেই একটা হাতের সঙ্গে আমার হাত ঠেকিল। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় হাতটা চাপিয়া ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না।

এইবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধকার ঘর। হাতে চুড়ি নাই, সুতরাং সাবিত্রী নয় সেকথা সত্য। শক্ত পুরুষের হাত বলিয়া মনে হইল। ডান হাতে

হাত খানা চাপিয়া ধরিয়া বাঁহাত দিয়া একটু একটু করিয়া অনুভব করিতে করিতে তাহার কনুই পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলাম। তাহার পর হাত দিতে গিয়া দেখি—ফাঁকা। কনুই পর্য্যন্ত মাত্র একখানা হাত। লেপের মধ্যেও ভয়ে একেবারে রোমাঞ্চিত হইয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলাম। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলাম, 'সাবিত্রী!"

বুঝিলাম, ঘরে রোগী রহিয়াছে। চীৎকার করা উচিত নয়। অথচ অন্ধকারে বিছানা হইতে উঠিয়া যে রোগীর ঘরে যাইব—তাহারও ক্ষমতা নাই। অতি কষ্টে উঠিতে হইল। মরি-বাঁচি করিয়া একরকম চোখ বুজিয়াই রোগীর ঘরে গিয়া দেখি, মা'র শয্যার পাশে সাবিত্রী মাথা লুটাইয়া বোধকরি রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির জন্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

পিসিমার জ্ঞান হঠাৎ কখন্ হইয়াছে কে জানে। অনুচ্চ এবং অস্পষ্টকণ্ঠে তিনি বলিতে-ছেন, 'জল! জল! একটু···জল!"

কে জাগাইয়াছে না বুঝিলেও আমায় যে কেন জাগানো হইয়াছে বুঝিলাম।

—পথে—

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

সন্ধ্যা হওয়ার আগে যে সময়টায় সহরের পথের কোলাহল বাড়িয়া ওঠে, ধোঁয়া আর ধূলো অপরিসর গলিগুলোকে যখন মসী-মলিন করিয়া তোলে, তখন আমি রাজপথের গোলমাল এড়াইয়া একটা বস্তির ভিতর দিয়া চলিতে-ছিলাম।

একটুখানি রাস্তা—তার আশ-পাশে খোলা, আর টিনের বাড়ীগুলো তো আছেই, তাদের মাঝে মাঝে চূণ-বালি-খসা থুথ্‌রে বুড়োর মত পাঁজরা সার দু'-তিনতলা বাড়ীও উঁকি দেয়!... মান্ধাতার কোনযুগে জন্মাইয়াছিল—হয় ত তাহারি তাহা মনে নাই।

যৌবনে - যে বয়সে—মানুষ শুধু স্বপন দেখে—যৌবনেরই মাদকতার...আমার কিন্তু সে বয়েস কাটিয়া গেল দাসত্বের সন্ধানে—পেটে ভাত নেই—ও নেশা জাগিবে কোথা হইতে?

তরুণীর প্রেম। ও আমার কাছে কল্পনার আন্‌কোরা জিনিষই রহিয়া গেল,—আমার ব্যগ্র ব্যাকুল উদগ্র বাসনা আলিঙ্গন করিতে চায়—দাস-জীবনকে। কিন্তু অদৃষ্টে তাও জোটে না। তাই ভাবি আর চলি—

আমার অতি পশ্চাতে একটা মেয়ে হন হন করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, আমার লক্ষ্য পড়িল তখন, যখন সে আমায় ডাকিল—দেখুন?

আমি ফিরিয়া চাহিয়া চমকাইয়া উঠিলাম এ কী আমার জীবনের ধ্রুবতারা না কি! হাসি ও আসে! যার পেটে দুটো দানা জোটে না, তার অন্তরে এ কী সাড়া! কিন্তু মানুষের বয়েস আর রীতিটা যায় কোথায়? আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সে বলিল, আপনার দেশলাইটা একবার জ্বালবেন?

ভোঁক ভোঁক করিয়া সুতীব্র আলো ছড়াইয়া একটা মোটর ছুটিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি দু'জনে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম। সংকীর্ণ পথটায় আমার গা ও'র গায়ে গায়ে মিশিয়া না যাইয়া থাকিতে পারে না।...আমার রক্তে রক্তে তুফান জাগিয়া ওঠে, মোটরের আলোয় দেখি—উজ্জ্বল ভাসা-ভাসা চোখ...শান্ত মুখশ্রী, রক্তভরা গাল...

গাড়ী চলিয়া গেলে সে বলে, ৮৪।১। ডি বাড়ীটার নম্বর দেখে নোব।...যে অন্ধকার।

আলোয় নম্বর দেখিয়া বলি, এতো চৌষট্টি এখনো অনেকখানি যেতে হবে।

সে একটু হাসিয়া বলে, অগত্যা—আমি এ পথে কখনো আসি নি...গাড়ী ছাড়া তো চলি না। কিন্তু কি জানেন, আমাদের কলেজে একটা মেয়ে পড়ে—জয়ন্তী...তারা বড় গরীব—আমি তাকে কিন্তু বড় ভালবাসি। আজ পাঁচ-সাত দিন সে কলেজ যায় নি, তাই খোঁজ নিতে এসেচি। গাড়ীতে আসি নি মানে আমার বাবা পছন্দ করেন না, যে আমি যার তার সঙ্গে মিশি, তাই জানাজানি হবার ভয়ে...কিন্তু এতদূর হবে জান্‌লে আস্‌তুম না—রাত হ'য়ে গেল।

তার দু'টী চোখ শঙ্কায় পরিপূরিত হইয়া ওঠে। বলি, চলুন আমি যখন আপনার সঙ্গে আছি,—ভয় কি।

নির্ভরতা আর ধন্যবাদ তার শঙ্কাকুলনেত্রে চট্‌ করিয়া ভাসিয়া আসে।...

পাশাপাশি অতবড় মেয়ের সঙ্গে কখনো

চলি নাই।···রাস্তার চলতি লোকগুলো চায়। আমার লজ্জায় গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে—

ও কিন্তু দিব্যি স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে!···

৮৪।১ডি বাড়ীর কাছে আসি—খোলার বাড়ী···তাতে তার দেওয়ালের মাটী ধসিয়া গিয়া বাঁশ, কঞ্চি বাহির হইয়া আসিয়াছে···শিকল নাড়ায় জয়ন্তী বাহির হইয়া আসে। বলে,—ওমা মীনা, তুই?

তারপর তাহার জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি আমার মুখের দিকে ঘোরে। আমি দেখি—ও যেন তপঃক্লিষ্টা ঋষিকুমারী। মীনা বলে, উনি বাড়ী খুঁজে না দিলে আর পেতুম না। অনেকদূর ভাই···

জয়ন্তী বলে, আসুন ভিতরে···

তারপর বলে, এত কষ্ট না কর্‌লেই হ'ত মীনা—

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখি—একখানি শোবার ঘর···ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের স্তূপে আর অপরিচ্ছন্নতার চাপে ঘরখানা একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়া আছে। তারই ভিতর তেমনিই ধারা অপরিষ্কার শয্যায় শুইয়া অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কাল দেহা যে রমণী, সেই জয়ন্তীর মা।···

চোখ ফাটিয়া কান্না আসে। আমি তো দুনিয়ায় কত বড় দুঃখী—আমার চেয়েও যে দুঃখী এরা।

জয়ন্তী বলিল, এই আমার মা, কেউ দেখবার নেই মুখে একটু জল দিতে, কাছে একটু বসতে কেউ নেই তাই কলেজ যাই নি ভাই।···যদিও জানি ফ্রী পড়ি বেশী কামাই হ'লে নাম কেটে দেবে।···

মীনার দু'টী চোখ সজল হইয়া আসিয়াছিল। সে হাতব্যাগ হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া জয়ন্তীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আজ রাত হ'য়ে গেছে—আসি ভাই।···কাল আবার আস্‌বো।

জয়ন্তী বলে, কিন্তু এ কী!···

মীনা বলিল, তুই আপত্তি করিস নি জয়ী। আমি তোর বন্ধু, বন্ধু ছাড়া বন্ধুকে কে দেখ্‌বে ভাই।···তারপর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়া আমায় বলিল, আসুন—জয়ন্তী আমায় নমস্কার করিয়া বলিল, গরীবের ঘর। কোন খাতির কর্‌তে পার্‌লুম না—আপনার—

দুটী হাত কপালে ঠেকাইয়া বলি, আপনার চেয়েও গরীব আমি—

আমার মেসের ভাঙ্গা চৌকীটায় বসিয়া ভাবি, মীনার মত যদি আমার একটী বন্ধু থাকিত।··· মীনার সঙ্গে পরিচয় হইয়া গিয়াছে, জয়ন্তীর সঙ্গেও···কিন্তু ওরা কেউই তো জানে না—আমার দুর্দ্দশার কথা।··আমার যে অর্দ্ধেক দিন অনাহারেই কাটে।···

জয়ন্তীর কথা মনে পড়ে—বেচারী!·· অত করিয়াও মাকে বাঁচাইতে পারে নাই। মা মরিয়া গেল।—ওঃ,:তার কী ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না! আমার ইচ্ছা করে জয়ন্তীর মত অমনি ভাবেই কাঁদিতে—কিন্তু আমি যে কাঁদিতেই জানি না। কোন্ বয়েসে মা-বাপ হারাইয়াছি মনে নাই।··· জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথের ধূলির সাথেই আমার পরিচয়, তারই সাথে আজও ঘুরিয়া বেড়াই—

জয়ন্তীকে দেখিতে গিয়াছিলাম—সে বলে, শচীশ-দা'—আমি তো আর বাঁচি নে, এমন একা থেকে।··এই ঘর, আমার মায়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এখানে থাক্‌লে আমি যে পাগল হ'য়ে যাবো।

মীনা হঠাৎ আসিয়া পড়ে।···আমাকে দেখিয়া ও যেন একটু কিন্তু হইয়া ওঠে। তারপর বলে, জয়ন্তী তোর টিচারী ঠিক হ'য়ে গেছে। বোর্ডিংয়েই থাক্‌বি—

জয়ন্তী আমার মুখের দিকে চায়।

বলি, সেই ভাল জয়ন্তী।·· তোমার পক্ষে সব দিক দিয়েই সুবিধে—

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, তাই যাব।

তার নিঃশ্বাসের মর্ম্ম আমি বুঝি! বাঙালীর ঘরের মেয়ে, বধূ জীবনই খোঁজে—ইচ্ছা করে ওর কাঁধটায় হাত রাখি—কিন্তু···

* * মীনার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ি।

মীনা বলে, লেকে যাব।

ট্যাক্সির দোলার সাথে মীনার গা আমার গায়ে লাগে।···এতো সেই প্রথম দিনের লাগা নয়।···আজ মনে হয় যেন এটা কতকটা ইচ্ছা করিয়াই···

মীনা গল্প করে—পুরুষ আর নারীর ভালবাসা,—তাদের মিলন···লেকের ধারেও তাই···

আমার চোখে জাগে জয়ন্তী—মীনার শিকার ধরা স্পৃহা আর তার নির্লিপ্ততা—দুটোয় মিলে আমায় পাগল করে।···তবু মনে হয় মীনা যেন জয়ন্তীর কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

একটা, চাঁদের আলো—আর একটা সূর্য্যের, একটা তীব্র···অন্যটা কোমল—

বসন্তের বেলা—

একটা মিঠা উন্মাদনা চারিধারে ছড়াইয়া দেয়।···ফুলের বাস, নতুন পাতার রূপ, শিশির ভেজা ঝরা শিউলী···অন্তরে সজীবতার সোনার কাঠি ছোঁয়ায়···

জয়ন্তী বলিতেছিল, কাল থেকে আমার চাকরী। আমি চল্লুম, কিন্তু তুমি কতকাল এমন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?

বলি, পথে ঘুরেই তো জীবন কাটালুম জয়ী।···কোনদিন যে এ ঘোরার শেষ হবে বলতে পারি না।

জয়ন্তী কি বলিতে যায়, পারে না—

নারী যে—তাদের বুকে একখানা পাথর বসানো আছে।···সেটা কওয়া কথাই বলিতে বাধা দেয়···অথচ না বলার ব্যথাটা জাগাইয়া দেয় জোর করিয়া।

আমি বুঝি—

বুঝি বলিয়াই হঠাৎ ওর মুখখানা আমার মুখের কাছে টানিতে চাই।

মীনা আসিয়া দাঁড়ায়···এ কথা, সে কথা—সব কথা বাদ দিয়া মীনা যেন আমার কথাই শুনিতে চায়।···তারপর মীনা ওঠে আমায় লইয়া। সে যেন আমায় জয়ন্তীর কাছে রাখিতে চাহে না।

ভাবিয়া ভাবিয়া আমি আর ঠিক পাই না।···তারপর ঠিক করি—দুপুর রাতে ঘর ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াই—নিস্তব্ধ রজনী—তারা ভোরা আকাশ চিরকালের অসাড় ধরিত্রী···ওরা সবাই আমায় আহ্বান করে।

চোখে জাগে জয়ন্তী,—তাহার পাশে মীনা···কিন্তু বৃথা এ আকর্ষণ! চলার পথে ওদের দামই বা কতটুকু!

বাহির হইয়া পড়ি—চলিতে সুরু···

জানি না—এবার আমার এ চলার শেষ আছে কিনা!··· ···
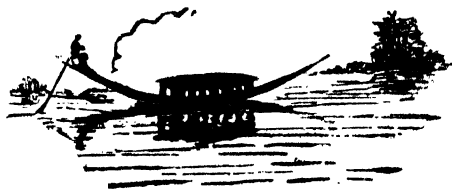
—চোখের জল—

শ্রীপ্রমথনাথ দে

এক

গ্রামের প্রান্তে একটী পুকুর। তাহার কাল জল আগাছা ও পাণিফললতায় পূর্ণ হইলেও সেই পাড়ার লোকের জীবন স্বরূপ। এইখানেই তাহারা স্নান করে, ইহারই জল পান করে।

ঘাটের পাড়টী ছাড়া, তিনটী পাড়ই জঙ্গলে ভরা। তাহার অন্তরালে বসিয়া একটী ধনী যুবক এক ঝাঁক ক্রীড়ারত বালহাঁস শিকার করিবার জন্য বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করিতেছিল—হঠাৎ জলের উপর একটী ইষ্টক পতনের সঙ্গে সঙ্গে এক অস্পষ্ট অর্থহীন ভাষাময় শব্দে ত্রস্ত হাঁসগুলি উড়িয়া গেল। শিকারীর হাতের বন্দুক হাতেই বদ্ধ রহিল।

যুবকটী তাহার সঙ্গী নিতাইএর সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, স্থানটা বেশ নির্জ্জন, চারিদিক স্তব্ধ। কেবল ঘাটে একবুক জলে, একটী সুশ্রী বালিকা, তাহার খোলা মাথায় কাল কাল চুলগুলি এলান—গায়ের রং বেশ টক্‌টকে—যেন কে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম আভা লুটিয়া লইয়া অঙ্গখানিতে মাখাইয়া রাখিয়াছে। বেশভূষা দেখিয়া মনে হয়, খুব গরীবের ঘরের মেয়ে।

নিতাই জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো, তুমিই কি হাঁসগুলো উড়িয়ে দিলে?"

বালিকা একবার চাহিল মাত্র। দৃষ্টি দ্বিধা ভয়ের বাহিরে।

আবার প্রশ্ন হইল; তারপর আবার; এইবার স্বর কিছু উচ্চ।

সংক্ষেপে উত্তর আসিল, "হাঁ!"

তারপর বালিকা আপন-মনে গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

নিতাই কহিল, "কেন এমন করলে?"

বালিকা বলিল, "এমনই।"

যুবক নিরঞ্জন স্তম্ভিত। এ বালিকা বলে কি? অপরাধ করিয়া যাহার কাছে কেহ ত্রাণ পায় না—এমনি যাহার প্রভুত্ব, কথা ত কোন ছার, ভয়ে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না—এমনি যাহার দাপট, বাঘে ভাল্লুকে এক ঘাটে জল খায়—এমনি যাহার প্রতাপ, তাহার সামনে এত বড় কথা!!

ব্যগ্রস্বরে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "নিতাই, এ কার মেয়ে?"

নিতাই বলিল, "হরিশ সরকারের বাবু।"

হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "হরিশবাবুর? সে আমার খাতক? তার জমি ভিটা আমার কাছে বাধা আছে? আচ্ছা—"

বালিকাটী ততক্ষণ কাপড়ে অঙ্গ ঢাকিয়া, কাকে একটী জলপূর্ণ কলসী লইয়া, বঙ্কিম ভঙ্গিতে ক্ষোভশূন্য চিত্তে, আনন্দ গর্ব্বে রাস্তায় উঠিয়াছে—যেন কিছুই ঘটে নাই, যেন এই সব তুচ্ছ কথায় কাণ দিবার তাহার অবসর নাই।

দুই

নিরঞ্জন ধনী জমীদারের ছেলে। শিক্ষিত। পিতৃহীন, মাতৃস্নেহে পুষ্ট। দান-ধ্যান-দয়া-মায়া সমস্তই আছে, তবে সে গুলি রুক্ষ গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়া—কোন রস নাই।

বেশ চরিত্রবান। রমণীর চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্যের মোহ তাহার হৃদয়ে দাগ বসাইতে পারে না।

থিয়েটার করা ছাড়া তাহার জীবনে কোন সখ নাই, অভিনেতারূপে যখন নায়কের পার্ট করে তখন, ভাব ভঙ্গী, ভাষা বৈচিত্র্য এমনিই ফুটাইয়া তুলে যে ভ্রান্ত দর্শকমণ্ডলী তাহার সত্যিকারের রূপ ভুলিয়া যায়।

শিকার করা ছাড়া, তাহার আর কোন নেশা নাই। এই জিনিষটা এতই প্রিয়, যদি তাহাতে কাহারও অজ্ঞানকৃত বাধা পায়, কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে না, বিচার বিবেক বুদ্ধিহারা হইয়া শাস্তি দিয়া থাকে।

কয়েক মাস হইল শিকারে তাহার আর তেমন আগ্রহ নাই। ঘরের লোক দেশের লোক, সকলেই আশ্চর্য্য হইল—হইল না কেবল তার বন্ধুরূপী, ভৃত্যরূপী বাল্যসাথী নিতাই, গোপন কথা সেই কেবল জানিত।

তিন

প্রায় দেড় মাস পরের কথা। অন্ধকার রাত্রি।

নিরঞ্জন তাহার পড়িবার ঘরে একাকী বসিয়া।

চমক ভাঙ্গিল, ঘড়িতে যখন দশটা বাজিল।

যেমন উঠিতে যাইবে, খোলা জানালার পাশে, ছাদহীন রোয়াকের উপর কাহার যেন মৃদু সন্তর্পিত পদশব্দ!

—"কে'ও।"

লালপাড় শুভ্র বসনাবৃত একটী রমণীমূর্ত্তি, মুখখানি ঢাকা—ধীরে ধীরে চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল।

নিরঞ্জন বলিল—"কে?"

রমণী মুখ খুলিল, সেই বিষাদ-করুণ মুখখানি আরক্ত, আয়ত চক্ষু দুটীতে অপূর্ব্ব দীপ্তি!

অন্যদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিরঞ্জন কহিল—"এ কি, অলকা? তুমি?"

"হাঁ।"

"তা তা আমার কাছে কেন, কি চাই তোমার?"

অলকা—"কিছু না, শুধু জানাতে এসেছি,—আপনি এ সব কী করচেন? আপনার এই স্বেচ্ছাকৃত অত্যাচারে আমরা না হয় আমাদের এই বাস্তভিটায় লক্ষ ফোঁটা চক্ষের জল ফেলে এই জমীদারী ছেড়ে চলে যাবো। আর ত আপনি কিছু করতে পারবেন না, কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম ছেড়ে শুধু জেদের বশে নিজেকে এত ছোট আপনি কেন করলেন?"

নিরঞ্জন কোন উত্তর করিল না, উত্তেজিতকণ্ঠে অলকা বলিয়া চলিল, "আপনার অনুগ্রহে! আপনার বন্ধু নিতাইয়ের ঘটকালিতে আমার সর্ব্বনাশের আয়োজনের অন্ত নেই, তাও আমি জানি। আপনিই না, অলক্ষ্যে থেকে, আমার বাবাকে বাধ্য করেচেন এক বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে- যাঁর কৃপাদত্ত অর্থে, বাবা আমার ঋণমুক্ত হবেন। কিন্তু জানবেন তাই যদি আমার কপালে লেখা থাকে বাঙালীর মেয়ে সে দুঃখ মাথা পেতে নিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করবে না। সে বোঝা স্বেচ্ছায় আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার তাতে লাভ?"

—"চখের জল।"

অলকা। "আমরা ত গরীব, সহায়সম্পদহীন, চক্ষের জল ত চিরসাথী। নূতনত্ব তাতে কি দেখবেন? ভগবান আপনাকে ধন দিয়েচেন, বল দিয়েচেন, সে কি শুধু গরীবকে কাঁদাবার জন্যে? তাই যদি হয়, তবে আমাদেরও সহ্য করবার শক্তি আছে জানবেন। কিন্তু তার ফলে আপনি কি পাবেন?

নিরঞ্জন নিরুত্তর, নতমুখ—চিন্তিত।

অলকা। আমার এই শেষ কথা। যাই করুন, চির দুঃখীর তাতে কিছুই আসে যায় না। তবে মনে রাখবেন শরীরের বলই সব নয়, মনের

দেবতার কাছে একদিন এ সকল কাজেরই কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হবে।

দারুণ যন্ত্রণায় ভয়সঙ্কোচশূন্য হইয়া অলকা যেমন আঁধারের বুক চিরিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রাখিয়া গেল এক জ্বলন্ত স্মৃতি, আর তার মাঝে লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ।

চার

বিবাহের দিন সমাগত। এক রাত্রেই সমস্ত, আয়োজন, আড়ম্বর নাই, কোলাহল নাই।

অলকার বুকে রুদ্ধ বেদনা, মুখে জোর করিয়া আনা ম্লান হাসি।

মা তাহার শয্যায় পড়িয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে, কে জানে, কোন্ দেবতার চরণে কি কি নিবেদন জানায়।

হরিশবাবুর একদিক দিয়া হৃদয়ের ভারটা নামিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার।

তবুও কিন্তু সব চাই।

যথাসময়ে বর আসিল। তাহার কলপ-মাখান কেশ, সদ্য ছাঁটা দাড়ি। চোখে সোনার চশমা—তাহার ভিতরে মিটিমিটি চাহনি। মুখে অভিনব উদ্যম, বুকে ধার করা প্রেম।

গ্রাম্যবালকেরা প্রথমটা জটলা আরম্ভ করিল বটে, শেষে কিন্তু জমীদারের পাইকের বহর দেখিয়া সরিয়া পড়িল।

সমর্থিত অভ্যাগতপূর্ণ আসরে বিবাহ হইয়া গেল—নিঃশব্দে, বিনা বাধায়।

ম্লান-মুগ্ধ নতমুখী অলকা তাহার অলস-অবশ হাতখানি বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিল,—পরের তৃপ্তির জন্য নিজেকে দুঃখের সায়রে ভাসাইয়া দিয়া।

অনুষ্ঠানের ত্রুটী নাই। বাসর বসিল। কৌতুকপ্রিয়া পল্লী মহিলাদেরও বোধ করি উৎসাহের মাত্রা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। বাসর জাগিতে কেহই আসিল না। শুধু স্তব্ধতাকে বুকে লইয়া দুইটী নর-নারী নীরবে বসিয়া রহিল। এ ভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছিল, কে জানে। হঠাৎ বৃদ্ধ ডাকিল, "অলকা।"

অলকা শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে পরচুলা খুলিয়া ফেলিয়া নিরঞ্জন বলিল, "তোমার উপদেশ আমি অবহেলা করি নি অলকা, মনের দেবতার কাছেই হার মেনে গিয়েছি।"

অলকা কথা বলিতে পারিল না, বিস্ফারিত নয়নে নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিরঞ্জন অলকার হাতখানি ধরিয়া তাহার লজ্জাভারনত রক্তমুখী অশ্রুনিষক্ত মুখখানি তুলিয়া বলিল—"অলকা আমায় কি ক্ষমা করতে পারবে?"

অলকা নিরঞ্জনের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল, তাহার দয়িতের বাঞ্ছিত চখের জল উপহার দিয়া।

মুহূর্ত্তে সোণার কাঠির স্পর্শে যেন ঘুমন্ত রাজপুরী জাগিয়া উঠিল।
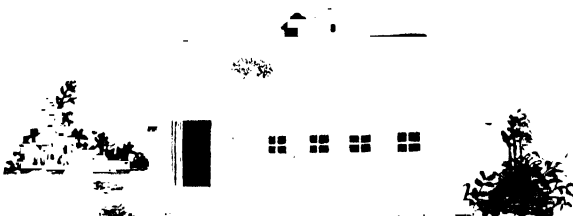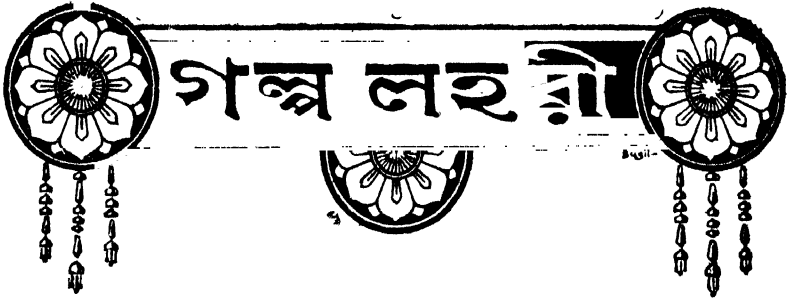
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ | আষাঢ় ১৩৩৮ | তৃতীয় সংখ্যা

—একটি রাত্রি—

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

সে আজ সাত-আট বৎসর আগেকার কথা। নীরেন পূজোর ছুটিতে কাশী বেড়াতে গেছল,—ফিরব ফিরব করছে—এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে তার কাশীবাসী জনৈক বন্ধু এসে বল্লে—"ওহে ভারি মজা হয়েছে—আজকের খবরের কাগজখানা দেখেছ?"

নীরেন চা খাচ্ছিল, বল্লে—"না দেখি নি—কি খবর বল ত?"

বন্ধুটি বল্লে—"আজ একটা নূতন মেল কাশী থেকে ছাড়বে। এ মেলটি পূর্ব্বে ছিল না—আজই এর প্রথম যাত্রা-দিন। নামটিও খাসা দিয়েছে হে—'তুফান মেল'!"

নীরেন লাফিয়ে উঠলো—"তবে ত এই মেলেই যেতে হচ্ছে—তবু একটু নূতনত্ব হবে। কি বল?"

বন্ধু বল্লে—"আমিও ত তাই তোমাকে খবর দিতে এলুম;—এখন পর্য্যন্ত কেউ বোধ হয় এর সন্ধান জানে না। আর তা' ছাড়া, দু'-একজন জানলেও তারা এ ট্রেণে যেতে সাহস করবে না। তাদের ধারণা—এ ট্রেণে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। প্রথম দিন ছাড়ছে—নূতন ট্রেণ—এখনও হয়ত পথ ঘাট ঠিক রপ্ত হয় নি—রাস্তায় ফাঁসাদ বাধতে কতক্ষণ।—"

নীরেন যথাসময়ে ষ্টেশনে এসে উপস্থিত।—গাড়ী প্লাটফর্ম্মে এসে দাঁড়িয়েছে।—টিকিট কিনে সারাটা প্লাটফর্ম্মে পায়চারি করে নীরেন যা দেখলে তা'ত সে অবাক হয়ে গেল।—গাড়ী ছাড়তে আর পাঁচ মিনিট মাত্র দেরী—কিন্তু একটি গাড়ীতেও যাত্রী নেই—সব খালি খাঁ খাঁ করছে,—কেবল একটি ইণ্টার ক্লাসে একটি যুবতী একা বসে রয়েছে—তার মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা এবং ভীতির লক্ষণ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।—

নীরেন সেই গাড়ীটার কাছবরাবর আসতেই

যুবতীটি সাগ্রহে বলে উঠলো —"আপনি কি এই ট্রেণে যাচ্ছেন ?"

নীরেন বল্লে—"হ্যাঁ—কেন বলুন দেখি ?"

যুবতী দ্বিগুণ আগ্রহে বলে উঠলো—"আপনার কোন্ ক্লাসের টিকিট জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

নীরেন বল্লে—"ইণ্টার ক্লাসের।"

যুবতী বল্লে—"তা'হ'লে এই গাড়ীতেই আসুন না কেন।—আমার একা যেতে সাহস হচ্ছে না—আপনি যদি দয়া করে—"

"বিলক্ষণ! বিলক্ষণ!" বলে নীরেন সেই গাড়ীতেই উঠে পড়লো।—যুবতীর মুখে-চোখে সোয়াস্তির আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ ছেড়ে দিলে।—যুবতীর মুখের দিকে চেয়ে নীরেন দেখলে—এত সুন্দর মুখ সে বোধ হয় জীবনে অতি অল্পই দেখেছে।—নীরেনই প্রথমে কথা কইলে—"আপনি কি একাই যাচ্ছেন ?"

যুবতী উত্তর দিলে—"একাই যাচ্ছি।"

নীরেন—"কেন ?"

যুবতী—"আপনার বলতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই বলে!"

নী—"দুনিয়ায় আপনার আপনার লোক কেউ নেই ?"

যু—"না।"

নী—"কেন ?"

যু—"এ কেনর কি ক'রে উত্তর দোবো বলুন।"

নীরেন বুঝলে সে একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন ক'রে ফেলেছে;—একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—"আপনি যাবেন কোথায় ?"

যু—"কলকাতায়।—আপনি ?"

নী—"আমিও কলকাতায় যাচ্ছি।"

একটু চুপ করে থেকে যুবতী বল্লে—"আপনি কি করেন ?"

নী—"কলেজে পড়ি।"

যু—"কলকাতাতেই থাকেন বুঝি ?"

নী—"হ্যাঁ।"

যু—"কাশীতে বেড়াতে গেছলেন বুঝি ?"

নী—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

যু "কলকাতায় আপনার কে কে আছেন ?"

নী—"কেউই নেই—একাই থাকি।"

যু—"বাপ-মা, ভাই-বোন বুঝি দেশে থাকেন ?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে নীরেন বল্লে—"ওস্ . পাটই নেই।"

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যুবতী ব'লে উঠলো—"কেউ নেই ?"

জানালা দিয়ে বাইরের খোলা মাঠের দিকে চেয়ে নীরেন বল্লে—"না।"

নিবিড় সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে যুবতী বল্লে—"কত বয়সে মা-বাপ হারিয়েছেন ?"

বাইরের দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই নীরেন বল্লে—"তের বৎসর।"

যু—"মা বাপ দুইই এক বৎসরের মধ্যেই হারিয়েছেন ?"

নী—"এক বৎসরে নয়—একদিনে—একই মুহূর্ত্তে। এবং শুধু বাপ-মা নয়—তার সঙ্গে বড় একটা বোন এবং ছোট ভাইও।"

যু—"বলেন কি ?"

নী—"গেছলুম স্কুলে পড়তে।—তখন আমরা রংপুরে থাকি।—দুপুরবেলায় হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হয়।—ভূমিকম্প থামতেই মাষ্টাররা স্কুলের ছুটি দিয়ে দিলেন।—যে যার বাড়ীর দিকে ছুটলুম—বুক দুরদুর করছে—পথের দু' ধারে কত বাড়ীই যে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রাণপণে ছুটেছি—বাড়ী গিয়ে কি দৃশ্যই না দেখতে হয়।—তারপর বাড়ীর কাছ বরাবর এসে যা দেখলুম—"এই অবধি বলেই নীরেন হঠাৎ থেমে গেল—তার কণ্ঠরোধ হ'য়ে এসেছিল।

যুবতী শশব্যস্তে ব'লে উঠলো—"বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না!"

কিছুক্ষণ আর কারুর মুখে কথাটি নেই!

হঠাৎ সেই বুকচাপা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে যুবতী বলে উঠলো -"আপনিও তা' হ'লে আমারই মত পৃথিবীতে একা!"

নীরেন এ কথার কোন উত্তর দিলে না—কিন্তু কেন কে জানে একথাটার মধ্যে সে একটা প্রকাণ্ড আশ্বাস খুঁজে পেলে এবং হঠাৎ তার মনে হ'য়ে গেল,—এই মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার নয়। এতক্ষণ সে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এই অপরিচিতা মেয়েটির সঙ্গে কথা কইছিল,—একে অপরিচিতা, তায় যুবতী, তার উপর আবার গাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই—কেমন যেন বারবার ঠেকছিল! কিন্তু এখন হঠাৎ তার মনে হ'য়ে গেল,—এই মেয়েটির সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কইবার যেন তার অধিকার আছে। তাই সে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে অপ্রতিভ হয়ে গেছল, সেই কথাটিই আবার উত্থাপন করতে তার একটুও মুখে বাধল না;—সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল—"আপনার বাপ-মা, ভাই-বোন সবই ছিলেন নিশ্চয়ই?"

একটা শুষ্ক হাসি হেসে যুবতী উত্তর দিলে—"ছিলেন বৈকি?"

নী—"তবে তাঁরা বুঝি গত হয়েছেন?"

যুবতী একথার কোন উত্তর দিলে না—কেবল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে—"নাই শুনলেন সে সব কথা!"

দ্বিতীয়বার অপ্রতিভ হ'য়ে গিয়ে নীরেন এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করতে সাহস করলে না!—কথাটাকে এক নিমেষে একটা সমাধানের মধ্যে এনে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সহসা বলে উঠলো—"এ পৃথিবীতে তা' হ'লে আমরা দু'জনেই একা—কি বলেন!"

কথাটা ব'লে ফেলেই সে কিন্তু কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হ'য়ে উঠলো—হঠাৎ তার যেন মনে হ'য়ে গেল, সে বড্ড বেশী বাচালতা করছে কিন্তু তার সে ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে পারলে না। যুবতী বলে উঠলো—"আজ এই ট্রেণেও আমরা দু'জনে একা—কি আশ্চর্য্য!"

নীরেন লাফিয়ে উঠলো—"বাস্তবিক এটা একটা ভাববার জিনিষ—আমার কিন্তু এটা খুব বেশী আশ্চর্য্য ঠেকছে—আপনার?"

যুবতী স্থির অথচ হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বল্লে—"আমারও তাই মনে হচ্ছে—আপনি কি ঠিক জানেন সারাটা ট্রেণে আর একটিও যাত্রী নেই?"

নীরেন সোৎসাহে বলে উঠলো—"একটিও না—আমি তন্ন তন্ন ক'রে দেখে এসেছি, সারা ট্রেণখানায় একটিও যাত্রী নেই!"—এ যেন একটা মস্ত বড় সান্ত্বনার কথা কিন্তু এতে এত বেশী উৎফুল্ল হবার কি কারণ থাকতে পারে তা' সে হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলে না ফলে নিজের অত্যধিক উৎফুল্লতায় সে একটু লজ্জিত হ'য়ে উঠল।

ট্রেণ চলতে লাগল।—দু'দিকে ধূ ধূ করছে মাঠ, কোথাও জনপ্রাণী নেই,—মাথার উপরে দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ,—সেও ধূ ধূ করছে!—এমনি বিরাট নির্জনতার মধ্যে তারা দু'টিতে একা! মাইলের পর মাইল চলেছে, এই চিন্তাটা আজ নেশার মত নীরেনকে পেয়ে বসেছে—

ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো,—হেমন্তের শান্ত নীরব সন্ধ্যা—দূরে দিকচক্ররেখায় একটা ঘন গাছের ঝোপের পাশে একফালি ফাকাসে চাঁদ উঠেছে। অতবড় বিরাট মহাশূন্যের এক প্রান্তে সে যেন নিতান্তই একা! সেই দিক পানে চেয়ে নীরেন হঠাৎ বলে উঠলো—"আজকের দিনটা আমরা দু'জনে কেউই একা নই—কি বলেন?"

যুবতী সংক্ষেপে কেবল বল্লে—"হু!"

রাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে—নীরেনের কথার

আর বিরাম নেই—সে বকেই চলেছে।—হঠাৎ একসময় সে ব'লে উঠলো—"আচ্ছা, আমার সঙ্গে যদি আপনার দেখা না হোতো—তা' হ'লে কি করতেন ?"

যুবতী—"একাই যেতুম।"

নী—"এতবড় ট্রেনটায় একা ?"

যু—"তা' ছাড়া আর উপায় কি ছিল বলুন !"

নী—"আপনার সাহসকে কিন্তু বলিহারি !"

যু—"কেন স্ত্রীলোকের এরকম সাহস আপনি কি পছন্দ করেন না ?"

নীরেন শশব্যস্তে বলে উঠলো—"না না, তা' বলছি না—উল্টে—স্ত্রীলোকদের এইরকম স্বাধীন বিচরণ আমি অত্যন্ত পছন্দ করি—এ বিষয়ে আমি কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' একটা প্রবন্ধও লিখেছিলুম ;—বাস্তবিকই আপনার এই সাহস এবং স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রত্যেক বাঙ্গালী রমণীর অনুকরণের বিষয়।"

একথার কোন উত্তর না দিয়ে যুবতী হঠাৎ বল্লে—"রাত হ'য়েছে—আপনি খাবেন না ?"

নীরেন বল্লে—"হ্যাঁ, ক্ষিদে পেয়েছে বটে—"

একটু হেসে যুবতী বল্লে—"তাও কি অপরে স্মরণ করিয়ে দেবে ?—বেশ লোক ত আপনি ?"

নী—"গল্প করতে করতে অত খেয়াল ছিল না।"

যু—"রোজই বোধ হয় এমনি ধারা ঘটে থাকে ?—যে গোপ্পে লোক আপনি।"

অত্যন্ত জোরে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে নীরেন বলে উঠলো—"একদিনও এমনধারা হয় না—এ আপনি ঠিক্ জানবেন !—আমার ক্ষিদে পেলে আমি একদণ্ড স্থির থাকতে পারি না,—আজকে যেন সবই—"

কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই গাড়ী একটা ষ্টেশনে এসে লাগলো। নীরেন বলে উঠলো—"নেমে দেখি কি পাওয়া যায়—দানাপুর বুঝি—? এখানে খাবারদাবার যথেষ্ট মিলবে।"—সে নামবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই যুবতী ব'লে উঠলো—"বাজারের যা' তা' কিনে খাবার দরকার হবে না—আমার সঙ্গে যথেষ্ট খাবার আছে।"

ক্ষণকালের জন্য কি ভেবে নিয়ে নীরেন হঠাৎ বলে ফেল্লে—"তা' হ'লে ত ভালই হবে—যা' আছে দু'-জনে ভাগাভাগি করে খাওয়া যাবে"—তার কথার মধ্যে প্রচুর উৎসাহ এবং আগ্রহ আত্ম-প্রকাশ করছিল।

যুবতীরও মুখে-চোখে উৎসাহ এবং আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকট হয়ে উঠেছিল,—হঠাৎ সেটাকে জোর ক'রে দমন ক'রে ফেলে—সে বল্লে—"লুচি-তরকারি কিন্তু আপনাকে দিতে পারবো না—আপনাকে সুধু মিষ্টি খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠে নীরেন বল্লে—"দু'-চারটে মিষ্টি হ'লেই আমার হবে—তেমন বিশেষ ক্ষিদে পায় নি।"

যুবতী বল্লে—"দু'-চারটে মিষ্টি খেয়ে যে আপনার পেট ভরবে না—সে আমি বেশ ভাল ক'রেই জানি,—আপনার ভয় নেই, আমার সঙ্গে যা' মিষ্টি আছে—তা' চারদিনেও আপনি ফুরতে পারবেন না।"

বাধা দিয়ে নীরেন বল্লে—"তবে বুঝি নিজের ভাগে বাজে জিনিষ রেখে—আমাকে সরেস জিনিষ দিতে চান—সেটি হবে না কিন্তু—যা'

আছে দু'জনের সমানভাগ—" বলেই সে উঠে বাঙ্কের উপর থেকে টিফিন-কেরিয়ারটা নামিয়ে ফেল্লে। তারপর হঠাৎ যুবতীর মুখের দিকে অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং মধুর একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ব'লে উঠলো—"আমাকে যত্ন ক'রে পরিবেশন ক'রে খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে যুবতী বল্লে—"লুচি-তরকারী নাই খেলেন।"

নীরেন বল্লে—"বাজারের কেনা মিষ্টিই যদি খাওয়াতে চান—তা' হ'লে আগে বল্লেন না কেন দানাপুরে নেমে কিনে খেতুম।"

একটা নীরব আত্মপ্রসাদের তৃপ্তি যুবতীর সুন্দর মুখেচোখে এক নিমেষের জন্য হঠাৎ ফুটে উঠেই পরক্ষণে মিলিয়ে গেল। অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে সে বলে উঠলো—"আমি ক্রিশ্চান—আমার রান্না আপনি খেতে যাবেন কেন?"

নীরেন সবেগে মাথানাড়া দিয়ে বল্লে—"আমার যদি কোন আপত্তি না থাকে!"

যুবতী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো—তারপর সহসা ব'লে উঠলো—"খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আপনার কি কোন বাচবিচার নেই?"

নীরেন সবেগে বল্লে—"এতটুকু না!"

যুবতী বল্লে—"খুব নীচ জাতের হাতেও আপনি খেতে পারেন?"

নীরেন সগর্ব্বে বল্লে—"অনায়াসে!—অবশ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই!"

যুবতী আর কোন কথা বল্লে না—নীরবে গাড়ীর বেঞ্চের উপর পরিপাটি করে একটি শাল-পাতা বিছিয়ে নীরেনের জন্য খাবার সাজাতে বসে গেল।

নীরেন মুগ্ধনেত্রে চেয়ে বসে রইলো! খাওয়া শেষ হয়ে গেলে রূপার একটি ডিবে থেকে দু'টি পান নীরেনের হাতে দিয়ে যুবতী বল্লে—"আপনার খাওয়া দাওয়া রোজ দেখে কে?"

একটু হেসে নীরেন বল্লে—"মেসের উড়ে ঠাকুর।"

গাড়ী চলতে লাগল,—চারিদিকে ঘন অন্ধকার,—কেবল দূরে—বহুদূরে রেলকোম্পানীরই একটা কারখানায়—কয়লার গাদায় আগুন ধরান হয়েছে—তারই শিখা পাশের একটা জলায় প্রতিবিম্বিত হ'য়ে চিক্‌চিক্ করছিল। মাঝে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামল। চারিদিক শাঁই-শাঁই করছে—একটা লোক ধরাকণ্ঠে একঘেয়ে সুরে ষ্টেশনের নাম আওড়ে যাচ্ছে।—ঠং-ঠং—ঠং! আবার গাড়ী চলতে লাগলো।—নীরেন হঠাৎ বলে উঠলো—"আচ্ছা—মনে হচ্ছে না—এমনি ক'রে অনন্তকাল ধরে গাড়ীখানা এইভাবে চলতেই থাকুক।"

যুবতী বল্লে—"জানি না!—তার স্বর কম্পিত!

আরও কিছুক্ষণ পর যুবতী বল্লে—"আপনি ঘুমোবেন না?"

নীরেন বল্লে—"না, একটুও ঘুমব না—সারা রাত জেগে বসে থাকবো!—আপনি?"

যুবতী নতমস্তকে বল্লে—"আমারও ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না।"

হঠাৎ কি মনে ক'রে নীরেন বলে উঠলো—"আচ্ছা গাড়ীখানা যদি উল্টে যায়?"

সংযত কণ্ঠে যুবতী বল্লে—"তা' হ'লে যা' হয় সে ত আপনিও জানেন—আমিও জানি।"

নীরেন বল্লে—"তা' হ'লে কিন্তু মন্দ হয় না—" তারপরই হঠাৎ সামলে নিয়ে ব'লে উঠলো— "দেখছিলুম আপনি ভয় পান কিনা।"

যুবতী বল্লে—"ভয় পাব কেন?—আমার জন্যে কাঁদবার লোক ত কেউ নেই যে—"

কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই নীরেন বল্লে— "আমারও ঠিক সেই অবস্থা"—তারপরই সহসা কি ভেবে বলে উঠলো "আজ কিন্তু কেন কে জানে আমার মনে হচ্ছে - দুনিয়ায় আমি একা নই।—আপনার?"

একথার কোন উত্তর না দিয়ে যুবতী বল্লে— "আপনি কথা কইতে খুব ভালবাসেন, না?"

নীরেন বল্লে—"আদপেই তা' নয়, মেসে আমার রীতিমত বদনাম আছে—আমি মুখচোরা—"

সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল—যুবতী বল্লে— "আমার ত কিন্তু আদপেই তা' মনে হয় না।"

নীরেন বলে উঠলো—"আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?"

যুবতী অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লে—"আপনি তাই মনে করলেন নাকি?"

অতঃপর অনেক কথাই হোলো। নীরেনের উচ্ছ্বাস রাত্রের সঙ্গে পা ফেলে ক্রমেই বেড়ে চলেছে।—তার মধ্যে যে এত কাব্য ছিল, তা' সে নিজেই এতদিন জানত না। যুবতী তার এই উচ্ছ্বাসে এতটুকু বাধা দিলে না—কিন্তু তাতে সমানে যোগ দিতেও তার যেন কোথায় বাধছিল। পরিচয় এবং আলাপ ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে উঠছিল। হঠাৎ এক সময় নীরেন বলে উঠল— "আজকের রাত্তির হঠাৎ যদি অনন্ত হ'য়ে ওঠে— তা' হ'লে বেশ হয় - না?"

গাড়ীটা একটা পোলের উপর উঠেছিল— একটা চাপা গুড়্ গুড়্ শব্দ সেই ভীষণ নিস্তব্ধ রজনীর বুকের চাপা কান্নার মত এই দু'টি নির্জ্জন প্রাণীর কানে এসে পৌছতে লাগল;—সে কেবল মিনিট খানেকের জন্য· তারপর আবার সেই এক-ঘেয়ে ট্রেণ চলার শব্দ।

যুবতী বল্লে—"আপনি কি সত্যই ঘুমোবেন না?"

নীরেন হঠাৎ অত্যন্ত অভিমানের সুরে বলে উঠল—"আমি কি বড্ড বেশী বিরক্ত করছি আপনাকে?"

যুবতী কোন কথা বল্লে না - কেবল একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস অসাবধানে তার নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে এল।

নীরেন তীব্রতর অভিমানের সুরে বল্লে— "আমাকে আপনার ভাল লাগছে না, নয়?"

যুবতী ম্লান একটি হাসি হেসে বল্লে—"আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।"—সে স্বর স্নেহপূর্ণ এবং গাঢ়।

হঠাৎ একটা টানেলের মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। এক নিমেষে গাড়ীখানা অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে গেল। নীরেন হঠাৎ সোৎসাহে বলে উঠলো—"ভয় পাবেন না—টানেলের মধ্যে গাড়ী ঢুকেছে—বেশি ভয় হয় ত কাছে সরে আসুন।"

অন্ধকারের ভিতর থেকে উত্তর এলো—"না, ঠিক আছি !"

এমনি ক'রে আবোলতাবোল ব'কে সারাটা রাত কেটে গেল।

গাড়ী তখন লিলুয়া ষ্টেশন ত্যাগ করেছে—আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাওড়ায় গিয়ে পৌঁছবে।

যুবতী হঠাৎ বল্লে—"আর কয়েক মিনিট পরেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে হয় ত জীবনে আর কখন দেখা হবে না।"—তার চোখদু'টি ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠল।

নীরেন বল্লে—"কলকাতায় যখন থাকেন, তখন অনায়াসেই দেখা হ'তে পারে—অবশ্য যদি ইচ্ছা থাকে।"

যুবতী বল্লে—"যাবার সময় অতটা নিষ্ঠুর নাই হলেন নীরেনবাবু!"—তার স্বর করুণ।

নীরেন বলে—"আমি কিন্তু আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।"

যুবতী একটু যেন চিন্তিত হ'য়ে উঠে বল্লে—"আজ আর অত কষ্ট করবেন না—একে সারারাত ঘুমোন নি—"

সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, নীরেন বল্লে—"আমার ওতে একটুও কষ্ট হবে না—অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে, তা' হ'লে স্বতন্ত্র কথা!"

যুবতী তার জিনিষপত্রগুলি একত্র করতে করতে বল্লে—"আজ আমি এখান থেকে বরাবর বাড়ী যাবো না—অন্য আর এক জায়গায় একটা কাজ সেরে তবে বাড়ী ফিরবো।"

নীরেন বল্লে—"বেশ তা' হ'লে আপনার ঠিকানা আমাকে দিয়ে যান্—সময় মত গিয়ে দেখা করব।"

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে যুবতী হঠাৎ বলে ফেল্লে—"তিনের সাতের এক রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট—শ্যামবাজার।"

ঠিকানা টুকে নিতে নিতে নীরেন বল্লে—"আপনার নাম ?"

যুবতী নতমস্তকে উত্তর দিলে—"আমার নাম শ্রীমতী সরযূবালা দেবী।"

গাড়ী এসে হাওড়া ষ্টেশনে লেগেছে। চারিদিকে হুড়োহুড়ি—ছুটোছুটি।

একটা ট্যাক্সিতে যুবতীকে উঠিয়ে দিয়ে নীরেন বল্লে—"আজ তা' হ'লে নমস্কার!—কাল নিশ্চয়ই দেখা করছি—রাগ করতে পারবেন না কিন্তু।"

তাড়াতাড়ি প্রতিনমস্কার ক'রে যুবতী হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে,—কিন্তু সেই চকিতের মধ্যেই নীরেন হঠাৎ দেখে ফেল্লে—তার বড় বড় চোখ দু'টি জলে টলটল্‌ করছে।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠেই নীরেন তিনের সাতের এক নম্বর রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীটে খোঁজ করেছিল—কিন্তু যুবতীর কোন সন্ধান পায় নি। তিনের সাতের এক নম্বর বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা বল্লেন—সরযূ ব'লে কোন যুবতীর সন্ধান তাঁরা রাখেন না, এবং ঐ শ্রেণীর মন্দা-মেয়ের সঙ্গে তাঁদের মত ভদ্রবংশের লোকদের কোনরূপ সম্বন্ধ বা আলাপ-পরিচয় থাকতেই

পারে না। নীরেন আশেপাশের বাড়ীগুলো খুঁজলে,—সকলেরই এক বুলি। অবশেষে হতাশ হ'য়ে সে মেসে ফিরে গেল। অতঃপর সারাটা কলকাতার সহর সে ঢুঁড়েছে—কিন্তু কোথাও সে সরযূর সন্ধান পায় নি।

তারপর বহুকাল গত হ'য়েছে। সেদিনকার একটি রাত্রের স্মৃতি নীরেনের বুকের মধ্যে অনেকখানিই ফিকে হয়ে এসেছে।

কেবল নির্জ্জন সন্ধ্যায় দূরের তেতালা বাড়ীটার পাশে যখন চাঁদ ওঠে—তখন মেসবাড়ীর নির্জ্জন কক্ষের বাতায়নের ধারে বসে তার হঠাৎ মনে হ'য়ে যায়—সে যেন এ দুনিয়ায় বড্ড একা!

সহরের একটি রংদার পল্লীর মাঝখানের কোন একটি বাড়ীর দোতালার প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে রসিক পুরুষদের হল্লা এবং মাতামাতির মধ্যে একটি যুবতীরও মাঝে মাঝে মনে হয়—সেও যেন বড্ড একা!

—নেপথ্য—

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দরজা খুলিয়া গেল।

—আমাকে শিগ্‌গির বাঁচান্। বলিয়া সুধা দিগ্বিদিক সম্বন্ধে একেবারে সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া প্রদোষকে জড়াইয়া ধরিল : আমাকে বাঁচান দয়া করে'।

প্রদোষের বাহুর মধ্যে সুধা মূর্চ্ছা গিয়াছে।

ব্যাপারটা প্রদোষ আদপেই আয়ত্ত করিতে পারিল না। গভীর রাত্রি, জনশূন্য পথঘাট, ইহার মধ্যে এই সঙ্গীহারা পথচারিণী মেয়েটি হঠাৎ ভীত আর্ত্তস্বরে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াই অচেতন হইয়া পড়িল—প্রদোষ না পারিল সুধাকে মেঝের উপর শোয়াইয়া দিতে, না বা বাহিরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিতে কেহ এই মেয়েটিকে আক্রমণ করিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে কি না। তাড়াতাড়ি হাঁক দিল : রঘুয়া!

—জী। বলিয়া রঘুয়া এক লাফে আসিয়া হাজির।

রঘুয়ার চক্ষু স্থির। সুধার চোখের উপর হইতে আলুলিত চুলগুলি কপালের দিকে সরাইয়া দিয়া প্রদোষ কহিল,—তোর লাঠীগাছটা নিয়ে বাইরে দু' পা এগিয়ে দেখে আয় ত' কেউ একে তাড়া করবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে কি না। যা' শিগ্‌গির—

—ডাকু?

রক্তের আস্বাদে ক্ষিপ্ত বাঘের মত রঘুয়া দেয়ালের কোণ হইতে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইয়া এক বিকট হাঁক দিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল।

কেমন ততক্ষণে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে পাশের গলি দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

শিথিলকায় সুধাকে অতি সন্তর্পণে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া প্রদোষ সিঁড়ির ধাপ গুনিয়া গুনিয়া উপরে উঠিতেছিল। আগাগোড়া অন্ধকার। একবার পা পিছলাইলে আর কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। তাহা হইলে, মেয়েটি এই ভবে চক্ষু মুদিল।

অতি নিবিড় আগ্রহে সুধাকে বুকের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া প্রদোষ উঠিতে লাগিল।

রঘুয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—কোই নেই হায় বাবু। ভাগ গিয়া।

—উপরে উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালা দিকিন্ শিগ্‌গির

পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিয়া রঘুয়া আলো জ্বালাইল। দোতলায় নিজের পরিষ্কার তক্তকে বিছানার উপর সুধাকে আলগোছে শোয়াইয়া দিয়া প্রদোষ কহিল,—পাথরের বাটি করে' কুঁজো থেকে শিগ্‌গির খানিকটা জল গড়া—

জল গড়াইয়া রঘুয়া কহিল, ডাগ্‌দার বাবুকো বোলানে হোগা?

—দরকার নেই। চোখে-মুখে একটু জল ছিটোলেই এখুনি চোখ চাইবে হয় ত'। সদর দরজাটা বন্ধ করে' দিয়েছিস ত'?

বন্ধ করা হয় নাই। রঘুয়া নীচে নামিয়া গেল।

বনী-বনে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। পায়রার পাখার মতন নরম, ভীরু দু'খানি হাত,—ক্ষীণ দেহটি কুয়াসার আড়ালে চাঁদের মতন করুণ। সিঁথিতে

সিঁদুরের ক্ষীণ একটি ইসারা। ঐ ইসারাটিতেই সুধার সকল মাধুর্য্য। কপালে ও চোখে জল ছিটাইতে ছিটাইতে প্রদোষ ভাবিতে লাগিল এ কাহার নিরুদ্দেশ অভিসারে মৃত্যুর অনুযাত্রিনী হইয়াছে! কোথা হইতে আসিল, কোথায় আবার যাইবে!

গভীর শ্রান্তিতে সুধার সর্ব্বাঙ্গে সুপ্তি নামিল বুঝি। সে পাশ ফিরিল। দেহের কাঠিন্য শ্লথ হইয়া আসিল,—শুইবার ভঙ্গিটিতে একটি সুকোমল অবসাদ। পা দুইটা এখনো একটু ঠাণ্ডা আছে। চাঁপার কুণ্ঠিত কলির মত দু'টি শুভ্র পা। প্রদোষ তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

রঘুয়া দরজায় দাঁড়াইয়া নতুন কোনো আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল; প্রদোষ তাহাকে ইসারায় নীচে পাঠাইয়া দিল। সে দরজায় পাহারা দিক্; দরকার হইলে ডাকিয়া আনিবে।

এমন একটা ব্যাপার ঘটিবে কে ভাবিতে পারিয়াছিল? কাশীতে প্রদোষ আসিয়াছে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রথম পাঠ নিবার জন্য। বাড়ি-ঘর মা-বাপ ছাড়িয়া সে দীর্ঘ পথে পাড়ি দিয়াছিল, কবে ফিরিবে বা একেবারে ফিরিবেই কি না তাহার কিছুই হিসাব ছিল না। বীণার অন্যত্র যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুধু তাহাই নয়, পরীক্ষায়ও সে ফেল হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। পার্থিব জীবনে তাহার আর স্পৃহা নাই। ভাবিয়াছিল কাশীতে দিন কতক বিশ্রাম করিয়া সে এলাহাবাদ হইয়া প্রথমত দিল্লী যাইবে, সেইখান হইতে হরিদ্বার। কিন্তু বলা-কহা নাই, হঠাৎ এ কী উৎপাত জুটিয়া গেল!

উৎপাতই ত'। কতদিন আটকাইয়া থাকিতে হয় কে জানে! কাহার ঘরণী কুল ডিঙাইয়া তাহাকে ত্রাণকর্ত্তা ঠাওরাইয়া এমন সশরীরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বসিল। কতক্ষণে জ্ঞান হয় কে জান! জ্ঞান হইয়া চোখ আবার চাহিবে ত'! চোখ না চাহিলেই ত ফর্সা!

বিছানার উপর পা দুইটা গুটাইয়া লইয়া প্রদোষ সুধাকে আরো জোরে হাওয়া করিতে লাগিল। আঁজলা ভরিয়া জল লইয়া তাহার কপালে ও চোখে ঠোঁটে ও গলায় কানের পিঠে ও ঘাড়ের চুলগুলি ভিজাইয়া ফেলিল। সুধার সর্ব্বাঙ্গে যেন চেতনার চাঞ্চল্য আসিয়াছে। মেয়েটির উন্মীলচক্ষু মুখের মধুরতর লাবণ্যটি দেখিবার জন্য মমতাবিহ্বল দৃষ্টিতে প্রদোষের সে কী প্রতীক্ষা!

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সুধা ধড়মড় করিয়া উঠিল। কিছু যেন ভাল করিয়া ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না। এখনো একটা তন্দ্রার কুজ্ঝটিকা তাহাকে ঘিরিয়া আছে। তাহার চাহনি ফিকে, ঘোলাটে,—দৃষ্টিতে অপার শূন্যতা!

ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রদোষ কহিল,—তোমার আর কোন ভয় নেই।

কাহার মমতামধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুধার স্নায়ুগুলি সেতারের তারের মত ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। অস্পষ্ট লণ্ঠনের আলোকে সে কাহাকে যে নিমেষে চিনিয়া বসিল বলা কঠিন; একান্ত অন্তরঙ্গের মত অনুরাগময় অভিমানে সে সহসা প্রদোষের কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল: এতক্ষণ আমাকে ফেলে তুমি কোথায় ছিলে?

এই মুহূর্ত্তেই আকস্মিক স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ আঘাত এই মেয়েটিকে সহিবে না। সে বুঝুক, বুঝিয়া স্বস্তি পাক যে সে নিরাশ্রয় নয়, তাহাকে রক্ষা করিবার মত তেজ ও শক্তি, মমতা ও মনুষ্যত্ব এখনো সংসারে দুর্লভ হয় নাই। কপালের কাছে ভিজা চুলগুলিতে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে প্রদোষ গাঢ়স্বরে কহিল,—আর কিছু ভয় নেই, এইবার চুপ করে' লক্ষ্মীটির মত ঘুমোও, কেমন?

আরো নিবিড় সান্নিধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া সুধা কহিল,—তুমি আমাকে ফেলে যাবে না বল!

—পাগল! প্রদোষ তাহার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

কয়েকটি স্তব্ধ, নিস্পন্দ মুহূর্ত ! সুধার হয় ত' ঘুম আসিল। এই ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ও প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাস পলায়ন-প্রয়াসের পরিশ্রমে তাহার শরীর একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে ! বিস্তৃত দেহটিতে এমন একটি আলস্যের লাস্য রহিয়াছে যে প্রদোষের সমস্ত চেতনা বিহ্বল, বিমূঢ় হইয়া গেল। সে না পারিল তাহাকে বালিশের ওপর তুলিয়া দিতে, না পারিল এই একাকী রাত্রের অপরিচিত অন্ধকারে এই মেয়েটিকে অসংলগ্ন ভাষায় বীণা বলিয়া সম্বোধন করিতে ! চিত্রার্পিতের মত সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার দেহে যেন স্নায়ু নাই, স্বর !

হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া সুধা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল : ঐ, ঐ ! ওরা এল, এল আমাকে ধরতে—ঐ—

প্রদোষ তাহাকে ঘনতর স্নেহাবেষ্টনে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া কহিল,—কৈ, কেউ না। কার সাধ্য তোমাকে ধরে ? আমি আছি কি করতে তা' হ'লে ? অমন করে' কেঁপো না, লক্ষীটি—এই যে আমি। কিসের ভয় ?

কতক ভয়ে, কতক আবেশে সুধা আর চোখ মেলিল না। তাহার হাতের মুঠিটা ঠাণ্ডা, আঙুলগুলি বাঁকানো নীচের পাতলা ঠোঁটটি রজনীগন্ধার পাপড়ির মত কাঁপিতেছে। প্রদোষ আঙুল দিয়া ঠোঁট দুইটা সরাইয়া দেখিল দুই পাটি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে, নিশ্বাস কেমন চাপা ; নাড়ী দেখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার সঙ্কেত ঠিক বুঝিল না—মনে হইল কেমন-যেন অবসন্ন, ভীরু ! ভাবিল, রঘুয়াকে একটা হাক দিবে কি না। কিন্তু ভয়বিকৃতকণ্ঠে অমন একটা খোট্টা নাম হাঁকিয়া উঠিলে হয় ত' দুঃস্বপ্নের মাঝেই মেয়েটি মিলাইয়া যাইবে। সে তাড়াতাড়ি সুধাকে প্রসারিত অবস্থায় শোয়াইয়া দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া তাহার হাত-পা গরম করিতে বসিল। হাতে-পায়ে রক্ত একটু অতিরিক্ত হইয়া উঠিতেই সে আবার চোখে-মুখে জল ছিটাইতে লাগিল।

নিতান্ত অসহায়ের মত সুধা কহিল,—তুমি কৈ ?

তাড়াতাড়ি তাহার গা ঘেঁসিয়া সরিয়া আসিয়া প্রদোষ কহিল,—এই ত' আমি—তোমার কাছে। কেন তুমি অমন ভয় পাচ্ছ ?

—না, ভয় পাচ্ছি না। তুমি আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধর। আমাকে চলে' যেতে দিয়ো না। তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে দলে দলে লোক আসছে—হাতে ছোরা,—ঐ যে ! ঐ আবার এলো ! ঐ আমার দিকে তাকিয়ে শাসাচ্ছে—

প্রদোষ ব্যাকুলতর দুর্ভাবনায় মেয়েটিকে লতার মত জড়াইয়া ধরিল ; কহিল—আমার কাছ থেকে কেউ তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এবার তুমি ঘুমোও।

সুধার শরীরে সাড়া নাই, দয়িতালিঙ্গনের মাঝে সে যেন নিজেকে ঢালিয়া ঢালিয়া ফুরাইয়া দিয়াছে।

এই স্পর্শে না আছে রমণীয় রোমাঞ্চ, না বা শীতল শিহর ! কেমন একটা মূঢ় আবেশ—জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখার মত একটা আনন্দহীন নিষ্প্রাণ আকাঙ্ক্ষা ! প্রদোষ কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না, না চিন্তায় না চেতনায় !

পাছে এই স্পর্শটুকু শিথিল করিয়া দিলে মেয়েটি আবার নিরুত্তাপ শয্যায় সহসা চীৎকার করিয়া উঠে, সেই ভয়ে প্রদোষ তাহাকে দুই বাহুর মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিল। প্রখর ও অবিচ্ছিন্ন মনোযোগসহকারে সে মনে মনে মুহূর্ত গুনিতে লাগিল। টেবিলের উপর রুপোর রিষ্ট্-ওয়াচ্‌টা একধারে পড়িয়া আছে, তাহার খট্-খিট্ এখান হইতে শোনা যাইতেছে না। এই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতায় প্রতিটি মুহূর্ত মুখর—অন্ধকারে তাহাদের অগণন

শোভাযাত্রা চলিয়াছে। এই মুহূর্তের সমুদ্র কবে পার হইবে ভাবিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিল।

সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল। কে বলিবে এ তাহার বীণা নয়। যেন বাসরশয্যা হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। সাহসিকা অভিসারিকা নয়, ত্রস্তা বেপথুমতী। মুখখানি তেমনি করুণ,—অস্তমিত চাঁদের কিনারে আকাশটুকুর মত অশক্ষান! ঠোঁট দু'টিতে সেদিনের বিগতগন্ধ স্মৃতির আভাসটুকু এখনো যেন লাগিয়া আছে। ললাটে সেই আভা। এক দিন এমনি করিয়াই তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! সেই দিন এখনো অবসান হয় নাই। মাঝে প্রদোষ দুরন্ত শিশুর মত মা'র কোলে ঘুমাইয়া ছিল বুঝি—হাঁ, প্রথম প্রেমের বিস্মৃতিটি মা'র মতই তাপবিমোচিনী! বীণা আবার আসিয়াছে। কিম্বা, বীণা বলিয়া হয় ত' কেহ ছিল না। কে জানে, হয় ত' এই বীণা আবার স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

এই রাত্রি দীর্ঘায়ু হোক্!

প্রদোষের মনে কবি-কল্পনার মত সুধার দেহ ভরিয়া এখন ঘুম নামিয়াছে। তাহার দেহভঙ্গীটি এখন স্বাভাবিক, সুস্থ—মুখের সেই কঠিন পাণ্ডুরতা তরল হইয়া আসিতেছে। নিশ্বাস লঘু, গাত্রোত্তাপ স্নিগ্ধ। আলগোছে সে মেয়েটিকে বালিশে ভর করিয়া শুইতে দিল। একটু চঞ্চল হইয়া উঠিতেই সে আবার তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। সুধা কথা কহিল না, খালি দুর্বল ডানহাতটি প্রদোষের কোলের উপর বিছাইয়া দিয়া পরম স্বস্তিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ক্রমে লণ্ঠনের তেল ফুরাইয়া আসিল এবং আলোটা নিবিয়া যাইতেই প্রদোষ টের পাইল কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ চাঁদ মেঘের জানালায় মুখ বাড়াইয়াছে। তাহাকে আর বুঝি সন্ন্যাসী থাকিতে দিল না। মূর্চ্ছিত সুধা ও ঘুমন্ত সুধায় কত প্রভেদ! যেন লণ্ঠনের আলো আর কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ! হঠাৎ সে নত হইয়া নিজের মুখের উপর সুধার মৃদু-মৃদু নিশ্বাসটী বারকতক অনুভব করিল। আরো একটু নত হইতেই সুধার বুকের মধ্য হইতে কি একটা কঠিন জিনিস হঠাৎ তাহার হাতে খোঁচা মারিয়া বসিল। প্রদোষের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

তাড়াতাড়ি অথচ অতি সন্তর্পণে সে মেয়েটির বুকের বস্ত্রবাহুল্য স্বল্প করিতে সুরু করিল। বোধহয় মেয়েটির জামার অন্তরালে তাহার জীবন-রহস্যের চাবি আছে। সেমিজের ধারটা টানিয়া তুলিতেই যে অল্প একটু ফাঁক হইল তাহারই একটুখানিতে ভীরু নির্লোভ হাতখানা খানিকটা লুকাইতেই সে সেই শক্ত জিনিসটার নাগাল পাইল। অতি ধীরে তাহাকে বাহির করিয়া আনিল। আলো না থাকিলেও বুঝিতে তাহার দেরি হইল না যে এ একটা খাপে-ঢাকা ছোরা!

একটা ভয়ঙ্কর রূপক। নারীপ্রেমাতুর সন্ন্যাসীর শাসনদণ্ড

প্রদোষ হটিয়া গেল। এইবার সে ভয় পাইয়াছে। মায়াবী কাশী!

কিন্তু মেয়েটির মুখে কী সুচারু বিদগ্ধতা! প্রিয়বিরহবিধুরা গভীর রাত্রে চুম্বনের স্বপ্ন দেখিয়া সানন্দ লজ্জায় যেমন করিয়া অধরে একটি ক্ষণ তৃপ্তির ক্ষীণ রেখা টানে, তেমনি একটি হাসি তাহার ঠোঁটের বালিশে ঘুমাইয়া আছে। এ মেয়েটি কাহাকে হত্যা করিতে বাহির হইয়াছিল! বস্ত্রান্তরালে ছোরা, অথচ মুখে এমন একটি নিষ্পাপ মাধুর্য্য!

প্রদোষ তক্তপোষ হইতে নীচে নামিয়া অতি তাচ্ছিল্যভরে কাশীর দেবতাকে জোড়হাতে নমস্কার করিয়া কহিল,—জয় বাবা বিশ্বনাথ!

কোনো একদিন আকাশের সূর্য্য নাকি গলিয়া-গলিয়া ফতুর হইয়া যাইবে। ভাগ্যিস্ সে-

লগ্ন এখনই আসিয়া পৌঁছে নাই। অট্টালিকার সারি সরাইয়া প্রথম রশ্মিরেখা উঁকি দিয়াছে।

সুধা এখনো ঘুমে। ক্লান্ত দেহে ঘুমের সুষমাটি লাবণ্যকে গাঢ় করিয়াছে। যেন এই রাত্রি প্রভাত হইলে কোন্ আকাঙ্ক্ষিত সূর্য্যের সঙ্গে তাহার শুভদৃষ্টি ঘটিবে। তাহার দৃষ্টির অজস্র বন্যায় সে স্নান করিয়া নির্ম্মল হইয়া উঠিবে, তাহারই দৃষ্টির বন্যায় সমস্ত অন্ধকার অপসৃত, অপরিচিত পথের কিনারা খুঁজিতে তাহার আর দেরি নাই।

প্রদোষ ঘরের মধ্যে অস্থির পদে পাইচারি করিতেছিল।

এত বেলায় ওঠা সুধার অভ্যাস নয়। তাই একটু বিব্রত হইয়াই সে তাড়াতাড়ি গায়ের উপর শিথিল বস্ত্রাঞ্চল টানিতে টানিতে উঠিয়া বসিল। এতক্ষণ তাহার মনে হইতেছিল সে কলিকাতায় তাহাদের পটুয়াটোলার বাড়িতে দোতলার ঘরে তাহার মায়ের ফোটো শিয়রে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মধ্য রাত্রে মূর্চ্ছিত চেতনায় তাহার একবার মনে হইয়াছিল সে বীরেনেরই কোলে মাথা রাখিয়া একাকীত্বের ভার লাঘব করিতেছে —তাহার নিরুদ্দেশ পথ সাথী, তাহার উড্ডীন দুই পাখার আকাশ-আশ্রয়! কিন্তু তাহা ত' নয়,— তবে?

সহসা সম্মুখে অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া সুধা ভয়ে লজ্জায় দুঃখে ভাবনায় একেবারে এতটুক হইয়া গেল। দুর্ব্বল অসুস্থ শরীরটা প্রবল উদ্বেজনায় ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সাম্‌লাইয়া সে কহিল,—আমি কোথায়?

প্রদোষ একটু সরিয়া আসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—তার চেয়ে বলুন্ আপনি কে? যেখানে আপনি আছেন সেখানে কেউ এসে আপনাকে ছোঁয়া দূরে থাক্, ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াতে পারবে না। আপনার কিচ্ছু ভয় নেই।

সুধা তাড়াতাড়ি মাথার উপর ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। লজ্জায় তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

—যা' হয়—

শ্রীবিমল মিত্র

সেদিন কলেজের কমনরুমে বসে' অনেক কথাই হচ্ছিল।

ক্যারমবোর্ডের খটাংখট শব্দ—প্রথম কলেজে আসা ফাষ্ট ইয়ারের ছেলেদের ছুটোছুটি··· ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের অকারণ জ্যাঠামিপনা—ওদের দুই বন্ধুর কথার স্রোতে বাধা দিতে পারবে কেন?

অসীম বলছিল—শিল্পীর যেমন পাথর কুঁদে মূর্ত্তি গড়বার ক্ষমতা আছে—তেমনি মানুষেরও আছে নিজের নিজের ভাগ্য গড়বার ক্ষমতা। আমার হাতে ভাগ্য-রেখা ক্ষীণ কি স্পষ্ট তা' নিয়ে জ্যোতিষীদের পকেটে পয়সা ঢালার চেয়ে লেবর আর পার্সিভিয়ারেন্স-এর ফল অনেক ভাল।—আর দেখ ব্যাপারটা কি জান—

আনন্দ মাঝখানে বাধা দিলে—বাই দি বাই, আচ্ছা অসীম, তোমার এইম্ কি? মানুষের তো একটা উদ্দেশ্য থাকে, অর্থাৎ গোল···

আনন্দের কাছে অসীমের গোপন করবার কিছুই নেই। বললে—আছে বৈ কি—প্রথমতঃ, এম এটা দিতেই হবে নইলে কিছুই হোল না। তারপর স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যাণ্ড এ যাব, সেখান থেকে ডি লিট্ টাইটেলটা নিতে হবে—তারপর দেশে এসে পুরোমাত্রায় সাহিত্য-চর্চ্চা করা। আর পেট চালাবার জন্যে ওখান থেকে বার্-এ্যাট-ল হয়েও আসতে পারি।—এক কথায় কালচার্ড আপ-টু-ডেট আর ফেমাস হ'তে হবে বুঝেছ···।

আনন্দ বললে—ঠিক বলেছ—কিন্তু আমাকেও সঙ্গে নিও—দু'জনে কিন্তু কখনও ছাড়াছাড়ি হব না—আর চিরকাল ব্যাচিলর তো?

হরিহর আত্মা নয়···

তবু দু'জনের কাছে দু'জনের মনের ভাব প্রকাশ করবার পক্ষে ওরা যথেষ্ট সচ্ছন্দতা অনুভব করে।

বয়েস কত আর? আঠরোর কম কিছুতেই নয়, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে···—কিন্তু যৌবনের প্রাচুর্য্য এই বয়েসেই প্রকট!

সাবান মেখে খসখসে করা চুল···অসম্ভব রকমের ঢিলে পাঞ্জাবী···মানানসই জুতো··· কামিয়ে ফেলা গোঁফ···সবই ছেলেটির উন্নত রুচির পরিচায়ক।

ক্লাসের ছেলেগুলো যাই বলুক—আড়ালে বলতে বাধ্য হয়—মন্দ নয়—বেশ ভালোই!

অন্য ছেলেটির বেশের কিছু পার্থক্য থাকলেও বন্ধুর চেয়ে স্টাইলে কোন হিসেবে কম নয়। এক কথায় বলতে হয় দু'জনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা' সার্কাসের বাঘের খেলার মত একটুখানি দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।—অন্ততঃ দু'-দশমিনিট ধরে' তারিফ করতে হয়।

বলে রাখা ভাল পাঞ্জাবী-পরা ছেলেটি—যা'র নাম অসীম—ওর একটু লেখার অভ্যেস আছে—অর্থাৎ কবি। ছোট-বড় মাসিকে রীতিমত স্বনামেই লেখা ছাপা হয়।

অপর ছেলেটি—যা'র নাম আনন্দ ওটি কবি না হ'লেও কাব্যিক অর্থাৎ কবি প্রকৃতির। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—যেমন বর্ষারাতে আনন্দর চেষ্টা ক'রেও ঘুম আসে না—রবি ঠাকুরের কবিতা পেলে খাওয়ার কথা ভুলে যায়—আকাশে মেঘ দেখলে চোখে জল ঝরে—বাঁশীর শব্দ শুনলে পুরোন স্মৃতি মনে পড়ে, ইত্যাদি।

— নিশ্চয়ই ! যদি লঙ লাইফ পাই, তা' হ'লে দেখিয়ে দেব জীবন-যাপন কা'কে বলে ! বালিগঞ্জ সাইডে দশবিঘে জমির ওপর চমৎকার বাড়ী করতে হবে !···

আনন্দ লাফিয়ে উঠ্‌লো—ঠিক ঠিক সে বাড়ীতে শুধু আমরা দু'জন থাকবো, চারদিকে বাগান—

অসীমের আশাও অসীম ; বললে সে সব প্ল্যান আমি অনেকদিন করে' রেখেছি ; চার-দিকে বাগান—ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তা · একপাশে একটা টেনিস লন ! ··

—চমৎকার !

- তারপর বাড়ীর ভেতরে থাকবে বড় বড় তিনটে ঘর - একটাতে লাইব্রেরী আর দুটো দু'জনের শোবার ঘর—তা' ছাড়া একটা মস্ত সকোয়ার হল !—তা'তে মাঝখানে একটা নিউ-মডেল মেহগনি টেবল—চারপাশে অসংখ্য চেয়ারে, কোচ, সোফা এমনি সব হ্যাঁ, বাড়ীটা হবে বাঙলো প্যাটার্ণের।

আনন্দ বললে—আর বাঙলোর পেছনে একটা গোল পুকুর মাছে ভর্ত্তি···

অসীম বললে—হ্যাঁ, তাও থাক্‌তে পারে·· বন্ধুদের ইন্‌ভাইট্‌ করে' সেখানে মাঝে মাঝে ফিসিং চলবে। মোট কথা একটা আইডিয়াল··

বাধা দিয়ে আনন্দ বললে—যাই বল, লাইফটা ফুল্লি এঞ্জয় করতে হবে ! কিন্তু সবই হবে যদি ভাষ্ট এ্যামাউণ্ট অব মণি থাকে।

—তা' তো বটেই, মনথলি দু'জনের পাঁচশ'র কমে তো কিছুতেই হ'তে পারে না—কি তার বেশীও লাগতে পারে···

হঠাৎ বেল বাজতেই বাধা পড়ল। প্রফেসর জি, পির ক্লাস ; এক সেকেণ্ড দেরী হ'লে মার্কড এ্যাবসেণ্ট ; তাড়াতাড়ি রুম-নম্বরটা দেখে নিয়ে দু'জনেই ক্লাসে গেল।

···বছর বিশেক—কি তা' ও নয় !

ডালহাউসি সকোয়ারের ফুটপাথে যে লোকটা ছাতি কাঁধে নিয়ে কাস্তপদে এদিকে আসছিল—তা'কে দেখে কে বলবে ওই আমাদের সেকেণ্ড্‌ ইয়ারের অসীম !

আই-এ ফেল করে' অসীম চাকরীতে ঢুকেছিল ;···কবিতা দেবীও সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছিলেন।

মাথার সে লম্বা চুলগুলো সমস্ত সমান করে' ছাঁটা, চশ্‌মা নইলে নয়, তাই সাধারণ ফ্রেমের একটা চশমা নাকের আগায় রক্ষিত। গায়ে কোট জামা—গলার বোতাম আঁটা ; ছোট ঝুল কাপড় হাতে একতাড়া আপিসের কাগজ-পত্র···

দেখ্‌লে মায়া হওয়াই স্বাভাবিক !

মনে হয় বসতে পেলে ও যেন আর দাঁড়াতে চায় না। ও যেন নির্ব্বিবাদে সারাজীবন শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেই খুসী হোত ! ওর আটত্রিশ্‌ বছরের আকাশে যে চিরকালই এমনি বর্ণহীনতা ছিল না—একথা ওকে দেখে বিশ্বাস করা শক্ত ! মনে হয়, ওর জীবনে বড় বেশি কিছু কাম্য নয়—শুধু খেতে পেয়ে নিঃশ্বাস ছাড়্‌তে পারার শক্তিটুকুই ওর পক্ষে যথেষ্ট ব'লে মনে করে।

বাড়ীর কাছে যেতেই ছোট ছেলেটি সারা গায়ে খোসপ্যাঁচড়া নিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

ভেতরে স্ত্রী—হাতে ছাই মেখে উনানে আগুন ধরাতে ব্যস্ত স্বামীর আগমনে হাতের কাজ ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে সেরে নেবার চেষ্টা করলে।

অসীম গিয়ে জিগ্যেস করলে—মায়া, জ্যোতির প্যাঁচড়ায় আজ ওষুধ দেওয়া হয় নি ?

উত্তর এল—দেওয়া আবার হয় নি, যা' তোমার ছেলে, সেই দণ্ডেই মেখে পুঁছে ফেলে

দিয়েছে ··· সারা দিন ধুলো মেখে মেখে বেড়াবে ! ওকি বাড়ীতে থাকে নাকি ? তুমি এলে এখন তাই—তুষ্টুর একশেষ !

অসীম ঘরে গিয়ে প্রদীপের সলতেটা উসকে দিলে ···ঘরের জিনিষ-পত্র নজরে পড়ল।···

একটা তক্তপোষ জোড়া বিছানাপাতা ; ছিদ্রবহুল চাদরটা অতীতের বহু অত্যাচারের সাক্ষীস্বরূপ মলিন হ'য়ে বিরাজ করছে। চার কোণ ভাল করে টাকাও পড়ে নি।

খানিক পরে মায়া এল। অসীম তখন জুতো জোড়া পা থেকে খুলে রেখে তক্তপোষের ওপর চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়েছে। একটা বিড়ি ধরিয়ে পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল।

মায়া বললে—বাড়ীঅলা যে টাকা চাইছিল —তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়ে' গ্যাছে—আর কিন্তু দেরী করবে না। মাইনে পেলে আজ ?

অসীম উত্তর করলে—যা' পেয়েছি নিজেরা উপোস করে' থাকলেও তা' দিয়ে তু'মাসের ভাড়াও চোকান যাবে না। এমাস থেকে সকলের মাইনে কমে' গ্যাছে—চাকরী ও যেতে পারে !

···সারাদিন যা' পরিশ্রম গ্যাছে ! গাধার খাটুনি ··বড় সাহেবের চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেবার ভয় দেখান—মাইনের রিডাকশ্যন্ · সবই যেন আজ নতুন সমস্যা হ'য়ে ওর কাছে মুখ ব্যাদান করতে লাগল !

মায়া ওর হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। লিখেছে আনন্দ ; লিখছে—

সম্প্রতি আমার চাকরী গিয়েছে ; যে দৈনিক কাগজটার অফিসে কাজ করতাম—সেই প্রেসের ওপর প্রেস-অর্ডিনান্স্ জারি হ'য়েছে—তাই আমার এই দুর্দ্দশা। কাজের আশায় চারদিকে ঘুরছি। সন্ধানে যদি কাজটাজ্ থাকে দেখো। কিছু টাকা ধার পেলে ভালো হোত। কিন্তু তোমার অবস্থাতো আমি জানি—তাই তোমাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। সে যাক্—আমার শরীরও ভাল নেই - এক'দিন ভালো করে' খাওয়া পাচ্ছি না ; আর বেশী কিছু লেখবার নেই। বৌদি' কেমন আছেন—আর জ্যোতি ? উত্তর দিও—ইতি,

তোমার আনন্দ।

অসীম অনেক দুঃখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অসীম অনেক কথাই ভাবছিল। ..মায়া তখনও কলতলায় বাসন মাজছে !

...ওর মনে হোল পৃথিবী ওর সঙ্গে যেন বড় বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে·· ওর আকাশের উদয়াচলের সমারোহের সঙ্গে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের বিরাট দৈন্যতায় কত তফাৎ !·· কিন্তু এই কি স্বাভাবিক ?

মায়া যখন শুতে এল—চাঁদের আলোয় ও মায়ার মুখখানা একবার ভালো করে' দেখে নিলে ! আজ ওর প্রথম চোখে পড়ল প্রথম ফুলশয্যার রাতের মায়ার সঙ্গে আজকের ছাব্বিশ বছরের মায়াতে কোনও সামঞ্জস্য নেই—যা' আছে তা' কেবল ওর নামে !

ও জিগ্যেস করলে—মায়া ঘুমুলে নাকি ?... সারাদিন কঠোর খাটুনির পর তার শুতে শুতেই ঘুম এসেছিল। উত্তর এল না।

অসীমের বিশ্বাস হোল না ; ওই যে ওর পাশে এসে শুয়ে রয়েছে, ওকে ও সত্যিই একদিন নিজেই পছন্দ করে' বিয়ে করেছিল নাকি ?

ওর মনে হোল—এই বিশ বছরে কত তফাৎ ! ···বিশ বছরে ও কতদূর এসে গ্যাছে।—বুধগ্রহ থেকে পৃথিবী কি আরও দূর ?

———

—নিমাই-চরিত—

শ্রীহরিপদ গুপ্ত

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া রমেশ-দা' বলিলেন—এক গ্লাস জল।

একটু বিশ্রামের পর তিনি ধরিয়া বসিলেন—আগামী সপ্তাহে ক্লাবে তোমার একটা গল্প পড়তে হবে, শীগ্‌গির নাম বল, আজই নোটিস্ দিয়ে দেব।

অবাক্ হইয়া গেলাম। এ কী অসম্ভব কথা! অনেকদিন হইতে লেখা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি, পুরাণো লেখাও হাতে কিছু নাই। নূতন করিয়া ছাই-ভস্ম-রাবিস্ লিখিতেও আর প্রবৃত্তি হইতেছিল না। অগত্যা আমাকে এ যাত্রা রেহাই দিতে অনুরোধ করিলাম।

তিনি কিন্তু নাছোড়বান্দা! কিছুতেই যখন ছাড়িলেন না, তখন প্রথম যে নাম মনে আসিল বলিয়া ফেলিলাম—'নিমাই-চরিত'। তিনি প্রফুল্ল-চিত্তে বিদায় হইলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই দিন কাটিয়া গেল। লেখা কিন্তু একটী পাতাও মসিময় করিল না—মুস্কিল ত বটেই, ফাঁপরেও পড়িলাম বড় কম নয়। কোন প্লটই স্থির হইল না; অথচ রমেশ-দা'কে নিমাই-চরিত নাম পর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছি। দারুণ দুর্ভাবনা!

চিন্তার খেই সহসা হারাইয়া গেল।

বৌদিদি আসিয়া বলিলেন—ঠাকুর পো, নিমাই-চরিতখানা টেবিলের ওপর রেখেছিলুম, ক'দিন থেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না; পড়ে শেষ আর কর্‌তে পার্‌লুম না।

কেবল আনন্দেই যে হাসি আসে না একথা হাড়ে হাড়ে বুঝিলাম; কারণ, তাঁর কথায় আমার মুখ সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলাম—আর বল কেন বৌদি', সেখানা নিয়েই যত বিপদ। একটা মিটিংয়ে গল্প পড়তে হবে, ভদ্রলোক নাম চাইলেন, —হাতে ছিল তোমার নিমাই-চরিতখানা খেয়ালে গল্পের নাম বলে দিলুম—'নিমাই-চরিত'। এখন বিভ্রাট হয়েছে কি লিখ্‌ব, প্লট খুঁজে পাচ্ছি না!

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে আমার স্ত্রী কল্যাণী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—বেশ তো, অত ভাব্‌নার কী আছে? আমাদের নিমাই-দা'কে নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলো না!

কূল পাইলাম।

কথাটা মন্দ লাগিল না। এতক্ষণ ভাবিয়া দেখি নাই। সত্যই তো নিমাই দা' নিজেই খুব সুন্দর একটা গল্পের উপাদান—

যাহা হউক, মাথা হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল। সেই দিনই আহারাদির পর লেখা আরম্ভ করিয়া দিলাম এবং দুই দিন অক্লান্ত চেষ্টার ফলে লেখাটি সম্পূর্ণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

শনিবার। আজ ক্লাবে গল্প পাঠ করিবার দিন। কয়েকখানি দৈনিক কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মনে যে আনন্দ হইতেছিল না তাহা নহে, কিন্তু সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একপ্রকার ভয়ও করিতেছিল।

সাতটায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার কথা। আমি আধঘণ্টা পূর্ব্বে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড হল। প্রায় ভরিয়া আসিয়াছে।

রমেশ-দা' পিঠ্ চাপড়াইয়া বলিলেন—তোমার গল্পের নামকরণ খুব সার্থক ও চমৎকার হয়েছে! এখন পর্য্যন্ত আমাদের সভ্যরা কেউ আসে নি, এঁরা সবই বাইরের লোক।

চাহিয়া দেখিলাম—গৃহের অধিকাংশ ব্যক্তিই ফোঁটা-তিলক কাটা, কেহ কেহ মুক্তকচ্ছও। তাঁহাদের বৈষ্ণব বলিয়াই মনে হইল। বুঝিলাম,—ভদ্রলোকেরা ভুল করিয়াছেন। নিমাই-চরিত পাঠ মানে তাঁহারা আমার গল্প বোঝেন নাই, শচীনন্দন নিমায়ের কথাই বুঝিয়াছেন। আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

সাতটা পনের মিনিটের সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। দুই-একজন ব্যতীত সভায় সাহিত্যিক সভ্য বড় কেহ উপস্থিত হন নাই। বুঝিলাম,—আমার মতো নগণ্য লেখকের লেখা শুনিয়া কেহ সময়ের অপব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন।

উদ্বোধন-সঙ্গীত হইয়া গেলে গত সভার কার্য্য বিবরণী পাঠ হইল। তারপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—এবার নিমাই-চরিত পাঠ হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পড়িবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

ঘামে আমার সমস্ত শরীর একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল। কম্প্রবক্ষে কুণ্ঠিতচিত্তে ধীরে ধীরে সভাপতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম :—

নিমাই-চরিত।

নিমাই-দা' অর্থাৎ নিমাইচন্দ্র বসু শ্যামবাজারের বিখ্যাত বসু-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি সকলেরই অগাধ বিশ্বাস ছিল; তিনি নাকি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কখনও তিনি কোন ইচ্ছা করিলেন না এবং তাঁহার কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হওয়া হইল না। অথচ, তাঁহার প্রতি সকলের বিশ্বাস কিন্তু তেমনই অচল-অটল রহিয়া গেল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নিমাই-দা' প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছিলেন; অমনি সকলে আশা করিয়া বসিল—আই এ পরীক্ষাও তিনি প্রথম বিভাগেই পাশ করিবেন।

নিমাই-দা' কিন্তু পরীক্ষা আর দিলেন না। হঠাৎ তিনি একটি শ্বেতাঙ্গিণী তরুণীর প্রেমে পড়িয়া গেলেন।

এই কয় লাইন পড়া হইতেই তিলকধারী শ্রোতার দল অবাক্-বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে 'হরি হে দীনবন্ধু!' বলিয়া একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। গোলমালের জন্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, তারপর আবার পড়িতে লাগিলাম :—

কথাটা গোপন রহিল না। নিমাই-দা'র পিতা নিত্যানন্দবাবুর কাণে যাইতেই তিনি পুত্রকে তলব করিলেন।

কোথায় নিমাই দা'?

তিনি তখন সিন্দুক ভাঙ্গিয়া হাজার দশেক টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। নিত্যানন্দবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক; তাঁহার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করিয়া দিন দুই চুপ করিয়া রহিলেন। তার পরই একদিন তিনি লেখাপড়া করিয়া নিমাই-দা'কে ইচ্ছাপত্রের বলে সকল সম্পত্তি হইতে একেবারে বঞ্চিতকরিয়া দিলেন। তাহার বিরুদ্ধে কেহ একটা প্রতিবাদের কথাও কহিতে পারিলেন না।

:

এই ঘটনার বছর সাতেক পরের কথা।

আফিসে চলিয়াছি, হঠাৎ ডালহাউসী-স্কোয়ারের মোড়ে নিমাই-দা'র সঙ্গে দেখা। হন্‌হন্ করিয়া তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন।

ডাকিয়া বলিলাম—ব্যাপার কী? অত ব্যস্ত হয়ে চলেছ কোথা?

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্-বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া রহিলেন।

দেখিলাম—আগের নিমাই-দা' আর নাই। তাঁহার অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; যেন একটা কাল-বৈশাখীর ঝড় একটা গাছের ডালপালা সব ভাঙ্গিয়া মুস্‌ড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। দেখিলে আর চেনা যায় না। সেই গৌরবর্ণ একেবারে তামাটে হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা নিমাই-দা' আমাকে চিনিতে পারিয়া পিঠ্ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—এই চলে যাচ্ছে ভাই একরকম। তারপর তোদের খবর কি? সব ভালো?

বলিলাম—আর সকলে ভালই, তবে মা আর নেই। আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন।

তিনি মার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মা তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার চোখের কোণে অশ্রুরেখা টলমল করিয়া উঠিল।

ব্যাপারটাকে ঘুরাইয়া দিবার জন্য হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তারপর, তোমার সেই মেমের খবর কি? ছেলেটেলে কিছু হলো?

মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন—ভাগল্‌বা।

আগ্রহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—

কি রকম, কি রকম?

তিনি বলিতে লাগিলেন:—

ছুঁড়িকে নিয়ে চম্পট দিয়ে একেবারে বোম্বেতে গিয়ে তো ওঠা গেল। দিন কতক সে ছিল বেশ ভালোই। তারপরই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করলে। ওদের স্বজাতের একটা ছোক্‌রাও জুটে গেল। বলে—ওর আত্মীয়। রাতদিন তার সঙ্গেই ফিস্ ফিস্ করে কি সব পরামর্শ হতো; দু-বেলা তার সঙ্গেই সে বেড়াতে বেরুতে লাগ্‌ল।

এসম্বন্ধে দু একটা প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখি যে, সে একেবারে আগুণ হয়ে যায়। কাজেই চুপ করতে বাধ্য হই।

এর কিছুদিন পরই আমার ভয়ঙ্কর অসুখ হলো। আমি জ্বরের ঘোরে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। যখন জ্ঞান হলো দেখ্‌লুম—পাখী উড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চেক্‌বইখানিও একেবারে অদৃশ্য; তখন মনে হলো একাউণ্টটা ওবেটীর নামে ট্রেন্সফার করে কী ভুলই না করেছি!

ব্যাপারটা বুঝ্‌তে আর একটুও বিলম্ব হলো না। আমি একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লুম। কি যে করব কিছুই ভেবে পেলুম না। যাকে বলে তোমার ওই—সর্ষেফুল দেখা।

সেখানকার পোষ্টমাষ্টার কিশোরীবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো; তিনি বাঙালী। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গিয়ে তাঁকে বিপদের কথা সব বল্‌লুম।

তিনি বলিলেন—এতো জানা কথাই। তাকে আর পাবে না। সে এতক্ষণ রেড্‌সিতে; খোঁজ করে কোনও লাভ নেই। তুমি কলকাতায় চলে যাও; বাবা আর ফেল্‌তে পারবে না। একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে—

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লুম—পকেট যে একেবারে গড়ের মাঠ। যাই কি নিয়ে?

তিনি একটু হাসিলেন। তারপর বলিলেন—বিকেলে এসো একেবারে ট্রেণে তুলে দেব'খন।

তাই হলো। বিকেলে কলকাতার টিকিট কেটে তিনি আমাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে গেলেন।

সব খবরই পেলুম। বাবার সঙ্গে আর দেখা কর্‌লুম না; সাহসও হলো না।

এক বন্ধুর বাড়ী উঠে দিন কতক সেখানেই কাটিয়ে দিলুম।

কি করি, কি করি ভাব্‌ছি এমন সময় হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল। লাগ্‌ল ইংরেজে-জার্ম্মাণে যুদ্ধ; ব্যস্, রিক্রুট হয়ে একেবারে ইষ্ট আফ্রিকায়।

বেশ ছিলুম সেখানে। দু'একটা গুলিও

খেয়েছিলুম কিন্তু কিছু হলো না, মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে উঠ্‌লুম। সহজে কি আর এ প্রাণ বেরোয়?

তারপরই সন্ধি হলো;—আবার সেই ইণ্ডিয়ায়। কলকাতায় আর যাওয়া হলো না, কি মনে করে হঠাৎ বেনারসেই নেমে পড়্‌লুম।

সহসা নিমাইদা পোষ্টআফিসের বড় ঘড়িটার দিকে চাহিয়া অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া—বেজায় বেলা হয়ে গেছে, চাকুরী বজায় রাখ্‌তে হবে তো? একদিন যাস না আমার ওখানে বলিয়া বাড়ীর ঠিকানাটা দিয়া একপ্রকার ছুটিয়াই মুহূর্ত্তে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলেন।

কয়দিন ধরিয়াই নিমাইদার জীবন-ইতিহাসের শেষটুকু শুনিবার জন্য মনের ভিতর কেমন করিতেছিল। সেদিন ঠিক্ করিলাম—আফিস হইতে ফিরিবার পথে একবার তাঁহার বাড়ীতে যাইতেই হইবে।

মেইল ডে। আফিস হইতে বাহির হইতে সেদিন একটু দেরী হইয়া গেল। গলিটার মোড়ে আসিতেই নিমাইদার সঙ্গে দেখা। তিনি জোর করিয়া আমাকে টানিতে লাগিলেন। বলিলেন—চ' আমার বাড়ীটা দেখ্‌বি চ'!

আমি হাসিয়া বলিলাম—সেই মনে করেই তো এসেছি।

তিনি ভারি খুসী হইলেন।

ছোট্ট একতালা একটি বাড়ী, খান তিনেক ঘর। বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। আমাকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া নিমাইদা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—ওগো, কে এসেছে দেখ্‌বে এসো! শীগ্‌গির দুজনকে চা আর জলখাবার দাও। পেট একেবারে জ্বলে গেলো।

একটু পরেই নিমাইদা কাপড় জামা ছাড়িয়া আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। চাকুরীর বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই তাঁহার সহিত আলোচনা চলিতেছিল, সহসা জলখাবারের ডিস্ ও চায়ের পেয়ালা লইয়া প্রবেশ করিল এক রূপসী তরুণী। তাহার মুখের হাসি যেন চোখের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছিল!

নিমাই দা'কেও চা-খাবার দিয়া সে ধীরে ধীরে কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

কোন্ সকালে নাকে-মুখে চারটি গুজিয়া বাহির হইয়াছি! পেটে তখন আগুন ধরিয়াছে গো-গ্রাসে রেকাবিটি শূন্য গর্ভ করিলাম তা বলাই বাহুল্য—তপ্ত চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিলাম—তারপর, নিমাইদা, সেদিনের তোমার সেই বাকী অংশটুকু শেষ করে দাও! শেষটা শোন্‌বার জন্যই আজ আমার আসা!

সেই তরুণী পান দিয়া গেল।

পান চিবাইতে চিবাইতে নিমাইদা হাসিয়া বলিলেন—শোন্‌বার মতো কী আর আছে? ইচ্ছে যখন হয়েছে, তবে শোন:—

কলকাতা পর্য্যন্ত আর যাওয়া হলো না। খেয়ালের বশে কাশীতেই নেমে পড়্‌লুম। ভাবলুম—অনেক পাপ করেছি, বাবা বিশ্বনাথের চরণে কিছু ঢেলে দিয়ে হাল্কা হওয়া যাক্। না, পুণ্য কর্‌ব একথা মনেই ওঠে নি, তবে অগিয়ে চলেছি সে কেবল খেয়াল।

উঠ্‌লুম গিয়ে এক বন্ধুর বাড়ী। দেখ্‌লুম—বন্ধু তখনো আমাকে ভুলেনি। খুব আদর যত্ন করলে। দিন দশেক সেখানে ছিলুম, বেশ আনন্দেতেই কেটেছিল।

প্রকাণ্ড বাড়ী; বন্ধু দুখানি ঘর নিয়ে আছেন। আর বাকী ঘরগুলি সব ভাড়া দিয়েছেন।

কয়েকদিন হলো একঘর নূতন ভাড়াটে এসেছে। তারা 'স্বামী-স্ত্রী' বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে; তাদের চাল-চলনে কিন্তু তা মনে হয় না! আশ্চর্য্যই বা কি? কাশীতে এরকম

ব্যাপার নূতন নয়, প্রায়ই ঘটে। কাজেই কেউ বড় একটা গায়ে মাখ্‌লে না।

তাদের ঘরখানি ছিল ঠিক্ আমার ঘরের পাশেই। সেদিন রাত্রে মেয়েটি হঠাৎ করুণ-স্বরে কেঁদে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রহারেরও চটাপট্ শব্দ আস্‌তে লাগ্‌লো। বুকের ভেতরটা আমার কেমন করে উঠ্‌ল। ছুটে বাইরে গিয়ে তাদের দরজায় সজোরে আঘাত কর্‌লুম।

খীলখুলে লোকটা বাইরে এসে চোখ রাঙিয়ে বল্‌লে—কী চান আপনি?

বল্‌লুম—ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত বিয়েতে এসব হচ্ছে কি?

সে চীৎকার করে বল্‌লে—আলবাৎ মারব! আমার ইয়ে.ক আমি মার্‌ব, তুমি বলবার কে হে?

তার মুখের তীব্র গন্ধে সমস্ত স্থানটা ভরে গেছে।

অদূরে সেই তরুণীটি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। হঠাৎ সে ছুটে এসে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বললে—আপনি আমাকে রক্ষে করুণ, ও আমার স্বামী নয়, কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

লোকটা তার চুলের মুঠি ধরে টান্‌তে টান্‌তে তীব্রকণ্ঠে চেঁচাতে লাগল আয় হারামজাদী ঘরে আয়।

আমি আর থাক্‌তে পারলুম না। ছুটে গিয়ে লোকটার টুঁটি টিপে ধরে বললুম—পাজী, শূয়ার। এমন করে একজনের সর্ব্বনাশ করে? এখনই তোমাকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার কর্‌ব।—সঙ্গে সঙ্গে বেদম প্রহার দিলুম।

বন্ধু এসে ছাড়িয়ে দিলে।

ছাড়ান পেয়ে লোকটা সেই যে ছুটে পালাল আর এলো না।

বন্ধু পত্নীর কাছে তরুণী সব কথাই অকপটে খুলে বল্‌লে।

বন্ধুর কাছে শুনলুম—তরুণী বালবিধবা। ঐ রাসকেলটা ছিল তার ছোট ভাইদের গৃহ-শিক্ষক। নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ে কর্‌বে বলে তাকে ঘরের বার করে আনে, তারপর এই কাণ্ড, এখন বিয়ে কর্‌তে চায় না।

পাজী তো পালাল।

তখন কি আর করি? অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সাধ করে পরলুমলো সই এ কলঙ্কের হার।

বলিয়া নিমাইদা হাসিতে লাগিলেন!

রাত হইয়াছিল। আমিও বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

গল্প পাঠ শেষ হইলে দেখিলাম—ঘরের মধ্যে তিনটী প্রাণী—আমি, রমেশদা এবং সভাপতি ব্যতীত আর সকলে কখন চলিয়া গিয়াছে! সভাপতি মহাশয় সম্ভবতঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরে তখনো উঠিতে পারেন নাই। আর রমেশদা নেহাৎ আতিথ্যে বাধে তাই—

গম্ভীর মুখে সভাপতি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—বেশ হয়েছে। রমেশদা' কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলেন না। একটি নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম।

কি বিড়ম্বনা।

—রুদ্ধ-স্রোত—

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

খট্‌···খট্‌···খট্‌···

ক্রমাগত কড়া নাড়িয়া যাই, তবুও সাড়া পাই না। বেশী চেঁচামেচি করিবারও সাহস নাই, কারণ হয় ত এতক্ষণ বাবা অফিস হইতে আসিয়া পড়িয়াছেন—বিলম্ব নিবন্ধন বকুনি খাইতে হইবে। কিন্তু কি করি, কেউ সাড়া দেয় না যে!

হঠাৎ ছাদে আলিসার ফাঁকে একটি হাস্যোজ্জ্বল মুখ উদ্ভাসিত দেখিয়া বলিলাম—"এই শীগ্‌গীর দরজা খোল বলছি, রাধি!"

কিন্তু রাধির দুর্বুদ্ধি; তাই রসিকতার মাত্রা বাড়াইয়া আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়।

সেইখানেই দাঁড়াইয়া আদুরে-সুরে মাথা দোলাইতে দোলাইতে বলে—"খু-ল-ব-না!"

আমার ক্রোধের মাত্রা ধৈর্য্যের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যায়। গলাটা আরও একটু চড়াইয়া বলি—"এখুনি দরজা খোল বলছি পোড়ারমুখী! আবার ইয়ার্কি!"

রাধিকে আর দরজা খুলিতে হইল না। দরজা আপনিই খুলিয়া গেল,—কিন্তু সেই খোলার কর্ত্তাকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া গেলাম। দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বয়ং বাবা।

আমার মুখে আর ভাষা স্ফুরণ হইল না। মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, বাবা বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন—"বলি এত রাত্রে যাওয়া হয়েছিল কোথা? রোজ রোজ ইস্কুল পালিয়ে কোলকাতা গিয়ে বায়স্কোপ দেখা হয়?"

মনে মনে বুঝিতে পারি রাধি সমস্ত ফাঁস করিয়া দিয়াছে। হতচ্ছাড়ির উপর যা' রাগ হয়!

কোন কথা না বলিয়া চোরের মত ঘাড় গুঁজিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়ি।

রাধি আমার বোন নহে। তাকে আত্মীয়া বলা যাইতে পারে হয় ত—

তাহার সহিত আমার আত্মীয়তা সূত্রটা কিরূপভাবে আবদ্ধ ছিল, তাহা সঠিক বলিতে পারিব না। তবুও পরিম্লান, মসিলিপ্ত স্মৃতির পৃষ্ঠা হইতে যত দূর সম্ভব পাঠোদ্ধার করিয়া লিখিলে জিনিষটা দাঁড়ায় কতকটা এইরূপ—

আমার মাসীমার বাটীতে তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাসুরপো ছিলেন। তিনি বিপত্নীক; রাধি তাঁহারই কন্যা। শৈশব হইতেই মাতৃহীনা। কিন্তু বিধাতা বুঝি তাহার উপর বড়ই বিমুখ ছিলেন, তাই ইহার উপরেও যেদিন তাহার পিতাকে পর্য্যন্ত টানিলেন, সেদিন গ্রামস্থ সমস্ত প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাগণ এই অলক্ষণা বালিকাটীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে প্রমাদ গণিলেন। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ভাবে সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, ওই মেয়েটীকে আর এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় রাখা চলিবে না—নতুবা ও সবাইকে একে একে পেটে পুরিবে।

মা সমস্ত শুনিয়া চিঠি লিখিয়া ওকে আমাদের বাড়ীতে আনান।

এখানে আসিয়া ও সহজভাবে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাচিল। এতদিন অনাদর ও লাঞ্ছনার মধ্যে থাকিয়া উহার জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল। তার অন্তর মধ্যে যে ব্যর্থ রাগিনীটী করুণ সুরে বাজিতেছিল, তাহা আজ অকস্মাৎ থামিয়া গেল। মা উহাকে আদর করিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন।

উপরোক্ত ঘটনার পর বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কত পরিবর্ত্তন-ই না ঘটিয়া গেল এই ক'টা দিনের মধ্যে! মাঝে মাঝে ভাবিয়া থৈ পাই না।

বাবাকে হারাইয়াছি সে এক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া। তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া পাঠকের মনে করুণরসের উদ্রেক করিতে চাই না! তবে পড়া ছাড়ি নাই, নেহাৎ যখন পড়িবার সংস্থান ছিল।

সে একদিনের কথা। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল যেন আমার দিগ্বিজয়-যাত্রা!

পরীক্ষা দিলাম এবং পাশও করিলাম। এই-বার, ছেলে পাশ করিলে মাতারা সাধারণতঃ যেরূপ আবদার ধরেন, মাও তাহার পুনরাভিনয় করিলেন—আমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

ইহাতে চক্ষু বিস্ফারিত করিবার মত কিছুই নাই। কারণ, ইহা সনাতন।

কিন্তু সব থেকে বেশী আশ্চর্য্য হইলাম, যখন শুনিলাম আমার বধূ হইবে রাধি-ই!

যাহাকে চিরদিন আপনার বোনের ন্যায় দেখিয়া আসিয়াছি আজ, তাহারই সহিত বিবাহ! ছিঃ! ছিঃ!

মাকে বলিলাম—"ইহা অসম্ভব! ওর সহিত আমার এই সুন্দর সম্বন্ধটাকে এই ভাবে শেষ করিয়া দিতে চাই না। বিয়ের দু'দিন পরে ত সেই হীন স্বার্থ লইয়া কলহ করিতে থাকিব? তাহা হইতে কি বোনের সম্বন্ধটা ভাল নয়?"

মা বলিলেন—"আমি ও সব তত্ত্ব বুঝি না। তোরা আজকালকার ছেলে, ও রকম বলবি তা জানতুম।"

অভিমানে মা আঁচলের খুঁট দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

কি করিব, আমি একান্ত নিরুপায়।

রাধির মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে-ছিলাম। ও আর আমার দিকে ঘেঁসে না। বয়সোচিত একটা সলাজ গাম্ভীর্য্য ওর মধ্যে আসিয়াছে। যেটা আমার নিকট একান্ত অপ্রত্যাশিত। ওর সমক্ষে আজিকারএই সত্যটাই আপনাকে সব থেকে বড় করিয়া উদঘাটন করিয়াছে, যে, তাহার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে এবং আমাকে ঘিরিয়া একদিন উহাকে প্রেমের পুষ্প-দেউল রচনা করিতে হইবে; সুতরাং, আমি যে উহার ভাই এ চিন্তাকে সে আপনার মন হইতে বেমালুম নির্ব্বাসন দিয়াছে।

নিত্য যে দু'টী সেবাপরায়ণ হস্ত অতি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমার পরিচর্য্যা করিয়া যাইতেছে তাহা বুঝি, কিন্তু আমি যে চাহিয়াছিলাম এক চির সৌন্দর্য্যময়ী স্বপ্নবিহারিণীকে, যার প্রতিটী নিঃশ্বাস আমার অন্তর মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে—যার চটুল চরণ-ছন্দ আজও আমার হৃদয় মধ্যে অবিরাম বাজিতেছে—সেই অলকাকে, সেই বিদ্যুৎ-বিভাসিতাকে, সেত অবগুণ্ঠনবতী নিঃশব্দচারিণী রাধি নয়!

রাধির বর মিলিল। ছেলেটী কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতি করে—ভাত কাপড়ের ভাবনা নেই।

দুটো বছর কি কারণে কাটিয়া গিয়াছে। আবার আমার পরীক্ষা। মফঃস্বল কলেজ হইতে কলিকাতায় গিয়া পরীক্ষায় বসিতে হইবে। মেসে

থাকা বড়ই ব্যয়বহুল। কোথায় উঠি ভাবিতেছিলাম।

রাধির চিঠি পাইলাম। সে ডাকিয়াছে, তার বাড়ী হইতে পরীক্ষা দিবার জন্য। মাও সম্মতি দিলেন। সুতরাং একদিন পোঁটলা-পুঁটলী বাঁধিয়া কলিকাতার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

'সতেরোর সি' বাড়ীখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। দ্বারপথেই জামাই আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। উপরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। স্বল্পপরিসর ঘর বটে, তবে পরিপাটি করিয়া গুছান—রাধির হাতে ইহারই মধ্যে সুগৃহিণীর পক্বতা ধরিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

রাধি আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল; বলিল—"আমার খোকাকে দেখেছ দাদা ?"

আমি বলিলাম—"কই না, ওসব কিছু শুনি নি ত ?"

কিছুক্ষণ পরে সে এক ছোট্ট পুঁটলী প্রমানণ মাংসপিণ্ডকে বুকে করিয়া—"খুকু ছোনা কই রে! খুকু ছোনা কই রে!" করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কোলে নেবে না ?"

আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম—।

—"থাক্, ঢের হয়েছে! নিজের ছেলে হ'লে দেখ্‌ব কিন্তু—"বলিয়া ওর বাঁকা চোখে অকারণ একটা টান মারিয়া চলিয়া যায়।

ঘরের মধ্যে একা বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, তাই একখানা খাতা লইয়া অর্থহীনভাবে নাড়াচাড়া করিতেছিলাম। দেখি, মলাটের উপর মেয়েলী হস্তাক্ষরে লেখা—"খেয়াল খাতা—শ্রীরাধারাণী দেবী" ক্ষুদ্রাকারে জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাপূর্ণ ডায়েরী। আর পড়িয়া দেখিলাম না—আপন-মনে পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ একস্থানে কবিতায় খানিকটা লেখা দেখিয়া পড়িতে লাগিলাম—

সেদিন

মনে না কি পড়ে

বৈশাখী ঝড়ে

তখনো হয় নি ছন্দ সারা

এসেছিলে তুমি

বনতল চুমি

মেগে নিতে দু'টী কথা কাব্যগাথা

অর্থহারা—

দেখিলাম কবিতাটীর কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথ হইতে চুরি হইলেও পড়িতে মন্দ লাগে না তবে তার শেষ হয় নাই। হয় ত সেই সময় হঠাৎ ছেলেটী কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, অথবা তরকারি চুঁইয়া যাইবার গন্ধ নাকে আসিয়াছিল, কাজেই আর ছন্দ-সমাপ্তি ঘটিয়া উঠে নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একঘেয়ে সাংসারিক জীবনযাত্রার মধ্যে যে সুরটী গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সে এমনি করিয়াই সাঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

খপ্ করিয়া রাধি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। "ও কি ও সব কি দেখ্‌চ ছাই পাঁশ! কোন্ ঘরে তোমার সংসার পাতবে দেখ্‌বে চল!"

আমি বাছিয়া বাছিয়া নীচের একখানি নির্জ্জন ঘরকে মনোনীত করিলাম। বলিলাম—"একটু অন্ধকার হোক্, এ ধারটা বেশ নিস্তব্ধ, পড়াশুনার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হবে।"

সন্ধ্যাবেলা রাধি কত কথাই বলে। বলে—সহর আর তার ভাল লাগে না—সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়। ছাদে উঠিয়া দিনান্তে একবার আকাশের রূপ দেখিবে, তাহারও যো নাই—উত্যঙ্গ অট্টালিকাগুলোর প্রাচীরে দৃষ্টি প্রতিনিয়তই প্রতিঘাত পায়। অখণ্ড আকাশখানা শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া তারি একখণ্ড তার আঙিনাতে একান্ত অপ্রিয় আত্মীয়ের ন্যায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে—কিন্তু সে আকাশকে আর আকাশ বলা

যায় না, তার মধ্যে আর বিস্কাটের উদারতা নাই, সম্পূর্ণ বর্ণগন্ধহীন, আবিলতাময়।

পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দিনের বেলা পরীক্ষা দিতে যাই, আর রাত্রিযাপন করিয়া পাঠাভ্যাস করি। চারিদিকে স্তূপাকার বই ছড়ান। কত বৎসর পূর্ব্বে হ্যাজ্‌লিট্ একটী গোলাপ দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন, তারই পঞ্চাশ পাতা ফিবিস্তি পড়িতেছিলাম।

হঠাৎ রাধির খোকাটী কাঁদিয়া উঠে। ছেলেটী বড়ই কাঁদুনে। দিন রাতই কাঁদে—তার মা তাকে থামাইতে পারে না।

খোকার বাপ বলে—"আঃ! আর পারি না—নাও না একবার! লজঞ্চুস টুস নেই এক-আধ্‌টা?"

রাধি বলে—"কই আর। সেই কবে এক শিশি এনেছিলে, সে ত অনেকদিন ফুরিয়ে গেছে।"

—"তা' আর ফুরিয়ে যাবে না? ছেলের চেয়ে ছেলের মা'ই টুক্‌টাক্ গালে ফেল্‌তে লাগ্‌লে সে আর কতক্ষণ টি'ক্‌বে?"

কথাটা শুনিয়াই রাধি ঝাঁজাইয়া উঠে—"ওমা! কবে গো!"

যে কোন রকমেই হোক্ প্রমাণ করিয়া দিতে চায় যে, সেই বিচিত্র বস্তুটীর রসাস্বাদন করিতে সে চিরকালই পরাঙ্মুখ। আজ পনের বৎসর বয়সে সন্তানের জননী হইলেও এখনও তার মধ্যে সেই বালিকা মনটী উকি-ঝুঁকি দেয়।

স্বামী বলে—"দিনরাত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে 'হাঁ' করে থাক্‌বে, না ছেলের কান্না থামাবে?"

কথাটার উত্তরে সে কি বলে তাহা ভাল করিয়া শুনা যায় না। কিন্তু ইহা আমার মর্ম্মবিদ্ধ করে। আজ এই শ্রাবণের নবঘন রাত্রিতে সমস্ত সৃষ্টি যে এক অনাগত নবীনের প্রসব বেদনায় থম্-থম্ করিতেছে, তাহার প্রাণ-স্পন্দন কি সে শুনিবে না? সত্যই ইহা চরম অবিচার।

সেদিনকার রাত্রের ব্যাপারটা ওই পর্য্যন্তই।

.. আমার পরীক্ষা শেষ হইয়া যায়। আবার দেশে ফিরিয়া যাই। যাবার সময় রাধি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে—"মাসীমাকে না হয় এখানে এনে রাখ না। কেউ নেই সমস্ত দিন কথা বলতে পারি না!"

আমি বলিলাম—"দূর! তা'কি হয়, দেশের বাড়ীঘর ফেলে—"

দীর্ঘ পনেরটী বৎসর পরে। দূরের পথ হাতছানি দিয়া ঘর হইতে বাহিরে টানে। সম্মুখে ধূ ধূ করিতেছে দিগন্তশয়ান মরুপ্রান্তর, মাথার উপর স্বচ্ছ আকাশের চাঁদোয়া। আকাশের দিকে মুখ করিয়া একটী তারার সহিত কথোপকথন করিতেছি। উহাকে আমার চিরন্তন প্রিয়া বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। মনে মনে তাহার একটী নামকরণ করিয়াছি। নিত্য সন্ধ্যায় আমি সেই নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকি, সে আকাশের একটী কোণ হইতে ঝিক্‌মিক্ করিয়া আমাকে প্রত্যুত্তর দেয়! তারপর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আমাদের অখণ্ড প্রেমালাপ চলে। উহার উদয় আর অস্তের একটা বিশিষ্ট সময় আছে, যে সময়টুকুর জন্য সে একান্ত আমারই—তারপর তাকে বিস্মৃত হই। তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আমাদের সম্বন্ধকে বিষাক্ত করি না। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সুদূর অনন্ত ব্যবধান, তাহা আমাদের প্রেমকে শিথিল করিয়া দেয় না—আরও গভীর করিয়া তোলে।

'সতেরোর-সি'কে আবার খুঁজিয়া বাহির করি। দেখি তার আর পূর্ব্ব শ্রী নাই—দেয়ালের আবরু খসিয়া গিয়া নগ্ন অস্থিগুলা দাঁত বাহির

করিয়া রহিয়াছে। একটী ছেলেকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলি—"তোমার মা'কে গিয়ে বল, মামাবাবু এসেছেন।" কি ভাগ্য ছেলেটা গিয়া বলে।

রাধি আসে। বলে—"এই যে, এতদিন কোথায় ছিলে?"

উত্তরে কি বলিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই। সে কিছুক্ষণমাত্র আমার সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিল, কিন্তু তাহারই মধ্যে কতবার উঠিয়া গিয়া ছেলেটাকে দুটো থাপ্পড় দিয়া আসিল, রাঁধুনির সহিত তেলচুরি লইয়া একপ্রস্থ ঝগড়া করিল, ঝিয়ের বাসন মাজার মধ্যে শক্‌ড়ি লাগিয়াছিল বলিয়া 'চোক্‌থাকি' বলিল।

আহার সমাপ্ত করিয়া উহাদের বৈঠকখানা ঘরের এক কোণে পড়িয়া দিবানিদ্রা দিতেছিলাম। হঠাৎ 'ছ্যাং' করিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। কণ্ঠটা শুকাইয়া উঠিয়াছিল। তৃষ্ণায় উপরে রাধির নিকট একগ্লাস জল চাহিতে গিয়া শুনি, সে কাহাকে বলিতেছে। "মা গো মা, আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না! কে আমার সাতপুরুষের সল্‌তে গো, ভালবাসা জানিয়ে খবর নিতে এসেচেন—এখন একমাস ধ'রে রোজ রোজ কাঁড়ি জোগাও আর কি! কই আসবার সময় ছেলেদের জন্যে আধপয়সার মিষ্টি হাতে ক'রে আন্‌তে পেরেছিলেন? আমার বাড়ীটা যেন সব হোটেলখানা পেয়েছে—"

কথাটা যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা, তাহা বুঝিতে পারি। বুঝিলাম, জীবনের হিসাব নিকাশ খতাইয়া দেখিবার দিন তাহার আসিয়াছে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়ি। যাইবার সময় রাধি একবার বলে—"আর দুটো দিন থেকে গেলে হ'ত না দাদা! কিছু যত্ন-আত্তি কর্‌তে পার্‌লুম না—আমার যেমন পোড়া কপাল।"

ওদের গলির মোড়ের আমগাছটীতে এবার আর বোল ধরে নাই। লোকে তাকে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়াছে। কে আবার তার একটা ডালই কাটিয়া লইয়া গিয়াছে—দরকার পড়িয়াছিল হয় ত।

—টিউবওয়েল—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

তিন

রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা তার কথাই আলোচনা করছিলাম।

আমার বড় ছেলে নরেশ বল্‌ল, দেখলে মা, কি ছেলে! কেমন আত্মসম্মান-জ্ঞান! এমন খুব শিক্ষিত ছেলের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় না।

গৃহিণী বল্‌লেন, ও শিক্ষা তোমাদের স্কুল-কলেজে পাওয়া যায় না নরেশ; ও শিক্ষা বাপ মা ভাই বোন্‌দের কাছ থেকে হয়, বই পড়ে হয় না।"

নরেশ বল্‌ল, তুমি অতি সত্যি কথা বলেছ মা। এই ভাব না, আমাদের কথা। তোমার মত মা আর ওঁর মত বাবা যদি আমরা না পেতাম, তা' হ'লে হাজার লেখাপড়া শিখে, দশটা পাশ করেও আমরা কি তোমাদের ছেলে ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্য হ'তে পার্‌তাম।

আমি বল্‌লাম, বাপ-মায়ের কাছে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাতে যে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন হয়, এ কথা আমি অস্বীকার করছি নে। কিন্তু কি জান নরেশ, এ সব বিষয়ে আমি একটু অদৃষ্টবাদী, অথবা সোজা কথাতেই বলি, আমি একটু সেকেলে ধরণের মানুষ; আমার শিক্ষা দীক্ষাও সেকেলে। কাজেই আমার মনে হয়, শুধু মনে হয় কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের প্রাক্তন সংস্কার এতে কাজ করে। তোমরা হয় ত কথাটা মান্‌তে চাইবে না, তোমাদের বিজ্ঞান এ কথায় সায় দেবে না; কিন্তু আমি এ ছাড়া অন্য কোন কারণ ত দেখতে পাই নে। এমনও দেখেছি, অতি সাধু-সচ্চরিত্র পিতা মাতার ছেলেও ওই এক রকম হয়ে যায়। মা-বাপ কি তাদের উপদেশ দিতে ত্রুটী করেন, বা তাদের সম্মুখে বাপ-মায়ের সদাচরণ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, মহানুভবতার আদর্শ কি সে সব ছেলেদের সম্মুখে থাকে না? তবুও সে সব ছেলে বিগড়ে যায় কেন? আমি এ কথার একই উত্তর দেব—প্রাক্তন-সংস্কার। এই ধর না, রমেশেরই কথা। তার বাপ মা নিশ্চয়ই উচ্চ শিক্ষিত নয়, তাঁদের আদর্শও যে উন্নত ছিল, তাও বোধ হয় না। তাঁদের ঔরসে এমন কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ ছেলে জন্মগ্রহণ কর্‌ল কেন?

আমার মেজ ছেলে পরেশ বল্‌ল, বাবা, এর কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। একে আমি pure accident বলি।

গৃহিণী বল্‌লেন, এইবার তোমাদের তর্ক আরম্ভ হোলো। এর পর যে সব কথা হবে, আমি তার মধ্যে প্রবেশলাভও কর্‌তে পারব না; সুতরাং, আমি এখন যাই, রমেশের জলখাবার নিয়ে আসি। তোমাদেরও তর্ক কর্‌তে কর্‌তে গলা শুকিয়ে যাবে, তোমাদের জন্যও চা ঠিক কর্‌তে বলে আসি। এই ব'লে গৃহিণী উঠে দাঁড়ালেন।

পরেশ বল্‌ল, মা, তুমি মনে কর, আমি ভারী তার্কিক। আসলে কিন্তু তা' নয়। অমনি ক'রে একটা একটা কূট না চালালে বাবার কাছ থেকে কি কিছু আদায় করা যায়; উনি কি সহজে কিছু বলেন। আমি তর্ক আরম্ভ করি, যা' তা' বলি, আর বাবা তখন তাঁর অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেন।

গৃহিণী বল্লেন, বেশ, তোমরা ওঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন কর, আমি আস্ছি। দেখো, ভাণ্ডার শূন্য করে ফেলো না।

নরেশ বল্ল, সে ভয় নেই মা!

গৃহিণী চ'লে গেলেন; এদিকে আমরা জন্মান্তরবাদ নিয়ে ঘোর আলোচনা আরম্ভ কর্‌লাম।

আমরা আলোচনায় এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, রমেশ কখন এসে একপাশে বসেছে, তা' আমরা জান্তেও পারি নি।

একটু পরে গৃহিণী খাবারের রেকাব ও জল নিয়ে যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখি, রমেশ চুপ ক'রে ব'সে আছে।

গৃহিণী বল্লেন, তোমাদের তর্ক চলুক; আমি ততক্ষণ রমেশের ক্ষুধা নিবৃত্তি করাই।

রমেশ বল্ল, মা, এখন খাবার থাক্, আগে ওঁদের তর্ক শেষ হোক।

গৃহিনী হেসে বল্লেন, তর্কের কি ওঁদের শেষ আছে। তর্ক যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন ওঁদের ঐ জন্মান্তরবাদ জন্মান্তর পর্য্যন্ত চল্‌বে। ওর জন্য ব্যস্ত হোয়ো না।

সুতরাং আমাদের তর্ক মাঝপথেই থেমে গেল। পরেশ বল্ল, বাবা, কাল লাইব্রেরী থেকে খানকয়েক বই না আন্‌লে আপনার কথার জবাব দিতে পারছি নে।

নরেশ বল্ল, বইগুলোর নাম বল্ না পরেশ। তুই হয় ত মনে করেছিস্ বাবা হয় ত সে সব বই দেখেন নি। ও কথাও ভাবিস্ নে। বাবার কাছে কোন বইয়ের নাম করলে উনি অমনি বলে বসেন, ও, সেই বইখানি আমি দেখেছি। উনি যে একখানি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, তা' বুঝি তুই এখনও জান্তে পারিস্ নি

আমি হেসে বল্লাম, পিতৃভক্তিরও একটা সীমা আছে নরেশচন্দ্র! কি বল হে রমেশ?

রমেশ বল্ল, কি জানি, অত কথা বুঝি নে। তবে, বল্‌তে পারি, পিতৃভক্তির সীমা থাকতে পারে, কিন্তু মাতৃভক্তির সীমা নেই, শেষ নেই। কেমন মা, আপনি এ কথা স্বীকার করেন কি না?

গৃহিনী বল্লেন, মাতৃভক্তি নয় রমেশ, মাতৃ-স্নেহ—তার কোন সীমা নেই। অতএব, মাতৃ-স্নেহের প্রমাণস্বরূপ আমি যে তোমার জন্য খাবার এনেছি, লক্ষীছেলের মত তার সদ্ব্যবহার কর। ওঁদের তর্ক আজ আর হবে না, পরেশ নজীর না এনে ছাড়বে না।

রমেশ বল্ল, আচ্ছা বড়দা' আপনাকেই মধ্যস্থ মান্‌ছি, মা যে আমার জন্য এই খাবার নিয়ে এসেছেন, এটা কি তাঁর স্নেহের বাড়াবাড়ি নয়। আপনিই এর বিচার করুন।

নরেশ বল্ল, বাড়াবাড়িটা কি দেখ্‌লে তুমি। বিকেলে কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ী এলে সকলেরই খিদে পায় এবং তখন জলযোগ করতে হয়। এর মধ্যে স্নেহের আধিক্য কি দেখলে তুমি?

রমেশ বল্ল, বড়দা' মা স্নেহে অন্ধ হয়ে ভুলে গিয়েছেন যে, আমি অতি গরীব চাষার ছেলে। আমরা এ সব খাবারের মুখও কখন দেখতে পাই নে, খাওয়া ত দূরের কথা। আমাদের খিদে লাগলে আমরা মুড়িগুড় খাই, তাও যদি ঘরে থাকে; নইলে না খেয়েই থাকি। মা সে কথা ভুলে গিয়েছেন। তিনি ঠিক ভেবেছেন, আমি হাইকোর্টের বড় উকিল শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ছেলে। কেমন মা, ঠিক কথা বলি নি।

গৃহিণী বললেন, অতি ঠিক কথা বলেছ, আমি তাই মনে করি। তোমাকে আমি ত কতদিন বলেছি, আমার নরেশ, পরেশ, দীনেশ, আর রমেশ — আমার এই চার ছেলে।

রমেশ বল্ল, মা, এ ভুল যে ভাঙ্গতে হবে। আমাকে বাবু ক'রে তুলবেন না। আমার মনে

পড়ে, বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন একদিন আমি তাঁর কাছে একটা ছাতা চেয়েছিলাম। বাবা তাতে বলেছিলেন, যাকে দু'দিন পরে দুপুর রৌদ্রে মাঠে গিয়ে চাষ করতে হবে, তার ছাতা মাথায় দেবার বদ্‌অভ্যাস করতে নেই। বাবা আরও বলেছিলেন, রমেশ, একটা কথা মনে রেখো, কখনও দরকার বাড়িয়ো না। চাষার ছেলে, চাষার মতই থেকো, কোনদিন কোন কষ্ট হবে না। মা, আমি বাবার সে কথা ভুলি নি, কোনদিন ভুলব না।

আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। এমন সুন্দর কথা একটী নবীন যুবকের মুখে আমি কমই শুনেছি। আমি নরেশকে বল্‌লাম, নরেশ, আমি একটু আগেই তোমাকে যে বলেছিলাম, রমেশের বাপ-মা নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিত নয়, তাদের আদর্শও উন্নত ছিল না, আমি আমার সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি রমেশের পরলোকগত পিতার উপর অবিচার করেছিলাম, সেজন্য অপরাধ স্বীকার করছি। শুন্‌লে ত, রমেশের পিতা রমেশকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন, আর রমেশ সে পিতৃবাক্য ভোলে নাই, জীবনে ভুলবে না। তোমাদের উচ্চশিক্ষিত বাবার চাইতে রমেশের এই অশিক্ষিত বাবা যে কত উন্নত, তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। এমন উন্নতমনা বাপের ঔরসে এমন ছেলেই জন্মগ্রহণ করে। তাঁর আদর্শের কাছে আমাদের আদর্শ কি ক্ষুদ্র, কি সঙ্কীর্ণ!

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার পায়ের ধূলা নিয়ে বল্‌লে, অমন কথাও বল্‌বেন না। ওতে অপরাধ হয়। আপনার সঙ্গে আমার বাবার তুলনা! আপনি যে হিমালয় পর্ব্বত!

আমি তখন রমেশকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্‌লাম, তোমার মত পুত্রলাভ বহু সাধনার ফল বাবা!

ক্রমশঃ

—পরাগ—

শ্রীগিরিজাকুমার বসু
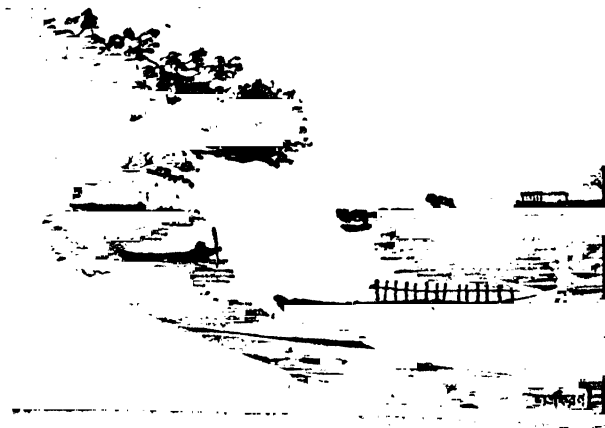
সেবার অসুস্থ হ'য়ে পাবনায় গেছলুম একজন আত্মীয়ের আহ্বানে। পাবনার হাওয়া নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে চমৎকার।

আত্মীয়ের বাড়ীটি ছিল পাবনার একটি প্রধান বড়ো রাস্তার উপর—সে রাস্তা সোজা চলে গেছে পদ্মার তীর পর্য্যন্ত। রাস্তার বাঁদিকে বাজার, খানিক এগিয়ে ডাকঘর ও ডানদিকে জেলখানা। প্রথম দিনকতক আমি বাড়ী থেকে বেরোই নি। শরীরটা সবল ছিল না ব'লে এবং কারুর সঙ্গে পরিচয় হয় নি বলে।

একদিন সাহস ক'রে একাই বেরিয়ে পড়লাম —পা চালিয়ে দিলুম নদীর দিকে। ডাকঘরের সামনে দুটি কিশোরীকে নিয়ে একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের একজন গৌরী আর একজন কৃষ্ণা। যেটি কৃষ্ণা তার সুষমাতন্বলতা, অপূর্ব্ব শ্রী, ডাগর চোখ দু'টি। ভারি ভালো লাগ্‌লো তাকে।

ভদ্রলোকটি আমার কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, আপনি না আনন্দবাবুর বাড়ীতে থাকেন? কতদিন হোলো এসেছেন? আমি সসম্ভ্রমে জবাব দিলুম—'হ্যাঁ, সে প্রায় এক সপ্তাহ।' বাবুটি বল্‌লেন, আপনার নামটি জান্‌তে পারি কি? আমি বল্‌লুম—'প্রসূনকুমার!' আপনার? 'ইন্দ্র'। পদ্মার ধারে যাচ্ছেন নাকি? চলুন, আমরাও যাবো।' মেয়ে দু'টির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি জান্‌তে চাইলে, বাবুটি বল্‌লেন—একটি তাঁর, আর একটি তাঁর শালীর মেয়ে।

পদ্মার পাড়ে ব'সে আমরা নানা গল্প করতে লাগ্‌লুম। আলাপ-পরিচয়ের মাঝে ইন্দ্রবাবু বল্‌লেন,—'আপনি মেয়েদের সঙ্গে ততক্ষণ একটু গল্প করুন। আমি শ্যামবাবুর বাড়ী থেকে আসি।'

তিনি চলে যেতে তাঁর মেয়েকে প্রশ্ন কর্‌লুম—'তোমার নাম কি?' সে বল্‌লে—'তুষারকণা। আপনাকে কি বলে ডাকি বলুন ত, বড় মুস্কিল হ'ল দেখ্‌ছি।' আমি বল্‌লুম—'কেন দাদা বল্‌তে পার্‌বে না? সে বল্‌লে—'নিশ্চয়?'

তারপর তুষারের কাছ থেকে তাদের বাড়ীর অনেক খবর জান্‌লুম। তারা থাকে আমার আত্মীয়টির পাশের বাড়ীতে। বাড়ীর মালিক কালিবাবু এদের মামা, জমিদার লোক। তার বয়েস চোদ্দ বছর, তার মাসতুত বোন্‌টির নাম পরাগ, তার চেয়ে ছ' মাসের বড়। তুষারের খেয়াল ছিল যে পরাগের সঙ্গে কোনো কথা কই নি, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। বল্‌লে,—দিদিকে আপনি কোনো প্রশ্ন কর্‌লেন না তো?' আমি বল্‌লুম,—'তোমার কাছ থেকে সব খবরই তো পেলুম, "ওকে আবার বিরক্ত করি কেন?' এমন সময় তামাক-তুষ্ট ইন্দ্রবাবু এসে পৌঁছলেন। তুষার তার বাবাকে বল্‌লে,—'এঁর সঙ্গে আমাদের 'দাদা' সম্পর্ক হ'য়েছে। সে সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হোয়েছিল, তুষার তাও তার বাবাকে জানালে। তিনি বল্‌লেন,—'বেশ।'

পদ্মার ধারে উপরি উপরি ক'দিন আমরা এক সঙ্গেই বেড়াতে গেলুম—ওঁদের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেল। বেশী কথা আমার হোতো তুষারেরই সঙ্গে। পরাগ আমার সঙ্গে দু'-চরটে কথা ব'ল্‌তো, আমিও তার সঙ্গে কথা কইতুম খুব কম। কিন্তু আমার অন্তর কথা কইতে চাইতো পরাগের সঙ্গেই বেশী। কেন জানি না, আমরা দু'জনে সামনা-সামনি হ'লেই ভাষা হারিয়ে ফেলতুম।

ইন্দ্রবাবু ও কালিবাবুর সঙ্গেও আমার বেশ

আলাপ হ'য়ে গেল। আমাদের বাড়ীতে ওঁদের এবং ওঁদের বাড়ীতে আমার আনাগোনাও সুরু হ'য়ে গেল। অমি যেতুম কম, ওঁরা আসতেন বেশী। আমার আত্মীয়ের স্ত্রী বলতেন—'ওঁরা তোমার খুব প্রশংসা করে।' আমি বললুম—আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন। আমার আত্মীয়ের খুব বড় দোতলা বাড়ী, তার উপরতলার সমস্তটা একা আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল।

সকালে কালিবাবুদের বাড়ীতে গেলে দেখতুম পরাগ আর তুষার বাইরের বৈঠকখানা ঘরের পাশে একটি ছোটো কুঠ্‌রিতে বসে লেখাপড়া কর্‌ছে। আমি একদিন ইন্দ্রবাবুকে বললুম—'ওদের কি মাষ্টার আছে, না আপনারা নিজেরাই পড়ান?' তুষার তাড়াতাড়ি এসে বললে—মাষ্টারও নেই, ওঁরাও পড়ান না—আমরা নিজেরাই পড়ি, কালেভদ্রে ওঁরা আমাদের নিয়ে বসেন।' ইন্দ্রবাবু বললেন—'সময় পাই না—কালীরও সময় কম। আপনি যে ক'দিন আছেন, ওরা কেমন পড়া-শোনা করে পরীক্ষা ক'রে একটু দেখুন না।'

আমি বললুম—'আমি সামান্য কিছু জানি—ওদের পরীক্ষা করা তো দূরের কথা, পড়ানোর ক্ষমতাও আমার নেই।' তুষার বললে—'আপনি তা' হোলে নিজে আগে পড়ানোর পরীক্ষাটা দিন, দাদামণি। কাল সকালে পরীক্ষার দিন ধার্য্য রইল।' আমি ঘাড় নেড়ে বললুম—'তথাস্তু। কিন্তু দাদামণি হলুম কবে থেকে?' সে বললে—দিদি আপনাকে দাদামণি বলে ডাকতে হুকুম করেছে। বলেছে—দাদা শুধু মিষ্টি শোনায় না। বড় নেড়া নেড়া মনে হয়।'

তার পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলেও যখন চোখ বুজিয়ে বিছানায় প'ড়ে আছি, এপাশ-ওপাশ কর্‌ছি, তখন বাড়ীর গৃহিনী আমার আত্মীয়াটি এসে বললেন—'ওঠ, চা জলখাবার এনেছি।' আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই একবার ভোজ্যগুলির দিকে চেয়ে বললুম—'ক'রেছেন কি? সকালে কখনো এত খাওয়া যায়? আর দেখে মনে হোচ্ছে, এসব বাড়ীরই তৈরি, এত তৈরি কর্‌লেন কখন এর মধ্যে? তিনি বললেন—'বাড়ীর তৈরি সত্যি, কিন্তু একটা জিনিসও এ বাড়ীর তৈরী নয়। ও বাড়ী থেকে তোমার একজন এই সব এনেছে, দরজার পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে, লজ্জায় ঘরে ঢুকছে না।' আমি বললুম—'তুষারের আবার এত লজ্জা হোলো কেন হঠাৎ?' আত্মীয়াটি জানালেন—খাদ্যবাহিকা তুষার নয় পরাগ।

আমি বিদ্যুৎবেগে বিছানার উপর উঠে বসে বললুম—'পরাগ, তুমি।' পরাগ ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। আমার আত্মীয়াটি ভাঁড়ার বের ক'রে দেবার জন্যে বেরিয়ে গেলেন।

পরাগকে জিজ্ঞেস কর্‌লুম সে আমায় কোন কিছু ব'লে ডাকে না কেন? যদি আমার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ পাতাবার অমত তার থাকে তো সে আমাকে শুধু 'প্রসূনবাবু' ব'লেই ডাকে না কেন? বললুম—পরাগ আমি না হয় তোমার 'দাদামণি' হবার যোগ্য নই, আমার নামটাও কি এত খারাপ যে তুমি তা' উচ্চারণ ক'র্‌তে চাও না?' তারপর ব'ললুম—'আজ তোমাদের আমি পড়াতে যাবো কথা ছিল। কিন্তু আমার, এমন কি আমার নামটার প্রতি যখন তোমার এত ঘৃণা, তখন সে কথা আর রাখা চলল না। পরাগ মুখ নীচু কোরে রইলো, আমার কথার কোনো জবাব দিলে না। আমি তার মুখটি তুলে ধ'র্‌তেই দেখলুম, পরাগের চোখ জলে ভরা। আমি ব'ললুম—'পরাগ, তুমি কাঁদ্‌ছ? কেন, তোমাকে এই ঘরে আনিয়ে আমার কাছে বসিয়েছি ব'লে? আচ্ছা, তুমি যাও পরাগ—আমাকে তোমার খাওয়াতে হ'বে না।' পরাগ আরও বেশী কাঁদতে লাগলো, আমি ভারি বিব্রত হ'য়ে প'ড়লুম। আমি বললুম—'লক্ষ্মীটি পরাগ, বলো না কেন কাঁদছো?' পরাগ অস্ফুকুণ্ঠিত স্বরে

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লে—'আমি বুঝি আপনার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে চাই না? আমি বুঝি আপ্‌নার নাম উচ্চারণ ক'র্‌তে চাই না? আমি বুঝি আপ্‌নার কাছে আস্‌তে চাই না? আমায় একটুও ভালোবাস্‌লে এসব কথা কখনো ব'ল্‌তেন না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও আপনাকে 'প্রসূনবাবু' বা দাদামণি বল্‌তে পারি নি। আমার মন বারবার আমায় যেন জানিয়ে দিলে যে, আপ্‌নার নাম আমার করা উচিত নয়। বাড়ীতে আমায় সকলে ঠাট্টা করে, বলে তোর নাকি প্রসূনবাবু বর, যে, তুই তার নাম করিস নে? তুষার বলে—'দিদি, তোমার প্রসূন বাবু কে হন? আমি তাকে রঙ্গ ক'রে বলি—স্বামী—তোর হিংসে হ'চ্ছে নাকি? সকলের তামাসা সত্ত্বেও আমি আপনাকে দাদামণি ব'লে বা আপনার নাম ধ'রে ডাক্‌তে পারি নি—পার্‌বো না।

পরাগের মনে যে এমন ভাবে স্থান পেয়েছিলুম, তা বুঝ্‌তে পারি নি। জেনে খুসী হ'লুম্ খুব—আমার মনেও যে তার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছ্‌লো। আঁচলে চোখ মুছে পরাগ বল্‌লে—'চলুন, আমাদের পড়াতে যাবেন।' আমি বল্লুম—'চলো—কিন্তু যাবার আগে দু'টি কথার জবাব তোমায় দিতে হবে। তোমকে আমি একটুও ভালোবাসি না ব'লেছ। তোমার কি সত্যি এই বিশ্বাস? তুষারের প্রশ্নের উত্তরে তুমি ব'লেছ আমি তোমার স্বামী, আর জানিয়েছ যে, সে কথা তুমি ব'লেছিলে রঙ্গ ক'রে। ঠিক্ বলতো শুধু পরিহাসছলেই তা' ব'লেছো কি না?'

পরাগ এ কথায় কোন উত্তর না দিয়ে 'যাও, তুমি বড় ই'য়ে—' বলে ছুটে পালিয়ে গেল। পরাগের পরশ পাওয়া খাবারগুলো নিয়ে আমি নাড়াচাড়া কর্‌তে লাগ্‌লুম।

পরাগদের আমি পড়াতে লাগ্‌লুম! কি ক'রে জানি না আমাদের বর ক'নে সম্বন্ধটা সাব্যস্ত হ'য়ে গেল। কালিবাবু বল্‌লেন—'তোমাকে বাবাজী বল্‌ব।' ইন্দুবাবু বল্‌লেন—'মাসশ্বশুর হিসেবে আমি অকাম্য নই। পরাগের মা তো জামাই বল্‌লেনই উপরন্তু 'P' লেখা একটি হীরের আংটিও আমায় আশীর্ব্বাদ স্বরূপ দিয়ে ফেল্‌লেন।

এই সব সুখের দিনও কিন্তু শীগ্‌গির আয়ুহীন হোলো—বিশেষ দরকারে আমায় ক'ল্‌কাতায় ফিরে আস্‌তে হয়েছিল। আমার আসার আগের দিন সন্ধ্যায় পদ্মা সাম্‌নে রেখে পরাগ ব'ল্‌লে,—'আর কাউকে বিয়ে ক'র্‌ব না শপথ কর্‌লুম।' আমিও জানালুম—তুমি যদি আমার ঘরে না আসো তো সে ঘর চিরদিন লক্ষ্মীছাড়াই থাক্‌বে।'

এক বছরের পরের ঘটনা। পরাগের বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র পেলুম। ভাব্‌লুম, বাঙ্‌লার মেয়ের শপথের এই দাম। কিন্তু দোষই বা কি তোদের? তাদের ভালোবাসাও যে তাদের গুরুজনের শাসনাধীন—বিদ্রোহী হবার মতো ভর্‌সাও তাদের নেই। বিয়েতে গেলুম না, তবে তার মার দেওয়া সেই আংটিটি তাকেই উপহার পাঠিয়ে দিলুম।

আরো ছ' মাস পরে। বিছানায় ব'সে, একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ছিলুম—রবিবারের দুপুর বেলা। হঠাৎ পরাগ এসে হাজির হোলো,তার দিকে একবার চেয়েই সব বুঝ্‌তে পার্‌লুম। মুখে ব'ল্‌লুম—পরাগ কি মনে ক'রে? ব'সো। পরাগ গম্ভীরভাবে ধীর কণ্ঠে ব'ল্‌লে, আমার সীঁথির দিকে চেয়ে দেখুন—আমি জানাতে এসেছি যে, বিধাতা আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

আমি বল্‌লুম 'তা' তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি।'—পরাগ বল্‌লে 'শুধু এইমাত্রই কি আপনার জবাব'? আমি তার হাত ধ'রে ব'ল্‌লুম—'না পরাগ, আরো আছে।—আমার গৃহলক্ষ্মীর আসন আজো শূন্য!'

কিন্তু আর ভাষা বার হ'ল না।

—স্বামী-দেবতা—

কুমারী উষারাণী দত্ত

এক

নামটি তার হাসিরাশি; সে হাসির রাশি, আনন্দের ফোয়ারা, করুণার প্রতিমূর্ত্তি।

রূপ তার কবিকল্পিত উর্ব্বশীর মত, আর গুণও তার অপরিমেয়।

মা-বাপের একমাত্র কন্যা, প্রাণের পুতলী, নয়নের ধ্রুবতারা।

হাসির পিতা ভোলানাথবাবুর ধন-সম্পত্তি খুবই কম, কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা ছিল অগাধ, অসীম। আর এ ধনের একমাত্র অধিকারিণী হাসিই।

পিতা-মাতার অসীম স্নেহের মধ্য দিয়া তাহার বাল্য কাটিল, কৈশোর কাটিল, সে যৌবনের প্রারম্ভে আসিল।

গরীব হইলে কি হয়, ভোলানাথবাবু হাসিকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা দিতে কসুর করেন নাই, লেখাপড়ায়, গান-বাজনা, হইতে রান্নাবান্নায় হাসি ছোটখাট একটি ওস্তাদ হইয়া উঠিল। লোকে বলিত সাধারণ ঘরে এমন মেয়ে দেখা যায় না, এ রাজারাজড়ার ঘরে শোভা পায়।

ভোলানাথবাবুও বলিতেন—"হ্যাঁ, হাসি আমার রাজরাণী হবে, দেখ্‌বে সবাই।"

দুই

চিরদিন সমান যায় না।

যৌবনের প্রারম্ভে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবার হাসিকে বধূ হইতে হইবে। হাসির মা সেদিন পাড়ার পাঁচজনের নিকট হইতে খুব একচোট বকুনি খাইয়া আসিলেন—"ওমা, মেয়ে যে ধাড়ী হ'ল, বিয়ে দেবে কবে গো, পুষে রাখবে না কি!"

বাড়ী আসিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন—"শুন্‌ছো?"

ভোলানাথবাবু তখন হাসির এস্রাজের তার বাঁধিতেছিলেন, বলিলেন—"কি?"

"হাসিকে ত আর রাখা যায় না।"

সে কি. তুমি বল্‌ছো কি, হাসিকে রাখা যায় না মানে?"

"না, তোমার মত লোক ত দেখি নি, বাপু, রাখা যায় না মানে, আর আইবুড়ো রাখা যায় না, এবার তার বিয়ে দিতে হবে।"

"বিয়ে, তা' বিয়ে কেন?"

"ও মা, কি গো তুমি, বিয়ে না দিলে মেয়ের মনে কি সুখ-শান্তি আসে! এখন যে ওদের স্বামীর ঘরই কর্‌তে হবে।"

ভোলানাথবাবু একটু ব্যথা-জড়িতকণ্ঠে বলিলেন—"কেন, আমি ভালবাসি, তুমি ভালবাস, তা'তে ও সুখী থাক্‌বে না?"

"না গো না, চিরকাল মা-বাপের স্নেহে মেয়ে ছেলে কখন সুখী থাক্‌তে পারে না।"

"বিয়ে হ'লে হাসি আরও খুসী হবে, আরও হাসবে, না?"

"তা' ত হবেই।"

"তবে বিয়ের চেষ্টা দেখি?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু বিয়ে হ'লে ত হাসি চলে যাবে, আমার আনন্দের ফোয়ারা, হাসির ঢেউ সব যে নিবে যাবে! কা'কে নিয়ে থাক্‌বো?" ভোলানাথ বাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

হাসির মাতার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, বলিলেন—

"তা' বলে ত সন্তানের সুখের চেয়ে আমাদের সুখ বড় নয়।"

সত্যই ত হাসি খুসী হইবে, সুখী হইবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দ পিতা-মাতার কি হইতে পারে? সন্তানের ভাবী সুখের আশায় পিতা-মাতার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

তিন

হাসির বিবাহের ঠিক হইল। বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় ভোলানাথবাবু পাত্র স্থির করিলেন। ধনীর দুলাল, সুদর্শন, বলিষ্ঠ দেহ। পাত্রটি ভোলানাথবাবুর চক্ষে ভালই লাগিল।

পাত্রের পিতা না কি বড়ই দয়ালু, আর হাসিকে দেখিয়া পছন্দ হইয়াছে, তাই অতি অল্প পণেই রাজি। কিন্তু সেই অল্প পণটা এতই অল্প যে, তাহা জোগাড় করিতে ভোলানাথবাবুকে স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার, গ্রাসাচ্ছাদনের জমিটুকু ও বাসস্থান বাড়ীখানি বিক্রয় করিতে হইল। তা' হোক্, না হয় তাহারা একবেলা খাইয়া গাছতলায় থাকিবেন, তাঁহাদের প্রাণের হাসি ত সুখী হইবে।

বিবাহ হইয়া গেল। হাসির পার্শ্বে নধরকান্তি ললিত আসিয়া দাঁড়াইল।

হাসির পিতা-মাতা নয়ন ভরিয়া দেখিলেন; ভাবিলেন, না, সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তাঁহারাই জিতিয়াছেন। কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হাসিলেন।

বিদায়ের সময় আসিল। ভোলানাথবাবু হাসির মুখখানি দু'হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া অশ্রু-পূর্ণ স্নেহ-গদগদ-কণ্ঠে বলিলেন—"হাসি, মা আমার, তোর হাসি মুখ দেখ্‌ব ব'লে সর্ব্বস্বান্ত, পথের ভিখারী হয়েও আমি সুখী—এই মুখে যেন আরও হাসি দেখতে পাই!"

"বাবা, আমার বাবা!"

হাসি ভোলানাথবাবুর গলা জড়াইয়া ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল।

চার

এ কি হইল, পিতার আদরের, মাতার অঞ্চলের নিধি হাসি শ্বশুরবাড়ীর হইল অবহেলা লাঞ্ছনার পাত্রী।

হাসির রূপ-গুণ সব ডুবিয়া গেল,—তাহার পিতার দারিদ্র্যের অতল তলে। হাসি এবাড়ী পা দিয়াই শুনিল, শাশুড়ী ননদের মধুর বচন—"কি হাড়হাবাতে ঘরের মেয়ে গো তুমি! এই অল্প টাকায় এতবড় ধাড়ীমেয়েকে মিন্‌সে কি ব'লে ঘাড়ে চাপালে।

হাসির বধূজীবনে প্রথম পাথেয় লাভ!

আর হাসির স্বামী, জীবনের সহচর, হিন্দু নারীর ইষ্টদেবতা,তাহার নিকট হইতে হাসি কি পাইল? ফুলশয্যার রাত্রে যখন সে বসিয়াছিল তাহার হৃদয়ভরা প্রেম ভালবাসা নিবেদন করিবার জন্য দয়িতের কাছে, তখন ললিত বলিল "কিগো বাপসোহাগী, বাপের আদর ত দেখলুম খুব, কিন্তু সেটা শুধু ওই মুখেই। প্রাণের ধন, নয়নের ত রার বে'তে দু'টো পয়সা খরচ কর্‌তে বুঝি প্রাণ সরলো না—ছোট-লোকের মন আর কত হবে!"

স্বামী-দেবতার প্রেম সম্ভাষণই বটে!

পাঁচ

অনেক কান্নাকাটি অনুনয় বিনয়ের পর হাসি পিতার নিকট যাইবার অনুমতি পাইল চারদিনের কড়ারে।

পিতা-মাতা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন—"এ কি, হাসি এত রোগা হ'য়ে গেছিস, কাল হ'য়ে গেছিস কেন মা!"

হাসির কান্না আসিতেছিল, কিন্তু সে হাসিল। তাহাকে যে হাসিতে হইবে। এই হাসিটুকু দেখিবার জন্যই যে তাহার পিতা আজ পথের ভিখারী।

সে বলিল—"কই রোগা ত হই নি, বেশ আমোদেই ত ছিলুম। তোমরা ক'দিন দেখ নি কি না, তাই অমন লাগ্‌ছে।"

মাতা বলিলেন—"হাঁ রে হাসি, ওঁরা তোকে বেশ যত্ন-টত্ন কর্‌তো, না, খুব আদরে ছিলি কেমন ?"

হাসির বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল—আদর-যত্ন ! হাঁ, হিন্দুবধূর আদর সে পাইয়াছে বই কি ! বলিল—"হাঁ, তা খুব করেছে। তা' দেখ মা, আমি কিন্তু চারদিন বাদেই চলে যাব, এখন ত বেশীদিন তোমাদের কাছে থাকা ভাল নয়, কি বল মা ?"

মা-বাপের মনে ব্যথা লাগিল- এরই মধ্যে মেয়ে পর হইয়া গেল ! খুসীও হইলেন, যাক্, হাসি ত সুখী হইয়াছে ! ওর যেখানে ভাল লাগে, সেই ভাল !

আর হাসি ! এই প্রথম ছলনা শিখিল। তাহার কুমারী-হৃদয়ের সরল হাসি, স্নিগ্ধ আনন্দ ত্যাগ করিয়া এবার সে বাঙালী ঘরের বধূ সাজিল !

ছয়

হাসির হাসি নিবিল, হৃদয় শুকাইল, দেহ মলিন হইল, কিন্তু তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

সে স্বামীর ঘরে, স্বামীর চরণে—ইহা অপেক্ষা হিন্দুর মেয়ের চাহিবার আর কি আছে ?

কিন্তু শ্বশুর-বাড়ীর আদর, স্বামীর আদর আর ত সে সহিতে পারে না, অথচ না সহিয়াই বা উপায় কি ?.

সেদিন ভোলানাথবাবুর নিকট হইতে পূজার তত্ত্ব আসিয়াছে। নিজেরা না খাইয়া কন্যা-জামাতার তত্ত্ব-তল্লাস সাধ্যমত করিতে তিনি কসুর করিতেন না। কিন্তু এই তত্ত্ব-তল্লাসের দিনই হাসির লাঞ্ছনা বাড়িত আরও বেশী।

হাসির শ্বশুর-শ্বাশুড়ী যা' মুখে আসে তাই বলিয়া হাসিকে গালাগালি দিয়া তত্ত্বের দ্রব্যগুলি ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। হাসি অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে দ্রব্যগুলি কুড়াইয়া লইয়া ঘরে গেল। বুক ভাঙ্গিতেছিল, আরও ভাঙ্গিল। সে ত জানে, এই সামান্য জিনিসগুলি যোগাড় করিতে তাহার পিতা-মাতাকে কয় বেলা অনাহারে থাকিতে হইয়াছে, ও হইবে। আর তাঁদের কত স্নেহের দান—এ'

হাসি পিতার দেওয়া জিনিসগুলির উপর মস্তক রাখিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

ললিত আসিল—"কি গো, নবাব-নন্দিনী কাঁদা হচ্ছে কেন ?"

হাসি কাতরকণ্ঠে বলিল—"বাবা যা' পেরেছেন সাধ্যমত দিয়েছেন, মা-বাবা রাগ ক'রে সব ফেলে দিলেন।"

"তাই নাকি, তা' মা-বাবার ভারি অন্যায় ত, ওই চামারে জিনিষ ঘরে না তুলে ফেলে দিলেন !"

স্বামীর ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠস্বর হাসির বক্ষে ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল—"চামারে জিনিষ ?"

"তা' নয় ত কি ! এনেছি চামারের ঘরের মেয়ে, তা' তার জিনিষ হবে বামুনের ?"

"ওগো, কেন এমন করে বল্‌ছো, তুমিও কি বুঝ্‌বে না, একটু কি জ্ঞান হবে না ?"

"বটে, আমায় জ্ঞান দিতে এসেছ ! জান, আমি তোমার স্বামী, তোমার প্রভু ! স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধ কেবল প্রভু দাসীর—প্রভুকে দাসী জ্ঞান দিতে আসে !"

ললিত ক্রোধে ফলিতে ফলিতে তত্ত্বের কাপড়-চোপড়গুলি পুঁটলী পাকাইয়া পা দিয়া বল খেলিতে লাগিল।

হাসি স্থিরনেত্রে পিতার প্রদত্ত স্নেহের দানের পরিণতি দেখিতে লাগিল।

দ্রব্যগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ললিত হাসির গাত্রে নিক্ষেপ করিল। হাসি ব্যথা পাইল, হাত কাটিল, পা কাটিল, কিন্তু কাঁদিল না, প্রস্তর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ললিত বিছানায় শুইয়া

পড়িল। স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বুঝি বা একটু করুণা হইল। তাই একটু নরমস্বরে বলিল—"যাক, খুব হয়েছে, এদিকে এস, পা-টা একটু টিপে দাও ত।"

হাসির নারী-হৃদয় গর্জ্জিয়া উঠিল, চক্ষু দু'টি জ্বলিয়া উঠিল, মনে হইল ছুটিয়া বাহির হইয়া চিৎকার করিয়া বলে—"দেখো, ও গো ও হিন্দুসমাজ, হিন্দুনারীর স্বামী-দেবতার লাঞ্ছিত-প্রহৃত স্ত্রীর উপর কি অসীম কৃপা!

কিন্তু তাহা ক্ষণেকের তরেই, পরক্ষণেই মনে হইল,—সে বধূ—হিন্দুঘরের লজ্জাবতী বধূ!

হাসি ললিতের নিকটে গেল। সে পা দু'খানি তাহার কোলে তুলিয়া দিয়া স্বামীর কর্ত্তব্য সাধন করিল। আবার কি, স্বামীর পদসেবা অপেক্ষা স্ত্রীর কোন্ কাজ বড়!

সাত

ফুল ঝরিল, হাসি মরিল!

ধীরে ধীরে ক্ষয় হইতে হইতে হাসির জীবন দীপ নিবিল!

কিন্তু কে দায়ী? একটি হাসির নির্ঝরিণীকে রুদ্ধ করিয়া দিবার জন্য, একটি সোনার প্রতিমাকে অকালে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য, এক স্নেহময় পিতা-মাতার বক্ষে শেল বিঁধাইবার জন্য দায়ী কে? স্বামীরূপধারী অত্যাচারী রাক্ষস হাসির স্বামী ললিত, না অচল-আয়তনে ঘেরা এই অন্ধ হিন্দু-সমাজ?

—উপকূলে—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বিশেষ একটা কাজে দিল্লী গিয়েছিলুম ; কাজ শেষে কোলকাতায় ফিরছি। গাড়ীতে যে ক'জন আরোহী সবাই বাঙালী।

গাড়ী ছাড় ছাড় হয়েছে, কোনরকমে একটু জায়গা করে' বসেছি, এমন সময় একজন সুপুরুষ ভদ্রলোক ব্যস্ত-সমস্তভাবে আমাদের কামরায় প্রবেশ করলেন এবং 'ঝুপ্' করে একেবারে আমার কোলেই বসে পড়লেন।

তাড়াতাড়ি সরে বসে একটু বিরক্তভাবে বললুম—মুখে বললেই তো পারতেন—

আমাকে বাধা দিয়ে একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন—একজন ভদ্রলোক আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমাকে তো আপনার হাত ধরে বসানই উচিত ছিল ; তা না ক'রে বসেছি ব'লে আবার রেগে যাচ্ছেন—ভারি মজার লোক তো।

ভদ্রলোকের ওপর রাগটা অনুরাগে এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণে লোকটির দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলুম—বেশ লাগে তাঁকে দেখতে, সুন্দর সুস্থ দেহ, বয়স বোধ হয় ত্রিশও পার হয় নি।

বাইরের সুস্থ সৌন্দর্য্যের তালে তালে ভিতরটাও তার এগিয়ে চলেছিল সমভাবেই। চমৎকার তাঁর ব্যবহার, একটু মিশলে খুসী না হয়েই পারা যায় না—যেন দুকূল ছাপিয়ে-পড়া নদী—আসে-পাশে সকলকেই আনন্দের অংশ দিতে দিতে চলেছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর বুকের কথা মুখের ভাষায় মুখর হ'য়ে উঠল।

পাঁচ বছর বাদে আবার প্রিয়জনদের কাছে ফিরে চলেছেন, দীর্ঘ প্রবাসের পর বুকে যৌবন, মনে সাফল্য গৌরব, আর ব্যাগে টাকা নিয়ে।

ঝরণাধারার মত অযচ্ছল কথা কওয়া, কিছু বাকী থাকে না, তবু যেন তাঁর জানাতে সবই বাকী, ফুরোবার নামটি নেই।

আমার সহানুভূতি যেন তাতে ঘৃতাহুতি দিলে—

টিনাটি ইতিহাস—

সুনীলা বাল্যের সাথী, তারপর যৌবনেরও—মধুর বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়া। অন্তরের সম্পদে উচ্ছ্বসিত সুনীলার বাহিরের সৌন্দর্য্য, আরো কত কি বর্ণনা! দু'বছরের মেয়ে শেফালী তাঁর প্রতিনিধি সুনীলার কাছে।—এ ক' বছরে তাদের কেমন হওয়া সম্ভব—স-পুলক কল্পনা। আরও কত কি!

একখানা কার্ডে কোলকাতার ঠিকানা লিখে পকেটে গুঁজে দেন। একটুও যে বাড়িয়ে বলেন নি, তাই সপ্রমাণ করবেন তাঁদের ওখানে নিয়ে গিয়ে।

খালি শোনা ছাড়া বলতেও হয়—তার স্ত্রীর জন্য আনা উপহারের প্রশংসা।

শুধু কি এই!

বড় বড় ষ্টেশনে তাঁর টেলিগ্রাম করা চাই-ই—পরের বড় বড় ষ্টেশনে উত্তরও আসে। টেলিগ্রামের উত্তর পেলেই ঝণাৎ করে পিয়নকে দেন বকশিশ—প্রতিবারেই।

আবার তখনি ছোটেন আর একটা টেলিগ্রাম করতে।

ফিরে এসে আমাকে পড়ে শোনান—'পৌছোনোর অপেক্ষায় আছি মনে উৎসুক উৎকণ্ঠা

নিয়ে।' 'মনের চাঞ্চল্য আর বাধা মানছে না—টাইম টেব্‌ল্ আর ঘড়ি ধ'রে অপেক্ষা করছি তোমার ছুটে আসার', 'ষ্টেশনে অপেক্ষা কর্‌বো, বাগানের ফুলগুলো ফুটে উঠেছে উৎসুক আবেগে—আজ পূর্ণিমা জান তো!'

—এই সব টেলিগ্রামের নমুনা।

লোক জমেছে অনেক—

গাড়ী একখানা কাটতে গিয়ে পয়েণ্টস্‌ম্যান নিজের পা-খানাই কেটে ফেলেছে।

শুনেই বিকাশবাবু ছুটলেন দয়া করতে—ভারি মণিব্যাগটা হাল্‌কা ক'রেই যেন তাঁর স্বস্তি।

কাণা-খোঁড়াদেরও প্লাটফরমে আজ মহোৎসব! মাসেকের আয় একদিনেই হয় বিকাশবাবুর সৌজন্যে।

নতুন যারা উঠেন তাঁদের সাথেও তাঁর আলাপ চলে সমান আগ্রহেই। একটানা কথা—বিবাহিত জীবনের মাধুর্য্য, শেফালী, সুনীলা—আগাগোড়া সব—

কিন্তু নতুনের পুরাণো হ'তে কতটুকুই বা দেরী লাগে!

ফেনিল উচ্ছ্বাসের নীচে সমুদ্রের মত প্রশান্ত ভালবাসা আমায় চোখে স্পষ্ট হয়ে আসে।

খুব ভোরে উঠে দেখি বিকাশবাবু ঘড়ি খুলে জানালার বাইরে ঝুঁকে পড়েছেন। আমায় চোখ মেল্‌তে দেখে বল্‌লেন—দেখ্‌ছি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল করে গাড়ী যাচ্ছে, এই টেলিগ্রাম পোষ্টগুলোর চব্বিশটায় এক মাইল হয়—

হেসে ফের বললেন—কলেজ ক্লাসে আমার রোল নম্বর ছিল তেইশ, আর ললিতের ছিল চব্বিশ। ললিতের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হ'লেই সে লম্বা লেক্‌চার দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিত যে, এগ্‌জামিনে বেশী নম্বর পাওয়া ছাড়া সকল বিষয়েই সে আমাকে হারাতে পারে—খেলাধূলায়—স্বাস্থ্যে-শক্তিতে—গল্পে-আলাপে—রোল নম্বরে পর্য্যন্ত—যথা, একদিন হয় চব্বিশ ঘণ্টায়—তেইশ নয়—পঁচিশ নয়; রেলওয়ের চব্বিশটা পোষ্টে এক মাইল হয়—আরও কত কি···

এম্নি কত অবান্তর অসংলগ্ন কথা!

কিছুক্ষণ পরে কাগজখানা চোখের সাম্‌নে ধ'রে পড়্‌বার ভাণ করতে লাগ্‌লেন।

মনের উপর এ চোখঠারা আমার কেমন বিশ্রী লাগে।

পাঁচমিনিট পরেই কাগজখানা সরিয়ে রেখে তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাহিরের পানে তাকান। তারপরেই হাতঘড়ির পানে চেয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন—গাড়ীর স্পীড্ কমে গেল না কি!

পাঁচ বছরের দীর্ঘপ্রবাসের পর মিলন প্রতীক্ষার শেষ ঘণ্টাটাও দীর্ঘতর হয়ে ওঠে তার কাছে। টাইমটেব্‌লে ছাপার কালিতে যা' লেখা আছে, তাই তাঁর কাছে বেশী মনে হয়—তার যেন আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহ্য হয় না—

গাড়ী তখন ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিল হাবড়া ষ্টেশনে। গাড়ী থামবার আগেই বিকাশবাবু পাদানিতে এসে দাঁড়ান—প্লাটফরমের পানে তাঁর ব্যাকুল দৃষ্টি—

ভেলভেটের নাগরা পায়, খদ্দরের শাড়ী পরে এক যুবতী—পাশে মোজাজুতো পায়, সিল্কের ফ্রক গায়, বাব্‌রীছাঁট চুল সাত-আট বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে—চলন্ত গাড়ীর জানালার সার্সির পানে তাদের দৃষ্টি—

আমাদের কামরাখানা তাদের পেরিয়ে গেল।

বিকাশবাবু তাদের দেখেছিলেন, ডাক্‌লেন—এই—

তারা ডাক শুনে চোখ ফেরালেন—উদ্বিগ্ন উৎফুল্লতায়—

গেলো—গেলো—বহুকণ্ঠের শঙ্কিত স্বর—

ফিরে দেখি বিকাশবাবু পাদানিতে নেই—কামরার জানালার নীচে গাড়ী আর প্লাটফর্মের ফাঁকের মাঝখানে কি একটা ছুটে গেল—বিকাশবাবুর গায়ের কোটটা !

—গাড়ী তখনো চল্‌ছে……

বিরহের শেষে আনন্দের একটা স্পষ্ট উজ্জ্বল্য—তারপরেই এল অন্ধকার। তটের কিনারায় ভিড়েও তরী বানচাল হয়ে গেল—বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল্যটুকু বুকে নিয়ে !

—রামধনু—

শ্রীরবীনেশ্বর দত্ত

অনেকদিন বাংলা দেশে থাকিয়া বৈজু বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছে।

তের বছর বিহারের কোন দেহাতে ছিল তার বাস। আত্মীয়স্বজন বিয়োগ যখন হয়, তখন গাঁয়ের একজনকে ধরিয়া সে আসিল বাংলাদেশে নকরী করিতে। ভাগ্যহীনের পাতাচাপা ভাগ্য। মিঃ কে,সি, রের বাড়িতে তাহার 'বয়ে'র নকরী জুটিয়া গেল। কাজ তেমন কিছুই না—ছেলেমেয়ে লইয়া বেড়াইতে হইবে। একটা ঠেলা গাড়িও আছে।

বাবীর বয়েস তখন সাত, আর আটুর পাঁচ। বাবী কিন্তু শাড়ী পরিতে ভালবাসে না, ইজার ও ফ্রক্ পরে। ফুরফুরে বব্‌কাট্ চুলে লাল ফিতা দিয়া একটা প্রজাপতি বানাইতে ভালবাসে। যখন-তখন গায়ে একটু একটু পাউডার ঘসিতেও তার ভাল লাগে। এই বয়সে সে প্রসাধনে বেশ পাকা। আটুর কিন্তু কোনোটাতেই আপত্তি নাই, যেমন করিয়া সাজাইয়া দেওয়া যায় তাতেই খুসী। বৈজু তাহাদের দুইবেলা বেড়াইতে লইয়া যায়। কিন্তু বাবীর তৈলবিহীন মসৃণ ফুরফুরে চুলে হাত বুলাইতে বৈজুর বেশ লাগে। নিজের মাথার তেল কপাল চুঁয়ে পড়ে, তার ভাল লাগে না। আটুর মাথায় টিকি নাই, নিজের মাথার টিকিটা একবার তুলিয়া ভাবে,—আপদ! বৈজু বাংলা কথাই বলিতে চেষ্টা করে, ভাল হয় না, তাই ববী খিল্-খিল্ করিয়া হাসে। বৈজুর মনে একটু ব্যথা লাগে।

আজকাল আর চুলে তেল দেয় না, নাপিতকে দিয়া টিকিটাও কাটিয়া ফেলিয়াছে। দুইদিন অন্তর কাপড়-জামা সাবান দিয়া কাচে। কাপড়টা মালকোঁচা দিয়াই পরে।

একবছরের মধ্যেই বৈজু বেশ বাংলা বলিতে শিখিয়াছে। পাড়ায় বাবীর বৈজু ছাড়া মোটে সঙ্গী নাই। কাজেই বৈজুই তার খেলার সাথী। সে স্নান না করাইয়া দিলে স্নান হয় না, চুল আঁচড়ান, পাউডার মাখান সবই বৈজুকে করিতে হয়। সে কিন্তু আনন্দিত মনেই দিদিমণির কাজ করিয়া দেয়। তাহাদের মধ্যে মিলও ছিল যেমন, ঝগড়াও হইত তেমন।

···আ রে বৈজু, তোর টিকি গেল কোথায় রে?

···কেটে ফেলেছি দিদিমণি।

···কেন কাটলি রে, আমরা বেশ তোর টিকি ধরে টান্‌তে পার্‌তাম?

···তবে তোমার চুল ধরেও টান্‌তাম।

···ইস্!···

আটু বলিত তখন,—বৈজু, টিকিপল রাখেতাম্।

বৈজু চটিয়া যাইত,—তোর টুপির উপর রাধেশ্যাম।

মিঃ রে পাটনায় বদলি হইলেন। সপরিবারেই চলিয়া গেলেন। বৈজু সার্ভেণ্ট ক্লাসে উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়া তাকাইতেছিল বাবীদের কামরায়। দেখা না পাইয়া হতাশায় বসিয়া পড়িল। তাকাইয়া রহিল বাইরের দিকে। কত নগর নগরী গ্রাম ছুটিয়া চলিয়াছে। ওই দিকেই তো তার বাড়ি। ওই যে পাহাড়ের পিছনে একটা দেহাত্ ওইখানেই। কতদিন সে নিজের ভাষা বলে নাই; নিজের ভাষা বলিতে প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠে। কত কি ভাবিয়া চোখ ঝাপসা হইয়া আসে।

কিউলে যখন ট্রেন থামিল, সাহেব ডাকিলেন —বয় !

বৈজু নামিয়া গেল কত উৎসাহের সহিত। অনেকক্ষণ পর বাবীর সঙ্গে দুই-একটা কথা বলিবে —ক'টা পাহাড়,ক'টা ষ্টেশন ইত্যাদি দেখিয়াছে। কিন্তু যাইয়া দেখে বাবী পরিত্রাণে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অন্তরে একটু দুঃখ হইল। ইচ্ছা হইতেছিল, কিছুক্ষণ এই গাড়িতেই যায়। কিন্তু মেমসাহেব বলিলেন,—তোর খাবার নিয়ে যা' বৈজু। আশার নীড় হতাশায় ভাঙ্গিয়া গেল।

···কখন পাটনায় যাব সাহেব ?

·· সন্ধ্যেবেলা।

বাবীর সঙ্গে আজ আর দেখা হইবার আশা নাই। চাপা দুঃখের উচ্ছ্বাস লইয়া সে ফিরিয়া আসিল। খাবার সে খাইল না, উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল আকাশের দিকে। আকাশের গায় গড়িতেছিল রাজপ্রাসাদ। তারপর নিজের মনেই হাসিয়া খাবার খাইল, শুইয়া পড়িল। গাড়ি চলিল দানবের মত। কিন্তু মন কি মানে ? চিন্তার জাল আপনা হইতেই বুনিতে থাকে। কাব্য জানে না, কবিতা জানে না, কিন্তু মনে মনে করিতে জানে কাব্যের ছাঁদ।

পাটনায় আসিয়া সাহেব অনেকবার ডাকিলেন। কিন্তু বয় আরামে ঘুমাইতেছে। বাবী যাইয়া ধাক্কা দিল—বৈজু ওঠ, যাবি না ?

বাবীর নূতন সঙ্গী মিলিল, মিঃ সি, সি, চেটার্জ্জীর ছেলে মণ্টু। ঠিক পাশাপাশি বাড়ি। বড় বাড়ি—মাঝখানে পার্টিসন, বাগানের ব্যবধান শুধু একটা তারের ফেন্সিং। বৈজুর সঙ্গে বাবী আর বড়-একটা বেড়াইতে চায় না, সে মণ্টুর সঙ্গেই বেড়াইতে যায়। আটুর কিন্তু বৈজুর সঙ্গে বেড়াইতে আপত্তি নাই।

বৈজুর মন বড় খারাপ হয়, মণ্টুর উপর রাগও হয়। রাগ করিয়া বাবীর সঙ্গে কথা কয় না। বাবীরও তাতে আসে যায় না।

মণ্টুর সঙ্গে বাবী ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, লুকোচুরি খেলে, আদর করিয়া জামায় ফুল গুঁজিয়া দেয়। দেখিয়া বৈজুর গা জ্বালা করে। সে আর ওই দিকে তাকাইবে না।

কিন্তু চোখ আপনা হইতেই সেই দিকে যায়। সে দেখে ওরা কি করে। ওদের সঙ্গে খেলা করিতে সেই দিকে ছুটিয়া যায়। কিন্তু উপেক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

একদিন বৈজু গাঁদাফুল তুলিয়া বাবীকে দিতে গেল। বাবী বলিল, যাঃ, বিশ্রী,তোর পছন্দ নেই ! মণ্টুর বেশ পছন্দ আছে। ফরিওপ্‌সিস্‌, পিঙ্ক্‌ কত ফল আছে, তুই তো নামও জানিস না অত। মণ্টু একটা লাল টক্‌টকে ফল বাবীর হাতে দেয়।

বৈজুর গা জ্বালা করে।

আরো বছরখানেক কাটিল। বৈজুর ক্ষত বুকখানা আরো বিক্ষত হইতে থাকে। কত চেষ্টা করিল একটু ইংরাজী শিখিবে, বাংলা শিখিবে, লিখিবে, কিন্তু হইয়া উঠে না। বাবীর কাছে যখন একটু একটু পড়িতে বসে, তখন মণ্টু আসিয়া লইয়া যায়। একা বসিয়া পড়িতে আর ভাল লাগে না। তারা যে দিকে যায়, সেই দিকেই চাহিয়া থাকে। তখন কি আর পড়িতে ইচ্ছা করে।

মণ্টু যখন ইস্কুলে যায়, বৈজু তখন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। এই সময়টুকু বাবীর সঙ্গে দেখা হইবে না। নিজের সঙ্গে দেখা না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু মণ্টুটার সঙ্গে না দেখা হইলেই ভাল হয়।

বাবীকে তাহার কত কথা বলিবার আছে, কিন্তু সময় হয় না। নদীর ধারে সে বেড়াইতে যাইতে বলে, বাবীর ইচ্ছা করে না। ছল করিয়া বলে,—দিদিমণি, সাহেব রাগ করছিল তুমি মণ্টুদা'র সঙ্গে যাও বলে, আর যেয়ো না। আমি যে তোমায় বলেছি তাও বলো না।

বাবী হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। হাসিলে গালে একটা টোল পড়ে। বেশ দেখায়। বৈজুর মনে কাব্য গড়িয়া উঠে।

আজ এক জায়গায় বেড়াতে যাবে দিদিমণি, বেশ জায়গা?

...হ্যাঁ, আজ তোর সঙ্গে যাব। মণ্টুর ফিরতে আজ দেরী হবে, প্রাইজ পাবে কি না ইস্কুলে।

পশ্চিম কোণ লাল হইয়া উঠিয়াছে—সূর্য্য ডুবিয়া যায় নাই। কল্‌কল্ করিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। বাবী আনমনে বসিয়া জল দেখিতেছে, বৈজু বলিল, আচ্ছা দিদিমণি, তুমি আমায় বুঝি ভালবাস না?

...বাসি রে বৈজু। আট্, ওই দেখ কি-একটা ভেসে যাচ্ছে!

...কই দিদি? অই যে, কি যাচ্ছে ওটা?

...ওটা কি রে বৈজু?

...ওটা একটা কাঠ। আচ্ছা দিদিমণি, মণ্টুকে কেন ভালবাস, ও তোমার তো কেউ না?

...ও যে আমায় ভালবাসে।

...আমিও তো—

...চল্ বৈজু, রাত হ'য়ে গেল?

...চল দিদিমণি।

মিঃ সি, সি, চেটার্জ্জী পাটনা হইতে বদলি হইয়া যাইতেছেন। মণ্টুও চলিয়া যাইবে। বৈজুর কত আনন্দ। বাবীর কিন্তু মন খারাপ। সান্ত্বনা দিয়া বৈজু বলে, তার জন্য কি দিদিমণি, আমিই তোমার সঙ্গে খেলা করব।

বাবী তার কথায় কাণও দেয় না।

মণ্টুরা চলিয়া গেছে। বাবীর খেলিবার সময় কান্না আসে। বৈজু ভাবে, ওর চোখে এত জল আসে কেমন করিয়া! কতটা সে ভালবাসে মণ্টুকে!—সেও বাবীকে কাঁদাইবে।...

পরদিন বৈজুর পাত্তা পাওয়া যায় না। দুই-তিনদিন গেল, চারদিনের দিন সে আসিয়া হাজির। মেম সাহেবদের বকুনি-ঝকুনি দিব্য হাসিমুখে হজম করিয়া ফেলিল। বৈজুর উপর সকলেরই বড় মায়া—কেউ নাই কি না?

...আচ্ছা দিদিমণি, আমি আসি নি ব'লে তুমি কেঁদেছিলে আমার জন্যে?

...ধ্যাৎ, কাঁদব কেন? কোথায় ছিলি বল তো?

...তুমি কাঁদ নি দিদিমণি?

...না, আট্ কেঁদেছিল। তুই একটা আহাম্মক, বাড়ি না এসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিস খালি, না?

বৈজুর বড় আঘাত লাগিল।

বাবী এখন স্কুলে যায়—গাড়িতে। পিয়ানো বাজাইয়া গান করে—গলার সুর কি মিষ্টি! বৈজু অবাক হইয়া তার মুখের প্রত্যেক ভঙ্গীমাটির দিকে প্রফুল্ল নয়নে তাকাইয়া থাকে।

যখন বাবী ইংরাজী পড়ে, তখন বৈজু একদৃষ্টে তাহার নানা ভঙ্গীর চঞ্চল ঠোঁট দু'টির দিকে তাকায়—কি যে পড়ে, বৈজু বোঝে না, তবু তার ভালই লাগে।

বৈজুর মনে একটা দুঃখ—বাবী আজকাল তার সঙ্গে বেড়াইতে যায় না, মা-বাবার সঙ্গেই একটু বেড়াইয়া আসে। বৈজু ঠিক বুঝিতে পারে না,—কেন? বোধ হয় সে বড় হইয়াছে বলিয়াই। বাবী কিন্তু শাড়ী পরিতে শিখিয়াছে, বব্‌কাট্ চুলও আর নাই—একরাশ চুল পিঠে ঝুলিয়া কোমর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

কদাচিৎ বৈজুকে লইয়া বাবী নদীর ধারটায় সন্ধ্যার রক্তিম আকাশের নীচে একটু বেড়াইয়া আসে। বৈজুর মনে সেদিন খুবই আনন্দ হয়। কত কথাই বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাবী যে বড় গম্ভীর মেয়ে! এই তো সবে পনের, তাতেই।

মধুর বসন্ত প্রভাতে ঝিরঝিরে মলয় হাওয়া বহিয়া চলিতেছে। অকারণেই বাবীর মনটা

প্রফুল্ল কুসুমের মত দেখায়। সেমিজের আড়াল হইতে সে চিঠিখানা বাহির করিয়া লুকাইয়া কত-বার পড়ে। বৈজুর চোখে কিন্তু ধরা পড়িয়া যায়।

...কার চিঠি এল দিদিমণি?

...আমার ফ্রেণ্ডের চিঠি রে বৈজু।

দু' একটা ইংরাজী কথার মানে বৈজু জানে, মুখে-মুখেই শিখিয়াছে।

...ও!

বৈজুর মাথা খারাপ হইল না কি? যখনই দেখা পায়, তখনই টিপ্ করিয়া বাবীকে একটা প্রণাম করিয়া লয়। বাবী অবাক হইয়া যায়। বৈজু খালি হাসে।

...তোর হ'ল কি রে বৈজু?

...কিছু হয় নি দিদিমণি; তোমার আলতা মাখান পা দুটো এত সুন্দর যে, আমার খালি ইচ্ছে করে প্রণাম করি। শুধু তা' নয়, ইচ্ছে করে জিব দিয়ে পায়ের ধূলো নি... পা দুটো বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। যদি শিব-শঙ্কর হতুম—

...যা', তুই বড় বোকা বৈজু।

বৈজু ভাবিল, সে খুব চালাকি করিয়া কথা বলিয়াছে। বাবী শাস্ত্র জানে না বলিয়াই কথাটা বুঝিল না।

বৈজু একটু হাসিল।

...আমরা শীগ্‌গিরই অন্য জায়গায় যাব বৈজু, বাবা বদ্‌লি হবেন। তোর ইচ্ছে করে না নূতন জায়গায় যেতে?

...করে বই কি দিদিমণি।

...এই চিঠিটা ফেলে দিস তো বৈজু?

...কা'কে লিখেছ?

...মণ্টুকে মনে পড়ে তোর? ...তাকেই লিখেছি। যা' চট্ ক'রে ফেলে দিয়ে আয়।

বৈজু এলোমেলো কত চিন্তার বোঝা লইয়া ডাকঘরের দিকে চলিল। বাবী এখনো মণ্টুকে ভোলে নাই, চিঠিপত্র লেখাও চলে। সে ভাবিয়াছে, বাবী নিশ্চয়ই এতদিনে মণ্টুকে ভুলিয়া গেছে। বুদ্ধিমান বৈজুর একটা বুদ্ধি আসিল—চিঠি খুলিয়া দেখিবে বাবী কি লিখিয়াছে।—জল দিয়া খামটা খুলিল, কিন্তু পড়া হইল না—ইংরাজী লেখা।

নিজের উপর রাগ হইল, দুঃখ হইল, চিঠিও ছিঁড়িয়া ফেলিল। মণ্টুর কাছে চিঠি লেখা—তার পক্ষে দুঃসহনীয়। বাড়ি ফিরিয়া ভাবে—বাবী নিশ্চয়ই তার এই কাজটা জানিবে না।

কিন্তু কয়েকদিন পর বৈজু বাবীর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইল।

...বৈজু, সেদিন চিঠি পোষ্ট করেছিলি?

...তুমি তো দিদিমণি চিঠি ফেলে দিতে ব'লেছিলে, পোষ্ট করতে বল নি?

বাবী খিলখিল করিয়া হাসে।

...যাঃ, তুই বড় বোকা, এ্যাদ্দিন বাঙ্গালীর সঙ্গে থেকেও যদি বুদ্ধি একটু তোর থাকে।...তোর কাপড়চোপড় গুছিয়ে নে, কালই কিন্তু আমরা পাটনা থেকে চলে যাব।

...কোথায় যাব দিদিমণি?

...লক্ষ্ণৌ।

বৈজু ভাবিল, দিদিমণি নিশ্চয়ই তাকে খুব ভালবাসে, নইলে এতবড় অন্যায় কাজের উপরও সে রাগ করিল না।

যতটা উৎসাহ লইয়া বৈজু লক্ষ্ণৌ আসিল, তার তিন গুণ উৎসাহ কমিয়া গেল মণ্টুকে তাদের বাড়ীর পাশে দেখিয়া।

বৈজুর রাগ হয়, অভিমান হয়। এখানে না আসিলেই ভাল হইত। বাবী যায় মণ্টুর পাশে পাশে হাঁটিয়া বেড়াইতে—সদা প্রফুল্ল হাসির লীলায়িত মুখে।—দেখিলে চাপা দীর্ঘনিশ্বাস আরো চাপিয়া বেদনা হয়। বাবীর পাশে বসিয়া মণ্টু একলা ঘরে গান শোনে, আর বৈজু বাইরে দাঁড়াইয়া থাকে। কখনো চুরি করিয়া ওই দিকে তাকায়; কিন্তু দেখিয়া নিজের দেহের

রক্ত-হিম হইয়া যায়। ইচ্ছা করে বিজন বনে গিয়া চীৎকার করিয়া একবার কাঁদে।

মণ্টুর সঙ্গে বাবীর বিয়ে! কথাটা শুনিয়া বৈজুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না—

সাহেব বলিয়াছেন, তার না কি এতদিনে অনেক টাকা জমিয়াছে। সে স্থির করে,—টাকাটা বাবীর বিয়েতেই যৌতুক দিবে। সাহেব আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বৈজুও নাছোড়বান্দা—বাবীকে একছড়া মুক্তার হার কিনিয়া দিতেই হইবে।

* * * *

বিয়ের দিন বৈজুর খবর কেউ দিতে পারিল না।

আহা বেচারী!

শূন্যে মনের রঙ্গিন তুলিতে সে কত রাজপ্রাসাদই না গড়িয়াছিল! দুঃখটা তার এমনই বাজিয়াছিল যে,—

কিন্তু বাবী মনের সুখেই আছে। মুখেও লাগিয়া আছে সদা প্রফুল্ল হাসি।

মাসখানেক যায়—

তাহারা 'হানিমুন' করিতে যাইবে বৈচিত্র্যময় এক পাহাড়ের দেশে—যেখানে কঠিনের বুকে কোমলের চিরন্তন আঘাত আর প্রতিঘাত।

শীতের কুহেলীজাল ভেদ করিয়া সূর্য্য তার কচি রোদ ছড়াইয়া দিয়াছে শ্যামল ক্ষেত্রে; আর সোণার প্রতিচ্ছবি নদীর বুকে। যেন পৃথিবীর বক্ষে সূর্য্যের এই প্রথম সমাবেশ।

যে পথটা নদীর ধার দিয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ দিয়াই বাবী মণ্টুর হাত ধরিয়া বেড়াইতেছিল।

প্রভাতের প্রথম আলোর পরশে মন তার ছিল হাল্কা। মমতা ছিল শিশিরে ভিজান। নাম না জানা পাখী কি গান গাহিয়া যায় বাবীর তাই ভাল লাগে।

সামনের গাছতলায় একটা লোক শুইয়া ছিল। দেহটা অনাবৃত। শীতে হয় ত বরফ হইয়া গিয়াছে, না হয় ত—

নইলে নিশ্চলভাবে শুইয়া কেন? পাশে তার কে একজন বন্ধু। বাবী অগ্রসর হইয়া দেখে—সেই শায়িত লোকটী বৈজু!

লুপ্ত আশা সজাগ হইয়া উঠে। কাছে যাইয়া সে ডাকে—বৈজু! বৈজু! ও বৈজু! শীতে শুয়ে কেন?

কোনো উত্তর আসে না।

পাশের লোকটী বলে,—ও তো মরে গেছে! ...বৈজু ছিল আমার আত্মীয়। কাল রাত্রে এই গাছতলায়ই আমার সঙ্গে তার দেখা। শেষ রাত্রেই—

বাবীর বুক দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া পড়ে।

.. কিছু বলে যায় নি?

.. হাঁ। মরে গেলে নদীর জলেই ওকে ফেলে দিতে বলেছে, তার সঙ্গে এই ছবিটাও।

...দেখি।

বাবী তাকাইয়া দেখে, এটা তার দশ-এগার বছর বয়সের ছবি। অনেক কথাই মনে পড়ে। ছোটবেলার অনেক এলোমেলো কথা সংগ্রহ করিয়া ভাবিতে থাকে। বৈজুর ছোটখাট দুই একটা কথার মানে তখন সে বুঝিতে পারে নাই। সে তাকে—

বৈজুর বন্ধুর হাতে ছবিটী ফিরাইয়া দিয়া বাবী আবার মণ্টুর পাশে পাশে হাসিয়া চলিল। স্বামীর অলক্ষ্যে চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার দানার মত চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

কিন্তু তার হাসি ঠোঁটে লাগিয়াই ছিল। কে জানে সেই হাসির অন্তরালে গভীর বেদনা লুকাইয়া আছে কি না!

———

—ব্রতভ্রষ্ট—

শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস

এক

মা রক্ষাকালীর কাছে যোড়া পাঁঠা মানত করিয়া একমাত্র পুত্রকে করাল ব্যাধির কবল হইতে ফিরাইয়া পাইয়াও ঘোষেদের বউ যখন মায়ের মানত শোধ করিতে বিস্মৃত হইল এবং তারপর বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে সর্পদংশনে যখন তাহার সেই প্রাণের ধন তাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া গেল, তখন লক্ষ্মীপুর গ্রামবাসীরা সভয়ে জানিল— তা'দের মায়ের শক্তি কত—মা তাদের কতখানি জাগ্রত!

গ্রামপ্রান্তে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক বৃহৎ আম্র কাননের মধ্যে রক্ষাকালী মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দির মধ্যে মায়ের পাষাণ মূর্ত্তি বিরাজিত। ৺শ্যামা পূজার সময় মহাসমারোহে মায়ের পূজা হয়। অন্য সময়েও দায় ঠেকিয়া লোকে পূজা দিয়া থাকে। মাঘমাসের শেষভাগে একদিন গ্রামের নাপিত বউ হরিমতি তাহার হারাণো সোণার মাদুলিটি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশায় মায়ের নিকট মানত করিতে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। দেখিল,—মন্দির-অঙ্গনে দেবীর দিকে মুখ করিয়া অনিন্দ্যকান্তি এক তরুণ ব্রহ্মচারী একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর যোগাসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। সম্মুখে ধুনীতে অগ্নি জ্বলিতেছে। পার্শ্বে একটি কমণ্ডলু ও একটি একতারা। পরিধানে গৈরিকবাস। এই মাঘমাসের দারুণ শীতেও তাঁহার দেহে কোন আবরণ নাই। হরিমতি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, দূর হইতে উদ্দেশে মায়ের চরণে স্বীয় অভীষ্ট জানাইয়া দ্রুতপদে গ্রামাভিমুখে চলিল।

অচিরে গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল যে, কোন্ এক বিবাগী রাজার ছেলে ব্রহ্মচারী হইয়া কালী মন্দিরে আসিয়া স্থান লইয়াছেন। গ্রামবাসীরা দলে দলে ব্রহ্মচারীকে দেখিতে ছুটিল। সেই নবীন ব্রহ্মচারীর তেজপুঞ্জোদ্ভাসিত শ্রী ও অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। তিনি যে বড়ঘরের ছেলে, সংসারের মিথ্যা মায়ার বন্ধন কাটাইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন,—সে বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ রহিল না।

দুই

একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমে একটী মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু ব্রহ্মচারী কালীবাড়ীতেই রহিয়া গেলেন। গ্রামবাসীরা দেবদর্শনের মতই তাঁহাকে নিত্য গিয়া দেখিয়া আসে ও তাঁহার সেবা-যত্ন করে। দিনান্তে দু' একটি ফল ও একটু কাঁচা দুগ্ধ, ইহাই ব্রহ্মচারীর আহার। গ্রামবাসীরা ভক্তিভরে তাঁহার জন্য নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনে। ব্রহ্মচারী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আহার্য্যের দুই-একটি উপকরণ মাত্র রাখিয়া আর সমস্তই সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিলাইয়া দেন। অধিকাংশ সময়েই ব্রহ্মচারী মৌনাবলম্বী কিংবা নিমীলিত-নেত্রে ধ্যানস্থ হইয়াই থাকেন। তাঁহার মুখে কেহ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলে, তিনি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন; বলেন—"আমি মূর্খ, শাস্ত্রের কি জানি?—শুধু এই জানি মায়ের নাম সত্য! আর ত কিছু জানি না।" কিন্তু তবুও ভক্তগণের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রালোচনা করিতে হয়—কি মধুর, অমৃতময় সে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা! এই বয়সে ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যে কতখানি পাণ্ডিত্য ও

অধিকার জন্মিয়াছে, গ্রামবাসীরা তাহা ভালরূপেই বুঝিয়াছে। ইদানীং তাহারা ব্রহ্মচারীর আর এক অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইয়াছে।

তাঁহার কৃপায় ভট্চায্ পাড়ার বলরাম ঠাকুরের বহুকালের অসাধ্য ব্যাধি শূলরোগ সারিয়াছে, মল্লিক-বাড়ীর সাধনের মৃগীরোগ নিরাময় হইয়াছে, গ্রামের জমীদারের কনিষ্ঠ পুত্র, মরণোন্মুখ নরেন্দ্র-নাথ ব্রহ্মচারীর মৃতসঞ্জীবনী তুল্য ঔষধে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়াছে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামে পরনিন্দা-পরচর্চ্চার যে নৈমিত্তিক স্রোত বহিতেছিল, অকস্মাৎ তাহা রুদ্ধ হইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে দিবারাত্র সেই ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গই আলোচিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে অলৌকিক কত কি কাহিনী দিকে দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল—ব্রহ্মচারী বাকসিদ্ধ, তিনি বায়ুভোজী, তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা নাই, শুধু ভক্তের মনোরঞ্জনের জন্যই সামান্য কিছু আহার করিয়া থাকেন। অমাবস্যার ঘোর নিশুতি রাত্রে মা মহামায়া আসিয়া তাঁহাকে না কি দেখা দেন, ইত্যাদি।

মধ্যাহ্ন কাল। রবির প্রখরকরজালে দিগ্-দিগন্ত উদ্ভাসিত, দীপ্তমান। প্রকৃতির শ্রান্ত আবেশময় একটা ঢুলুঢুলু মূর্ত্তি।

গ্রামের ললনাগণ রায়েদের পুকুর ঘাটে স্নানার্থ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আজ সেই ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গই আলোচিত হইতেছিল। শতমুখী হইয়া ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব কতই কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঘাটে রহিল শুধু দুইটি নারী—একজন বর্ষীয়সী ও অপরটি তরুণী, বয়স অনুমান আঠারো-উনিশ বৎসর। মধ্যাহ্ন গগনের সহস্রাংশুর মতই বুঝি বা এই তরুণীর রূপচ্ছটা—কিন্তু গাঢ় এক বিষাদ-মেঘে ঢাকা! মধ্যাহ্ন তপনের খররশ্মি-জালের পরিবর্ত্তে তরুণীর সেই বিষাদ-মেঘাবৃত রূপ-লহরের প্রতি ভঙ্গে যেন একটা স্নিগ্ধ অমিয়ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। নীরব মধ্যাহ্নে বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নির্জ্জন বাপীতটে মূর্ত্তিমতী সেই বিষাদ প্রতিমাখানিকে দেখিয়া পুণ্যাশ্রম তপোবনের তপঃকৃশা ঋষিকন্যা বলিয়াই ভ্রম হইতেছিল। কিন্তু হায়! তরুণীর সেই অলোক-সামান্য রূপরাশি, তার সেই ভরা যৌবন নিষ্ফল, নিরর্থক!—তাহার পক্ষে একটা নিদারুণ অভিসম্পাত মাত্র! আজ চার বৎসর হইল অভাগিনীর কপাল পুড়িয়াছে—তার সীঁথির সিন্দূর, হাতের নোয়া জন্মের মত ঘুচিয়াছে। তরুণীর নাম সরমা, সে এই বর্ষীয়সীরই পুত্রবধূ। ঘাটে কেহ নাই দেখিয়া বর্ষীয়সী অনুযোগের স্বরে পুত্রবধূকে বলিলেন—"তোকে এত ক'রে বল্লুম বাছা, বাবাকে গিয়ে একবার দেখে আয়, কিন্তু আমার সে কথা তুই কাণেই তুল্লি নে। সাধু-সন্ন্যাসী, ঠাকুর-দেবতার উপর এমন অনাস্থা ত আমি কারও দেখি নি!"

সুরমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল—"ঠাকুর দেবতার উপর অনাস্থা কেন হ'বে মা?—তা' কেন তুমি বলছো। তবে, তোমাদের মত সাধু-সন্ন্যাসী দেখ্‌লেই আমার ভক্তি হয় না, মানি। এ জীবন ভরে সাধু-সন্ন্যাসীদের কত লীলা খেলাই ত দেখ্‌লেম—ধর্ম্মের মুখোস পরে' এরা কি না করে? গেল বছর গ্রামে কি কাণ্ডটাই না হ'ল! পঞ্চানন্দঠাকুর হঠাৎ কৃষ্ণের অবতার হ'য়ে, গ্রামের বউঝিদের নিয়ে গোপীলীলা করতে গিয়ে কি ঢলানটাই না ঢলালেন!—গ্রামের লোক শেষ কালে মারধোর ক'রেই তো তাঁকে গ্রাম থেকে তাড়ালে!—সে কি ভুলে গেলে মা?" শাশুড়ী মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন—"পঞ্চানন্দ ঠাকুর ত আর সবাই নয়!—তা' তোমার মনে ভক্তি না এলে আর কি করবে! কিন্তু ঠাকুর দেব্‌তার নাম শুনতেও কি দোষ? কই, তা শুনতেও ত তোমার মন হয় না? গাঁয়ে পুরাণ পাঠ হয়,

কথকতা হয়, রামলীলা হয়, আমাকে ত একলাই যেতে হয়—কই, তুমি ত কখনো যাও না। সে জন্য লোকে তোমায় কত মন্দ বলে। তোমার এখন ধর্ম্ম কর্ম্মই ত একমাত্র পথ—সংসারে তোমার অন্য বন্ধন ত কিছু নাই। সেই ধর্ম্মেই যদি মন দিতে না পারো, তোমার এ পোড়া জীবনটা বইবে কি ক'রে মা, বলতো?"

কঠিন গিরিদেহে ভীমবেগে প্রহত হইয়া তরঙ্গমালা যেমন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর এই অনুযোগের আঘাতে সরমার ভাঙ্গা বুক বুঝি বা তেমনি করিয়াই শতধা বিচূর্ণিত হইল। আকুল উদ্বেলিতকণ্ঠে সে বলিল—"জ্বলন্ত চিতার মত আমার এ দগ্ধ-জীবন কি করে' যে কাটাবো মা, তাই ভেবেই ত সারা হলেম। ধর্ম্মে-কর্ম্মে আমাকে তুমি মন দিতে বল্‌ছো, কিন্তু মন কি আর আমার বসে আছে মা!—কোন কাজেই ত তাকে স্থির করতে পারি না—কিছুই যে ভাল লাগে না!—দিনরাত বুকের মধ্যে শুধু হু হু করে ওঠে! বেঁচে আছি, কিন্তু আমার এ দেহে প্রাণ কই? প্রাণহীন দেহের শুধু একটা ছায়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—মরার অধিক হ'য়েই ত এ পৃথিবীতে আমি বেঁচে আছি মা!—"

একটা কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সরমা পুনরায় বলিতে লাগিল—"খেতে হয়, তাই এ পোড়া পেটে অন্ন জল দিই,এ কালামুখ লুকিয়ে রাখ্‌বার উপায় নেই, তাই লোকের সাম্‌নে বেরুই, সমবয়সীদের সঙ্গে কথা না বল্‌লে নয়, তাই বলি। চারটে বছর হ'ল আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! এই চার্ বছর আমি কি ক'রে যে কাটালুম, আমার দিন যে কি ক'রে যা'চ্ছে, সে শুধু এক অন্তর্য্যামীই জানেন! আমার দুঃখ কি তুমিও বোঝ না মা!"

মোক্ষদাসুন্দরীর হৃৎপিণ্ডটা টানিয়া ছিঁড়িয়া কে যেন সহসা শতখণ্ড করিয়া দিল। একটা তীব্র, মর্ম্মভেদী যাতনায় তাঁহার প্রাণটা যেন সহস্রকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। উন্মাদিনীর মত বিভ্রান্ত আত্মহারা তিনি সরমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। স্বীয় অঞ্চলে পুত্রবধূর অশ্রুধারা মুছিয়া দিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন—"আমি তোর দুঃখ বুঝি নে?—হায় রে অভাগি! কিন্তু বুঝেই বা কি করবো মা! তোর বুকের এ চিতার আগুন নিবাবার সাধ্য আমার কি আছে! ভগবানের অমৃতময় নামেই শুধু এর নির্ব্বাণ হ'তে পারে—অন্য কিছুতে নয়! তাই ত তোকে এত কথা বল্‌ছিলেম। তুই যদি তোর মন বাঁধ্‌তে না পারিস, তবে কারও সাধ্যি নেই তোকে শান্তি দেয়। আমার দিকেও কি একবার চেয়ে দেখ্‌লি নে মা। দশটা নয়, পাঁচটা নয়,—একমাত্র বুকের ধনকে খেয়েও ত মুখ বুজে, বুক চেপে রয়েছি! পাগল হ'য়ে বেরিয়ে গেলে ত কোন লাভ নেই মা!" বলিতে বলিতে মোক্ষদা-সুন্দরীর চক্ষু ফাটিয়া হু হু করিয়া ধারা ছুটিল। তাঁর সেই তপ্ত অশ্রুবারি, পুত্রবধূর অশ্রুধারার সঙ্গে মিলিয়া একটা প্রবল বন্যার সৃষ্টি করিল।

সেই খররবিতপ্ত মধ্যাহ্নে, নির্জ্জন সেই বাপী-তটে, শোকবিধুরা নারীদ্বয়ের নীরব সেই অশ্রুপ্লাবন স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া দেখিলেন,—শুধু মধ্যাহ্নগগনের দীপ্ত তপন। আর তাঁদের সেই পাষাণভেদী বিলাপোক্তি নিঝুম নিস্পন্দ হইয়া শুনিলেন,—অনন্ত মূর্ত্তিমতী অনন্তরূপিণী করুণা-ময়ী প্রকৃতিদেবী। আজ তাহাদের সেই অনন্ত ব্যথা বেদনা দেখিবার, বুঝিবার এ বিরাট বিশ্বে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ ছিল না।

শ্রান্ত ক্লান্ত মধ্যাহ্ন সমীরণ শোক-বিহ্বলা সেই দুর্ভাগিনীদের ভগ্ন দীর্ণবক্ষের তপ্তশ্বাসে যেন রহিয়া রহিয়া শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ পর আত্মসংবরণ করিয়া সরমা বলিল—"কাল আমাকে তুমি নিয়ে যেও মা—আমি ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে দেখ্‌তে যাব।"

মোক্ষদাসুন্দরী বসনাঞ্চলে পুত্রবধূর অশ্রুজল

মুছাইয়া দিলেন—তাহাকে বক্ষ-বেষ্টন হইতে বিমুক্ত করিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন—"বেশ, কালই আমি নিয়ে যাব।—বাবাকে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি হ'বে।"

তিন

পরদিন সত্যই সরমা তার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীকে দেখিতে গেল। বেলা তখন প্রায় প্রহরখানেক হইয়াছে। কালীবাড়ী পৌঁছিয়া সরমা দেখিল, ইতিমধ্যেই গ্রামের অনেক নরনারী আসিয়া সেখানে জুটিয়াছে। ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া সরমা অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—এ কি অপরূপ দেব-দুর্ল্লভ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! রজত-গিরিসন্নিভ উন্নত দেহ, ধ্যানমগ্ন! জ্যোতিষ্মান, সৌম্য-দর্শন সেই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া সরমার প্রাণ অপূর্ব্ব এক ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে এতকালের তার বদ্ধ-সংস্কার কোথায় ভাসিয়া গেল। সরমার মনে হইল,—সে মূর্ত্তি যেন তাহার কত জন্মের পরিচিত, ইনিই বুঝি তার জন্মজন্মের পারের কাণ্ডারী!

সরমার মনে হইল,—ঘোর আবর্ত্তময় তরঙ্গ-সংকুল এই সংসার-সমুদ্রে কর্ণধারহীন জীর্ণ তরীতে ভাসিয়া উদ্দাম উন্মত্ত স্রোতের মুখে কূলহারা দিশাহারা হইয়া 'কোথায় গুরু, কোথায় কর্ণধার' বলিয়া সে বুঝি বা এতদিন পরিত্রাণী তাঁহাকেই ডাকিতেছিল! এই প্রহেলিকাময় জগতে এমনি কত কি আশ্চর্য্য অনুভূতি লোকে অনুভব করে। এমনি করিয়াই কত তুচ্ছ ঘটনায় অভাবনীয়রূপে, জন্মজন্মান্তরের কত স্মৃতি, প্রাণের কত লুপ্ত আকর্ষণ অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে! এমনি করিয়াই কোন্ জন্মের কোন্ ছিন্ন-সূত্র আবার নব-গ্রন্থিতে গ্রথিত হয়! যাহার সঙ্গে কোন দিন দেখা নাই, জানা নাই, আলাপ-পরিচয় নাই, প্রথম দর্শনেই কি জানি কেন মনে হয়,—সে যেন কতকালের পরিচিত, কত আপনার জন! তাহাকে দর্শন মাত্রেই প্রাণ আনন্দে স্পন্দিত হইতে থাকে। আজ তাই ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র সরমার দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচারীর সম্মুখস্থিত ধুনী হইতে একটা ক্ষীণ ধূমশিখা উত্থিত হইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছিল। গ্রামের সুনির্জ্জন প্রান্তস্থিত, ঘনবিন্যস্ত তরুরাজিবেষ্টিত, হোমানলের মত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে সমুজ্জ্বল, আজ সেই কালীবাড়ীটিকে পুণ্যাশ্রম এক তপোবন বলিয়াই সরমার ভ্রম হইতেছিল। আর ধ্যান মগ্ন দেবকান্তি সেই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল,—ইনিই সেই আশ্রম-স্বামী।

ক্ষণেক পরে ব্রহ্মচারী নয়নোন্মীলন করিলেন। "বাবা, চরণে প্রণাম হই" বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতা হইলেন। প্রণামান্তে উঠিয়া পুত্রবধূকে বলিলেন—"ঠাকুরকে প্রণাম কর মা।" সরমা বিহ্বল হইয়া ব্রহ্মচারীকে দেখিতেছিল, শাশুড়ীর কথায় তাহার চৈতন্য হইল; সে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী সন্ত্রস্ত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার উদ্দেশে সমাগত নারী দ্বয়ের এই সভক্তি প্রণতি ব্যাকুল-চিত্তে তিনি মহামায়ার চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন। পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন—"মা জগদম্বা আপনাদের মঙ্গল করুন!" মোক্ষদা সুন্দরী ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন—"অভাগিনী বউকে আজ তোমার কাছে নিয়ে এসেছি বাবা, চার বছর হ'লে ওর কপাল পুড়েছে, ওর সব সুখ ফুরিয়েছে! অভাগীকে ধর্ম্মে মতি দাও, জ্বলে পুড়ে মর্‌ছে—ওকে শান্তি দাও বাবা!"

ব্রহ্মচারী ব্যথিত হইয়া সরমার মুখের দিকে চাহিলেন—হায়, কোন কর্ম্মফলে এই সোনার প্রতিমা আজ বিদগ্ধ—ভস্মীভূত!

ব্রহ্মচারীর ক্ষুব্ধ অন্তর হইতে একটা গাঢ় নিশ্বাস বহিল। বেদনাপ্লুতকণ্ঠে তিনি বলিলেন—

"মাকে ডাক মা, তিনিই শান্তি দেবেন, ধর্ম্মে মতি দেবেন—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পুণ্যশীলা শুদ্ধামতি হও!"

সরমা ভূম্যবলুণ্ঠিতা হইয়া ব্রহ্মচারীর অমৃতময় এই আশীষ-বাণী গ্রহণ করিল।

সরমা বিবশ, বিহ্বল! তাহার ভ্রম হইতেছিল,—শোকতাপভরা হাহাকারময় এই জগৎ ছাড়িয়া সে যেন কোন স্বর্গে, কোন পুণ্যলোকে, সঙ্গীতময় চিরানন্দময় কোন এক রাজ্যে গিয়া পঁহুছিয়াছে!

চার

পরদিন হইতে সরমা প্রত্যহই কালীবাড়ীতে যাওয়া-আসা করিতে আরম্ভ করিল। কখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে, কখন শাশুড়ীর সঙ্গে, কখন বা একাকী। আবার কখন ব্রহ্মচারীকে দেখিবে সেই প্রতীক্ষায় সে অধীর হইয়া থাকিত। ব্রহ্মচারীর নিকট যাওয়া তার একদিনের জন্যও বাদ যাইবার যো ছিল না; শতকাজ ফেলিয়াও সে তাঁহাকে দেখিতে ছুটিত। কি যাদু-মন্ত্রে যে ব্রহ্মচারী তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তা' তিনিই জানেন!

সেদিন অতি প্রত্যূষে সরমা ব্রহ্মচারী সন্দর্শনে যাইতেছিল। তখন সবে নৈশান্ধকার কাটিয়া পূর্ব্ব গগনে সোনামুখী উষার স্বর্ণ-কিরীট-রশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাছে গাছে বিহঙ্গমকুল সবে জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের নৈমিত্তিক প্রভাত-সঙ্গীতের সুর ধরিয়াছে। সদ্যনিদ্রোত্থিত সমীরণ সবে তাহার কোমল করের মৃদু স্পর্শে দিকে দিকে একটা স্পন্দন একটা শিহরণ জাগাইয়া তুলিয়াছে। কালী-বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে সরমার কর্ণে ত্রিদিবের অপ্সরী কিন্নরীগণের কলকণ্ঠের মধুর সঙ্গীতালাপের মত অপূর্ব্ব সুধাময় সঙ্গীতের এক সুর-তরঙ্গ প্রবেশ করিল। কি ললিত মধুর সে কণ্ঠ! অমিয় উৎসের মত কি মধুর সে ঝঙ্কার! প্রাণের কোন্ আবেগ উচ্ছ্বাসে আজ কি জানি কেন ব্রহ্মচারী এই শান্ত সুন্দর প্রভাতে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মধুস্রাবী সঙ্গীতের এই লহরধারা তুলিয়াছেন!

স্বপ্নজালের মত একটা মোহজাল, একটা আবেশ বিহ্বলতায় সরমা অভিভূত হইয়া পড়িল! তাহার মনে হইল, অনন্তপ্রকৃতিময়ী অনন্তরূপিনী এই বিরাট বিপুল বিশ্বে তার আর কিছুই বুঝি আবশ্যক নাই! আকুলি-বিকুলি করিয়া দুঃস্বপ্নে-গড়া তার এই ব্যর্থ জীবনটাকে বৃথা টানিয়া বহিবার প্রয়োজন কিছু নাই! চরাচর ব্যাপী অনন্ত বায়ু সমুদ্রের প্রতি স্তরভরা এই সুর, এই তরঙ্গ, এই ঝঙ্কারের তালে তালে নাচিয়া দুলিয়া লক্ষ্যহারা হইয়া অবহেলায় সে বুঝি বা মহান্ অনন্তের অসীম শূন্যপথে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে পারে!—

ব্রহ্মচারী নীরব হইলেন। সরমার স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধীরপদে মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। কালীবাড়ী তখন নীরব, এত সকালে আর কেহই ব্রহ্মচারী সন্দর্শনে আসে নাই।

এই অসময়ে সরমাকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"আজ এত ভোরেই যে সরমা, ব্যাপার কি?"

সরমা একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল—"ব্যাপার আর কি?—একটা উদ্বেগের জন্য কাল সারারাত্রি আমার ঘুম হয় নি—ভোর হ'তে-না হ'তেই তাই ছুটে এসেছি। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে ঠাকুর।"

"আমার কাছে প্রার্থনা?—কি প্রার্থনা তোমার সরমা?"

"আমি তোমার কাছে মন্ত্র নেব—আমায় গুরুমন্ত্র দিতে হ'বে।"

ব্রহ্মচারী সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন—"আমি

মন্ত্র দেব? না, না—গুরুমন্ত্র দেবার যোগ্য আমি নই—সে অধিকার আমার নাই সরমা!"

সরমা উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল—"গুরুমন্ত্র দেবার তোমারই যদি অধিকার না থাকে, তবে আর কার আছে ঠাকুর!—না, না—তোমার কোন আপত্তি আমি শুন্‌বো না; কত পুণ্যফলে তোমাকে পেয়েছি, আমার পশু-আত্মা তোমাকে মোচন কর্‌তেই হ'বে—আমি তোমার মন্ত্র-শিষ্যা হ'ব—সে অধিকার আমায় দিতেই হ'বে!"

ব্রহ্মচারী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"নিজের পশুত্ব যে মোচন করতে পারে নি, সে তোমার মুক্তির ভার কি ক'রে নেবে সরমা? আমি ভণ্ড, শুধু ভেকধারী ব্রহ্মচারী—আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা কর্‌তে চাই না—আমার উপর মিথ্যা এতখানি আস্থা তুমি রেখ না।"

সরমা স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় কহিল—"তুমি ভণ্ড?"

ব্রহ্মচারী উদ্বেলিতকণ্ঠে বলিলেন—"ভণ্ডই যদি না হ'ব, সাধন-ভজনের স্থান নির্জ্জন গিরিগুহা, বিজন অরণ্য ছেড়ে, এ লোকালয়ে তবে কেন আস্‌বো? ভোল ধ'রে লোকের ভক্তি কুড়োচ্ছি—আরাম ক'রে বসে তোমাদের সেবা নিচ্ছি—কি প্রয়োজন ছিল তার?"

সরমা কহিল—"আমাদের অতি বড় পুণ্যের জোর, তাই তুমি আমাদের দেখা দিতে এসেছ—তাই আমরা তোমাকে পেয়েছি! তুমি যদি ভণ্ড হও, আমি জান্‌বো,—এ জগতে আমার এই ভণ্ড গুরুই সাধু শ্রেষ্ঠ! আমি অন্তরে তোমাকেই গুরু বলে বরণ করেছি—তুমি যদি আমাকে দীক্ষা না দাও, জান্‌বো আমি, এ জীবনে গুরুলাভ আর আমার অদৃষ্টে নাই।"

ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ বিমনা হইয়া রহিলেন, পরে গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"এ ভব-সাগর পার হ'তে সদ্‌গুরুর আবশ্যক আছে মানি, কিন্তু তোমার মত অচলা ভক্তি যার, ঐকান্তিক নিষ্ঠা যার, সে গুরু কৃপা ব্যতিরেকেও মাকে লাভ কর্‌তে পারে। প্রহ্লাদ বনে বনে কেঁদে কেঁদে, পাগল হ'য়ে ডেকে ডেকেই ত তার হরিকে পেয়েছিল!" বড় দুঃখেও সরমার হাসি আসিল। বলিল—"প্রহ্লাদের সঙ্গে তুমি আমার তুলনা করছ ঠাকুর, ছিঃ ছিঃ! আমি জানি গুরু কৃপা ভিন্ন মুক্তি নাই। তুমি আমাকে মিথ্যা ভুলিয়ো না, আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমাকে তোমার শিষ্যা বলে গ্রহণ কর!"

ব্রহ্মচারী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তাই হ'বে—কাল প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ক'রে তুমি এসো, আমি তোমার কাণে মায়ের নাম-মন্ত্র দেব।" ব্রহ্মচারী মৌনী হইয়া নিমীলিত-নেত্রে মায়ের নাম জপে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরদিন সরমা ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষা লইল। তাহার দগ্ধপ্রাণে সে যেন কতকটা শান্তিলাভ করিল।

পাঁচ

সেদিনও সরমা অতি প্রত্যূষে ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শনে আসিয়াছিল। প্রাতঃস্নাতা হইয়া শুদ্ধ ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া গুরুদেবের পূজার জন্য সাজি ভরিয়া রক্তজবা লইয়া সে আসিয়াছিল। পরিধেয় বস্ত্রখানি তার ভরাযৌবনের পরিপ্লাবন যেন সংবরণ করিতে পারিতেছিল না—তাহার বসনাবরণ ভেদ করিয়া নিষ্কলঙ্ক শুভ্রদেহের কাঞ্চনচ্ছটা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। চরণচুম্বিত মুক্ত তার নিবিড় অলকদাম পৃষ্ঠদেশ আবরিত করিয়া গাঢ়কৃষ্ণ মেঘের মত শোভা পাইতেছিল। প্রভাতের মৃদুসমীরণে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত তার নির্ম্মল ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কুন্তলদাম ক্রীড়াচ্ছলে যেন দুলিয়া দুলিয়া আসিয়া পড়িতেছিল।

ব্রহ্মচারী ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ধ্যানভঙ্গে তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

সম্মুখেই দেখিলেন,—বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ রশ্মিজালমণ্ডিত ভাস্করখোদিত মূর্ত্তিবৎ স্থির ধীর পূর্ণাঙ্গ পূর্ণায়ত স্বর্ণপ্রতিমার মত এই সরমাকে।

ব্রহ্মচারী বিভ্রান্তনেত্রে অপলকদৃষ্টিতে সরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন্ অতীতের এক সুখ-স্বপ্নের মত একটা মোহ জড়িমায় তিনি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি কোথায় আছেন, সম্মুখে এ কাহাকে দেখিতেছেন, সহসা যেন তিনি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এ কি রূপ! এ কি মূর্ত্তি!—কোন্ দেবতা না জানি কোন্ স্বর্গের সুষমা-রাশি নিঃশেষে নিংড়াইয়া এই দেবীমূর্ত্তি গড়িয়াছেন! ভক্তিমতি প্রিয় শিষ্যা এই কি তার সরমা! ব্রহ্মচারী মুগ্ধ, আত্মহারা!

বিগলিত স্বর্ণধারার মত বালারুণের দীপ্ত কিরণজাল পত্রপল্লবের রন্ধ্রপথে বিচ্ছুরিত হইয়া সরমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। রঞ্জিত শির বৃক্ষমালা চারিদিকে স্বর্ণপুরীর স্বর্ণ-দেউলের মত শোভিতেছিল।

ক্রীড়া চঞ্চল বসন্তের প্রাতঃসমীরণ কোন বিলাসীর বিলাস কুঞ্জের কুসুম-সৌরভ বহিয়া আনিতেছিল। কত যুগের কত স্মৃতি বুকে করিয়া রক্ষাকালীর পাষাণ মন্দির ধ্যানমগ্নের মতই বিরাজ করিতেছিল। চারিদিকে ঘন-বিন্যস্ত বৃক্ষরাজির বেষ্টনী, বৃক্ষে বৃক্ষে বিহঙ্গমকুলের কল কূজন, মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে লতায় লতায় বিচিত্র কুসুমদাম!—সব মিলিয়া যেন একটা স্বপ্নলোকই গড়িয়া তুলিয়াছে!

আজ প্রভাতে তরুণ রবির অরুণালোকে সমীরণের মৃদু কম্পন, বিহগের কল কাকলী ও আকাশভরা সুবাসধারার মধ্যে সুস্নাতা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা, পুষ্পভার সাজি হস্তে দণ্ডায়মানা এই সরমাকে এক দেব কন্যা বনদেবীর মতই দেখাইতে ছিল!

ব্রহ্মচারী সহসা উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"যাও—যাও—আমার সুমুখ থেকে এখনি সরে যাও—এক মুহূর্ত্তও আর এখানে থেক না তুমি!"

সরমা স্তম্ভিত, অবাক্ হইয়া ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ঠাকুরের অকস্মাৎ আজ এ কি ভাব!

সরমা আতঙ্কবিহ্বলকণ্ঠে ডাকিল—"গুরু-দেব!"

"না না,—আমি দেব নই—গুরু নই—তুমি আমার কাছ থেকে এখনি চলে যাও!—আমি আদেশ কর্‌ছি—না, না, আমি তোমাকে মিনতি কর্‌ছি - আমার কথা রাখ!"

সরমা ভাবিতেছিল,—হায়!—একি হইল!—তার গুরুদেবের অকস্মাৎ এ ভাবান্তর কেন ঘটিল!

সে অশ্রুবিগলিতকণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য! এই ফুলগুলি তোমার পূজার জন্য এনে ছিলেম, রেখে যাচ্ছি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"না না,—ফুলের প্রয়োজন শেষ হয়েছে—পূজার্চ্চনা আজ থেকে আমার বন্ধ—পূজা আর আমি কর্‌ব না।"

সরমার বিস্ময় একটা ঘোর আতঙ্কে পরিণত হইল। কহিল—"তোমার কি হয়েছে ঠাকুর, দয়া ক'রে আমায় তুমি বল—এমন ক'রে আমায় তুমি পাগল করো না! কি হয়েছে?" "না, না,—আমি সে কথা কা'কেও বল্‌তে পার্‌বো না!- তুমি যাও—আমার কথা রাখো।"

"আচ্ছা, তবে যাচ্ছি" বলিয়া চোখের জল মুছিয়া সরমা তার সাজি লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস সে রাখিয়া গেল। প্রভাত বায়ুতে সেই গাঢ় দুঃখনিশ্বাসটুকু ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে যেন একটা অব্যক্ত মর্ম্মবেদনার সুর জাগাইয়া তুলিল।

সরমা চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী উঠিলেন। তাহার বিশাল বক্ষোপরি দীর্ঘ ভুজদ্বয় সম্বদ্ধ করিয়া

বাহুবেষ্টনে সবলে বক্ষ-পঞ্জর চাপিয়া ধরিয়া তিনি নবোদিত আরক্তিম তপনের দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দিনমণির কিরণচ্ছটায় তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল—তাঁহার দৃষ্টি আঁধার হইয়া আসিল। ব্রহ্মচারী ছুটিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া জ্বালাময় রুদ্র-নেত্রে রক্ষাকালীর পাষাণ মূর্ত্তির দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর মর্ম্মভেদী যাতনায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচারী সেই পাষাণ-মূর্ত্তির সম্মুখে লুটাইয়া পড়িলেন।

একটু বেলা হইতে-না-হইতেই ব্রহ্মচারীকে দেখিতে গ্রামবাসীরা দলে দলে আসিয়া জুটিল। কিন্তু তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল,—ব্রহ্মচারীর আসন শূন্য, ধুনী জ্বলিতেছে, ব্রহ্মচারীর সম্বল একতারা ও কমণ্ডলুটি পড়িয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মচারী নাই। গ্রামবাসীরা ভাবিয়াছিল, ব্রহ্মচারী নিকটেই হয় তো কোথাও গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন। বৃথা আশায়, নিষ্ফল প্রতীক্ষায় তাহারা দীর্ঘকাল কাটাইল, কিন্তু ব্রহ্মচারী প্রত্যাগমন করিলেন না। সহসা তাহাদের দৃষ্টি মন্দিরের দ্বারের উপর পতিত হইল। তাহারা দেখিল, মন্দিরের দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ—তখন তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ব্রহ্মচারী দ্বার রুদ্ধ করিয়া মন্দির মধ্যে কোন গুপ্ত সাধনায় মগ্ন আছেন। নিরাশ হইয়া তাই তাহারা ফিরিয়া গেল।

ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া গৃহে ফিরিয়া সরমা ছটফট্ করিতেছিল—তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, কোন কাজেই সে মন দিতে পারিতেছিল না। তার গুরুদেবের আজ অকস্মাৎ এই ভাবান্তর দেখিয়া তার মনে কত কি আশঙ্কা জাগিতেছিল। বৈকালবেলায় সে আবার তার গুরুদেবের তত্ত্ব লইতে আসিল, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ সে পাইল না।

তিন দিন কাটিয়া গেল। ব্রহ্মচারী তবুও মন্দির হইতে বাহির হইলেন না। সরমা প্রত্যহই দুই বেলা আসিয়া সংবাদ লইতেছিল, কিন্তু ব্রহ্মচারীর দর্শনলাভ তাহার ঘটিল না। কিন্তু আজ সরমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। চতুর্থ দিন সকালবেলায় আসিয়া সরমা দেখিল, ব্রহ্মচারী মন্দির হইতে বাহির হইয়াছেন, তিনি আবার তাঁহার পরিত্যক্ত আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। সরমা দেখিল, ব্রহ্মচারীর সেই চাঞ্চল্য আর নাই - তিনি পূর্ব্বের মতই আজ প্রশান্ত, গম্ভীর মুখমণ্ডলে তাঁর সেই স্বাভাবিক স্নিগ্ধভাব বিরাজমান। পূর্ব্বাহ্ণের প্রবল ঝটিকার রণরুদ্রমূর্ত্তির চিহ্ন অপরাহ্ণে যেমন কিছুই থাকে না, ব্রহ্মচারীরও তেমনি সেদিনকার সেই ভাববিপর্য্যয়ের কোন চিহ্নই আজ ছিল না। সরমাকে দেখিয়াই উৎফুল্লকণ্ঠে ব্রহ্মচারী বলিলেন—"এসেছ সরমা, আমি তোমারি প্রতীক্ষা করছিলেম।" দুর্জ্জয় অভিমানে সরমার সারা অন্তর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে কথা কহিল না, বিস্মিত-দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ব্রহ্মচারী কাতর হইয়া কহিলেন—"আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে তুমি যে প্রাণে কতখানি ব্যথা পেয়েছ, তা আমি জানি ; কিন্তু এ ব্যথা আমি তোমাকে ইচ্ছে করে দিই নি সরমা! আমি উন্মত্ত হয়েছিলেম, উন্মাদ কি না করতে পারে? আমি আজ এখনি যাচ্ছি সরমা। তোমার সঙ্গে দেখা না করে ত যেতে পারি না, তাই তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।"

ব্রহ্মচারী তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, হঠাৎ এই সংবাদ শুনিয়া সরমার রাগ অভিমান সব দূরে গেল। ব্যাকুল হইয়া কহিল—"তোমার চরণে কি দোষ করেছি ঠাকুর, যে, এত শীগ্‌গিরই তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ?"

দীপ্ত দিনমণি হঠাৎ মেঘাবৃত হইলে চারিদিক যেমন নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, সরমার সেই পরিবেদনায় ব্রহ্মচারীর মুখমণ্ডলও অকস্মাৎ তেমনি মলিন হইয়া গেল। একটা তীব্র ব্যথায় বিমর্দ্দিত হইয়া

তিনি বলিলেন—"না সরমা, তুমি কোন দোষ কর নি। পুণ্যবতী সতীলক্ষ্মী তুমি, তোমাতে কোন দোষ সম্ভবে না! নরদেহধারী পিশাচ আমি, হীন প্রবৃত্তির দাস! আপনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে এ প্রবৃত্তির মোহ আমাকে কাটাতে হবে—আজীবন অসংযমীর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে—তাই আমি যাচ্ছি!"

বিহ্বল-দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া কাতরকণ্ঠে সরমা বলিল—"তুমি জিতেন্দ্রিয়, মহাপুরুষ!—এমন কি পাতক করলে তুমি, যার জন্য তোমাকে এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?—কি হয়েছে তোমার ঠাকুর, বল—আমি তোমার শিষ্যা, কন্যাস্থানীয়া, আমাকে কিছু গোপন করো না।" "হাঃ! হাঃ! জিতেন্দ্রিয়—মহাপুরুষ!" ব্রহ্মচারী উন্মাদের মত সহসা বিকট কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"আত্মজয়ী হয়েছি ভেবে মনে বোধ হয় অহংকার হয়েছিল, মহামায়া তাই আমার সে অহংকার নিমেষে চূর্ণ করে দিলেন! মনে করেছিলেম,—আমার এ মনের পাপ মনেই গোপন রাখ্‌বো—আমার এ অধঃপতনের কথা কা'কেও বল্‌বো না, তোমাকেও নয়। কিন্তু তা' পারলেম না—আমার এ ভ্রষ্ট মতির কথা তোমায় না বললে আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হবে না!—তাই তোমাকে বলছি সরমা, শোন—"

"আজ বার বৎসর হ'ল আমি গৃহত্যাগী। আমার গৃহে রাজার ঐশ্বর্য্য, স্নেহময়ী মাতা, সন্তান-বৎসল পিতা, ভাই-বোন সবই ছিল, কোন অভাবই আমার ছিল না। সুখ অফুরন্ত হ'য়েই বুঝি আমাকে অভিষিক্ত করেছিল; কিন্তু দীর্ঘ দিন সে সুখ আমার অদৃষ্টে সইল না! দয়া-মমতা, প্রেম-ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি ত্রিদিব-দুর্লভ সৌন্দর্য্যময়ী যে দেবীরূপিনী নারীকে আমি জীবনের সঙ্গিনীরূপে পেয়েছিলেম,—যার পুণ্য-স্পর্শে আমার অন্তর সুধার হিল্লোলে ভ'রে উঠেছিল—একদিন সে হঠাৎ আমাকে এক কাল অন্ধকারে, বিশ্বব্যাপী বিরাট এক নৈরাশ্যের অতলগর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে অনন্তধামে চলে গেল! আমার বুক ভেঙে চুরমার হয়ে গেল! পঙ্গু জড়ের মত জীবনীশক্তি হারিয়ে প্রাণহীন শুধু কায়াটা নিয়ে আমি বেঁচে রইলুম।"

ক্ষণেক থামিয়া ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন—"দেশে দেশে ঘুরলাম, মন বাঁধবার জন্যে পাগলের মত কত তীর্থে ছুটে বেড়ালাম, কিন্তু সকলই বিফল হ'ল! যে শক্তিশেল বুকে বিঁধেছিল, তার অসহ্য যাতনা কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না; শেষে একদিন নিশীথ রাত্রিতে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করলাম। ব্রহ্মচারী সেজে কত সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে বনে বনে, গিরিকন্দরে কত দীর্ঘকাল কাটালুম। শেষে এক মহাপুরুষের অনুগ্রহলাভ করলাম—চিত্ত আমার শান্ত হ'ল, আমার পূর্ব্বের সকল স্মৃতি হৃদয় থেকে ধীরে ধীরে মলিন হ'য়ে এল, আমি সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণার হাত হ'তে মুক্তিলাভ করলাম! তারপর হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, কৈলাস প্রভৃতি তীর্থ ঘুরে তোমাদের এখানে এসে—" ব্রহ্মচারী একটা তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সরমা স্তম্ভিত, নির্ব্বাক হইয়া তাহার গুরুদেবের জীবনের এই করুণ-কাহিনী শুনিতে লাগিল।

ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন—"সেদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ক'রে আমার জন্য সাজি ভ'রে পূজার ফুল নিয়ে আমার সুমুখে এসে তুমি দাঁড়ালে। ধ্যান ভঙ্গে চোখ মেলে আমি তোমাকে দেখ্‌লাম। দেখে, হঠাৎ আবার কত কাল পরে আমার হারানো দেবীপ্রতিমার মুখখানি আমার লুপ্ত-ক্ষত-হৃদয়-পটে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তোমারি মত ছিল জলভরা চোখ দু'টি তা'র, তোমারি মত ঢলঢল মুখখানি, তোমারি মত নিটোল ললাট, সুবঙ্কিম এমনি দু'টি ভ্রূ, এমনি ছিল তাদের মধুর

ভঙ্গি! নবনীত এমনি গড়ন, চম্পকদামের মত এমনি বর্ণ, এমনি ছিল তার দুর্লভ রূপরাশি! তোমার সেই অতুল রূপের ছটা আমার অন্তরের শিরায় শিরায় একটা আগুন জ্বালিয়ে দিলে—আমি উন্মত্ত বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়্লাম! তোমার ভরাযৌবনে উছলিত লীলায়িত কুসুমিত দেহের উপর আমার একটা তীব্র লালসা জন্মাল। হায়, মানুষের কি মোহ, কি বিকার! চিত্ত-প্রবৃত্তি কি দুর্নিবার!" ব্রহ্মচারী সহসা নীরব হইয়া ঘন নিবদ্ধ তরুরাজির শাখাপল্লবের বিচ্ছেদ পথে অনন্ত আকাশের দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিলেন। আর সরমা? অকস্মাৎ সম্মুখে বজ্রপতন হইলে মানুষ যেমন মহাতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহার অবস্থাও তেমনি ঘটিল! ক্ষণেক স্তম্ভিত, বিহ্বল হইয়া থাকিয়া উন্মাদিনীর মত চীৎকার করিয়া সে বলিল—"অসম্ভব!"

"পাপ-পঙ্কিল এ জগতে অসম্ভব বুঝি কিছু নাই সরমা! নহিলে তুমি শিষ্যা, আমার কন্যা-স্থানীয়া—তোমার উপরেও আমার এই পশু প্রবৃত্তি! উঃ!"

অন্তরের দুর্বিসহ যাতনায় অসহ্য পরিবেদনায় উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মচারী তাঁহার সমগ্র শক্তিতে দন্তের দ্বারা অধর দংশন করিলেন। তাঁহার অধরপল্লব কাটিয়া গিয়া রক্তের ধারা বহিল। দেখিয়া সরমা আতঙ্ক বিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হায়! হায়! এ কি করলে ঠাকুর!"

ব্রহ্মচারী নিজ অবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; বলিতে লাগিলেন—"এ নর লোকে কামিনীর আসক্তি যে কতখানি প্রবল তা' আমি জান্তাম, কিন্তু সে আসক্তি বন্ধন যে এমনি দুর্ভেদ্য, এতবড় বজ্রকঠিন, তা' ত জান্তাম না!"

সরমা বিদ্যাবিতকণ্ঠে বলিল—"আমার কত বড় বিশ্বাসের মূল যে তুমি ছিন্ন ক'রে দিলে ঠাকুর, তা' তোমাকে কি বোঝাব! জগতে প্রতিপদে ঠেকে ঠেকে, প্রতারিতা প্রবঞ্চিতা হ'য়ে আঁক্ড়ে ধর্‌বার কোথাও কিছু না পেয়ে এ সংসার-সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছিলেম! দুর্ভেদ্য দুর্গের মত তোমাকে দেখে নির্ভর ক'রে দাঁড়াবার স্থান পেলাম ভেবে তোমাতেই নির্ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেম! কিন্তু এত বড় বোঝা আমার যে, তুমিও আমার ভার বইতে পার্‌লে না! বল ঠাকুর, বল গুরুদেব, শুধু একটিবার বল,—এ তোমার শুধু ভ্রান্তি, শুধু একটা মিথ্যা কল্পনা!"

ব্রহ্মচারী একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"না সরমা, এ মিথ্যা নয়—এ জ্বলন্ত সত্য—মিথ্যা ব'লে আমি আমার পাপের ভার আর বৃদ্ধি কর্‌ব না। এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত আমায় কর্‌তেই হ'বে—তাই নিজ মুখে আমার পাপের কাহিনী তোমার কাছে ব্যক্ত কর্‌লেম। তবে আসি সরমা।"

সরমা কাতর অবসন্নকণ্ঠে বলিল—"এ জীবনে আর কি কখনো তোমার দেখা পাবো না ঠাকুর?"

ব্রহ্মচারী গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"না!" তারপর তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনখানি বগলে লইয়া, তাঁর কমণ্ডলুটি হাতে করিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

সরমা আবেগভরে কহিল—"আমাকে একটা ভিক্ষা তুমি দিয়ে যাও ঠাকুর!—আমার একটিমাত্র মিনতি আছে তোমার কাছে!" ব্রহ্মচারী দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"আমার কাছে এমন কি তুমি চাও, সরমা?"

সরমা গদগদকণ্ঠে কহিলেন—"তুমি ভণ্ড হও, মহাপাতকী হও,—তবুও তুমিই আমার গুরু! আমার অন্তিম দিনে, আমার শেষ মুহূর্ত্তে তোমার দর্শন যেন আমি পাই—বল ঠাকুর, আমার এ সাধ তুমি পূর্ণ করবে?"

ব্রহ্মচারীর ললাটে একটা গাঢ় চিন্তার রেখা প্রকটিত হইল। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন—"শোন সরমা, যদি কখনো আত্মজয়ী হ'তে পারি,—তোমার গুরু হ'বার যোগ্য হ'তে পারি,—তবেই আসবো, নইলে নয়।" তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সরমা অধীরকণ্ঠে বলিল—"বেশ, তাই হোক্! আমি জানি, তুমি আসবে—আমার এ কাতর প্রার্থনা কখনো নিষ্ফল হবে না!"

বহুদিন পরে আজ আবার ব্রহ্মচারীর চোখে জল আসিল। নিস্পন্দদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া অন্তরীক্ষবাসী কোন্ দেবতার চরণে অন্তরের কোন্ ক্ষুব্ধ ব্যাকুল মিনতি জানাইয়া বাষ্পনিপীড়িতকণ্ঠে কহিলেন—"তাই যেন হয়, তোমারি পুণ্যে, আবার তোমাকে যেন আমি ফিরে পাই!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী বিদায় হইয়া চলিলেন।

ব্রহ্মচারীর একতারাটি পড়িয়া রহিল দেখিয়া সরমা ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঠাকুর, তোমার একতারাটি যে ফেলে গেলে, নিয়ে যাও।"

ব্রহ্মচারী ফিরিলেন না, বলিলেন—"আমার এ ভাঙাবুকের সুরের সঙ্গে ওই একতারার সুর আর আর মিলবে না সরমা! ও নিয়ে আমি আর কি করবো—ও থাক!"

সরমা অস্তগমনোন্মুখ হীনপ্রভ দিনমণির মত সেই গমনশীল ব্রহ্মচারীর দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মচারী আম্র কাননের দূরপ্রান্তে অদৃশ্য হইলেন। সেই সঙ্গে সরমার চোখে চারিদিক যেন আঁধার হইয়া আসিল। সরমার মনে হইল,—আচম্বিতে কোথা হইতে একটা মত্তঝটিকা আসিয়া চারিদিক যেন উলট-পালট করিয়া দিয়া গেল! তাহার মনে হইল,—মহাসাগর হইতে একটা বন্যা মত্তবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যেন একটা ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিল! সরমা ভাবিতেছিল,—শুধু দাহ, জ্বালা, হাহাকারে ভরিয়া এই বিশ্বটাকে এমনি বিপুল অনন্ত করিয়া গড়িবার ভগবানের কি প্রয়োজন ছিল? মাথা গুঁজিবার মত শান্তিময় একটু স্থানই যদি এ জগতে না থাকিল,—তবে বিশ্বের এই অনন্তরূপ অনন্ত বৈচিত্র্যের সার্থকতা কি আছে? সরমার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া একটা কাতর দীর্ঘশ্বাস বহিল। বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ব্রহ্মচারীর শেষ চিহ্ন তাঁহার পরিত্যক্ত একতারাটি তুলিয়া লইয়া ভক্তিভরে মাথায় ছোঁয়াইয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া চলিল।

মনের দেবতার ক্রুর ইঙ্গিতের কাছে মানুষ কত বড় অসহায়!—ভাবিয়া তাহার সারা অন্তর ব্রহ্মচারীর জন্য করুণায় সহানুভূতিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।
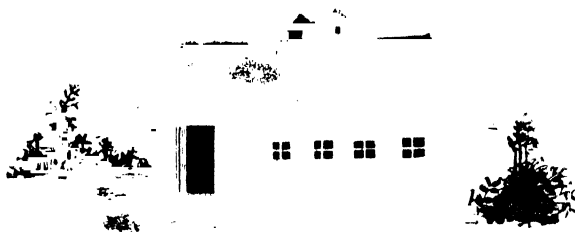
—ক্ষুধা ও সুধা—

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

এক

রাধিকার পূর্ব্ব ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও যেমন করুণ, তেমনি মর্ম্মান্তিক !

সে প্রায় তিন-চারবৎসর পূর্ব্বের কথা ।

ছাদনাতলায় কিশোরী বধূ রঙীন একরাশ আশা বুকে লইয়া বর জানকীনাথের সহিত শুভ দৃষ্টি করিল। খুসীতে তাহার ছোট বুকখানি দুলিয়া দুলিয়া উঠিল। তাহার ঠোঁটের মৃদু হাসিটুকু, চোখের চপল দৃষ্টিটুকু সখী ও পুরনারীগণের অন্তরে তৃপ্তির লহরই বহাইয়া দিয়াছিল ।

জানকীনাথেরও কম হয় নাই। দ্বন্দ্ব সংশয়ের ভিতর দিয়া জীবন পথের ভাবী সাথীটির প্রতি চাহিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ।

প্রথম শুভদৃষ্টিতে উভয়ের অন্তর্লোক উভয়ের কাছে বহু পরিচয়ের যোগসূত্র দ্বারা একই সুরে রণিয়া উঠিল !

বাসর-ঘরে সুরের প্লাবন ভেদ করিয়া চকিত জানকী 'আসছি' বলিয়া ছাদের কোলাহল লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। একজোড়া জুতা চুরি লইয়া বর ও কন্যাপক্ষ গালাগালি হইতে হাতাহাতিতে মাতিয়া গিয়াছে। ভীষণ মারামারির মাঝখানে যখন চেলিপরা বর খালি পায়ে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কন্যাপক্ষীয় একজন পাশ হইতে একটি ছোট বাঁশ টানিয়া কয়েকজন বরযাত্রীর মাথা লক্ষ্য করিয়া তুলিতেই জানকী তাহা নিবারণ করিতে যাইল, ফলে সেই সমুদ্যত আঘাত সজোরে তাহার মাথায় লাগিতে সে সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত দেহ লইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে আরো তিন চারজন আহত হইল ।

জানকীর রক্ত দেখিয়া সেই মুহূর্তে দানবী-লীলা থামিল বটে, তাহাকে কিন্তু হাসপাতালে পাঠাইতে হইল ।

উৎসবের হাসি বাঁশী-গান থামিয়া গেল। শূন্য বাসরে সখীর কোলে মাথা গুঁজিয়া রাধিকা ফোঁপাইয়া উঠিল। পুলিস আসিয়া জনকয়েক লোককে বাঁধিয়া লইয়া গেল ।

* * *

তিনদিন পরে হাসপাতাল হইতে জানকীকে বাড়ী আনা হইলে রাধিকার খোঁজ পড়িল ।

জানকীর মা বলিলেন—"না, সে রাক্ষসীর মুখ আমি দেখ্‌বো না, বাছাকেও আর দেখাব না। সে আমাদের কেউ নয়।"

জানকীর বাবা বলিলেন—"তা' কি হয়, মার আমার দোষ কি ? জোর ক'রে 'আমাদের নয়' বললেও শাস্ত্র ছাড়বে কেন ? মার মুখ দেখ্‌লে তোমার আর ও কথা মনে হবে না গিন্নি!"

সেই দিন রাত্রেই রাধিকা আসিয়া চেতনাহীন স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িতে জানকীর মা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন ।

আরও পনের দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর যমই জয়ী হইল ।

চীৎকার করিয়া জানকীর মা পুত্রের দেহখানাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং জানকীর বাবা রাধিকাকে নিঃশব্দে বুকে টানিয়া লইলেন ।

তখন হইতে রাধিকা শ্বশুর-গৃহেই রহিয়া গেল ।

পিতা লইতে আসিলে রাধিকা স্পষ্টই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, বোধ হয় আর তাঁহাদের কোলে তাহার ফিরিয়া যাওয়া ঘটিবে না ।

কাতর-বিস্ময়ে পিতা বলিলেন—"কেন মা,

এখন দিনকতক আমাদের ওখান থেকে ঘুরে এলে মনটা অনেকটা শান্ত হ'ত।"

পনের বছরের বাঙ্গালীর মেয়ে রাধিকা শ্বশুর-গৃহে নিজের অবস্থা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, তাই পিতাকে দৃঢ়ভাবেই প্রত্যাখ্যান করিতে তাহার বাধিল না। বলিল—"এখানে আগে আমার নিজের ঠাঁইটুকু পেতে নি বাবা, যদি যাবার দিন আসে, আমি নিজেই যাব—"

সজল-চোখে পিতা ফিরিয়া গেলেন।

দুই

দিন যায়।

শ্বশুর 'বউমা' বলিতে অজ্ঞান, শাশুড়ী ফিরিয়া চাহেন না, রাধিকা দু'জনারই চোখে চোখে ঘুরিয়া বেড়ায়। শাশুড়ীর স্নেহদৃষ্টির তলে আশ্রয় পাইলে যেন সে বাঁচিয়া যায়!

সংসারে ভূতের মত খাটিয়া যায়, প্রয়োজনের বেশী কথা বলে না, নঃশ্বাসের পাহাড় মনের ভিতরটাকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তোলে, থাকিয়া থাকিয়া রাধিকা কাঁপিয়া উঠে!

অবসরটুকু নিজের ঘরেই কাটায়। এটা-সেটা গুছাইয়া, জানকীর ব্যবহৃত জিনিষগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া, তাহার ফটোখানি এ দেয়াল হইতে ও দেয়ালে, সেখান হইতে শিয়রে খাটাইয়া ক্ষীণ স্মৃতিকে যেন সে বাড়াইয়া তুলিতে চায়! মনের মধ্যে হাতড়াইয়া বিশেষ কিছু পায় না কি না!

একটি জীবন্ত স্মৃতিকে রাধিকা সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিল—সেটি জানকীর বিলাতী কুকুর।

সে শুনিয়াছিল কুকুরটি স্বামীর কত আদরের, কেমন করিয়া তিনি তাহার সেবা করিতেন, তাই রাধিকা কুকুর লইয়া পড়িল।

শাশুড়ী বাঁকা চোখে চাহিতেন, শ্বশুর খুবই হাসিতেন। কাজের ফাঁকে নিত্য-নূতন সাবান দিয়া কুকুরকে স্নান করান, ভাল তোয়ালে দিয়া তাহার গা মুছান, ভাল খাবারের ব্যবস্থা করা, তাহার জামা তৈয়ারী করা, তাহাকে বুকে করিয়া আদর করা, রাধিকার যেন কেমন একটা নেশা ধরিয়া গেল।

কুকুরটাও তাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

বাড়ীর লোক অসন্তুষ্ট হইয়া বলে—"মা গো, কুকুর ঘাঁটা কি বাপু! কুকুর ছুঁয়ে গেরস্ত-ঘরের কাজ চলে?—"

পাড়ার লোক ঠাট্টা করিয়া বলে—"আহা, কুকুর নয় ত—যেন পেটের বেটা!"

রাধিকা হাসিয়া সব শুনিয়া যায়, তারপর কুকুরটাকে ছেলের মত কোলে করিয়া আদর করিয়া নাচায়, বলে—"ও রে আমার কেলো রে —ও রে আমার ভুলো রে—ধন আমার, নীলমণি আমার, দুধ খাবার সময় হয়েছে তোমার, তাই বুঝি ছটফট্ করছ?"

রাধিকার বড়দিদি সেদিন রাধিকাকে দেখিতে আসিয়াছিল। দিদিকে প্রণাম করিয়া রাধিকা হাঁকিল—'ভুলো'—সঙ্গে সঙ্গে ভুলো ছুটিয়া আসিয়া কোলে উঠিল।

দিদি বলিলেন—"বেশ কুকুরটা ত—লোম-গুলো যেন পশম!"

রাধিকা হাসিয়া বলিল—"কুকুর ত নয়, তোমার বোনপো! বাবা ভুলু, মাসীমারা এসেছেন, নম কর।"

ভুলো মাসিমার পায়ে মুখ গুঁজিল। রাধিকা বলিল—"আজ মাসীমা অনেক খাবার এনেছেন রে—আজ আর দাদুর মার খেতে যাস নি— এখন যা' নতুন ভায়েদের সঙ্গে খেলা কর্‌গে যা—"

রাধিকার রকম দেখিয়া বড়দি'র চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

একমাত্র ভয় করিত রাধিকা—দীর্ঘ রাত্রিটাকে।

দিনের আলো হারাইয়া নিঃসঙ্গ ক্লান্ত শরীরে যখন সে ঘরটিতে ঢুকিয়া নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইত, তখন অন্তরাত্মা তাহার

শিহরিয়া উঠিত! ভাবিত,—দিনের পর রাত্রি কেন আসে? এ দীর্ঘ রাত্রি সে কাটাইবে কেমন করিয়া? ভুলোটা যদি সারা রাত জাগিয়া থাকিত!

মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের পানে সে সভয়ে উঁকি দিয়া কাঁদিয়া উঠিত! কে জানে কতদিন তাহার জীবনটাকে এইভাবে টানিয়া চলিতে হইবে! মনে হয় এমন করিয়া আর সে পারিবে না! সে বাঁচিতে চায়;—আলো চায়, বায়ু চায়, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময়ী ধরণীর মাঝখানে আর পাঁচ-জনার মত ভোগ চায়, বিলাস চায়, দরদী চায়! একটা বিকট চীৎকারে ওই বিপুল আকাশটাকে চৌচির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে,কিন্তু শক্তি নাই! অবসন্ন দেহে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া সে সূর্য্যো-দয়ের প্রতীক্ষা করে।

শেষে ভুলো পর্য্যন্ত সেদিন তাহাকে ছাড়িয়া গেল, সেদিন রাধিকা প্রকাশ্যে কাঁদিয়া উঠিল এবং সেইদিন প্রথম শাশুড়ি আসিয়া সস্নেহে তাহার মাথাটি কোলে তুলিয়া নিঃশব্দে তাহার সারাদেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

দুইটি সমব্যথীর শূন্যহৃদয় উভয়ের প্রতি সম-বেদনায় পূর্ণ হইয়া সেইদিন বুঝি প্রথম চোখের জলে উভয়ের যোগসূত্র গ্রথিত হইল।

তিন

শ্বশুর বাড়ীর ভিতর আসিয়া ডাকিলেন—"মা, একবার এদিকে এস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—"

রাধিকা নিঃশব্দে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে তিনি বলিলেন—"পাশের গ্রামের এক হতভাগা আমার কাছে এসেছে মা, ঠাকুর বিক্রি করতে। বিদেশ যাচ্ছে চাকরী করতে, বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই সেবা করবার, তাই আমার কাছে এসেছে। তুমি যদি ভারটি নিতে পার, আমি ঠাকুর রাখি।"

একটুও না ভাবিয়া সাগ্রহে রাধিকা বলিল—"খুব পারব বাবা, আপনি নিয়ে আসুন ঠাকুর—"

ঠাকুর দেখিয়া রাধিকা উল্লসিত হইয়া উঠিল। কাল পাথরের যুগলমূর্ত্তি—নাম ব্রজদুলাল।

সমারোহে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইল। কুকুর 'ভুলো'কে ভুলিয়া রাধিকা ঠাকুর ব্রজদুলালকে লইয়া পড়িল।

ব্রজদুলালের পূজার ভার রাধিকা নিজে গ্রহণ করিল। মনের মত করিয়া ঠাকুরঘর সাজাইল। জানকীর শূন্য টবে নূতন করিয়া ফুলের গাছ লাগাইল।

বাসরঘরে তাহার প্রাণে যে সব গানগুলি সুর হারাইয়াছিল, ব্রজদুলালকে দেখিয়া তাহারাই আবার ভাষায় ছন্দে সুরে নূতন করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর, ও পাড়ার জন-কতক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া রাধিকা জানকীর পুরাতন হারমোনিয়ম টানিয়া বাহির করিয়া ঠাকুরঘর সুর-মুখর করিয়া তুলিল।

এতদিন মাছ খাইত, এবার রাধিকা মাছ ছাড়িল, এতদিন তেল মাখিত, এবার তেল ছাড়িল, নরুণ পাড় ছাড়িয়া সাদা থান পরিল, যে দু'-একখানি ভূষণ গায়ে লাগিয়া ছিল, তাহা হইতে সে নিজেকে নিঃশেষে মুক্ত করিল। উনিশ বছরের জীবনকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নিজেকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া রাধিকা যেন ব্রজদুলালের শুদ্ধ পূত নির্ম্মাল্যের আধার রচনা করিল।

নিজে পূজার আয়োজন করে, ভোগ রাঁধে, বিলাইয়া প্রসাদ পায়। ছেলেমেয়েদের গান শেখায়, রাত্রে আরতি দেয়,এখন আর দীর্ঘ রাত্রির একাকীত্ব তাহাকে ভয় দেখায় না। মন যেদিন চঞ্চল হয়, সারারাত্রি ঠাকুরঘরে কীর্ত্তন গাহিয়া কাটায়।

জানকীর ফটোখানি সিংহাসনে ঠাকুরের পৃষ্ঠ পট করিয়া রাখিয়াছে, সে ঘরে সময় বিশেষে ছোট্ট ছোট্ট কীর্ত্তনীয়া শিষ্য-শিষ্যা ব্যতীত রাধিকা অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া মনের গোপন দুর্গের মতই শান্ত মৌন ও মনোরম করিয়া রাখিয়াছে।

মাঝে মাঝে শ্বশুর শাশুড়ি বিগতচেতনা তপঃখিন্না, মূর্ত্তিমতী সাধনার সুর-সাধনায় বাধা দিতে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া যান। ঘরের মধ্যে তখন সুরের প্লাবন বহিয়াছে—

"ও তার প্রেমের সুধায় কি আনন্দ!—
ভব-ক্ষুধা যায় দূরে,
গা' তোরা মধুর সুরে!"

—পথের সঙ্গী—

শ্রী রেবা দত্ত

ছুটির দিন ছাতে 'বসে কল্পনার রাজ্যে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছি কি করি? মনে হল মাসীর চিঠি বা কোন খবর পাই নি। মনটা কেমন উতলা হ'য়ে উঠলো; থাকতে পারলুম না। রাস্তায় নামা গেল। শেয়ালদহে এসে সোদপুরের টিকিট কেটে মাসীর বাড়ী রওন হয়ে পড়লুম। কিন্তু গাড়ীটা একদম ফাঁকা; মনটা বড় দমে গেল। এতখানি রাস্তা কি করে মুখ বুঁজে যাই। কিন্তু নিরুপায়ের দৈব সখা: একটি লোক এসে আমার একটু দূরে বসলো; যাহাহোক তাকে দেখে আমার মনে বেশ আনন্দ হল। ট্রেন ছাড়লে লোকটীর সঙ্গে আলাপ জমাবার আশায় তাঁর কাছে এগিয়ে গেলুম।

সে কিন্তু নির্ব্বিকার; শেষে বাধ্য হ'য়ে নিজেই কথা বল্লুম; জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার নামটী জানতে পারি কি! যেই এই কথা বলা এই সে মারে আর কি? বল্লে, আপনার সে খোঁজে দরকার আমি বল্লুম, কিছু না; একলা যাব, তাই একটু গল্প করতে এলুম। উত্তর দিলে, আমাকে কি তুমি স্ত্রী পেয়েছ যে প্রেমালাপ করবে? আমি ত হতভম্ব! নিশ্বব্দে চুপচাপ বসে রইলুম।

শেষে সন্ধ্যায় সোদপুরে নামার সময়, দেখলুম সেও নামলো। তাড়াতাড়ি টর্চ্চটা আনতে ভূলে গেছি; বহুকষ্টে অন্ধকারের মধ্যে এগুতে লাগলুম হঠাৎ সামনে দেখি ট্রেনের সেই লোকটা হেটে চলেছে। আমি অবাক হয়ে গেলুম! কি ক'রে সে আমার চেয়ে এগিয়ে গেল! পাশাপাশি যাবার রাস্তা যখন নেই, পিছনের লোক আগে যায় কি করে? যাক, আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছি, কথা বলার সাহস নেই, তাড়ার ভয়, তবু ত সঙ্গী হ'ল। খানিক গিয়ে সে পেছনে চাইলে আর বল্লে,ও আমার পিছু নেওয়া হ'য়েছে, সেই জন্যে বুঝি এত আলাপ জমাবার চেষ্টা—আচ্ছা, আমি এই দাঁড়ালুম! কি করে যাবে যাও।

কি করি? চললুম। পথটা জানা, এই আমার সৌভাগ্য। খানিক চলার পর মনে হল মাসীর বাড়ী এলুম। দরজায় ঘা দিলুম দরজা খুলে গেল। কিন্তু বাড়ীটা নিঝুম ভেতরে গেলুম মাসী বলে ডাকলুম! সাড়া পেলুম চাপাগলায় ঘরের ভেতর থেকে। সেইঘর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলুম। মাসী গায়ে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। আমি ক্ষুন্নমনে বল্লুম, মাসী, তোমার হল কি? মাসী ঢাকা খুলে হেসে উঠলো। চেয়ে দেখি, সেই লোকটা! কি করে সে আমার আগে এসে এরকম করে শুয়ে রয়েছে—ভেবেই পেলুম না মনে হ'ল উপদেবতা নয় ত? সে খিল খিল করে হেসে বললে, ঠিক ঠিক আমি তাই রে আমি তাই। ভয়ে সজ্ঞা হারা হয়ে গেলুম! সম্ভব একটা বিকট চিৎকার করে ছিলুম।

চোখ চেয়ে দেখি অন্যঘর। মাসীর ক্রোড়ে মাথা, তবুও ভয়ে গা কেঁপে উঠলো মাসী বল্লে ভয় নেই আমি তোমার সত্যিকারের মাসী। এবার যখন আসবে খবর দিও, রাত্রে একলা এলে এইরকম হয়।

ঘর ভাড়া দিয়েছিলুম। সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, তারপর থেকে যে এ বাড়ীতে রাত্রে আসবে মনে করে তাহাকেই অমনি বিপদে ফেলে। তোমাকে ঐ কথা জানিয়ে কাল চিঠি দিয়েছি দিনের গাড়ীতে এসে যাহয় একটা ব্যবস্থা করার জন্য। তুমি পাবার আগেই বোধহয় বেরিয়েছ।

—হারানোর সন্ধানে—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ হালদার

কলিকাতা শহরের উত্তর দিক্‌টায় একটা নাতিপ্রশস্ত রাস্তা ধরিয়া এক ভিখারী করুণ সুরে হাঁকিয়া চলিয়াছে—"বাবু, অন্ধকে একটা পয়সা, বাবু-উ উ-উ !…"

দূরের কোন্ এক বাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল। শীতের রাত্রি - এরই মধ্যে পথে লোকচলাচল কমিয়া গিয়াছে—আরো খানিক পরে আরো কমিবে। চারিদিক গাঢ় কুয়াসায় লেপিয়া অন্ধকার। দূরের আলোগুলি সেই আঁধার কুয়াসায় আপনাদের ক্ষমতার অনেকখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাত তিনেক অন্তরের মানুষগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায় না। আকাশে তারাগুলি কুয়াসার লেপের তলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে যেন—। শুক্লা পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ কুয়াসার ভিতর দিয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না ; উহার ম্লান জ্যোৎস্না কুয়াসার ভিতর দিয়া আরো ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। রাস্তায় গাড়ীগুলি 'হেড্‌লাইট্' জ্বালাইয়া সতর্কভাবে যাওয়া আসা করিতেছে। কিন্তু এ কুয়াসা অন্ধের কি আর অসুবিধা করিবে !…

অন্ধ অবিরাম হাঁকিয়া চলিয়াছে—"বাবু, অন্ধকে একটা পয়সা, বাবু-উ উ-উ !"…

পরণের কাপড়খানি ওর বড় ময়লা ;—হইবারই কথা। হাতের লাঠিগাছি বেশ মোটা মজবুত ; এই জনাকীর্ণ সহরতলীতে উহাই ওর সম্বল।

অন্ধ চলিয়াছে। কেহ হয় ত দয়া করিয়া একটা পয়সা ওর হাতে ফেলিয়া দেয়, ও দাঁড়াইয়া অন্তরের অন্তস্থল হইতে দাতার শুভকামনা করে। তারপর আবার পথ চলে।

রাস্তার একটা নিরাপদ কোণ বাছিয়া লইয়া একটা কুকুর হয় ত আরামে ঘুমাইতেছিল। ওর লাঠি হঠাৎ তাহার গায়ে পড়ায় সে বেচারা 'কেঁউ' করিয়া লাফাইয়া উঠে। ও হাত দুই পিছাইয়া যায়।

রাস্তার কোনো বয়াটে ছেলে হয় ত পয়সা বলিয়া ওর হাতে ইটপাটকেল ফেলিয়া দেয়। কেহ কেহ হয় ত আবার টিনের চাকতি দিয়া উপহাস করে।

ও রোজ ভিখ মাগে ;—কি করিবে, ওর ত আর কোনো উপায় নাই। কোন্ এক খোলার বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া লইয়া ওরা অনেক দিন হইতে আছে। ঘরে ওর বৌ, আর একমাত্র সন্তান বছর পাঁচেকের মাণিকলাল। ও ভিক্ষায় যাহা রোজগার করে, তাহাতে ওদের চলে না, তাই ওর বৌ কয়েক বাড়ী বাসন মাজিয়া কিছু উপায় করে। তাহাতেই ওদের দিন কোন-রকমে কাটিয়া যায়।

আজ ও অনেক কিছু রোজগার করিতে পারিয়াছে ;—অন্যান্য দিন অতটা পারে না। আজ দিন তিনেক হইল মাণিকলালের জ্বর হইয়াছে ;—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা উপসর্গও দেখা দিয়াছে। আজ সকালে তাহার অবস্থাটা একটু খারাপের দিকেই গিয়াছিল। ছেলে কোলে করিয়া ওর বউ ওর সাথে নিকটবর্ত্তী দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়াছিল। ডাক্তারবাবু ঔষধ দিয়াছেন এবং দুধসাগু পথ্য দিয়াছেন। আর বলিয়া দিয়াছেন, আঙ্গুর, বেদানা, আপেল এই রকম সব ফল খাওয়ান দরকার। ঘরে কিছুই ছিল না। তাই ছেলের অবস্থা দেখিয়াও ওকে

বাধ্য হইয়া বাহির হইতে হইয়াছে এবং সারাটা দিন প্রাণপণে হাঁকিয়াছে—"বাবু, অন্ধকে একটা পয়সা বাবু-উ-উ-উ !…"

এই পথটা ধরিয়া ও এখন ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে। ছেলের জন্য বেদানা, আঙ্গুর, কাশীর পেয়ারা, আপেল আর কমলা লেবু কিনিয়া লইয়াছে। আজ এক বাবুকে নিজের দুঃখের কথা বলায় তিনি ঝনাৎ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়াছেন। টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া ও খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চলপদে দাড়াইয়া ছিল। তারপর যখন আবেগ-কম্পিত স্বরে বাবুর শুভকামনা জানাইয়া ছিল, তখন তিনি চলিয়া গেছেন। বাবুটি ওর দুঃখ বুঝিয়াছিলেন। মাণিকলালের কথা শুনিয়া বোধ করি তাঁহার হারিয়ে যাওয়া আর একটি ছেলের কথা মনে পড়িয়াছিল —তাই তাহাকে স্মরণ করিয়া তিনি টাকাটি দান করিয়াছিলেন। তাই ও ছেলের জন্য অনেক কিছু কিনিয়া ফেলিয়াছে। হাতে সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে মাত্র। তা' হোক্—ওরা না হয় দিনকয়েক আধপেটা খাইয়া থাকিবে।

এই পথটা ফুরাইলেই রাজপথে পড়িবে; তারপর দক্ষিণ দিকে খানিকটা চলিয়া একটা গলির মধ্যে ওদের ঘর। আর বেশী দেরী নাই—জোর মিনিট দশেক। বৌ হয় ত ওর অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। মাণিকলাল হয় ত এতক্ষণ ওর অপেক্ষায় ছিল—কিন্তু এখন হয় ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইয়া ও যখন তাহার সম্মুখে ফলগুলি রাখিবে, তখন তার মুখখানি কিরূপ খুসিতে ভরিয়া উঠিবে! ও কল্পনা করিতে পারিল না—ও যে জন্মান্ধ। কিন্তু আনন্দে সে কি বলিবে, তাহা যেন ও স্পষ্ট শুনিতে পাইল—ভগবান ওকে কালা করেন নাই বলিয়া ও মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইল।

ভাবিতে ভাবিতে ও পথ চলে। হয় ত হঠাৎ একটা হোঁচট্ লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যায়—একটু রক্তও বা'র হয় হয় ত—তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উৎসাহে ও আবার পা বাড়ায়। ভাবে, এখন মাণিক হয় ত অনেকটা ভাল আছে—জ্বরটা কমিয়া গেছে বোধ হয়। কিন্তু—কিন্তু—জ্বরটা যদি বাড়িয়া গিয়া থাকে—যদি—যদি . ! ও আর ভাবিতে পারে না। মাণিকই তাদের একমাত্র সন্তান—সারাজীবনের পুঁজি—বৃদ্ধ বয়সের আশাভরসা—যেমন লাঠিটা! ভগবান কি এতটা নির্দ্দয় হইতে পারেন? হাত দুইটা একবার কপালের কাছে তুলিয়া খুব তাড়াতাড়ি ও পা ফেলিতে থাকে।

পথটা পার হইয়া ও রাজপথে আসিয়া পড়িল। অবিরাম গাড়ীঘোড়ার স্রোত রাজপথ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। ট্রাম, মোটরবাস, ট্যাক্সি, রিক্স, গরু-মহিষের গাড়ী আর ঘোড়ার গাড়ী অবিরাম এধার-ওধার ছুটাছুটি করিতেছে। পথ পরিষ্কারের অপেক্ষায় ও ফুটপাথের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

—"এই যে কুঞ্জ, এখানে আর দাঁড়িয়ে কেন? যাও, বাড়ী যাও।"

কুঞ্জ চিনিল সে রাখাল। তাহাদেরই খোলার বস্তিতে ও একখানা ঘর লইয়া একা থাকে। রাখালের কথার ধরণ দেখিয়া কুঞ্জ আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠে।

কম্পিতস্বরে সুধায়—"মাণিক ভাল ত?"

রাখাল বলে—"যাও, বাড়ী গেলেই জান্‌তে পার্‌বে—শীগ্‌গির যাও।"

কুঞ্জ চেঁচাইয়া উঠে—"এ্যা! তবে কি মাণিক নেই! সত্যি বল রাখাল, মাণিক কি নেই?"

আর ঢাকিবার পথ নাই দেখিয়া রাখাল অবশেষে বলে—"না, ঘণ্টাখানেক আগেই হয়ে গেছে। যাও, বাড়ী যাও, বৌ তোমার পাগলের মত হয়ে গেছে—কেঁদেকেটে চুল ছিঁড়ে মাথা

খুঁড়ে হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়েছে, সবাই মিলে ধ'রে রেখেছে। যাও, তুমি বাড়ী যাও।"

আর ও বাড়ী যাইবে! আজ সারা দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গলা ফাটাইয়া ও কাহার জন্য এত ফলমূল কিনিয়াছে! কাহার কথা ভাবিয়া ও দুর্ব্বল দেহে এত বল পাইয়াছে! নাই, নাই, ওদের এক সন্তান সারা জীবনের পুঁজি—বৃদ্ধ বয়েসের সম্বল মাণিক নাই! সে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে!

ওর মাথায় বজ্রাঘাত হয়! মাথাটা হঠাৎ বোঁবোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠে—চোখের সাম্‌নে সব কিছু বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতে থাকে। "বাবা মাণিক রে!" বলিয়া ও পথের উপরেই 'ধপ্‌' করিয়া বসিয়া পড়ে—দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটি হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিতে থাকে। কোঁচড় হইতে মাণিকের জন্য কেনা ফলগুলি রাস্তায় গড়াইয়া পড়ে।...

রাখাল তখনো দাঁড়াইয়া ছিল। সে যতগুলি পারে কুড়াইয়া আবার কুঞ্জর কোঁচড়ে তুলিয়া দেয়। আঙুরগুলি প্রায় সবই কাদায় পড়িয়া নষ্ট হয়—একটা পেয়ারা গাড়ীর চাকার তলায় পিষিয়া যায়। আর একবার ওকে বাড়ী যাইতে বলিয়া একটা বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে রাখাল আর একদিকে চলিয়া যায়।

খানিকটা পরে কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়ায়। বুকজোড়া একটা সুতীব্র হাহাকার লইয়া ও ঘরে যাইবার জন্য রাজপথে পা বাড়ায়। দূর হইতে একটা মোটরের 'হর্ণ' ঘন ঘন বাজিতে থাকে। শব্দটা ওর কাণে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু মর্ম্মে আঘাত করে না। ও তখন আপন-মনে অগ্রসর হইতে ছিল। গাড়ীখানি প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিতে থাকে—ড্রাইভার ব্রেক্‌ কষিতে কষিতে সেখানি ওর উপর আসিয়া পড়ে। চারিদিক হইতে একটা ভীতি-বিহ্বল কোলাহল উঠে। কুঞ্জ পড়িয়া যায়—একেবারে চাকার তলায়।...

তারপর যখন পুলিশ ওর বিকৃত দেহ-পিণ্ডটাকে গাড়ীর তলা হইতে টানিয়া বাহির করে, তখন ও তার হারাণ মাণিকের সন্ধানে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কে জানে ? ..

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ { শ্রাবণ ১৩৩৮ } চতুর্থ সংখ্যা

—দুর্ব্বলের বল—

৺যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

[৺যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কথা-সাহিত্যে অপরিচিত নহেন; তাঁহার রচিত 'দুর্ব্বাদল', 'বিল্বদল', 'পুষ্পদল' প্রভৃতি গল্প-পুস্তকই এ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এক সময়ে কথা-সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহার অভাব আজ আমরা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি।

শ্রদ্ধেয় কবি-বন্ধু, দরদী সমালোচক, রসবেত্তা, বাঙলা-সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা যতীনবাবুর কয়েকটী গল্পের পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি। ক্রমে ক্রমে সেইগুলি 'গল্প-লহরী'র পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিব। এই সুযোগে কালিদাস-বাবুকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। সম্পাদক]

এক

ভৈরবচন্দ্র সিংহ কাঞ্চনপুরের অমিতপ্রতাপ জমিদার। কঠোর তেজস্বিতা এবং দুর্দ্ধর্ষ দৃঢ়তার জন্য সকলেই তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। তাঁহার বিশাল পেশীবহুল দেহের কোন অংশে যে দৈবক্রমে হৃদয় বলিয়া কোন একটা কোমল পদার্থের অস্তিত্ব থাকিলেও থাকিতে পারে, এমন সন্দেহও সহজে লোকের মনে উদিত হইত না। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাস্রোত দুর্দ্দমনীয় নদীস্রোতের মত দুর্ব্বার বেগে প্রবাহিত হইত এবং কোন প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইলে নদীর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়া বাধাপ্রদানকারীকে সবলে অতলে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। ইহাতে আত্মীয়-পর বিচার ছিল না।

ভৈরবচন্দ্র অপুত্রক। তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা সৌদামিনী ও সুহাসিনী উভয়েই পতিপুত্র-সহ পিতৃগৃহবাসিনী। তাহাদের প্রতিও ভৈরবচন্দ্রের বিশেষ প্রীতিবাহুল্য দেখা যাইত না। মনে হইত তাহাদের পিতৃগৃহবাসের মূলে স্নেহবাহুল্য অপেক্ষা ধনীগৃহের চিরাগত প্রথার প্রভাবই অধিক।

ভৈরবচন্দ্রের পত্নী জীবিতা ছিলেন, কিন্তু

তাঁহার জীবনের লক্ষণ বড়-একটা দেখা যাইত না। সূর্য্যের কলঙ্কবিন্দুর ন্যায় স্বামীর দুঃসহ তেজঃপ্রভার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াই থাকিতেন। তাঁহার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিষাদের কথা কেহই জানিতে পারিত না।

মথুরাপুর ভৈরবচন্দ্রেরই জমিদারীভুক্ত। আজ মথুরাপুরের কাছারীতে বড় ধূম। নূতন জমিদার আজ জমিদারী পরিদর্শনে আসিয়াছেন। মথুরাপুর পূর্ব্বে দেবীপুরের রায়চৌধুরীদের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তিন বৎসর হইল ভৈরবচন্দ্র এই জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মথুরাপুরে আসার সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং নূতন 'মহালে' নূতন জমিদারের এই প্রথম আগমন।

কোন নূতন জমিদারীতে প্রথম গমন করিবার সময় রীতিমত সমারোহের ব্যবস্থা করা ভৈরবচন্দ্রের রাজনীতির অন্তর্গত ছিল। তিনি বলিতেন যে, শাসনের প্রারম্ভে জমিদারের অমোঘ প্রতাপের কথা একবার নূতন প্রজাদের ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিলে উত্তরকালে জমিদারী শাসনের বিশেষ সুবিধা হয়। সুতরাং ক্ষুদ্রপল্লী মথুরাপুর আজ জমিদারের হস্তী, অশ্ব, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতির সাড়ম্বর ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

পল্লী-মহিলারা ঘাটে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া জমিদারের অমিত ঐশ্বর্য্যের নিপুণ সমালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিল, ছেলেরা হস্তীশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই অতিকায় জন্তুর আকৃতি-প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণে নিরত হইয়াছিল এবং বয়স্ক পুরুষেরা নায়েবের আদেশে করযোড়ে কাছারী বাড়ীতে জমিদারের আদেশ প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছিল। অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে ;— পশ্চিমের মেঘশিশুগুলি যেন বিচিত্রবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আকাশের আলোকিত ক্রীড়াঙ্গনে খেলা করিতে আসিয়াছে। তরুশিরে কিরণের স্বর্ণমুকুট শোভা পাইতেছে। কুলায়গামী বিহঙ্গ কণ্ঠে বিশ্ববিধাতার স্তুতিগাথা গীত হইতেছে। ভৈরবচন্দ্র সান্ধ্যভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

কাছারীর সম্মুখে বিশালকায় হস্তী সুসজ্জিত বেশে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বালক-বালিকারা অনিমেষ লোচনে ইহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী এবং সাজসজ্জা অপরিসীম বিস্ময়ে অবলোকন করিতেছিল। কোন কোন সাহসী বালক হাতি কলা খাবি? বলিয়া মাতঙ্গবরের সঙ্গে রহস্য করিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহার ঈষৎ শুণ্ডাস্ফালন মাত্রেই 'ওরে বাবারে' বলিয়া শতহস্ত দূরে ধাবমান হইতেছিল। বালিকারা বিচিত্র সুরে ইহার উদ্দেশে নানা স্তুতিগাথা উচ্চারণ করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ইহার আদর্শে ইন্দ্রের ঐরাবতের একটা অস্পষ্ট ধারণা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময়ে সহসা চারিদিকে সসম্ভ্রম-বাণী উচ্চারিত হইল "ওরে রাজা আস্‌চেন!" শুনিবামাত্র যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। যাহারা নিতান্ত সাহসী, তাহারাই কেবল দূর বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া ভয়ে ভয়ে বহুমূল্য পরিচ্ছদভূষিত ভৈরবচন্দ্রের প্রতি গোপন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ভৈরবচন্দ্র গম্ভীরভাবে হস্তীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া শিশুকণ্ঠে বলিল 'দাদা আমি আতি চ'বো।' ভৈরবচন্দ্র মুখ ফিরাইয়া গোধূলির অরুণালোকে দেখিলেন অকলঙ্ক পুষ্পকলিকার মত একটী অনিন্দ্যসুন্দর শিশু তাহার বিশাল নয়ন মেলিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! ভৈরবচন্দ্র শিশুর দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে কহিলেন, 'হাতী চড়্‌বে?' বালক তাহার ক্ষুদ্র বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল 'আতি—!' ভৈরবচন্দ্র বালকের হাত ধরিয়া বলিলেন 'এস।' বালক সানন্দে তাঁহার দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি দাদা?' ভৈরব হাসিয়া বলিলেন 'হাঁ। এস।'

ভৈরবচন্দ্র শিশুকে হস্তীপৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। বালক আনন্দে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

বালকের দাসী 'রাজাবাবুকে' দেখিয়াই দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া বক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। খোকাকে জমিদারের কাছে যাইতে দেখিয়া সে আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। হাতী চলিতে লাগিল। বালক কখনো হাসিয়া আনন্দে করতালি দিল, কখনো ভয়বিবর্ণমুখে ভৈরবচন্দ্রের বক্ষে মুখ লুকাইল, কখনো অস্পষ্ট ভাষায় ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে আদি অন্তহীন গল্প জুড়িয়া দিল।

শিশুর মধুর আকৃতি, চরিত্র এবং আচরণ ভৈরব চন্দ্র যতই দেখিতে লাগিলেন ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীতহীন হৃদয়ে থাকিয়া থাকিয়া সহসা কি যেন অস্পষ্ট মধুর রাগিনী বাজিয়া উঠিতে লাগিল, ভৈরবচন্দ্র ধীরে ধীরে অজ্ঞাত আবেগে শিশুকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন।

সন্ধ্যার সময় ভ্রমণ শেষ করিয়া ভৈরবচন্দ্র আবার কাছারীতে ফিরিয়া আসিলেন। খোকার দাসী ব্যাকুল-উদ্বেগে তাহার জন্য কাছারীর নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল। খোকাকে ফিরিতে দেখিয়া দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দ্রুতবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

শিশু হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া ঝাঁপাইয়া দাসীর কোলে পড়িল। ভৈরবচন্দ্রের দিকে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল 'দাদা, মা যাই।' ভৈরব হাসিয়া বলিলেন 'কাল আবার এসো। আবার বেড়াতে যাব।' তারপর কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া দাসীর হস্তে দিয়া বলিলেন 'কে রোজ সন্ধ্যার সময় নিয়ে আসিস।' দাসী গভীর আনন্দ কষ্টে গোপন করিয়া নীরবে সম্মতি জানাইয়া গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

কি জানি কেন সে রাত্রে ভৈরবচন্দ্রের ভাল নিদ্রা হইল না। বহুকালের বিস্মৃত একটি নিষ্ঠুর ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সবল চিত্তকে উদভ্রান্ত করিয়া দিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র শিশুর সুকুমার মুখের সঙ্গে সপ্তবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারই উৎপীড়নে নির্ব্বাসিতা এক কিশোরী বালিকার মুখের যেন কিছু সাদৃশ্য ছিল।

দুই

তিনদিন মাত্র থাকিবেন বলিয়া ভৈরবচন্দ্র মথুরাপুরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহার তথায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তথাপি তিনি মথুরাপুর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র শিশু ধীরে ধীরে তাঁহাকে যেন কি এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছিল।

নিজের অবিশ্বাস্য দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে ভৈরবচন্দ্রের অত্যন্ত হাসি পাইত। এবং এই হাস্যকর দুর্ব্বলতা দূরীভূত করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে চিত্তকে দৃঢ় করিয়া স্তূপাকার খাতাপত্র লইয়া বসিতেন, কিন্তু নিকাসের ঠিক দিতে দিতে নিতান্ত অকারণে সেই সহাস্য শিশু-মুখ সহসা তাঁহার মানস-চক্ষে উদিত হইয়া তাঁহাকে উন্মনা করিয়া দিত। ভৈরবচন্দ্র হাসিয়া খাতা ফেলিয়া চক্ষু মুদিয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিতেন।

আজ মধ্যাহ্ন হইতে আকাশ ধীরে ধীরে নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আজ আর ভৈরবচন্দ্রের ভ্রমণে বাহির হওয়া ঘটিল না। তিনি কাছারীঘরের বারান্দায় সুখাসনে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে নিবিষ্টচিত্তে প্রকৃতির বর্ষণোৎসব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল। দূরে যমুনার তীরপ্রান্তবর্ত্তী তরুশ্রেণী বৃষ্টির অস্পষ্টতায়

দিগন্তের নয়নতটে শ্যাম কজ্জলরেখার ন্যায় দেখাইতেছিল, মস্তকের উপর ধূসর আকাশ দামিনীর তীক্ষ্ণ হাস্যে থাকিয়া থাকিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং আর্দ্র বায়ু অশ্রুসিক্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধরণীর শীতল বক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছিল। ভৈরবচন্দ্র হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে আজ যেন এক বিশাল শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাতসারে তাঁহারও হৃদয় যেন ধীরে ধীরে নিরানন্দের নিবিড় মেঘে ঘনান্ধকার হইয়া আসিতেছিল এবং তাঁহার উজ্জ্বল নয়নে অশ্রুর আভাষ অজ্ঞাতে আর্দ্রতা সঞ্চার করিতেছিল। সেদিনও প্রকৃতির এমনি প্রাবৃটোৎসব। চারিদিকে বৃষ্টি ও বায়ুর উন্মাদ নৃত্য। এমনি দিনে তিনি এক অসহায় দরিদ্র বিধবাকে তাহার কিশোরী কন্যার সহিত এক বস্ত্রে গৃহত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন! যাইবার সময়ে মর্ম্মপীড়িতা বিধবা অশ্রুপূর্ণনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল 'যদি ভগবান থাকেন, তাহা হইলে একদিন ইহার সুবিচার করিবেন, আমি সেই আশায় বাঁচিয়া থাকিব।' কাজটা কি ভাল হইয়াছিল? কিন্তু কেন সে হতভাগিনী তাঁহার ইচ্ছাস্রোতে বাধা দিতে চেষ্টা করিল? তাহার দশকাঠা বাস্তুভিটার জন্য তিনি তাহাকে অন্যত্র তাহার চতুর্গুণ ভূমি দিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি মূঢ়া তাঁহার অনুরোধে সম্মত হইল না। বলিয়া পাঠাইল, 'আমার শ্বশুরের ভিটা আমার বক্ষের পঞ্জর। প্রাণ থাকিতে আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারিব না।' মূঢ়া একবার ভাবিল না যে, কার্য্যোদ্ধারের জন্য বক্ষের পঞ্জর টানিয়া বাহির করিতেও ভৈরবচন্দ্রের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই।

তথাপি আজ প্রকৃতির করুণ মিনতির দিনে ভৈরবচন্দ্র মনকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার অপ্রসন্ন হৃদয় করুণসুরে বলিতেছিল কাজটা ভাল হয় নাই।' বালকের কথা মনে পড়িল। এত বৃষ্টিতে আজ আর সে আসিবে না। ভৈরবচন্দ্রের সবল হৃদয়ের কোনও গোপন-তন্ত্রী যেন সহসা গভীর বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া তেজস্বী ভৈরবচন্দ্র নিজের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন।

চীৎকার করিয়া ডাকিলেন 'নায়েব!' নায়েব উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিলেন 'সকলকে প্রস্তুত হইতে বল, আমি কাল প্রত্যুষেই বাড়ী ফিরিব।' নায়েব 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভৈরবচন্দ্রের মনে বালকের সুকুমারমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ভৈরবচন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বর্ষাসিক্ত প্রকৃতির করুণমূর্ত্তির দিকে শূন্যমনে চাহিয়া রহিলেন।

প্রত্যুষে গ্রাম হইতে বিদায় লইবার সময়ে ভৈরবচন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রী আবার তীব্র বেদনায় বাজিয়া উঠিল। যাইবার পূর্ব্বে ছেলেটিকে একবার দেখিয়া যাইবেন না? আবার কতদিনে দেখা হইবে! না আর না। চীৎকার করিয়া ভৈরবচন্দ্র ডাকিলেন 'রামা!' রামচন্দ্র উপস্থিত হইলে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বিস্তর কাপড়চোপড়-খেলনা ইত্যাদি তাহাকে দিয়া বলিলেন 'যা এই সব মাষ্টার মশায়ের ছেলেকে দিয়ে আয়। আর—না, যা শীগ্‌গির ফিরে আসিস, আমরা এখুনি বেরবো।' অনুসন্ধান করিয়া ভৈরবচন্দ্র জানিয়াছিলেন যে, ছেলেটী গ্রাম্যস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পুত্র।

মাষ্টার-মশায়ের বাটীর নিকট দিয়া যাইবার সময় ভৈরবচন্দ্রের আকুল চক্ষু আর একবার কাহার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। সুধীর তখন ভৈরবচন্দ্র প্রেরিত নূতন খেলনার সযত্ন পর্য্যবেক্ষণে গভীর মনোনিবেশ করিয়াছিল।

তিন

একমাস না যাইতেই ভৈরবচন্দ্র আবার মথুরাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। মথুরাপুরের আয়

অতি সামান্য। এই ক্ষুদ্র গ্রামের প্রতি জমিদারের এত টান দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। কেহ বলিল 'মহালটা নূতন কি না, তাই বোধ হয় ভাল ক'রে দেখবার-শোন্‌বার জন্য এসে থাকবেন।' কেহ বলিল 'এখানকার জল-হাওয়া বোধ হয় খুব পছন্দ হয়েছে। যমুনার জল ত নয় যেন মিছরির সরবৎ! লোহা খেলে লোহা হজম হয়ে যায়।' কিন্তু কার্য্যতঃ এই সকল অনুমানের একটারও সার্থকতা দেখা গেল না। ভৈরবচন্দ্র কেবল বসিয়া বসিয়া তামাকু সেবনই করিতে লাগিলেন এবং যমুনার জল খাইয়াও তাঁহার ক্ষুধা যথেষ্ট কমিয়া গেল।

এবার আসিয়া ভৈরবচন্দ্র আর সুধীরের সাক্ষাৎ পাইলেন না। সুধীর তাহার মাতার সঙ্গে তাহার দিদিমার কাছে গিয়াছিল। সুধীরের দিদিমা জামাই-বাড়ী না থাকিয়া তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী কন্যার নিকট গঙ্গাতীরে থাকিতেন। জামাতা খরচ দিতেন এবং কন্যা মধ্যে মধ্যে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। সুতরাং ভৈরবচন্দ্রের আশাপূর্ণ হইল না। এবং কর্ম্মচারীদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই নিরাশা ক্রোধ ও বিরাগে পরিণত হইল।

চাকরবাকর তাঁহার তর্জ্জনে ত টস্থ হইয়া উঠিল, নায়েব-গোমস্তা এই বিপদে সংকল্প করিয়া লক্ষ দুর্গা নাম লিখিতে প্রবৃত্ত হইল, -প্রজাদের লাঞ্ছনার অবধি রহিল না। সকলেই আকুল চিত্তে ভাবিতে লাগিল বিঘ্নবিনাশন কবে এ বিঘ্ন বিনাশ করিবেন।

আহারান্তে ভৈরবচন্দ্র তন্দ্রামগ্ন অবস্থায় ধূমপান করিতেছিলেন। এমন সময়ে একখানি হাস্যোজ্জ্বল ছোট মুখ জানালার অবকাশ হইতে বলিল 'টু!'

ভৈরবচন্দ্র চকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। সুধীর হাসিয়া বলিল 'দাদা!' ভৈরব সাগ্রহে বলিলেন এস, দাদা এস।' সুধীর হাসিতে হাসিতে তাঁহারই প্রদত্ত একটী বৃহৎ পুত্তলিকা লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৈরবচন্দ্র বাহুবিস্তার করিয়া তাহাকে সাগ্রহে বক্ষমধ্যে গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর সমস্ত মধ্যাহ্ন ধরিয়া দুই ভাইয়ে গল্প চলিল। অপরাহ্নে তাহাকে লইয়া ভৈরবচন্দ্র বেড়াইয়া আসিলেন। সেই দিন সন্ধ্যা হইতে প্রভুর প্রকৃতির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ একান্ত বিস্মিত হইল। পনের দিন পরে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে গভীরতর সংশয় বহন করিয়া ভৈরবচন্দ্র বাটী ফিরিলেন। নানাকারণে এবার ভৈর চন্দ্রের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, সুধীরচন্দ্র উৎপীড়িতা দত্ত-গৃহিণীর দৌহিত্র!

বাড়ী ফিরিয়া তিনি সুহাসিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোর ওপাড়ার দত্ত-গিন্নীকে মনে পড়ে?'

সুহাসিণী বলিল 'মনে পড়ে বৈকি। তাদের বাড়ী ভেঙেই ত আমাদের বাগান বড় করা হ'য়েছে।'

কথাটা ভৈরবচন্দ্রকে আঘাত করিল। ভৈরবচন্দ্র বলিলেন 'তার একটী ছোট মেয়ে ছিল, তার কি হ'ল জানিস?'

সু সেদিন কমলার মা বল্‌ছিল যে, তার নাকি মথুরাপুরে বিয়ে হ'য়েছে। জামাই বুঝি সেইখানকার ইস্কুলের মাষ্টার।'

শুনিয়া ভৈরবচন্দ্র চকিত হইয়া উঠিলেন। তিনিও এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন।

সুহাসিনী বলিল 'কেন তাদের কি কোন খবর পেয়েছ?'

অন্যমনস্ক ভৈরবচন্দ্র বলিলেন 'না।' সুহাসিনী চলিয়া গেল।

ভৈরবচন্দ্র নির্জ্জন উদ্যানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নীরবে পদচারণা করিলেন।

চার

কঠিন প্রস্তরে সহজে দাগ পড়ে না; কিন্তু একবার দাগ পড়িলে আর তাহা উঠে না। ভৈরবচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল।

যে তেজস্বী ভৈরবচন্দ্র জীবনে কখনো কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন নাই, সামান্য একটা শিশুর জন্য সেই ভৈরবচন্দ্র আজ তাঁহারই দ্বারা উৎপীড়িত দরিদ্র বিধবার নিকট ত্রুটিস্বীকার করিবেন? এরূপ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতে ভৈরবচন্দ্রের মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। অথচ সুধীরের বিরহ বক্ষবিদ্ধ কণ্টকের মত ক্রমাগতই তাঁহাকে পাড়া দিতেছিল। তাই ভৈরবচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টায় সুধীরের স্মৃতিকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য যত্ন করিতেছিলেন।

বাটীতে বিস্মৃতিলাভে অসমর্থ হইয়া ভৈরবচন্দ্র অবশেষে সুসজ্জিত বজরায় আরোহণ করিয়া নদীবক্ষে ভ্রমণে বাহির হইলেন। নিত্য পরিবর্ত্তমান প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিভিন্ন লোকালয়ের বিচিত্র নরনারী, নদীতীরবিহারী পশুপক্ষীর নিত্য নবীন রূপের মধ্যে তিনি শান্তির অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছিলেন। তথাপি যেদিন আকাশ-প্রান্তে প্রকৃতির দীর্ঘবেণার ন্যায় নীল মেঘ দেখা দিত, আর্দ্র বায়ু কাঁদিয়া কাঁদিয়া নদীবক্ষে লুটাইয়া পড়িত, সুগভীর স্তব্ধতা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের গভীর বিষাদ সূচিত করিত, সেদিন ভৈরবচন্দ্রের ব্যথিত হৃদয় সেই ক্ষুদ্র শিশুটির জন্য গভীর বেদনায় উৎসুক হইয়া উঠিত। যেদিন অবিশ্রাম জলধারায় চারিদিক ধূসর হইয়া উঠিত, জলে-স্থলে কোন প্রভেদ বুঝা যাইত না, তীরবর্ত্তী ম্লান তরুগুলি অশ্রু-সজলদেহে নিরুপায়ভাবে মস্তক অবনত করিয়া প্রকৃতির সহস্র উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিত, সেদিন সপ্তবর্ষ পূর্ব্বের কিশোরীকন্যা-মাত্র সহায়া দরিদ্র বিধবার নির্ব্বাসন-চিত্র সহসা যেন তাঁহার চক্ষে নগ্ন ভীষণতায় প্রকট হইয়া উঠিত! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বর্ষণ-সিক্ত আকাশের দিকে তিনি শূন্যমনে চাহিয়া থাকিতেন।

পূর্ণিমার রাত্রি। রজতশুভ্র চন্দ্রকরে চারিদিক আলোকিত। ভৈরবচন্দ্র বিনিদ্র নয়নে প্রকৃতির সুপ্তসুষমা অবলোকন করিতেছিলেন। হীরকশীর্ষ তরঙ্গরাজি বিদীর্ণ করিয়া সুসজ্জিত তরণী সুমধুর কলরবে দ্রুতবেগে স্রোতের মুখ ভাসিয়া চলিয়াছিল। নীলাকাশে স্নিগ্ধসুন্দর পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে দেখিতে থাকিয়া থাকিয়া আর একখানি অমনি সুন্দর শিশুমুখ তাঁহার হৃদয়াকাশে সমুদিত হইতেছিল। ভৈরবচন্দ্র তাহাকে ভুলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিতেছিলেন না। সহসা দূরাগত বিহগ কাকলী ভৈরবচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন সমুচ্চ কোলাহল করিতে করিতে দলে দলে চক্রবাক-মিথুন আকাশের রজত সরোবরে মনের আনন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে।

ভৈরবচন্দ্র প্রসিদ্ধ শিকারী। কি জানি কেন তাঁহার হৃদয়নিহিত শিকার প্রবৃত্তি আজ সহসা জাগিয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে বন্দুক উঠাইয়া ভৈরবচন্দ্র একটী চক্রবাককে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আহত চক্রবাক ছটফট করিতে করিতে নদী সৈকতে লুটাইয়া পড়িল।

মাঝিরা নৌকা থামাইল। অন্যান্য পক্ষীগণ দ্রুতবেগে চারিদিকে পলায়ন করিল। কিন্তু আহত চক্রবাকের সঙ্গিনী তাহাকে ছাড়িয়া গেল না। সে করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল! কখনো আবেগভরে চঞ্চু চুম্বন করিয়া তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিল, কখনো বক্ষে বক্ষ মিলাইয়া তাহার উপর স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল, কখনো হাহাকার করিয়া নদী সৈকতে লুটাইয়া লুটাইয়া আপনার হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিল! এই বিরহ-বিধুর চক্রবাকের করুণ আর্ত্তনাদে সহসা যেন সুধীরের

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভৈরবচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন! দ্রুতবেগে তীরে নামিয়া চন্দ্রালোকে দেখিলেন, হস্তীপৃষ্ঠে গমনকালে শঙ্কিত সুধীরের সরল নেত্রে মধ্যে মধ্যে যে ভীতির ছায়া অঙ্কিত দেখিয়াছিলেন আহত চক্রবাকের সরল নেত্রে যেন তাহারই অবিকল প্রতিবিম্ব! ভৈরবচান্দ্রের হৃদয়তন্ত্রী সহসা যেন অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল, বেদনার তীক্ষ্ণ আঘাতে তাঁহার শুষ্কচক্ষু সজল হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া ভৈরবচন্দ্র বলিলেন নৌকা ঘুরাও।

বাটী ফিরিয়া ভৈরবচন্দ্র যেখানে বিধবা দত্ত-গৃহিনীর বাস্তুভিটা ছিল. সেইখানে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। ভয়ে ভয়ে প্রধান কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল ওখানে কি বাগানবাড়ী হবে?" গম্ভীরভাবে ভৈরবচন্দ্র বলিলেন না, বসতবাড়ী। বিস্মিত কর্ম্মচারী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ভৈরবচন্দ্রের নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাটী প্রস্তুত হইল। তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত কক্ষ মনের মত করিয়া সাজাইলেন।

সমস্ত প্রস্তুত হইলে ভৈরবচন্দ্র অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কাহার জন্য এই অট্টালিকা প্রস্তুত হইল, এই সম্বন্ধে লোকে নানা জল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না। ভৈরবচন্দ্র প্রত্যহ নিজে দাঁড়াইয়া অট্টালিকার সমস্ত জিনিসপত্র পরিষ্কার করাইতেন এবং সময়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই বাটীর চারিদিকে নীরবে পদচারণা করিতে দেখা যাইত।

* * *

তিন বৎসর পরে ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যু হইল।

মৃত্যুর পর তাঁহার উইল পড়িয়া সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, তিনি নবনির্ম্মিত অট্টালিকা এবং তাঁহার বিশাল জমিদারীর অর্দ্ধাংশ সুধীরের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন!

বিধাতা সুবিচার করিলেন। দশবৎসর নির্ব্বাসনের পরে দত্ত-গৃহিণী আপনার শ্বশুরের 'বাস্তুভিটায়' আবার ফিরিয়া আসিলেন।

—নারী-নিগ্রহ—

শ্রীমনোজ বসু

হারুদাস আমাদের প্রজা। সে বাড়ীর উপর এক মুদীখানার দোকান করিয়াছিল। সন্ধ্যা অবধি বেচাকেনা, সন্ধ্যার পরেই ঝাঁপবন্ধ করিত— মাথা ভাঙিয়া মরিলেও আর একপয়সার জিনিষ দিবে না। তারপর ভূতের মতো বাঁশতলার অন্ধকার দিয়া বাহির হইয়া যাইত। যদি বলিতাম অন্ধকারে এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছো হারু, নেহাৎ একটা আলো হাতে ক'রে যাও—হারু বলিত, আলো দেখলে রক্ষে আছে, সবশালা উনুনের মধ্যে সেঁদুবে—। কথাটা মিছা নয়। প্রথম দোকান করিয়া হারু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, নগদদামে ছাড়া জিনিষ বিক্রী করিবে না। খরিদ্দারে বাকী চাহিলে প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইয়া দিত। একশোবার এককথা কাঁহাতক্ বলা যায় তাই শেষে বুদ্ধি করিয়া 'নগদ বিক্রী' সাইনবোর্ড কিনিয়া টাঙাইয়া দিল। সকলকে আঙুল দিয়া কেবল ঐ সাইনবোর্ড দেখাইয়াই খালাস। কিন্তু হতভাগা লোকে তবু কি মানে। সাইনবোর্ডের পাশে ফের আর একখানা কাগজে বড় বড় করিয়া ধারে বিক্রী নাই, লিখাইয়া আঁটিয়া দিল। ইহাতেও ইতর বিশেষ হইল না। এখন সাইনবোর্ড এবং হাতে লেখা কাগজ দুইই আছে কিন্তু ধার বাকী দিতে হয়, না দিলে দোকান চলে না। সন্ধ্যার পর হইতে তাহার তাগাদা। চাষাভূষা খরিদ্দার, সারাদিন মাঠে থাকে—সন্ধ্যার আগে ধরা পাওয়া যায় না। আগে আগে হেরিকেন লইয়া বাহির হইত। একদিন একজনের ঘর কানাচ হইতে হারু স্পষ্ট শুনিল বাপে ছেলেয় কথা হইতেছে। কিন্তু উঠানে ঢুকিয়া দেখিল একলা ছেলেটী, বাপ, যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়া গিয়াছে। ছেলে বলিল—বাবা বাড়ী নেই, কুটুম্বুর বাড়ী গেছে। নিজের কানে গলা শুনিয়াছে, হারু বিশ্বাস করিল না। কিন্তু উপায় কি! রান্নাঘর শোবার ঘর গোয়াল ঢেঁকিশাল সমস্ত খোঁজ করিয়া অবশেষে ম্রিয়মান হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে হঠাৎ উঠানের কোণে খেজুর রস জ্বাল দিবার যে বড় উনুন ছিল তাহার মধ্যে খড়মড় করিয়া কি নড়িয়া উঠিল। তাকাইয়া দেখে, চুলওয়ালা একটা মাথা। ক্রমে উনুনের ভিতর হইতে গোটা মানুষটাই বাহির হইয়া পড়িল। সেই অবধি হারু সেয়ানা হইয়াছে। এখন আর আলো নেয় না, অন্ধকারে একেবারে বাড়ীর মধ্যে দাওয়ায় উঠিয়া বলে - বড়মিঞা, আজ আর শুনছিলে।

তাগাদা এমন একগ্রামে নয়। পাঁচ সাত খানা গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি গভীর হয়। ওরি মধ্যে যেদিন একটু সকাল থাকে নিমাই বৈরাগীর আখড়ায় গিয়া খোল বাজাইতে বসিয়া যায়। এতখানি রাত অবধি হারুর ছেলেমানুষ বউ ফাঁকা পুরীতে একেলা থাকে। বাড়ীতে ঐ ছাড়া আর দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নাই। বউ দরজায় খিল আঁটিয়া ঘুমাইয়া থাকে। আমরা একঘুমের পর জাগিয়া হারুর গান শুনিতে পাইতাম— 'হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, অর্থাৎ হারু বাড়ী ফিরিতেছে। পানাপুকুরের ধারে বাঁশতলায় আসিয়া ভূতের ভয়টয় হইত বুঝি, রোজই ঐ একটা গান ধরিত। তাহারই অল্প পরে হারুর দাম্পত্য সম্ভাষণ প্রায় দুই রশি পথ পার হইয়া কানে ঢুকিত—এই মাগী, দুয়োর খোল—মরেছিস নাকি হারামজাদী, তোর ঘুমের

শ্রাদ্ধ কর্‌ছি—। দুম দুম করিয়া দুয়ারে লাথি পড়িত। কিছুক্ষণ পরে চুপচাপ, আর কোন সাড়া নাই।

এই সময়ে দিনকতক আমার প্রাতঃভ্রমণের বাতিক হইয়াছিল। ঘোর থাকিতে থাকিতে যখন হারুর বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতাম, দেখিতাম অত সকালেই উঠিয়া বউটি গোবরছড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারী করুণা হইত, বড় ভালোমানুষ বউটি। একদিন মাকে বলিলাম—হারু বউটার উপর বড্ড অত্যাচার করে না? এ যেন নিতান্ত সাধারণ ঘটনা এমনিভাবে মা বলিলেন—গোয়ার গোবিন্দ ছোটজাত—ওদের ঐ রকম ব্যাভার। আমি কলেজে পড়ি, সিভালরি কথার মানে শিখিয়াছি, বলিলাম—গায়ের 'পরে বসে' মেয়েটাকে কষ্ট দেবে, এর কোন প্রতিকার নেই? মা বলিলেন যার পাঠা সে যদি লেজে কাটে! ওর বউ ও মারে তাব আমরা করব কি?—আর কথা সরিল না, চমকিয়া উঠিলাম—সে কি, মারধোর পর্যন্তও চলে!

সেই দিনই পথে হারুর সাথে দেখা হইয়া গেল। বলিলাম—তুমি বউএর উপর ভারী অত্যাচার আরম্ভ করেছ, ভদ্রলোকের পাড়ায় থেকে এসব কি?—হারু একেবারে আকাশ হইতে পড়িল—সে কি ছোটবাবু, কে এমন কথা বল্লে? তার কিসের কষ্ট—কোন্‌টার অভাব আছে, বলুন ত? কত কত বাহারের জিনিষ—বোম্বাই শাড়ী, রূপোর পৈছে, রুমাল—কোন্ বেটা দিতে পারে দিক্ তো—

কহিলাম—রেখে দাও বোম্বাই শাড়ী—আমি নিজে খোঁজ করে' সব জেনেছি—। হারু ঘাবড়াইয়া গেল।—কি জেনেছেন, বাবু?

সে যে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিয়া থাকে একথা মুখ ফুটিয়া আর উল্লেখ করিতে পারিলাম না, শুধু বলিলাম—সে কি বলবার কথা? আচ্ছা, তুমি রোজ দুপুর রাতে বাড়ী ফেরো, ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তা'তে ঐ রকম ইতরের মতো গালিগালাজ কর্‌বে কেন?

গালাগালি করি আমি?—তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গালি দিলাম কবে? আমি ত বউকে ডেকে মিষ্টিমুখে দোরটা খুলে দিতে বলি।

এমন ভাবে কথা বলিতেছিল যে, বেশ বুঝিলাম তাহার মুখের কথার সহিত মনের ধারণার একচুল গরমিল নাই। হারু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে দুপুর রাত্রের নিত্যকার কাণ্ড মিষ্টমুখের পর্য্যায়েই পড়ে। তা' লইয়া আর তর্ক বৃথা। খুব চড়াগলায় বলিয়া দিলাম—এখানে ওসব চল্‌বে না, তুমি যদি বউকে ফের কোনদিন জ্বালাতন কর, বড় সুবিধে হবে না বলে দিচ্ছি। বুঝ্‌তে পার্‌লে?

হারু সবিনয়ে কহিল—আজ্ঞে বুঝ্‌লাম—আর এমন হবে না।

সেই রাত্রেও পানাপুকুর পাড় হইতে যথাকালে হরিনামের মাহাত্ম্য কানে পৌঁছিল। ইহারই মিনিট দুই পরে মিষ্টমুখের সম্ভাষণ সুরু হইবার কথা। কিন্তু দশমিনিট পার হইয়া গেল, কোন সাড়া নাই। মনে মনে খুসী হইলাম—যাক্, আমার কথার ফল হইয়াছে। পরদিন সন্ধান লইয়া জানিলাম—হাঁ, হারু কথা রাখিয়াছে বটে, নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে বাহির হইবার সময় বউকে ঘরে পুরিয়া দুয়ারে তালা দিয়া গিয়াছিল। চাবি হারুর কাছে থাকে। কাজেই ফিরিয়া আসিয়া চুপিচুপি তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেই হইল, বউকে ডাকাডাকি করিয়া জ্বালাতন করিবার দরকার নাই।

উহারই তিন-চারদিন পরে এক তুমুল কাণ্ড! শোনা গেল হারুর বউ মর-মর, আত্মহত্যা করিয়া ভবের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কয়াশ কল্‌কে ফুলের বীচি খাইয়া ফেলিয়াছে। হারুর বাড়ী গিয়া দেখি, উঠানের একপাশে নির্জীবের মতো বউটা পড়িয়া আছে, মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে।

এদিকে এই অবস্থা, ওদিকে গোয়ালের উপর হারু চুল ছিঁড়িয়া মাথা ভাঙিয়া আর এক কাণ্ড জমাইয়া তুলিয়াছে। বলে, এসব মাগীর বদমাইসী—মরে' আমাকে জব্দ কর্‌বে—আমার হাতে দড়ি দেবে। কত জন্মের শত্তুর যে ছিল। ধম্মো আছেন—তিনি জেনে বিচার কর্‌বেন। যাহা হউক, ধর্ম্মের বিচারে শেষ পর্য্যন্ত বউ মরিল না, মাছের আঁইস-ধোয়া জল গেলাস দুই খাওয়াইয়া দিতেই হড়-হড় করিয়া সমুদয় বিষ বমির সাথে বাহির হইয়া গেল! তখন আবার হারু কোমর বাঁধিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিয়া গেল। আমরা চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যাকালে এগজামিনের তাড়ায় আলোর সাম্‌নে বসিয়াছি, হাতে একখানা আইনের বই অর্থাৎ তিন আনা সংস্করণের তিন দিনে পাশ করিবার গ্যারান্টি দেওয়া নোট। এমন সময়ে হারুর গলা শুনিলাম, মার সাথে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। বউ উঠে বসেছে। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—এ'কাণ্ড কর্‌লি কেন? তা' কথা কয় না। আজ আর তাগাদায় বেরুনো হোল না। রাত্তিরে ভাত-টাত খেতে দেবো, মাঠাকরুণ?

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কাণ্ড করে' বস্‌লো কেন? এর আগে তোদের ঝগড়াঝাটি কিছু হয়েছিল?

হারু বলিল—আজ্ঞে না, ঝগড়া-টগড়া করার মানুষ আমি না—সামান্য কথা কাটাকাটি। পূবের বাগানের ধার দিয়ে মানকচু রুয়ে দিছিলাম---সারাদিন দোকান-পাটের কাজ, দেখার ফুরসৎ হয় না। মাঝে সেদিন হঠাৎ দেখি মাটী খুঁড়ে পাঁচ-সাতটা কচু তুলে নিয়েছে। বউকে বল্‌লাম—কচু তুলেছিস নাকি?—ভাতের পাতে ত খেতে পাই নে। একেবারে সাফ বেকবুল। বলে—শজারুতে খেয়েছে, আমি কি জানি। হবেও বা। আজ সকালে একেবারে হাতে-নাতে চুরি ধরা—

মা বলিলেন—চুরি?

হারু বলিতে লাগিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, চুরি বলে' চুরি—দিনে ডাকাতি। শজারুর কথা-টথা সব মিছে—ওই-ই কচু তুলে' তিনু সেকরার ছেলেকে দিয়ে হাটে পাঠায়। ছেলেটা বিড়ি ধরেছে, তিনু পয়সা দেয় না—এই কচু বেচার পয়সার ভাগ পায়। কালকের হাটে দুটো বিক্রী হয় নি, তাই কাপড়ের মধ্যে করে' সকালে নিয়ে এসেচে আমাদের বাড়ী। পড়্‌বি ত পড় একেবারে আমার সাম্‌নে। আমায় দেখে ছেলেটা ভাঁটিবনে বসে পড়্‌ল। খপ্ ক'রে হাত ধ'রে টান দিতেই ব্যস—দুই তাড়া দিলে সব বলে ফেল্‌ল—।

মা বলিলেন—তার পরে তুই বউটাকে বুঝি খুব মারধোর কর্‌লি?

হারু ঘাড় নাড়াইয়া অত্যন্ত সহজভাবে কহিল—আজ্ঞে না। মিষ্টিমুখে গিয়ে বল্‌লাম—এমন কর্‌লে সংসার-ধম্মো চলে কি করে'? তাইতে এত—

মা বলিলেন—সে তোর দোষ। বো'র মনেও সাধ-আহ্লাদ আছে, তুই তার হাতখরচ একটা পয়সা দিবি নে—তাই চুরি করে—

হারু অকৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে কহিল—অমন কথা বলবেন না মা ঠাক্‌রুণ, মেয়েমানুষ অমন হ'লে তক্ষুণি সংসার উচ্ছন্ন যাবে—। ওরা ত হ'ল বাঁধাগরু, যেখানে বাঁধ্‌বো সেখানে খাবে—ওদের আবার সাধ-আহ্লাদ কি?

একেবারে স্পষ্ট উক্তি! চাষা কি না—ভদ্রলোক হইলে রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতে শিখিত। আমি আর সহিতে পারিলাম না। ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া রুক্ষকণ্ঠে কহিলাম—যাই হোক্ হারু, তোমায় বলে' দিচ্ছি আমাদের ভিটেয় বাস করে' ভবিষ্যতে আর কোন দিন এমন ঝগড়াঝাটি না হয়—খবরদার!

হারু ঘাড় নাড়াইয়া প্রতিবাদ করিল—ঝগড়া-

ঝাটি কোথায়? সামান্য কথান্তর কোন্ ঘরে না হয়?

আমি কহিলাম—তাও যেন না হয়। তা' হ'লে বাস ওঠাতে হবে—হারু কহিল—কিন্তু বউ যদি আগে গালাগালি করে—

—করুক গে। এককাঠি বাজে না। তুমি উত্তর দিও না—তা' হ'লে সে থেমে যাবে। বুঝ্‌লে?

—আজ্ঞে বুঝলাম, বলিয়া অত্যন্ত শুক্‌না মুখে হারু চলিয়া গেল।

হারু কথা রাখিয়াছিল, অতঃপর ঝগড়া-ঝাটি হইত না। আর সামান্য কিছু যদিই বা হইত আমার কানে পৌঁছিবার উপায় ছিল না, ইতিমধ্যে ওকালতী পাশ করিয়া খুলনায় প্রাক্‌টিশ সুরু করিয়াছিলাম। এক শনিবারে বাড়ী গিয়াছি। রবিবারে প্রায় প্রহরখানেক বেলার সময় ওপাড়া হইতে বাড়ী ফিরিতেছি। হারুর বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দেখি দোকান বন্ধ, বাড়ীর ভিতরে তুমুল কোলাহল, বউর গলা সপ্তমে চড়িয়াছে। আর একটু আগাইয়া বাড়ীর মধ্যে যে কাণ্ড দেখিলাম তাহা যেমন অভাবিত তেমনি বিস্ময়কর। দেখিলাম, যে বউটিকে নিতান্ত নিরীহ বলিয়া জানিতাম, সে ঢেঁকিশালের উনানে খেংরাকাঠি দিয়া কলাই ভাজিতেছে এবং স্বামীকে সম্বোধন করিয়া যে সব কথা বলিতেছে শুনিলে কাণ গরম হইয়া উঠে—চলিত বাংলাভাষা যে হাউই বাজির মত এই প্রকার আগুন ছুটাইতে পারে আগে ততদূর ধারণা ছিল না—এবং মাঝে মাঝে যখন ভাবাবেগ বড় প্রবল হইয়া উঠিতেছে হাতের খেংরাকাঠি হারুর দিকে উদ্যত করিয়া এমন ইঙ্গিত করিতেছে যে, স্পষ্ট বোঝা যায় গায়ের বল স্বামীর তুলনায় নিতান্ত কম না হইলে সে কেবল মুখের কথায় ছাড়িয়া দিত না। কিন্তু হারু নির্ব্বিকার, এত গালাগালির উত্তরে একটুও জবাব করিতেছে না। উঠানে যেই কাঠ ঠেশ দিয়া আপন-মনে দিব্য ভুড়ুভুড় করিয়া তামাক টানিতেছে। এমনি মিনিট দুই-তিন টানে, তারপর হুঁকাটা নামাইয়া সযত্নে সেই কাঠের পাশে রাখিয়া দেয়, তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে ঢেঁকিশালের দিকে ছুটিয়া গিয়া দুমদুম করিয়া বউটার পিঠে গোটা তিন-চার লাথি। বাস, আর কোন কথা নাই—শান্তভাবে আবার নিজের জায়গায় আসিয়া হুঁকা তুলিয়া লয়। বউএর গালাগালির একটানা সুরও সাথে সাথে উগ্রতর হইয়া ওঠে। হারু দু'-তিন মিনিট আর ভ্রূক্ষেপ করে না, তাহার পর ফের তার পালা।

আমি উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিয়া হারু ভারী খুসী। বলিল—শুন্‌ছেন তো? পতি পরম গুরু—তার উপর বাকিগুলো শুনুন একবার। আমি কিন্তু আপনার কথা রেখেছি—একটাও জবাব করিনি—।

আমি বলিলাম—তা' বলে' স্ত্রীর গায় হাত তুলিস, ছুঁচো রাসকেল?

আমার রাগ দেখিয়া হারু অবাক! শেষে বলিল—সব তাতে আমার দোষ! বিয়ে করা ইস্তিরির গায়ে হাত তুল্‌বো না কি পথের মেয়ে মানুষ ধরে' ঠেঙাবো? ও মাগী আস্কারা পাচ্ছে আপনাদের জন্যে—না বাবু, আপনারা এর মধ্যে আস্‌বেন না—আমার পরিবার আমি শাসন কর্‌বো।

চোপরও—আমি রুখিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইলাম। হারুও উঠিয়া দাঁড়াইল, ঢেঁকিশালে উনানের ধারে বউর কাছে গেল। তারপর উনান হইতে কলিকার উপর আগুন তুলিয়া লইয়া টানিতে টানিতে আমার সাম্‌নে হইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় হারুর বউ আমাদের বাড়ী আসিয়া একেবারে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। জ্বালাতন আর কি! বলিলাম—আবার কি হোল? কথা বলিতে পারে না, কেবলি কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ছোটবাবু, আপনি

আমার ধম্মো বাপ- আমাকে বাঁচান-। তা' তো বাঁচাইব-কিন্তু কাণ্ডখানা কি? অনেকক্ষণ কাঁদিয়া এ ং অনেক ভূমিকা করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই,-হারু আর মারে নাই বটে, কিন্তু খুব শাসাইয়াছে।—আমি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে নাকি বউকে সে শতখণ্ড করিয়া কাটিয়া গাঙের জলে ভাসাইয়া দিবে। যে রকম গোঁয়ার, কিছু বিচিত্র নয়। বউটার ভারী ভয় হইয়াছে। আমি বুঝাইয়া বলিলাম- ওসব মিছে কথা, কিছু ভয় নেই-তুই বাড়ী যা'-আমি সব ব্যবস্থা কর্‌ব। সে নাছোড়বান্দা, বলে—না বাবা, ও না মলে' আর বাড়ী যাব না—মেরে মেরে আমার হাড় গুঁড়ো করে' দেয়—এই ভাখ সেদিন মেরেছিল এক বাড়ি-বলিয়া ডান কনুয়ের কাছে একটা দাগ দেখাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কহিলাম—তবে দিনকতক তোর বাপের বাড়ী গিয়ে থাক্—।

কপালের উপর প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া হারুর বউ বলিল-আ আমার পোড়া কপাল! রাজ্যেশ্বর ভাই ছিল, ও বছর কলেরায় মারা গেল। বাবু তুমি আমার বাবা, এই আমার বাপের বাড়ী—এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও নড়বো না-বলিয়া সে আবার আমার পা জড়াইয়া ধরিল।

মহামুস্কিলে পড়িলাম, ইহাকে লইয়া কি করা যায়! কত বুঝাইলাম, বউ কিছুতে ঠাণ্ডা হয় না। বলে—এই ত তুমি দেখলে বিনি দোষে সকালে আমায় কি হেনস্থা করলে। কোম্পানীর বিচার নেই নাকি? তুমি ত বাবা উকীল, মহারাণীকে বুঝিয়ে বোলো যে, আমার মেয়েকে খুন কর্‌তে চায়। তাতে যদি ওর ফাঁসী হয়, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবো না, এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌ছি—।

অবশেষে পা ছাড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। খুলনার নূতন বাসায় ঝি ছিল না। অগত্যা ঠিক করিলাম, যদি নিতান্ত না ছাড়ে কাল উহাকে সাথে লইয়া খুলনায় যাই-আপাততঃ আমার বাসায় থাকুক, তারপর হারু যদি মিটমাট করিয়া না লইয়া আসে, তখন খোর-পোষের জন্য যাহা হয় করা যাইবে।

রাত্রিটা মায়ের ঘরে মেজের উপর শুইয়া কাটাইল। সকালে প্রথম ভাঁটায় নৌকা ছাড়িবে, কিন্তু হারুর বউএর উদ্দেশ নাই। আমি নৌকায় উঠিয়া বসিয়া আছি, এক ঘণ্টার উপর ভাঁটা হইয়াছে, শেষে নৌকা খুলিয়া দিতে বলিতেছি—এমন সময় তাড়াতাড়ি ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম-অৰ্দ্ধেক ভাঁটা হয়ে গেল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? সে যেন লজ্জিত হইল, উত্তর দিল না। পুনরায় প্রশ্ন করিতে একটুখানি ঘোমটা টানিয়া আস্তে আস্তে বলিল—দুটো চাল সেদ্ধ করে' দিয়ে এলাম। ভারী জব্দ হয়েছে, কাল সমস্ত রাত না খেয়ে চিঁচি গলায় আর কথা বেরুচ্ছে না-। সহসা হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—দুটো ভাত রেঁধে খাবে, সে ক্ষমতা নেই, কেবল ঐ মুখ সর্ব্বস্ব। এমন অকম্মা তুমি মোটে দেখ নি বাবা, রান্নাঘরে চাল-ডাল কাঠকুটো সব সাজানো মরা মানুষেও দুটো সেদ্ধ করে' নিতে পারে-তা' না, সমস্ত রাত না খেয়ে পড়ে আছে। আমার ত গোড়ায় দেখে ভয় হয়েছিল, সত্যি সত্যি বুঝি বা—

আমি বলিলাম—তুই চলে যাচ্ছিস—আজকে রাত্রেও হারুর খাওয়া হবে না যে—

বউ বড় ভাবিত হইল। শেষে ম্লানমুখে কহিল—বাবা, তবে তোমার বাড়ীতে বলে' দাও যেন এ ক'দিন দুটো দুটো রাঁধা ভাত পাঠিয়ে দেয়। আমি কোম্পানীতে দরখাস্ত দিয়েই চলে আস্‌বো—

বলিলাম- তার চেয়ে তোর খুলনায় গিয়ে

কাজ নেই। আইনে আছে, বাপে মেয়ের দরখাস্ত করতে পারে। আমি তোর হয়ে দরখাস্ত দেবো, তুই বাড়ীতে থেকে হাক ক ডুটো ডুটো রেঁধে দিস—

বউএর মুখে হাসি ফুটিল, সে যেন বাচিয়া গেল। কহিল—আচ্ছা। তুমি তা'হ'লে মোকদ্দমা জুড়ে দাও গে। মহারাণীকে বেশ করে' বুঝিয়ে বোলো — আমায় কি রকম ঠেঙায়। তা'তে যদি ফাঁসীও হয় আমার হাড় জুড়োবে।

নৌকা ছাড়িয়া দিলাম।

—মনস্তত্ত্বের উপাদান—

শ্রীতারাপদ মজুমদার

বাণীর পিতা ছিলেন পশ্চিমের একটী সহরের নামজাদা উকিল। "নীরস প্রস্তর হইতে রসিক-প্রবর অশ্বত্থবৃক্ষের রসাকর্ষণের" ন্যায় এই শুষ্ক সহর হইতেই তিনি বহু অর্থ শোষণ করিয়াছিলেন। দুইটী কন্যা; বড় কল্যাণী,—বিবাহ হইয়া গিয়াছে;—জামাতা দিল্লীর দরবারে বড় চাকুরি করে, মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক আসিয়া শ্বশুর-মহাশয়ের পদধূলি লইয়াও যায়। ছোট কন্যা বাণী; বড় বড় ভাবুকদের অনুসরণ করিয়াই বলিতেছি, যেন একটী বন্য হরিণী, নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়ায়, সময় মত এক-আধবার মা-সরস্বতীর অর্চ্চনাতেও মন দেয়, তবে সেটা ক্ষণিকের নিমিত্ত। গৃহসংলগ্ন উদ্যানবাটির পার্শ্বেই তাহার পড়িবার ছোট ঘরখানি, চমৎকার সাজানো,—যেন একটী স্বপ্নোদ্যানের পাশে এক-খানি স্বপ্নকুটীর। এ হেন স্থানে বসতির ফলে বাণীর স্বভাব চাঞ্চল্যের মধ্যেও কবিত্ব জাগিয়া উঠে মাঝে মাঝে। কল্যাণীরও একদিন সে ভাবোদয় হইয়াছিল, কিন্তু,—এখন সে গৃহিণী, স্বামীর সেবাকর্ম্মের চিন্তায় তাহার চিত্ত এখন ভরপূর। কিন্তু বাণীর সে বালাই নাই; তাই পড়িবার সময় খাতার পাতায় মনের অনেক গোপন কথাও লিখিয়া ফেলে। বসন্ত তাহার পনেরটী অভিযানের চিহ্ন বাণীর দেহে আঁকিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাণীর চিত্তরাজ্যে সাড়া এমন কিছুই পড়ে নাই। ষোড়শ বসন্ত যেন দূরে দাঁড়াইয়া নীরব ভাষায় সংবাদ পাঠাইতেছে, এবারেও কি তোমায় একা দেখিব? ঋতুরাজের সেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিয়া বাণীর ভরন্ত নিটোল কপোল দু'টি রাতুল হইয়া উঠে, ঠিক যেন নিপুণ চিত্রকরের হাতের গোলাপী রঙের দুইটী পোঁছ লাগিয়া—বাণী তখনই কবিতার খাতা টানিয়া বাহির করে—অন্তরের পূর্ণতাটুকু একেবারে উজাড় করিয়া দিতে চায় শাদা কাগজের উপর সবুজ কালির আঁচড়ে। বাগিচার পাপড়ি খোলা মল্লিকা যেন ঘোমটা-তোলা বধূটির মতো বাণীর পানে চাহিয়া চাহিয়া হাসে, বলে, এর মধ্যেই এত! তবু ত এখনও দোসর পাস নি, কিন্তু সে আশায় ছাই! এই দ্যাখ্, এই গন্ধরাজ আমার 'পরে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়্ছে তার জীবনের সমগ্র ব্যগ্রতাটুকু নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে; কিন্তু আমি ত জানি ওদের নিবেদনের মূল্য কতটুকু, সার্থকতা কতটুকু, তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি অতি বড়ো অভিমানিনীর ন্যায়...বাণী আপন-মনেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, বিবাহ করিবে না, এমনি করিয়াই সুখের হিল্লোলে বহিয়া যাইবে...

কয়েক মাস পরে—

দিল্লী হইতে শিশিরের জরুরী তার আসিল—কল্যাণী অসুস্থা, শীঘ্র এস। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত উদ্যোগ হইয়া গেল। বাণী মাতা-পিতার সহিত দিল্লী চলিয়া গেল। জামাই বাবুর তারে দিদির অসুস্থ সংবাদ—বাণীর বসন্তের স্বপন একটু ওলটপালট হইয়া গেল।... কল্যাণী পীড়িতা বটে, অবস্থাও একটু খারাপ হইয়াছিল, এখন আর ভয় নাই, একেবারে নীরোগ হইতে কিছু সময় লাগিবে মাত্র। পিতার আদালত ছাড়িয়া বেশীদিন থাকা চলে না,মাতাও

সঙ্গে না থাকিলে তাঁহার শত বিশৃঙ্খলতা, সুতরাং বাণীই কেবল থাকিয়া গেল, অন্ততঃ দিদি নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত।

তখন পূজা আসিয়া পড়িয়াছে; কল্যাণীও সারিয়া উঠিয়াছে,—বাণীর অবস্থা কতকটা ফিরিয়া যাই-যাই, কিন্তু দিদির টানা-টানিতে যাওয়া আর হইয়া উঠিতেছে না। এমন সময় শিশিরের এক বন্ধু পূজার ছুটিতে বেড়াইতে আসিল; শতকরা নব্বইজন সমর্থ বাঙ্গালী যাহা করে, সেও তাহার ব্যতিক্রম করে নাই।—ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী-ভবনে যায় নাই; অথচ সাহিত্যের মহল্লায় তাহার খুব নামডাক, পল্লীচিত্র ফুটাইতেও নাকি সিদ্ধহস্ত!

চায়ের নিত্যসঙ্গী গল্প, দুই বন্ধুতে মস্‌গুল; —সাহিত্য,কাব্য,রাজনীতি, রাজসেবা, কত কী! একটা ছাড়িয়া আর একটা, সেটা ছাড়িয়া নূতন একটা,—যেন জোঁকের গতি, যেটুকু স্থান যায়, তাহার সবটুকু স্পর্শও করে না, অথচ গমনের দাবীও রাখে!···তরুণদের প্রসঙ্গ-বাক্য মুখরিত হয় পরিণয়ের আলোচনায়, যদি আবার সেই ব্যাপারে কাহারও বিশেষ মতানৈক্য থাকে। শিশির বলিল, আর কদ্দিন এমনি একা একা কাটাবি? এইবার এই ইতরজনদের কিছু মিষ্টান্ন জুটিয়ে দে।

যেন কতবড় একটা অবৈধ কথা শিশির তুলিয়াছে, উৎপল হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, ওইটি মাপ করো ভাই, জানই ত আমি একটু মনস্তত্ত্বের আলোচনা করে থাকি, একটু খেয়ালের ঝোঁকে সচরাচর চলি; সুতরাং ওই ব্যাপারটাতে আমার একটা অদ্ভুত খেয়াল আছে, সেটা বল্‌লে হেসে কুটিকুটি যাবে, অথচ সে আশা যে কখনো পূর্ণ হবে, তা' আমারো মনে হয় না। উৎপল গম্ভীর হইয়া গেল।

শিশির বলিল, তোর হেঁয়ালী আমি বুঝতে পারছি না, খুলেই বল্‌না ছাই।

মনস্তত্ত্ববিদের প্রবীণতায় ঘাড় নাড়িয়া উৎপল বলিল, ওই ত, না বলতেই হেঁয়ালী, বল্‌লে ত' মুর্শিদাবাদের সেই গোলকধাঁধায় আলিবর্দ্দির মতো ঘুরে মরবি।···আচ্ছা,তবু শোন্, আমি চাই একবৃন্তে দু'টী ফুল, তার মধ্যে দু'টীকেই পাবার অধিকার অবশ্য আমার থাকবে না, অর্থাৎ একটী হবে তার কিশোর, আর একটী কিশোরী, বুঝতে পেরেচিস্?

অন্তরের বিস্ময় বিরক্তি সাধ্যমত চাপিয়া শিশির বলিল, না, কী যে বলিস্ তুই···

উচ্চরোলে হাসিয়া উৎপলবাবু বলিল, আচ্ছা আরও খোলসা করে বল্‌ছি, অর্থাৎ দু'টী যমজ ভাই-বোন্। বোনটীকে আমার সঙ্গিনী ক'রে নেব, কিন্তু বোনটীর সঙ্গে ভাইটীর মনের ক্রিয়ার কতটা ঐক্য, সেইটা পরীক্ষা করবার অধিকারও তাদের বাপের কাছ থেকে নেব, সুতরাং ভাই-বোনেই আমার কাছে থেকে যাবে···

অসম্ভব বলিয়া শিশির টেবিলটায় এক ধাক্কা দিল, সেটা পড়িয়া যাইত, উৎপল আট্‌কাইল, হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বলেইছি তো একেবারে দুরাশা।

শিশির বলিল, এ তোর নেহাৎ পাগলামি, এক ত মনের মতো যমজ ভাই-বোন্ পাওয়াই ভার, আর যদিও বা পাওয়া যায় ত সেই ভাই যে তার বোনের বিয়ের জন্যে···না না, এও কি কখনো সম্ভব? আর যেন কারুর কাছে এ কথা বলিস নি, তা'হ'লে রাঁচি পাঠিয়ে দেবে।

মৃদু হাসিয়া উৎপলবাবু বলিল, ওহে না, তুমি ঠিক ধরতে পার নি; চিরকালই কি তার ভাই আমার কাছে থাকবে? কিছুদিন···তার মধ্যেই আমি তার সঙ্গে মিশে মিশে তার অন্তরটাকে বিশ্লেষণ ক'রে নেব,—এর মধ্যে ভাই আমার একটা মস্ত বড়ো স্বার্থ লুকানো রয়েছে, জানই ত

সেই যমজ ভাই-বোন্ নিয়ে বইখানা স্বরু করেছি —শিশিরের মুখের দিকে অনুমোদনের ভিক্ষায় উৎপল চাহিয়া রহিল।

হতাশার স্বরে শিশির উত্তর করিল, না, তোর জন্যে বায়ুরোগ-বিনাশক একটা তেলের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। সমর্থন অভাবে উৎপল অন্য প্রসঙ্গ আনয়ন করিল।

অনুজার উদ্বাহের জন্য সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগী এই বিশ্বহিতৈষী আজীবন তোমার দ্বারে ক্রীত-দাসত্বের প্রতিজ্ঞা করছে…

কৃত্রিম কোপে কল্যাণী বলিল, ফের,…না, সত্যি শোনই না আমার মৎলবটা একবার।

তখন দুইজনে হাসিয়া হাসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিল।

পরের দিন—

আবাল্য বন্ধু উৎপলের হাতে বাণীকে তুলিয়া দিতে পারিলে শিশিরের আনন্দের সীমা থাকিত না। পত্নীর নিকটেও সে এই কথা বলিয়াছিল, কিন্তু উৎপলের খেয়ালটাও ত বড় সাধারণ নয়, সুতরাং মনের আশা মনেই রহিল, —"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে 'অসমর্থস্য' মনোরথাঃ!"

কল্যাণী বিদ্রূপ করিয়া স্বামীকে বলিল, তোমারই বন্ধু ত, রতনে রতনে চেনে; কিন্তু আমায় যদি হুকুম দাও, ভদ্রলোককে ভেড়া বানিয়ে দিয়ে দিই, শেষটায় মনস্তত্ত্ব ছেড়ে দিন-র ত্তির প্রেমতত্ত্বে ডুবে না যায়…

পত্নীর কবরীতে ছোট্ট একটী টান দিয়া শিশির বলিল, রতনে আবার রতন চিনবে না?— যেমন তুমি আমায় চিনেছ। তা' সেই হতভাগ্যকে মেষ বানিয়ে তারপর তার হাতে বোন্‌টীকে দিতে ইতস্ততঃ করবে না ত, অবশ্য সেটা পরের কথা, এখন এই জন্তু বিশেষটা বানাবার জন্যে কি কি উপকরণের দরকার, সেটার হুকুম হ'লে এই দীন সেবক কায়মনোবাক্যে, এমন কি অর্থের দ্বারাও তা' পালন করতে সচেষ্ট হয়।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল, সাহিত্যিকের গন্ধ লাগ্‌ল নাকি গায়? আচ্ছা, এখন ঠাট্টা রাখো, সত্যি বলছি, আমি যদি বাণীর সঙ্গে ওঁর বিয়ে ঘটিয়ে দিতে পারি—?

শিশির বলিয়া উঠিল, তা' হলে তোমার

দিন কয়েক পর—

সেদিন সকাল বেলাতেই মেঘ করিয়া শারদ্ প্রভাতের মাধুর্যটুকু মাঠে মারা যাইবার উপক্রম; যেন দুষ্ট ছেলে পড়ার অনিচ্ছায় তাহার কোমল মুখখানি ভার করিয়াছে,—আকাশের অবস্থা এম্‌নি। শিশির চায়ের কাপে চুমুক দিয়া জানালার বাহিরে দৃষ্টি ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "প্রভাতে মেঘডম্বরু…"

উৎপল কাপ্ নামাইয়া আর একটী চরণ যোগ করিয়া দিল, "দাম্পত্য কলহশ্চৈব…"

শিশির হাত তুলিয়া বলিল, থাক্, ভাবের দোরে 'ট্রেস্‌পাস্' করো না, ও কথাটা তোমাদের মতো ভীষ্মদের মুখে সাজে না।

উৎপল বলিল, এরকম অনধিকার চর্চ্চা ত আমায় চিরকালই ক'রে যেতে হবে ভাই।

যেন হঠাৎ কথাটা মনে পড়িয়া গেল, এম্‌নি ভাবে শিশির বলিল, ভাল কথা, কাল আমার গিন্নী মস্ত বড় একটা সুখবর দিয়েছে রে, তোকে বলি-বলি ক'রেও বলা হয় নি।

উৎপল তাহার সপ্রশ্ন চোখ দু'টি তুলিল।

শিশির কহিল, তোর অভিপ্রায়েরই অনুকূল একযোড়া কিশোর-কিশোরীর সন্ধান আমার গিন্নী কোথায় পেয়েছে, তা'কেও ব'লেছিলাম কি না, কারণ এ বিষয়ে ওদের মতো ওস্তাদ আর নেই।

মিথ্যা বিকারহীনতারভাবে উৎপল

বলিল, কি রকম?—যেন এই প্রসঙ্গে তাহার এতটুকুও ব্যগ্রতা নাই।

তাহার এই আত্মদমনের চেষ্টায় শিশির মনে মনে হাসিল; বলিল, বয়স তাদের পনের কি ষোল, যেন 'বসোরা' থেকে সদ্য-আনা এক জোড়া গোলাপফুল; তবে একটু বাধা আছে ভাই—তোর দিক্ থেকে; কারণ তারা বাঙ্গালী নয়, দিল্লীওয়ালা, বাঙ্গালীর সঙ্গে থেকে বাংলাও বেশ জানে, তা'ছাড়া, বাঙ্গালীর সঙ্গে বিয়ে দিতে তাদের কোনও আপত্তি অবশ্য হবে না, এখন তোর···

বাঙ্গালী নয়! সে ত একটা 'এড্‌ভেঞ্চার'! সাহিত্যিক উৎপল ইহাতেই মনের আনা রাজী হইয়া গেল; কহিল, একবার দেখাতে পারিস না?

শিশির বলিল, মেয়েটাকে তারা দেখাতে চাইবে না, তবে ছেলেটাকে পারি, এমন কি আজই। আর তারা যখন যমজ, তখন একটা থেকে আর একটার পরিকল্পনা, সে ত তোদের মতো সাহিত্যিকদের পক্ষে খুবই সহজ।

তা' বটে।—উৎপল রাজী হইয়া গেল। অনেকটা ওমরখৈয়ামের সেই সাকীর মতো একটা পায়জামাপরা রূপসীর ছবি তাহার মনের মধ্যে নৃত্য সুরু করিয়া দিল!

শিশির উৎপলকে সাবধান করিয়া দিল,—খবরদার ছেলেটা যেন আগে থাক্‌তে আমাদের ষড়যন্ত্র জান্‌তে না পারে। বলিয়া মুখখানিকে যথাসাধ্য প্রয়াসেও স্বাভাবিক না রাখিতে পারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাণী তখন একটী কবিতা কাটাকুটি করিতেছিল। দিদি আসিয়া ডাকিল, বান্থু।

ক্ষিপ্রহস্তে খাতাখানিকে লুকাইয়া বাণী উত্তর করিল, কি?

একটু মজা করতে হবে ভাই।

বাণী মুখ তুলিয়া মাত্র দৃষ্টি-প্রশ্ন করিল। কল্যাণী তাহার পাশে বসিয়া বলিল, ওই যে উৎপলবাবু এসেছেন না?

মুখখানিকে বিরক্তি-রেখাঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়া বাণী কহিল, কে তোমার উৎপল-বাবু, উৎকটবাবু আমি দেখবার জন্যে 'হাঁ' ক'রে বসে থাকি কি না?

কল্যাণী তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া বলিল, আহা, তাই কি আমি বল্‌ছি, তবে ওঁদের কথাবার্ত্তাগুলোও চুরি কর্‌তে অনেক সময় তোমায় দেখেছি কি না!

গাম্ভীর্য্যের ভাণে বাণী ডাকিল, দিদি! পরে ঘর হইতে পলায়ন-উদ্যতা হইল।

কল্যাণী তাহার হাত চাপিয়া ধরিল; বলিল, আচ্ছা, স্বীকার কর্‌লাম, তুমি ওসবের মধ্যে থাকো না, এখন যা' বল্‌ছি তাই শোনো। উনি ওঁর দিল্লীওয়ালা এক গাইয়ে বন্ধুকে আজ নেমতন্ন ক'রেছিলেন, তিনি এখন ব'লে পাঠিয়েছেন, তাঁর শরীর খারাপ, আস্‌তে পার্‌বেন না, তা' তোরও ত এদেশী গান কয়েকটা জানা আছে···

কথা শেষ করিতে না দিয়া বাণী বলিল, ছিঃ! ও আমি পার্‌ব না বাবু, তোমরা অন্য...

কল্যাণী বলিল, আ রে, না না, আমি একটা বেশ মৎলব ঠাউরেছি,—সেবার ওঁর সেই বন্ধু লছমন্ সিংকে 'এপ্রিল্ ফুল' বানাবার জন্যে আমি এক সুট্ দিল্লীওয়ালার পোষাক কিনেছিলাম না?—তাতেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। তুই গিয়ে মাত্র দু'-চারটে গান গেয়েই চলে' আস্‌বি।

প্রস্তাবটী প্রথম হইতেই বাণীর মনে ধরিতে-ছিল, কিন্তু লজ্জার শাসনে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। অনেক তর্কবিতর্কের পর কতকটা নিমরাজী হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তরুণ দিল্লীওয়ালাবেশী বাণী শিশির ও উৎপলকে গান শুনাইয়া গেল।

শিশির তখন উৎপলকে নিরালায় পাইয়া বলিল, কেমন ?

উৎপলের চিন্তাধারা তখন বাণীর সৌন্দর্য্যের লহরী ও তাহার শেষের গাওয়া গান খানির সুরের পিছনে ছুটিতেছিল—এমন লালিত্য, এমন লাবণ্য পুরুষের মধ্যেও থাকে ! এমন কোমল স্বর পুরুষের কণ্ঠ হইতেও নির্গত হয় ! হইবে না কেন ? উহারা ত যমজ ভাই বোন্,—ভাইটির মধ্যে বোনের প্রকৃতির প্রাধান্য আসিয়াছে,—বিশেষ আশ্চর্য্য কি ?—শিশিরের প্রশ্ন তাহার কর্ণে পৌঁছিল না।

শিশির উৎপলকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, কি রে, এর মধ্যেই ছেলেটির পাশাপাশি আর একটা কারুর কল্পনায় ডুবে গেছিস না কি ?

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া উৎপল বলিল, দূর !

শিশির তাহার কথায় মনোযোগ না দিয়া বলিল, কেমন লাগ্‌ল, বল্ ?

চমৎকার !

কি চমৎকার, ও নিজে, না ওর গান ?

দুই-ই।

তা' হ'লে সেটা তো আরও···কি বল ? 'এখনও তারে চোখে দেখি নি, শুধু'···শিশির কালোয়াতি সুরু করিল।

কৃত্রিম রোষে উৎপল বলিল, তুই থাম্ দেখি···।

আমি যদি ভাই একেবারে থেমে যাই তো তোরই লোক্‌সান। যাক্, এখন কথা তুল্‌ব ?

নির্ল্লজ্জ উৎপলের মুখ হইতে বাহির হইল, স্বচ্ছন্দে,···এমন কি এই ছুটিতেই ও কাজটা সেরে যেতে চাই।

বন্ধুবরের দক্ষিণ কর্ণটি চাপিয়া ধরিয়া শিশির বলিল, ও হে প্রেমিকপ্রবর, এটা যে আশ্বিন তোমার এই পবিত্র প্রেমের জন্যে কি ওরা হিন্দুয়ানী ত্যাগ করবে ?

তাও তো বটে ! উৎপলের মুখখানিতে সান্ধ্য-উৎপলের ন্যায় ম্লানিমা নামিয়া আসিল।

পরের অগ্রহায়ণে—

শিশিরের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া সহস্র কার্য্য ফেলিয়া উৎপল দিল্লী আসিয়া পড়িল।

শিশির মুখখানিকে যথাশক্তি বিষণ্ণ করিয়া বলিল, তোর খেয়ালটা একটু বিচিত্র কি না, তাই ভগবান সেটা পূর্ণ হ'তে দিলেন না···

উৎপলের বুকের মধ্যে 'ধড়াস' করিয়া উঠিল ; কাতরকণ্ঠে বলিল, ব্যাপার কি ?

কণ্ঠে হাসি চাপিয়া শিশির বলিল, সেই ভাইটি মরে গেছে, সুতরাং···

তাই ভাল ! উৎপল আকাশ হইতে পড়িতে পড়িতে যেন অবলম্বন পাইল, বলিল, আহা ! কি হয়েছিল রে ? তবে তো···

ওদিকে কল্যাণী বাণীকে জ্বালাইতেছিল। বাণীর একখানি কবিতার খাতা সে চুরি করিয়াছিল, সেখানি লইয়া বাণীর সম্মুখে আসিয়া জোরে জোরে পড়িতে লাগিল—ফাগুন যখন বুকের মাঝে আগুন দেবে জ্বেলে··

খাতাখানি কাড়িয়া লইবার জন্য বাণী তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কল্যাণী হাসিতে হাসিতে বলিল, আচ্ছা নে নে, আর পড়্‌ব না··· হ্যাঁ বাণু, বাবা সেদিন চিঠি লিখেছেন তোমার জন্যে, আঃ ! শোনই না···ভদ্রলোক শিম্‌লাতে থাকে, বরফের দেশ, তোমার বুকের আগুনটাও তো···

বাণী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। কল্যাণী গম্ভীর হইয়া বলিল, কেন বিয়ে কর্‌বি নে না কি ?

বাণী মুখখানি ভারী করিয়া বলিল, না।

কল্যাণী ঔষধ প্রয়োগ করিল, ও রে, কাল

রাত্রে আবার তোর সেই উৎকটবাবু এসেছেন।

বাণী মুখ খুলিল না।

ভগিনীর অন্তরের হর্ষালোক কল্যাণী দেখিতে পাইল; বলিল, আচ্ছা, ঐখানেই চেষ্টা করব না কি?

বাণী ঘর হইতে পলায়ন করিল।

শিশির ও কল্যাণী মনস্তত্ত্ববিদ ছিল না, কিন্তু উৎপলের 'ভাবিয়া দেখা'র ফলাফল শিশিরের জানা ছিল এবং বাণীর মনোভাবের উপর কল্যাণীরও যথেষ্ট অধিকার ছিল। সুতরাং একটি শুভতিথিতে মনস্তত্ত্ববিদ্ ও কবি পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়ে কৃতার্থ হইয়া গেল।

শিশিরের নিকট কল্যাণী আসিয়া বলিল, ও গো, এইবার আমার পারিশ্রমিকটা ..

সেটা আমার মতো গরীবের কাছ থেকে না নিয়ে—বলিয়া কল্যাণীকে টানিতে টানিতে শিশির আসিয়া সেখানে হাজির হইল, যেখানে উৎপল এবং বাণী তাহাদের বিচিত্র মিলনের গল্পে বিভোর হইয়াছিল। উৎপলকে লক্ষ্য করিয়া শিশির বলিল, ভায়া, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষটা পরে করো, এখন আমায় বাঁচাও—আমায় শ্যালিকা দায় থেকে উদ্ধার করেছেন বলে' ইনি আমার ঠেঁয়ে পারিশ্রমিক চান। আর ও গো কবিরাণী, বলি তোমার বুকের আগুন কি···

বাণী পলাইতেছিল, তাহার একখানি হাত কল্যাণীর হাতের উপর রাখিয়া নাট্যকারের ভঙ্গিতে উৎপল বলিয়া উঠিল, আপনার পারিশ্রমিকস্বরূপ আমার এই জীবনসর্ব্বস্বকে···

বাণী হাত ছিনাইয়া লইয়া দৌড় দিল; সকলে হাসিয়া উঠিল। তখন পাশের বাড়ীতে কে সুর দিতেছে,—মেরো দিল্‌কো পিয়ারা মেরো দিল্‌মে আতি হেঁ·········

—দু'দিন—

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

তিন বছর পরে একদিন।—

দ্রুত পথ চলেছি,—একটা ঝি এসে বল্লে, মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।

—আমাকে ?—বিস্ময়ে ওপরে চাইলাম। একটা মেয়ে তাড়াতাড়ি স'রে গেল।

কুৎসিৎ পল্লী। অনেকদিনের হারানো-স্মৃতি মনে প'ড়ে গেল। তবে কি······

তারপর—কেন যে ওপরে উঠে গেলাম, সে কথা আজও ভেবে উঠ্‌তে পারি না !

ঠিক তাই,—মিনুই বটে ! সে লাবণ্য নাই,—যেন আমার চেয়েও বড় হ'য়ে উঠেছে আজ ! শুষ্ক-পাংশু ঠোঁট দু'টি—কী কদর্য্য ! ঐ ঠোঁট এখুনি হয়ত কথাও বলবে !

ভাবি, কেন এমন হ'লো ! কিসের অভাব ছিলো এর ? মা, বাপ, ভাই, বোন্, স্বামী, পুত্র······

সেই তারাপদর কথা মনে পড়্‌লো।—ভাল-মানুষ ছেলেটি···

খবর যেদিন পেলাম—ভাবলাম, এত ভালবাসা, এই নিবিড় বন্ধন,—এর কি কোন অর্থই নাই ?

কান্নার শব্দে চম্‌কে উঠ্‌লাম ! দেখি, মিনু মাটিতে মুখ গুঁজে কাঁদ্‌ছে ! বল্লাম, আমাকে ডেকে এনে—এ আবার কি অভিনয় !

কথা বল্লে না। স'রে এসে আমার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়্‌লো।

বল্লাম, ছাড়—আমি যাই।

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মিনু বল্লে, আমার একটা-কথাও শুন্‌বে না ?

—আজ কি তার কোন প্রয়োজন আছে ?

—আমার বুকটা হাল্কা কর্‌তে দাও গো ! ব'লে জলভরা চোখে সে চাইলে।

বল্লাম, বল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বল্লে, না থাক্। কিন্তু আর সে কিছু না ব'লেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেই পুরোনো মিনু !—এম্নি ক'রেই নিজেকে সাম্‌লে নিতে ঘর থেকে পালিয়ে যেতো ! গালের তিলটি পর্য্যন্ত ঠিক তেম্নিই আছে ! আর—আর—না, না, কিছুই তো বদ্‌লায় নি ! ওকে দেখ্‌লাম,—আর রোজ-দেখা ছবির মতই কেমন সহজে মনে প'ড়ে গেল। এ যেন এক দুঃস্বপ্নের মত বর্ত্তমানকে অস্বীকার ক'রে তিন বছর পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি ! ছোট একখানি ঘর—আমি আর সে, সে আর আমি। সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় এক উচ্ছল যৌবনের স্বর্গ রচনা ! মনে পড়্‌লো—সেই একদিন—যেদিন, তার দাদা নিতে এলো। বল্লে, তোমাকে ছেড়ে কি ক'রে থাক্‌বো গো ! বল তুমি, ছুটি পেলেই একবার ক'রে দেখা দিয়ে আস্‌বে ?···

দীর্ঘ একটি বৎসর থাক্‌তে হবে—খোকা আস্‌ছে ;—এই আনন্দের পাশে আমাকে ছেড়ে যাবার বেদনা, কি অপরূপ হ'য়েই না সেদিন ফুটে উঠেছিলো !

তারপর, সেই একদিন—যেদিন খোকাকে দেখ্‌তে যাই। দেখ্‌লাম, কে-একজন তরুণ যুবা কন্দর্পের রূপ নিয়ে ঘর আলো ক'রে ব'সে ব'সে পড়্‌ছে। শুন্‌লাম, কলেজে পড়ে—খুব ভাল ছেলে। গরীব,—কেউ নেই ব'লে, ওঁরা ছেলের মত স্থান দিয়েছেন। নাম শুন্‌লাম, তারাপদ।

তারপর আর কিছুই জানি না। একদিন খবর পেলাম, মিনু ও তারাপদ কোথায় চ'লে গেছে। না, না—হয়ত সে সত্য নয়। হয়ত এই তিনটি বৎসর আমার সঙ্গে মিনু একটা তামাসাই ক'রে এসেছে! হয়ত এই কথাই তখন মুখ ফুটে বল্‌তে গিয়ে,—অভিমানে আর সে বল্‌তে পারে নি! হয়ত এ-কথাও সে ঐ সঙ্গে বল্‌তে চেয়েছিলো—ঠাট্টাও বোঝ না;

পায়ের শব্দে চম্‌কে দেখি, ঝি!—এদিক-ওদিক চেয়ে আমার কাছে এসে বক্‌সিস চাইলে। বল্লে, নতুন বাবু এলেই আমরা কিছু পেয়ে থাকি

মুহূর্ত্তে আমার চমক্ ভাঙলো! এই সুসজ্জিত ঘর—এই পালঙ্ক—ঐ মিনু—

তাড়াতাড়ি একখানা নোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি,—দেখি, দরজার সম্মুখে মিনু! বল্লে, যেও না। তোমার অপমান—ডেকে আমিই করালাম।

আমার কানের ভেতর কেবলই ঘুরে ঘুরে সন্-সন্ সন্-সন্ শব্দ হ'তে লাগ্‌লো। মনে হ'লো, সেই তারাপদ এই ঘরের চারদিক থেকে অকস্মাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো!

মিনু এসে আমার হাত ধর্‌লে। ঘৃণায় আমার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌লো! ব'ল্লে, ব'সো,—খাবার এনেছি।

জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই, আমার পা দুটো জড়িয়ে ধর্‌লে। বল্লে, হাতে আমার না খাও—কোন দুঃখই কর্‌বো না। কিন্তু একটু ব'সো। এইটিই আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ,—'তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে'—একথাও আজ আমার বল্‌বার অধিকার নেই! বরং বল্লে, ব্যঙ্গের মতই শোনাবে! এতদিন এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুধু লোকের যাওয়া-আসা দেখেছি! কেন জানি না—মনে হ'তো, ঐ অসংখ্য লোকের মধ্যে কোনদিন না কোনদিন তোমাকে দেখ্‌তে পাব। কাজও তো পড়্‌তে পারে এই পথে।

—সতীনারীর কামনা তা হ'লে ব্যর্থ হয় নি—কি বল? ব'লে একটু হাসলাম।

মিনু অনেকক্ষণ আর মাথা তুল্‌তেই পার্‌লে না। তারপর বল্লে, তুমি এমন ক'রে আঘাত দেবে জান্‌লে আমি বল্‌তাম না। আজও খুঁটি-নাটি ক'রে স্বামীর কাছে বল্‌বার স্বভাব আমার মরে নি—এইটিই আশ্চর্য্য! আজও মনে হয়, আমি সেই তোমার কাছেই আছি: সেই ছোট্ট ঘর—ছোট্ট আশা···

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না। মিনু বোধ হয় কাঁদ্‌ছিলো। বল্লে, কতদিন নিজের হাতে তোমাকে খাওয়াতে পারি নি—খাবে না কিছু?

বল্লাম, আমার সাম্‌নে তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা কর্‌লো না? হু হু ক'রে তার চোখে জলের বন্যা এলো। বল্লে, অমন্ ক'রে আঘাত ক'রো না গো, আজও আমি কথা সইতে পারি না!

আমার বুকের ভেতর তোলপাড় ক'রে উঠ্‌লো! চেয়ারটা টেনে ব'সে পড়্‌লাম।

বল্লে, খাও, আমি একটু দেখি। দোকানেও তো যার-তার হাতে খাও।

আর আঘাত দিতে ইচ্ছা কর্‌লো না। নীরবে একটি একটি ক'রে মুখে তুল্লাম। অনেকক্ষণ থেকে একটি কথা বল্‌বার জন্যে জিভ অসংযত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। বল্লাম, তারাপদ কোথায়? দেখ্‌ছি না!

অতি সহজ কণ্ঠে মিনু বল্লে, সে তো অনেক-দিনই পালিয়েছে।

বিস্ময়ে মুখের দিকে চাইলাম!

—কাপুরুষটার ব'লে যেতেও সাহস হ'লো না! হয়ত ভেবেছিলো, আমি তাকে ছেড়ে দেবো না! ব'লে মিনু মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লো।

আবার সেই অসচ্ছন্দতা। যন্ত্রের মত খেয়ে চলেছি।

—হয়ত এতদিন একটা বিয়েও করেছে! ওদের জীবনের দাম আছে, প্রয়োজন আছে,—ওদের কি অমন ক'রে ভেসে পড়লে চলে? চিঠি লিখে জানিয়েছিলো,—তোমার জন্যে আমি মান-সম্ভ্রম নষ্ট কর্‌তে পারি না—যা করেছি তা' করেছি,—এবার ঘরে ফির্‌লাম।—না, না, তুমি উঠো না। ঐ মিষ্টিটা খাও লক্ষ্মী!

আমার কান দুটোর ভেতরে কে যেন কার্ব্বলিক্ এসিড্ ছিটিয়ে দিলে! লক্ষ্মী—লক্ষ্মী,—আমাকে ডেকে এনে, এ কি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গাভিনয়!

বল্লে, বিয়ে করেছো?

—না।

—কর নি?—কেন, মেয়ে জাতটার ওপর ঘেন্না ধ'রে গেছে?

বেশ একটু জোর দিয়েই বল্লাম, হাঁ।

অনেকক্ষণ কি যেন ভাব্‌লে। তারপর বল্লে, বল না—সত্যি?

হাসি এলো। বল্লাম, আজ আর তোমার সে ভয় কেন?

– হাঁ, তা বটে! আমার বুক দুর্ দুর্ কর্‌ছিলো! এম্নি মেয়েমানুষের স্বভাব!—এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?

—একটা কাযে।

—আর কোনদিন যাবে না? - বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌লো।

বল্লাম, কেন?

—ঘরেই না হয় নেবে না...

আর সে বল্‌তে পার্‌লে না,—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নই ওঠে। কিন্তু আমাদের জীবনে ঐ তারাপদকে তো কিছুতেই ক্ষমা কর্‌তে পারি না! হয়ত আজও মিনু আমাকে ভুলতে পারে নি। কিন্তু একদিন একটা মুহূর্ত্তও তো এসেছিলো, যেদিন সত্যিই আমাকে সে ভুলেছিলো!

বল্লাম, ভুলে যাও মিনু! ভুল্‌তে যখন এক-দিন পেরেছিলে –

মিনু কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলো। বল্লাম, থাক্,—একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করার চেয়ে এখানে লজ্জা আর কিছু নাই! বরং তুমি আমাকে কটু কথা বল—শোভন হবে।

— কটু কথা?—ব'লে কি যেন ভাব্‌লে।

তারপর বল্লে, আজ সবই আমার অভিনয়ের মত শোনাচ্ছে—নয়? একটা ভুল করেছি,—কিন্তু তাই ব'লে - তোমাকে ভুল্‌তে পারি নি—পারি নি।

ব'লেই আমার পায়ের ওপর মুখ ঘ'সে ঘ'সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো! আমার চোখেও জল টল্-টল্ করে উঠ্‌লো। হৃদয়ের এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই তারাপদর কথা বারবার ক'রে মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো!—অম্নি চোখের জল শুকিয়ে গেল!

মিনু তখন আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। তার মুখের দিকে আর চাইতে পার্‌লাম না। ব্যথা দেবার প্রলোভনও আর ছিলো না। বল্লাম, আজ ছাড়ো—আর একদিন না হয় আস্‌বো।—

—আস্‌বে—আস্‌বে তুমি?—যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে!

ঝি এসে বল্লে, এক বাবু এসেছে।

মুখের কথার যে এতখানি দাহিকা-শক্তি আছে, আগে জান্‌তাম না! আমার সমস্ত মুখখানাকে ঐ কটা কথা যেন পুড়িয়ে কালো ক'রে দিয়ে গেল! দেখ্‌লাম, মিনুও অম্নি আগুনের মত দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো! হয়ত তার জন্ম-জন্মার্জ্জিত নারী-সংস্কার এতদিনের কুশ্রীতাকে দুইপায়ে ঠেলে আজ অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে! কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরেই সে নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে লজ্জায় ম'রে গেল!

দুই হাতে মুখ ঢেকে কি ভাব্ছিলো সেই জানে! হয়ত তার মনটা বারবার ছি ছি-ই কর্ছিলো!

ঝি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চ'লে গেল। ভাব্লাম, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। ঝি যদি আমারই সাম্নে সেই বাবুটাকে···

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্বার জন্যে বল্লাম, আজকের কথা ভুলে যেও,—আমি চল্লাম।

আমার পা দুটো শক্ত ক'রে আঁক্‌ড়ে ধ'রে বল্লে, আমার খোকা?

—ভাল আছে—ভাল আছে। ব'লে পা দুটো ছাড়াবার চেষ্টা কর্‌লাম। কিন্তু কী শক্তি ঐ ক্ষীণ শুষ্ক হাত দুখানির!

ডাক্‌লাম, মিনা!

মুখ তুলে চাইতেও পার্‌লে না। আমার পায়ের ওপর মুখ রেখে শুধু রুদ্ধ আবেগে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

সেই নীরব মুহূর্ত্তে আমি একটি নব নীড়ের স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। মিনাকে নিয়ে অনেক দূরে—

কিন্তু ছি!

নীচের কোন-এক ঘরের মত্ত-নারী কণ্ঠের কুৎসিৎ রসালাপ কানে এলো। সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো!—মিনা তো আজ ওদেরই একজন! হয়ত ওদেরই মত অগ্নি ক'রে···

একটা লাথি মেরে দূরে স'রে দাঁড়ালাম। বল্লাম, সব ঢঙ্-ই শেখা হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছি!

মিনা সে কথার কোন উত্তরই না দিয়ে আবার গড়াতে গড়াতে আমার পায়ের ওপর এসে পড়্‌লো। বল্লে, একবার আমার খোকাকে দেখাও।

সমস্ত বাড়ীখানার দূষিত হাওয়ায় যেন আমার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিলো। বল্লাম, তাকে দেখ্‌বার যোগ্য নও।

আবার সেই কান্না। বল্লে, একবার—একবার।

—না, তা' হয় না। ব'লেই ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

আর একদিন।—

অফিস থেকে বাড়ী ফির্‌ছি। আমার দোর গোড়ায় মিনুর ঝির সঙ্গে দেখা। বল্লে, বাবু—শীগ্‌গীর আসুন,—অনেকক্ষণ ব'সে আছি।

বুকটা 'ছাঁৎ' ক'রে উঠ্‌লো! বল্লাম, কি হয়েছে?

—দিদিমণি কেমন কর্‌ছে।

একটা অজানা আশঙ্কা বিদ্যুতের মত মনটাকে নাড়া দিয়ে গেল। একি অভিশাপ! যে আমার আজ আর কেউ নয়,—তার জন্যে একি ব্যাকুলতা আমার? অথচ সেদিনের দেখাকে একটা দুর্ঘটনা বল্‌তেই বা পার্‌ছি কই?

ঘরে এসে দেখ্‌লাম, মিনু মেঝের ওপর খোকারই একটা পুরোণো বালিশ বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। বল্লে, এসো—কাছে এসে ব'সো।

হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে আমার পা দুটো বুকের কাছে টেনে নিলে। চোখে কত জলই না তার ছিলো! বল্লে, অনেক দুঃখ দিয়ে গেলাম তোমাকে,—ক্ষমা ক'রো। আর—আর—একবার খোকাকে দেখাবে না?

বল্‌তে বল্‌তে চোখের তারা তার বড় হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্লাম, কি কর্‌লে মিনু!—কেন এ কাজ কর্‌লে?

—কেন?—উত্তেজিত হ'য়ে অনেক কথাই বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেল।

দেখ্‌লাম, মুখ দিয়ে তখন ফেনা কাট্‌ছে। নীরবে তার হাতখানি কোলের ওপর তুলে নিলাম।

বল্লে, বেঁচে থেকেই বা কি কর্‌তাম বল?

হঠাৎ আমার চৈতন্য ফিরে এলো। বল্লাম, না, না,—আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

আমার হাতখানা শক্ত ক'রে ধ'রে একটু হাস্‌লে। ঝি এসে বল্লে, একবার খোকাকে এনে দেখান বাবু! কাল সারারাত খোকা—খোকা ক'রে মাথা খুঁড়েছে।

খোকাকে নিয়ে যখন ফির্‌লাম, তখন সব শেষ হ'য়ে গেছে। ভাসা ভাসা চোখ দু'টি স্থির হ'য়ে তখনও যেন খোকার প্রতীক্ষাই কর্‌ছে! চীৎকার ক'রে ডাক্‌লাম, মিনু!—তোমার যে খোকা এসেছে!

মিনার চোখের পাতা আর পড়্‌লো না!

—যৌবন-স্বপ্ন—

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

এক

ফুটবল খেলা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার মুখে ক্লাবের ক্যাপ্টেন সুবোধ বলিল,—"দেখ হরে,—একদিন একটা মজার খেলা খেললে হয় না? ম্যারেড ভার্সেস অন্‌ম্যারেড।"

সকলে উৎসাহসূচকধ্বনি করিয়া কহিল, "বাঃ—চমৎকার!—বেশ মজা হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে ম্যারেড অন্‌ম্যারেডের দল বিভাগ হইয়া গেল। কিন্তু অবিবাহিতের সংখ্যা বেশী হওয়ায় সকলের সুখ কল্পনাটা বেশ একটু বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। মাত্র পাঁচজন মেম্বর বিবাহিত। কি করিয়া দল গঠন হইবে? সকলে ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া এ সমস্যার পূরণ হয়?

অবশেষে সতীশ সব সমস্যার সমাধান করিয়া বলিল, "কেন, যারা বয়সে বড় তাদের বিবাহিতের দলে ভিড়িয়ে দেওয়া হোক্।"

সকলে বলিল, "বেশ।"

কিন্তু বয়সে বড় এক অরুণ ছাড়া আর কাহাকেও পাওয়া গেল না। সে বেচারী সকলের শেষে আসিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিতে টানিতে একেবারে সকলের মাঝখানে আনিয়া রমেশ বলিল, "এই যে অরু আছে। বিয়ে না হ'লেও বয়সে তোদের সকলের সিনিয়ার।"

সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অরুণের সমস্ত মুখখানা ঊষার অরুণ রাগের মতই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

মাধব বলিল,"ঠিক্ বলেছ রমেশ-দা'। বেচারী যেন পাঁড় শসা।"

আবার উচ্চ হাসি।

অরুণ রাগে ফুলিতে ফুলিতে এক টান মারিয়া হাত ছাড়াইয়া তীব্রস্বরে কহিল, "যাঃ!—কি ইয়ারকি করিস, ভাল লাগে না।"

করুণা মুখের গোড়ায় হাত নাড়িয়া থিয়েটারী ঢঙে বলিল, "ভাল নাহি লাগে সখা মলয় সমীর পিক্ কুহুতান—"

নীলমণি সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিল, "এনে দে তারে এনে দে সজনী—কাঁদে বুঝি প্রাণ..."

অরুণ বিব্রত হইয়া একবার মুক্তির আশায় চারিদিক চাহিল, কিন্তু কোথাও ফাঁক নাই। যেন তাহাকে ঘেরিয়াই উহাদের রহস্য নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

একটী ছেলে পিছন হইতে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা অরু-দা'—তুমি আজ অবধি বিয়ে কর নি কেন?—"

এই 'কেন'র একটী সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। সে গুপ্তকথা প্রকাশ করিবার দুঃসাহস অরুণের ছিল না, কাজেই সে সহজভাবে জবাব দিল, "কেন কি আবার? আমার খুসী! বিয়ে ক'রে কি আর দুটো হাত-পা বেরুবে?—"

মোহিত বলিল, "হাত-পা বেরুক, চাই না বেরুক, তবু লোকে বিয়ে করে। কেউ অসুখী হয়েছে বলেও তো শোনা যায় না। তোর বাবু বিদ্‌ঘুটে প্রতিজ্ঞা! যা রয় সয় তাই ভাল।"

কুমুদ সব্যঙ্গে বলিল, "ওরে বুঝিস্ না রে, বুঝিস্ না। এ হয়েছে ঠিক্ তাই—'গ্রেপস্ আর সাওয়ার।' নাগালের বাইরে হ'লে একটা বাহ্যিক নির্লোভতা না দেখালে যে চরিত্রের

অনেকখানিই অঙ্গহানি হয়।” বলিয়া হাসিতে লাগিল।

কথাটা কতকাংশে সত্য।—

অরুণের পিতামাতা ছেলের বিবাহের চেয়ে লেখাপড়াটাকেই বেশী বড় করিয়া দেখিতেন।—বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি পরীক্ষার রত্নে পুত্রটিকে ভূষিত করিয়া উচ্চ পণে বাজার দর যাচাই করিয়া লইবেন এই ছিল পিতার আজন্ম সঙ্কল্প —যা মনে মনে খুঁতখুঁত করিলেও রাশভারী কর্ত্তার মুখের উপর কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। সমবয়সী সকলের একে একে বিবাহ হইয়া গেল।

কি তাদের স্ফূর্ত্তি! কেমন হাসি হাসি মুখ! কত গল্প, কত বিচিত্র কাহিনী স্বপ্নের মতই অরুণের তরুণ চিত্তে কল্পনার মাধুর্য্য জাল বুনিয়া তাহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া দিত। বন্ধুদের গোপন কথার প্রতি সুধাকণাটুকু সে তৃষিত চাতকের মত পরম আগ্রহে গিলিত। তাহাদের পরিহাসের উত্তরে তাহার তরুণ চিত্ত মনে মনে বাপ-মায়ের উপরে বিদ্রোহী হইলেও বাহ্যিক শুষ্ক প্রতিজ্ঞার আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া সর্ব্বদাই প্রচার করিত,—বিবাহ সে জীবনে করিবে না। চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। তারপর যোগী-ঋষিদের কত সম্ভব-অসম্ভব আকাশ কুসুমের গল্পে শ্রোতাগণকে বিস্মিত—চমকিত—বিমোহিত করিয়া দিত।—

কুমুদের কথায় অরুণ মাথা নাড়িয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, “তোর মাথা হয়। মোদ্দাং বিয়ে আমি কর্‌বো না। বাপ-মাকে পইপই করে ব'লে দিয়েছি, কাজেই তাঁরা নিশ্চেষ্ট। আচ্ছা কুমুদ, তুই তো বিয়ে করেছিস, সত্যি ক'রে বল দেখি, আগেকার চেয়ে কি বেশী সুখী হয়েছিস? কেবল ভাবনা—কেবল চিন্তা। এ একরকম বেশ আছি, খালি স্ফূর্ত্তি—আমোদ করে বেড়াও। মুক্ত—স্বাধীন জীবন।”

অবিবাহিত সকলে সমস্বরে এ কথায় সায় দিল। কুমুদ হাত তুলিয়া বলিল, “থামুন মহাশয়েরা, থামুন। গোলাপে কাঁটা আছে মানি, তবু তার গন্ধ ও সৌন্দর্য্যটুকু উপভোগ কর্‌তে হ'লে সে বাধা তুচ্ছ বলেই মনে হয়। তখন কাঁটার ব্যথা সুখের মধুর স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে।—”

সুবোধ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সোৎসাহে বলিল, “সাবাস! কথায় আছে—‘কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে’—”

অরুণ বলিল, “তোদের সঙ্গে তর্ক মিছে। তবে আমার দিক দিয়ে এটুকু জানাতে পারি,—কাঁটার ব্যথার আড়ালে যত সুখই কেন লুকোনো থাক না, সেটুকু পাবার তরে কোনদিন আমার এতটুকু আগ্রহ নেই। তোরা তো ল্যাজকাটা শেয়াল, দলে টান্‌বার জন্যে কত প্রলোভনই দেখাবি।—”

রমেশ বুকে চাপড় মারিয়া বলিল, “কিন্তু অদ্রিসম অটল এ হিয়া—”

ভূপেন বলিল, “কলির ভীষ্ম। দেখা যাক্ কতদিন এ প্রতিজ্ঞা থাকে?”

অরুণ সগর্ব্বে বলিল, “দেখে নিস।—”

কিন্তু এক সপ্তাহ পরে ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা শিথিল হইবার সংবাদ পাইয়া রমেশ বলিল, “ও হে, শুনেছ নতুন খবর—ভীষ্মদেবের যে বে'।—”

সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।—

রমেশ বলিল, “বিশ্বাস হচ্ছে না? এই মাত্র আমি ওর মার মুখে শুনে আস্‌ছি! আচ্ছা অরু, সত্যি করে বল তো—।”

অরুণ আম্‌তাআম্‌তা করিয়া বলিল, “বিয়ে?··· কই না—আমি জানি না ঠিক্।···”

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।—

সুবোধ অগ্রসর হইয়া তাহার হাতে একটা

প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, "লজ্জা কেন রে! আই কন্‌গ্রাচুলেট ইউ।"

কুমুদ বলিল, "তা' হ'লে মশায়ের ভীষণ প্রতিজ্ঞা? তার জল-সমাধি কি এইখানেই—"

রমেশ বলিল, "কাজেই। নৈরাশ্যে প্রতিজ্ঞাটা খোলে ভাল। আশার আনন্দে যে ও গুলোকে ধরে রাখে সে মূর্খ—মহামূর্খ।—"

অরুণ কৈফিয়ৎ দিল, "বাপ-মা বড় ধরে পড়লেন—শেষে কান্নাকাটি! ভাবলুম, দূর হোক্—তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে—"

করুণা বলিল, "সাধুপুরুষ! দ্বিতীয় পরশুরাম আর কি!

সকলে হাসিতে হাসিতে অরুণকে পাগল করিয়া তুলিল।—সুবোধ হাঁকিল, "এই রেডি হয়ে নাও—সময় হয়েছে।"

দুম্‌দাম্ করিয়া বল পড়িতে লাগিল—অরুণও হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।...

কিন্তু অরুণকে দারুণ লজ্জার সাগরে ডুবাইয়া এ বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। কল্পনার রঙীন সৌধ যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সম্মুখে মরুভূমি রচনা করিয়া দিল। মনের দুঃখে সে আর বাড়ীর বাহির হইল না!—নির্জ্জন ঘরখানিতে পড়িয়া ভাবিতে লাগিল,—তাহার কপালে সবই কি সৃষ্টিছাড়া! দীর্ঘদিন পরে যদি বা সুখের আলো উঁকিঝুঁকি দিল, তাহা কি না নিরাশার মেঘে ঢাকিয়া···অন্ধকারে সব আশার অবসান করিল! তাহার চেয়ে ছোট ওই করুণা, রমেশ, কোন্ কালে তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের তরুণ হৃদয়ের হাসিখুসি কত সরস গল্পে-গানে কেমন দিন দিন বিকশিত হইয়া উঠে—!···কি অনাবিল—কি উচ্ছ্বসিত ভালবাসা! একটী সৌন্দর্য্যময়ী তরুণী নিশীথের নীরব শয্যা আলোকিত করিয়া বুকখানির অতি নিকটে তাহার তপ্তস্পর্শ লইয়া মাদকতার মাধুর্য্য সৃজিয়া তরুণের সমস্ত মনপ্রাণ বিভোল করিয়া কত ছন্দ কত গান রচনা করিবে! ধন্য হইবে নিশিথিনী—সার্থক হইবে স্বপ্ন! বিচিত্র রাগিণী শুধু কোমল হইয়া সুধাধারা ঢালিয়া এই উষর মরুর শুষ্ক বক্ষ সরস করিয়া তুলিবে! তখন, তখন—শ্রীতে—সম্পদে—উচ্ছ্বাসে জীবনের শুভ্রতট ফেনিল আনন্দে—

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল,—বৃথা চিন্তা!—তাহার শুষ্ক প্রতিজ্ঞারই বুঝি জয় হয়! সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে তো কাহারও বিশেষ আগ্রহ দেখি না। সকলে বেশ নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে আপনাপন সুখসম্পদ লইয়া দিন কাটাইতেছেন। এ দিকে যে একটী তরুণ হৃদয় 'জল'—'জল' করিয়া মরিতেছে...

পিতা না হয় বিষয়ী লোক—অতটা খোঁজ করিবার অবসর পান না। কিন্তু মা? তিনিও তো বেশ পূজা-আহ্নিক লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, পুত্রের বয়স ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে—তাঁরও সংসারে দ্বিতীয় বধূ নাই—পোড়া প্রাণে কি একটু সাধ-আহ্লাদও হয় না গা? একটী ফুটফুটে মুখ,—চঞ্চল চরণের রুণুঝুণু শব্দ,— মিষ্ট 'মা' ডাক, এ সবের আকাঙ্ক্ষা কি তিনি পূজার বেদীতলে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছেন?—নাঃ—সংসারটা স্বার্থপর!

ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিল—আরও মাসখানেক অপেক্ষা করিয়া দেখিবে—যদি তাঁহারা প্রতীকার না করেন তো—শেষ সম্বল লোটা আর কম্বল। এ ভাবে আশা-নিরাশার মাঝে দগ্ধানোর চেয়ে—সে শতগুণে শ্রেয়; তবু একটা সম্পূর্ণ পথ—

এক সপ্তাহও কাটিল না—প্রসন্না ভাগ্যদেবী অরুণের সাথে প্রবঞ্চনার খেলা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সত্যই তার ললাটে শুভ-বিবাহের হৈম-কিরণছটা ঝলকিয়া উঠিল। আবার সে মহানন্দে বাড়ীর বাহির হইল।—

পাত্রীপক্ষ একেবারে আশীর্ব্বাদ করিয়া

অরুণের পিতার প্রার্থিত বিরাট ফর্দ্দে সম্মতি দিয়া সব বন্দোবস্ত পাকা করিয়া তাহার সকল দুর্ভাবনার অবসান দূর করিয়া দিল।

এতদিনে—দুখ নিশি হল অবসান।—

দুই

বিবাহ—বিবাহ!

কি মধুমাখা অক্ষরত্রয়ে সংযুক্ত কথাটি!

এ কি স্বর্গের সৃষ্টি—না মর্ত্ত্যের কল্পনা?

কৈশোরের সীমাপ্রান্তে বাসনার অতি ধীর ব্যাকুল উন্মেষ শুধু ঐ সুধাবিগলিত কথাটিতে রঙ্গীন যৌবনের সর্ব্ব কামনাকে উজ্জ্বল মূর্ত্তি দান করিয়া এক বিশাল বারিধির সৃষ্টি করে। তার অধীর আবেগ—উদ্দাম তরঙ্গ—প্রমত্ত লীলা—সীমাহীন আনন্দ—সব কয়টি মিলিয়া যৌবনকে চিরচঞ্চল চিরনূতন সাজে সাজাইয়া মানুষের অনুরাগকে প্রবল করিয়া গড়ে। শৈশব কৈশোর তখন তুচ্ছ স্মৃতি মাত্র—অনাগত ভবিষ্যৎ আঁধার মগ্ন—শুধু নয়নে মোহ অঞ্জন মাখাইয়া জাগিয়া আছে—মদমাধুর্য্যময় দীপ্ত প্রখর যৌবন!

অরুণের শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত যৌবনের রাগে মাতিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। নয়নে এক বিচিত্র স্বপ্ন আবেশ,—গমনে এক উগ্রগতি—কথায় উচ্ছ্বসিত স্মিত হাস্য ঝড়িয়া পরিতেছে।—

সুতার বন্ধনী পরিয়া অরুণ ভাবিল,—এতো বন্ধন নয়—যৌবনের রক্তরাখী যে! এত সুখ ইহার পরতে পরতে! যাঁতি হাতে যেন সব জঞ্জাল সাফ্ করিয়া সে তার অন্তহীন সুখের বর্ত্ম সুগম করিতে চলিয়াছে। সুন্দর অনুষ্ঠানগুলি! কুলা-ডালা-প্রদীপ প্রভৃতির বরণের সঙ্গে সঙ্গে এ কি অদম্য পুলক তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল—! সে কি মর্ত্ত্যেরই চিরহতাশদগ্ধ অরুণ, না কল্পলোকের আর কেহ?—

বিদায় মুহূর্ত্তে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি আন্‌তে যাচ্ছ?—"

একজন প্রতিবেশিনী বলিয়া দিলেন, "বল, দাসী আন্‌তে যাচ্ছি।"

অরুণ তাঁহার দিকে কটমট করিয়া চাহিল। বিক্ষুব্ধ মন প্রবল আপত্তি তুলিয়া বলিল, "দাসী! ন্যুইসেন্স! এই জন্যই তো বাঙ্গালী জাতির এত অধঃপতন! স্ত্রী জাতি—দাসী? ছি! ছি! রাণী—রাণী! হৃদয়ের রাণী সে!"

প্রতিবেশিনী তাহার চিন্তাজাল ছিঁড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "বল ঠাকুর-পো, তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্ছি।"

ক্রুদ্ধ অরুণ কোন অপ্রিয় রূঢ় বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে ইচ্ছা করিল না। কারণ সে দেখিতেছিল তাহার গায়ে হলুদ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি কথাটি উপহাসের তরঙ্গ তুলিয়া এই বাক্‌সর্ব্বস্ব মেয়েগুলার আনন্দের খোরাক যোগাইতেছে। প্রতি কথায় কি উচ্চ বিকট হাসি! মনটা আনন্দের উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা ছিল তাই রক্ষা, নতুবা··।

প্রকাশ্যে একটু চড়িয়া বলিল—"বলেছি।—"

প্রতিবেশিনী বলিলেন,—"মনে মনে নয়, চেঁচিয়ে বল্‌তে হয়।"

মা বলিলেন, "হয়েছে।—"

অরুণ হাঁফ্ ছাড়িয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল। ভোঁ-পোঁ-পোঁ—ঝম্-ঝম্ ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল, ব্যাগ্-পাইপ আনন্দে তান ধরিল—'হৃদয় আসন রেখেছি শূন্য তব আশাপথ চাহিয়ে।' অরুণও সেই তালে মাথা নাড়িয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিল।—থিয়েটারের যবনিকা উঠিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ঐক্যতান বাদন যেমন অভিনেতাদের হৃদয়ে নানা রসের সঞ্চার করিয়া উদ্দীপনার সৃষ্টি করে—তালে তালে হৃদয়কে নাচাইয়া তোলে—অরুণও তেমনি যাত্রা-পথের এই বিচিত্র সুরতানলয়ের মধ্যে আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিয়া ধন্য হইয়া গেল।---

উলু উলু উলু। বর আসিয়াছে। কল কোলাহল

ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে একপাল মেয়ে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

কে একজন তাহাকে কোলে করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া এক সুসজ্জিত মখমলমণ্ডিত তাকিয়া ফুলদানী বাতিদানশোভিত বিচিত্র আসনে ফুলের মাঝখানে বসাইয়া দিয়া গেল।—বন্ধুরা চারি পাশ ঘিরিয়া বসিল। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ তাহাকে দেখিবার জন্য দুই ধারে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ছুটা-ছুটি করিয়া কলরব করিতে লাগিল। অরুণের বুকখানা আনন্দে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল—সে বড় কেউ কেটা নয়! ওই অগণিত জনসংখ্যা তাহারই দর্শনাশায় ব্যগ্র। তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই উজ্জ্বল উৎসব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বেশ গম্ভীর চালে মুখে একটা প্রসন্নতার ছাপ ফুটাইয়া ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া সকলের প্রশংসমানদৃষ্টিকে বিস্ময়চকিত করিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল—কখনো বা পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া দু'-একটি কথা বলিয়া যেন তাহাদের কৃতার্থ করিয়া দিতে লাগিল।

সব সুন্দর, কিন্তু বিবাহের সুদীর্ঘ মন্ত্রগুলি এত আনন্দের মাঝেও অসহ্য! আর কতক্ষণ বক্ বক্ করা যায়? মেয়েরা জানাইল, স্ত্রী-আচার হইবে।

ছাঁদনাতলায় চারধারে কলাগাছ পোতা শিলের উপর বর আসিয়া দাঁড়াইল। হুলু ও শঙ্খধ্বনিতে হর্ষপ্রকাশ করিয়া মেয়েরা কুলাডালা প্রভৃতি লইয়া বরণ করিতে লাগিল। সহসা পৃষ্ঠদেশে একটী কোমল করের মুষ্টি স্পর্শ হইল। অরুণ পিছন ফিরিয়া দেখিল,—এক সুন্দরী তরুণী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছে।

ঠক্ করিয়া থালাটা কপালে লাগিল। বরণের সময় একজন তরুণী পিছন হইতে মাথাটা ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়াছিল। অত্যধিক আনন্দে সে দেখিল ইহাদের সুমধুর অত্যাচারও ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ বরণের সময় কপালের কাছে জাঁতিখানি তুলিয়া ধরিল।

বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা কন্যাকে তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করানো হইল। অরুণ বার-বার সতৃষ্ণ-নয়নে বস্ত্রমণ্ডিতার পানে চাহিতে লাগিল।

তারপর—শুভদৃষ্টি!

অরুণের পলকশূন্য চক্ষু বহুক্ষণ হইতেই বস্ত্রাবরণের রহস্য ভেদ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ক্ষুধিত-আগ্রহে নিশ্চল নয়ন সে-দিকে স্থির করিয়া রাখিল।

ধীরে ধীরে আচ্ছাদন উঠিল।

অরুণ দেখিল,- গৌরবর্ণ মুখে এক জোড়া পদ্ম-পলাশ নয়ন পাশাপাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। নাসিকা-রূপ প্রাচীরের বালাই নাই। বৃহৎ ললাটে কয়েক গাছা অবাধ্য কেশ বাগ না মানিয়া বিদ্রোহ ঘটাইয়া দিয়াছে। নলি-নলি হাত দু'খানি পিঁড়ি ধরিয়া দেহের সমতা রক্ষা করিতেছে। দেহলতা ক্ষীণ, যেন বাতাসে উড়িয়া যাইবে। অরুণের অমনি মনে পড়িল—

"মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি"

ঠিক্ তাই। পরমাসুন্দরীর লক্ষণই যে এই,—তন্বী সুগৌরা পদ্মপলাশনয়না ক্ষীণ বায়ু-বিক-ম্পিতা দেহলতা!

টুপ্ করিয়া আবরণ পড়িয়া গেল। যেন অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দুষ্ট রাহুর গ্রাসে কপিশবর্ণ ধারণ করিল। ক্ষুণ্ণমনে আবার সেই নীরস পুরোহিতের সাম্‌নে বসিয়া অরুণ দারুণ বিরক্তিতে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। পুরোহিত কন্যার হাত তাহার হাতের উপর রাখিয়া জলপূর্ণ ঘটের উপর ফুল দিয়া বাঁধিলেন।

করস্পর্শে অরুণের সমস্ত রক্তকণা নাচিয়া

নাচিয়া পুলক-বন্ধনের মাঝে আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল।

এত কোমল মানুষের হাত! যেন বিদ্যুৎ-ভরা একরাশ পেঁজা তুলা! প্রতি স্পন্দনে প্রাণ-ময়ী ভাষা! অরুণ কি পাগল হইয়া যাইবে? ধীরে ধীরে মৃদু চাপ দিয়া সে হাতখানি দোল দিতে লাগিল। কিন্তু অপর পক্ষ হইতে কোন ইঙ্গিত? একটু চাপন? কম্পন? নাঃ– কিছুই বোঝা যায় না। আরও একটু চাপ দিল। কই না ত? তবে কি পাষাণ? কোন অনুভূতিই এর নাই? আরও চাপ দিল – সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট —'উঃ!' বলিয়া সেই একরাশ নরম ফুলের মত হাতখানি খসিয়া মাটিতে পড়িল। ফুল-জল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ পুরোহিত ব্যাপার দেখিয়া একটু মুচকিয়া হাসিলেন ও পুনরায় দু'টী কর গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন। অরুণ পৃথিবীর ঘৃণা-লজ্জা-ভয় কাটাইয়া যেন তখন নূতন জগতের প্রাণী হইয়া গিয়াছে। আপনার রসিকতায় প্রিয়ার মুখ ভাব দেখিবার জন্য আড় নয়নের চাহনি দিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে। দৃষ্টি আর নড়ে না—পলক আর পড়ে না!

বরের অভিভাবকেরা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"উঃ ঘোর কলি! ছোঁড়া কি বেহায়া গো।—"

সকলে উঠিয়া গেলেন। অরুণ একদৃষ্টে প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাসর-ঘর!

সুসজ্জিতা রূপসী তরুণীর ঝাঁকে পড়িয়া অরুণ আর একবার দিশেহারা হইয়া গেল। কণ্ঠে দেবী বীণাপাণি বাক্য ও সঙ্গীতের তরঙ্গ তুলিয়া কল্পনার কল্পলোকে উধাও করিয়া দিলেন।···সে ভাবিল,—জীবনে যাহার এমন দিন না আসিতেছে, তাহার মনুষ্যজন্মই বৃথা!

এত আমোদ– এত হাসিরাশি হৃদয়ের কোন্ পাতালপুরী হইতে ভোগবতীর সুধাধারা উৎসারিত করিতেছে! বিবাহ-রূপ পার্থ শরে সুনির্ম্মল গঙ্গাবারি পীযূষের ধারায় ধারায় মুমূর্ষু দেবব্রতের ন্যায় তাহার তৃষাতপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অন্তরকে প্লাবিত রসসিক্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া দিতেছে!

পরদিন।—

বন্ধুরা ডাকিয়া তাহার দেখা পাইল না। একবার মাত্র চকিতের মত আসিয়া বলিল,—"কি করি ভাই ছোট শালীটা বড় দুষ্টু, কিছুতেই ছাড়তে চায় না।"

বন্ধুরা হাসিয়া বলিল, "তা' বই কি। বিশেষ, অবলার অনুরোধ। বেশ...সন্তুষ্ট হলুম।—"

মুখ নীচু করিয়া অরুণ চলিয়া গেল। তাহার অন্তরে একটুও অপ্রতিভের ছায়া পড়িল না।—উল্লাস সেখানে সতর্ক প্রহরী যে।···

নির্জ্জন গ্রাম্যপথে পালকী করিয়া বর-কনে চলিয়াছে।

আগে আগে বাজনদারের দল—পালকীর পাশে কেহ নাই। অরুণ এ সুযোগ ছাড়িবার ছেলে নয়। একটু ইতস্তত করিয়া চাদরখানি কনের হাতের উপর ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দিল ও তাহার তলায় নিজের হাতখানি চালাইয়া কনের হাতে মৃদু চাপন দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বড় কষ্ট হচ্ছে কি?

কনে ঘাড় নাড়িল, "না।"

বর বলিল, "আচ্ছা—এই গিয়ে—তোমার নাম কি?"

সহসা একদল রমণী পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল,—"ও মা—এই বউ! আমরা ভাবছি না জানি কি অপ্সরী-কিন্নরীই আসবে!"

পুরুষেরা বলিল,—"বাবা! এ যে মণিপুর ব্রাণ্ড!" অরুণ কট্‌মট্ করিয়া সেদিকে চাহিল। বিবাহের বর না হইলে ঘুসী বাগাইয়া সে এ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিত। যাহা হউক,

কনের নামটি শুনিয়া তাহার কাণের পিপাসা আর মিটিল না ;—ঝাঁ করিয়া বাড়ীর দুয়ারে পাল্কী আসিয়া দাঁড়াইল। খই ছড়াইয়া শঙ্খ ও হুলুধ্বনি দিয়া সকলে তাহাদের বরণ করিয়া লইল।

উৎসুক প্রতিবেশিনীদের ঘোমটা খুলিয়া বউ দেখাইতে গিয়া অরুণের মা বেশ একটু চমকিত হইলেন।—ও মা! এ কি শ্রী! খালি কটা রংটাই আছে। যেমন ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোখ—তেমনি চ্যাপ্‌টা নাক—কপাল মাঠ—মুখ লম্বা——হাত-পা যেন কাটি-কাটি!

পোড়াকপাল বউয়ের! মনে মনে কর্ত্তার রুচিকে শত সম্মার্জ্জনী প্রহার করিলেন। কিন্তু উপায় কি? বিবাহ তো আর ফিরান যায় না।

আর বেহায়া ছেলেটাও কি অন্যদিকে চায় না? ওই শিক্‌ড়ে মূলোটার পানে একদৃষ্টে 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া আছে? পাগল হইল না কি?

খুব আস্তে একটী প্রচণ্ড নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া রোষ ক্ষোভ ফুটিতে দিলেন না। প্রকাশ্যে প্রতিবেশিনীদের বলিলেন,—"কেমন বউ হয়েছে গা?"

তাহারা মনে মনে বলিল,—"পোড়া কপাল! বউয়ে অরুচি!" প্রকাশ্যে একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—"তা' মন্দ কি। বেশ হয়েছে।—বেঁচে-বর্ত্তে থাক্—গুণ থাক্‌লেই হ'ল। মেয়েমানুষের রূপ নিয়ে ত কেউ ধুয়ে খাবে না!"

গৃহিণী বুঝিলেন, ইহার অধিক প্রত্যাশা করা মূর্খতা মাত্র। তাঁহারই মন যে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষেপিয়া উঠিতেছে।

পরদিন অরুণ হাসিতে হাসিতে বন্ধুমহলে আসিতেই রমেশ বলিল,—"কি বাবা এক গাল হাসি যে! থেকে থেকে এ মণিপুর কোত্থেকে আনালে?—"

অরুণ রাগে 'গুম্' হইয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

করুণা বলিল,—"এখন থেকেই মৌনব্রত নিলে—কিন্তু গোটা দিন যে পড়ে রয়েছে।"

অরুণ ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিল,—"কি বল্‌বো বল্ না? বউ খারাপ তা' আমি কি বল্‌বো।"

করুণা হাসিয়া বলিল,—"বালাই,ও কি কথা! খারাপ বলতে নেই—ও যে রূপের সাগর! কবি এক জায়গায় বলেছেন—'এক কথায় তার রূপের উপমা—আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য'।"

সুবোধ বলিল,—"সেটা মোহে কি ভয়ে ঠিক্ বলা যায় না।"

রমেশ বলিল,—"যাই হোক্,একটা কিছুর জন্যে তো বটেই। তা' ভাই দুঃখ কিসের?—খতিয়ে দেখ্‌লে জিতটা তোমারই। রংটা ফর্‌সা আছে—বিয়ের জল পড়্‌লে একটু শ্রীও ফির্‌বে। আর আমাদের সকলেরই তো দেখ্‌ছি—এ পিঠ—আর ও পিঠ।"

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাধব বলিল,—"দাঁড়াও, তোমার কথাটা শ্রীমন্দিরে পৌঁছে দিচ্ছি।"

রমেশ হাত জোড় করিয়া বলিল,—"দোহাই তোমার, সে কৃষ্ণকালীর দরবারে ঐটী ছাড়া আর যা' হয় ব'লো ক্ষতি হবে না।—ওটি শুন্‌লে পতন ও মূর্চ্ছা না হোক্, আমার—"পৃষ্ঠদেশে নাহি অস্ত্র লেখা" এ গৌরব থাক্‌বে না।"

অরুণ বেশীক্ষণ বাহিরে বসিতে পারিল না। মন তাহার উড়ুউড়ু করিতেছিল। "তোরা বোস্—আমি পাণ নিয়ে আসছি" বলিয়া একেবারে যেখানে নববধূকে লইয়া প্রতিবেশিনী বালিকারা গল্প করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। নববধূ ঘোমটা টানিয়া দিল। অরুণ সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া একটী মেয়েকে

জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হচ্ছে রে বুলি? খুব হাসি যে!"

বুলি বলিল,—"দাদা, বৌদি' বল্‌ছিলেন-"

ঘোমটা ঢাকা বৌদি' বুলিকে টিপিয়া দিলেন, অরুণ তাহা দেখিয়া মনে মনে খুসী হইয়া বলিল,—"কি রে' থাম্‌লি কেন?"

বুলি বলিল,—"বৌদি' বারণ করেছে বল্‌তে" নববধূ নড়িয়া বসিল। বস্ত্রের বস্ত্রের খস্ খস্ শব্দ হইল। বুলি সে দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি ভাই বৌদি' রাগ কর্‌লে? আমি ত বলি নি।"

পাছে নূতন ভাব ছুটিয়া যায়, এই জন্য সে বৌদি'কে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল।

একটী বয়স্থা মেয়ে বলিল,—"দাদা, তুমি এখান থেকে যাও। দেখ্‌ছ না ঘোমটায় ঢাকা পড়ে বৌদি' ঘেমে নেয়ে উঠেছে।"

অরুণ কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় মা ওঘর হইতে ডাকিলেন,"ওরে পাণ নিয়ে যা, রমেশ ডাকাডাকি কর্‌ছে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অরুণ অগত্যা বাহির হইয়া বেগে উচ্চকণ্ঠে বলিল—"আমি পার্‌ব না পাঠিয়ে দাও।"

বধূ খাইতে বসিয়াছে, অরুণ সেই ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"মা গোটা কতক পাণ দাও তো।" মা বলিলেন,—"দিচ্ছি। একেবারে ঘরের মধ্যে এলি কেন?" অরুণ উষ্ণস্বরে বলিল, -"কেন, ঘরের মধ্যে এলে জাত যায় নাকি?"

মা বলিলেন,—দেখছিস্ না বৌমা খেতে পার্‌ছে না।"

অরুণ সেদিকে আগ্রহে চাহিয়া তাচ্ছিল্য-ব্যঙ্গকে স্বরে কহিল,—"তা' আমি কি জানি।"

মা মনে মনে বলিলেন "হয়েছে! এতেই এই? তবু যদি……"

এইরূপ আনাগোনার মধ্য দিয়া দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিল। রজনী অনন্ত তিমির রাশি বুকে পুরিয়া সোহাগ আশার বসনে দেহ ঢাকিয়া অরুণের কল্পনার কুঞ্জে উঁকি মারিলেন।

তিন

ফুলশয্যা।—

আকাশে চাঁদের আলো নাই বাতাসে মলয় পরশ নাই, কোকিলের কুহু, ময়ুরের কেকা কিছুই নাই। তবু যাহা আছে, তাহা শত শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নাজালকে ম্লান করিয়া কুহু কেকার অভাব মিটাইয়া দিয়াছে—মলয় সেখানে অচল।

অরুণের মনোসরোবরে আজ সত্য-সত্যই কি প্রভাতের কনক কমলিনী ফুটিয়া উঠিবে? এত দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষিত শুভক্ষণ আজ আশার আলোয় সমুজ্জল হইয়া ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাহার তৃষিত হৃদয়ে বসন্ত রাগিনীর লীলায় ছন্দিত হইবে? ওগো স্বপ্ন ওগো সুন্দর এস এস নামিয়া লঘু শুভ্র চরণে সার্থক কর প্রতি দণ্ড, প্রতি পল, প্রতি মুহূর্ত্তটি!

আচার-অনুষ্ঠানের জ্বালায় অস্থির! সে পর্ব্ব শেষ হইতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। রাতের আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট? এখনি ভোরের কাক ডাকিয়া উঠিবে! তখন…ক্যাডাভ্যারাস! অরুণ সশব্দে পাশ ফিরিয়া শুইল, অমনি খুট্ করিয়া একটী শব্দ হইল। ফিরিয়া দেখে বধূ দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ঘরে আর কেহ নাই।

তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সে দ্বার প্রান্তে আসিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। প্রতি মুহূর্ত্তটি এখন মূল্যবান, অপচয় করিতে আছে কি?

তারপর এক মিনিট কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বধূর একখানি কোমল কর ধরিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদ্‌পিণ্ড প্রবলবেগে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে লাগিল। সে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বিহ্বলভাবে বধূর মুখখানি দেখিতে আত্মহারা

হইয়া তাহাতে সোহাগের প্রথম স্পর্শ বুলাইয়া দিল। পরে গদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি ?"

বধূ সরম সঙ্কোচে আধজড়িতকণ্ঠে সুধা ঢালিয়া উত্তর দিল,—"কুবলয়।"

সোল্লাসে অরুণ বলিল,—"বাঃ! বেশ নাম তো! কুবলয় কি না পদ্ম। চমৎকার মিল! আমি অরুণ আর তুমি পদ্ম যেন আমার স্পর্শে এই এমনি—এমনি—এমনি ক'রে……কেমন ?"

বধূ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া অরুণের বুকে মুখ গুঁজিল।

অরুণ আদর করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ীর জন্যে মন কেমন কর্‌ছে, নয় ?"

বধূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"না।"

অরুণ পরিতৃপ্ত হইয়া কহিল,—"আচ্ছা, ঠিক্ করে বল্‌তো সেখানে কে কে তোমায় ভালবাসেন ?"

বধূ ফিস্‌ফিস্ করিয়া উত্তর দিল,—মা, বাবা, দিদি।"

"আর ?"

"খেঁদি, রাণী, সুবি……"

অরুণের কাণে যেন বীণা বাজিতে লাগিল। বধূর বর্ণিত লম্বা তালিকাগুলি শুনিয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিল,—"আচ্ছা, তোমার সব চেয়ে কা'কে অর্থাৎ কা'কে ভাল লাগে ?"

বধূ কথা কহিল না, লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল। অরুণ তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"বল না লক্ষ্মীটি! তবু চুপ ক'রে রইলে ?"

পরে অধরে অধর স্পর্শ করিয়া অনুরাগে বলিতে লাগিল,—"বল্‌বে না, বল্‌বে না ?"

বধূ অধর মুক্ত করিয়া কহিল,—"তোমায়।"

অমনি আনন্দে অরুণ তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া পুনরায় অধর চুম্বন করিল।

এবার অরুণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন বৃষ্টি করিতে লাগিল,—"তোমরা কোথায় স্নান কর ? ক'টা নারকোল গাছ আছে ? কেমন ফল হয় ?"

বধূ বলিল,—"পুকুরেই নাই। ওই যে বাড়ীর সাম্‌নে মস্ত পুকুরটা, তুমিত দেখেছ—"

অরুণ ঘাড় নাড়িল।

বধূ বলিল,—"ওটা রাজাদের দিঘী, আমরা সবাই ওইখানে চান করি। নারকোল? ওই বড় গাছটায় তেমন ফলে না, ছোট দু'টোয় বেশ হয়। তবে একটা গাছে ইঁদুর উঠে মুচিগুলো কেটে দেয়।"

অরুণ বলিল,—"জাঁতিকল পেতে রাখ না কেন ?"

বধূ হাসিয়া বলিল,—"গাছের আগায় কোথায় জাঁতিকল পাতা হবে ?"

অরুণ হাসিয়া বলিল,—"তা' বটে।" পরে কহিল,—"আচ্ছা, ওই যে মোটা মত স্ত্রীলোকটি বাসর-ঘরে খুব গান গাচ্ছিলেন, তিনি কে ?"

বধূ মুচকি হাসিয়া বলিল,—"তিনি আমাদের ঠান্‌দি' কি না, পাড়ার ভস্‌চাজ্জিদের বউ। ভারী আমুদে। আর ওই যেটী ফিরোজা রঙের কাপড় পরে এসেছিল, সে আমার গঙ্গাজল; আর যে চাঁপা রঙের ব্লাউজ গায়ে দিয়েছিল, সে হচ্ছে আমার রোজ ওয়াটার; আর যার মাথায় টায়রা ছিল, সে আমার বকুল ফুল—ওর বর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, পশ্চিমে চাকরি করে।"

অরুণ শ্বাসরুদ্ধ করিয়া বধূর সুদীর্ঘ বচন সুধা পান করিতে করিতে মনে মনে বলিল,—"আহা, ধন্য আমি! কি কথার বাঁধুনি—কেমন মিষ্টি!" প্রকাশ্যে বলিল,—"আচ্ছা, আমাদের বাড়ী কেমন লাগছে ?

বধূ বলিল,—"বেশ।"

"শুধু 'বেশ' বলে চুপ কর্‌লে হবে না, কে কেমন সব খুলে বল।"

তথাপি বধূ চুপ করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া

অরুণ তাহার একখানি হাত হাতের মধ্যে লইয়া টিপিতে টিপিতে বলিল,—"ভাল নয়, নয় ?"

বধূ কিছু বিব্রতে পড়িল। ভাল তো নয়ই, তাহার রূপের যে বর্ণনা সে শুনিয়াছে! শাশুড়ী তো সারাদিন গজ্ গজ্ করিয়াছেন, প্রতিবেশারাও তাই। আহা, নিজেদের কি অপরূপ চেহারা! তা' সে কথা তো মুখ ফুটিয়া বলা যায় না, কাজেই সে ইতস্তত করিতে লাগিল।

অরুণ একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"জানি আমি, বাড়ীর লোক সব হিংসুটে। তোমায় যে দেখ্‌তে পার্‌বে না, এ আমি আগে থেকেই জানি।"

বাহিরে জানালার পার্শ্বে চাপা হাসি উঠিল; ফিস্‌ফিস্ শব্দও শোনা গেল।

বধূ তাড়াতাড়ি অরুণের মুখ চাপিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"চুপ চুপ। ওরা সব বাইরে থেকে শুন্‌ছে।"

"শুনুক" বলিয়া অরুণ বধূকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

—নেপথ্য—

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]
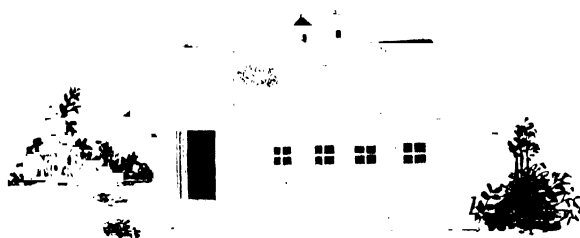
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আট

খবর পাইয়া কলিকাতা হইতে বীরেনের বাবা দেবেনবাবু কাশীতে আসিয়া হাজির হইলেন। ছেলে তাহার গুণ্ডামি করিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে, এমন একটা খবর তাঁহার ডার্বি জেতার মতই অসম্ভব ছিল। ব্যাপারটা সোজা নয়, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কাশীর অন্য কিছু কারসাজি আছে।

তীক্ষ্ণ এক জোড়া গোঁফে দেবেনবাবুর রেখা-কুটিল মুখের রুক্ষতা বাড়িয়াছে। তা' ছাড়া, কে কবে একটা ছুরির ফলা দিয়া তাঁহার গালের উপর আঘাত করিয়াছিল, সেই কুঞ্চিত ক্ষত স্থানটা সমস্ত মুখকে এমন বীভৎস ও কদাকার করিয়া তুলিয়াছে যে, ও মুখ স্বপ্নে দেখিলে চমকিয়া উঠিতে হয়। ছোট ছোট চোখে কুৎসিত ও নিষ্করুণ সন্দেহ, উঁচু কপালটায় ঔদ্ধত্য, রোমশ হাত দুইটী যেন জহ্লাদের! বাপকে বীরেন বাঘের চেয়েও বেশী ভয় করিত। তাই দেবেনবাবুকে সশরীরে লক্-আপ্-এ উপস্থিত হইতে দেখিয়া বীরেন একদিকে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু বাবার কাছে কি জবাবদিহি করিবে—সেই ভয়ে তাহার হাত ও পা শির্‌শির্ করিয়া সমস্ত গায়ে ঘাম দিল।

দেবেনবাবু পুলিশের লোক বলিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিতে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। ছেলের এই অশোভন আচরণের জন্য তিনি নিজেই এমন একটা ধমক হাঁকিলেন যে, বীরেন বসিয়া পড়িল। তাহার পর আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিলেন। বীরেন ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু একটুও প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

মুন্সির ঘাটের মোক্ষদা ঠাকরুণ্ হঠাৎ কিছু মোটা টাকা পাইয়া স্বস্তিতে হাই তুলিলেন।

দেবেনবাবু বলিলেন,—আপনার ত' কিছু আর খোয়া যায় নি। দেখেছেন ত' ভাল করে'?

টাকাগুলি গুণিতে গুণিতে মাসী বলিল,—তা' যায় নি বটে।

ছেলে আমার ভীষণ গোঁয়ার। মুখের কথায় মাথা ফাটায়। আপনার কাছে এসেছিল জল চাইতে। তেষ্টার সময় জল পায় নি কিনা তাই অমন তেড়ে-ফুঁড়ে মারমুখো হয়ে ছুটে এসেছিল। তা' পুলিশ আর ওকে কম ঠাণ্ডায় নি।

মাসী কপালের উপর চোখ তুলিয়া কহিলেন,—জল? কাশীতে আবার জলের অভাব? ডুবে মর্‌তে চেয়েছিল ত' গঙ্গাই আছে—তেষ্টা মেটাত ইহকালের। ছোঁড়া আমায় সে বল্লে কিনা, মাসি, তোমার বোন্‌ঝিকে আমি বিয়ে করেছি, পঞ্চব্যান্নন রেঁধে খেতে দাও এখুনি! মার ঝাঁটা পোড়ারমুখো।

—ছেলেটা আমার অমনিই পাগ্‌লা। বলিয়া দেবেনবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন: মিছিমিছি তোমার পিছে লেগে তোমায় হায়রাণি করে ছাড়্‌লো, নাও, জলখাবার খেয়ো, এ নিয়ে আর কোনো কেলেঙ্কারি করো না বুঝ্‌লে?

থানায় ফিরিয়া আসিয়া দেবেনবাবু আবার

বীরেনকে লইয়া পড়িলেন। এ সময়টুকুতেও তাহার মুক্তি ছিল না, দস্তুরমত পুলিশের জিম্মায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। বসিয়া বসিয়া তাহার উদ্বেগের আর পার ছিল না। পুলিশের সঙ্গে সেই রাত্রে মেস-এ ফিরিয়া সে সুধাকে দেখিতে পাইল না কেন? কোথায় গেল সে? তাহার পর পুরা দুই দিন কাটিয়া গেল, কক্ষচ্যুত তারার মত কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল না জানি? কে তাহাকে কুড়াইয়া লইয়াছে? কে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, না অবিশ্বাস! এমনি করিয়াই কি সে তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়া নিজে একা কলিকাতায় ফিরিয়া চলিয়াছে? ঘরের স্নেহচ্ছায়ার পিয়াসী হইয়া আসিয়া কি সে এখন নিষ্পাদপ মরুভূমির প্রান্ত খুঁজিয়া ফিরিবে?

বীরেনের ইচ্ছা হইল থানার সমস্ত আগল ভাঙিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। হেমন্তকে পুলিশে ধরাইয়া সুধার কিনারা পাইতে হয়ত' তাহার দেরী হইবে না। সুধা এই চলমান জন-স্রোতের মধ্যে অস্পষ্ট পদচিহ্নের মত মুছিয়া যাইবে, আর সে নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় দিন-রাত্রির ঢেউয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া আবার হয়ত' কোনোদিন আর একটি কিশোরীর দেহের ঘাটে তরী ভিড়াইবে;—সুধা হয় তখন শ্মশানের ধূলায়, নয়ত' পথের পণ্যবীথিকায়! সে কেন সুধার সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়াছিল? কেন সে উহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হয় নাই? যা' থাকে বরাতে, ঐ কনেষ্টবল্‌টার মুখে একটা লাথি মারিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া ভোঁ ছুট দিবে—সোজা ত্রিপুরাভৈরবী। বাবার অস্ত্র বাবা কাড়িয়া রাখিয়াছেন বটে, তবু হেমন্তের টুঁটি টিপিয়া ধরিলে তাহা টোটার চেয়েও বেশি কাজ দিবে নিশ্চয়।

কিন্তু কিছু একটা করিবার পূর্ব্বেই দেবেন-বাবু আসিয়া উপস্থিত! সোজাসুজি কহিলেন, এখুনি কল্‌কাতায় যেতে হবে।

—এখুনি? বীরেন ঘাবড়াইয়া গেল।

—হ্যাঁ, এখুনি! এই রামপ্যারি, একঠো টাঙা বোলাও জল্‌দি।

বীরেনের মুখে ভাষা জোয়াইল না। ছোট জানালা দিয়া রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

টাঙা আসিলে, দেবেনবাবু বলিলেন,—চান্-টান্ ষ্টেশনেই সেরে নেওয়া যাবে। খাওয়া রিফ্রেসমেণ্ট রুমে। চল্। এই পাপ তীর্থে আর এক মুহূর্ত্তও না—নে, ওঠ্।

জনবিরল রাস্তাটার চারদিকে ব্যাকুল সন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে বীরেন টাঙায় উঠিয়া বসিল। একবার শুধু বলিল,—ভেবেছিলাম, একবার লক্ষ্ণৌ যাব। এখনত' আমার ছুটি।

দেবেনবাবু একথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কোচোয়ানকে কহিলেন,—ঘোড়াকে চানা দুটো বেশী করে খাওয়াতে পারিস্ না?

বীরেন মুখ গোমড়া করিয়া বসিয়া রহিল। ষ্টেশন আসিয়া পড়িয়াছে। স্নান বা আহারে তাহার আর রুচি নাই। তবু মাথাটা ধুইয়া কিছু তাহাকে গিলিতে হইল। নিজে রাঁধিয়া ভাত বাড়িয়া থালাটা বীরেনের সাম্‌নে আগাইয়া সুধা পাখা হাতে কাছে বসিয়া ভোজন ব্যাপারটাকে সুষমামধুর রমণীয় করিয়া তুলিবে—এই স্বপ্ন কোনোদিন সে ভুলেও দেখিয়াছিল বলিয়া আজ তাহার চোখে জল আসিল।

গাড়ি আসিয়া ভিড়িল, ছাড়িতে তখনও আধঘণ্টার উপর দেরী। বীরেনকে লইয়া দেবেন-বাবু একটা থার্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ঢুকিলেন। বীরেন প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পাইচারি করিতে যাইতেছিল, দেবেনবাবু বাধা দিলেন: না রোদ্দুরে আবার হাঁটা কেন? শুয়ে ঘুমো না! এই নে, আমার কাছে একটা বই আছে। বলিয়া হাতব্যাগ্ হইতে একটা সস্তা ছেঁড়া ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস বাহির করিয়া দিলেন। বীরেন বইটা

স্পর্শও করিল না ; অন্যমনস্ক হইয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিদ্রোহ বীরেন করিতে পারে না এমন নয় ; কিন্তু দরজা খুলিয়া ছুট্ দিলেই সে রেহাই পাইবে, আর বাবা বসিয়া-বসিয়া আলস্যে হাই তুলিবেন এমন ব্যবস্থা রামরাজত্বে কাহারো কল্পনায় আসিত কিনা কে জানে। বাবা যে শুধু পশ্চাদ্ধাবন করিবেন তাহা নয়, পকেট হইতে নিদারুণ অস্ত্রটা বাহির করিয়া বোধ হয় প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা করিবেন না। এতবড় উচ্ছৃঙ্খল যে বিদ্রোহী, সে দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তান হইয়াছে বলিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, দেবেনবাবুর নিয়মকানুনগুলি এত শিথিল নয়। ধরাত' সে পড়িবেই, লাভের মধ্যে দুপুর রৌদ্রে ভরা-পেটে খানিকট দৌড়-ঝাঁপ করিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া আছড়ে পড়া। না, মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া তাহাকে পথ খুঁজিতে হইবে। আর সে হঠকারিতা করিবে না। তাহার স্বভাবের এই অপরিণামদর্শী উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সুধা তাহাকে কতদিন বকিয়াছে। বকিবার সময় সুধার চিবুকের উপর ছোট দু'টি টোল পড়িত! নাকের ডগায় দু'টি বিন্দু ঘাম! কপালের কিনারে দু'টি কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সাপের ফণার মত সর্ব্বদা ফুলিয়া থাকে!

কিন্তু এই কি সুধার রূপ ধ্যান করিবার সময়? বীরেন কহিল,—একটা লেমনেড্ খেয়ে আস্‌ছি বাবা।—

দেবেনবাবু কহিলেন,—না। মোগলসরাইয়ে গিয়ে খাবে।

—ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে যে।

—থাক্। মনে থাকে যেন তুমি এখনও পুলিশ কাষ্টডিতে। বীরেন চুপ করিয়া গেল। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর কোন্ স্বল্পপরিমিত স্থানটিতে সুধা এই মুহূর্ত্তটি যাপন করিতেছে? না জানি শেষকালে ঐ জানোয়ার ম্যানেজারটা তাহাকে লুফিয়া নিবে? তাহার প্রতীকারের জন্য সে কোন চেষ্টা করিবে না? বাবাকে সে সব কথা খুলিয়া বলিবে নাকি? লাভ কি? হেমন্ত ধরা পড়িবে বটে, কিন্তু সুধা?

গাড়ি ছাড়িল। দেবেনবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—তোমার জন্য পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে, দিন দশেক পরে একটা দিন আছে দেখেছি। মনে মনে তুমি তৈরি হয়ে নাও। পাত্রী সুন্দরী, নগদ টাকাও পাওয়া যাবে। বিয়ে করে'ই বিলেত চলে যাও, দিশী ডিগ্রী শিকেয় তুলে রাখ।

অন্য সময় হইলে বীরেন লাফাইয়া উঠিত। জীবনে সে এতদিন খালি লণ্ডনের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশের স্বপ্ন দেখিয়াছে। কিন্তু আজ সে বাঁকিয়া বসিল। সোজা বাবার মুখের উপর বলিয়া বসিল,—বিয়ে আমার হয়ে গেছে—

গলাটা সাম্‌নে বাড়াইয়া দিয়া দেবেনবাবু বলিলেন,—কী বল্লে?

জিভ্ দিয়া উপরের ঠোঁট্‌টা একটু চাটিয়া বীরেন বলিল,—সম্প্রতি আমি বিয়ে করেছি।

—কোথায়?

—এই কাশীতে।

—কাশীতে? দেবেনবাবু গলাটাকে গুটাইয়া স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিয়া আসিলেন ; কাশীতে? বলিয়া হাসি। সে হাসি রুক্ষ জ্যৈষ্ঠের তপ্ত হাওয়ার মত, তাহাতে এক কণা আর্দ্রতা নাই।

বীরেন দেবেনবাবুর মুখের পানে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলিয়াছিল, কিন্তু ভস্ম হইয়া যাইবার ভয়ে বাহিরের দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল! কহিল,—বিলেত আমি যেতে পারি, কিন্তু আর একলা নয়, সস্ত্রীক। এবার আর পড়্‌তে নয়, দেশ দেখ্‌তে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই হবে। তুমি চল না একবার কল্‌কাতা।

ভয় পাইয়া বীরেন আবার বাবার দিকে তাকাইল : কিন্তু বিয়ে আমি আর করছি না।

দেবেনবাবুর মুখে সেই নিষ্ঠুর চাপা হাসি :

তাতে কি ? কাশীতে অমন এক-আধটা বিয়ে সবাই করে’ থাকে। তা’তে স্ত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির কলঙ্ক লাগে না, বুঝ্‌লে ?

বীরেন বুঝিল। তাই আর একটিও বাক্য-স্ফুরণ করিল না।

সুধাকে সে পৃথিবীর জনতার মধ্যে ছুঁড়িয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে পিঁড়ি টানিয়া আর একটি কিশোরীর মুখোমুখি হইয়া শুভদৃষ্টির লালসায় রোমাঞ্চিত হইতে থাকিবে,—বিধাতা কি তাহার অদৃষ্টে এই লিখিয়াছিলেন ? সুধার সঙ্গে এই ক’টি দিন তাহার তেমন বনিবনাও হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারই হাত ধরিয়াত’ সে এই বিপুল জনারণ্যে পা বাড়াইয়াছিল ? তাহারই সন্তান ধারণের গৌরবেত’ সে সীমন্তে সিঁন্দূরের সঙ্কেত ধারণ করিয়াছে ! মেয়েটির স্বভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার যে রুদ্রতার আভাস পাওয়া যায়, তাহাইত’ তাহার চরিত্রের মহিমা ! উহাকে লইয়া সে আগ্রায় নির্জ্জন যমুনার ধারে একটা মুসাফিরখানা তৈয়ারি করিয়া দিন গুজরাইবে, আর রাত্রে তাজমহলের শ্বেতপাথরের মেঝের উপর শুইয়া আকাশ দেখিবে—কানে কানে সেইদিনও বীরেন এই কথা বলিয়া তাহাকে চুমা খাইয়াছিল। জীবনে সুধাই উহার ডাক্তার, সুধার সুখসান্নিধ্যই উহার মহৌষধি ! কিন্তু সেই সুধাকে ফেলিয়া কিনা তাহাকে এখন বিষবৃক্ষে জলসিঞ্চন করিতে হইবে ? কখনই না, বিয়ের সভা হইতে নিশ্চয় সে পলাইবে। ধরা সে পড়ুক, কিন্তু জোর করিয়া তাহাকে কেহ ঢেঁকি গিলাইতে পারিবে না। বিয়ে যদি সে করেও, সুধাই তাহার পৃথিবীব্যাপিনী আকাশ ! দেহসুখবিধায়িনীর প্রতি তার কোনো দায়িত্ব নাই, জুতার সে সুখতলা মাত্র।

হ্যাঁ মার্‌বইত’, একশোবার মার্‌ব, কেন তুমি সুধার চিঠি ছিঁড়্‌লে ?

—বেশ করেছি ! ওর ফোটোটা টুক্‌রো করে’ দেব আমি। ঘটা করে’ আবার টেবিলের উপর টাঙিয়ে রেখেছেন—

—ছেঁড় দিকিন্‌। জুতো দিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব না ?

—আমার জুতো নেই ?

—তোমারত’ লপেটা, আমার সু।

—এসো না, কে কার মুখ ছেঁড়ে !

বীরেন ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। গাড়ি আসিয়া মোকামাঘাটে লাগিয়াছে। সে দিন-দুপুরে স্বপ্ন দেখিতেছিল বুঝি। ভাগ্যিস্‌ দুপুরের স্বপ্ন ফলে না।

দেবেনবাবু বলিলেন,—কিরে লেমনেড খাবি না ?

বীরেন কোন উত্তর না দিয়া সন্ধ্যার চঞ্চলনীর গঙ্গার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

নয়

বীরেন বলিল,—বিয়েতে আমার মত আছে বাবা, নগদ কত দেবে ?

দেবেনবাবু খুসি হইয়া বলিল,—নগদ পাঁচ হাজার। গয়নাও আটাশ ভরী। নাই বা হ’ল কুলীন। টাকা পেলে ঔদার্য্য একটু বাড়ে বই কি !

—নিশ্চয়। আপনি তোড়জোড় করুন। আমি পাশপোর্টের বন্দোবস্ত দেখি—

—কিছুরই তোমার বন্দোবস্ত দেখ্‌তে হবে না। আমি তা’ হ’লে মাথার উপর আছি কি করতে ? কালকেই আমার সঙ্গে তা’ হ’লে চল মেয়ে দেখ্‌তে, কেমন ?

—আচ্ছা।

বাবাকে এইরূপে একটা জরুরি কাজে ব্যাপৃত হইতে দিয়া বীরেন সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এই সজ্জার আড়ম্বরটুকু দেবেনবাবুর চোখ এড়াইল না। স্ত্রীকে বলিলেন,—বিয়ের নাম শুনলেই ছেলেরা কেমন একটু উস্‌খুসে হয়ে উঠে !

দেখ্‌লে? ছোঁড়া গোঁফের প্রান্তে দিব্যি একটু এসেন্স লাগিয়েছে, সিল্কের রুমালটা পাঞ্জাবীর বুক পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌তে মন সরে নি, কোন্‌টা আল্‌গোছে উঁচিয়ে দিয়েছে একটু।

স্ত্রী বলিলেন,—কিন্তু পথে যে তোমাকে বল্‌ছিল কাশাতে কা'কে বিয়ে করেছে, তার কিছু খোঁজ নিলে?

দেবেনবাবু তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কহিলেন,—ওটা হচ্ছে আধুনিক কালের ছেলে-ছোকরার একটা সস্তা প্যাঁচ। লোকচরিত্র আমার চেয়ে তুমি আর বেশি বোঝ না নিশ্চয়ই, মানুষ ঠেকিয়ে হাত ক'খানা আমার ঝুনো হয়েছে। তার মানে হচ্ছে এই, ও বল্‌তে চায় আমাদের পছন্দে ওর মন উঠ্‌বে না, নিজের বৌ ও নিজেই বাছবে। কিন্তু প্যাঁচের পিছনে তিনশূন্য শুনে বাছাধনের মুখখানা আহ্লাদে কেমন প্যাঁচ হয়ে গেছে দেখ্‌লে? তারপর মেয়েও আমি দেখাবো। আলাপ করার আগে সব যুবতীই সব ছেলের মনে ধরে' থাকে—ওটা মধ্যাকর্ষণের নিয়মের মতই স্বতঃসিদ্ধ। কনে যে ওর পছন্দ হবে তা' আমার কড়ে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত বলে দিতে পারে—

বাবা-মার চোখে ধূলা দিয়া বীরেন সোজা পরেশের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। চন্দ্র চ্যাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে ছোট একখানা দোতলা বাড়ী। সন্ধ্যা। পরেশ বেড়াইতে বাহির হইয়া না গেলে হয়। উহাকে অন্ততঃ পাঞ্জাব মেল ধরিতেই হইবে।

বাসিন্দা পরেশ ও তাহার বাবা। পরেশকে প্রসব করিয়া তাহার মা মারা যাইবার পর প্রসন্নবাবু ছেলেকে লালন পালনে সাহায্য করিবার ওজুহাতে আর বিবাহ করেন নাই, চরিত্র রক্ষা করিবার নির্লজ্জ প্রয়োজনীয়তাও কোনদিন অনুভব করেন নাই যা' হোক্‌। সদাশিব প্রফুল্ল মানুষটি! সংসারে এই পরেশই তাঁহার পরেশ।

প্রসন্নবাবু কোথা হইতে একটি মেয়ে কুড়াইয়া আনিয়াছেন—দুর-সম্পর্কে অনিন্দিতা পরেশকে দাদা বলিয়া ডাকে। অনিন্দিতা 'গোখলে'র নীচু ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছে—প্রাকৃত ভাষায় বয়সের যদিও তাহার গাছ-পাথর নাই। প্রসন্নবাবু এই দু'টি ছেলেমেয়ে লইয়া সংসারের হাট জমাইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই দুইটি সহসা একদিন পরস্পরের কণ্ঠমাল্য হইয়া শোভা পাইলেই তিনি 'ওঁ' বলিয়া সহাস্যে সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু এ দুইটি প্রাণী নিজেদের ঘিরিয়া এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করিয়া আছে যে, প্রসন্নবাবু অন্ধকারে একটিও ঘুলঘুলি আবিষ্কার করিতে না পারিয়া ক্ষণে ক্ষণে হাঁপাইয়া উঠিতেছেন। তবু সময়ের স্রোতে মুহূর্ত্তের পাপড়িগুলি ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই বিচ্ছিন্ন দলগুলিতে হয়ত' একদিন মালা গাঁথা সমাধা হইবে—গোপনে, সূর্য্যের অগোচরে, নিশীথ রাত্রে।

এই কারণে এই বাড়ীটা পাড়ার রহস্যের একটা ডিপো ছিল। রোয়াকে বসিয়া যাহারা সান্ধ্য-মজলিস্‌ গুলজার করে, তাহাদের কাছে পরেশ-অনিন্দিতার সম্পর্কটার মত মুখরোচক চাট্‌নি আর নাই। অনিন্দিতাকে যাহাদের চোখে ভাল লাগিয়াছে তাহারা সমাজ-সংস্কারের অছিলায় পরেশকে দু'ঘা বসাইয়া দিতে পর্য্যন্ত কোমর বাঁধে। কেন না, তাহারা কোথা হইতে না জানি আবিষ্কার করিয়াছে পরেশ অনিন্দিতার কাজিন্‌। বাঙলা সমাজকে উহারা উল্‌টাইয়া দিবে নাকি? উহারা মাঝে মাঝে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, প্রসন্নবাবুর মৃত্যুও বুঝি আসন্ন হয়।

শুধু বাহিরে নয়, অন্তঃপুরেও রহস্যের সমাধান মেলে না। অনিন্দিতার আদর্শ দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে—কল্যাণে, উৎসর্গে, প্রীতিতে।

পরেশের আদর্শ জীবনকে খালি ভোগ করিয়া যাইবে। অক্লান্ত কর্ম্মে, পৃথিবী পর্য্যটনে। ঘরে কাহারও মন টেঁকে না। দুই হাতে দুইটি

ঘুঁড়ি আকাশে উড়াইয়া দিয়া বুড়ো প্রসন্নবাবু খালি সুতো গুটান।

বীরেন ডাকে,—পরেশ! পরেশ বাড়ী আছে?

পরেশ অফিস হইতে ফিরিয়া সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর বাহির হয় না। শনিবার অনিন্দিতাকে লইয়া বায়স্কোপে যায়। রবিবার যায় মাঠে কিম্বা চীনা হোটেলে। বীরেন তাহা জানিত। আজ ত' বৃহস্পতিবার, নিশ্চয়ই সে দোতলার বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বই পড়িতেছে।

ডাক শুনিয়া পরেশ উপর হইতে মুখ বাড়াইল।

—ব্যাপার কী?

অনিন্দিতা দুয়ারের উপর বসিয়া কাল মুখমলের উপর চিকন সবুজ সুতায় গাছপাতা তুলিতেছিল। পরেশ কহিল,—দু' পেয়ালা চা করে' দাও অনি।

বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—তুমি শরীরীত' বীরেন? দেখি তোমার হাত?

বীরেনের হাত ঠাণ্ডা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ঘাম দেখা দিয়াছে। তাহাকে কাছে বসাইয়া পরেশ ফের প্রশ্ন করিল,—সুধা কৈ? বাইরে একা দাঁড়িয়ে নাকি? তোমার যেমন সব কাণ্ড! মড়া কেটে কেটে তোমার মন একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

পরেশ উঠিতে যাইতেছিল, বীরেন বাধা দিয়া কহিল,—সঙ্গে কেউ নেই।

—কেউ নেই মানে? সুধাকে কোথায় রেখে এলে? ঢোঁক গিলিয়া বীরেন কহিল,—সুধাকে কাশীতে হারিয়ে এসেছি।

এক মুহূর্ত্ত পরেশের মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না। সহসা ঝড়ো নদীতে তাহার যেন নৌকাডুবি হইল। তাড়াতাড়ি বীরেনের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—হারিয়ে এসেছ মানে? পথে? খুঁজে পেলে না কোথাও?

—ওকে চুরি করে' নিয়ে গেছে।

—তোমার কাছ থেকে?···তুমি তখন কী কর্‌ছিলে হাঁদারাম? লড়তে পারো নি? মর্‌তে পারো নি? তাকে তুমি স্বচ্ছন্দে ফেলে রেখে ফিট্‌বাবু সেজে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছ?

বীরেন কহিল,—খবরটা ধৈর্য্য ধরে' আগাগোড়া আগে শোন, ব্যস্ততা দেখাবার সময় এখনও ফুরিয়ে যায় নি।

—খবরটা তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে সারো বলছি।

মুখ ভার করিয়া বীরেন কহিল,—সংক্ষেপে সারবার নয়।

রিষ্টওয়াচে সময় দেখিয়া সে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া আগাগোড়া সব বলিয়া চলিল। জীবন-উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর।

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—ঐ হেমন্তই। কী বল্লে? ত্রিপুরাভৈরবীর গলি? বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকেই ডানদিকে? ও অনি! অনি! চা আর কর্‌তে হবে না। শিগ্‌গির আমার ব্যাগটা গুছিয়ে দাওত'।

ডাক শুনিয়া পাশের ঘর হইতে প্রসন্নবাবু আসিলেন। খাটে বসিয়া এতক্ষণ একমনে 'পেসান্স খেলিতেছিলেন। কহিলেন,—কি হ'ল পরেশবাবু?

এখুনি আমাকে কাশী যেতে হবে বাবা আর সময় নেই। ভারী জরুরি কাজ।

হাসিয়া প্রসন্নবাবু কহিলেন,—তা' না হয় যাবে। কিন্তু বন্ধু এল, আতিথ্য কর্‌বে না—সেটা কি ভালো দেখায়?

ব্যস্ত হইয়া জুতা পরিতে পরিতে পরেশ বলিল,—আতিথ্য তোমরা করো, আমার সময় নেই। রামদীন কোথায়?

—রামদীন গেছে তার বৈকালিক আহ্নিক কর্‌তে।

—আহ্নিক কর্‌তে? কাজের সময় লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি থাকে না, ওকে আমি আজই বরখাস্ত কর্‌বো।

সৌম হাসিতে প্রসন্নবাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিলেন,—বেচারা মশ্‌লা পিষ্‌ছিলো, সন্ধ্যে হয়ে আস্‌ছে দেখে দে ছুট্‌। বাজারে যেতে পারে নি বলে' বেচারার গাঁজার পয়সা আজ রোজগার হয় নি। নিজের মনে বক্‌ বক্‌ করছিল: এত খাটুনি তার আর পোষাবে না। পকেট থেকে চার্‌টে পয়সা তাকে ছুঁড়ে দিলাম: যা' ব্যাটা, দোকান এখনও বন্ধ হয় নি। পয়সা পেয়ে আর কি ও দাঁড়ায়?

—গাঁজা খেতে তুমি ওকে পয়সা দিলে?

—মায়া হয় না? ওর অমন শুক্‌নো বিবর্ণ মুখ দেখ্‌লে তুই ওকে সমরখন্দ আর বোখারা স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিতিস্‌। ওকে কেন, দরকার?

—বাঃ! আমার বিছানাপত্র প্যাক্‌ করে' দেবে না?

প্রসন্নবাবু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—ও! এই কথা? তা' আমি আছি কি করতে? ছোটখাট একটা বেডিং বইত' নয়! অনি, হোল্‌ড্‌-অল্‌টা কোথায়?

অনিন্দিতা ততক্ষণে প্লেটে ফলের টুক্‌রো ও কাপে করিয়া চা লইয়া আসিয়াছে।

পরেশ বলিল,—জিনিষ-পত্র সব ব্যাগ্‌টার মধ্যে চট্‌ করে' গুছিয়ে দাও, অনি। সেবারকার মত কামাবার আস্‌বাবগুলি ভুলে যেও না কিন্তু। বিছানাটা আমি বেঁধে ফেল্‌ছি। দেরাদুন এক্‌সপ্রেস্‌ কখন ছাড়ে?

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—আর পথের জন্য কিছু খাবার দিতে হবে না?

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—নাঃ! ও একটা নুইসেন্‌স্‌! রেষ্টুরেণ্টকার আছে।

—তবু কিছু। কিছু ফ্রুট্‌স থাকা ভালো! যাই, বাজারটা ঘুরে আসি। দু'বাক্স আঙুর! কি বল?

অনিন্দিতা কহিল,—তোমার বিছানা বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে ষ্টোভে কিছু আমি তৈরি করে' দিচ্ছি। এই হ'ল বলে'।

হঠাৎ ফিরিয়া বীরেনকে বলিল,—আপনি নিঃশব্দে ওগুলি খেতে থাকুন্‌।

পরেশ বলিল,—কিন্তু লণ্ড্রিতে যে আমার এক গাদা কাপড় পড়ে আছে! হ্যাঁ, আজকেই ডিউ ডেট্‌। কাপড় না হ'লে যাব কি করে'? যাই, তুমি বোস বীরেন্‌।

তুমি বোস বাপু! বন্ধুকে ফেলে চলে যাওয়াটা কোন্‌ দিশী ভদ্রতা? দাও আমাকে রসিদটা। বলিয়া প্রসন্নবাবু নিজেই খুঁজিয়া-পাতিয়া রসিদ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

আধঘণ্টার মধ্যে সব গোছগাছ হইল। চোখ রাঙা করিয়া রামদীন অন্ধকারে উদিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই পরেশ হাঁকিল,—রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে' আন্‌ জল্‌দি। রিষ্টওয়াচে সকালবেলা দম দিয়েছিলে অনি? শ্লো যাচ্ছে বুঝি? তোমার ঘড়িতে ক'টা? বলিয়া সে বীরেনের মুখের দিকে তাকাইল। সে মুখ কেমন ফ্যাকাশে, রক্তের লেশমাত্র আভাস নাই। খাবারের থালায় হাত ছোঁয়ায় নাই, দেয়ালে পিঠ দিয়া ক্লান্ত করুণভঙ্গিতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

—এ কী! খেলে না যে কিছু?

বীরেন্‌ কোন কথা কহিল না। শান্ত নির্লিপ্ত সংসার কেমন সহসা উদ্‌ভ্রান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে—তাহাই সে অভিভূত হইয়া দেখিতে লাগিল।

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—সঙ্গে যথেষ্ট টাকাকড়ি

রইলত'? যাচ্ছ জরুরি কাজে কতদিন থাক্‌তে হয় কে জানে?

গায়ে কোট আঁটিতে আঁটিতে পরেশ বলিল,—জরুরি বলে' জরুরি। বিস্তারিত বল্‌বার এখন আর সময় নাই বাবা! তবে ভয়-টয় কিছু নেই। সশরীরে ফের ফিরে আস্‌বো। দরকার হ'লে টেলিগ্রাম-পাঠ টাকা পাঠাবে। কিছু মশলা, অনি। লবঙ্গ নেই?

প্রসন্নবাবু দেরাজ হইতে আরো কিছু টাকা আনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—আরো কিছু সঙ্গে নাও, বৎস। বিস্তারিত সংবাদ দেবার যখন এখন সময় নেই, তখন নোটটাই বিস্তৃত হোক্। ভয়-টয় আমার কিছুই নেই। ভাল কাজেই অবশ্য যাচ্ছ। যখন যা' দরকার লিখবে। তোমার কাঁধ বেয়ে এখনও যে জল গড়াচ্ছে! স্নান করে' তোয়ালে দিয়ে মাথাটাও ভাল করে মোছ নি। এসো বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্বহস্তে তিনি পরেশের ঘাড়ের জল মুছিতে লাগিলেন।

মনিব্যাগে পরেশ আরো টাকা লইল।

—গিয়েই কিন্তু খবর দিও। এদিকে অফিসের বন্দোবস্ত আমিই করে রাখবো'খন। ম্যানেজার কাল সকালেই আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বেন।

—চল হে বীরেন—

বীরেন কলের পুতুলের মত খাড়া হইল, কে যেন তাহাকে সিঁড়ি দিয়া নীচে ঠেলিয়া দিতেছে।

দুয়ারের কাছে আসিয়া অনি ভীরুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কবে ফির্‌বে পরেশ-দা'?

—কেমন করে' বলি? তবে একলা বোধ হয় ফির্‌বো না।

কথাটা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য অনি চমকাইল। কিন্তু যে-কথার অর্থ বুদ্ধির আলোকে উদ্‌ঘাটিত নয় তাহার গূঢ়তার অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা করিয়া সে মনকে চঞ্চল করিতে চায় না। ধীরে টিফিন কেরিয়ারটা পরেশের হাতে দিয়া কহিল,—লুচি, ভাজা, চাটনি আর কয়েকটা অম্‌লেট করে দিলাম। রেষ্টুরেণ্ট কার-এ যা'-তা' খেয়ে ঘুমকে বিপন্ন করো না। তা' ছাড়া, দেরাদূন এক্সপ্রেস্-এ কি খাবার গাড়ি আছে?

—না নেই। দাও। শিগ্‌গির। চলো বীরেন, ওঠ।

ট্যাক্সিটা ছাড়িতেই পরেশ ফের চেঁচাইয়া উঠিল: তাড়াতাড়িতে তোমাকে কিন্তু প্রণাম করা হ'ল না, বাবা। এখান থেকেই হোক্—কি বল?

প্রসন্নবাবু প্রতিধ্বনি করিলেন: এখান থেকেই।

দূর হইতে ফের পরেশের গলা শোনা গেল: কাল সকালে বীরেন এসে তোমাকে সব বুঝিয়ে বল্‌বে। খবর শুন্‌লে তুমিও এ যাত্রায় আমার সঙ্গে বিশ্বনাথ দর্শনে খেপে উঠ্‌তে—

গাড়ি এল্‌গিন রোড পার হইয়া চৌরঙ্গিতে পড়িল।

পরেশ কহিল,—তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

নিতান্ত উদাসীনের মত বীরেন বলিল,—কী আর কইব বল।

—না কী আর কইবে? হেমন্ত চাটুয্যে, ত্রিপুরাভৈরবীর গলি—কত নম্বর বল্লে? তেরো? চোখের সাম্‌নে সব আমার ভাস্‌ছে। লোকটার চেহারা পর্য্যন্ত। ছোট চোখ, পুরু ঠোঁট, মোটা ঘাড়। না?

—কি জানি!

—জান না কী! ওকে আমি চিট না করেছিত' কী বলেছি। মেস্ করেছেন! দাঁড়াও! আর কিছু বল্‌তে হবে না—ঐ আমার যথেষ্ট ক্লু। চাই কি এর পর বিলেত গিয়ে

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে' চাকরী বাগাতে পারবো বীরেন।

ট্যাক্সি জি-পি-ও পার হইল।

অনেক পর বীরেন কহিল,—সুধাকে তুমি ঠিক খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌বে একা?

—খুঁজে বার করবো মানে? স্থায়ী সুস্থ শরীরে এনে তোমার বাম পাশে দাঁড় করিয়ে দেবো। উলু দেবে অনি। একা নয়ত' কি আবার তোমার মতন অজবুককে সঙ্গে নিয়ে যাবো নাকি? বাবা হাস্‌তে বল্লে, হাসি, কাঁদ্‌তে বল্লে কাঁদি—তোমার মতন কাছা খুলে বৈরাগী সাজি না। পাঁচটি দিন অপেক্ষা কর—

বুক হইতে পাথরটা একটু আলগা হইতেছে: ওকে এনে কোথায় তুল্‌বে?

—কেন তোমার মাথায়।

—কিন্তু ও যদি মামাবাড়ি যেতে চায়?

পরেশ কহিল,—অমন মামাবাড়ির আবদার আমার সঙ্গে যেন না করে। ও! তোমাকে আসল কথাই বলা হয় নি। জগৎবাবু—ওর মামা—গোড়ায় ওকে খোঁজ কর্‌বার জন্যে কোমর বেঁধে ছিলেন, সন্দেহ ছিল তোমারই ওপর! তোমাকে জব্দ করাই ছিল ওঁর উদ্দেশ্য। বল্লাম,—বৃথা! ভাগ্নি আপনার লায়েক, কিডন্যাপিঙের কিড্ নয়। তা' ছাড়া, এমন মেয়েকে ঘরে তোলাই পাপ, জামাইবাবু। পথে যে বেরোয়, পথই তাকে একদিন পথে বসাবে। তোমার জন্যে কম ওকালতি করেছি ভাই, কিন্তু তুমি এমন নদের-চাঁদ যে, হাতের চাঁদ নদীর জলে ডুবিয়ে এলে। যাও, বিছানায় শুয়ে ঢেউ গোন গে, রাহু স্বয়ং তোমার বাহুর বালিশে এসে চাঁদ উপহার দিয়ে যাবে। চেষ্টা কর্‌লে আমি রবিঠাকুরকে বিট্ কর্‌তে পার্‌তাম বীরু।

সেকেণ্ড ক্লাশটা ফাঁকা। হোল্‌ড্-অল খুলিয়া নীচের বার্থে পরেশ বিছানা করিয়া লইল। —অশ্রুজলের দাম দিয়ে প্রেম কিন্‌তে যাও, দেখ্‌বে সে-প্রেম ম্লান, বাসি; দস্যুতা করে' আয়ত্ত কর, দেখ্‌বে সে প্রেম মূক, মূঢ়। পাও আকাশ শুকিয়ে যাবে, না পাও আকাশ যাবে ফুরিয়ে শূন্য হয়ে। উঠি, এবার ছাড়্‌বে। পুনরাগমনায়চ।

প্লাটফর্ম হইতে গাড়িটা অন্তর্হিত হইলেও বীরেনের বাড়ী যাইতে মন সরিল না। এখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াও ট্রেণের নাগাল পাওয়া যাইবে না, আর খানিকক্ষণ আগে বুদ্ধি খেলিলে সে এই সঙ্গেই ভাসিয়া পড়িত। লাভ হইত কী? বাবা ফের কাণ ধরিয়া লইয়া আসিতেন; এইবার আর ক্ষমা করিতেন না, স্বহস্তে হাতকড়া পরাইয়া মুখে লপ্‌সি গুঁজিয়া দিতেন। কিন্তু পরস্মৈপদী এই জয়ে তাহার চরিতার্থতা কৈ? সুধা পরেশকে চিনিবে, দৃপ্ত নির্ভীক বিজেতা পরেশ, বীরেন তাহার কাছে ঘৃণ্য কাপুরুষ, সঙ্কীর্ণচিত্ত স্বার্থপর! পরেশ যখন ঘটা করিয়া তাহার এই পৃষ্ঠপ্রদর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া টিপ্পনি কাটিবে তখন বীরেনের বীরত্ব কি সুধাকে লাঞ্ছিত করিবে না? তাহার মুখ থাকিবে কোথায়?

থাকিয়া থাকিয়া পরেশের দেওয়া সেই ধূপ-দানিটার কথা তাহার মনে হইতে লাগিল: ঘুমাইয়া পড়িবার আগে শিয়রে ধূপকাঠি জ্বালাইয়া রাখিয়ো। স্মৃতির মত ধীরে ধীরে ইহার সুগন্ধ অস্পষ্ট হইয়া মিলিয়া যাইবে।

স্মৃতির মত? কিসের স্মৃতি? পরেশ কি তবে সুধাকে ভালবাসে।

বাক্স ভরিয়া এত জিনিষ দিয়াছে,—শাড়ী-ব্লাউজ, স্নো-সাবান, টর্চ্চ, এমন কি একটা ছোরা! তাই কাশীতে তাহাকে উদ্ধার করিবে বলিয়া বাবুর আর স্ফূর্ত্তির শেষ নাই, কেমন ব্যস্ত, কেমন উচাটন! তাহার এতসব অপ্রত্যাশিত সাহায্যের অন্তরালে কি খালি নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা, কোথাও কি একটুও গোপন-লালিত বাসনা নাই, সে বাসনায় কি সুধা তাহার চোখে সোনার মত,

বসন্তের ফুলের মত, কবিতার উপমার মত সুন্দর হইয়া দেখা দেয় না ?

দরকার কি মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণে ?

বাবা তাহার ঠিকই বলিয়াছেন,—কাশীতে অমন এক-আধটা বিয়ে সবাই করে' থাকে।

ঝগড়াটে, গোঁয়ার, একগুঁয়ে! মুখে মুখে বচসা, পদে পদে অমিল। ছিঁড়িয়া ছানিয়া জীবন তাহার ঝালাপালা করিয়া দিবে।

বীরেন স্বচ্ছন্দ পরমায়ু চায়, ছন্দহীন প্রেম চায় না। পরেশকে সে পথ ছাড়িয়া দিবে।

চোখে জল লাগিয়া ছিল, তাহাই হইল প্রেম, অবগুণ্ঠণের অন্তরাল হইতে নিজেকে আজো সম্পূর্ণ অনাবৃত ও নিরাভরণ করে নাই বলিয়াই তাহা মোহ—দরকার নাই এই বিলাসিতায়। তার চেয়ে বেনেপুকুরের ললিত ধরের মেয়েকে বিয়ে করিয়া সে সোজা লোহিত সাগর পার হইয়া যাইবে! প্রেমে ছিপি আঁটিয়া সে এম-আর-সি-পি হইয়া আসুক।

বাড়ী ফিরিয়া বীরেন মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বিকেলে বেনেপুকুর থেকে লোক এসেছিলো ?

মা বলিলেন,— এসেছিলো বৈকি। তারাত' এই আটাশে তারিখেই কর্‌তে চায়।

—লাগিয়ে দাও তা' হ'লে। আর দেরী করে' কাজ নেই।

—কাল তবে নিজে একবার মেয়ে দেখে আয়। বন্ধু-বান্ধব দু'-চারজন সঙ্গে নিস্ না-হয়।

বীরেন বিরক্ত হইয়া কহিল,— বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কী হবে ? আমার পছন্দই যথেষ্ট! টাকা দেবেত' পাঁচ হাজার ?

—দেবে বৈকি। কর্ত্তা অমন কাঁচা কাজ কর্‌বার নন্।

—বেশ, মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে, মা।

—না দেখেই ?

—প্রায়।

বীরেন কাপড়-জামা ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মা কাছে বসিয়া কহিলেন,—তবে বল্‌ছিলি কাশীতে কা'কে বিয়ে করে' এসেছিস্ ?

হাসিয়া বীরেন কহিল,—চোখে একটি মেয়ে হঠাৎ ভাল লেগেছিল, মা। চোখে ভাল লাগ্‌লেই কি আর বিয়ে কর্‌তে হয়, না তার জন্যে চোখের জল ফেল্‌লে মানায় ? ও সব বাজে কথা।

বীরেনের চুলে আঙুল ডুবাইয়া মা বলিলেন, —কাশীতে গিয়েছিলি কেন শুনি ?

—বাঃ! ডাক্তারদের যে সেখানে প্রকাণ্ড সভা হচ্ছিল এবছর। গত বছর হয়েছিল বেজ্‌ওয়াদায়। বেজ্‌ওয়াদার নাম শোন নি ? হ্যাঁ, মান্দ্রাজে। সভায় না গিয়ে কি পারি ? কত দেশ-বিদেশের ডাক্তারের সঙ্গে চেনা হয়। আমাকে কাল খুব সকালে কিন্তু জাগিয়ে দিয়ো হস্‌পিট্যালে যেতে হবে। একটা রুগী মর-মর রেখে গিয়াছিলাম, সে কেমন আছে কে জানে, বাজি ধরে' টাকা গিলে খেয়েছিল। কাক ডাক্‌তেই জাগিয়ে দিও কিন্তু। খামোকা পাঁচ-ছ'দিন কামাই হ'ল।

মা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন? খামোকা কেন ?

—খামোকা নয় ? গেলাম সভায়, বাধ্‌ল মারামারি! বাবা বলে নি তোমাকে ? কাল শুনো ভালো করে। এখন ঘুমতে দাও। বসে' না হয় বিয়ের খরচের একটা খসড়া কর। বরযাত্রী কিন্তু একশো বন্ধুই হবে, আগে থেকে বলে রেখো ওদের।

বীরেন পাশ ফিরিল।

কিন্তু ঘুম আসে না। অনাগতা নববধূর লাবণ্য কল্পনা করিয়া নয়, এই কথা ভাবিয়া যে, পরেশ এতক্ষণে গ্রাণ্ড কর্ডে আসানসোল পার হইয়া গিয়াছে।

[ক্রমশঃ]

—সতীশের প্রেম—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী

এতদিনে সতীশ প্রেমে পড়িল! সতীশের বয়স ত্রিশ বৎসর। গল্পের নায়কের বয়স প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সে প্রেমে পড়িতে যথারীতি চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সে বায়স্কোপে, থিয়েটারে নিয়মিতভাবে গিয়াছে, বেথুন কলেজের সম্মুখের ফুটপাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কাটাইয়াছে সন্ধ্যার সময় পার্কের ভিতর বেঞ্চিতে চিৎ হইয়া শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছে; কোন তরুণীর মোটর টায়ার ফাটিয়া বিপদে পড়িবার আশায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াছে, ট্রামে, বাসে, বাড়ীর ছাদে ছাদে, জানালায় সে তন্ন তন্ন করিয়া তাহার মানসীকে খুঁজিয়াছে; কিন্তু হায়! তাহার ভাগ্যদেবী সেই যে মুখ বাঁকাইয়াছেন, এত অধ্যবসায়েও তিনি আর সিধা হইতে চাহিতেছেন না।

*   *   *

সতীশ কলেজে পড়ে। কোন্ ইয়ারে পড়ে তাহা জানিবার সুবিধা নাই। পিতা বর্ত্তমান,—তাই আধুনিক গল্পের নায়ক হইবার মত সাজসরঞ্জাম সে সহজেই পাইয়াছে। বয়সটা কিছু বেশী হইলেও দাড়ি গোঁফ কামাইয়া বয়স কমাইয়াছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটী নাই। শুঁড় তোলা নাগরা, লাল ফাউণ্টেন পেন ইত্যাদি সবই আছে। চশমাও লইয়াছে। প্রথমে চশমা লইয়া সে প্রচার করিল যে, চক্ষে চশমা দিলে চক্ষু ঠাণ্ডা থাকে, কিন্তু পুরাতন-পন্থী পিতা—ছেলের চক্ষে চশমা দেখিলেই তাঁহার চক্ষুশূল হয় - তাই পিতার সম্মুখে সে চশমা ব্যবহার না করিয়া উভয় দিক্ রক্ষা করে। এ হেন সতীশ এতদিন পরে একটা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা দেখিয়া প্রথম প্রেমে পড়িল।

*   *   *

রাত্রে পূর্ণিমা। বিকেলবেলা হইতেই সতীশের মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। কি যেন অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য চুরি গিয়াছে, কিন্তু যাহা চুরি গিয়াছে, তাহা মনে পড়িতেছে না। সতীশ ছটফট্ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ফাগুনের আগুন হাওয়া সতীশের মনে রং এবং হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়া কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইয়াছে। সতীশ মেসের আট নং রুম তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় যাইবে স্থিরতা নাই। এই ফাল্গুন পূর্ণিমায় বায়স্কোপ দেখা চলে না। আর দেখিবেই বা কি? পার্ল-হোয়াইট কাহার মাসী, দাদাভাই সরকারী বায়স্কোপে দরকারী কি না —এসব তাহার মুখস্থই আছে। কোন থিয়েটারেই নূতন প্রোগ্রাম নাই। বিরক্ত হইয়া সতীশ গড়ের মঠে ঢুকিয়া পড়িল। আর হাঁটিতে পারে না। যেখানে লোকজন নাই সেখানে গিয়া সতীশ বসিল। বসিয়া বসিয়া সতীশ ভাবিতে লাগিল। আর ভাবিবেই বা কি? কিছু ভাবিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত গিয়া সাক্ষাৎ হয় কোন তরুণীর সাথে। সে ভাবিতে লাগিল হোয়াইট্এওয়ে কোম্পানীর বাড়ীটা ত কম উঁচু নয়; ফিরপো হোটেলটার ভিতর ওই যে মেমটি দাঁড়াইয়া আছে—ও বেশ সুন্দরী। উহার সহিত আলাপ হয় না?—নাঃ, ওসব আর ভাবিব না বলিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, একজন তরুণী গড়ের মাঠটি সোজা পাড়ি মারিতেছেন। আহা! উঁহার সঙ্গে

যে কেহই নাই—পথে যদি কোন বিপদ হয় ? সতীশ আর স্থির থাকিতে পারিল না – তরুণীর ভবিষ্য-বিপদাশঙ্কায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন তরুণ তাহার নিজপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া ওই তরুণীর ভবিষ্য বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পিছু লইতই। সতীশ যাহা করিয়াছে, তাহা মোটেই দোষণীয় নয়। গল্পের নায়িকা যখনই কোন বিপদে পড়িয়াছে, নায়ক যেখানেই থাকুন না কেন—ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবেনই। সতীশ সে সব গল্প পড়িয়াছিল—তাই ওই তরুণীর সঙ্গ লইতে দ্বিধা করিল না। যদি ওই তরুণীর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে সে না থাকিলে কে উদ্ধার করিবে ? তরুণা সোজা চলিতে লাগিল। মাঠের মাঝে নির্জ্জনতার আড়াল আশ্রয় করিয়া সতীশ একেবারে তরুণীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মাপ করিবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; আপনার সাথে কি কেহ নাই ? যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া কৃতার্থ হই।" তরুণী দাঁড়াইল না, কিন্তু জবাব দিল—"ঢের ঢের বাবু দেখিয়াছি,—কিন্তু তোমার মত এমন বেহায়া বাবু দেখি নাই ; শুধু এই কথাই বলিতে বুঝি মাইল দুই ছুটিয়া আসিয়াছ ?"

সতীশ—"না, যদি আপনার কোন বিপদ হয়, সেই –"

তরুণী বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"হাঁা, বিপদ হয়। জ্যোৎস্না-রাত্রে কিসের বিপদ ?

সতীশ—"আপনাদের বয়সে জ্যোৎস্নাতেই ভয় বেশী।"

তরুণী—"মাতাল না কি ? আমার বয়স কিসে বেশী দেখিলে ? ঝণ্ডু খানসামা বলে আমার বয়স আঠারোর বেশী হইবে না।"

সতীশ সবিনয়ে বলিল—"আমিও তাহাই বলি। ঝণ্ডু খানসামার সহিত আমার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। আপনার সরলতা এবং সপ্রতিভ ভাবে আমি মুগ্ধ হইয়াছি—আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনাদের বাড়ীতে গিয়া দেখা করিতে পারি।"

ঝণ্ডু খানসামার সহিত লোকটির কোন পার্থক্য নাই শুনিয়া তরুণী খুসী হইয়া বলিল—"বেশ তো, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই—কতজন তো গিয়া আমার সহিত দেখা করে,– তোমাকে তো ভালমানুষের ছেলে বলিয়াই মনে হইতেছে, তুমি দেখা করিলে আর ক্ষতি কি ?"

সতীশ বলিল—"আপনি কি কুমারী ?"

তরুণী—"কুমারী নই তো কি কুমার ? আমার নাম কুইনকুমারী।"

পথ প্রায় শেষ হইয়াছিল। তরুণী বলিল—"আর নয়, এখন তুমি সরিয়া পড়।"

সতীশ বলিল—"ঠিকানা ?"

তরুণী—"এখানেই রোজ দেখা হইবে, ঠিকানার দরকার কি ?"

তরুণী অদৃশ্য হইল।

* * *

সতীশ ভাবিতে ভাবিতে মেসে ফিরিল। তাহার অনুতাপ হইল,—কেন সে বৃথা সহরের মাঝে তাহার মানসীকে খুঁজিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় যাহার অন্বেষণে বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছে,—সে গড়ের মাঠে আসিল কি করিয়া ! সে তো কত দিন চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত আসিয়াছে, কিন্তু কয়েক গজ দূরে গড়ের মাঠে সে কেন নামে নাই। ঘাটে-বাটে মানসী খুঁজিয়াই সে হতাশ হইয়াছে—মাঠে নামে নাই কেন ? ভগবান আজ তাহার সুবুদ্ধি দিয়াছিলেন—কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। কিন্তু বিপদ হইল এই যে, কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতেই হইবে,—এই দীর্ঘ সময় সে কাটাইবে কি করিয়া ? এরূপ মনের অবস্থা লইয়া কলেজে যাওয়া চলে না, কোন খেলা বা সভায় যোগ দেওয়াও চলে না, কি

করা যায় ? অনেক ভাবিয়া সে যাহা আবিষ্কার করিল, তাহা ছাড়া এরূপ অবস্থায় অন্য কিছু করা সম্ভব নয় - একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সতীশ কবিতা না লিখিয়া আর কিছুই করিতে পারে না—তাই সতীশ এই প্রথম কবিতা লিখিতে বসিল,

"ফাগুনের মাঝামাঝি,
মাঠে পড়ে' সোজাসুজি,
বিরহ-মলয় আজি
দিতেছিল পাড়ি।
হ'ল দেখা খণ তরে।
তাহাতেই মন হরে—
সরলতা মাখা ও রে,
কুইনকুমারী !"

এই পর্য্যন্ত লেখা হইতেই ঘরে প্রবেশ করিলেন নন্দীগ্রামের পুলিন-দা'। তিনিই মেসের সর্ব্ব পুরাতন মেম্বার—এবং একজন গায়ক। মেসের সকলেই তাঁহাকে পুলিন্দা বলিয়া থাকে। তিনি সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বিড়ালের ডাক শুনিলেও আঁৎকাইয়া লঙ্কাকাণ্ড বাধান। এই জন্যই মেসের মেম্বারগণ বিড়াল কুকুর গরু ইত্যাদির ডাক অবিকল নকল করিয়াছে। সন্ধ্যার পর মেসে জন্তু-জানোয়ারের হাট বসিয়া যায়। সন্ধ্যার পর পুলিন্দার গান গাওয়া অভ্যাস—কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই গান আরম্ভ করিবার পরই তাঁহার ভীতি-চীৎকার শোনা যায়—'আজি কে আসিল রে,' ধরিয়াই 'ও রে বাবারে, গেলাম রে' করিতে হয়। এ হেন পুলিন্দার আগমনে সতীশ বলিল—"কে, পুলিন্দা ?"

পুলিন্দা—"কেন, দেখ্‌তে পাও না না কি ?"

সতীশ জানাইল যে, দেখিতে সে পূর্ব্বেই পাইয়াছে—তবে নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিতে এই প্রশ্ন। পুলিন্দা 'বেশ—বেশ' বলিয়া একেবারে বালিশের তলায় হাত দিলেন। সতীশ জোর করিয়া পুলিন্দার হাত এবং বালিশ চাপিয়া বসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ধস্তাধস্তির পর পুলিন্দার হাত বাহির হইয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গে বাহির হইল ওই কবিতা। পুলিন্দা কয়েক গজ দূরে দাড়াইয়া সমগ্র কবিতাটি সুর করিয়া পাঠ করিলেন এবং এরূপ ভাব দেখাইলেন যে, এই কবিতাটি সুর সংযোগে মধুময় করিয়া মেসের অনান্য মেম্বারদিগকে দান করিতে এখনি রওনা হইতেছেন। সতীশের প্রাণঘাতী অনুরোধেও পুলিন্দা নরম হন না। সতীশ বলিল—"পুলিন্দা, তোমার পায়ে পড়ি—এবারটি আমায় মাপ কর।"

পুলিন্দা মাপ করিতে রাজি নহেন। অবশেষে এই প্রকার সন্ধি হইল যে, সতীশ আর কখনও ভয় দেখাইবে না এবং কুইনকুমারী অথবা যে কোন কুমারী সম্বন্ধে যাহা ঘটিবে বা ঘটিয়াছে, —তাহা পুলিন্দার নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। সতীশ অগত্যা স্বীকার করিল। পুলিন্দা সমগ্র ঘটনাটা শুনিয়া বলিলেন—"হুঁ"।

সতীশ—"তার মানে ?"

পুলিন্দা—"না, ভয় কিছু নাই,—তবে সাবধান।"

সতীশ—"কি যে তুমি বল, ভয় নেই অথচ সাবধান।"

পুলিন্দা। "খুব ফর্‌সা কাপড় ছিল তো ?"

সতীশ জানাইল যে, কাপড় এবং ব্লাউজ দুই-ই খুব ফর্‌সা। সে নিজেও খুব—

পুলিন্দা—"হুঁ।"

সতীশ চটিয়া বলিল—"কি যে 'হুঁ হুঁ' কর তার ঠিক্ নেই।"

পুলিন্দা—"উহারা ওই রূপেই বেড়ায়। পা মাটিতে ছিল তো ?"

এতক্ষণে সতীশ পুলিন্দার ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিল। তাই হাসিয়া জবাব দিল—"আ রে, সে ভয় ছাড়। সে ভয় আমার নাই—অন্য কোন ভয় নাই তো ?"

পুলিন্দা বলিল—"না, এক প্রাণের ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয়ই নাই।"

সতীশ বলিল—"যে প্রকারেই হোক্ উহাকে আমার চাই-ই। এ বিষয়ে তোমার সাহায্য দরকার।"

পুলিন্দা বলিল—"এসব কাজে আমার উৎসাহ যথেষ্ট পাইবে, তবে দিনের বেলায়। রাত্রে আমি কিছু করিতে পারিব না।"

সতীশ বলিল—"শোন, কাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তোমায় গড়ের মাঠে যাইতে হইবে; আমরা দু'জন কুইনকুমারীর সহিত তাহাদের বাড়ী যাইব —তুমি তাহার অভিভাবকের নিকট আমাদের বিবাহের প্রস্তাব করিবে। এটুকু উপকার তোমাকে করিতেই হইবে—পুলিন্দা।"

পুলিন্দা স্বীকৃত হইলেন - তবে তাঁহার মনে একটু খট্‌কা রহিয়া গেল—ওই সন্ধ্যায় যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া। দিনের বেলা যাইতে পারিলে তাঁহার আর কোন আপত্তি থাকিত না। সন্ধ্যায় যাইবার কথার পর হইতেই তাঁহার গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল।

* * *

পরদিন সন্ধ্যায় সতীশ ও পুলিন্দা গড়ের মাঠে আসিয়া উপস্থিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুলিন্দা বলিল—"দেখিতেছ, আজ জ্যোৎস্না কিরূপ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল—আর যাইয়া কাজ নাই; কি বল?"

সতীশ ও পুলিন্দাকে কিছুতেই ছাড়িবে না— পুলিন্দাও অগ্রসর হইবেন না। কিছুক্ষণ টানা-টানি করিয়া সতীশ পুলিন্দাকে ছাড়িয়া দিল। পুলিন্দা ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় উপদেশ দিয়া গেলেন যে, সময় উপস্থিত হইলে 'রাম নাম' করিতে যেন ভুল না হয়। সতীশ কিন্তু ফিরিল না—মাঠের মাঝখানে গিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। অবশেষে তরুণী আসিল। সতীশ নমস্কার করিতেই তরুণী বলিল—"কি! আসিয়া জুটিয়াছ!"

সতীশ বলিল—"না আসিয়া আর কি করি? আপনাকে না দেখিলে বাঁচিবার আশা নাই। আজ সারাদিন যে আমার কি ভাবে কাটিয়াছে, —তাহা ভগবান ছাড়া আর কেউ জানে না—" ইত্যাদি বলিয়া সতীশ নিজের পরিচয় দিতে লাগিল;—উদ্দেশ্য তরুণীও তাহার পরিচয় দিবে। সতীশ বলিল—"আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি, আমাদের বিপুল সম্পত্তির মধ্যে ন' খানি বাড়ী কলিকাতায়। আমার পিতা রায়বাহাদুর —"

তরুণী বলিল—"আর তুমি বুঝি বাহাদুর?"

সতীশ—"না, আমি শুধু রায়। আমার নাম সতীশচন্দ্র রায়। আমাদের তিনটী কাপড়ের কল চলিতেছে; চারটি চা বাগানে চা গাছ সজোরে উঠিতেছে—"ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সতীশ মিথ্যা বলে নাই। সত্যই তাহারা তিনটি কাপড়ের কলের এবং চারটী চা বাগানের অংশী-দার। সম্প্রতি তাহারা প্রত্যেক কোম্পানী হইতে দশ টাকার সেয়ার কিনিয়াছে। তরুণী কিন্তু সতীশের পরিচয় পাইয়াও নিজের পরিচয় দিল না—সতীশও লেডির অসম্মান করিতে সাহসী হইল না। যাহা হউক, অবশেষে সতীশ তরুণীর পাণি-প্রার্থনা করিয়া বলিল "আপনি দয়া না করিলে আমার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে—আপনি আমাকে উদ্ধার না করিলে আর কাহারও পিতার ক্ষমতা নাই। আপনি আমার হৃদয়ের নিদারুণ বেগ বাহির হইতে বুঝিতে পারিবেন না—নিজের অন্তর যদি কখনও কাহাকে ভাল বাসিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিবেন—" ইত্যাদি বলিয়া নিরস্ত হইল।

তরুণী যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে,—তাহার বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই তবে কি না বাঁধা থাকিতে হয়— স্বাধীনতায় আঘাত লাগে। মনও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে—একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্তরে-বাহিরে বিশ্ব-

মানবতার বিশ্ব-টিকিও দেখা যায় না, বড়ই নির্ভ-শীল হইতে হয়; স্বামী যাহা দিবে তাহা ছাড়া বেশী পাইবার উপায় নাই।" ইত্যাদি। বিবাহের অসুবিধার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তরুণী বলিল—"যাই হোক্, তোমার হাল দেখিয়া আমার মন নরম হইয়াছে, তোমাকে আমি উদ্ধার করিব।"

সতীশ তরুণীর সরলতা এবং পাতিব্রত্যে মুগ্ধ হইয়া বলিল—"আপনি আজ যাহা সরলভাবে বলিলেন, তাহা চিরদিন মনে থাকিবে। আপনাকে লাভ করিয়া আজ আমি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখী বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি—"

তরুণী বাধা দিয়া বলিল—"আর বেহায়াপণা করিও না—আমার বাসায় আসিয়া পড়িয়াছি। ভিতরে গিয়া বসিবে চল।"

* * * *

বিখ্যাত হাড্‌সেট্ কোম্পানীর মালিক মিঃ ডাভ্ তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধিশালী। বিবাহের পর হইতে প্রতি বৎসর সন্তানলাভে বিরক্ত হইয়া মিসেস্ ডাভের সহিত মর্ম্মান্তিক ঝগড়া বাধাইয়া বসিলেন। ইহার শেষ ফল হইল এই যে, উভয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের আশ্রয় লইলেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়া গেলে মিসেস্ ডাভ মিঃ ডাভের কোলে শিশু সন্তানগুলি সম্প্রদান করিয়া,—সিমলা না কি সিলোনে বিশ্রাম লাভ করিলেন। এদিকে মিঃ ডাভ্ বাধ্য হইয়া দুই-একজন আয়া রাখিলেন। শ্রীমতী কুইন-কুমারী আজ দুই বৎসর হইল মিঃ ডাভের আয়া-গিরিতে ভর্ত্তি হইয়াছে। ডাভ্ সাহেব কুইন-কুমারীকে খুব বিশ্বাস করে। তাই তাহার অখণ্ড প্রতাপ। ঝণ্ডু খানসামা এবং মনিরদ্দি বাবুর্চ্চি কুইনকুমারীকে হাসিতে দেখিলে বেহেস্ত-সুখ অনুভব করে। এ হেন কুইনকুমারী বাবুর্চ্চি-খানার পাশের কামরায় সতীশকে লইয়া গেল। মাদুরের উপর টেবিল-ক্লথ বিছাইয়া বলিল—"তুমি বস', আমি সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আসি।"

তরুণী বাহির হইয়া গেল।

আর কোন কাজ না থাকাতে সতীশ ভাবিতে লাগিল যে, কি ভাবে পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবে; এবং কি ভাবেই বা তাহার নিজের মনোনীত পাত্রীর প্রতি পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করাইবে। শেষে স্থির করিল এখন ভাবিয়া লাভ নাই—এই সব গুরু বিষয়ের উপদেশ মেসে গিয়া পুলিন্দার নিকট হইতে বাহির করিবে। তবে মেয়েটি কে? এই সাহেবের বাড়ীতে ঢুকিয়া বাবুর্চ্চিখানার পাশে আশ্রয় দেওয়া তো ঠিক—

কুইনকুমারী প্রবেশ করিয়া বলিল—"কি চম্‌কে উঠ্‌লে যে! ভয় নাই, কেহ আসিবে না। আর সাহেব আমার কথা খুব শোনে। আয়া বলিতে একেবারে অজ্ঞান। তাই তো ভাবি বিবাহ করিলে এমন মনিবকেও ছাড়িতে হইবে। পাণ খাবে?"

তরুণী পাণ সাজিতে বসিয়া বলিতে লাগিল—"সাহেবের আয়া হইলেও কাজ আমায় কিছুই করিতে হয় না; শুধু হুকুম চালাইয়া বেড়াই। একদিন হইল কি, বাবুর্চ্চি বেটা আমার কাপড় ধরিয়াছিল—সেই কথা সাহেবকে বলিয়া দিতেই সাহেব ঘোড়ার চাবুক লইয়া—আঃ! পঁচিশ ঘা তাহার পিঠে; তারপর থেকে—দোক্তা খাও তো?"

সতীশ বলিল—"না, পাণও আমি খাই না। আমার মাথা ঘুরিতেছে—আজ আমি যাই; আর একদিন আসিব।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তরুণী বলিল—"সে কি হয়! আজ রাতটা থাকিয়া যাও—রাত্রিও কম হয় নাই।"

সতীশ বলিল—"রাত্রি নেহাৎ বেশী হয় নাই—তোমার বাড়ী তো দেখিয়া গেলাম—কাল-

পরশু আবার আসিব।” বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

* * *

মেসে ফিরিয়া সতীশ পুলিন্দাকে সমস্ত কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এখন উপায়? আমার ঠিকানা পর্য্যন্ত আমি তাহাকে জানাইয়াছি—যদি সে এখানে আসিয়া বিবাহের দাবী করে? তাহা হইলে আমি মুখ দেখাইব কি করিয়া?”

পুলিন্দা বলিলেন—“আমি তোমাকে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম; তখন তো তুমি শুনিলে না—এখন আমি কি করিব?”

সতীশ বলিল—“কোথায় তুমি নিষেধ করিয়াছিলে? তুমি তো শুধু বলিয়াছিলে যে, ভূত কি না দেখিও। তা’ ছাড়া তো আর কিছু বল নাই।”

পুলিন্দা বলিল—“ভূত কি আর গাছে ফলে? ইহাদেরই নাম ভূত। যাক্, তুমি ভাবিও না আমি ইহার ব্যবস্থা করিতেছি। সমাজে মেসের ঝির সহিত মেসের বাবুর প্রেম চলিয়াছে—কারণ তাহারা জাতিতে উভয়েই মেস। আজই আমি সমাজনেতাদিগকে পত্র লিখিতেছি। দেখি, তাঁহারা বেহায়ার সহিত আয়ার মিলনে উৎসাহ দেন কি না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও যে, তাঁহারা বিবাহের পক্ষে মত না দিলেও প্রেমের পক্ষে মত দিবেনই। প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী। অন্য বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার বিনাশ নাই। প্রেম জাতিভেদ মানে না, আজ কাল জাতিভেদ পর্য্যন্ত মানিতেছে না—অতএব তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।”

সতীশ রাগিয়া বলিল—“আমি যেন সেইজন্যই ভাবিতেছি; আমি চাই যাহাতে সে আর আমার কাছে না আসে।”

পুলিন্দা হাসিয়া বলিল—“আচ্ছা, তাহাই হইবে। মেস বদল কর।”

পরদিন মেসের দুইজন মেম্বার কমিল।

আর একটি রাত্রি !

[নেহাৎ গল্পও নয়, নেহাৎ ছোটও নয়।]

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম্-এ, বি-এল্

এও আজ সাত-আট বৎসর আগেকার কথা, তবে ৺পূজার ছুটী নয়, গ্রীষ্মের ছুটী।

বৃহস্পতিবার, বারবেলা নয়, সকালবেলাই, তবুও কি ভোগটাই না ভুগিতে হইল! আমাদের ক্লাব-বাড়ীতে বসিয়া আছি। দু'-চারজন মেম্বারও আছেন। আমরা সকলেই ব্যস্ত; শনিবার বৈকালে ক্লাবের সাহিত্য-শাখার বিশেষ অধিবেশন—মাঝে একটা দিন মাত্র। এই সময়টুকুর মধ্যেই সহরের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নামে নিমন্ত্রন-পত্র দিতে হইবে; সাধারণের জন্য টিকিট ছাপাইতে হইবে—ইত্যাদি বহু কাজ হাতে রহিয়াছে। এমন সময় কি না—

"৩।৭।১নং রামকান্ত বসুর লেনে সরযূ নিশ্চয়ই আছে!—না মশাই?"

ভালো আপদ—কোথা থেকে এক পাগল জুটিল এই সময় আবার! কয়দিন হইতেই শুনিতেছি বটে, একটা আধ-পাগ্‌লা গোছের ছোক্‌রা সমস্ত দিনই 'সরযূ' 'সরযূ' করিয়া বাড়ী বাড়ী খুঁজিতেছে। বেশীর ভাগ যায়গাতেই লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত বা উপহসিত হইয়াছে; সহানুভূতি পাইয়াছে অতি অল্প লোকের কাছেই। ছোকরাটিকে দেখিবার কৌতূহল ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এমন দিনেই আসিতে হয়! ছেলেটার দুর্ভাগ্য বটে। আমি কিছু বলিবার আগেই দু'-একজন কৌতুক-প্রিয় মেম্বার তাহাকে খাতির করিয়া ঘরের ভিতর আনিয়া বলিল—"সরযূ এখন ৩।৭।১নম্বরে নাই—আমাদের এই সেক্রেটারী মহাশয়ের বাড়ীতেই আছে—ইঁহাকে একটু ভালো করিয়া ধর।"—এই বলিয়া আমার দিকে ইঙ্গিত করিল। ছোকরা একেবারে আমার পা ধরিয়া পড়িল। বলিল—"সরযূর সঙ্গে দয়া করিয়া একবার দেখা করিতে দিন। নীরেন আসিয়াছে বলিলেই সে নিশ্চয় দেখা করিবে।"

আমি যত বলি সরযূকে আমি কস্মিনকালেও জানি না, ততই সে নাছোড়বান্দা, সঙ্গীরাও সুবিধা পাইয়া বেশ ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। কাহার উপর রাগ করিব! অবশেষে আগন্তুককেই যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। মেজাজটা কিন্তু বিগড়াইয়া গেল; তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

যথারীতি স্নানাহার সারিলাম বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাইলাম না। আহা, বেচারার এমন কি অপরাধ, যা'র জন্য তাকে অতটা শাস্তি দিলাম! কই, একবারও ত তা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম না ব্যাপারটা কি? আহারের পর নিদ্রাদেবীর আবাহনের উদ্দেশ্যে এক-আধখানা মাসিক পত্র লইয়া নাড়াচাড়া করা আমার বহুকালের অভ্যাস; আজ কিন্তু তার ব্যতিক্রম হইল। শয্যার পার্শ্বে টিপয়ের উপর দেখি কতকগুলি রচনা স্তূপীকৃত থাকিয় নির্ব্বাচনের অপেক্ষায় কাতর নয়নে আমারই দিকে চাহিয়া আছে—আমাদের ক্লাবের মাসিক-পত্রিকা 'গোপিকা' আর সাতদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। প্রথমেই চোখে পড়িল,—'একটি রাত্রি' শ্রীজগৎপতি চৌধুরি। তুফান মেলের প্রথম যাত্রা কাশী হইতে সমগ্র ট্রেণখানিতে একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় দুইটি মাত্র প্রাণী! তরুণ-তরুণী, দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক নাই, পরিচয় নাই—পড়িয়া

বড়ই আনন্দ পাইলাম। শুনিয়াছিলাম, গল্পের গরু গাছে ওঠে, এখন সেটা সত্য বলিয়াই ধারণা হইল। কিন্তু এ কি! নীরেন, সরযূ, ৩।৭।১ নং রামকান্ত বসুর লেন! আর ত গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না—এ যে বর্ণে বর্ণে সত্য!—পরে হওড়ায় খবর লইয়া জানিলাম, প্রথম দিন তুফান মেল কাশী হইতেই ছাড়ে, আর দুই জন মাত্র যাত্রী সেই দিন জুটিয়াছিল একজন সরযূ আর একজন নীরেন!

সমস্তটা পড়িয়া বেচারা নীরেনের জন্য দুঃখ হইল; তার উপর যে অযথা অত্যাচার করিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। অনুতপ্ত হইলাম; নিজের উপর রাগও হইল। এখনই এর প্রতিকার করা প্রয়োজন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। তখনই উঠিলাম। নীরেনের সন্ধানে সেই দুপুরবেলাই বাহির হইলাম। কলেজ বন্ধ, গ্রীষ্মের ছুটি। মেসে-মেসেই অনুসন্ধান করি। নীরেনের ত কেউ নাই, ঘর-বাড়ীও নাই, কলিকাতায় মেসে থাকাই সম্ভব। অনেক ঘুরিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় পটুয়াটোলার এক মেসে নীরেনের সন্ধান মিলিল! প্রথমে মেসের ম্যানেজারের নিকট তদন্ত করিয়া জানিলাম,—নীরেন সর্ব্ববিষয়েই খুব ভালো—পড়া-শুনায়, ব্যায়াম-চর্চ্চায়, সচ্চরিত্রতায়, আর্ত্তসেবায় দয়া-দাক্ষিণ্যও যথেষ্ট। অর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল। কিন্তু সম্প্রতি—ম্যানেজার-মহাশয়ের শেষটা বলিতে একটু যেন সঙ্কোচ লাগিতেছিল। বলিলাম—"দেখা করিব।" তিনি তেতালার একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিলেন, আর একটু হাসিয়া বলিলেন—"যদি খাতির পাইতে চান ত' সরযূর সন্ধান দিবেন।" আমি সে কথার জবাব না দিয়া তাড়াতাড়ি তেতালায় উঠিলাম।

দেখি ছোট একটি কুটুরী। দোর-জানালা সমস্তই খোলা; কাপড়, জামা, বই, চায়ের বাটি, খপরের কাগজ, সাবানের বাক্স, ভাঙ্গা আর্শী, দাঁড়াভাঙা চিরুণী, ঢাকনি-খোলা নস্যদানী সবই যেন এক জাহাজে সহযাত্রী ছিল—জাহাজ বানচাল হওয়ায় একসঙ্গেই ডুবিয়া মরিয়াছে। দেয়ালের গায়ে একখানি ক্যালেণ্ডার বাতাসে উল্টাইয়া গিয়াছে—আর একখানি ক্যালেণ্ডার উল্টায় নাই বটে, কিন্তু সাত-আটমাস তাহাতে হাত পড়ে নাই। বাহিরে জ্যৈষ্ঠমাস হইলেও সেই ছোট্ট তেতালার ঘরে এখনও কার্ত্তিক মাস চলিতেছে।

একটু অনুসন্ধান করিতেই ঘরের মালিককে দেখিতে পাইলাম। খাটের বিছানায় নয়, মেঝেয় মাদুরে বই মাথায় দিয়া; গায়ের উপর জামা বা চাদর নাই, খবরের কাগজ! সৌম্য মূর্ত্তি, সুগঠিত দেহ, হাস্যপ্রফুল্ল মুখ, কিন্তু ঈষৎ ম্লান, দৃষ্টি উদাস। আমাকেই দেখিয়াই সাদর অভ্যর্থনা করিল, আবার তখনই অপ্রস্তুত হইল—"আসুন, বসুন—কিন্তু বসিবেন কোথায়!" এই বলিয়া বইগুলা সরাইতে লাগিল। "আপাততঃ এইখানে বসুন। একটা চেয়ার ছিল, কিন্তু কোথায় গেল কে জানে!" আমি তাহার সরলতা ও সৌজন্যের আতিশয্যে মুগ্ধ হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের মাত্রাও দ্বিগুণ বাড়িল—আগ, আজই সকালে অকারণে একে কি লাঞ্ছিতই না করিয়াছি! বলিলাম—"ভাই, ব্যস্ত হইও না, আমি নিজেই জায়গা করিয়া বসিতে জানি।" পাশেই বসিয়া পড়িলাম; কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আজ সকালেই যে সে আমার হাতে অপমানিত হইয়াছে এ কথা তার মনেই নাই, এমনই আত্মভোলা সে! দেখিলাম তাহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিতেছে, কথাও অসংলগ্ন হইতেছে। সন্দেহ হইল, গায়ে হাত দিয়া বুঝিলাম, প্রবল জ্বর। খানিক পরেই সে মাদুরে লুটাইয়া পড়িল। এবার মাথায় বইখানিও নাই। মেসের ছোকরাদের ডাকিলাম।

তখনই ডাক্তার আনা হইল। তিনি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ভয় পাইলেন। আদেশ দিলেন—"মেসে থাকিলে এ রোগীর জীবন

সংশয় ! শীঘ্রই—হাঁসপাতাল হইলে ভালই হয়—না হয়, কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে রোগীকে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন।” কেহই কিন্তু হাঁসপাতালে পাঠাইতে রাজী হইল না। আমি যে নীরেনের সম্পূর্ণ অপরিচিত, একথা তাহারা বুঝিতে পারে নাই; তাহারা আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি বলিলাম—“এখনই ব্যবস্থা কর, ভাই সব। আমার বাড়ীতেই লইয়া যাইব—এই রাত্রেই।”

সেই রাত্রেই সংজ্ঞাহীন নীরেনকে বাড়ী আনিলাম। হায় রে, আমার বাড়ী! এ যে মেসেরই একটু উন্নত সংস্করণ। চাকর-বামুন লইয়াই আমার সংসার। বাপ বহুকাল মারা গিয়াছেন, ভাই নাই, বোন্ নাই, মা কাশী-বাসিনী।

বিবাহ করি নাই। জ্ঞাতি বৃহৎ। পৈতৃক বাড়ীতে একাই বাস করি। অর্থের অসদ্ভাব নাই। মা’র বড় দুঃখ যমুনাকে বিবাহ করিলাম না—অন্য কাহাকেও নয়। যাক্, সময় কিন্তু মন্দ কাটিতেছে না। কলেজ হইতে সব পাশগুলিই করিয়াছি। তারপর, ক্লাবের সেক্রেটারী, মাসিক-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, বৎসরে চারি-পাঁচবার ভ্রমণ ও সাঁতার প্রতিযোগিতার পাণ্ডা, এই রকম করিয়াই দিন কাটিতেছে। এই ত আমার বাড়ীর দশা! সেখানে আনিয়া ফেলিলাম একটি অপরিচিত অনাত্মীয় যুবককে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়! তবুও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিলাম—অর্থব্যয়েও কার্পণ্য করিলাম না। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ডাক্তার বলিলেন—“আর ভয় নাই; এখন ঔষধের চেয়ে তদ্বিরেরই বেশী দরকার।”

আরও পনের দিন গেল। নীরেন এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, কথাবার্ত্তা কয়। প্রথমটা তার খুবই গোলমাল ঠেকিয়াছিল, ক্রমশঃ সব মনে পড়িতে লাগিল। এখন সে আমাকে ‘দাদা’ বলিয়া ডাকে—ক্রমশঃ সেই তুফান মেলের সমস্ত ঘটনা সে আমাকে অকপটে বলিল। আমি বলিলাম—“নীরেন, এ ঘটনা আর কেউ জানে?”

বলিল—“কই, না, কেউই জানে না ত।”

আমি তখন সেই রচনাটি তাহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। সে ত একেবারে অবাক! ক্ষণিক পরে হাসিয়া উঠিল; বলিল—“হয়েছে, হয়েছে, তিনিই তা’হ’লে জগৎপতি!”

আমি বলিলাম—“কে হে?”

নীরেন বলিতে লাগিল—“দাদা, সেই যে হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া সরযূকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিলাম, সরযূ যে সেই তার বাসার ঠিকানা বলিল—”

আমার ভয় হইল, আবার বুঝি রোগে ধরে। বলিলাম—“হাঁ, হাঁ, তা’তে জগৎবাবুর কি?”

নীরেন বলিল—“সরযূ ত গেল, আমি পোল-টুকু হাঁটিয়াওপারে ট্রাম ধরিব ভাবিয়া চলিয়াছি, এমন সময় একটি বেশ ফরসা বাবু বেশী মাত্রায় কথা কয়, বলিলেন—‘ওহে, তুমি ত আমাদের পাড়ার মেসে থাক; এস আমার গাড়ীতে এস।’ আমি উঠিলাম। দেখিলাম, তিনি হাওড়া ষ্টেশন হইতে কয়েক ঝুড়ি আম লইয়া যাইতেছেন। পথে কথায় কথায় তিনি আমার সমস্ত বিবরণ জানিয়া লইলেন। কে জানে দাদা, তিনি এমন সাংঘাতিক লোক! আমার ব্যাপারটায় একটা গল্প জমাইবেন। সি-আই-ডিরাও যে এর চেয়ে ভাল।”

একদিন নীরেনকে খুব অন্যমনস্ক দেখিলাম—একটা ঘোর যেন তার চোখে লাগিয়াছে—পুরানো সেই উদাসভাবটি যেন আবার তাহাকে দখল করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভয় হইল। বলিলাম—“নীরেন, ভাবিতেছ কি? খুলিয়া বল; দাদার কাছে লুকাইতে নাই।”

নীরেন আমার মুখের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে খানিকটা চাহিয়া রহিল ; বলিল -"দাদা, তারা ত ঠিকই বলিয়াছিল।"

আমি বলিলাম -"স্পষ্ট করিয়া বল, কা'রা কি বলিয়াছিল ?"

"তারা সেদিন বলিয়াছিল না যে, আপনার কাছেই সরয় আছে, সে ত ঠিক কথা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--"কিসে বুঝিলে ?"

উত্তরে নীরেন আমার হাত ধরিয়া আমার শয়ন-ঘরে লইয়া গিয়া দেয়ালের গায়ে যমুনার যে সুবৃহৎ ফটোখানি ঝুলিতে ছিল, সেইখানি দেখাইল । বলিল—"এই ত !"

আমি আশঙ্কা করিলাম তাহার ব্যাধি বুঝি আবার ফিরিয়া আসে। এবার তা' হ'লে আর বাঁচান যাইবে না। বলিলাম—"ভাই, তুমি ঠিক বুঝিতেছ এই সরয় ?"

নীরেন বলিল—"এতে ভুল হইতেই পারে না।"

আমি বলিলাম "তুমি একে বিবাহ করিবে ?"

সে বলিল—"আমি এমন পাত্রীর সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আমি বলিলাম—"সে ভার আমার। তুমি প্রস্তুত হও।"

মাকে লিখিলাম—"মা, এতদিন পরে তোমার যমুনার যোগ্য পাত্র মিলিয়াছে। নীরেনকে লইয়া আমি ৺কাশীধামে তোমাদের কাছে দু'-চারদিনের মধ্যেই যাইতেছি।"

আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র কিনিয়া দু'জনে কাশী রওনা হইলাম।

সেখানে পৌঁছিয়াই আগে বিশ্বনাথের দর্শন করিলাম না, জগজ্জননীকেও না, দর্শন করিয়াই পদধূলি লইলাম গৃহ জননীর। মা আশীর্ব্বাদ করিলেন ; নীরেনকে দেখিয়াও খুসী হ'লেন। কিন্তু তবুও মনে হইল, মা যেন একটু ক্ষুব্ধা, একটু আশাহতা। কারণ বুঝিয়াও সেটাকে বড় আমলে আনিলাম না। যমুনাকে ডাকিলাম—"মুনা-মুনা-যমু-যমু।" জানি যমুনা না বলিয়া ঐ রকম বিকৃত করিয়া ডাকিলে যমুনা রাগ করে ; বলে—"ও রকম করিয়া ডাকিলে কখনও সে সাড়া দিবে না।" কিন্তু 'ঘ'টুকু না বলিতে বলিতেই যমুনা হাসি মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। এবার যত ডাকি, এমন কি পুরা যমুনা বলিয়া ডাকিতে থাকিলেও তাহার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। কিন্তু দ্বিতলের সিঁড়ি হইতে চুড়ির করুণ আওয়াজ কাণে আসিল। মা বলিলেন—"তুই যেমন বোকা, যমু এখন বড় হইয়াছে, সে কি হঠাৎ আসিতে পারে ; বিশেষতঃ, যখন নীরেন রহিয়াছে এখানে। সে ত সবই শুনিয়াছে।"

আমি হাসিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম, চুড়ির আওয়াজকারিণী সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া। হাসিমুখে সে আমাকে প্রণাম করিতে ভুলিল না বটে, কিন্তু তাহার মুখখানি একেবারে বিবর্ণ, চোখে কালীমাখা। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম ; সস্নেহে বলিলাম—"যমু, এ কি !"

এই স্নেহ-সম্ভাষণে বাঁধ ভাঙিয়া গেল। চোখে আঁচল ঢাকিয়া সে উপরে পলাইয়া গেল। আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

"মা, মাসীমা কোথায় ?"

মা বলিলেন—"৺গয়ায় গিয়াছে। তোদের যাইবার দিন সেও কলিকাতায় যাইবে। একটু আগে তাকে খবর দিলেই চলিবে।"

মাসীমা আমার মার বোন্ নন্, যমুনারও মাসী নয় ; তবে তাহার মার সঙ্গে তাঁহার একটা সম্পর্ক ছিল, আর আমার মার সঙ্গে সখীত্ব ছিল বহুকালের। মা-বাপমরা আত্মীয় স্বজনহীন চার বৎসরের যমুনাকে লইয়া তিনি আমাদের বাড়ীতে আজ প্রায় দশ বৎসর আগে উঠিয়াছিলেন এবং

সেই অবধিই আছেন। আমিও তাঁহাকে মাসী বলি। আমাদের তিনি খুবই ভালবাসেন। যমুনা রূপে-গুণে অতুলনীয়া। বহুদিন হইতে মা'র সমস্ত মনটাই সে দখল করিয়া রাখিয়াছে। মা'র একান্ত ইচ্ছা তাহাকে পুত্রবধূ করেন। কিন্তু আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত। বহুদিন পরে আজ কিন্তু অশ্রুপ্লুতা সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম! তাহার রোদনের অর্থ বুঝিতে আজ আর এতটুকু বিলম্ব হইল না। সেই যমুনা এত সুন্দর! কিন্তু এখন উপায় নাই। বেচারী নীরেনের মুখ মনে পড়িল। যাকে এত করিয়া বাঁচাইলাম, তাহাকেই ?

মন বাঁধিলাম।

প্রতি সন্ধ্যায়ই নীরেন ও যমুনাকে লইয়া ঘাটে ঘাটে বেড়াইতাম ; কোনদিন বা নৌকা বাহিতাম। প্রথম প্রথম যমুনা বিশেষ আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু আমার দুর্জ্জয় জেদের নিকট তাহাকে পরাজয় মানিয়া লইতে হইয়াছে। নীরেন যমুনাকে সরযূ বলিয়াই জানিত ও সেই নামেই ডাকিত। যমুনা বেশ কৌতুক অনুভব করিত ; আমার দিকে কটাক্ষ করিয়া নীরেনকে বলিত—"আপনার দেওয়া নামটাই আমার বেশ পছন্দ সই। 'যমু' 'মুন্না'র চেয়ে ঢের ভাল।"

যমুনা কৌশলে নীরেনের নিকট হইতে সরযূ-কাহিনী সমস্ত শুনিয়া লইয়াছিল। নীরেন একদিন যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা সরযূ, তোমাকে এঁরা যমুনা বলেন কেন ?"

যমুনা বেশ হাসিয়া-হাসিয়াই জবাব দিল —"দেখুন, এদের সবই ভুল, অযোধ্যায় সরযূ, বৃন্দাবনে যমুনা, কাশীতে গঙ্গা।"

প্রায় মাসখানেক কাটিল। নীরেন বেশ সারিয়াছে, কিন্তু যমুনা শুকাইয়া উঠিতেছে। বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইল, দিনও স্থির হইল। কলিকাতায় আমার মামার বাড়ীতে থাকিয়া যমুনার বিবাহ হইবে, নীরেন থাকিবে আমাদের বাড়ী। মামা হইবেন কন্যাকর্ত্তা, আমি হইব বর কর্ত্তা। মা সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছেন ; কিন্তু নিজে তিনি যাইবেন না। যমুনা খুব আপত্তি করিয়াছিল, মা'র পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিল পর্য্যন্ত ; কিন্তু মা যখন বুঝাইলেন, তিনি কি মাসীমা মরিয়া গেলে তাহাকে দেখিবে কে ? রক্ষকহীনা সুন্দরী যুবতীর পক্ষে স্বামীগৃহ ছাড়া কোন স্থানই নিরাপদ নয়, তখন অগত্যা যমুনা মন বাঁধিয়াছিল। রাজী হয় নাই ; শুধু বলিয়াছিল—"মা, তোমার যা' ইচ্ছা তাহাই হউক্!"

রওনা হইবার দিন মাকে ধরিয়া বসিলাম—"মা, তুমি না গেলে কেমন করিয়া চলিবে ?"

মা বলিলেন—"বিশ্বনাথের চরণে এত করিয়া বলিলাম, বাবা যখন আমার মনের সাধ পূর্ণ করিলেন না, আমিও যাইব না। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ত যাইব, এখনও বলিতেছি। আমিও বাবাকে দেখিয়া লইব!"

এই বলিয়া চোখ মুছিলেন। আমি ভাবিলাম—কি অগাধ বিশ্বাস! কিন্তু এ বিশ্বাসের মূল কোথায় ? শূন্যে, ফাঁকায় নয় কি ? পাষণ্ড আমি, তখন এই রকমই বুঝিতাম। স্পষ্ট বলিলাম—"মা, তোমার বিশ্বনাথ আমি মানি না।"

এবারেও সেই তুফান মেল! একখানি মধ্যম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়াছি। নীরেনের আহ্লাদ আর ধরে না! যমুনাও যথাসাধ্য তাহাতে যোগ দিতেছে। অথচ আমার কাছে ধরা পড়িতেছে বুঝিয়া সঙ্কুচিত হইতেছে। আমার মনের কথা আর নাই বলিলাম। আমিও সেই আনন্দে যোগ দিবার চেষ্টা করিলাম। আবার

ভয়ও হইল,—যমুনা কি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছে—তা'হইলে ত সর্ব্বনাশ! মানে মানে রাতটা কাটাইতে পারিলে হয়।

গয়া ষ্টেশনে মাসীমা উঠিলেন। নীরেনকে দেখিয়া খুব খুসিই হইলেন, কিন্তু আমার দিকে চাহিয়াই আবার যেন মুসড়াইয়া গেলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"বীরেন, এবার বাবা তুই একটি বিয়ে কর। আর মা-মাসীকে কষ্ট দিস নি।"

বীরেন যেন যমুনাকে বিদায় করিবার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করিতেছিল। হায় মাসীমা! আজ যদি তুমি আমার মনের কথাটা বুঝিতে পারিতে!

নীরেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"মাসীমা, সরযূকে তোমরা যমুনা বলিয়া ডাক কেন? বিয়ের সময় কিন্তু সরযূ নামে সম্প্রদান করিতে হইবে। পরে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী যা' ইচ্ছা বলিও।"

মাসীমা অবাক্! বলিলেন —"বাবা, তুমি সত্যই কি সরযূকে জানিতে? সে যে এই যমুনারই সহোদরা বোন্ গো—দু'জনে যে যমজ।"

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমরা তিন জনেই শিহরিয়া উঠিলাম! মাসীমা বলিতে লাগিলেন— "তিন বছরের যমজ মেয়ে সরযূ ও যমুনাকে রাখিয়া ওদের মা হঠাৎ মারা যায়; তার ঠিক্ বছরখানেক আগেই বাপ মারা পড়ে। দুনিয়ায় ওদের আর কেহই ছিল না। ওদের মার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। মরিবার সময় সে বিশ্বাস করিয়া মেয়েদের আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। আমার ছেলে-মেয়ে কিছুই ছিল না। আমি ওদের মানুষ করিতে লাগিলাম। মেয়েরা যখন পাঁচ বছরে পড়িয়াছে, তখন এক দিন তাহাদের লইয়া পাড়ার লোকের সঙ্গে একটা খুব বড় যোগে কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করিতে আসিলাম। ওঃ, সে কি অসম্ভব ভীড়! দু'জনকে স্নান করাইয়া ঘাটে দাঁড় করাইয়া নিজে ডুব দিতে নামিলাম। একটু চোখের আড়াল হইয়াছে, আর অমনি সর্ব্বনাশ! সরযূকে দেখিতে পাইলাম না, যমুনাটা পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে। মাথা ঘুরিয়া গেল! অনেক খুঁজিলাম, সকলই বৃথা হইল। পাড়ার লোকেরা সকলেই খুঁজিল, কিন্তু সরযূর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। যমুনাকে লইয়া একেবারে বীরেনের মায়ের কাছে আসিয়া উঠিলাম। তাঁহাকে সবই বলিলাম। সেখানে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, কিন্তু সন্ধান মিলিল না।"

তারপর বীরেনকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন— "তোদের দু'টিতে ছেলেবেলায় কি ভাবই ছিল রে! ক্রমশঃ সরযূর কথা ভুলিতে বসিলাম। তোকে আর যমুনাকে এক সঙ্গে দেখিয়া আমাদের দুই সখীর একই কথা মনে হইতে লাগিল; তা' শুধু আমাদের ইচ্ছা হইলে চলিবে কেন? বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা যা' তাই ত হইবে।"

এই বলিয়া মাসী-মা একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন। আমার বুকটা 'ধক্' করিয়া উঠিল! নীরেন জিজ্ঞাসা করিল—"মাসীমা, সরযূর খোঁজ আর এ পর্য্যন্ত পান নাই?"

মাসীমা একটু চুপ করিয়া বলিলেন—ঠিক তা নয় নীরেন, এই পাঁচ-ছয় মাস হবে ৺কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে তার দেখা পাইয়াছিলাম। আমার মন হইতে সে কখনও যায় নাই,—দেখি ঠিক্ যেন আমাদের যমু! দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। তাহাকে একধারে ডাকিয়া পরিচয় লইলাম। শৈশবের কথা সে বেশী কিছুই বলিতে পারিল না। তখন তাহাকে সমস্তই বলিলাম। সে আমার ঠিকানা লইয়া বৈকালে দেখা করিবে বলিল। নিজের ঠিকানাও আমাকে দিল—সে একটা যাত্রীবাড়ী। আমার দুবুদ্ধি, হাতে পাইয়াও তাহাকে ছাড়িলাম। বৈকালে আসিল না দেখিয়া সন্ধ্যার সময় তাহার বাসায় গেলাম। শুনিলাম,— সেইদিন বৈকালেই তুফান মেলে সে কলিকাতায়

রওনা হইয়াছে, কলিকাতার ঠিকানা কেহই বলিতে পারিল না। তুফান মেল সেই দিনই প্রথম ছাড়ে। আর সমস্ত গাড়ীতে না কি সে আর একজন মাত্র যাত্রী জুটিয়াছিল, ভয়ে আর কেউ উঠে নাই। কি ডাকাত মেয়ে বাবা! পরে অনেক সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, সে এক সন্ন্যাসিনীর দলে সন্ন্যাসিনী হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরিতেছে। এদের দল গয়ায় আসিয়াছিল, খবর পাইয়াই গয়ায় ছুটিয়াছিলাম। দেখা হইল না। শুনিলাম, তাহারা কিছুদিন আগেই গয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে—মথুরা বৃন্দাবন হইয়া রামেশ্বর যাইবে। এই রকম করিয়াই তাহারা ঘুরিবে। এদিকে দিদির চিঠিতে জানিলাম, নীরেনের সঙ্গে যমুনার বিয়ের সব ঠিক, দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, তাই সেই চিঠির কথামতই তাড়াতাড়ি তোদের এই গাড়ী ধরিলাম।'

মাসীমা ত এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ শেষ করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন না যে, সাতকাণ্ডের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ডও আছে। নীরেন হঠাৎ আমার পায়ে ধরিল; বলিল—"দাদা, মুক্তি দাও, যাকে বাচাইয়াছ, তাকে আর মারিও না। মাসীমা, কিছু মনে করিও না, তোমাদের যমুনা আমার চেয়ে সর্ব্ব বিষয়ে ভালো পাত্রেই পড়িবে। তোমরা সকলেই আমাকে মাপ কর, আমাকে মুক্তি দাও।"

এই বলিয়া সে যে সেই চুপ করিল, আর বাকী রাতটুকু কেহই তার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিল না। তুফান মেলে প্রথম রাত্রে নীরেনের বুকে যে তুফান উঠিয়াছিল, দ্বিতীয় রাত্রে সে তুফানের বৃদ্ধিই হইল। সকালে হাওড়ায় ট্রেণ আসিলেই নীরেন বুকে তুফান লইয়া অনন্ত জনসমুদ্রে মিশিয়া গেল; আমাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইল সরযূর অনুসন্ধান। জানি, তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা বৃথা। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিতে লাগিলাম,—প্রথমটা সে বেশ দৃঢ় পদবিক্ষেপেই চলিতে লাগিল, কিছু পরেই দেখি তার পদক্ষেপ শিথিল হইতেছে, ঘাড় ঝুকিয়া পড়িতেছে; মনে হইল,—যাই, ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করি। কিন্তু বুঝিলাম,—সন্ন্যাসী পরশমণির সন্ধানে চলিয়াছে! একবার হাতে পাইয়া ছাড়িয়াছে সেই আফ্‌শোষে সে, দগ্ধ হইতেছে, সে ফিরিবে না! তবে চলুক সে, পরশমণির সন্ধানেই চলুক!

সহসা যমুনার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—স্বস্তির আনন্দে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমার বুকের উপর হইতেও যেন একটা গুরুভার নামিয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। চোখে চোখ পড়িতেই যমুনা লজ্জারাঙা মুখখানি অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইল।

*　　*　　*

মা আসিলেন। আমি পদধূলি লইয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কেমন রে, বাবা বিশ্বনাথ তবে বুঝি নাই। এখন বিশ্বাস হইল ত? আমার যমুনা আমারই রহিল।

আমি কিন্তু দমিবার পাত্র নয়; বলিলাম—"বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু আট আনা মাত্র।

মা বলিলেন—"সে কি রে, মোটে আট আনা, ষোল আনা কিসে হইবে?" আমি বলিলাম—"যখন সরযূর সঙ্গে নীরেনের—"

আর বলিতে পারিলাম না। মায়ের চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিল।

—টিউবওয়েল—

—[পূর্ব্বানুস্মৃতি]—

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

চার

দিন তিনেক পরে একদিন বিকালে আমি উপরের ঘরে ব'সে একখানি বই পড়ছি। বেলা তখন প্রায় ছ'টা। সেই সময় রমেশ তাড়াতাড়ি সেই ঘরে এসে বল্‌ল, মা কই?

আমি বল্‌লাম, আজ যে ছ'টার আগেই এসেছ, আর এসেই অমনি মায়ের খোঁজ করছ। কোন নতুন সংবাদ আছে না কি? প্রেসে বুঝি এখন কাজ কম, তাই সকাল সকালই ছুটী পেয়েছ।

রমেশ হেসে বল্‌ল, কাজ কম ত নয়ই, খুব বেশী। আজ আমাকে তিন ঘণ্টা ওভারটাইম কাজ কর্‌তে হবে। সেই কথা মাকে বল্‌বার জন্য পনর মিনিটের ছুটী নিয়ে এসেছি। আমাকে এখনই যেতে হবে।

রমেশের গলার আওয়াজ পেয়ে গৃহিণী সেখানে এসে পড়্‌লেন। রমেশের শেষ কথাটা তিনি বাইরে থেকেই শুন্‌তে পেয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে এসেই বল্‌লেন, আবার এখনই যেতে হবে বাবা!

রমেশ বল্‌ল, আজ তিন ঘণ্টা ওভারটাইম কাজ কর্‌তে হবে। ফিরে আস্‌তে সেই রাত সাড়ে ন'টা। আমি পনের মিনিটের ছুটী নিয়ে সেই কথা বল্‌বার জন্য এসেছি মা, নইলে আপনি যে মানুষ, একটু দেরী হলেই রমেশের কি হোলো ব'লে সারা বাড়ী মাথায় ক'রে বস্‌বেন। আমি ব'লে এসেছি, এই যে পনের মিনিট ছুটী নিলাম, সওয়া নয়টা পর্য্যন্ত কাজ করে সেটা ঠিক ক'রে দেবো। তাইতেই ত বল্‌ছিলাম আমার বাড়ী ফির্‌তে রাত সাড়ে নয়টা হবে।

আমি বল্‌লাম, অত রাত্রে একলা আস্‌তে ভয় কর্‌বে না ত? তা, কেষ্টাকে ন'টার সময় প্রেসে পাঠিয়ে দেব; সে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বে।

আমার কথা শুনে রমেশ হোহো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। আপনি কি যে বলেন বাবু! রাত ন'টায় এইটুকু পথ আস্‌তেই ভয় কর্‌বে? এর চাইতেও বেশী রাতে কত দিন মেদিনীপুর থেকে বাড়ী গিয়েছি। বড় বড় মাঠ, জঙ্গল, এক পেয়ে পথ, সাপ-বাঘের আড্ডা। তা'তেও আমার ভয় হয় নি, আর কলকাতার এই পথে আস্‌তে আমার ভয় হবে? জানেন মা, পাড়া গাঁয়ে আমাদের বাড়ী। আপনারা ত পাড়াগাঁ দেখেন নাই বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। আমাদের ভয়-ডর নেই।

আমি বল্‌লাম, রমেশ, তুমি সবে কল্‌কাতায় এসেছ। এ যে কি ভয়ানক স্থান, তা' তুমি জান না। এখানে প্রতি পদে বিপদের আশঙ্কা। দিনে দুপুরেও এখানে সাবধানে চল্‌তে হয়।

রমেশ বল্‌ল, তা' ব'লে প্রেসের সামান্য কম্পোজিটারকে ন'টার সময় বাড়ী আন্‌বার জন্য চাকর পাঠাতে হবে, এমন হাসির কথা যে আপনি কেমন ক'রে বল্‌লেন, তা' আমি ভেবে পাচ্ছি নে। যাক্ গে সে কথা। আমি আর দেরী কর্‌তে পার্‌ছি নে মা! এই দেখুন, ঘড়িতে ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। আমি খুব জোরে হেঁটে গেলে ঠিক ছ'টায় প্রেসে পৌঁছুতে পার্‌ব।

তার কথা শুনে গৃহিণী বল্‌লেন, তাই ব'লে

জল না খেয়েই যাবে? সে কি কথা। তুমি এক মিনিট অপেক্ষা কর, আমি খাবার নিয়ে আস্‌ছি। সেই ন'টার আগে যা'-তা' দিয়ে দুটো ভাত খেয়ে গিয়েছ, আর ফির্‌বে রাত সাড়ে ন'টায়, ক্ষিদেয় যে মারা যাবে রমেশ।

রমেশ তখন দুয়ারের কাছে গিয়েছে; ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, এতদিন কোথায় ছিলেন আমার দয়াময়ী মা! না, না, আপনার জ্বালায় আমাকে দেখ্‌ছি কোলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে! খাবার এখন নয় মা, ব'লে এসেছি পনের মিনিট হবে! তার বেশী দেরী হ'লে তাঁরা কি মনে কর্‌বেন; আমারও যে লজ্জা বোধ হবে।

এই বলেই রমেশ তাড়াতাড়ি চলে' গেল। গৃহিণী বারবার ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, সে ফিরেও চাইল না।

আমি তখন গৃহিণীকে বল্‌লাম, দেখ্‌লে কেমন ছেলে! এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আমি ত কখন দেখি নি। দু'মিনিট বিলম্ব করলে যে তার কথার অন্যথা হবে, এ লজ্জা ওই ছেলে সইতে রাজী নয়। এমন কর্ত্তব্যপরায়ণতা দুর্ল্লভ। ছেলেটী সত্য সত্যই রত্ন। ভগবান ওর মঙ্গল কর্‌বেন। ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌তে পারি।

গৃহিণী বল্‌লেন, আমি ওকে প্রথমদিন দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলাম, এমন ছেলে হয় না। আহা, সেই রাত সাড়ে ন'টায় আস্‌বে, ক্ষিদেয় কষ্ট বড়ই পাবে।

আমি বললাম, কেষ্টাকে দিয়ে প্রেসে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিলে হয় না?

গৃহিণী বল্‌লেন, তা' হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে না, বাড়ী এসে তুমুল কাণ্ড করবে।

আমি বল্‌লাম, সে কথা ঠিক। আমাদের বাড়ীর ব্যবস্থা এই যে, ন'টার মধ্যে সকলের আহার শেষ কর্‌তে হবে। বামুনটা ন'টা বাজলেই বাসায় চলে যায়। সেই জন্য আটটার সময়ই আমরা আহার শেষ করি। কোন কারণে ছেলেদের বাড়ী ফির্‌তে বিলম্ব হ'লে তাদের রাত্রির খাবার গৃহিণীর ঘরে পৌঁছে দিয়ে বামুন চলে' যায়। তা' ব'লে আমরা যে নয়টার সময়ই শুয়ে পড়ি, তা' নয়। ছেলেরা দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা ক'রে, আমার কাছে বসে গল্প-গুজব করে, কখনও বা তর্ক জুড়ে দেয়; গৃহিণীও এটা-ওটা করে রাত এগারটা বাজান। সুতরাং রমেশের রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ী ফিরে আসায় যে আমাদের কারও কষ্ট অসুবিধা হবে, তা' নয়। আমরা সেদিনও সকলে আহারাদি শেষ ক'রে গল্প আরম্ভ করেছিলাম; গৃহিণী কিন্তু অভুক্ত রইলেন। নরেশ সেই কথা বলতে, তিনি বল্‌লেন, যেদিন তোমরা বিলম্ব ক'রে বাড়ী এস, সেদিনও তোমাদের যেমন খাওয়া শেষ না হ'লে আমি খেতে পারি নে, আজও রমেশ এসে না খেলে আমি কিছুই।—

তাঁর কথা শেষ না হ'তেই রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বল্‌ল, শুন্‌তে পেয়েছি মা, আপনি আমার জন্য অনাহারে বসে' আছেন। সেই জন্যই ত বলেছিলাম, আমি মেসে খাই। তা' ত আপনারা শুন্‌লেন না। এই দেখুন ত, সবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, আর আপনি আমার খাবার আগলে বসে' আছেন।

গৃহিণী বল্‌লেন, তা'তে কি হয়েছে। রাত বারোটাও বাজে নি, একটাও বাজেনি যে, ঘুমে চোখ বুজে আস্‌ছে। চল বাবা, তোমাকে খেতে দিই গে।

রমেশ বল্‌ল, মা, আমার যে খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কোলকাতার ছাপাখানার ব্যবস্থার কথা কি আমি জানি! আমাদের প্রেসের নিয়ম এই যে, ছ'টার পর তিন ঘণ্টা কাজ করলেই এক রোজের মাইনে অতিরিক্ত পাওয়া যায়। আর তা' ছাড়া, যারা ওভারটাইম কাজ করে, প্রেস থেকে তাদের প্রত্যেককে দু' আনা ক'রে জল-

পানি দেয়। সেই দু' আনা পাওনা থেকে কেটে নেয় না। এ কি আমি জানি। তা' হ'লে ত ব'লেই যেতাম যে, রাত্রে আমাকে খেতে হবে না।

গৃহিণী বল্লেন, জলপানি ত পেয়েছ মোটে দু' আনা। তা' দিয়ে এমন কি খাওয়া যায় যে, তা'তে পেট ভরে যায়।

রমেশ হাস্তে হাসতে বল্ল, যারা নবাবী ক'রে কচুরী জিলেপী রসগোল্লা খায়, তাদের কি আর পেট ভরে। আমি ত তা' খাই নি, আমার পেটও ভরেছে, আরও চার পয়সা বাঁচিয়েছি। এই নিন্ মা, সেই চার পয়সা।

এই ব'লে রমেশ চারটি পয়সা আমার স্ত্রীর পায়ের কাছে রেখে দিল।

আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম, কি রকম! পেয়েছ ত দু' আনা। তার এক আনা বাঁচিয়ে এনেছ; বাকী এক আনায় এমন কি খেলে, যাতে পেট ভরে গেল।

রমেশ বল্ল, শুনবেন কি খেয়েছি। এই দুই পয়সার মুড়ি, আর দু' পয়সার বেগুনি-ফুলুরি। মা, আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না, দু' পয়সার বেগুনি ফুলুরি এত দিয়েছিল যে, আমি খেয়ে শেষ করতে পারি নে। এর পর যখন জলপানি পাব, তখন এক পয়সার বেগুনি কিনব, তা' হ'লেই খুব খাওয়া হবে। আর দেখুন মা, দু' পয়সার মুড়িও বড় কম নয়। এতেও পেট ভরবে না।

গৃহিণী বল্লেন, দেখ বাবা রমেশ, ও সব তুমি খেও না। বিদেশ যায়গা, অসুখ করলে মহা বিপদ হবে। দোকানের বেগুনি কি খেতে আছে? ও একেবারে সাক্ষাৎ বিষ যে! তেলে ভাজা ওগুলো সব। সে তেলকিন্ত ভাল। না, না, তোমাকে আমি মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি, কখনও ও সব খেয়ো না। তোমাকে [illegible]নি থেকে একটা পয়সাও বাঁচাতে হবে না, বরঞ্চ যেদিন তোমাকে রাতে নটা-দশটা অবধি কাজ করতে হবে, সেদিন ত আর বাড়ী এসে খেয়ে যেতে পারবে না, সেদিন তুমি ছ'টার সময় চার আনার ভাল খাবার কিনে খেও। কাল থেকে প্রেসে যাবার সময় তোমার পকেটে আমি কিছু পয়সা রেখে দেব। কোন্ দিন যে তোমায় অতিরিক্ত কাজ করতে হবে, তা' ত আর জানতে পারা যাবে না, তাই সঙ্গে পয়সা রেখো। বল, আমার সুমুখে যে, আর কখনও বেগুনি খাবে না। যে অত্যাচার আজ করেছ, আজ তুমি খেতে চাইলেও আমি কিছু খেতে দেব না।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, ও গো, তুমি রমেশকে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দাও, ওর যাতে ওইসব অখাদ্য জীর্ণ হয়ে যায়।

রমেশ আর হাস্য সংবরণ করতে পারল না, বল্ল, আচ্ছা যায়গায় এসে পড়েছি। মা, আপনারা কি আমাকে বাবু না বানিয়ে ছাড়বেন না। মুড়ি-বেগুনি খেলে যে মানুষে মরে যায়, এ কথা আমার আত্মীয়স্বজন শুনলে আপনাদের পাগল বলবে। ওই যে আমাদের প্রধান জলখাবার। ওর চাইতে ভাল খাবার আমরা জানি নে; ঐ খেয়েই আমরা এত বড় হয়েছি।

আমি বল্লাম, মুড়িতে আপত্তি নেই, কিন্তু বেগুনিগুলো খাওয়া ঠিক নয় রমেশ।

রমেশ বল্ল, বেশ, বেগুনি আর খাব না। তার চাইতে মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস মহাশয় কাল থেকে রস গোল্লা খাবেন। কেমন মা, আপনি খুসি ত! দেখুন, বড়দা', আমি মেদিনীপুরে একবার এক থিয়েটার দেখেছিলাম। তার সব কথা ভাল মনে নাই। এইটী মনে আছে, কে না কি একদিনের জন্য বাদশা হয়েছিল।

নরেশ বল্ল, তুমি আবুহোসেনের কথা বলছ?

রমেশ বল্ল, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড়দা', আবুহোসেন, আবুহোসেন। আমিও দেখছি তাই হ'য়ে পড়লাম। যাক্ গে, আর রাত ক'রে কাজ নাই। আমি শুয়ে শুয়ে আবুহোসেন হই গে।

এই ব'লে রমেশ নেচে চলে' গেল। আমরা ছেলেটার কথা শুনে সত্য-সত্যই অবাক্ হয়ে গেলাম।

ক্রমশঃ
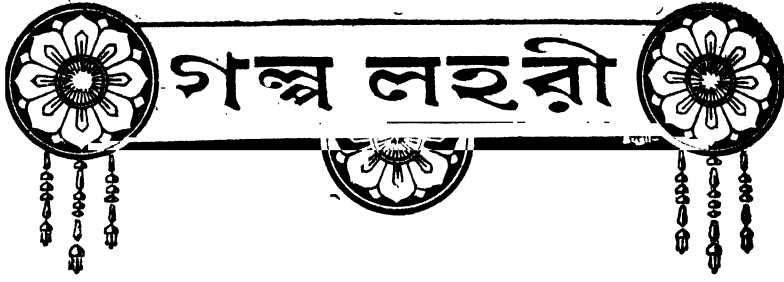
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩৮ | পঞ্চম সংখ্যা

—মরীচিকা—

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

প্রকাশ চাটুয্যে তাঁহার নিত্য অভ্যাসমত জীর্ণ ছাতিটী মাথায় দিয়া চড়কডাঙ্গার পোষ্ট-অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র এই শাখা পোষ্ট-অফিসটী গ্রামের প্রান্তে একখানি খড়ের ঘরে অবস্থিত।

পোষ্টমাষ্টার ফকির চক্রবর্ত্তী এক জীর্ণ টেবিলের সম্মুখে একখানি হাতলভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া একটা খাতায় রুল টানিতেছিল; প্রকাশ চাটুয্যেকে দেখিয়া বলিল, "আসুন চাটুয্যে-মশায়, প্রাতঃপ্রণাম।"

"জয়স্তু" বলিয়া চাটুয্যে-মহাশয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একখানি টুল লইয়া বসিয়া বলিলেন, "ডাক এখনো আসে নি না কি ভায়া?"

"না, এই এলো বলে।"

প্রকাশ চাটুয্যে একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন, খেজুর গাছের মাথার উপর রোদ্দুর এসে পড়েছে, এখনো আসে নি? তা' হ'লে তো আজ অনেক দেরী হ'ল আসতে। ক'টা বাজ্‌ল?"

ক্ষুদ্র একটী কুলুঙ্গীতে একটী ক্ষুদ্র টাইমপিস্ ক্ষীণভাবে টিক্‌টিক্ করিতেছিল, ফকির সেদিকে চাহিয়া বলিল, "পৌনে আটটা। এইবার এসে পড়্‌ল বলে। তামাক খান এক কলকে ততক্ষণ। ও রে বদন—"

পোষ্ট-পিওন বদন হাজরা একখানি চেটাইয়ের উপর বসিয়া ডেট্‌ষ্ট্যাম্পের তারিখ বদল করিতেছিল। পোষ্টমাষ্টার-বাবুর আহ্বানে 'এক কলকে'র ব্যবস্থা করিতে গেল।

বছর তিনেক হইল ফকির এই গ্রামে পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসিয়াছে। পনেরটী টাকা বেতন পায়; গ্রামের পালবাবুদের দুইটী ছেলে পড়াইয়া মাসে আরও পাঁচটী টাকা উপার্জ্জন করে। সংসারের বন্ধনের মধ্যে কেবল রুগ্না স্ত্রী, বছরখানেক পূর্ব্বে একটী শিশু পুত্র দেড় বৎসর বয়সে তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে. তারপর হইতেই স্ত্রীর শরীর সেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আজও তাহা সারে নাই। রুগ্না স্ত্রীর ঔষধপথ্যের খরচটা বাঁচিলে পল্লীগ্রামে মাসিক এই কুড়িটী টাকায় তাহার বিশেষ অসচ্ছল হইত না:

স্বল্পক্ষণ পরে একটা ঠুং ঠুং শব্দ শুনিয়া প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "যাক্, এসে পড়েছে এবার।

সঙ্গে-সঙ্গেই পিত্তলের ঝুমঝুমি লাগানো একটা ভোঁতা সড়কির এক প্রান্তে বাঁধা মেলব্যাগ লইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মেল রণার ছিদাম মুচী আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাগটী নামাইয়া কোমরের চাপরাসটী খুলিয়া দেওয়ালের একটী পেরেকে টাঙ্গাইয়া চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়কে একটী আভূমি প্রণাম করিয়া সে বেচারা গামছায় ঘাম মুছিতে মুছিতে আর এক কলকের ব্যবস্থা করিতে গেল। ফকির চক্রবর্ত্তী পোষ্ট অফিসের চক্রাকার কাঁচিটীর সাহায্যে অনেক চেষ্টায় ব্যাগের দড়িটী কাটিয়া ফেলিয়া সেটীকে টেবিলের উপর উপুড় করিয়া ঢালিল।

প্রকাশ চাটুয্যে বলিলেন, "দেখ দিকি হে, আমার রসিদখানা এলো কি না। জামাইটার চিঠিও অনেকদিন পাই নি—নাড়াজোলের ছাপমারা খামের চিঠি। 'হিতবাদী' খানাও তো আজ আস্‌বার কথা—"

ফকির তখন নীলবর্ণের একখানি লম্বা লেফাফা লইয়া নিবিষ্টচিত্তে নাড়াচাড়া করিতেছিল।

প্রকাশ চাটুয্যে বলিলেন, "কার চিঠি হে? কোথা থেকে এল?"

ফকির বলিল, "এর তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না চাটুয্যে-মশায়। চিঠিখানা তো আমারই নামে দেখ্‌ছি। রেজেষ্টারী চিঠি—কিন্তু ব্যাপারখানা—"

প্রকাশ বলিলেন, "অ্যাঁ! রেজেষ্টারী চিঠি? তোমার নামে? অফিসের কিছু সরকারী চিঠি নয় তো? বাঁদিকের কোণের 'ফ্রমটা' দেখ না—"

ফকির বলিল, "তাইতে তো আরও গোলমাল ঠেক্‌ছে চাটুয্যে-মশায়। আস্‌ছে তো দেখ্‌ছি, বিশ্বাস কোম্পানী সলিসিটার্স।"

"সলিসিটার্স?—তার মানে তো এটর্নী, অর্থাৎ উকীলের চিঠি। সে কি হে ফকির, তোমাকে আবার উকীলের চিঠি কে দিলে? কোলকাতার কারও কাছে ধারকর্জ্জ করেছ না কি? কোন কাবুলীওয়ালা—"

ফকির বলিল, "না চাটুর্য্যে-মশায়, ধার কর্‌তে যাব কেন? ধারও করি নি, কাবুলীওয়ালারও তোয়াক্কা রাখি না।—"

"তা' হ'লে বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত কিছু নয় তো? চিঠিখানা খুলে ফেল না ভায়া।"

ফকির বলিল, "বিষয়সম্পত্তির মধ্যে তো একখানা একতলা ভদ্রাসন বাড়ী, ভাঙ্গা, তার ছাদের কার্ণিসে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে, তার জন্যে তো বিশ্বাস কোম্পানী কিম্বা অন্য কোন কোম্পানীরই মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যাই হোক্, দেখা যাক্ চিঠিখানা ছিঁড়ে—"

চিঠিখানা পড়িয়া ফকিরের চক্ষু কপালে উঠিল। ললাটে ঘর্ম্ম বিন্দু দেখা দিল। চিঠিখানা সে প্রকাশ চাটুয্যের হাতে দিয়া বলিল, "পড়ুন চাটুয্যে-মশায়।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে চাটুয্যে-মহাশয়ের মুখেও ভাবান্তর দেখা গেল।

চিঠিখানা পড়িয়া এবং ফকিরের মুখে পূর্ব্ব ইতিহাসটা শুনিয়া জানা গেল যে, ফকিরের এক মাতামহ অর্থাৎ মায়ের পিসে-মহাশয় তিনিই ফকিরের স্বর্গগতা জননীকে ছেলেবেলায় 'মানুষ' করেন এবং যথাসময়ে বিবাহও দেন। তারপর দু-এক বৎসর খোঁজখবর লইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকালের ব্যবধানে মাঝে মাঝে এক একখানি চিঠি আসা ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ ইদানীং ছিল না বলিলেই হয়। ফকিরের মা বছর তিনেক পূর্ব্বে স্বর্গগতা হইয়াছেন; এই তিন বৎসরের মধ্যে এই এই মাতামহটীর কোন সন্ধান সে রাখে নাই, তিনিও রাখেন নাই। সম্প্রতি সেই বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে। সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টায় তিনি যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে এক উইল বাহির হইয়াছে; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পত্তি সবই ছেলেদের হাতে দিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দৌহিত্রটীকে বৃদ্ধ মৃত্যুকালে একেবারে বঞ্চিত

করিয়া যান নাই। মোথাগাড়ী গ্রামখানিতে তাহার পত্তনি স্বত্ব, সেই গ্রামখানি বৃদ্ধ তাঁহার দৌহিত্র ফকির চক্রবর্ত্তীকে দিয়া গিয়াছেন। এটর্নীর লোকেরা পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অফিস হইতে তাহার ঠিকানা আবিষ্কার করিয়া ফকিরকে এই সংবাদ জানাইতেছে, এখন যথাকর্ত্তব্য সে যেন স্বয়ং আসিয়া করে।

চাটুয্যে-মহাশয় বলিলেন, "আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে ফকির? চিঠিতে সম্পত্তি লাভ এ কি সোজা ভাগ্যির কথা। উঃ! এটর্নিদের তো আমি জোচ্চোর বলেই জান্‌তাম, কিন্তু তারা কি না তোমায় খুঁজে বার ক'রে জানাচ্ছে যে, এই সম্পত্তি তুমি নাও। খুব ভাগ্যিমান তুমি যা' হোক্। তারপর? এই মোথাগাড়ী গাঁখানা কোথায়?—কোন্ জেলায় তা' জানো?—আমাদের এই দিকে?—"

ফকির বলিল, "কিছুই জানি না চাটুয্যে-মশায়। কোথায় মোথাগাড়ী, কি রকম জায়গা, তার কোন জিয়োগ্রাফিই তো জানি না। আমার সে দাদামশায়টিকে আমি অতি ছেলেবেলায় একটীবার মাত্র দেখেছিলাম; ব্যস্, আর কখনও দেখি নি।"

প্রকাশ চাটুয্যে বলিলেন, "যাই হোক্, বুড়োকে খুব ধর্ম্মিষ্ঠি লোক বল্‌তে হবে বই কি। তা' নইলে আজকালকার দিনে—এই আমারও তো পিসে-মশায় রয়েছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর অবস্থাও তো কিছু খারাপ নয়, কিন্তু কখনও একখানি দু'পয়সার পোষ্টকার্ড লিখেও—" বলিয়া নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হিতবাদী এবং রসিদ সেদিন আসে নাই বলিয়া অন্যান্য দিনের মত কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করিয়াই ছাতিটী লইয়া উঠিয়া বলিলেন, "উঠ্‌লাম তা' হ'লে এখন ভায়া। যাই হোক্, আমাদের সন্দেশ খাওয়াচ্ছ কবে বল।" বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া ছাতিটী সন্তর্পণে খুলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

দুই

কথাটা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। গ্রামের বহু লোক আসিয়া ফকিরকে সৌভাগ্যজ্ঞাপন করিয়া গেল। দীনু সাঁতরা বাজারে আলু বিক্রয় করে, কিছুদিন পূর্ব্বে সে গ্রামের সখের থিয়েটারে ইন্দ্রজিৎ সাজিয়া লক্ষণরূপী ফকিরকে নৈবেদ্যের থালা ছুঁড়িয়া এমনি মারিয়াছিল যে, ফকিরের দু-তিন জায়গা কাটিয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে সেও আসিয়া খুব বিনীতভাবে নিজের অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গেল।

পীতাম্বর শিরোমণি গ্রামের পূজনীয় ব্যক্তি। তিনি কোনদিন পোষ্টঅফিসে আসিতেন না; তিনিও আসিয়া ফকিরের করতালু পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন যে, যেরূপ ঊর্দ্ধরেখা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ফকিরের রাজা হওয়া উচিত ছিল।

গ্রামের ছেলেরা ধরিল খাওয়াইতে হইবে। মাসকাবারের দোহাই দিয়া ফকির একটু ইতঃস্তত: করিতেছিল, কিন্তু তাহারা শুনিল না। দীনু সাঁতরা বাগ্‌দীপাড়া হইতে একটা প্রকাণ্ড ছাগল লইয়া আসিল; মুদীর দোকান হইতেও ধারে জিনিষপত্র আনিবার ভার আর একজন লইল। মহাসমারোহে গ্রামের পঞ্চানন্দতলায় পূজা দেওয়া হইল। শিরোমণি-মহাশয় নগদ পাঁচটাকা প্রণামী পাইয়া হৃষ্টমনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই দিনই এই ব্যাপারে প্রায় গোটা পনের টাকা খরচ হইয়া গেল।

গ্রামের লোকে খুব হৈচৈ করিল বটে, কিন্তু ফকির নিজের মনে যেন তেমন তৃপ্তি পাইল না। গ্রামের ডাক্তারবাবুটী ভিজিট লইতেন না বটে, কিন্তু ঔষধের মূল্য হিসাবে তাঁহার নিকটে অনেকগুলি টাকা দেনা হইয়া গিয়াছিল। তিনি অনেক দিন হইতেই বলিতেছিলেন যে, এই ম্যালেরিয়ার

দেশে রাখিলে তাহার স্ত্রীর মজ্জাগত ম্যালেরিয়া কিছুমাত্র উপকার হইবে না, এবং খুব বেশী দেরী করিলে রোগটা কালাজ্বরে দাঁড়ানও অসম্ভব নয়। কাজেই এই লোক খাওয়ানোর ব্যাপারে অনর্থক কতকগুলি টাকা খরচ করিয়া ফকির মনে মনে যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

সেই রাত্রে পোষ্ট-অফিসের বারান্দায় দু'খানি বেঞ্চি পাশাপাশি জোড়া দিয়া তাহার উপর ডোরাকাটা একখানি সতরঞ্চ পাতা শয্যায় শয়ন করিয়া ফকির অনেক কথাই ভাবিল।

মোথাগাড়ী কোথায়, কোন্ দিকে তাহা সে জানে না। গ্রামখানিতে ম্যালেরিয়া আছে এই চড়কডাঙ্গার মত কি না তাহাও তাহার অজানা, কিন্তু তবু মনে হইল যে, গ্রামখানা যদি নদীর তীরে হয়, আর ম্যালেরিয়া না থাকে, তাহা হইলে নদীর তীরেই বেশ একখানি ছোট ঘর তোলা যায়, ইটের বাড়ী যদি নাও হইয়া উঠে, তাহা হইলে বেশ ভাল এবং বড় একখানি আটচালা ঘর —ডাক্তার স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য যে রকম জেদ করিতেছেন, এই মোথাগাড়ীটার জলবায়ু যদি ভাল হয়—আঃ, তাহা হইলে তো বাঁচা যায়!

কল্পনাটা আরও রঙ্গীন হইয়া উঠিল। বাড়ীর সম্মুখের খোলা জায়গা যদি খানিকটা রাখা যায়, তাহাতে কতকগুলি ফুল গাছ, আপাততঃ দেশী ফুল হইলেও ক্ষতি নাই; গাঁদা, কৃষ্ণকলি, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ; যদি পাওয়া যায় তো দু'-চারটী গোলাপ, কিম্বা হাস্নাহানা, অথবা দু' একটী চাঁপা কিম্বা করবী। কলিকাতা হইতে কলমের ভাল আমগাছ দু' পাঁচটা; ছেলেবেলায় সে লিচু বড় ভালবাসিত, অন্ততঃ একটা মজঃফরপুরী লিচু গাছ। আঃ, কি সে আনন্দ! কি সে তৃপ্তি! চারিদিকে খোলা মাঠ, সম্মুখে নদী, সারা গ্রামের অধিবাসীরা নিজের প্রজা! মুক্তি, মুক্তি, এতদিনে বুঝি মুক্তি!

ভবিষ্যতের রঙ্গীন কল্পনায় বর্ত্তমানের দিনগুলি বড়ই অস্বস্তিকর মনে হইল সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই নিয়মের বাঁধনে বাঁধা দিনগুলি, না আছে তার মধ্যে মধুরতা,না আছে কোন বৈচিত্র্য। সেই মেলব্যাগের দড়ি কাটা, চিঠিতে ছাপ দেওয়া, তারপর খাম, পোষ্টকার্ড, মণিঅর্ডার, পার্শেল— আবার ডাক বাঁধিয়া দেশী গালায় শিলমোহর করা, তারপর এই দীন শয্যায় শয়ন! স্ত্রীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী অসুস্থতা; যেদিন তাহার জ্বর আসিল, সেদিন এই সব পরিশ্রমের পর আবার রাঁধাবাড়ার ব্যবস্থা করা। এ সব আর পারা যায় না। সত্যই মুক্তির আনন্দ চাই, তাই বুঝি ভগবান এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। গত দুইদিন সে পালবাবুদের বাড়ীতে পড়াইতে যায় নাই, তাঁহাদের একজন লোক আসিয়া ফকিরকে ডাকিয়া গেল। ফকির জানাইল, সে আর টিউসনি করিতে পারিবে না।

এক সপ্তাহের ছুটীর জন্য সেই দিনই ফকির দরখাস্ত করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহার বদলি লোক না আসায় তাহার কলিকাতা যাওয়ার বিলম্ব হইয়া যাইতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষের এই বিলম্বের জন্য মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া সে ভাবিতেছিল, চাকরী ছাড়িয়া দিবে কি না, এমন সময়ে প্রকাশ চাটুয্যের পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ডাক এলো নাকি হে? জামাইটার কি কাণ্ড বল দিকি নি? নাড়াজোলের কোনও চিঠি—"

ছুটি না পাওয়ার অসুবিধার কথা ফকির বলিল।

ছুটী না পাইয়া আরও কবে কাহার কি অসুবিধা হইয়াছিল এবং চাকরি করা যে কি ঝকমারির ব্যাপার তাহার দু'-একটি উদাহরণ দিয়া চাটুয্যে-মহাশয় বলিলেন, "তাই বল্‌ছিলাম কাল রাত্তিরে শিরোমণি-মশায়ের ওখানে। ওঁরা বলেন কি না যে,বিষয়সম্পত্তি পাওয়া গেলেই তো হবে

না,তার ঝঞ্ঝাট পোয়ানো কি ফকির পেরে উঠ্‌বে ? আমি তখনই বল্‌লাম যে কেন, ফকির না পারে, আমি তো পার্‌ব ? আমি থাক্‌তে ফকিরের গায়ে আঁচটি লাগ্‌তে দেবো না। তাই বল্‌ছি ভায়া, তুমি কিছু ভেব না ; আমার উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ঘুমোও, আর দেখ, আমি কি কাণ্ডটা করি।—উঠি ভায়া তা' হ'লে এখন, দাও তো হে খান চারেক পোষ্টকার্ড —পয়সাটা বাড়ী গিয়েই গুঁদির হাতে -"

পয়সা যে পাওয়া যাইবে না, এবং নিজের পয়সা দিয়া সরকারী তহবিল পূর্ণ রাখিতে হইবে ইহা ফকির জানিত। কিন্তু তবু সে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া চারিখানি পোষ্টকার্ড প্রকাশ চাটুয্যেকে দিল। তিনি চলিয়া গেলেন।

তিন

দিন তিনেক পরে একদিন সকাল বেলা পোষ্ট-অফিসের সম্মুখের বটগাছতলায় একখানি ছইওয়ালা গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার 'রিলিভ' অথবা স্বয়ং ইন্‌স্‌পেকটর আসিয়াছেন মনে করিয়া ফকির তাড়াতাড়ি সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, গাড়ী হইতে যিনি নামিলেন, তিনি অপরিচিত। লোকটির বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হইবে, গায়ে আলপাকার কোটের উপর সোনার চেনটি ঝুলিতেছে, চেহারাটা দেখিলে বেশ অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়।

অফিসের ভিতরে আসিয়া তিনি ফকিরের চেয়ারখানিতে বসিয়া বলিলেন, "তোমারই নাম বোধ হয় ফকিরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ?"

নিজের পরিচয়ে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে জানা গেল যে, ফকিরের যে দাদামহাশয় তাহাকে মোথাগাড়ীর সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, ইনি তাঁহারই পুত্র, সুতরাং ফকিরের মাতুল। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইঁহার সহিত পরিচয় না থাকিলেও ইঁহার নাম সে বহুবার শুনিয়াছে।

সে তাড়াতাড়ি তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পিওন বদন হাজরাকে একটি টাকা দিয়া বাজারে মিষ্টান্ন কিনিতে পাঠাইল।

আহারাদির পর মাতুল অনেক হিতোপদেশ দিলেন। অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট যে কতবড় অসুবিধার ব্যাপার তাহার একটা বৃহৎ বর্ণনা করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, মোথাগাড়ী গ্রামের প্রজাদের মত দুর্দ্দান্ত প্রজা তাহাদের আর কোথাও নাই। চারিপার্শ্বের সমস্ত গ্রামগুলিই তাঁহাদের জমীদারী তাই রক্ষা, নচেৎ ক্রমাগত মামলা-মোকদ্দমা করিয়া সেই সব দুর্ব্বিনীত প্রজাদের শাসনে রাখা যে কতবড় শক্ত ব্যাপার, তাহা আর বলিবার নয়।

ফকিরের রঙ্গীন কল্পনা যেন এক মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। নদীর ধারে আটচালা ঘর, সাম্‌নে তার ফুলের কেয়ারী, আমগাছ, লিচুগাছ, গোলাপ, হাস্‌নাহানা, চাঁপা, করবী—

সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, গ্রামখানা কি ঠিক্ নদীর ধারেই—"

তিনি বলিলেন, "নদীর ধারে !—কে বল্লে ? ক্ষেপেছো ? নদী কোথায় সেখানে ? ত্রিসীমানায় কোন নদী নেই, দেড় ক্রোশ হেঁটে এলে তবে ভাবনাখালির দ' ! সারা গ্রামখানা কেবল জঙ্গলে পূর্ণ ; মশা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর। জলতেষ্টায় মরে গেলেও একটি পয়সার বাতাসা কিন্‌বে এমন একখানিও দোকান নেই।"

কল্পনার রংটা যেন আরও ফ্যাকাসে হইয়া যাইতে লাগিল।

মামা বলিতে লাগিলেন, "আজ তিনটী বছর ধরে' ক্রমাগত উকীল আর আদালতে জলের মত পয়সা খরচ করে ওই গাঁখানায় যে কতটাকা লোকসান দিতে হয়েছে, তার হিসেব যদি শোনো বাবাজী—"

বাবাজী বিবর্ণমুখে মাতুলের দিকে অত্যন্ত হতাশভাবে চাহিল। মাতুল বলিলেন, "আমার

পরামর্শ যদি শোন,তা' হ'লে ভাল পরামর্শই দেবো বাবাজী। অবিশ্যি, বাবা যখন শেষ ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন, তখন তার আর নড়চড় করা আমার সাধ্য নেই। কিন্তু আমি বলি যে, ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না গিয়ে ;মি কেন ওই গাঁয়ের মূল্যস্বরূপ টাকা নাও না। ওই গাঁয়ের যা ন্যায্য মূল্য সেই টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নাও; নিয়ে কোম্পানীর কাগজ কেনো, সুদে খাটাও, ব্যবসা কর, কোনও হাঙ্গামাই নাই। বছর কতক আগে মঙ্গলগঞ্জের বাবুরা ওই গাঁয়ের জন্য তিনহাজার টাকা দিতে চেয়ে ছিলেন, আমরাই তখন দিই নি। সেই পরামর্শই-ভাল, সম্পত্তির বদলে তুমি তিন হাজার টাকা নাও ; ব্যস, কোনও গোল-মালই থাক্‌বে না। দেখ ভেবে চিন্তে, আমার তো মনে হয় যে, এর চেয়ে ভাল পরামর্শ আর হ'তে পারে না।"

ফকিরের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও মামাবাবু দু'-এক দিন থাকিলেন না, সেই দিনই চলিয়া গেলেন। ফকিরকে বলিয়া গেলেন যে, তাহার মতামত যেন শীঘ্রই জানান হয়।

চার

সে রাত্রি আবার অনিদ্রায় কাটিল। সম্পত্তি লওয়া ভাল কিম্বা তিন হাজার টাকা লওয়া ভাল, ইহার মীমাংসা কিছুতেই হইল না।

দুর্দ্দান্ত প্রজা—মামলা মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাট, জঙ্গল ও ব্যাধিপূর্ণ গ্রাম—ত্রিসীমানায় কোন নদী নাই—ছিঃ ছিঃ, এরূপ জমিদারী লইয়া সে কি করিবে? শেষে সেই জমিদারীই তাহার পক্ষে একটা মস্ত অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইবে? না, তার চেয়ে তিন হাজার টাকাই ভাল। উঃ, তিন হাজার!—সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

এক বৃদ্ধা বাড়ীর কাজকর্ম্ম করিত, ফকির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সোণার মা, তুমি যদি তিন হাজার টাকা পাও, তা' হ'লে কি কর?"

"তিন হাজার, কতগুলো টাকা বাবাঠাকুর?"

ফকির বলিল, "ওই যে দেখ্‌ছো ভাতের হাঁড়ী ওর প্রায় দু'-তিন হাঁড়ী।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। দু-তিন হাঁড়ী! —টাকা! সে বলিল, "আমার পোড়া বরাতে কি আর অত টাকা পাওয়া যায় বাবাঠাকুর? যদি পাই, তা' হ'লে একটা ঘড়ায় ক'রে মাটীতে পুঁতে রাখি।"

ফকির হাসিল। টাকার এর চেয়ে ভাল ব্যবহার সে জানে না। তিনহাজার টাকা পাইলে কি উপায়ে তাহাকে নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তাহাই হইল তখন একটা মস্ত দুর্ভাবনার ব্যাপার।

নিবারণ জেলে মাছ চালানের কারবারে বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে সে একটা মনি-অর্ডার করিতে আসিলে ফকির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, দু'-তিন হাজার টাকা যদি সে পায়,তাহা হইলে কি উপায়ে তাহার সদ্ব্যবহার করে।

নিবারণ জানাইল যে, দুই-তিনহাজার তো দূরের কথা, উপস্থিত সে যদি হাজারখানেক টাকা পায়, তাহা হইলে বেকির খাল জমা লয়। এক হাজার টাকা উঠিয়া আসিতে ছয় মাসও লাগিবে না।

গ্রামের সুধীর ঘোষাল এক ন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। কলিকাতায় তাঁহার অনেক রকমের ব্যবসা। তিনি শনিবারের সন্ধ্যায় বাড়ী আসিলেন। তাঁহার নিকটেও ফকির পরামর্শ লইতে গেল। তিনি বলিলেন, "ওসব বাজে পরামর্শ না শুনে আপনি ভাল ভাল সেয়ার কিনে ফেলুন। আম্‌ড়াগুড়ি চা, সেকৃরাহাটী জুট, বেহারলক্ষ্মী কটন এই সব সেয়ার কিনে ফেলুন; দেখ্‌বেন, এক বছরে ফেঁপে উঠ্‌বেন।"

যাহার যেমন অভিজ্ঞতা সে সেইরূপই বলিয়া গেল।

স্ত্রীর গলায় ছিল সরু লিকলিকে এক ছড়া

বিছেহার, হাতে কাঁচের চুড়ীর অন্তরালে দুইগাছি বাধানো শাঁখা মাত্র। স্ত্রী বলিল, "যা' ইচ্ছে তাই কর, আমি কথা কইতে চাই নে, কিন্তু আমার একছড়া বেশ ভারি দেখে হার আর আটগাছা চুড়ি বেশ ভাল প্যাটার্ণ দেখে গড়িয়ে দাও। দুঃখু-কষ্ট তো চিরকালই আছে, শরীরের যা' দশা, কোনদিন চক্ষু বুজি তার ঠিক্ নেই।"

একটা জুয়েলারী ফার্ম্মের বিজ্ঞাপন ও ছবি-সম্বলিত একখানি পত্রিকা কিছুদিন পূর্ব্বে পোষ্টমাষ্টারের নামে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা হইতে হার ও চুড়ির নক্সা পছন্দ করিয়া ফকির সেইদিনই তাহাদের দোকানে ভি পিতে জিনিষ পাঠাইবার অনুরোধ জানাইয়া অর্ডার পাঠাইল।

পাঁচ

কলিকাতায় এটর্ণির আফিসে যাইয়া অবশেষে ফকির লেখাপড়া করিয়া দিল যে, মোথাগাড়ী গ্রামের পরিবর্ত্তে সে তিনহাজার টাকাই লইবে।

লেখাপড়া শেষ হইলে মাতুল তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন, মামার বাড়ীর আদর-যত্নের কোন ত্রুটীই হইল না বটে, কিন্তু টাকাটা তখনই পাওয়া গেল না। মামা জানাইলেন যে, বড়ই দুর্ব্বৎসর,তাহার উপর কর্ত্তার শ্রাদ্ধে বহুটাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং টাকাটা তিন কিস্তিতে একবৎসরের মধ্যেই তিনি দিবেন।

ফকির চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রথমটা ইতঃস্ততঃ করিতেছিল, অবশেষে হার ও চুড়ী প্রস্তুতের কাহিনীটা বলিল। মাতুল জানাইলেন যে, সেজন্য চিন্তা নাই, পাঁচশত টাকা তিনি সাত-দিনের মধ্যেই ফকিরকে পাঠাইয়া দিবেন।

ছুটী ফুরাইয়া গিয়াছিল, ফকির চড়কডাঙ্গায় ফিরিল।

হার এবং চুড়ীর ইনসিওরড্ পার্শ্বেল যথাসময়ে ভি-পিতে আসিল, কিন্তু মাতুলের প্রতিশ্রুত পাঁচশত টাকা তখনও আসে নাই। দু'ই-এক-দিনের মধ্যে যদি আসে, ইহা আশা করিয়া ফকির আরও এক সপ্তাহ ভি-পি ধরিয়া রাখিল, কিন্তু টাকাটা তবুও আসিয়া পৌছিল না। ফকির তখন মহা-সমস্যায় পড়িয়া মাতুলকে টাকার কথা স্মরণ করাইয়া এক চিঠি লিখিল, এবং অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে অফিসের টাকা হইতে ভি-পিটা লইল। দু'-একদিনের মধ্যেও যদি মাতুলের টাকা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেও কোন অসুবিধা হইবে না।

নূতন হার ও নূতন চুড়ী পাইয়া বহুকালের পর ফকিরের রুগ্না স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটিল, কিন্তু ফকির মনে একটুও স্বস্তি বোধ করিতে পারিল না।

আবার সেই দীনশয্যা, নিয়মিত বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রা, সেই ডাক রণারের সড়কির ঠুং ঠুং শব্দ, মেল-ব্যাগের দড়ি কাটা, চিঠি, মনিঅর্ডার, পার্শেল - দিনের পর দিন আবার সেইভাবে চলিতে লাগিল।

অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত প্রতিদিন ডাকের ব্যাগের প্রতি চিঠিখানা উল্‌টাইয়া ফকির দেখিত যদি ভুলক্রমেও অন্য কোন চিঠির সঙ্গে তাহার মাতুলের চিঠিখানা মিশিয়া গিয়া থাকে। কিন্তু এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তবুও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া ফকির বড়ই ব্যস্ত হইয়া আবার চিঠি লিখিল; সেই সঙ্গে এটর্ণীদের অফিসেও এক পত্র দিল।

অফিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা ইতিমধ্যে ফকিরের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ছোট ব্রাঞ্চ পোষ্ট-অফিসে এত টাকা এক সঙ্গে কেন রাখা হইয়াছে? টাকা অবিলম্বে যেন হেড আফিসে পাঠান হয়।

মাতুলের প্রত্যুত্তর অথবা টাকা যাহা হোক্ একটী কিছু আসিবেই, এই প্রতীক্ষায় আরও দু'-তিন দিন কাটিল। অবশেষে একদিন খবর

পাওয়া গেল যে, পোষ্ট-অফিসের ইন্‌সপেক্টার পরিদর্শনে আসিতেছেন।

খবরটা শুনিয়া ফকিরের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। চাকরী তো যাইবেই, সেই সঙ্গে কেবল যে সুনাম যাইয়া ব্যাপারটার শেষ হইবে তাহা নহে, সরকারী তহবিলের হিসাব ঠিক্ না থাকিলে জেল হওয়াও অসম্ভব নয়।

নূতন চুড়ি এবং হার অগত্যা বন্ধক দিতে হইল; কিন্তু তাহাতেও টাকার সঙ্কুলান হইল না। কাজেই পুরাতন সরু হারটী এবং বাঁধানো শাঁখা দুইগাছিও খুলিয়া দিয়া অফিসের টাকার হিসাব মিলাইতে হইল। তবুও দশ-বারটাকা অকুলান হইল; ফকির সেটা নিজের বেতন হইতে দিল।

ইন্‌সপেক্টার আসিয়া টাকার গরমিল নাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া টাকাগুলি নিজেই হেড-অফিসে পাঠাইয়া দিলেন এবং এত টাকা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেন, তাহার সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া একটু ভর্ৎসনাও যে না করিলেন, এমন নয়।

ফকিরের তখন সম্বল বেতনের অবশিষ্ট আড়াইটী টাকা এবং স্ত্রীর সম্বল রহিল হাতে কয়েকগাছি কাঁচের চুড়ী।

দিন পনের পরে মামার বাড়ীর চিঠি পাওয়া গেল। মামা নিজে লেখেন নাই, লিখিয়াছেন অন্য একজন। চিঠিখানা পড়িয়া জানা গেল যে, মামার শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়াছে, সে কারণ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তিনি ওয়ালটেয়ার যাইতেছেন। এখন টাকাকড়ি কিছু দেওয়া সম্ভব হইবে না। চৈত্র মাসটা গেলে যাহা হোক্ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এটর্নীর আফিস হইতেও উত্তর পাওয়া গেল। তাহারা লিখিয়াছেন যে, ফকির যদি তিনহাজার টাকার দাবী দিয়া মাতুলের নামে আদালতে নালিস করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মোকর্দ্দমার কোর্ট ফি বাবদ দুইশত বাষট্টি টাকা আট আনা এবং তাঁহাদের খরচ ইত্যাদি বাবদ সর্ব্বসমেত তিনশত টাকা যেন পত্রপাঠমাত্র পাঠাইয়া দেয়।

হার এবং চুড়ি বন্ধক রাখিয়া যাঁহার কাছে টাকা ধার করা হইয়াছিল, তিনি সেই সময় সুদের টাকার তাগাদা করিতে আসিলেন। ফকিরের আর সহ্য হইল না; হাতবাক্সর তলায় একটী সোনার মাদুলী পড়িয়াছিল—তাহার যে শিশু-পুত্রটী দেড়বৎসর বয়সে মাতা-পিতাকে ফাঁকি দিয়া এক অজ্ঞাতলোকে চলিয়া গিয়াছে, কোন একটা অজানিত আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এটী তাহারই গলায় ছিল। ফকির সেই মাদুলীটী লইয়া তাঁহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নিন্—টাকার সুদ।"

বলিয়াই সে ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—জল্লাদ—

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

রাত্রি প্রায় আড়াইটা বাজিয়াছে। কোথাও কোনও শব্দ নাই—নাগরিকগণ প্রসুপ্ত—কেবল মাত্র অদূরে গুল্মের অন্তরালে ঝিল্লিরব অশ্রান্তভাবে ধ্বনিত হইয়া নৈশপ্রকৃতির গাম্ভীর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছিল। রজনীর সেই শেষ যামে প্যারিসের উপকণ্ঠে—একটী সুদৃশ্য পল্লীভবনের পশ্চাৎ দিকে একটি ঘরের জানালার নিম্নে—বিখ্যাত তস্কর গুঁস্তাভদিলেরো দাঁড়াইয়াছিল। খোলা জানালার ভিতর হইতে মৃদু আলোকরশ্মি বাহিরে আসিতেছিল।

গুঁস্তাভ খুব সাবধানে চারিদিক চাহিয়া জানালার দিকে সরিয়া গেল, এবং ভিতরে কি আছে দেখিবার জন্য পর্দ্দার পার্শ্ব হইতে উঁকি মারিল—ঘরের আসবাব ও সজ্জা দেখিতে বেশ সুদৃশ্য; দেখিলে বোধ হয় গৃহস্বামী বেশ ধনী। ঘরের মধ্যস্থলে একটি চেয়ারে একটি লোক বহির্গমনের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার সুদৃশ্য টুপীটি সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রহিয়াছে—লোকটি নিদ্রিত, যেন কাহারও অপেক্ষা করিতে করিতে এইমাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন।

গুঁস্তাভ ভাবিল—হাঁ, এই ত সুযোগ! সাবধানে ঢুকিয়া ঘরের মধ্যে যা' কিছু দামী জিনিষ পাই, হাতাইয়া সরিয়া পড়ি। যদি লোকটী···? না! ভয় বলিয়া যে দুনিয়ায় একটি বস্তু থাকিতে পারে, গুঁস্তাভ তাহা কল্পনায় আনিতে পারে না। জানালার পর্দ্দা সরাইয়া অতি ধীর পদে সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল; তারপর এরূপ সাবধানে সে উপবিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে অগ্রসর হইল যে, মোটেই তাহার পদশব্দ হইল না—অত ধীরে বোধ হয় কাঠ-বিড়ালও যাইতে পারে না।

কিন্তু এত সাবধান হওয়া সত্বেও সেই উপবিষ্ট ব্যক্তিটী সহসা জাগ্রত হইল। গুঁস্তাভ চমকিত হইল—এতকাল নির্ব্বিঘ্নে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে—কিন্তু অদ্যকার এই আকস্মিক বিপত্তিতে সে যে ভীত বা ব্যর্থকাম হইবে, গুঁস্তাভ সে শ্রেণীর তস্কর ছিল না। পাছে এরূপ অতর্কিত বিপদ আসিতে পারে, সেই জন্য সে সর্ব্বদাই একখানি ছোরা নিজ পকেটে রাখিত—এর চেয়ে বড় মারণাস্ত্র তাহার প্রয়োজনই হইত না। উপস্থিত বিপদে সে তৎক্ষণাৎ উপায় স্থির করিল—ওই উপবিষ্ট লোকটিকে হত্যা···

গুঁস্তাভ এরূপ কতজনকে নিজ পাপকার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ ভাবিয়া পৃথিবী হইতে অকালে চির-বিদায় দিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই—তাই আজও সামান্য কারণে এই গুরুতর পাপসংকল্পে তাহার দ্বিধা বোধ হইল না। মানুষের জীবন সে এমনই তুচ্ছ জ্ঞান করিত।

উপবিষ্ট ব্যক্তিটি ভালরূপে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই গুঁস্তাভ নেকড়ের মত বিদ্যুৎগতিতে তাহার বাম পঞ্জরে আঘাত করিল—আততায়ীর হস্তে হতভাগ্য ব্যক্তির সব শেষ হইল। একটু 'টুঁ শব্দ' পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। হত্যাকারী কে তাহা জানিবার পূর্ব্বেই এই নিঃশঙ্ক সুপ্তিমগ্ন ব্যক্তিটি ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

গুঁস্তাভও তাহার পাপকার্য্যের অন্তরায় দূর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহ মধ্যস্থ মূল্যবান ছোটখাট দ্রব্য সকল নিজ পকেটজাত করিতে লাগি[illegible]

উপবিষ্ট মৃত ব্যক্তির পকেট হইতেও মূল্যবান সামগ্রী লইতে বিলম্ব করিল না।

হঠাৎ মৃতব্যক্তির দিকে ভাল করিয়া তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিত হইল—মৃত ব্যক্তিটি যে হুবহু তাহারই মত দেখিতে, বয়স ও আকৃতিতে উভয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে, এমন কি দাড়ির অগ্রভাগও একই প্রকারে ছাটা—দেখিলে মনে হয় যেন আর একটি গুঁস্তাভ বসিয়া আছে! আশ্চর্য্য!

গুঁস্তাভ মৃত ব্যক্তির দামী ওভারকোটটি ও সুদৃশ্য টুপীটি তুলিয়া লইল। ওভার কোটটি নিজে পরিধান করিয়া ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানি বড় আয়নায় নিজ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল—হাঁ! এইবার ঠিক মানাইয়াছে! কে বলিবে যে সে একজন তস্কর, খুনী!

আর নয়, এইবার বাতায়ন-পথে তাহাকে সরিয়া পড়িতে হইবে। গুঁস্তাভ জানালার নিকট সরিয়া আসিতেই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

দেখিল একটি বৃহৎ মোটর তীব্র আলোক বিকিরণ করিতে করিতে বাটির ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ী থামাইয়া এক ব্যক্তি দ্রুতপদে সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল।

বিপদে পড়িলে হাল না ছাড়িয়া দেওয়াই ছিল গুঁস্তাভের জীবনের বৈশিষ্ট্য। বিদ্যুৎ গতিতে সে মৃত ব্যক্তির টুপীটা নিজ মস্তকে পরিয়া ওভারকোটের কলারটি গলার উপর টানিয়া দিল; তারপর অতি ক্ষিপ্রগতিতে দ্বার খুলিয়া আগন্তকের প্রতীক্ষায় সিঁড়ির উপর শান্তভাবে ও কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—!

নমস্কার মঁসিয়! এই বলিয়া আগন্তক তাহাকে অভিবাদন করিল। সে বলিল—আমিই নূতন সহকারী; আপনাকে পৌছিয়া দিবার জন্য ঠিক সময়েই আসিয়াছি—এই বলিয়া নিজ ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য সিঁড়ির আলোর নিকট সরিয়া গেল। গুঁস্তাভ ভাবিতে লাগিল,—এ কাহার সহকারী? কোথায় পৌছাইবার কথা বলিতেছে?

আগন্তক যুবকটি খানিকটা আগাইয়া আসিয়া বলিল—চলুন মঁসিয়। এখন তিনটা বাজিয়াছে। সব প্রস্তুত হইতেছে, আমরাও আর এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌছিতে পারিব। আসুন এই বলিয়া সে দ্রুতপদে মোটরের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। গুঁস্তাভও তাহার অনুসরণ করিয়া গাড়ীতে গিয়া চাপিয়া বসিল। যুবকটি মোটর চালাইয়া দিল।

গাড়ী পূর্ণবেগে রাস্তা অতিক্রম করিতে লাগিল—আর তাহার ভিতর ছদ্মবেশী হত্যাকারী রাতের আঁধারে প্রেতের ন্যায় যেন কোন বীভৎস নাটকের অভিনয় করিতে চলিল। ক্রমে মোটর পল্লী-পথ ছাড়িয়া বিস্তীর্ণ রাজপথে ছুটিতে লাগিল। গুঁস্তাভ গাড়ীর ভিতর অন্ধকারে মৃতব্যক্তির রেডিয়ম সংযুক্ত ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিল, রাত্রি প্রায় সাড়ে-তিনটা বাজিয়াছে। কোথায় সে যাইতেছে তাহা দেখিবার ইচ্ছায় গাড়ীর কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিল—কিছুই বুঝিতে পাইল না—অন্ধকারে কিছুই চিনিতে পারিল না—তবে সে আজ কোথায় যাইতেছে? সহসা কি-এক অজানা ভয়ে তাহার সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল—

হঠাৎ গাড়ীর গতি মন্দীভূত হইতে লাগিল; সে আবার গাড়ীর শার্শি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বিশেষ কিছু না দেখিতে পাইলেও এইটুকুমাত্র সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে আর দেরী নাই—শীঘ্রই আবার একটা অভিনয়ে তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে।

মোটরচালক একটা গাড়ীবারান্দার তলায় আসিয়া থামিল—ঘরর করিয়া শব্দ উত্থিত হইয়া

মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ হইল। মুহূর্ত্ত পরে চালক আসিয়া কামরার দরজা খুলিয়া দিল—বিস্মিত গুঁস্তাভ গাড়ী হইতে নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সে স্থানটী সম্পূর্ণ অন্ধকারে আবৃত। কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্র তখন অস্তগত; সুতরাং জ্যোৎস্না না থাকায় স্থানটী সম্পূর্ণ দেখা যায় না। সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল স্থানটী যেন চতুষ্কোণ ও খুব উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ—এবং প্রায় দুইশত গজ দূরে কতকগুলি ছায়া ও আলেয়ার মত আলো ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। কি এক অনৈসর্গিক আতঙ্কে গুঁস্তাভের মন পূর্ণ হইল—কে যেন একখানি বরফের হাত তাহার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মোটরচালক বলিল—'মঁসিয়, আমরা দেখিতেছি, একটু পূর্ব্বে আসিয়াছি। তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হবার অগ্রে কি মঁসিয় সামান্য কিছু জলযোগ সারিয়া লইবেন?

গুঁস্তাভের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল! সে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না যে, কাহাদের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করিবে। সে মাথা নাড়িল বলিল—'না, প্রয়োজন নাই। দুই-একটা সিগারেটই আমার যথেষ্ট।'

মোটর চালক ঘাড় নাড়িয়া তাহার বাক্যের সমর্থন করিল এবং দূরে সেই আলোছায়াগুলির প্রতি মনোযোগের সহিত যেন কি দেখিতে লাগিল। গুঁস্তাভও সেই দিকে চাহিয়া দেখিল—বুঝিতে পারিল যে, আলোগুলি লণ্ঠনের আলো, আর কতকগুলি মানুষ তাহা লইয়া ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে যেন ঠকাঠক্ করিয়া হাতুড়ীর আঘাতের শব্দ হইতেছে—যেন কোথাও কিছু খুব ব্যস্ততার সহিত প্রস্তুত হইতেছে।

—গুঁস্তাভের মনে মৃত্যুপুরীর প্রেতদের নিশা সঞ্চরণের কথা মনে পড়িল। ভয়ে পুনঃ পুনঃ তাহার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

সহসা তাহার জীবনের ইতিহাসের একটা শোচনীয় ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। ওঃ! সেই জ্যাক বুঁসেরা গিলোটিন্—হাঁ, এমনই ভীষণ আঁধারে সেদিন—!

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মানসিক অবস্থা আর ভাল রহিল না। এক দণ্ড পূর্ব্বে যে লোক খোস মেজাজে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই এখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর ন্যায় অবসাদগ্রস্ত, অস্থির মস্তিষ্ক ও মানসিক শক্তিতে পঙ্গু।

—তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন জীবনেতিহাসের প্রত্যেক ভয়ানক ঘটনা - বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় ক্রমান্বয়ে অবিচ্ছেদে পরপর ছুটিয়া চলিল।

ঘড়িতে প্রায় সাড়ে-চারটা বাজিয়া গিয়াছে। রাতের তারা সকলই অস্তমিত। উষার আলো ও রাতের আঁধারে নিবিড় মেশামিশি হইয়া প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছে—কে জয়ী হইবে। ক্রমে উষার তরুণ আলোয় অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া আসিল—ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলী সুপ্রকাশিত হইতে লাগিল।

রাত্রের সেই ভীতিপ্রদ দৃশ্যটীও আবছায়ার মত দেখা যাইতে লাগিল এবং হাতুড়ীর ঠকাঠক্ শব্দটীও ক্রমে থামিয়া গেল। গুঁস্তাভ যেন স্বস্তি অনুভব করিল—আঃ! বাচা গেল! হাতুড়ীর প্রত্যেক শব্দটী যেন তাহার অন্তরের মধ্যে আঘাতের প্রতিধ্বনি করিতেছিল।

মোটরচালক বলিল—'মঁসিয়, এইবার আসুন, সমস্ত প্রস্তুত। সে অগ্রসর হইল; গুস্তাভও যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহার অনুগমন করিল—সে যে কোথায় যাইতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না—আজ সে মানসিক শক্তিতে দেউলিয়া!

এখন গুঁস্তাভের স্থিরবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছিল—দারুণ আতঙ্ক ও অবসাদে তাহার দেহ প্রায় সংজ্ঞাহীন সে পলাইতে চাহিল—কিন্তু হায়!

পলাইবে কোথায় - পথ কোথায় ? চারিদিক যে অবরুদ্ধ ! আগে সে ত সুযোগ পাইয়াছিল, কেন সে তখন পলাইল না ?— তীব্র অনুশোচনায় তাহার মন ভরিয়া গেল। এমন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কখনও সে দেয় নাই। যদি বাঁচিয়া থাকে, আর কখন দিবেও না।

গুঁস্তাভ অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ভোরের আলোয় দূরের সেই বস্তুটী বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল। দারুণ ভয়ে এইবার তার পদদ্বয় ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল - ঠিক্ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তরোগী। সে কিছুতেই ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিতে পারিল না। যদি কেহ তখন তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত,—সে দেখিতে পাইত,—গুঁস্তাভের মুখ রক্তশূন্য—মৃতের ন্যায় সাদা !

গিলোটিন্ ! গিলোটিন্ ! ! তাহার অত্যাচারী হৃদয়ের মধ্যে যাহার দুঃস্বপ্ন প্রতিনিয়ত তাহাকে নিপীড়িত করিয়াছে, আজ সেই গিলোটিনের সম্মুখে স্বেচ্ছায় আসিয়া সে উপনীত হইয়াছে ! অপরাধীর বেশে নয়, যে গিলোটিনকে সে যমতুল্য ভয় করে, আজ তাহারই সহিত তাহাকে অভিনয় করিতে হইবে ! সে আজ হত্যাকারী—তস্কর গুঁস্তাভদিলোরা নয়— আজ যে সে ফ্রান্সের প্রধান ঘাতক—'জল্লাদ !'

যাহাকে গুঁস্তাভ রাত্রে হত্যা করিয়াছিল, সে ফ্রান্সের প্রধান জল্লাদ—তাই আজ যে তাহাকেই সেই জল্লাদের ছদ্মবেশে অভিনয় করিতে হইবে !

নিয়তির কি পরিহাস ! কোথায় সে নিজে হত্যাপরাধে ভীম গিলোটিনে মৃত্যুবরণ করিবে,— না নিয়তির বলে সেই জল্লাদ !···

গিলোটিনের কাষ্ঠদণ্ডে ও কে বাঁধা রহিয়াছে ? আজ কাহার এ মৃত্যু-উৎসব ?—গুঁস্তাভ হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

যে লোকগুলি গুঁস্তাভের নিকট আসিয়াছিল, তাহারা সম্ভ্রমসূচকভাবে তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—'মঁসিয় প্রায় পাঁচটা বাজে, আপনি প্রস্তুত হউন, আমাদের ক্রটীর জন্যই এই সামান্য বিলম্ব হইয়াছে।

গুঁস্তাভ যেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না—মুখের মধ্যে জিহ্বাটী কম্পিত হইল মাত্র—কোন বাক্যই উচ্চারিত হইল না। শুধু সে জড়ের মত দণ্ডিত ব্যক্তিটীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

তখন ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত মৃত্যু-দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট দাঁড়াইয়া পবিত্র বাইবেলের অন্তিম স্তোত্র-গাথা ধীর ও গম্ভীর স্বরে পাঠ করিতেছিলেন।

গুঁস্তাভের কর্ণে সে পবিত্র বাণী অসীম মহাসাগরের বারি গর্জ্জনের ন্যায় শুনাইতেছিল— কোন বাক্যেরই সে মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। ক্রমে সেই শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ সে দণ্ডিতকে পরিচিত বোধ করিল— যেন সে তাহাকে দেখিয়াছে ! বক্ষের উপর যুগল হস্ত ক্রুশের আকারে স্থাপিত ; চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত। আকৃতি শীর্ণ রুক্ষ ; মাথার চুল ও দাড়ী দীর্ঘ— দেখিলে মনে হয়,—এই মৃত্যুর জন্য যেন তাহার কোন চিন্তা নাই ! একান্ত পরিচিতা প্রিয়ার বাহুবেষ্টনের মধ্যে আপনাকে তুলিয়া দিবার জন্যই যেন সে উন্মুখ হইয়া আছে !

গিলোটিনের কাষ্ঠ ফলকের উপরকার ফরাসী ভাষায় লিখিত,—বিদ্রোহী ! লেখাটা যেন জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মরণ-যাত্রীর করুণা পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * *

হঠাৎ গুঁস্তাভ তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—পীরী দিলেরা !—আমার—আমার ভাই !

তারপর যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চতুর্দ্দিকে লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিল—তার কর্ণকুহরে শত সাগরের জলরাশি গর্জ্জন করিয়া উঠিল—আর দৃষ্টির সম্মুখে যেন একঘন কুয়াসার আবরণ পড়িল।

গুঁস্তাভের মূর্চ্ছাতুর অসাড় দেহ ভূমিতে পতিত হইল।*

* ফরাসী গল্প হইতে।

—ব্যর্থলগ্ন—

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি এ

—মিণ্টু, এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবে দয়া ক'রে?

স্বামীর কণ্ঠস্বরে অঞ্জলি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পিঠে আঁচলটা ফেলিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—দুষ্টু, তুমি, এমন করে বল, যেন আমি তোমার কেউ নই, যেন—

মাঝপথে কল্যাণ বলিল—জানো ত আমি কাউকে কষ্ট দিতে সঙ্কোচ বোধ করি—

—সে অন্যলোকের বেলায়; আমার বেলায়ও?

স্ত্রীর হাত হইতে জলের গ্লাসটা লইয়া নিঃশেষ করিয়া কল্যাণ পাশ বালিশটা জড়াইয়া শুইয়া পড়িতে পড়িতে বলিল—ইংরেজদের—চাকরকে কিছু করতে বল্‌লেও 'প্লিজ' বল্‌তে হয়—তার মানেও 'দয়া ক'রে' ছাড়া আর কিছু নয়।

—ইংরিজি চাল ইংরেজের; তুমিও সাহেব নও, আমিও মেম নই। ওরকম ক'রে তুমি বল্‌তে পাবে না।

কল্যাণ জবাব না দিয়া খবরের কাগজ তুলিয়া লইল; অঞ্জলি বডির সেলাইটা শেষ করিতে বসিল।

দুপুর বেলা—চারিধারে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। দোতালার বারান্দার কাছ অবধি পথের কৃষ্ণচূড়া গাছটা মাথা তুলিয়াছে; সময় অসময় তারি পাতার ফাঁক দিয়া মৃদু বায়ুহিল্লোল আসিয়া কল্যাণের কাগজ এবং অঞ্জলির চূর্ণকুন্তল নাড়িয়া বিরক্ত করিতেছে। পাশের বাগানের পুকুরের জলে অত বেলায়ও পাড়ার কয়টি ছেলে মাতামাতি করিতেছে। মাঝে মাঝে তাদের জলোচ্ছ্বাস ও কলধ্বনি উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

কল্যাণের কাগজে মন বসিতেছিল না। স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিল—তোমার কি কাজ শেষ হবে না।

—কেন?

—মাথার চুলগুলো টেনে দাও, ঘুম আস্‌ছে না।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া মাথার কাছে বসিয়া অঞ্জলি কহিল—তবে না তুমি কাউকে কষ্ট দিতে ভালোবাসো না?

বালিশে মুখ গুঁজিয়া কল্যাণ বলিল—মাথায় হাত বুলোলে কারুর কষ্ট হয়?

—আচ্ছা, দাও ত আমার, দেখি কতক্ষণ পারো?

কল্যাণ দেখিল হিতে বিপরীত। সেবা গ্রহণ করিবার জন্য যখন হৃদয় মন উন্মুখ হইয়া আছে, তখন নিজেরই কথার গোলমালে, উঠিয়া সেবা করিতে হইবে! এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—মৌনর মত জিনিস নাই।

অঞ্জলি চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল; কল্যাণ তার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। এক মিনিটও হয় নাই, কল্যাণের মনে হইল, কতক্ষণ করিতেছে! 'সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়'। নিকুচি করেছে তর্কের! আর যদি সে কখনো তর্ক করে। তিন-চার মিনিট পার হইয়া গেল, অঞ্জলি বলে না—থাক্। একটিবার 'হয়েছে' বলিলেই কল্যাণের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়ে। 'আরো দু' মিনিট কাটিয়া গেল, কল্যাণ ভাবে—বাঃ, এ যে বেশ আরাম ক'রে নিচ্ছে! একটু দ্বিধাও যে হইল না এমন নয়। উল্টা বুঝিলি রাম আর কা'কে বলে। মুক্তির কোন পথ না পাইয়া অবশেষে ব—

ফেলিল—তোমার মাথায় যা' রাশ রাশ তেল, বেশীক্ষণ কি করা যায়!

কপট নিদ্রার ভাণ ছাড়িয়া অঞ্জলি উঠিয়া বলিল—থাক্ থাক্—কষ্ট হচ্ছে তাই বল্‌লেই হয়—অত ভঙ্গিমা কর্‌বার দরকার কি ছিল!

থাক্ কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই কল্যাণ শয্যা লইয়াছিল; কোন কথার জবাব দিল না। আবার নূতন বিপদ জুটিতে কতক্ষণ?

আধঘণ্টা ধরিয়া নানারকমে কুঞ্চিত কেশে অঙ্গুলি চালনা করিয়া অঞ্জলি দেখিল, কল্যাণের ঘুমাইবার নাম নাই, পা নাড়িতেছে। বলিল—এবার তোমায় ঘুম পাড়াই; আমার ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে, ঘুমোও বলিয়া পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে সুর করিয়া সুরু করিল—

দুষ্টু ঘুমোয় ছিষ্টি জুড়োয়
বিষ্টি এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
ঘুলঘুলিতে এসে—এ!

ঘুমপাড়ানি গানের শেষের দিকে টানিবার সুরে সহজেই ঘুম আসে; খানিকক্ষণ পরে কল্যাণের নাক ডাকিবার শব্দ পাওয়া গেল।

অঞ্জলি উঠিয়া টেবিলের উপরে ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল, দুটো। সে হাতের সেলায়ের কাজ সারিতে বসিল। নীচে একরাশ কাপড় ভিজাইয়া দিয়া আসিয়াছে, সাবান কাচা করিতে হইবে। সে পরে হইলে চলিবে; এখন ছাতের কাপড়গুলা তুলিয়া কুঁচাইয়া রাখিতে হইবে। শাশুড়ীর ঘরটা একবার ঝাড়িয়া আসিতে হইবে; শ্বশুরের সরবত আর একটু পরেই চাই। বোতাম আনানো নাই, নহিলে সব জামাগুলায় বোতাম লাগাইয়া দিত। কয়দিন ধরিয়া স্বামীকে বলিয়া বলিয়া এ কাজটা আর হইল না। চরকাটা আর ধরা হইতেছে না; মাগো, মনে করিতে লজ্জা করে! আজই সন্ধ্যায় সুতা কাটিতে বসিবে; একখানা কাপড় বোনাইয়াই হইয়া গেল!

প্রায় কাজ শেষ করিয়া যখন সে উপরে উঠিয়া আসিল, তখনো কল্যাণ ঘুমাইতেছিল। নিঃশব্দে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া সপ্রেমে স্বামীর পিঠে হাত রাখিল। কল্যাণ জড়িতস্বরে বলিল—ক'টা বেজেছে, দুটো?

—দুটো কাল বাজবে, তিনটে।

—তিনটে? বল্‌তে হয়! একরকম গর্জ্জন করিয়া কল্যাণ লাফাইয়া নামিল; পাঞ্জাবিটা গলা দিয়া নামাইয়া দিয়া 'চপ্পলে' পা ঢুকাইল।

অঞ্জলি বাধা দিল—কোথায় যাচ্ছ?

সংক্ষিপ্ত সতেজ উত্তর ম্যাচ!

হাত ধরিয়া অঞ্জলি কহিল—আজ না হয় নাই গেলে; আজ কি দিন, মনে আছে? সকাল থেকে বলে রেখেছি তুমি বিকেলবেলা বেরোতে পাবে না—আজকের গোধূলি-লগ্ন আমি বৃথা যেতে দোব না—

হাতটা কায়দা করিয়া ছাড়াইয়া কল্যাণ বলিল—বাস্‌রে, আজ কি থাক্‌তে পারি—আজ মোহনবাগান ডারহাম্‌স! ওয়াটারপ্রুফটা কাঁধে ফেলিয়া কল্যাণ দরজার দিকে অগ্রসর হইল নীচে পাড়ার সঙ্গীরা আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—কল্যাণ, আছ না কি?

—আছি, আস্‌ছি, এক মিনিট!

—এসো, এসো, আর সময় নেই। একে বিনোদ-দা'র জন্যে দেরী, তুমি আর সময় নিয়ো না।

দরজায় পিঠ দিয়া তখন অঞ্জলি দাঁড়াইয়া—কিছুতেই পথ ছাড়িবে না।

কল্যাণ অনুনয়ের সুরে বলিল—ছাড়ো, ছাড়ো, লক্ষ্মীটি! কি কর, দেখ্‌চ সব দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি মনে করবে?

—বলে দাও যাব না।

—তা' কি হয়? ঠাট্টায় খেয়ে ফেলবে; বলবে—প্রিয়া ছাড়া একদণ্ড চলে না।

—সেটা কি খুব নিন্দের ?

আম্‌তাআম্‌তা করিয়া কল্যাণ বলিল—না না, সেজন্যে নয় ; কিন্তু আমারো ত একটা ইচ্ছে আছে ?

—তোমার ইচ্ছে হচ্ছে আমার উৎসব ছেড়ে এ সব দেখতে যেতে ? সত্যি ক'রে বলো !

কল্যাণ বলিল কিন্তু এ যে মোহনবাগান ডারহাম্‌স্‌।

নীচের লোকেরা চ্যাঁচাইয়া উঠিল—কোথায় হে কল্যাণ, জায়গা পাবে না যে এর পর !

অঞ্জলি সরিয়া গেল ; কল্যাণ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

জানালার গরাদের উপর হাত ও মাথা রাখিয়া অঞ্জলি ভাবিতে লাগিল, মোহনবাগান ডারহাম্‌স্‌ সে কি এতই লোভনীয় ?

সকাল হইতে শ্বেতপদ্ম ও নবমল্লিকার রাশি কিনিয়া আনিয়া সে যে সুন্দর মালা গাঁথিল, ধূপধূনা সুরভির ব্যবস্থায় সে যে বিবাহ-তিথিকে সম্পূর্ণ করিবার আয়োজন করিল, প্রিয়ার করকমলের সেবায় প্রিয়ের স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যে স্মরণীয় মুহূর্ত্ত উজ্জ্বল হইবে কল্পনা করিয়া সপ্তাহকাল সে যে ভালো করিয়া নিদ্রা গেল না, এক মোহনবাগান ডারহাম্‌স্‌ সব স্বপ্নসাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিল !

প্রাচীন ফোর্টের পরপারে দিনান্তের সূর্য্য তখন ডুবিতেছে। গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলে দূরান্তের রণতরীর মাস্তুলসমূহ নির্ম্মল নীল আকাশে অনেকখানি মাথা তুলিয়াছে, ইডেন উদ্যানের লতাপল্লব চিক্কণ শ্যামলবর্ণে ঘনীভূত, সংখ্যাবিহীন নরনারী মোহন-বাগান ডারহাম্‌স্‌এর ম্যাচ দেখিতেছে। অন্ততঃ একটি গোলে—একটি গোলে যদি স্বদেশের টিম্‌ জিতিতে পারে, স্বরাজ বুঝি তাহাতেই—খাদি নয়, মহাত্মা নয়, নারীজাগরণে নয়, দেশহিতব্রতে নয়, বাংলার জনপ্রিয় খেলোয়াড় দলের মাত্র একটি গোল বিজয়ের উপরই স্বাধীন সাম্রাজ্যের সমস্ত কল্পনার ভিত্তি রহিয়াছে ! যদি সে স্বপ্ন বৃথা হয়, যদি পরাজয়েরই গ্লানি ভাগ্যে ঘটে, তবে অক্টারলোনি মনুমেণ্টের দীর্ঘ ছায়াতল দিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে বাঙালী জৈন পশ্চিমা মুসলমান এমন করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে যে, তার কাছে মোহনলালের পলাশীক্ষেত্রের বিয়োগাশ্রু কোথায় লাগে !

হে ভগবান, একটি গোল—তাও দিলে না ! ব্যথিত জনসঙ্ঘ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলিল। স্পষ্টবাদীর দল জানাইয়া দিল, কোন জীবের ভাগ্যে যেন একবারই শিকা ছিঁড়িয়া থাকে। স্মরণাতীত কালে বাঙালী যেদিন শিল্ড পাইয়াছিল, আজিকার দশকদের মধ্যে অনেকে সেদিন জন্ম-লাভ করে নাই ; স্মরণাতীত কালে একবার যা' হইয়া গেছে, বর্ষে বর্ষে তারই আশায় আসিয়া ফিরিয়া গিয়া লাভ কি ?

ভিড় হইতে বাহির হইয়া কল্যাণ মনঃক্ষোভ নিবারণ করিবার জন্য দলবল সমেত চায়ের দোকানে ঢুকিল ; সেখান হইতে বন্ধুজনের প্ররোচনায় থিয়েটারে গিয়া পড়িল।

রাত তখন অনেক, বোধ হয় বারোটা বাজিয়া গেছে। সহরতলীর জনবিরল পথে লোক চলাচল বন্ধ। জানালা দিয়া ম্লান গ্যাসের আলোক ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল, অঞ্জলির মাথার কাছে খাটের উপরে। অঞ্জলি স্বামীকে সাজাইবার জন্য পাউডার, স্নো, চন্দন, চিরুণী আর্শীর সাম্‌নে আনিয়া রাখিয়াছিল। মালা গাঁথা হইয়াছিল, ধূপ জ্বালা হইয়াছিল, দেশী এসেন্সে ও ফুলের সুবাসে শয্যাতল আমোদিত [illegible] হইয়াছিল। নিজে সাজিয়া প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল ; প্রতিটি মুহূর্ত্ত গণনা করিয়া ক্লান্তিতে নিঃশ্বাসে ভারি

পড়িল। তারপর নিদ্রা আসিয়া সব দুঃখ সব অভিমান হরণ করিয়াছে।

দরজা খুলিয়া কল্যাণ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল প্রদীপ নেভানো। জামাটা আনলায় রাখিতে গিয়া কিসে পা ঠেকিল; দেশলাই জ্বালিয়া দেখিল, বিচিত্র আলপনায় চিত্রিত কাষ্ঠাসন, সেখানে উজাড় করিয়া দেওয়া ফুল। এতক্ষণে মনে পড়িয়া গেল, আজ অঞ্জলি কি বলিয়াছিল। বাতি জ্বালিয়া ফেলিল। দেয়ালের গায়ে তার ফটোতে শুভ্র ফুলমালা হা যায় দুলিতেছে, নূতন কাপড়-জামা খাটের গায়ে রাখা। আরে ছোঃ, যত সব বাজে কবিত্ব বলিয়া সে শুইয়া পড়িল। হোটেলে খাইয়া আসিয়াছে, ঢাকা খুলিয়া দেখিল না অঞ্জলি আজ তার জন্য কত কি সযত্নে রান্না করিয়াছিল।

শেষ রাত্রি।

অঞ্জলি স্বপ্ন দেখিতেছিল,—দীপের আলোয় 'চয়নিকা' খুলিয়া সে পড়িতেছে; স্বামী আসিয়া তার কাঁধের উপর দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল—কি পড়া হচ্ছে—দেখি, 'আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে, জেনো জেনো মন রয়েছে তোমায় লয়ে।' সে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরিতে ফিরিতে—যেন সত্যই কথা কহিতেছে—বলিল—যাঃও!

প্রায় একই সময় কল্যাণ দেখিল মোহন-বাগানের বল যেন ডারহাম্‌স্‌এর নেটের মধ্যে ঢুকিয়াছে; সে উত্তেজিত অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ক্লীন গোল, তবু বলে অফ্‌সাইড।

সে যখন ম্যাচ্‌এর নেশায় বিভোর, ভগবান যদি ইংরাজী জানিতেন, তবে তখন হয় ত ভাবিতেন—এদের দু'জনেও ত ঠিক ম্যাচ করিল না, গোলকে অফ্‌সাইড আর অফ্‌সাইডকে গোল বলিয়া গোলমাল করিতে করিতেই জীবনের পথে চলিল!

—ফাঁসীর ফেরৎ—

[রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনী]

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সবেমাত্র 'কল্' থেকে ফিরে এসে একখানা ইজিচেয়ারে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় দীপকের চাকর এসে একখানা চিঠি দিলে। তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে ফেলে দেখি বন্ধু দীপক লিখেছে—"দু'দিন আমার সঙ্গে কোলকাতার বাইরে কাটাবার ফুরসৎ হবে কি তোমার? কোলাঘাটের খুনটার তদন্ত কর্‌তে যাচ্ছি। যদি সুবিধা হয়, হাওড়ায় ন' নম্বর প্লাটফর্মে দেখা কর্‌বে—একটা পনের মিনিটের ট্রেণ।"

তার কোন ডাক কোন কারণে উপেক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা আমার ছিল না; তাই কাপড়-জামা আর দরকারী দু'-পাঁচটা জিনিষপত্র একটা সুটকেশের মধ্যে ভরে' নিয়ে ট্যাক্সি ক'রে হাওড়া এসে পৌঁছুলাম। ট্রেণ ছাড়্‌তে তখনো দশমিনিট দেরী।

দীপক প্লাটফর্মে চিন্তিতভাবে পদচারণা কর্‌ছিল। আমায় দেখে বল্‌ল—"তোমার জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছি অনিল।"

ট্রেণ যখন উলুবেড়ে পার হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কোলাঘাটের খুনটার সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?"

—"বিন্দু-বিসর্গও নয়।"

—"বলি শোন, কোলাঘাটের চারমাইল দূরে মশোরপুর বলে' একটা বড় গ্রাম আছে। সেখানকার জমিদার হচ্ছেন সুরেশ চাটুর্য্যে। ইনি আগে ছিলেন কোচিন সহরে; সেখানে থেকে অনেক টাকা উপার্জ্জন ক'রে ইনি বাংলাদেশে ফিরে এসে এই জমিদারীটি কিনে এখানে বসবাস কর্‌ছেন। পাশের হরিরামপুর গাঁয়ের পঁচিশ বিঘে জমী ইনি ইজারা দেন মন্মথ রায়কে; তিনিও আগে থাক্‌তেন কোচিনে। কোচিন সহরে থাক্‌বার সময়ই এঁদের দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়; তাই বাংলাদেশে ফিরে এসে এঁরা দু'জনে পাশাপাশিই ঘর বাঁধেন। মন্মথ আর সুরেশ—দু'জনেই বিপত্নীক। আপনার বল্‌তে মন্মথ রায়ের একটি ছেলে আছে পঁচিশ বছরের; আর সুরেশেরও একটি মেয়ে আছে বয়স চোদ্দ-পনের বছর হবে। দু'জনের কেউই লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌তেন না; বাড়ির বাইরেও বড়-একটা কেউ বেরুতেন না। মন্মথ রায়ের শিকারের সখ ছিল খুব। হরিরামপুরের পাশে একটা ছোট জঙ্গল আছে; মাঝে মাঝে সেখানে তিনি যেতেন শিকার কর্‌তে। মন্মথ রায়ের বাড়িতে তার ছেলে ছাড়া আর দু'জন লোক ছিল—একজন চাকর, আর একজন ঝি—এই হচ্ছে দু'বন্ধু-পরিবারের কথা; এইবার আসল ঘটনাটি বলি—

'গত তেসরা জুন শুক্রবার দিন মন্মথবাবু বেলা প্রায় তিনটার সময় জঙ্গলের দিকে যান। যাবার সময় তিনি চাকরকে বলে' যান, একজনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছেন, সন্ধ্যের আগেই ফির্‌বেন; কিন্তু তিনি আর ফেরেন নি।

'হরিরামপুরে মন্মথবাবুর বাড়ি থেকে যে জঙ্গলের কথা বলেছি, তার দূরত্ব প্রায় আধমাইল। এই বনের পথটা দিয়েই তিনি সেদিন গেছ্‌লেন; গাঁয়ের দু'জন লোক তা' দেখেছে। প্রথম তাকে

দেখে এক বুড়ী ; তারপর জমিদার-বাড়ীর মালী নিধিরাজ। নিধিরাজ সাক্ষ্যে আরো বলেছে যে,এই পথ দিয়ে মন্মথবাবু একেলা চলে' যাবার কিছুক্ষণ পরে তাঁর ছেলে সুবোধ রায়কেও একটা বন্দুক নিয়ে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছে ; মন্মথবাবুকে তখনও পথের ও-মোড়ে দেখা যাচ্ছিল। আরো কিছুক্ষণ পরে রমা নামে চোদ্দবছরের একটি মেয়ে বনে ফুল কুড়োতে গেছ্লো ; সে দেখেছে বনের ধারে তারা পিতাপুত্রে দাঁড়িয়ে খুব ঝগড়া কর্ছিল—মন্মথবাবুর দু'-পাঁচটা চড়া কথাও সে শুনতে পেয়েছিল—সুবোধকে তিনি যেন মার্তে যাচ্ছিলেন বলে' তার মনে হয়েছিল। এদিকে সুবোধ মন্মথবাবুকে বনের ধারে কে খুন করেছে—এই কথা জানিয়ে গ্রামে এসে সাহায্য চায়। সে সময় সুবোধকে খুব উত্তেজিত বলে' মনে হয়েছিল। বন্দুকটা তখন তার কাছে ছিল না ; কিন্তু জামার আস্তিনে টাট্কা রক্তের দাগ লেগেছিল। গ্রামের ক'জন সুবোধের সঙ্গে বনের ধারে এল ; সেখানে এসে তারা দেখ্লে,—মৃতের মাথার পিছন দিকে একটা ভারী জিনিষ দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তাদের মনে হ'ল,—হয়ত সুবোধের বন্দুকের কুঁদোটা দিয়েই সে আঘাত করা হয়েছিল। মৃতদেহের পাঁচ-ছ'হাত দূরে বন্দুকটাও পড়েছিল। সন্দেহবশতঃ সুবোধকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তদন্ত ক'রে স্থির করে—'স্বেচ্ছাকৃত হত্যা।' পরদিন সুবোধকে কোলকাতায় চালান দেওয়া হয়'।''

—"খুব জটিল কেস্, তবে ঘটনাগুলো পরপর লক্ষ্য কর্লে সুবোধকেই খুনী বলে' মনে হয়।''

"ঘটনাগুলো পরপর লক্ষ্য কর্লে ছেলেটাকেই খুনী বলে' মনে হয় বটে, কিন্তু জমিদারের মেয়ে দীপ্তি সুবোধকে একেবারে নির্দ্দোষ বলে' মনে করে ; সেইজন্য সে ললিত গোয়েন্দাকে ডেকে এ ঘটনার তদন্ত কর্তে দিয়েছিল। ললিত এ সম্বন্ধে কোন কিনারা কর্তে না পেরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

—"কিন্তু কেস্ যে রকম জটিল, তুমি কিছু ক'রে উঠ্তে পার্বে বলে' তো মনে হয় না।''

"কেসটাতে দুটো ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্বার আছে।''

—"সেগুলো কি ?"

—"প্রথমতঃ, সুবোধকে তখুনি গ্রেপ্তার করা হয় নি ; সে বাড়ীতে ফিরে গেলে পর ইন্স্পেক্টর তাকে গ্রেপ্তার করে। ইন্স্পেক্টারের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে সুবোধ বলেছিল—'আমায় যে গ্রপ্তার করা হবে, তা' আমি জানি ; আর বাবা যখন অমনভাবে খুন হলেন'—''

—"সে যে খুনী, ওই 'জানি' কথাটা থেকেই ত তা' বোঝা যাচ্ছে।

—"জুরীরাও তাই বলেছে বটে ; কিন্তু, ওই কথাটাই তার নির্দ্দোষের প্রমাণ।"

—"আচ্ছা, ছোকরা কি বল্ছে ?"

—"বিশেষ কিছুই নয়। পড়েই দেখ না।" বলে দীপক নোটবুক থেকে খবরের কাগজের কাঁচি দিয়ে কাটা একটি অংশ আমার হাতে দিয়ে বল্ল—"এইখান থেকে পড়।"

আমি পড়তে সুরু কর্লাম—"তিনদিন কোলকাতায় থাক্বার পর ঘটনার দিন দুটোর সময় আমি বাড়ী ফিরি। শুন্লাম, বাবা বাড়ীতে নাই ; সহরের দিকে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে বাইরে গাড়ীর শব্দ শুনে জানালা দিয়ে দেখলাম, তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী হ'তে নেমে পায়ে হেঁটে কোথায় চলে গেলেন। চুপচাপ বসে থাক্তে আমার ভাল লাগছিল না বলে' কিছুক্ষণ পর বন্দুকটা নিয়ে আমি খরগোস শীকার কর্বার ইচ্ছায় বনের পথ ধরে' যাই ; পথে নিধিরাজ মালীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে মনে করেছিল আমি বাবাকে অনুসরণ করেছি—এটা তার একেবারেই

মিথ্যা ধারণা; কারণ, বাবা যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সেইপথ দিয়ে গিয়েছেন তা' আমি জান্‌তুম না। হঠাৎ কিছুদূরে 'কু-ই' বলে' শিষ্‌ দেবার শব্দ আমি শুন্‌তে পেলুম। বাবা আমাকে দূর হ'তে এই রকম শিষ্‌ দিয়ে ডাক্‌তেন; সুতরাং এই শিষ্‌ শুনে আমি দ্রুত অগ্রসর হয়ে বাবার সম্মুখীন হই। আমাকে দেখে বাবা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে যান এবং অত্যন্ত রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করেন 'সেখানে আমি এসেছি কেন?' উত্তর দিতেই তিনি আমাকে তাড়া ক'রে মার্‌তে আসেন। তাঁর ওইরূপ রুক্ষ রাগান্বিতভাব দেখে আমি আর কোন কথা না বলে' ওইপথেই ফিরে আসি। প্রায় মিনিট পাঁচেক চলে' আস্‌বার পর হঠাৎ পিছনে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শুনে আমি ছুটে বাবার কাছে যাই। গিয়ে দেখি,—তিনি মাটিতে পড়ে হাঁপাচ্ছেন, আর তাঁর মাথার কিয়দংশ একেবারে ভেঙ্গে গেছে। আমি বন্দুকটা ফেলে দিয়ে তার মাথাটি কোলে তুলে নিলুম; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। কয়েক মুহূর্ত্ত আমি নিশ্চল হয়ে সেখানে বসেছিলুম; তারপর গ্রামে এসে সাহায্য চাই। আর্ত্তনাদ শুনে আমি যখন ফিরে যাই, তখন বাবার কাছে কেউই ছিল না; সুতরাং, কে যে তাঁকে আঘাত কর্‌ল, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমি কর্‌তে পারি নি। তিনি লোকের সঙ্গে বড় বিশেষ মেলামেশা কর্‌তেন না; বাড়ি থেকে কদাচিত বা'র হ'তেন। আমি যতদূর জানি, তাঁর শত্রুও কেউ ছিল না।"

রাজপক্ষের উকিল—"তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে কিছু বলে' যান?"

অপরাধী—"তিনি অস্পষ্টভাবে কি সব বলেছিলেন, তার মধ্যে কেবল 'পালক' কথাটি ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝ্‌তে পারি নি।"

রাজপক্ষের উকিল—"ওই কথাটা থেকে তুমি কি বুঝেছিলে?"

অপরাধী—"বিশেষ কিছুই না; ওটা একটা প্রলাপ বলে' আমার মনে হয়।"

রাজপক্ষের উকিল—"পিতার সঙ্গে তোমার যে বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছিল, তার মূল কারণ কি?"

অপরাধী—"এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ইচ্ছুক নই।"

রাজপক্ষের উকিল—"কিন্তু কোর্ট এ প্রশ্নের উত্তর চায়।"

অপরাধী—"এই প্রশ্নের সঙ্গে আমার পিতাকে খুন করার কোন যোগসূত্র নেই—এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পার্‌ব না।"

রাজপক্ষের উকিল—"কিন্তু এতে তোমার অপরাধ সপ্রমাণ কর্‌ছে।"

অপরাধী—"তা' হ'লেও, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ।"

রাজপক্ষের উকিল—"তোমার পিতা দূর হ'তে তোমাকে শিষ্‌ দিয়ে 'কু-ই' বলে ডাক্‌তেন?"

অপরাধী—"হ্যাঁ।"

রাজপক্ষের উকিল—"তোমাকে না দেখে, তুমি কোলকাতা হ'তে ফিরেছ কি না তা' পর্য্যন্ত না জেনে, তিনি তোমাকে শিষ্‌ দিয়ে ডাক্‌লেন কেন?"

অপরাধী—"তা' ত আমি জানি না।"

বিচারক—"পিতার আর্ত্তনাদ শুনে তুমি ফিরে গিয়ে যখন দেখ্‌লে তিনি মাথায় ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছেন, তখন এমন কিছু কি তোমার চোখে পড়ে নি যা'তে অপর কা'কেও সন্দেহ করা যেতে পারে?"

অপরাধী—"বিশেষ কিছুই নয়।"

রাজপক্ষের উকিল—"বিশেষ কিছুই নয় মানে?"

অপরাধী—"আমি তখন এত অভিভূত যে, বিশেষ কিছু লক্ষ্য কর্‌বার মত মনের অবস্থা

আমার ছিল না। কিন্তু তবু যখন আমি বাবার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসেছিলুম, তখন আমার মনে হয়েছিল, আমার বাঁ পাশে একটা খাকী রংয়ের কোট পড়েছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে যখন আমি উঠে দাঁড়ালুম, তখন সেখানে কিছুই দেখ্‌তে পাই নি।"

রাজপক্ষের উকিল—"তুমি উঠে দাঁড়াবার আগেই কি তা' অদৃশ্য হয়েছিল?"

অপরাধী—"হ্যাঁ।"

রাজ উকিল—"তুমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পার না সেটা কি?"

অপরাধী—"না। কিন্তু সেখানে কি-একটা ছিল বলেই আমার মনে হয়েছিল।"

রাজ উকিল—"মৃতদেহ হ'তে তা' কতদূরে?"

অপরাধী—"প্রায় শ'খানেক হাত।"

রাজ উকিল—"বনের কিনারা হ'তে কতদূরে?"

অপরাধী—"সেখান থেকেও প্রায় শ'খানেক হাত হ'বে।"

রাজ উকিল—"তা' হ'লে সেটি যখন অদৃশ্য হয়, তখন তুমি তার একশো হাতের মধ্যে ছিলে; তবু লক্ষ্য কর নি সেটা কি?"

অপরাধী—"একশো হাতের মধ্যে ছিলুম বটে, কিন্তু সেদিকে আমি পেছন ফিরে ছিলুম যে।"

এইখানেই আসামীর জবানবন্দী শেষ হয়েছে।

এই পর্য্যন্ত পড়ে আমি বল্‌লাম—"আসামী এখানে জেরার মুখে যে ক'টি কথা বলেছে, সবই তার দোষকে সপ্রমাণ কর্‌ছে। প্রথমতঃ, তার পিতা তাকে যদি না-ই দেখে থাক্‌বেন, তা'হ'লে তাকে শিষ্ দিয়ে ডাক্‌লেন কেন? তারপর তার পিতার সঙ্গে কি জন্যে তার বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছে, তাও সে বল্‌লে না। আর ওই খাকী কোট আর 'পালক' কথাটার কোন মানেই হয় না—একেবারে বুজরুকী!"

দীপক হো হো করে হেসে উঠে বল্‌ল—"তুমি আর রাজপক্ষের উকিলে তফাৎ নেই একটুও—ছেলেটার উপর তোমাদের মোটেই সহানুভূতি নেই দেখ্‌ছি। কিন্তু আমি ওই 'পালক' কথাটা আর হারিয়ে-যাওয়া কোটটা থেকেই আমার তদন্ত সুরু কর্‌ব। যাক্ সে কথা। আমরা কোলাঘাটে প্রায় এসে পড়েছি; এখানে একটা হোটেলে কিছু খেয়ে দেয়ে আমরা মশোরপুরে যাব।"

প্রায় চারটের সময় রূপনারায়ণের দীর্ঘ পোলটা পার হয়ে আমাদের গাড়ী কোলাঘাট ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। দীর্ঘ দেহ, দোহারা চেহারা এক ব্যক্তি আমাদের অপেক্ষায় ষ্টেশনে পদচারণা কর্‌ছিল; তা'কে চিনে নিতে আমাদের একটুও দেরী হোল না—সে গোয়েন্দা ললিত মুখুয্যে। ললিতের সঙ্গে আমরা ষ্টেশনের নীচে একটি হোটেলে কিছু আহারের চেষ্টায় আশ্রয় নিলাম।

একটি সুন্দরী তরুণী আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। আদবকায়দায় একেবারে আপ্-টু-ডেট্; ব্যবহারে একটুও সঙ্কোচ নেই। আমাদের তিনজনকে নমস্কার ক'রে দীপককে সে বল্‌ল—"আপনি আজ আস্‌বেন জেনে আমি তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলুম। আমার যতদূর মনে হয়, মনে হয় কেন, জোর করে আমি বল্‌তে পারি,—সুবোধ-দা' কখনো একাজ করে নি। সে নির্দ্দোষ—এই কথাটা মনের মধ্যে নিয়েই আপনি তদন্ত সুরু কর্‌বেন। আমরা দু'জনে ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি; আমার চেয়ে ভাল ক'রে তাকে আর কেউ চেনে না। তার মত শান্ত, পিতৃভক্ত ছেলে খুব কমই আছে—সে কি কখনো একাজ করতে পারে? সুবোধ-দা'র সঙ্গে মন্মথবাবুর ঝগড়া হয়েছিল অন্য কারণে—সে কথা জেরার মুখে সে বলে নি।"

—"কি কারণে ?" দীপক জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

—"হ্যাঁ,সে কথা গোপন রাখ্‌বার সময় আর নেই। মন্মথবাবুর ইচ্ছা ছিল, আমাদের দু'জনের বিয়ে হয়—"

—"এ বিবাহে আপনার বাবার মত আছে ?"

—"না ; তিনি এর সম্পূর্ণ বিপক্ষে। কেবল মন্মথবাবুই ছিলেন এই বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী।"

নিজের বিবাহের কথা বারবার বল্‌তে বল্‌তে তরুণীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল।

—"আপনার মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনে আমি বিশেষ বাধিত হলুম। আচ্ছা, কাল সুরেশ-বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বার সুবিধা হবে কি ?"

—"ডাক্তারবাবু যদি বারণ না করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই দেখা হবে।"

—"ডাক্তারবাবু ?"

—"হ্যাঁ ; আপনি শোনেন নি বুঝি ? গতবছর থেকেই বাবার শরীর খুব ভেঙ্গে পড়েছিল ; তার-পর মন্মথবাবুর মৃত্যুতে বাবা একেবারে শয্যা নিয়েছেন। ডাক্তার নন্দী বলেছেন যে, অত্যধিক দুঃখের উত্তেজনায় বাবার স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মন্মথবাবুর মৃত্যুতে বাবা ভয়ঙ্কর শোক পান ; তিনিই ছিলেন বাবার একমাত্র বন্ধু।"

—"আপনার কাছ থেকে অনেক দরকারী খবর পেলুম্—এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দীপ্তি দেবী !"

—"আপনি কতদূর কি কর্‌তে পারেন, অনুগ্রহ ক'রে কালকে আমাকে জানাবেন ; আর সুবোধ-দা'কে বলবেন যে, আমি তাকে নির্দ্দোষ বলেই জানি।"

—"আচ্ছা।"

—"আমি তা' হ'লে এখন যাচ্ছি। বাবা আমায় ছাড়া একমিনিটও থাকৃতে পারেন না —আচ্ছা, নমস্কার !"

তরুণী চলে গেল।

—"মেয়েটাকে মিথ্যে আশা দেওয়া তোমার কিন্তু ভারী অন্যায় হ'ল দীপক।" ললিত গম্ভীর ভাবে এই কথা বল্‌ল।

—"আমার কিন্তু মনে হয়,—সুবোধ রায়কে ফাঁসীর মঞ্চ থেকে আমি ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ব। তার সঙ্গে দেখা করা দরকার। এখুনি একখানা ট্রেণ আছে—তা'তেই আমি আবার কোলকাতায় ফিরে যাব।"

ললিত বলল—"বেশ।"

—"তা' হ'লে চল ; আর দু'মিনিট মাত্র সময় আছে। আর অনিল, তুমি ভাই এই হোটেলেই একখানা ঘর ভাড়া নেবার ব্যবস্থা কর ; আমি রাত্রির ট্রেণেই ফির্‌ব !"

রাত যখন প্রায় বারোটা, তখন দীপক ফির্‌ল। ফিরে এসেই পরিশ্রান্তভাবে দীপক একখানি চেয়ারে ঝুপ্ ক'রে বসে' পড়্‌ল। কিছু-ক্ষণ চুপচাপ কেটে যাবার পর আমি তাকে প্রশ্ন কর্‌লাম—"ছোকরার সঙ্গে দেখা ক'রে কিছু জান্‌তে পার্‌লে ?"

—"কিছুই না। প্রথমে ভেবেছিলুম, খুনীকে ছোকরা চেনে, বিশেষ কোন কারণে তার কথা গোপন রাখ্‌ছে ; কিন্তু ছোকরার সঙ্গে দেখা ক'রে বুঝ্‌লুম, ঘটনাচক্রে সে বড় বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছে—তা'কে যতটা চালাক আমি মনে করেছিলাম, সে তত বোকা।"

—"কিন্তু সুবোধ যদি নির্দ্দোষ হয়, তা' হ'লে খুনী কে ?"

—"তা'কেই তো আমাদের খুঁজে বার কর্‌তে হবে। দুটো ঘটনা এ সম্বন্ধে আমাদের সহায়তা কর্‌বে—প্রথমতঃ, মন্মথবাবু মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বনের ধারে 'কু-ই' শব্দে শিষ্ দিয়েছিলেন ; কিন্তু তখন তিনি জানতেন না যে, সুবোধ কোলকাতা থেকে ফিরেছে। তা' হ'লে এই 'কুই' শব্দে অন্য কাকেও তিনি ডেকেছিলেন ; কেন না, সেই

শব্দ শুনে সুবোধ তাঁর কাছে যাবামাত্রই তিনি খুব রেগে উঠেছিলেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যার সঙ্গে তিনি গোপনে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন, তার সঙ্গে এমন কিছু গোপনীয় কথা ছিল, যার জন্য সুবোধকে তিনি সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন। যাক্ গে সে কথা ; এখন সুখে সকাল পর্য্যন্ত একটা লম্বা ঘুম দেওয়া যাক্।" বলে দীপক শোবার উদ্যোগ কর্‌ল।

পরদিন সাড়ে দশটার সময় ললিত মোটর নিয়ে এসে হাজির ; বল্‌ল—"তোমাদের সব তৈরী তো ? একেবারে বরাবর যশোরপুরে যাব।"

আমরা তারই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম ; বিনা বাক্য-ব্যয়ে মোটরে গিয়ে বসলাম ; মোটরও চল্‌তে সুরু কর্‌ল।

প্রায় মন্মথবাবুর বাড়ীর সাম্‌নে মোটর ছেড়ে দিলুম। বাকী পথটা আমাদের হেঁটে যেতে হবে। ছোট দোতলা বাড়ীটি, চারিপাশে বাগান, আশেপাশের ছাওয়া ঘরগুলোর উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একজন চাকরকে ডেকে মোটরখানা তার জিম্মা ক'রে দিলাম। দীপক হঠাৎ তাকে সুবোধ আর মন্মথবাবুর দু'জোড়া জুতো নিয়ে আস্‌তে বল্‌ল ; জুতো দু'জোড়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দীপক খুব চিন্তিতভাবে আমাদের সঙ্গে অগ্রসর হ'ল।

আমরা বেড়াতে বেড়াতে কিছুক্ষণ পরেই বনের ধারে যেখানে মন্মথবাবু খুন হয়েছিলেন, সেখানে এসে পড়্‌লাম। বনের চেয়ে সেটাকে একটা শুক্‌নো জলা বল্‌লেই ভাল হয়। চারিদিকে এক হাঁটু কাদা ; তার মধ্য দিয়ে একটা পথ চলে গেছে জলার ওপারে। পথের দু'পাশে মাথাসমান নলখাগড়া ; মাঝে মাঝে দু'-পাঁচটা বড় বড় গাছও আছে। পথটার দিকে নির্দ্দেশ করে দীপক ললিতকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"এ পথটা জলার ওধারে কত দূর গেছে ?"

—"সুরেশবাবুর বাগান পর্য্যন্ত।"

—"এখান থেকে সুরেশবাবুর বাগান কতদূর ?"

—"প্রায় দু' মাইল।"

আর কোন কথা না বলে' দীপক পকেট থেকে লেন্সখানা বার ক'রে চারিদিক বেশ ভাল ক'রে লক্ষ্য কর্‌তে সুরু ক'রে দিলে। তারপর আমাদের দেখিয়ে বল্‌লে—"এই যে পায়ের দাগগুলো দেখ্‌ছ,—এগুলো মন্মথবাবুর মৃত্যুতে যারা সুবোধকে সাহায্য কর্‌তে এসেছিল, তাদের পায়ের দাগ। ওই দিক্ থেকে ওই যে তিন জোড়া জুতোর দাগ দেখ্‌ছ, ও সুবোধের জুতো। প্রথমে বাপের শিষ্ শুনে সে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এসেছিল, তাই জুতোর 'হিলে'র দাগটা খুব স্পষ্ট হয়ে পড়েছে ; তারপর মন্মথবাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ধীরে ধীরে সে ফিরে গেছে—তাই এই জুতোর দাগ পড়েছে খুব অস্পষ্ট ; তারপর তার জুতোর অগ্রভাগের দাগ জমীর উপর খুব স্পষ্ট ভাবে পড়েছে—সে যে পিতার আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে এসেছিল, এ সেই সময়কার জুতোর দাগ। তারপর এই দেখ মন্মথবাবুর জুতোর দাগ ; তিনি এখানে দু'-তিনবার পদচারণা করেছেন। তারপর, তারপর, এই দেখ আর একজোড়া জুতোর দাগ—একই জুতোর দাগ দুবার! প্রথম বার এসে ফিরে গেছে ; তারপর আবার এসেছে—যে জামাটা ফেলে গেছ্‌ল, সেখানা নিতে নিশ্চয়ই। এখন এই পায়ের দাগটা অনুসরণ কর্‌লেই আসল অপরাধী খুঁজে পেতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না।" বলে' দীপক সেই পদচিহ্ন ধরে জলার পথ দিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। সেখানে যা' কিছু তার চোখে পড়্‌ল, তাই সে ভাল ক'রে পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ পথের উপর একটা বড় পাথর দেখে সেটাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে দীপক আবার অগ্রসর হ'ল।

মিনিট পনেরর মধ্যেই সেই পদচিহ্ন ধরে'

আমরা জলার শেষে একটা প্রশস্ত চওড়া রাস্তায় এসে পড়্‌লাম—সেখানে আর পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। ডানদিকের পথের অদূরে একটা বাগানের মাঝে একটা বড় হল্‌দে রংয়ের বাড়ী দেখা যাচ্ছিল; সেদিকে তাকিয়ে দীপক জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"ললিত, এ বাড়ীটাই বুঝি সুরেশবাবুদের ?"

ললিত উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

—"যাক্, আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে; এবার আমরা ফিরে যাই।"

তারপর আমরা সেই জলার মধ্য দিয়েই মন্মথবাবুর বাড়ীতে ফিরে এলাম। সেখান থেকে মোটর নিয়ে আমরা হোটেলে ফির্‌লাম।

আহারাদির পর দীপক বল্‌ল—"ওই যে পাথরখানা পথের উপর পড়েছিল দেখ্‌লে ললিত, ওইটে দিয়েই মন্মথবাবুকে আঘাত করা হয়েছিল।"

—"কি করে বুঝ্‌লে ?"

—"পাথরটা বেশীদিন ওখানে পড়ে থাক্‌লে নরম মাটিতে গেঁথে যেত; ওর তলায় তা' হ'লে কি ঘাস জন্মাতো ? খুনী পালাবার সময় পাথরখানা ওখানে ফেলে রেখে চলে গেছে। খুনী লোকটা ডান হাতের পরিবর্ত্তে বাঁ হাত ব্যবহারেই বিশেষ অভ্যস্ত—ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাতে তার জোর বেশী। ডান পায়ে খুঁড়িয়ে চলে, গায়ে একটা খাকী রংয়ের জামা ছিল, আর সিগার খেতে সে খুব ভালবাসে।"

দীপকের কথা শুনে ললিত হেসে উঠ্‌ল; বল্‌ল—"ব্যাপারটা বেশ জমিয়ে তুলেছ দেখ্‌ছি। তুমি তুমি কি মনে কর, এই কথাগুলো শুনেই জজ আসামীকে ছেড়ে দেবে ?"

—"আমার কথায় তোমার যদি অবিশ্বাস হয়, তুমি তোমার নিজের মতে কাজ ক'রে যাও, আমি কিন্তু আমার মতেই চল্‌ব।" শান্তস্বরে দীপক এই কথাগুলা বল্‌ল।

ললিত বিদায় নেবার পর দীপক চিন্তিতভাবে আমাকে বল্‌ল—"আমার ধারণা সম্বন্ধে এখন তোমাকে কতকগুলো কথা বল্‌ব, সেগুলো মন দিয়ে শোন। মন্মথবাবু শিষ দিয়ে আর যাকে ডাকুন, তাঁর ছেলেকে ডাকেন নি নিশ্চয়; কেন না, তিনি তখন জানতেন যে, সুবোধ কোলকাতায় আছে। আর কারুর সঙ্গে জলার ধারে তাঁর দেখা কর্‌বার কথা ছিল। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর খুব পুরানো বন্ধু; কেন না, নতুন কোন লোকের সঙ্গে তিনি এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্‌তেন না, যাতে তাকে শিষ্ দিয়ে ডাকা চলে। তা' হ'লে এই বুঝ্‌তে হবে, বন্ধুটির সঙ্গে তাঁর কোচিনেই আলাপ হয়েছে।"

—"বেশ তা' হ'লে ওই 'পালক' কথাটার মানে কি ?"

দীপক পকেট থেকে একখানা মানচিত্র বার ক'রে টেবিলের উপর খুলে রেখে বল্‌ল—"এই দেখ, এখানা মাদ্রাজের ম্যাপ; কাল রাত্রে ফেরবার সময় হাওড়া থেকে কিনে এনেছি।" তারপর তর্জ্জনী দিয়ে ম্যাপের একটা অংশ নির্দ্দেশ ক'রে বল্‌ল—"এটা কি পড় দেখি ?"

—"পালক।"

—"হ্যাঁ, তারপর।" বলে সে তর্জ্জনীটা সরিয়ে নিতে দেখ্‌লাম—'পালক্-কাট্' (Pallak kat)

—"হ্যাঁ, এই কথাটাই মৃত্যুর পূর্ব্বে মন্মথবাবু বলেছিলেন যে,—পালক-কাটের লোকই তাঁকে খুন করেছে—কিন্তু সুবোধ তা' বুঝ্‌তে পারে নি।"

—"আশ্চর্য্য !"

—"এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। যে খুন করেছে, সে আগে পালক-কাট সহরেই থাক্‌ত মনে হয়।"

—"কিন্তু সে এখন এখানেই থাকে—কেন না খুন করেই তাড়াতাড় তাকে সরে পড়্‌তে হয়েছে। সরে পড়্‌বার দুটো মাত্র পথ আছে—একটা হরিরামপুরে এসে পড়েছে,—আর একটা যশোরপুরে গেছে। নিশ্চয়ই সে ধরা

পড়্বার ভয়ে হরিরামপুরে ফেরে নি; সুতরাং সে মশোরপুরের দিকেই গেছে,—খুব সম্ভব সেখানেই সে থাকে।"

—"আচ্ছা,তুমি কি ক'রে জান্লে সে খুঁড়িয়ে চলে?"

—"তা'র বাঁ পায়ের জুতোর দাগ মাটিতে যত গভীর হয়ে পড়েছে, ডানপায়ের জুতোর দাগ তত গভীর নয়; তা'তেই বোঝা গেল, তার ডান পা খোঁড়া।"

—"আচ্ছা, বাঁ হাতে তার জোর বেশী কেমন করে বুঝ্লে?"

—"বুঝ্লুম এই দেখে যে,—পশ্চাৎ দিক্ থেকে আঘাতটা মন্মথবাবুর মাথার বাঁ দিক্কার পিছনের খুলীখানাকে চূর্ণ করে দিয়েছে, ঠিক মাথার মাঝখানে লাগে নি। তারপর সে সিগার খেতে খুব ভালবাসে; দেখ্লুম, সেখানে দাঁড়িয়ে যখন সুযোগের অপেক্ষা করছিল, সেই সময়টুকুর মধ্যে সে তিনটি সিগার খেয়েছে—তার টুকরোগুলো সেখানে পড়ে আছে আর তার গায়ে খাকী রংয়ের একটা জামা ছিল; তাড়াতাড়ি পালাবার সময় পথের দুটো কাঁটা গাছে কতকগুলো খাকী রংয়ের সুতো আটকে ছিল।

সুরেশ চাটুর্য্যে নামে এক ভদ্রলোক আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান—হোটেলের চাকর এসে বল্ল।

"বেশ তাকে নিয়ে এস।" দীপক বল্ল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই এক ভদ্রলোক অল্প খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছেন; কিন্তু তাঁর পেশীবহুল হাত দুখানা, আর চল্বার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল, তখনও তাঁর দেহে একজন বলিষ্ঠ যুবকের মত শক্তি ও সামর্থ্য আছে। তাঁর চোখ দুটোতে বুদ্ধিমত্তা আর গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তবে কিন্তু তাঁর ফ্যাকাশে মুখ ভাল ক'রে খানার পানে তাকালেই বোঝা যায়, কিছুদিন হতে তিনি কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগ্ছেন।

"নমস্কার সুরেশ বাবু।"

"নমস্কার।"

"অনুগ্রহ করে এই চেয়ারখানায় বসুন"—বলে' দীপক সুরেশবাবুর দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল। বল্ল—"আমার চিঠি তা হ'লে আপনি পেয়েছেন?"

—"হ্যাঁ; কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার মত গোয়েন্দার কি যে দরকার থাকতে পারে তা' ত বুঝি না।"—বলে' ভীতিব্যাকুল দৃষ্টিতে দীপকের পানে তিনি চেয়ে রইলেন।

—"আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি ত নিজেই জানেন। মন্মথবাবুর খুন সম্বন্ধে আমি এখানে তদন্ত করতে এসেছি।"

দীপকের কথায় বৃদ্ধ দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্ত্তনাদ করে উঠ্লেন—"ওঃ,ভগবান!"তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্ল—"কিন্তু ছেলেটা অমন বিপদে পড়্বে জামুলে আমি ও কাজ কর্তুম না—যদি তার ফাঁসীর হুকুম হয়, তা' হ'লে আমি সব কথাই স্বীকার কর্ব।"

—"আপনার কথা শুনে সুখী হলুম"—দীপক বল্ল।"

—"আহা, সুবোধকে আমি নিজের ছেলের মত দেখি! ওর বিপদ দেখে এর আগেই আমি সব কোর্টে জানাবো ঠিক্ করেছিলুম। কিন্তু পারি নি এই ভেবে,—আমি গ্রেপ্তার হ'লে মেয়েটা তখুনি আত্মহত্যা কর্বে।"

—"আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে না।"

—"সত্যি!"

—"আমি ত পুলিশ কর্ম্মচারী নই—আমি সখের গোয়েন্দা। আপনাকে কোনরূপ বিপদে ফেল্বার ইচ্ছা আমার নেই, তবে আমি চাই,—নির্দ্দোষ সুবোধ যেন মুক্তি পায়।"

—"মৃত্যু তো আমার মাথার কাছে এগিয়েছে।

বহুদিন থেকে বহুমূত্র রোগে আমি ভুগছি; ডাক্তার বলেছে, হয় ত আর এক মাসও আমি বাঁচব না। তাই জীবনের শেষ দিন ক'টা আর কয়েদখানার মধ্যে কাটাবার আগ্রহ আমার নেই।"

টেবিলের উপর নোট বুকখানা খুলে ফাউনটেন পেনটা হাতে নিয়ে দীপক বল্ল—"বেশ তা' হ'লে সত্যঘটনাগুলো আপনি বলে যান, আমি লিখে নি; শেষে একটা সই করে দেবেন। আমার বন্ধু এই অনিল দত্ত সাক্ষী থাকবে। বিচারের শেষদিন যদি দেখি বেচারার ফাঁসী অনিবার্য্য, তা' হ'লে এই স্বীকারোক্তিখানা আমরা কোর্টে দাখিল কর্‌ব।"

"—ততদিন আমি বেঁচে থাক্‌ব কি না সন্দেহ। তবে এসব কথা মেয়েটা না জান্‌তে পার্‌লেই হ'ল। যাক্; এখন শোন—

'মন্মথবাবুকে যতটা ভাল লোক বলে' তুমি ভেবেছ, আসলে সে সেরকম লোক ছিল না—তার মত শয়তান আমি খুব কমই দেখেছি। আমায় মুঠোর মধ্যে পেয়ে বাইশ বছর ধরে' সে আমায় শোষণ করেছে। কেমন ক'রে তার কবলে আমি গিয়ে পড়ি, সেই কথাটাই তোমাদের আগে বল্‌ব—শোন।

'আমি বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে ছিলুম। আমার জন্মাবার পরই মা মারা যান; বাবার আদর-যত্নেই আমি মানুষ হয়ে উঠি। আমার বয়স যখন কুড়ি, তখন বাবা মারা যান; তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব আমিই উত্তরাধিকারসূত্রে পাই। অত কম বয়সে হাতে টাকা পড়্‌লে আর সকলের যা' হয়, আমারও তাই হ'ল। অসৎ সংসর্গে পড়ে, স্ফূর্ত্তি ক'রে, বাবা যা' রেখে গিয়েছিলেন, তিনদিনেই তা' উড়িয়ে দিলুম। তখন অর্থসংগ্রহের আর কোন উপায় না দেখে আমরা ডাকাতি কর্‌তে কোচিনে গিয়ে পড়ি। সেখানে দলে ভিড়ে ডাকাতি সুরু ক'রে দিলাম। চলন্ত ট্রেণে, জমিদারী সেরেস্তায়, কখনো বা বড় বড় মাড়োয়ারী কুঠিতে ডাকাতি ক'রে আমাদের দিন বেশ স্বচ্ছন্দভাবে চলে' যাচ্ছিল। দলে আমরা ছিলাম ছ'জন; ক্রমে আমি সর্দ্দার হই। কোচিনে, পালককাটে এখনও চাটুর্য্যে-সর্দ্দারের দল বল্‌লে লোকে ভয় পায়।

'সেদিন জমীদারদের খাজনা সদরে জমা হ'তে যাবে—এই খবর পেয়ে পথের দু'পাশের জঙ্গলে আমরা লুকিয়েছিলুম। ছ'জন পাইকের সঙ্গে নায়েব যখন ষ্টেশনে যাচ্ছিল, তখন প্রথম গুলিতেই চারজনকে আমরা ধরাশায়ী কর্‌লুম; কিন্তু নায়েবকে পাক্‌ড়াবার আগেই তারা আমাদের তিনজনকে গুলি ক'রে মার্‌ল। পরের বারেই আমরা বাকী দু'জন পাইককে শেষ ক'রে দিয়ে নায়েবকে সেই মুহূর্ত্তে গুলি ক'রে মার্‌ব বলে' ভয় দেখিয়ে তার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলুম। হায়, হায়, তখন যদি আমি তা'কে গুলি করে মার্‌তুম, তা' হ'লে আজ আমাকে এমনভাবে খুনের দায়ে পড়্‌তে হ'ত না! পরদিন টাকাগুলো ভাগ ক'রে নিয়ে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা বাংলাদেশে পালিয়ে এলুম। কিছুদিন পরে সঙ্গীরা তা'দের দেশে চলে গেল; আর আমি এই জমিদারীটা নিলাম হচ্ছে দেখে কিনে নিয়ে এখানে ভদ্রভাবে বসবাস কর্‌তে সুরু করে দিলুম। তার অল্পদিন পরেই আমি বিবাহ করি; দীপ্তি জন্মাবার পরই আমার স্ত্রী মারা যান।

'বেশ শান্তিতে জীবন কেটে যাচ্ছিল। একদিন কোলকাতায় কতকগুলো জিনিষপত্র কিন্‌তে গেছি, হঠাৎ হ্যারিসন রোডের মোড়ে মন্মথর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল—ছেঁড়া জামা গায়ে, শুধু পায়ে ভিখিরীর মত সে পথ দিয়ে চলে' যাচ্ছিল। আমায় দেখে সাম্‌নে এসে বল্‌ল—'কি হে চাটুর্য্যে, চিন্‌তে পার? ছেলেটাকে নিয়ে বড় কষ্টে পড়েছি, তোমার বাড়ীতে কিছুদিন থেকে আসিগে চল। আর তা'তে যদি কোন

আপত্তি থাকে, তা' হ'লে মনে রাখ্‌বে এটা কোলকাতা—এখানে পুলিসের অভাব নেই।'

'সেই যে তারা এসে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ কর্‌তে সুরু করে দিলে,—তাদের হাত থেকে আমি আর কিছুতেই নিস্তার পেলুম না। তারপর মন্মথ সেদিন বলে বস্‌ল,—আমার মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দিতে হবে। কি সুন্দর কথা!—আমার সমস্ত বিষয় তা' হ'লে তার ছেলেই ভোগ কর্‌বে! কিন্তু আমি তার প্রস্তাবে মত দিলুম না। সে আমাকে ভয় দেখালে,—আমার মেয়ের কাছে সব কথা বলে' দেবে। আমি আর কোন উপায় না দেখে তাকে খুন কর্‌বার জন্য তৈরী হলুম। জীবনে ত অনেক খুনই করেছি, না হয় আর একটা খুন কর্‌ব।

'সেদিন তার সঙ্গে জলার ধারে দেখা কর্‌বার কথা ছিল। অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমি সেখানে তৈরী হয়ে লুকিয়েছিলুম। কিন্তু মন্মথ ছেলেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে দেখে আমি একটা গাছের আড়ালে বসে গোটা তিনেক চুরুট খেয়ে নিলুম। কিছুক্ষণ পরে সুবোধ চলে গেলে, একখানা বড় পাথর দিয়ে মন্মথকে ধরাশায়ী কর্‌লুম। তারপর তার আর্ত্তনাদ শুনে তার ছেলে ছুটে আস্‌ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়্‌লুম'।"

এই পর্য্যন্ত বলেই সুরেশবাবু চুপ কর্‌লেন।

দীপকও লেখা শেষ ক'রে নোট বুকে সুরেশবাবুর আর আমার স্বাক্ষর করিয়ে নিলে। তারপর বল্‌ল—"আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই; দণ্ডাদেশের পূর্ব্বে এ স্বীকারোক্তি কেউ জান্‌বে না। আপনার রোগের কথায় আমার মনে হয়,—শীগ্‌গিরই কোলকাতার আদালতের চেয়ে ঢের বড় আদালত থেকে আপনার ডাক আস্‌বে—আপনার পাপের জবাবদিহি কর্‌বার জন্য।"

—"আমারও তাই মনে হয়।" বৃদ্ধ বল্‌ল।

—"এই স্বীকারোক্তিখানাই সুবোধের মুক্তি পাবার পক্ষে যথেষ্ট।" দীপক বল্‌ল।

"কিন্তু বাবা, মেয়েটার কাণে যেন একথা না ওঠে।"

—"আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই; সুবোধ মুক্তিলাভ কর্‌লেও সে নিজেই জান্‌বে না কেন সে মুক্তি পেল—আর খবরের কাগজে কস্মিনকালেও এ কথা ছাপা হবে না।"

—"ভগবান তোমাদের সুখী করুন! তোমাদের জীবন শান্তিময় হোক্ তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা!" বলে' সুরেশবাবু ধীরে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা চুপ ক'রে বসে' রইলাম। তারপর দীপক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল—"ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা! কি ছিনিমিনি খেলাই মানুষগুলোকে নিয়ে সে খেলে!"

বিচারে সুবোধ মুক্তি পেল। দীপক তার স্বপক্ষে এতগুলো প্রমাণ সংগ্রহ করেছিল যে, কেস ডিস্‌মিস্ হয়ে গেল।

দীপকের মুক্তিলাভের পরও বৃদ্ধ সুরেশবাবু সাত মাস জীবিত ছিলেন।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। এখন দীপ্তিকে বিয়ে ক'রে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুবোধ সুখে কালাতিপাত কর্‌ছে। *

---

* ইংরাজী গল্প অবলম্বনে

—উমাপতি—

শ্রীমতী কিরণবালা দেবী সরস্বতী

এক

কালীগঞ্জ ষ্টীমার যখন গোয়ালন্দ ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন ঢাকা মেল প্রায় ছাড়ে ছাড়ে।

হঠাৎ ষ্টীমারখানি চড়ায় ঠেকিয়া যাওয়ায় এই বিলম্ব। ঘড়ির দিকে চাহিয়া ট্রেণ ধরিবার আশায় নিরাশ হইয়া আজিকার রাত্রি যে ষ্টীমারেই কাটাইতে হইবে, ইহারই জল্পনা-কল্পনা যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই করিতেছিলেন। ইহার মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে বালক-বালিকা, ও মালপত্র বেশী, তাঁহারা রাত্রি-যাপনের জন্য বিছানা-পত্র বিছাইয়া শয়নের ব্যবস্থাও করিতেছিলেন। তবে বেশীভাগ লোকই ট্রেণ ধরিবার আশায় ষ্টীমার ঘাটে ভিড়িবার পূর্ব্বেই, মালপত্র-সহ নীচের তলায় গিয়া ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ষ্টীমার ঘাটে ভিড়িবামাত্র কুলির ও যাত্রিগণের চীৎকার, হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি—কে কাহার আগে গিয়া ট্রেণ ধরিবে।

একে অল্প মিনিট কয়েক সময় মাত্র হাতে, তাহার উপর ষ্টীমার ঘাট হইতে ষ্টেশন কতকটা যাইতে হয়; পথেও ভীষণ অন্ধকার। অল্প জনকতক যাত্রী যাঁহাদের সঙ্গে অচল এবং সচল মাল ছিল না, তাঁহারাই শুধু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া কোনরকমে ট্রেণ ধরিলেন।

ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একটী ভদ্রলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া উঠিলেন—"সুবি, সুবি, আমি গাড়ীতে উঠ্‌তে পার্‌লাম না; শীগ্‌গির নেমে পড়।" ভদ্রলোকের মুখের কথা চলন্ত ট্রেণের শব্দে সম্পূর্ণ শ্রুতিগোচর না হইলেও ব্যাপার বুঝিতে সুবির বিলম্ব হইল না। সুবিকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া ভদ্রলোকটী দেখেন জিনিসপত্র-সহ কুলি তাঁর পিছনে আসিতে আসিতে হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি 'কুলি, কুলি' বলিয়া ডাকিবার সঙ্গে-সঙ্গেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে।

রাত্রিকাল। তাহাতে যেরকম সময় পড়িয়াছে, নিজের সঙ্গে এক গাড়ীতে যাওয়া নিরাপদ মনে করিয়া ভদ্রলোকটী সুবিকে পুরুষের কামরায় তুলিয়া দিয়াছিলেন।

সুবির বয়স চোদ্দ কি পনের, পাতলা ছিপ্‌ছিপে এক হারা চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি বড় সুন্দর—একবার দেখিলে পুনর্ব্বার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। একখানি কাল চওড়া পাড়ের শাড়ী মান্দ্রাজী ফ্যাসানে পরা, গায়ে একটী পাতলা ব্লাউজ, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে সরু সরু দু'গাছি তারের বালা ও কাপড়-আটকান একটী প্লেন ব্রুচ ছাড়া অন্য অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না। মাথায় কাপড় নাই বলিয়া মনে হয় মেয়েটী এখনও অবিবাহিতা।

গাড়ীতে সুবি একেবারে একা। স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ সে বেঞ্চের কোণ ঘেঁসিয়া জড়সড়-ভাবে বসিয়াছিল। সে গাড়ীতে পুরুষ-যাত্রীর মধ্যে একটী চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক ছাড়া অন্য কেহ ছিল না।

ব্যাপার বুঝিতেও সুবির মিনিট কয়েক বিলম্ব হইয়াছিল; কিন্তু আপনার অসহায় অবস্থা বুঝিবামাত্র একটা অব্যক্ত অস্ফুট আর্ত্তনাদের

সহিত সে সেই গতিশীল ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য গাড়ীর দরজার হাতল ঘুরাইতেই তাহার সম্মুখের বেঞ্চে উপবিষ্ট যুবকটী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"কি করেন ? মারা পড়্বেন যে !"

বাস্তবিক পক্ষে ট্রেণের গতি তখন বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা কাণে না তুলিয়া ঝড়ের বেগে সুবি ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িল। "সর্ব্বনাশ! কি করেন, কি করেন" বলিতে বলিতে সেই যুবকটীও পলক মধ্যে সেই গভীর নিশীথের কৃষ্ণ যবনিকা তলে, বনানীবেষ্টিত স্তব্ধ প্রান্তরের বুকে চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িল। বিপদ-জ্ঞাপক শিকলটী টানিয়া গাড়ী থামাইবার কথাও তাহার মনে হইল না।

দুই

চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িবার দরুণ তেমন গুরুতর আঘাত না লাগিলেও অল্পবিস্তর আঘাত উমাপতির যে না লাগিয়াছিল, এমন নয়। টাল সামলাইয়াই উমাপতি সুবির খোঁজ করিল—কিন্তু কোথায় সুবি ? গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে উমাপতির যেটুকু সময় বিলম্ব হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে তাহাদের উভয়ের ব্যবধানের দূরত্বও হইয়াছিল অনেকখানি। সে কামরায় অন্য যাত্রী কেহ থাকিলে হয় ত শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইলে লোকজন, আলোক, আশ্রয় সবই মিলিত ; এখন এই বিরাট অন্ধকার স্তূপের মধ্যে কেমন করিয়াই বা সে সুবির খোঁজ করিবে, আর এই জনহীন প্রান্তরের বুকে এই দীর্ঘ রাত্রিই বা কাটাইবে কেমন করিয়া ? তথাপি আশায়-নিরাশায় লাইনের ধার বাহিয়া সে অগ্রসর হইল। কিছুদূর যাইতেই দেখিল,—লাইনের বাহিরে মৃতের মত কি একটা পড়িয়া আছে। নিকটে গিয়া দেখিল,—সুবিই বটে !

মেয়েটী মাথায় চোট পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ভয়েই সে প্রায় আধমরার মত হইয়াছিল। উমাপতিকে তাহার নিকটে আসিতে দেখিয়া সুবির বিবর্ণ মুখখানি আতঙ্কে একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল, এবং একটা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই ত্বরিতপদে উঠিয়া বসিল। উমাপতির মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আপনি যদি আমার কাছ থেকে সরে না যান,"—কথাটা শেষ করিল না—কিন্তু তীব্রদৃষ্টিতে রেলের লাইনের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনের কথা উমাপতির নিকট স্পষ্ট হইয়া গেল ; সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ছিঃ! কি ছেলেমানুষি করেন! কি বিপদে পড়েছেন ভেবে দেখুন দেখি একবার! দেরী কর্‌বেন না, আসুন আমার সঙ্গে।"

মেয়েটী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উমাপতির মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি তাহার অন্তরের সমস্ত কথা জানিয়া লইল ; তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল।

তিন

সুবিকে সঙ্গে করিয়া উমাপতি যখন গোয়ালন্দে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও সুবির ভগ্নীপতির সন্ধান করিতে না পারিয়া সুবিকে লইয়া এখন কি করা যায় ভাবিয়া উমাপতি চিন্তিত হইয়া পড়িল।

মাসখানেক পূর্ব্বে সুবি তার ভগ্নীর গৃহে গিয়াছিল ; ভগ্নীপতি তাহাকে তাহার পিত্রালয় নয়নপুরে পৌঁছাইতে যাইতেছিলেন। ভগ্নীর বাড়ী যাইতে হইলে এখনই উজান ষ্টীমারে উঠিতে হয় ; উমাপতি সুবিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ভগ্নীর বাড়ী যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার পিত্রালয় নয়নপুরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য উমাপতির অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিল।

সুবির ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া উমাপতি বলিল—"গাড়ীর তো এখন অনেক দেরী। একটা

ভাল হোটেলে গিয়ে চলুন ততক্ষণ স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম ক'রে নেওয়া যাক্ ।"

যাত্রীদিগের বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থান গোয়ালন্দে নাই। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্র-ঝলসিত অনাবৃত রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে শত চক্ষুর দর্শনীয় হইয়া বসিয়া থাকিতে উভয়েই দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই সুবিও এ প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

চার

পরদিন কুষ্টিয়া ষ্টেশন হইতে নৌকা করিয়া নয়নপুর পৌঁছিতে জ্যৈষ্ঠের দীর্ঘ দিবাও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। নদী হইতে পুনরায় গরুর গাড়ীতে দুই মাইল পথ চলিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় তাহারা একখানি মেটে খড়োবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। অন্য সময় হইলে, অর্থাৎ, এই দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া উমাপতির সঙ্গে না আসিয়া ভগ্নীপতির সঙ্গে আসিলে, আনন্দোন্মত্তা বালিকা এই বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিবামাত্রই এতক্ষণ ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইত। আজ বাড়ীর দিকে গোযানখানি যতই অগ্রসর হইতেছিল, ততই তার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল; দ্রুত বক্ষস্পন্দনের সহিত হাত-পা একেবারে অসাড় নিস্পন্দ—নড়িবার শক্তিও যেন নাই!

গাড়ী থামিলে তার এই নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া উমাপতি বলিল—"সুমুখের এই বাড়ীই ত আপনাদের ?"

সুবি মাথা হেলাইয়া জানাইল—"হাঁ, এই তাহাদের বাড়ী।"

উমাপতি বলিল— "তা' হ'লে আপনি নেমে বাড়ীর ভেতর যান; আমি এই গাড়ীতেই ফিরে যাই।"

সুবি তেমনি ম্লান মুখখানি নত করিয়া বসিয়া রহিল; কোন উত্তর দিল না। বিস্মিত উমাপতি একটু নীরব থাকিয়া বলিল—"আমি নেমে বাড়ীর কাউকে ডেকে দেব কি ?"

সুবি অশ্রুপূর্ণ নয়নের কাতর চাহনিটুকু উমাপতির মুখের উপর স্থির করিয়া জড়িতস্বরে বলিল—"বাড়ী ঢুক্‌তে আমার কেমন যেন বড্ড ভয় কর্‌ছে—"

"এই কথা ; আসুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

উমাপতি সুবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় কয়েকটী বালক-বালিকা সুবিকে ঘিরিয়া উল্লাসভরে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল —"ও মা, দিদি এসেছে।"

সুবির ভগ্নীপতি রাজবাড়ী ষ্টেশন-মাষ্টারের নামে গোয়ালন্দ হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন,—ট্রেণ পৌঁছিলে তাঁহারা যেন সুবিকে নামাইয়া লন। পরের ট্রেণে সেখানে পৌঁছিয়া তিনি জানিতে পারেন, সুবি নামে কোন মেয়ে সে ট্রেণে ছিল না। ভদ্রলোক নিরুপায় হইয়া সুবির পিতাকে সকল সংবাদ সঙ্ক্ষেপে জানাইয়া টেলিগ্রাম করেন। টেলিগ্রামখানি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সুবির পিতা জগমোহন ভট্টাচার্য্য এই দুঃসংবাদে এমনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, উপস্থিত কি করা উচিত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। বয়স্থা মেয়ে একা পথে !—কোথায় গেল সে ?

সুবির মা সুবিকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া আত্মহারার মত ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"বের ক'রে দাও, বের ক'রে দাও, এখুনি ঘাড় ধরে' বাড়ী থেকে বের ক'রে দাও ওকে—" বলিতে বলিতে জগমোহন ঘরের দাওয়া হইতে লাফাইয়া উন্মাদের মত সুবি ও তাহার মায়ের কাছে আসিয়া তাহাদের মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। পিতার এই ক্রোধোন্মত্ত

রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সুবির ম্লান মুখখানি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল - তার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উমাপতি একেবারে বাড়ীর ভিতর না গেলেও সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে সকল ব্যাপারই তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। দেখিয়া-শুনিয়া উমাপতি একেবারে নির্ব্বাক! এতক্ষণ যাই-যাই করিয়াও সুবির এই সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় যাইতে পারিতেছিল না। এদিকে সুবির পিতার কর্কশ চীৎকারে, পাড়া-প্রতিবাসীবর্গের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষে ও তাঁহাদের নির্লজ্জ অবান্তর প্রশ্নে, নিরপরাধা বালিকার এই দারুণ বিব্রত অবস্থায় উমাপতির করুণ হৃদয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভিতরে আসিয়া বিনয়পূর্ণ-স্বরে বলিল—"শুনুন আপনারা, আপনারা যা' ভেবে এই নিরপরাধ মেয়েটীকে কষ্ট দিচ্ছেন, তা' ঠিক্ নয়। ইনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমায় ভদ্রসন্তান বলেই জান্‌বেন। আপনার মেয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।" পরে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সঙ্ক্ষেপে বিবৃত করিয়া উমাপতি বলিল "এর মধ্যে দূষণীয় ত কিছু নেই—"

মুখ খিচাইয়া জগমোহন বলিয়া উঠিলেন—"বাপু হে, সে যেন আমি বুঝ্‌লাম, অন্যে বুঝ্‌বে কেন? একে বয়স্থা মেয়ে; তয় দু'দিন বাদে তার বিয়ে দিতে হবে। একথা তখন তো আর গোপন থাক্‌বে না। কে ওই মেয়েকে গ্রহণ কর্‌বে? এই তুমি যে মুরুব্বিয়ানাচালে এত বক্তিমে কর্‌ছ, তোমাকেই যদি ধরে' পড়ি, তুমিই কি ওকে নিতে চাইবে?"

দারুণ উত্তেজনায় বৃদ্ধ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং পুনরায় গর্জ্জিয়া স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হয় মেয়ের গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে মার, নয় যে ওকে সঙ্গে ক'রে এনেছে, তার সঙ্গী ক'রে দাও।"

উমাপতির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে ধীর কণ্ঠে বলিল—"তা'তে আমি মোটেই অসম্মত নই। যদি বিনা অপরাধে এত বড় সাজা ওঁকে নিতেই হয়, আমায় জানাবেন,—শেষ পর্য্যন্ত ওঁর বোঝা আমার ভারি হবে না।" বলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পাঁচ

তারপর বছরখানেক কাটিয়া গিয়াছে—আজও সেদিনের স্মৃতি উমাপতির মনে দোল দিয়া যায়। সুবির ব্যথাতুর পাণ্ডুর মুখখানির কথা ভুলিতে সে চেষ্টা খুবই করে, কিন্তু পারে না তাই পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়া যখন সে শুনিল—তাহার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে; তাহাকে জিজ্ঞাসামাত্র না করিয়া মা বিবাহ-সম্বন্ধ একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন - তখন মায়ের উপর অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। সে তখনকার মত তাঁহাকে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না; সে স্পষ্টই জানাইয়া দিল—এ বিবাহ সে করিতে পারিবে না; অন্যত্র সে কথা দিয়াছে।

সুলোচনা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। একটু থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"দোসরা অঘ্রাণে বিয়ে ঠিক ক'রে দাদা চিঠি লিখেছেন। মেয়েও তিনি নিজে দেখে পছন্দ ক'রে তবে তাঁদের পাকা কথা দিয়েছেন। গরীবের মেয়ে; একটী পয়সা নগদ দেবার শক্তি নেই। তাঁরা যা দু'-এক-খানা গহনা ইচ্ছে ক'রে দেবেন তাই। দাদার আগ্রহ তেমন ছিল না; মেয়েটী দেখেই কিন্তু তাঁর কেমন মমতা পড়ে গেছে। না না 'ক'রে মেয়েও ত কম দেখা হ'ল না; এমন সুশ্রী কমনীয় মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না।"

চটি জুতার অগ্রভাগে উঠানের মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে উমাপতি বলিল—"তুমি মামাকে লিখে দাও মা, এ বিয়ে আমি কর্‌তে পার্‌ব না।

এখনও সময় আছে; তাঁরা অন্যত্র মেয়ের সম্বন্ধ অনায়াসেই ঠিক ক'রে নিতে পার্‌বেন।"

সুলোচনা জ্বলিয়া উঠিলেন; তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—"লিখ্‌তে হয়, তুমিই লিখে দাও। আমি পার্‌ব না। তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। উমাপতি মাথা হেঁট করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে জাগিতেছিল,—সেই দুর্দ্দিনের চিত্র! সুবির করুণ কোমল মুখখানি! তার আত্মনির্ভরশীল কাতর চাহনিটুকু! কিন্তু·········

ছয়

যদিও বেলা দুইটার পূর্ব্বে ডাউন ষ্টীমার আসে না, মাল বোঝাই ইত্যাদিতে তিনটার পূর্ব্বে ছাড়ে না, এবং ষ্টীমার-ঘাট হইতে তাহাদের বাড়ীও অধিক দূর নহে, তবুও সুলোচনা বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল গুছাইয়া বেলা বারটার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—ভয়, পাছে ষ্টীমার ছাড়িয়া যায়।

সেদিন হইতে মাতা ও পুত্র এই দু'টি অতি নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে যেন কেমন একটা অসন্তোষের ভাব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া উমাপতি এ বিবাহে সম্মতি দিয়াছে।

ইহার পর সে এ বিবাহ-সম্বন্ধে মুখে আপত্তি-সূচক আর কোন কথাই বলে নাই সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরের বেদনা মুখে এমনি ক্লিষ্টতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল যে, সুলোচনার মাতৃহৃদয়কেও ক্ষণে ক্ষণে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার কেবলি মনে হইতেছিল,—পুত্রের অমতে বিবাহ দিয়া তাহার দাম্পত্য-জীবনের সুখ-সৌভাগ্যের উপর একটা অশান্তির বোঝা চাপাইতে যাইতেছেন। নৌকার মধ্যে সকলেই নীরব। কেবল নদীর তরঙ্গ ভঙ্গের সহিত কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দ। এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুত্রের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সুলোচনা বলিলেন,—"নেমে মালটালগুলো ওজন করা না? ষ্টীমার এসে পড়্‌লে তখন ত আবার তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে।'

উমাপতি বলিল "ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা না গেলে কোনদিনই মাল ওজন করে না।"

একটু নীরব থাকিয়া সুলোচনা বলিলেন—"নেবে জিজ্ঞেস ক'রে আয় না, ষ্টীমার আস্‌বার আর কত দেরী?"

উমাপতি মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়া তীরে নামিয়া পড়িল। তারপর হেমন্তের খর-রৌদ্র-বিভাসিত উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া পদ্মার বীচি-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাজির খেলা, কখন বা নদীর চরে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে কৃষক-পল্লীর মৃণ্ময় কুটীর, কখন বা সর্ব্বগ্রাসী প্রলয় নৃত্য-কারিণী পদ্মার ভাঙ্গনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ এক সময় ফিরিয়া আসিয়া নৌকার মধ্যে শুইয়া একখানি মাসিক-পত্রের পাতা উল্টাইতে লাগিল। 'স্মৃতির দংশন' শীর্ষক গল্পটী তাহার মনকে আকর্ষণ করিল; গল্পটী পড়িতে পড়িতে তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, তাহার মনের ভাব লইয়াই যেন গল্পটী লিখিত হইয়াছে। মোহাবিষ্টের মত ভাবিতে ভাবিতে উমাপতি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিল,— পিতৃ-পরিত্যক্তা ব্যথিতা সুবি ম্লানমুখে করুণ নয়নে চাহিয়া যেন তাহার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছে। "আহা! মাথাটা এমন ক'রে হেলে পড়েছে বিছানায় উঠে শুলে হয় না?"

মায়ের স্নেহ-কোমল হস্তের স্পর্শের সঙ্গে তাঁহার মৃদু ভৎসনায় উমাপতির তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। সে কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নৌকার মাঝি বলিয়া উঠিল—"বাবু, জাহাজের ধোঁয়া দেহা যাতিছে।"

সাত

গোয়ালন্দে ট্রেণে উঠিতে গিয়া ইণ্টার ক্লাসের মেয়ে কামরার দিকে চাহিয়া উমাপতির হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক, বিছানার বাণ্ডিল, কলার কাঁদি, ফলের ঝুড়ি ঘিয়ের টিন, ক্ষীরের হাঁড়ি প্রভৃতিতে কামরা পূর্ণ। তারপর যাত্রীর ভিড়, কাচ্চা-বাচ্ছার কান্না এবং মহিলাগণের স্থান দখল লইয়া "তুমি শুয়ে আছ, আর আমি বস্‌তে যায়গা পাব না? কেন আমি কি ভাড়া দিই নি না কি?" ইত্যাদি ইত্যাদি ঝগড়া পুরাদমে চলিতেছে। পুরুষের কামরায়ও স্থানাভাব। অগত্যা উমাপতি মা ও ভাই-বোন্‌দের লইয়া এঞ্জিনের কাছাকাছি একখানি থার্ড ক্লাসের অপেক্ষাকৃত খালি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির জমাট বাঁধা অন্ধকার ও নীরবতার মাঝে আকাশে উজ্জ্বল তারকার মালা; পথিপার্শ্বস্থ বনবীথির মধ্যে খদ্যোতের মেলা এবং মাঝে মাঝে অনাদৃত ষ্টেশনগুলির চকিত আলোক ছাড়া পথে দর্শনীয় কিছু না থাকিলেও উমাপতি জানালার বাহিরে দৃষ্টি স্থির করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনার "বসে থাকবি কতক্ষণ; রাত জেগে কি শেষটা অসুখে পড়্‌বি? শুয়ে পড়্‌না—" মৃদু ভর্ৎসনায় সে বাঙ্কের উপর শয্যা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

উমাপতির যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও উষার আলোক ধরণীর বক্ষ আলোকিত করে নাই। ঘুম ভাঙ্গিতেই উমাপতির কাণে চাপা হাসির সঙ্গে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল। সে বুঝিতে পারিল, নিদ্রিত থাকার সময় এই নবাগতাদের গাড়ীতে আগমন হইয়াছে। গাড়ীর আরোহীবর্গ প্রায় সকলেই নিদ্রিত; কেবল কোণ ঘেঁসিয়া বসিয়া উমাপতির বিবাহিতা ভগিনী শৈবলিনী ও আর দুইটী মেয়ে হাসি-গল্পে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সেই চাপা কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন ও হাসির শব্দ মাঝে মাঝে উমাপতির কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছিল।

মেয়েদের এমন একটা বয়স আসে, যখন দুনিয়ার দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, অভিযোগ কোন কিছুই তাহাদের মনকে স্পর্শ করিতে পারে না; বয়সের রঙ্গিন নেশা তখন মনকে এমনি অভিভূত করিয়া রাখে!

এই নবাগতা মেয়ে দু'টীর মা একদিকের বেঞ্চে শুইয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন।

তাহাদের কথাবার্ত্তার যেটুকু অংশ উমাপতির কাণে গেল, তাহাতে সে বুঝিল, যদিও মাঝরাত্রেই তাহারা গাড়ীতে উঠিয়াছে, কিন্তু কথাবার্ত্তা বেশীক্ষণ আরম্ভ হয় নাই। উঃ, বাপ্‌রে, এই সময়টুকুর মধ্যেই এত বন্ধুত্ব!

আর অল্পক্ষণ পরেই ছাড়াছাড়ি হইবে বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া শৈবলিনী ক্ষুন্নস্বরে একটী মেয়েকে বলিল—"বড় দুঃখ হচ্ছে ভাই, হয় ত জীবনে আর আমাদের দেখা হবে না! নতুন সাথীটিকে পেয়ে আমায় ভুলে যেও না যেন, বুঝ্‌লে?"

মেয়েটী সলজ্জ হাসির সহিত মুখখানি নত করিল। শৈবলিনী তাহার হাত দু'টী পরম স্নেহে আপন হাতের মধ্যে লইয়া মৃদু চাপ দিয়া বলিল—"চিঠির উত্তর কিন্তু দিও ভাই।"

তারপর কাহার বাড়ীর নম্বর কত ইহা লইয়া দুইজনের মধ্যে একটু আলোচনা হইল; কেন না, কেহই বাড়ীর নম্বর অবগত নহে। মিনিট কয়েক চিন্তার পর স্থির হইল,—মায়ের নিকট হইতে উভয় পক্ষই ঠিকানা জানিয়া লইবে।

হঠাৎ শৈবলিনী বলিয়া উঠিল—"দেখ ভাই, আমার কি ভুল! আসল কথাই যে জিজ্ঞেস কর্‌তে ভুলে গেছি। তোমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম

পোষ্ট-অফিস, জেলা, আর ভাই তোমার বরের নামটী আমায় বল? তোমার বিয়ে ত এই পরশু; বিয়ে হ'লেই ত শ্বশুর-বাড়ী চলে যাবে?"

শৈবলিনীর প্রশ্নে মেয়েটী একটু মৃদু হাসিল মাত্র; কোন উত্তর দিল না। শৈবলিনী বলিল—"লজ্জা কি ভাই; এখনও ত তোমার বিয়ে হয় নি, বরের নাম বল্‌তেও কোন দোষ নেই।"

যে মেয়েটী এতক্ষণ তাহাদের নিকটে বসিয়া উভয়ের গল্পের রসাস্বাদন করিতেছিল, সে তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"কি মেজদি' বল্‌ব তোমার বরের নাম? বলি?"

পূর্ব্বোক্ত মেয়েটী ঈষৎ কোপ কটাক্ষ ভগ্নীর মুখের প্রতি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু সে দমিবার বা ভীত হইবার পাত্রী নহে। সে হাসিতে হাসিতে শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"তা' জানেন না, এই আমার মেজদিদির পতি তিনি—"

শৈবলিনী বলিল—"তা' যেন বুঝ্‌লাম; তা' বলে কি তাঁর নাম নেই?"

পরম বিজ্ঞের মত মেয়েটী বলিল—"একটু বুদ্ধি খরচ কর্‌লেই ত বোঝা যায়। আচ্ছা, শুনুন তবে—আমার ঠাকু'মা আদর ক'রে দিদিকে সুভদ্রা বলে ডাকতেন; অত বড় নাম ধরে' ডাকতে অসুবিধে হয় বলে' সবাই ওকে সুবি বলেই ডাকে; কিন্তু ওর আসল নাম হচ্ছে উমারাণী। তাই ওর বরের নামও হ'ল উমাপতি। কেমন আমি ঠিক্ বলেছি কি না?"

মেয়েটী হাসিতে লাগিল। বালিকার হাস্যোচ্ছ্বলিত মুখের দিকে চাহিয়া শৈবলিনী বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, তোমার দিদির শ্বশুর-বাড়ীর গাঁয়ের নামটি কি ভাই?"

বালিকা তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা' জানেন না, আমড়া; আর জেলা পাবনা—অর্থাৎ কি না, আমরা আর আমড়া খেতে পাব না।"

শৈবলিনী বারেকমাত্র মেয়ে দুইটীর দিকে চাহিয়া উঠিয়া গিয়া অন্য বেঞ্চে নিদ্রিতা মায়ের গায়ে ঠেলা দিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"ও মা, মা, উঠে দেখ কে! আমাদের গাড়ীতেই আমাদের বৌদি'!"

আনন্দের বেগে শৈবলিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বিস্ময়-চকিতা সুলোচনা বলিয়া উঠিলেন—"কই?"

বাঙ্কের উপর হইতে উমাপতিও সেই সময় তাহার ভাবী পত্নীর মুখখানি দেখিবার লোভে চোরাদৃষ্টিটুকু মেয়েটীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিল। কিন্তু এ কি! এ কোথা হইতে আসিল! এ যে সুবি! দারুণ মানসিক উত্তেজনায় হয় ত তাহার দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া উমাপতি পুনরায় মেয়েটীর মুখখানি দেখিবার জন্য চাহিল। লজ্জা অভিভূতা বালিকা মাথা নীচু করিয়া বেঞ্চের কোণ ঘেসিয়া অপরাধীর মত জড়সড়ভাবে বসিয়া রহিল। লুব্ধ মধুপের মত তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া-ফিরিয়া উমাপতির অনুসন্ধিৎসু নেত্রযুগল যে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল, তাহাতে আর তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না,—কে সে!

—হিমিকা—

শ্রীবাসুদেবানন্দ

হিমালয়ের অন্তর্দ্দেশে তুষার-ছাওয়া দেশ—এ সব পাহাড়ে দেশে হঠাৎ যেমন জল-ঝড় আসে, হঠাৎ ঠিক তেমনি ক'রে চলে যায়। রাত্রে ঝড়বৃষ্টি, খুব বরফপাত হয়ে গ্যাছে—সারা পৃথিবীটা এখনও ধপধপে সাদা। জনৈক বাঙ্গালী পরিবার কিছুদিনের জন্য এ দেশে বায়ুপরিবর্ত্তনে এসেছেন। বিকালে শেফালি ও মাণিক তা'দের মার কাছে গিয়ে বল্‌লে—আজ তাদের বরফে খেল্‌তে দিতে হ'বে। যদিও রাত্রিটা খুব দুর্যোগে কেটেছে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি বেশ মনোরম হয়ে উঠেছিল। খেলবার জায়গা মাত্র বাড়ীর পাশে খানিকটা খোলা মাঠ, তার দিয়ে ঘেরা। সেখানে আছে কেবল একটা আপেল গাছ, গোটা দুই চির, আর এধারে-ওধারে গোটাকতক গোলাপের ঝোপ। আর যে দু'-চারটে গাছ আছে, তা'তে একটিও পাতা নেই, বরফে মোড়া। আর ফলের পরিবর্ত্তে বরফই ফল-ফুল হ'য়ে দোল খাচ্ছে।

মা বল্‌লেন—"আচ্ছা, আজ তোমরা খেল্‌তে পার।"

কিন্তু যাবার পূর্ব্বে তাদের খুব গরম কাপড়-চোপড়ে এঁটে, এবং হাঁটু পর্য্যন্ত চামড়ার জুতো পরিয়ে ছেড়ে দিলেন। তারা ছাড়া পেয়ে লাফাতে লাফাতে একেবারে তুষারের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। খানিক পরে দেখা গেল, দু'জনেই একেবারে তুষারের খোকা হয়ে গ্যাছে; কেবল সাদার ভেতর থেকে টুকটুকে দুটো লাল মুখ দেখা যাচ্ছে। শেফালি খানিক বরফ হাতে ক'রে মাণিকের মুখে মাখিয়ে দিতে গেল—মাণিক ছুটে পালাল। তারপর শেফালি চুপ ক'রে দাঁড়াল—খানিক ভেবে নিয়ে বল্‌লে—"ভাই, একটা বরফের খুকি তৈরী কর্‌বি?—সে আমাদের বোন্ হবে—তারপর সারা শীতকাল আমরা তার সঙ্গে খেলা কর্‌ব। কেমন ভাই, বেশ মজা হবে না?"

মাণিক হাততালি দিয়ে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—"বেশ হবে। মাকে নিয়ে গিয়ে দেখাব।"

শেফালি বল্‌লে—"মাকে দেখাব, কিন্তু ভাই আমি তা'কে ঘরে নিয়ে যেতে দেব না। সে কিছুতেই গরমে যেতে চাইবে না বুঝ্‌লি?"

শেফালি কারিগর; যোগানদার মাণিক। মাণিক নানা যায়গা থেকে পরিষ্কার বরফ কুড়িয়ে এনে দিচ্ছে। শেফালির চাঁপার কলির মত আঙ্গুল গঠনে চঞ্চল হয়ে রয়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সত্যই একটী সুন্দর খুকীর মুখ বরফ থেকে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

"মাণিক, মাণিক, দৌড়ে গিয়ে বাগানের ওই কোণ থেকে ধবধবে বরফ নিয়ে আয় ত; এবার কাপড় তৈরী কর্‌ব। দেখিস্, যেন বরফগুলো আগে পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলিস নি।"

মাণিকের কিন্তু পুতুলটা এত ভাল লেগেছে যে, সেখান থেকে সে সরে যেতে নারাজ। তাই খানিক দূর দৌড়ে গিয়েই যা' তা' খানিকটা বরফ কুড়িয়ে নিয়ে এসে বল্‌লে "এই নে ভাই, এনেছি। ও কি সুন্দর তৈরী করেছিস শেফালি!"

শেফালি মস্ত কারিগরের মত গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে—"হুঁ, দৌড়ে আর একটু ভাল বরফ নিয়ে আয় ত।"

মাণিক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকেই থপ্ করে খানিক বরফ তুলে নিয়ে

বল্লে "এই নে। বেশ হয়েচে, বেশ হয়েচে, যেন ভাঙিস্ নি। চল্ মাকে গিয়ে দেখাই।"

"মা দেখে খুসী হবেন 'খন; কিন্তু বাবা এসেই বল্বেন—'দুর দুর, ফেলে দে—কেবল ঠাণ্ডা লাগাচ্চে'।"

এমন সময় হঠাৎ মাণিকের নজর পড়্ল জান্লায় তার মার দিকে।—দেখেই চীৎকার ক'রে ডাকল—"দেখ, দেখ মা, কেমন সুন্দর খুকী হয়েচে! এইবার এর সঙ্গে আমরা খেল্ব।"

মা স্নেহের আনন্দে যেন অবাক্ হয়ে বল্লেন—"তাই ত, ওমা কি সুন্দর! এমন ত কেউ কর্তে পারে না!"—এই বলে' মা হাতের বুননের কাজে মনোসংযোগ কর্লেন এবং তাড়াতাড়ি সার্বার চেষ্টা করতে লাগ্লেন—কারণ শীতের বেলা এদেশে খুব কম—তখন সূর্য্য প্রায় পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়চে। কিন্তু মা কানটা ঠিক দিয়ে রেখেছেন ছেলেপুলেদের কথায়। তিনি শুন্তে পেলেন শেফালি বলচে—"দেখ মাণিক, সারা শীতকাল এই খুকীর সঙ্গে আমরা খেল কর্ব—কিন্তু বাবা হয় ত ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে খেল্তে দেবেন না।"

মাণিক বুদ্ধিমানের মত বল্লে "ওর যে ক্ষিদে পাবে দিদি; আমরা ওকে ঘরে নিয়ে যাব, কেমন? আর বশ ক'রে আমার গরম দুধ খাইয়ে দেব।"

শেফালি খুব জ্ঞানীর মত মৃদু হেসে বল্তে লাগ্ল—"দূর্ বোকা, তা' কি হয়! দুধ খাওয়ান একেবারেই চল্বে না। এরা হিমের লোক, কেবল হিম ভালবাসে, কেবল তাই খেয়েই বেঁচে থাকে।"

শুনে মাণিক বলে' উঠ্ল—"তাই না কি? ও হিমিকা, গরম দুধ তুমি খেতে ভালবাস না। আচ্ছা, তোমার ছোট ছোট বরফ খাওয়াচ্ছি।"—বলে' টাটকা বরফ খুঁজতে গেল।

এমন সময় শেফালি খুব চেঁচিয়ে বলে' উঠ্ল—"মাণিক দেখে যা, শীগ্‌গির দেখে যা, আকাশের হল্দে মেঘের আলো কেমন এর গায়ে পড়ে' হল্দে জামা তৈরী হয়ে গ্যাছে।"

মাণিক ছুটে এসে দেখে বল্লে—"তাই ত ভাই! কিন্তু এর ঠোঁট ত আমাদের মত লাল নয়।"—বলে' দুই হাঁটুর ওপর দুই হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে তার ঠোঁটের কাছ মুখ নিয়ে গেল; আর অমনি তার লাল টুপির আলো ঠোঁটে পড়ে টুকটুকে হ'য়ে উঠ্ল।

"ও শেফালি, দেখ ভাই, কি সুন্দর ঠোঁট! চুমু খাই।—ও রে বাপ রে, কি ঠাণ্ডা ঠোঁট!"

এমন সময় সন্ধ্যে হ'য়ে আস্ছে দেখে, তাদের মা ছেলেমেয়েকে ডাক্লেন—"মাণিক, শেফালি, সন্ধ্যে হ'য়ে আস্চে; এবার ফিরে এস।"

তারা উত্তর দিলে—"না মা, আর একটু থাকি—দেখ না কেমন হিমের খুকী তৈরী হয়েচে; আমরা এর নাম রেখেচি হিমিকা।"

মা বল্লেন—"তাই ত! বেশ হয়েচে ত!"

এমন সময় একটা দমকা হাওয়া এসে সেই হিমের পুতুলটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইলে—ছেলে দু'টীও দু'পাশে তার হাত ধরে' বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেড়াতে লাগ্ল।

মাণিকের ছোট ছোট পা, বেশীদূর দৌড়তে না পেরে হাত ছেড়ে দিয়ে বল্লে—"না ভাই, হিমিকার হাত আমরা আর ধর্ব না, ভয়ানক ঠাণ্ডা।"

শেফালিও বল্লে—"হাঁ ভাই, বড় ঠাণ্ডা—আমার হাত জ্বলচে। এবার থেকে আমরা কেবল ওর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেড়াই।"

এমন সময় একটা দমকা হাওয়া এসে হিমিকাকে অনেকদূর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মা তখন বাইরে এসে বল্লেন—"সব ঘরে চল।"

অল্প আঁধারে হিমিকা দূরে তখন সত্যিকারের খুকীর মতনই দেখাচ্চে। মা জিজ্ঞাসা কর্লেন—"হ্যাঁ রে, ও পাড়ার কারু মেয়ে নয় ত?"

শেফালি বল্‌লে—"না, না, ওকে যে আমরাই তৈরী কর্‌লুম, বল্‌লুম যে তোমায়।"

মাণিক গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"ও হিমের খুকী, ওর ঠোঁট আর হাত ভয়ানক ঠাণ্ডা।"

এমন সময় শেফালি ও মাণিকের বাবা ফটকের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুক্‌লেন—তাঁর গায় ওভার-কোট ও হ্যাটের ওপর আবার একখানা ভোট কম্বল জড়ান। স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের দেখেই তাঁর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল—তিনি দূরে কি-একটু কাজে বেরিয়েছিলেন। খানিক দূর এগিয়ে আস্‌তে আস্‌তে একটু আশ্চর্য্যও হ'লেন। —"ব্যাপার কি! এই বরফের দিনে বাড়ী-শুদ্ধ লোক বাইরে কেন?"

স্ত্রী একটু এগিয়ে এসে হেসে বল্‌লেন—"দেখ্‌চ।"

স্বামী একেবারে বাস্তববাদী, সোজাসুজি লোক; স্ত্রীর মত তাঁর কল্পনা একটুও নেই। আঁধারে একটী বালিকাকে ছুটে ছুটে বেড়াতে দেখে বল্‌লেন—"এর মা ত আচ্ছা বেকুফ। এই ঠাণ্ডায় মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়েচে; ও ত দেখ্‌চি 'নিমনিয়া' হ'য়ে মর্‌বে এখনি।"

স্ত্রী মুখ টিপে হাসি চেপে বল্‌লেন—"আমিও তাই ভাব্‌চি।"

সেই সোজাসুজি লোকটী তখন হিমিকাকে ধর্‌তে গেলেন। এদিকে মাণিক পেছনে চীৎকার করে উঠল—ও হো হো, বাবা কি বোকা! ওকে যে আমরা বরফ দিয়ে তৈরী করেচি।"

কে কার কথা শোনে—মেয়েটী শেষে ঠাণ্ডায় মারা যাবে! বাতাসের সঙ্গে অনেক দৌড়াদৌড়ি ক'রে তিনি হিমিকাকে ধর্‌লেন। আস্‌তে আস্‌তে স্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—"একে ঘরে নিয়ে গিয়ে বেশ ক'রে গরম গরম দুধ খাইয়ে দাও; তারপর উনুনের পাশে নিয়ে গিয়ে বেশ ক'রে গা-হাত-পা সেঁকে গরম জামা পরিয়ে দাও। আমি পাড়ায় খবর নিচ্ছি, কার মেয়ে হারিয়েচে।"

মাণিক তখন তার বাপের কোমর জড়িয়ে প্রাণপণে টান্‌চে—মা হাস্‌তে হাস্‌তে একদিকে চলে গ্যাছেন। বাপ্ বল্‌লেন—"খোকা, তুমি বড় গোলমাল কর্‌চ, শীগ্‌গির ঘরে চল।" বলে' তাকে টেনে নিয়ে চল্‌লেন।

ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বল্‌লেন "তুমিও ত দেখ্‌চি এদের মত ছেলেমানুষ—মেয়েটা একেবারে বরফ হয়ে গ্যাচে—আমার হাতে দস্তানা, তাতেও ওর হাত আমার ঠাণ্ডা বলে বোধ হচ্চে।" বলে' নিজের ভোট কম্বলে মু'ড়ে হিমিকাকে উনুনের পাশে রেখে গাড়োয়ানকে গাড়ী জুড়তে বল্‌লেন থানায় খবর দিতে হবে—যেন তার বাপ-মা এসে শীগ্‌গির তার মেয়ে নিয়ে যায়।

গাড়ী জোড়া হ'লে ফিরে এসে দেখেন,—টেবিলের ওপর গরম দুধ জুড়চ্চে এবং তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা সেখানে দাঁড়িয়ে খুব গোলমাল করচে মাণিক একেবারে কেঁদে ফেলেচে। পিতা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"মেয়েটা গেল কোথ?"

স্ত্রী বল্‌লেন—"দুধ জ্বাল দিয়ে নিয়ে এসে দেখি, খালি কম্বলখানা পড়ে আছে, আর মেঝেয় খানিক জল—বোধ হয় পালিয়ে গ্যাছে।" মাণিক বল্‌লে—"না, আমি দাঁড়িয়েছিলুম—হিমিকা জ্বল জ্বল ক'রে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর কাঁদতে লাগল—তারপর ঝুপ্ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল—তারপর খানিক পরে আর তাকে দেখ্‌তে পেলুম না।

বাপ বল্‌লেন—"পালিয়েই গ্যাছে—যাক্, আমার যা' কর্‌বার আমি করেছি—এখন সব গিয়ে ঘুমোও।"

বিজ্ঞানের গবেষণা তাদের বাবাকে যে শিশুর অধিক সরল করেছিল, জগতের লোকের সঙ্গে তারা দুই ভাই-বোন্ হয় ত তা' বুঝ্‌ল না। কিন্তু বুঝ্‌ল একজন—সে নিশ্চয়তা দিয়ে এ সরলতার ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার আবশ্যক মোটেই অনুভব কর্‌ল না।

অন্ধ জগৎ এই হিমিকার মোহে পাগল—মিথ্যায় সত্যের আরোপ ক'রে যা' তারা হারায়, তার জন্যেই দু'টি পা ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদতে বসে।—নয় কি? তোমাদের কি মনে হয়?

—দাদামশায়—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক

গড়গড়ার নল মুখে দিয়া বৃদ্ধ অনুকূলবাবু এমনি আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন যে, তামাকটা কখন পুড়িয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার হুঁস ছিল না ; তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিল বারোয়ারী-তলা হইতে উত্থিত স্বেচ্ছাসেবকদিগের সম্মিলিত সুরে গান—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার,
আমার দেশ ;
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহি ত মেষ !"

অনুকূলবাবুর অন্তরের মধ্যে কি-একটা ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল তাঁহার দুই চক্ষুর কোণ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। নিজেকে সামলাইয়া লইবার জন্য বারকয়েক গড়গড়ায় তিনি ঘন ঘন টান দিলেন, কিন্তু ধোঁয়া বাহির হইল না ; আগুন তখন ছাই হইয়া গিয়াছে। তিনি উদাসভাবে অস্তমিত সূর্য্যের পরিণতি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন,—আর কতদিন, কতদিনে আমার জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হবে দয়াময় !

পৌত্রবধূ আসিয়া ডাকিল—"জল খাবেন চলুন না দাদামশায়, বেলা পড়ে এল যে !"

মৃণালের মুখের দিকে চাহিয়া অনুকূলবাবু কহিলেন—"একটু পরে দিদি, বারোয়ারীতলাটা একবার ঘুরে আসি।"

দুঃখিতভাবে মৃণাল বলিল—"নাই বা গেলেন দাদামশায়, আজ ক'দিন ধরে' কিছু খেতে পারছেন না,—"

ম্লান হাসি হাসিয়া অনুকূলবাবু বলিলেন—"না দিদি, আমি এখনি আসছি। সোনার চাঁদ ছেলেরা সব যাচ্ছে, একবার আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি।"

অনুকূলবাবু উঠিয়া পড়িলেন ; মৃণাল সেই-খানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় অনুকূলবাবু ফিরিয়া ডাকিলেন—"দিদি।"

মৃণাল তাঁহার ডাকের সাড়া দিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওদের আজ নেমতন্ন করব দিদি ?"

মুখে হাসি মাখাইয়া মৃণাল বলিল "কেন না।"

"—যদি বিশ-পঞ্চাশজন হয় ?—" [illegible] বাব।

তেমনি হাসিতে মুখখানিকে ভরাইয়া মৃণাল বলিল –"পঞ্চাশ কেন দাদামশায়, পাঁচশো লোককে রেঁধে খাওয়াবার ক্ষমতা আমার আছে।"

উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে অনুকূলবাবু বলিলেন—"তা' থাক্‌বে বই কি দিদি ! একদিন রাত্তিরে বোসেদের বাড়ী যখন ডাকাত পড়ে, মার্কণ্ড তখন তাদের মাঝে পড়ে এমন লাঠি ঘোরালে যে, তারা ছোত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। তারই স্ত্রী ত তুই ; তুই পারবি না আবার ! তা'হ'লে নেমতন্ন করি, কি বল দিদি, এঁা ?"

মাথা হেলাইয়া মৃণাল জানাইল—"হ্যাঁ।"

বুকের মাঝে একরাশ উৎসাহ লইয়া অনুকূল-বাবু চলিয়া গেলেন।

দুই

অনুকূলবাবু যখন বারোয়ারীতলায় গিয়া পৌঁছিলেন, তখন সভা শেষের গান হইতেছিল—

"—গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'।—"

তাহাকে দেখিয়াই গ্রামবাসীরা বিপুল আগ্রহে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেই তিনি শান্তি সৈন্যগণের নিকট গিয়া আজিকার রাত্রিটা তাঁহার আবাসে থাকিবার এবং রাত্রে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারাও সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিল।

আইন-অমান্যের সংগ্রাম তখন সুরু হইয়াছে। এই শান্তিসেনার দল চলিয়াছিল অন্য সৈনিকদিগের পাশে দাঁড়াইয় তাহাদের সহায় হইবার জন্য। সংখ্যায় তাহারা জন পনেরো ছিল।

অনুকূলবাবু বিশেষভাবেই তাহাদের যত্ন করিয়া নিজের চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া গিয়া নানারূপ আলোচনায় তাহাদের প্রাণের মধ্যে উৎসাহের উৎস ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

তাহাদিগের আহারের সময় তিনি মৃণালকে বলিলেন—"তুই আজ পরিবেশন কর দিদি; মার্কণ্ড যখন চলে যায়, তখন তাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াতে পারি নি আজ আমি এদের কাছে বসিয়ে খাওয়াই। এদের এক-একজনের ভেতর আমি এক একটা মার্কণ্ডকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, জানিস দিদি!"

উৎসাহের সঙ্গে কথাগুলো বলিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

মৃণালের চক্ষু তখন শুষ্ক ছিল না; তবুও নিজেকে সংযমের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—"আপনিও ওদের সঙ্গেই বসুন না দাদামশায়; কোন্ সকালে সেই হাতে-পাতে করেছেন বই ত নয়!"

কান্নারই মত করুণ হাসিয়া অনুকূলবাবু বলিলেন—"তা'কি হয় পাগলি! কে কি নেয় না নেয়, দেখ্‌তে হবে, কারও পেট ভরল কি না তদারক কর্‌তে হবে, বস্' বল্‌লেই কি বস্‌তে পারি রে! আজ আমি পেট ভরেই খাব'খন। আনন্দ আজ আমার প্রাণের কানায় কানায় জান্‌লি দিদি! আজ আমি একজন মার্কণ্ডের যায়গায় পনেরো জন মার্কণ্ডকে তাদের যাবার সময় খাওয়াচ্ছি।" বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে অতিথিদের নিকট ছুটিয়া গেলেন।

স্নেহপ্রবণ দাদামহাশয়ের প্রাণের ক্ষত বুঝিতে পারিয়া মৃণাল বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিল।

তিন

শান্তিসেনার দল যতক্ষণ অনুকূলবাবুর বাটীতে ছিল, ততক্ষণ তিনি যেন সহস্র মানুষের ক্ষমতায় তাদের সুখসাচ্ছন্দের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রির অনেকটা সময় তাহাদের সহিত গল্প-গুজবে কাটাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে আমার মার্কণ্ডের দেখা হবে কি?"

অবাক্ হইয়া তাহারা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"কে তিনি?"

বৃদ্ধের চক্ষু দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল—অন্তরের মধ্যে সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হইল—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সেই ত আমার সব রে ভাই! আমার বংশের একমাত্র দুলাল—সে আমার পৌত্র! তাকে এক বছরেরটী রেখে তার বাপ-মা যখন চলে গেল, তখন তার সব ভারটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বাইশ বছরের ক'রে তার বিয়ে দিলুম; আর হতভাগা এমনি বেইমান, পাছে আমি যেতে না দিই, সেই ভয়ে যাবার সময় একবার বলেও গেল না, যে—'দাদামশায়, আমি যাচ্ছি; আমায় আশীর্ব্বাদ করুন'।"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি নীরব হইয়া গেলেন।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শান্তিসেনার দল বলিল—"এটা তাঁর বড্ড অন্যায়।"

একটু দীপ্তকণ্ঠেই অনুকূলবাবু বলিয়া উঠিলেন—"না, না, অন্যায় কেন করবে সে; তার পক্ষে সে ঠিক কাজই করেছে। অনুমতি নিতে এলে হয় ত আমি দিতে পারতুম না; কিন্তু মায়ের

ডাক সে উপেক্ষা করে কি ক'রে! ঠিকই করেছে; সে ত অন্যায় করবার ছেলে নয়। আমাকে প্রণাম না ক'রে এক পাও কখন চলে নি।"

পুনরায় তিনি নীরব হইয়া গেলেন।

শান্তিসেনার দল এবার কোনও কথাই বলিতে পারিল না।

অনুকূলবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"হ্যাঁ, যা' বল্‌ছিলাম ভাই, যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, বলো, -তোমার দাদামশায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন; আর বলে দিয়েছেন, বিজয়মাল্য গলায় পরে সে যেন বাড়ী ফিরে আসে।"

কাহারও মুখ দিয়া তখন কোনও কথা বাহির না হইলেও, সকলেরই মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নতশির হইয়া তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন—"তোমাদেরও আমি ওই আশীর্ব্বাদই করি। যদি দেখা হয়, তাকে বলো,—ওইটাই আমার সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ! যুদ্ধজয়ী বীরের মত সে যেন আমার বাড়ী ফিরে আসে!... এখন শোও ভাই; রাত অনেক হয়েছে।"

চার

শান্তিসেনার দল চলিয়া গেলে অনুকূলবাবুর মনটার মধ্যে কোথা হইতে এক রাশ অবসাদ আসিয়া মাতামাতি সুরু করিয়া দিল। তাহাদিগের সহিত কতকটা পথ গিয়া যখন তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেলা অনেকটা হইয়া-গিয়াছে। এতখানি পথ চলিবার পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অবসন্নভাবেই তিনি দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি মৃণাল হাতপাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল—"কেন এতখানি পথ হাঁটতে গেলেন দাদামশায়? এই অশক্ত শরীরের ওপর অতটা অত্যাচার কি সহ্য হয় আপনার?"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অনুকূলবাবু বলিলেন—"কষ্ট কোথা রে দিদি! তা' হবে কেন! তারা চলেছে মার্কণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ কর্‌তে; তাদের সঙ্গে যদি একটু না যাই, তা' হ'লে যে কর্ত্তব্যের ক্রটী হবে দিদি!"

একথার কোনও উত্তর মৃণাল দিতে পারিল না।

অনুকূলবাবু বলিতে লাগিলেন—"আচ্ছা দিদি, এই যে একমাসের ওপর গেল সে একখানা চিঠি পর্য্যন্তও দিলে না—কি যে ভেবেছে!"

নির্ব্বিকার ভাবেই মৃণাল বলিল "হয় ত চিঠিপত্র লেখা নিষেধ দাদামশায়!"

"নিষেধ?—কেন? হয় ত কর্‌ছে নুনতৈরী, আর না হয় কাট্‌ছে তালগাছ কাজ ত এই; এই কাজের জন্যে চিঠি লিখ্‌তে নিষেধ থাক্‌বে কেন? তা' নয় দিদি, তাকে মানুষ হবার জন্যে এক-একদিন অনেক বকাবকি করেছি ত; তাই সুযোগ বুঝে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে বুঝলি না? আমাকে না হয় নাই লিখ্‌লে তোকেও ত একখানা লেখা উচিত ছিল।"

কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া মৃণাল বলিল—"হাতে হয় ত পয়সা নেই—"

চমকভাঙ্গার মত অনুকূলবাবু বলিলেন—"তাই হবে হয় ত; বড্ড ভুল হয়ে গেছে রে! এঃ! তখন যদি মনে করে দিতিস, তার হাতে কিছু দিয়ে দিতুম।"

"এঁরা যে তাঁরই কাছে যাবে, তার ঠিক কি দাদামশায়? কাজ ত আর এক যায়গায় হচ্চে না!"

কি চিন্তা করিয়া অবসন্নভাবে অনুকূলবাবু বলিলেন—'তাও বটে! কিন্তু টাকা যে তাকে পাঠাতেই হবে। অথচ, কোথায় পাঠাই!"

বৃদ্ধের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

মৃণালেরও প্রাণটা বেশ সুস্থির ছিল না; ডাকিল—"দাদামশায়!"

"কেন দিদি ?"

"মেয়েরাও সব এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, না ? সেদিন কমল পড়ে বলছিল।"

অনুকূলবাবু বলিলেন "হাঁ ; কিন্তু কেন বল দেখি ? তুইও কি যেতে চাস না কি ?"

ম্লান হাস্যে মৃণাল বলিল— 'দরকার যদি হয়, তবে যেতে হবে বই কি দাদামশায়, তাদের প্রত্যেক কাজের সহায় হবার জন্যে—"

অসহিষ্ণুভাবেই অনুকূলবাবু বলিয়া উঠিলেন— "তা' বল্‌বি বই কি রে নিমকহারামের দল ! তাকে মানুষ কর্‌বার প্রতিফল সে বেশ দিলে ; তুই-ই বা বাকী থাক বি কেন !"

হাসিয়া মৃণাল বলিল – "দাদামশাই যেন কি ! আমি যেন যাবার জন্যেই তৈরী হয়েছি। মাথা কি এতখানি বিগড়ে গিয়েছে যে, তামাসাটাও বুঝ্‌তে পার্‌লেন না।"

অনুকূলবাবু যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন ; বলিলেন—"সত্যিই মাথা বিগড়ে গেছে দিদি ; এমন সময় কি তামাসার ছলেও অমন সব কথা বলে।" বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল—"এত বেলায় আবার কোথায় চল্‌লেন ?"

"মাখমের কাছে একবার যাচ্ছি। তার কাগজখানা কাল এসেছে ; দেখি, কোনও খবর তার বা'র হয়ে থাকে।"

পাঁচ

মাখম ঘোষের সদরবাড়ীতে যাইয়া অনুকূলবাবু তাহাকে ডাক দিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নাতির কোনও খবর এল ?"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"না হে। তোমার হিতবাদীখানা একবার দাও ত দেখি ; যদি তার কোনও খবর পাই। হতভাগাটা একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখ্‌ছে না। বে-থা দিলুম ; কোথায় নাতি-নাতবউ নিয়ে শেষ বয়েসটা—"

বাধা দিয়া মাখম বলিলেন—"তুমি তাকে আনবার ব্যবস্থা কর অনুকূল-দা'। বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছ তুমি।"

—"আদৌ নয় মাখম। কাতর হব কেন ? সে গেছে একটা কাজের মত কাজ কর্‌তে। তবে দুঃখ হয়, দিদির আমার মুখের দিকে চেয়ে ! যাক্‌, কাগজখানা একবার আন দেখি।"

তাড়াতাড়ি মাখম কাগজখানা আনি। দিলে পড়িতে পড়িতে অনুকূলবাবুর মুখখানা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; তিনি বলিয়া উঠিলেন – "সাবাস ! মাখম আমি কাগজখানা নিয়ে চল্‌লুম ; দিদিকে পড়ে শোনাই গে। বাঃ, চমৎকার !"

—"কি অনুকূল-দা', তোমার নাতির কোনও খবর বেরিয়েছে ?"

—"তা' জানি না, নাম ত কারও নেই। হ্যাঁ, সাহস বটে ! চমৎকার ! ফুটন্ত জলের হাঁড়ি মাথায় নিয়ে একশজন পুলিসের মাঝে দাঁড়িয়ে—"

মাখম বলিল—"পড়েছি।"

—"দেখ দেখি মাখম, এতবড় নৈতিক সাহসের কাছে রাজশক্তিও মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে— শ্রদ্ধানতশিরে তাঁরা বলে' যাচ্ছেন,—কাল হ'তে আর ও কাজ কর্‌বেন না। সাবাস্ মার্কণ্ড !"

মাখম জিজ্ঞাসা করিল—"মার্কণ্ডের নাম পেলে ?"

—"না, না, তা' কি দেয় ; কিন্তু সেও এই কাজেই গিয়েছে ত। বলিহারি ! এই ত সাহস !—এই ত কাজ !"

ছয়

মাস দুই পরের কথা।

সেদিন দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতার মধ্যে অনুকূল-

বাবু বসিয়া বসিয়া আনমনা হইয়া কত কি ভাবিতেছিলেন; মৃণাল আসিয়া ডাকিল—"দাদামশায়!"

নিদ্রোত্থিতের মত অনুকূলবাবু বলিয়া উঠিলেন—"এসেছিস, ভালই হয়েছে; আমিই তোকে ডাক্‌ব মনে কর্‌ছিলুম।"

হাসিভরা মুখে মৃণাল বলিল "কেন দাদামশায়?"

"একটা পরামর্শের জন্যে দিদি।"

"কিসের?"

তাহার আপাদমস্তক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া অনুকূলবাবু বলিলেন—"এই মার্কণ্ডের সম্বন্ধে দিদি। সেই কবে গিয়েছে, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখ্‌তে পার্‌লে না। কেমন আছে—কে জানে!"

বলিতে বলিতে তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। মৃণালের মুখখানাও যেন ম্লানিমায় ভরিয়া উঠিল।

অনুকূলবাবু বলিতে লাগিলেন—"এতদিন চিঠি না পেয়ে আমার কেবল এইটাই মনে হচ্ছে দিদি,—চিঠি লেখে নিশ্চয়ই।"

কাতর-কণ্ঠে মৃণাল বলিল—"লিখ্‌লে কি আর পেতেন না দাদামশায়?"

—"তাই ত ভাব্‌ছি রে দিদি! আমার মনে হয়, পিয়ন ব্যাটা এত দূর না এসে হয় ত সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয়।"

—"তা' কি কেউ কখনও পারে দাদামশায়।"

"—পারে না; কে বল্‌লে তোকে? সবই পারে। এতখানি পথ হাঁটার শ্রম লাঘব কর্‌বার জন্যে যদি সে ছিঁড়েই ফেলে দেয়, তবে ধরে কে? রেজেষ্ট্রি চিঠি ত আর নয়। এমনও হতে পারে, হাটের দিন গ্রামের লোকের হাতে চিঠি দেয়; তারা হয় ত চালের বাতায় গোঁজে।"

মৃণালও আনমনা হইয়া গেল।

অনুকূলবাবু বলিতে লাগিলেন—"আজ হাটবার; নিজেই একবার গিয়ে দেখি দিদি। এতদিন ধরে' চিঠি দেয় নি, এ কি কখনও হয়? চিঠি সে লিখ্‌ছে নিশ্চয়; আমরা তা' পাচ্ছি না। আজ হাটে যাব; দেখিস, ঠিক্ চিঠি নিয়ে আস্‌ব। মুখখানা অমনকান্নায় ভরিয়ে রাখিস নি দিদি! আমার আশীর্ব্বাদ তাকে বর্ম্মের মত ঘেরে রেখেছে সব সময়। তার অনিষ্ট এতটুকুও হবে না—এ আমি তোকে জোর করেই বল্‌ছি! কেবল কি আমার আশীর্ব্বাদ রে, মার আশীর্ব্বাদও দিন-রাত তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি কর্‌ছে। চিন্তা কি দিদি, আমি আজই চিঠি নিয়ে আস্‌ব।"

মৃণাল বলিল—"আধক্রোশ পথ হাঁট্‌তে পার্‌বেন না দাদামশায়; তার চেয়ে কা'কেও বলে দিন।"

—"না রে, না; বলে' দেবার দিন আর নেই দিদি! দিন-রাত তোর মুখখানা দেখ্‌ছি, আর সব থেই হারিয়ে ফেল্‌ছি!...আমি নিজেই যাব। তোর মুখখানা দেখে..."

মৃণাল আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে দাঁড়াইল না; ত্বরিতপদে সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

রুদ্ধকণ্ঠে অনুকূলবাবু ডাকিলেন—"দিদি!—দিদি!"

কান্না-জমাট-কণ্ঠে বাহির হইতে মৃণাল বলিল—"বাসনগুলো বাইরে পড়ে রয়েছে দাদামশায়!"

সাত

মৃণালের সহস্র নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া অনুকূলবাবু তাঁহার জীর্ণ দেহখানাকে কোনওরূপে টানিতে টানিতে হাটের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মার্কণ্ডের পত্র তাঁহাকে লইয়া আসিতেই হইবে! হতভাগা ডাকপিয়ন একটু পরিশ্রমের ভয়ে হয় ত পত্র ছিঁড়িয়া ফেলে; আর তাহা না হইলে কাহারও হাতে পাঠাইয়া দেয়, সে আর দিবার নাম করে না।

বাঁধের উপর দিয়া পথ হাঁটিতে তাঁহার পা দুইখানা যখন অবশ হইয়া আসিল, তখন কতকটা শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তিনি একটা গাছের তলায় আশ্রয় লইলেন।

অন্তরের মধ্যে অফুরন্ত চিন্তার রাশি—সেই এক বৎসরের শিশুটীকে বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়া এতবড়টী করিয়াও একদিনের জন্য কাছ-ছাড়া হইতে দেন নাই! আর আজ দুইমাস—!"

হঠাৎ তাহার অন্তরের মধ্যে কেমন আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া উঠিল—এতদিনের মধ্যে এমনটা ত কোনও দিনই হয় নাই!...অন্তরের অস্থিরতা লইয়া তিনি একবার অসীমের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন - সব স্থানটুকুই নীলিমায় ভরা; কোথাও এতটুকু মেঘের আঁচড় নাই।

সেখান হইতে উঠিয়া দুই-এক পদ চলিতেই দেখিতে পাইলেন, শান্তিসেনার একটী দল সেই দিকেই আসিতেছে। স্থিরভাবে তিনি সেই-খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাহারা নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা যাবে বাবা?"

উত্তর আসিল—"আইন-অমান্য কর্‌তে।"

"ও—তোমরা তা'হ'লে যাচ্ছ আমার মার্কণ্ডের কাছে। দেখ বাবা, পয়সার জন্যে বোধ হয় সে চিঠি লিখ্‌তে পার্‌ছে না; গোটাকতক টাকা দেব, দেবে তাকে?"

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহারা বলিল—"কোথায় যে যাব, তার ত ঠিক নেই; তা' ছাড়া, তাঁকে চিনি না-ও।"

শ্রান্তভাবে অনুকূলবাবু বলিলেন—"তাও বটে! আচ্ছা, এস বাবা। আর হ্যাঁ, যদি দেখাশুনো হয়ে পরিচয় হয়, তা'হ'লে বলো বাবা তোমার দাদামশায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন!"

শান্তিসেনার দল চলিয়া গেল। তিনি আরও কতকটা পথ অগ্রসর হইতেই গ্রামের একটী লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

তাঁহাকে দেখিয়াই লোকটী বলিয়া উঠিল—"আপনার চিঠি এসেছে রায়মশায়।"

হর্ষাতিশয্যে অনুকূলবাবুর মুখখানা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিলেন—"এসেছে, এসেছে! ও আমার মার্কণ্ড লিখেছে নিশ্চয়ই! আমি জানি, চিঠি সে লেখেই—পিয়ন ব্যাটা ছিঁড়ে ফেলে। পড় ত ভাই, কি লিখেছে—বেলা পড়ে এল —চশমাও আনি নি।"

চিঠিখানা পড়িয়া লোকটী গম্ভীরভাবেই বলিল—"ভাল আছে।"

—"ভাল আছে—কেমন? এই যথেষ্ট! দাও ত ভাই চিঠি। বাড়ীতে ভাল ক'রে পড়ে দেখ্‌ব।"

দুইজনেই গ্রামের দিকে পা বাড়াইল।

যখন তাঁহারা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

অনুকূলবাবু বাটীতে আসিয়া ডাকিলেন—"দিদি, ও দিদি! ভায়ার চিঠি এসেছে! বলি নি তোকে, পিয়ন ব্যাটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। সে ভাল আছে; যোগীন পড়ে বল্লে। নিয়ে আয় ত দিদি, আলোটা আর চশমাটা; পড়ে দেখি।"

মৃণাল প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে, অনুকূলবাবু পত্র পড়িতে পড়িতে গম্ভীর হইয়া গেলেন। মার্কণ্ডের নিকট হইতে পত্র আসে নাই; আসিয়াছে আইন-অমান্য-পরিষদ হইতে—তাহার মৃত্যু-সংবাদ লইয়া।

অনুকূলবাবু ডাকিলেন—"দিদি!"

তাঁহার চোখ-মুখের ভাব, বলিবার ভঙ্গী মৃণালকে একটা অদূরাগত আশঙ্কায় ভরাইয়া তুলিল; সে ভয়ে ভয়ে ডাকিল -"কেন দাদামশায়!"

—"সেদিন তুই কাজ কর্‌বার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলি, না? মার্কণ্ড তাই তোকে পথ বলে' পাঠিয়েছে!..."

সেই রাত্রেই অনুকূলবাবু কোথায় বাহির হইয়া গেলেন; আর ফিরিয়া আসিলেন না।

—ক্ষুধিতা—

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

রজত যেদিন লেখার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল, সে একটা ভরা আষাঢ়ের এক কদর্য্য দিন। সকাল থেকে নিবিড় কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছেয়ে আছে; সে আবরণের কোথাও একবিন্দু ফাঁক নেই, যেন নিরেট থিলেন। অবিশ্রান্ত ধারায় একঘেয়ে ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি; মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গুরু গুম্ গুম্ শব্দ; বিদ্যুতের চক-চকানি! চারিদিকটা পচা, ভিজে অন্ধকার—যেন অসহ্য একঘেয়েমী আর বিশ্রী নোংরায় ধরিত্রীর সমস্ত রন্ধ্র ভরে' উঠেছে।

রজত মুচকে হেসে বল্‌লে, "তুমি বল না, আর কি ভাল দেখায়? ছেলেবেলায় ভালমন্দ না জেনে যা' করেছি, তা' আর ফির্‌বে না; কিন্তু এখন জেনে-শুনে ওসবে আর প্রবৃত্তি হয় না। আজ বাদে কাল সংসারে ঢুক্‌তে হবে; এখন যাতে দু'-পয়সা ঘরে আসে, সেই দিকেই মন দিতে হ'বে। তুমি কিছু মনে কোর না লেখা। এতদিন যা' করেছি, মনে হ'লে নিজেরই উপর ঘৃণা হয়।"

এই দামী সত্যি কথাগুলো বলে' রজত আবার একটা শুষ্ক হাসি হাস্‌লে; তারপর চুপ করে রইল। কিন্তু ওপক্ষ থেকে কোনও সাড়াই এল না। লেখা যেমন জান্‌লার গরাদে ধরে তা'তে মাথা রেখে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেম্‌নিই রইল। জলের ঝাপ্‌টা এসে তার মুখে মাথায় লাগ্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু তার মধ্যে সাড়া জাগাতে পার্‌লে না।

রজত খানিক বাদে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, চল্‌লুম তা' হ'লে। কথাটা বল্‌ব বল্‌ব ক'রেও বলা হয় নি—তবে আসা আজকাল খুবই কমিয়ে দিয়েছিলুম, তা' ত জানই।"

তারপর লেখার গায়ে ছোট একটু আদরের চড় মেরে মুখটাকে সপ্রতিভ কর্‌বার বৃথা চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে রজত বেরিয়ে গেল। লেখা তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল—নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, নিশ্চল!

তার শরীর একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছিল; দেহের মধ্যে রিম্ ঝিম্ ক'রে সমস্ত রক্ত যেন ঘর্ম্ম বিন্দুতে পরিণত হচ্ছিল। মাথার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড শূন্যতা; কিন্তু বাহিরের সেই নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ছিল একটা প্রচণ্ড জ্বালা! এ সেই জ্বালা,—যাকে ঈর্ষা বল্‌লে অবিচার করা হবে; আর কামনা বল্‌লেও অন্যায় বলা হবে। তার প্রাণের প্রচণ্ড ক্ষুধা যেন সমস্ত অন্তরে দাবদাহের সৃষ্টি কর্‌ছিল। কিসের সে বহ্নি, তা' সে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না; কিন্তু মনে হচ্ছিল,—তা'তেই সে সমস্ত পৃথিবী পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেল্‌তে পার্‌বে। আগুন, শুধু আগুন! তার দেহ, মস্তিষ্ক যেন কিছুতেই সে আগুনকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না—তা' একদিন ছড়িয়ে পড়্‌বেই!

জলের ধারা প্রচণ্ড হয়ে উঠ্‌তে একটা সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে লেখার চমক ভাঙল। জান্‌লা বন্ধ ক'রে ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে শূন্য ঘরের দিকে চাইতেই আবার যেন তার মাথার মধ্যে নূতন করে চিড়িক মেরে উঠল; সে আলমারিটা ঠেস্ দিয়ে সেইখানেই ধপাস্ ক'রে বসে' পড়্‌ল।

ছবির মত চোখের সাম্‌নে সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠল আগেকার ঘটনাগুলো—এমনই একটা বর্ষার পচা গুমোট সন্ধ্যায় লেখাদের বাড়ীর

দোরে-সে এসে দাঁড়ায়। সে তখন ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ে। কালো রোগা ছেলেটী, ভাসাভাসা চোখ, ললাটে ঘামের রেখা, মুখে অনভ্যস্ততার লজ্জা, গোপনতার সঙ্কোচ—

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে এসে রেখার নারী হৃদয় বোধ করি এরই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল। মুহূর্ত্তের পরিচয়-ক্ষণে লাভ-লোকসানের দিকে না চেয়ে সে নিঃশেষে আপনাকে রজতের পায়ে বিলিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌ল। হিতৈষীর দল সমস্বরে তাকে সচেতন ক'রে দিতে চাইল—এ পথ তার জন্য বিধাতা তৈরী করে নি—এখন না ফির্‌লে শেষে দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাক্‌বে না।

কিন্তু তাদের সে কথায় কাণ দেবার সময় বা সুযোগ তার ছিল না। রজতের দেওয়া আধফোটা কবিতার উপহার গুঞ্জন সুরে তার কাণে অমিয়া ঢালত। চুপটী ক'রে রজতের কোলে মাথা রেখে সে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটা দিনের কথা তার বিশেষ ক'রে মনে আছে। বর্ষার অপরাহ্নে রজতের কোলে মাথা দিয়ে সে শুয়ে রজত মৃদুস্বরে কবিতা আবৃত্তি করছিল,—

—"জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পারে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্য্যে তোমার! বাজিবে তোমার সুর
সর্ব্বদেহে মনে! জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রতিকাজে
রবে তব শুভ হস্ত দু'টী, গৃহ মাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি!"

আর একদিন তার দু'টী হাত নিজের বুকে চেপে ধ'রে বলেছিল—

—"শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্ব্বাঙ্গ মন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমার আমারে! নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া!
তোমার হৃদয় কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়-তন্ত্রী করিয়া প্রহত
সঙ্গীত তরঙ্গ ধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি,
সমস্ত জীবনব্যাপি থরথর করি!

হায় রে! আজ কোথায় সে দিন! লেখার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল,—কেমন ক'রে সেই সব আদরের তীব্রতা কমে রজতের মনে ধীরে ধীরে একটা সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্যের ভাব মাথা তুলে দাঁড়াল। তারপর সুরু হোল লেখার মান-অভিমানের খেলা! সে যে অভিমান করেছে, প্রতি ক্ষেত্রে সেটা রজতকে জানিয়ে দিলে। প্রথম প্রথম রজত একটু-আধটু মানভঞ্জনের পালা গাইত; ক্রমে তার অভিমানটাকেও সে তুচ্ছ ক'রে যেতে লাগল। অসহ্য জ্বালায় লেখার মন ভ'রে উঠল—কিন্তু উপায় কি? বিশ্বের হাটে যে দেউলিয়া নাম লিখিয়ে বসে' আছে, মহাজনের পদবী তার আস্‌বে কোথা থেকে?

হঠাৎ লেখার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তার নন্দরাণী নামটা এক দিন রজতের কাণে আনন্দ দিতে পারে নি বলে সে আদর করে তার নাম রেখেছিল লেখা। এই নামটা ধরে' ডেকে যেন তার আর তৃপ্তি হত না! কিন্তু, এখন? হায়! ক'টা বছর যেতে-না-যেতেই সব শেষ হয়ে গেল!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোল—রাত্রিও বেড়ে চলল—আকাশ তার একঘেয়ে অশ্রান্ত বর্ষণের ঝমঝম শব্দে চারিদিক ভারী ক'রে তুলতে লাগল। অন্ধকার ঘরে বসে' বসে' বহুক্ষণ বাদে লেখার দু' চোখ বেয়ে আকুলধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। মানুষের বাসনা কি এমনি চঞ্চল!

* * *

পরের দিন থেকে লেখার সহকর্ম্মিণীদের কাছ থেকে অজস্র বিদ্রূপ সুরু হোল। ভদ্র-লোকের ছেলের দু'দিনের সোহাগে সে ধরা-খানাকে সরার মতই দেখেছিল; অথচ যারা ওই পথে বহুদিন থেকে আছে, তাদের গ্রাহ্য পর্য্যন্ত কর্‌ত না। এখন গেল ত!

দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। এমন ক'রে যে চল্‌বে না, একথা লেখা বহুদিনই বুঝেছিল এবং স্মরণ করিয়ে দেবার লোকেরও অভাব ছিল না। কিন্তু আবার পঙ্কিল পথে পা দিতে তার মোটে ইচ্ছা কর্‌ছিল না; মনে হ'লে তার ভয়ানক কান্না পেত। কিন্তু হাতের টাকা ক্রমে ফুরিয়ে এল; আর রজতের কাছে চাইবারও তার প্রবৃত্তি হোল না—যে লাথি মেরে চলে গেল, তার পায়ে ধর্‌তে হ'বে? ছিঃ! সমস্তদিনউপোষ ক'রে পড়ে থেকে সন্ধ্যার আগে অন্য মেয়েদের তাড়নায় হাড়িকাঠের পথে পাঁঠার মত সেদিন সে কলঘরের দিকে গা ধুতে যাত্রা কর্‌লে। তারপর সাজসজ্জা ক'রে ছাদে উঠে গিয়ে বসে রইল।

খবর এল—"বাবু এসেছে।"

দোরের কাছে দাঁড়িয়ে যেতেই পেছন থেকে তাড়া এল, "আবার থম্‌কে দাঁড়ালি কেন? এগিয়ে যা না—মাইরি, এত ঢংও জানিস!"

ঘরে ঢুকে লেখা এক পাশে সন্তর্পণে বসে' পড়্‌ল। বাবুর রসিকতার চেষ্টা আছে! একটু হেসে বল্‌লেন "তুমি ত দেখি নিজের মা'গের মতই লজ্জা কর্‌ছ—এ্যা—হ্যাঃ হ্যাঃ—"

ও তরফ থেকে সাড়া এল না; বাবুটী পুনরায় প্রশ্ন কর্‌লেন, "তোমার নাম কি?"

"লে"—বল্‌তে গিয়ে থেমে আস্‌তে আস্‌তে সে বল্‌লে, "নন্দরাণী"

"বেশ, বেশ—শোন, এ ধারে এস—"

গায়ে হাত দিতেই লেখা সোজা উঠে দাঁড়াল। পরমুহূর্ত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ীওয়ালী 'হাঁ হাঁ' করে এসে পড়্‌লেন; বল্‌লেন, "চলে এলি যে?"

"ওকে তাড়িয়ে দাও মাসি, ও মদ খায়।"

"ওঃ, মদ খায়! ওরে আমার নেকী রে!" বিশ্রী একটা কটূক্তি ক'রে তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠ্‌লেন।

"যা', ঘরে গিয়ে যত্ন ক'রে বসা গে।"

"না মাসি, সে আমি পার্‌ব না। ওকে তাড়িয়ে দাও; নইলে আমি গলায় দড়ী দেব, নয় পুলিসে খবর দেব।"

বাড়ীওয়ালী গালে হাত দিয়ে বল্‌লে, "ধন্যি মেয়ে বটে বাছা! যা' জানো কর; তবে ভাড়াটা জড়িয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব না—এ কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে রাখ্‌লুম।"

বছর তিনেক পরের কথা। একদিন খুঁজ্‌তে খুঁজতে লেখা রজতের বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। রজত তখন বাইরের ঘরে বসে আছে। আগেকার চেয়ে একটু মোটা হয়েছে। পাশে কতকগুলি বন্ধু, তাদের সঙ্গে ইয়ারকী চলেছে—যেন আনন্দের স্রোতে সারা পৃথিবীটাই আজ তারা ভাসিয়ে দিতে চায়! লেখার বুক যেন চেপে আস্‌তে লাগ্‌ল—দম বন্ধ হয়ে এল! সে মূর্চ্ছাহতার মতো দরজার এক কোণে এসে মাথা দিয়ে দাঁড়াল।

তারপর থেকে প্রত্যহ তার গোপন অভিসার সুরু হোল। এই একবার মাত্র তাকে দূর থেকে দেখ্‌বার জন্য তার সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে থাক্‌ত। যেদিন দেখ্‌তে পেত, সেদিন সমস্ত রাত্রি যেন তাকে অন্তরে-অন্তরে আলিঙ্গন কর্‌তে থাক্‌ত! আর যেদিন দেখা হ'ত না, সেদিন মনে হ'ত, যেন সারাদিন ব্যর্থ হয়ে গেল!

সহসা একদিন দেখ্‌লে বাড়ী থেকে একটা চাকর একটী ছোট ছেলে কোলে ক'রে বেরুচ্ছে। দেখেই সে চিন্‌তে পার্‌লে এ রজতের ছেলে।

সে চাকরটাকে একটু আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি এই বাড়ীতে থাক ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মা ঠাক্‌রুণ।"

"ছেলেটি বাবুর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"—মানে, রজতবাবুর ?"

"আজ্ঞে।"

লেখা আগ্রহে হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে কর্‌লে। তারপর গভীর আলিঙ্গনে তাকে বুকে চেপে ধর্‌লে—মা যেমন ক'রে তার ছেলেকে আলিঙ্গন করে!

চাকরের হাতে আঁচল থেকে দু'টী টাকা বার ক'রে দিয়ে তার বিস্মিত দৃষ্টিকে লজ্জিত ক'রে দিলে। তারপর মিনতি ক'রে বল্‌লে, "বাবা, তুমি খোকাকে নিয়ে যখন বেড়াতে বেরোবে, তখন আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে ? অনেক টাকা দেব।"

চাকর ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না মা, বাবু জান্‌তে পার্‌লে শির বাঁচ্‌বে না। সে আমি পার্‌ব না।"

লেখার কোনও লজ্জাই ছিল না ; সে বল্‌লে, "না হয় আমি রোজ এইখানে আস্‌ব ; তুমি ওকে নিয়ে এস। পার্‌বে ত ?"

বারকতক ইতস্ততঃ ক'রে সে রাজী হোল। তখন লেখা আর একবার ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে' চুমো খেয়ে তাকে চাকরের কোলে ফিরিয়ে দিলে। ঠিক্ সেই সময় পেছন থেকে শোনা গেল, "এই খোকাকে নিয়ে এখানে কেন এসেছিস্ ?"

প্রশ্নকর্ত্তা রজত। চোখে চোখ মিল্‌ল। লেখার মুখ ছায়ের মত সাদা হয়ে গেল। রজত বল্‌লে, "লেখা, তুমি!"

তারপর ফিরে চাকরকে বল্‌লে, "তুই এইরকম ক'রে খোকাকে নিয়ে যেখানে সেখানে যাস্, আর যার তার কাছে দিস ; দাঁড়া, আজ তোর পিঠের চামড়া তুল্‌ব। যা' এখান থেকে নিয়ে যা'।"

চাকর তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। রজত বল্‌লে, "এ আবার কি নতুন ঢং লেখা! আজ-কাল ছেলে ধরা ব্যবসা করছ না কি ? তারপর, এখন তুমি কার কাছে আছ ? চেহারা ত বিশেষ ভাল দেখ্‌ছি না।"

লেখা চুপ ক'রে রইল। রজত বলেই চল্‌ল, "বন্ধু-বান্ধবেরা ধরেছে একটা গার্ডেন পার্টি দেবার জন্য। দু'-চারজন মেয়েমানুষও আন্‌তে হবে। খবর দেব ; যদি তোমার সময় থাকে ত তুমিও যেও। আর টাকাকড়ির কিছু দরকার হয় ত বল' ; সেদিন কিছু দিয়ে দেব 'খন।"

রজত শেষের কথাটা বল্‌বার আগে লেখার নিরাভরণ দেহের দিকে চেয়েছিল। লেখা কাপড়টা ভাল ক'রে গায়ে টেনে দিলে।

রজত বল্‌লে, "যাই এখন ; কে আবার দেখে ফেল্‌বে। তুমিও অমন ক'রে রাস্তায়-ঘাটে চাকর-বাকরকে ডেক না ; নানারকম কথা হ'তে পারে, বুঝেছ ?"

লেখা কথা বল্‌তে পার্‌লে না ; শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে, "আচ্ছা!"

—হানাবাড়ি—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,বি এল

তখন প্রায় রাত্রি ন'টার কাছাকাছি। উল্টা-ডিঙ্গির খালের ধারে একটা চায়ের দোকানে চারি বন্ধুতে তর্ক চলছিল।

সুনির্ম্মল বল্‌ছিল, "সব বাজে কথা—হ্যাঁ, বাড়ীটায় ক'কজন মারা পড়েছে মানি—কিন্তু এমন একটাও বাড়ী দেখাতে পার, যেখানে কখনও কেউ মরে নি। ভাঙ্গা ঝর্‌ঝরে বাড়ী, দরজা জানালাগুলা নড়্‌নড়্ কর্‌ছে, একটু বাতাস বইলেই নানারকম শব্দ হয়—ভীতু লোকে অমনি রটিয়ে দেয়—ভূত কাঁদ্‌ছে—ভূত, না ঘোড়ার ডিম!"

প্রতাপ আর অমিয় তাদের চায়ের শূন্য বাটী দু'টা তক্তা বারকরা পুরান টেবিলের উপর রেখে তার মুখের দিকে এমনিভাবে তাকিয়ে রইল, যা' দেখে সুনির্ম্মল সত্যিসত্যিই হেসে ফেল্‌লে।

অমিয় একটু আমতা-আমতা ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আচ্ছা, কালী-দা' তুমিও কি ও সব বিশ্বাস কর, না?"

কালীধন টেবিলের একধারে বসে' তার চায়ের বাটীটায় একটু একটু চুমুক দিতে দিতে চা-টা বেশ আরাম ক'রে উপভোগ কর্‌ছিল। অমিয় যে-সুনির্ম্মলের কাছে কোনও রকম উৎসাহ পেয়ে অবশেষে তার কাছে কিছু প্রত্যাশা কর্‌ছে, সেটা বুঝতে পেরে বল্‌লে,"আমি ওর মাঝামাঝি; ভূতও মানি, ভবিষ্যৎও মানি।"

প্রতাপ এবার একটু সাহস পেয়ে বল্‌লে," ওঃ! শুনে যদি বল্‌লে যে ভূত নেই, ত একদম নেই। আমার এক জ্যাঠাই স্বচক্ষে দেখেছিলেন,—একটা—।"

অমিয় বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বল্‌লে,"যা' বল্‌লে, প্রতাপ-দা'—সুনির্ম্মল দিন দিন ঘোরতর না স্তক হয়ে যাচ্ছে—ভূত মানে না।"

সুনির্ম্মল হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "কিন্তু এর মধ্যে সব চেয়ে মজা কি জানিস্ অমিয়, সবাই বলে অমুক দেখেছে; আমি দেখেছি,—এ কথা কাউকে বল্‌তে শুনেছিস্?"

কালীধন বল্‌লে, "আচ্ছা নির্ম্মল, যদি তোর বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারি?"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "চিরকাল তোমার নাম কর্‌তে থাক্‌ব। তুমি ত আমায় নতুন কিছু শিখিয়ে দেবে তা' হ'লে!"

কালীধন বল্‌লে, "এই রাস্তাটা বরাবর সোজা পূবদিকে চলে গ্যাছে জানিস্ ত - রেল লাইনটা পার হয়েই সাম্‌নে যে বড়বাড়ীটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, লোকে বলে ওটা হানা বাড়ী—ও বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত যতগুলো ভাড়াটে এসেছে, তাদের মধ্যে একজন-না-একজন আস্‌বার ঠিক দু'-একদিনের মধ্যেই নিশ্চয় মরেছে। সেই থেকে ও বাড়ীটা আর কেউ ভাড়া নিতে চায় না; বাড়ীটা অমনি খালি পড়ে রয়েছে—প্রায় পাঁচ-ছ'বৎসরের উপর বাড়ীটা খালি।"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "তা' এতদিন ত হবেই; তা' না হ'লে গল্পটা ঠিক্ জমে উঠ্‌বে কেন?"

অমিয় বল্‌লে, "আচ্ছা, দশ টাকা বাজী, যদি তুই ও বাড়ীতে একলা একটা রাত কাটাতে পারিস্।"

প্রতাপ বল্‌লে, "আমারও পঁচিশ।"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "আমি একলা ও বাড়ীতে কখনই থাক্‌ব না, তোদের বাজীর লোভেও না।"

প্রতাপ ব্যঙ্গের স্বরে বল্‌লে, "ভূতের ভয়ে?"

কালীধন বল্‌লে, তুই ত ভূত মানিস্ না; তবে কি জন্তু-জানোয়ারের ভয় ?"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "তা' তোমরা যাই কেন ভাব না কালী-দা' ।"

কালীধন বল্‌লে, "আচ্ছা, সুনির্ম্মলের কথা থাক্—চল্ না আমরা সকলে মিলেই যাই। আমরা চারজন আছি, ভয়টয় হয় ত নাও পেতে পারি—তা' হ'লে এতদিনকার একটা মিথ্যে ভয় সন্দেহ ভেঙ্গে যাবে। বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে এক-দিনের ফিষ্টের খরচাও আদায় ক'রে নেওয়া যাবে 'খন। কি বলিস্ তোরা ?"

ফিষ্ট্—স্ফূর্ত্তি—সবাই তখুনি রাজী হয়ে গেল।

অমিয় বল্‌লে, "আমরা যে হানাবাড়ীতে যাচ্ছি, একথাটা কিন্তু চাওয়ালাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত—বলা ত যায় না—যদি কিছু ভালমন্দ ঘটে—ও তবু সকালে একটা খবর দিতে পার্‌বে।"

কালীধন তার কথায় রাজী হ'ল ।

চাওয়ালা সব শুনে বল্‌লে, "কি সর্ব্বনাশ! আপনারা যাবেন ওই হানাবাড়ীতে—এই সেদিন একটা লোক ওই বাড়ীতে মারা পড়েছে !"

অমিয় ও প্রতাপ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কি, কি রকমটা মশায় ?"

চাওয়ালা বল্‌লে, "একটা ভিখিরী ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ওখানে উঠেছিল—সকালে দেখা গেল যে, সে মরে উঠনের ধারে পড়ে আছে।"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "ব্যাটা অনেকদিন খেতে পায় নি - খিদের জ্বালায় মাথা বিগড়ে গিয়েছিল—হয় ত তা'তেই আত্মহত্যা করেছে—বাড়ীটার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ?"

চাওয়ালা বল্‌লে, "না মশায়, ওখানে যাবার আগে সবাই ত আমরা তাকে দেখেছিলাম—আত্মহত্যা কর্‌বার মত কোন লক্ষণ তার ছিল না।"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "সে যাই হোক্, আমরা নিজে গিয়ে স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখে আস্‌ব আজ।"

চাওয়ালা বল্‌লে, "বারণ কর্‌লুম, আপনারা যদি না শোনেন, কি কর্‌ব ?"

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। খালের রাস্তাটা প্রায় জনশূন্য; কচিৎ দু' একটা লোক পথ দিয়ে যাতায়াত কর্‌ছে। রাস্তার দু' পাশের বস্তির আলোগুলো প্রায় নিভে এসেছে। দূরে রেল লাইনের উপরের আলোটা প্রকাণ্ড হয়ে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বল্‌ছিল। চারি বন্ধুতে হানাবাড়ীর দিকে যাত্রা কর্‌লে।

খানিকটা পথ চলার পর, অমিয় বল্‌লে, "সুনির্ম্মলটার একটা খেয়াল মেটাতে আমাদের আজ ঘুম মাটী—আরও কত যে কপালে দুঃখ আছে, কে জানে !"

কালীধন বল্‌লে, "আ রে, ঘাব্‌ড়াচ্ছিস্ কেন অমি—আমরা ত একটা সৎকাজেই যাচ্ছি—পরের উপকার কর্‌তে হ'লে নিজেদের একটু কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয়। প্রতাপ বাতিগুলো ঠিক্ ক'রে নিয়েছিস্ ত ?"

প্রতাপ বল্‌লে, "হাঁ ; গোটা তিন-চার যা' ঐ দোকানটায় পেলুম, তা' নিয়েছি।"

রেল লাইনটা পার হবার পর থেকেই রাস্তাটায় বিষম অন্ধকার চাঁদের মিট্‌মিটে আলোতে যা' অল্প অল্প পথ দেখা যাচ্ছিল, তাই-তেই তারা এগিয়ে চল্‌ছিল। মাঝে মাঝে যেখানে ঘন গাছপালায় রাস্তাটা অন্ধকার হয়ে গেছে, সেখানে তারা দু'-চারবার হোঁচট খাচ্ছিল।

প্রতাপ একবার বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "একেই বলে 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়' ! কোথায় আরাম ক'রে বাড়ীতে ঘুমুতুম, তা' নয়, চলেছি ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে। আর কতটা কালী-দা' ?"

কালীধন বল্‌লে, "প্রায় এসে পড়েছি—একটু এগিয়ে গেলেই সাম্‌নে।"

সকলে নিঃশব্দে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল। কেবল প্রতাপ মাঝে মাঝে সুনির্ম্মলকে আজকের এই কর্ম্মভোগের জন্যে গালাগালি দিচ্ছিল।

বাড়ীটা ঘন গাছপালায় একেবারে যেন চাপা পড়েছে—সাম্‌নে থেকে প্রায় কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। গেট থেকে যে রাস্তাটা বরাবর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছে, সেটা প্রায় আগাছায় অদৃশ্য। কোনও রকমে হাতড়াতে হাতড়াতে চার বন্ধুতে বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

কালীধন বল্‌লে, "কপাটটা বোধ হয় বন্ধ—চল্, পিছনের জানালা দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢোকা যাক্।"

সুনির্ম্মল বললে, "জানালা দিয়ে কেন? আমরা চোর না কি? ভদ্রলোকের মত সাম্‌নের দরজা দিয়েই ঢুক্‌ব।" এই বলে' সে খুব জোরে দরজার কড়াটা নেড়ে দিলে।

অমিয় বললে, "কি পাগ্‌লামী কর্‌ছিস্ নির্ম্মল?"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "ভূতের বাড়ী—ভূতুড়ে চাকরগুলা হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছে—কড়া নেড়ে তাদের জাগিয়ে দিচ্ছি—এতগুলো ভদ্রলোক এসেছে—দরজা খুলে দিক্।" কড়াটা আরও জোরে নেড়ে দিয়ে একটু সাম্‌নের দিকে ঠেল্‌তেই দরজাটা খুলে গেল।

সুনির্ম্মল বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে বল্‌লে, "বাঃ, দরজাটা ত খোলাই রয়েছে দেখ্‌ছি! চলে এস সব।"

প্রতাপ বল্‌লে, "কক্ষণ না! এসে দেখ্‌লাম দরজা বন্ধ—এখন বল্‌ছ খোলা—নিশ্চয়ই ভেতর থেকে কেউ খুলে দিয়েছে।"

কালীধন বল্‌লে, "ওসব কথা এখন বলতে নেই রে, দেশলাই বার কর্—আলোটা জ্বাল্‌তে হবে।"

সুনির্ম্মল পকেট থেকে একটা দেশালাই বার ক'রে দিলে; কালীধন হাত আড়াল দিয়ে বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে বরাবর উঠনের দিকে এগিয়ে গেল।

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও; বড় বাতাসের জোর; বাতিটা নিভে যাবে।"

পিছন থেকে প্রতাপ বল্‌লে, "দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।"

অমিয় পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কে বন্ধ কর্‌লে?"

সকলেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে প্রতাপের দিকে তাকালে। প্রতাপ একটু থতমত খেয়ে বল্‌লে, "হয় ত আমিই—কিন্তু কখন করেছি মনে পড়্‌ছে না।"

কালীধন কি-একটা বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল। সে বেশ ক'রে হাতের চেটোটা গোল ক'রে ধরে' বাতির আলোটা বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল। তারা যতই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ততই মনে হচ্ছিল, যেন দেওয়ালের ছায়াগুলাও সব নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে যেতে যেতে দেওয়ালের কোণে গিয়ে সব মিলিয়ে গেল।

দোতলায় ওঠ্‌বার সিঁড়ির ধাপে পা দিয়েই কালীধন বল্‌লে, "সাম্‌লে।"

তারপর আলোটা সাম্‌নে ধর্‌তে সকলে সিঁড়ির ধারে সব ভাঙ্গাচোরাগুলো দেখে দেখে সাবধানে ওপরে উঠে গেল।

সুনির্ম্মল সিঁড়ির একটা ভাঙ্গা জায়গা দেখিয়ে বল্‌লে, "হয় ত এইখান থেকে পড়ে ভিখিরীটা মরেছে।"

অমিয় বল্‌লে, "বাড়ীর চারিদিকই ত ভাঙ্গাচোরা; একটা ভাল ঘর দেখে নিয়ে চল একটা ঘুম দেওয়া যাক্। প্রতাপ, তোমার বিড়িগুলো কি হ'ল?"

প্রতাপ বল্‌লে, "পকেটের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু দু'হাত জোড়া, দিতে পার্‌ছি না।"

কালীধন আলো নিয়ে সবার আগে যাচ্ছিল;

সে একটা ঘরের দরজা খুলে বল্‌লে, "চল্, এই ঘরটাতেই বসা যাক্।"

ছোট্ট ঘর। সামনের বাগানের দিকে দু'টা জান্‌লা; আর একটা জান্‌লা, একটা দরজা উঠানের উপরের বারান্দার দিকে।

কালীধন বাতিটা একটা জান্‌লার মাথার উপরের তাকে বসিয়ে দিলে। সকলে মেঝের উপর বসে পড়্‌ল।

প্রতাপ পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিলটা বার ক'রে সকলকে একটা একটা বিড়ি দিয়ে বল্‌লে, "ব্যস্, আর কোথাও না বাবা; স্বর্গে যেতে বল্‌লেও আর 'পাদমেকং না গচ্ছামি'।"

অমিয় বিড়িটা ধরিয়ে জোরে দুটো টান দিয়ে বল্‌লে, "সব ত হ'ল; কিন্তু জল চাই যে - তেষ্টায় ছাতি ফাটবার উপক্রম হয়েছে।"

সুনির্ম্মল হেসে বললে, "হয় ত সাহেব বাড়ীতেই এসেছি—ঘণ্টা বাজাও—জল আপনি চলে আস্‌বে।" তার গলাটা যেন একটু ধরা-ধরা —কিন্তু কেউ সেটা লক্ষ্য কর্‌লে না।

প্রতাপ গোড়া থেকেই সুনির্ম্মলের উপর চটে ছিল; সে বল্‌লে, "দেখ্ নির্ম্মল, ফের যদি চ্যাঙড়ামি কর্‌বি ত চাঁটিয়ে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

কালীধন বল্‌লে, "আচ্ছা নির্ম্মল, তুই ত ভূত মানিস্ না, তোর আর ভয় কি? যা' না, একটু জল যোগাড় ক'রে আন্ না।"

সুনির্ম্মল কোনও জবাব দিলে না—সুধু একটু হাস্‌লে।

অমিয় বল্‌লে, "আর এখানে থেকে কাজ নেই কালী-দা'। অনেকক্ষণ ত থাকা গেল—চল, এইবার ফেরা যাক্। ভূত না হয় নাই বিশ্বাস কর্‌লে—কিন্তু লোকের নার্ভস্‌এর উপর ত কারুর কোনও হাত নেই। যত খুসী তোমরা হাসতে পার; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বল্‌ছি,—নীচে দরজা বন্ধ করার শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "আমিও যেন ওই রকম কি-একটা শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলুম।"

কালীধন হো-হো ক'রে হেসে বল্‌লে—"সাবাস্ নির্ম্মল, এর মধ্যেই বিশ্বাস কর্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিস্! তবুও এখনও সবটা শেষ হয় নি—এরপর ত তুই গোঁড়া ভূতভক্ত হয়ে পড়্‌বি। এখন একটু জল আন্‌বি?"

সুনির্ম্মল খুব জোরে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না।"

প্রতাপ বল্‌লে, "জীবনের একটা রাত যদি জল না পাওয়া যায়, তা'তে বিশেষ কিছু ক্ষতি আছে বলে' মনে করি না—চুলোয় যাক্ জল—এখন কোনও রকমে বাকী রাতটা কাটিয়ে দিতে পার্‌লে হয়।"

অমিয় শেষে রাজী হ'ল যে, জল না হ'লে তার সে রাতটায় বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।

চার জনে মেঝের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে নিঃশব্দে বিড়ি টান্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরে সুনির্ম্মল উঠে বসে বল্‌লে, "দূর ছাই! ঘুম ত আসে না; চুপচাপ বসে থাকাও অসম্ভব। একটা যা' হয় কিছু কর্‌তে হবে।"

বাকী তিনজনও একে একে উঠে পড়্‌ল। তারপর ভয় ভাঙ্গাবার জন্য তারা নানা রকম মতলব আরম্ভ কর্‌লে। প্রতাপ চীৎকার ক'রে গান জুড়ে দিলে—অমিয় আর নির্ম্মল দু'জনে এত চ্যাঁচামেচি সুরু ক'রে দিলে যে, বুঝি বা পুরান বাড়ীর দেওয়ালগুলা সব খসে পড়ে যায়।

হঠাৎ বাতিটা নিভে গেল। কালীধনের মনে হ'ল তার মাথার উপর কি একটা পড়্‌ল—সে চমকে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও লাফিয়ে উঠে পড়ল। কালীধন হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে, "বাতিটা ভাল ক'রে আঁটা ছিল না, তাই পড়ে নিভে গেল।"

সুনির্ম্মল দেশালাই বার ক'রে বাতিটা

আবার জ্বালিয়ে তাকের উপর রেখে দিলে। তারপর সকলেই মেঝের উপর বসে পড়্‌ল।

কালীধন বল্‌লে, "আমি বল্‌ছিলাম কি—কালকে—"

অমিয় হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরে' বল্‌লে "কালী-দা', কে যেন হাস্‌ছে—শুন্‌তে পাচ্ছ না?"

সুনির্ম্মল বল্‌লে, "যথেষ্ট হয়েছে—আর না—চল ফিরে যাই। আমিও যেন কেমন-একটা শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি—পাশের ঘরে কে যেন নড়ে বেড়াচ্ছে। হয় ত আমার মনের ভুল—কিন্তু তা' হ'লেও যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।"

কালীধন তাকে ভয় দেখাবার জন্যে বল্‌ল, "যেতে হয় একলা যাও; আমরা কেউ যাচ্ছি না।" তারপর একটু হেসে বল্লে, "যদি রাস্তা না চিনতে পার, ভিখিরীটা হয় ত পথ দেখিয়ে দেবে।"

সুনির্ম্মল রেগে গর্‌গর্‌ কর্‌তে কর্‌তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কালীধন অপর দু'জনের দিকে তাকিয়ে চোখটা একটু মট্‌কে বল্‌লে, "যাচ্ছ যাও; কিন্তু একটু চারিদিক চেয়ে সাবধানে চলো।"

সুনির্ম্মল দরজা থেকে ফিরে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে তাদের পাশে বসে পড়্‌ল। তারপর বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমি হয় ত খুব নার্ভাস্‌—কিন্তু আমি যা' বল্‌ছি সব ঠিক্‌। আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি,—কি যেন একটা ঘট্‌ছে; কি যেন চারিপাশে নড়ে বেড়াচ্ছে। আমার বুদ্ধি বল্‌ছে, সব ভুল! কিন্তু আমার মন বল্‌ছে,—সব ঠিক্‌! সব সত্যি!"

কালীধন আলোচনাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে বল্‌লে, "তোর একটা বিড়ি দে ত অমিয়।"

অমিয় কোনও সাড়া দিলে না।

কালীধন বল্‌লে, "কি রে, ঘুমুলি না কি?"

অমিয়র পাশে প্রতাপ বসে' ছিল। সে তাকে অল্প অল্প একটু নাড়া দিলে; তাতেও তার ঘুম ভাঙল না দেখে খুব জোরে নাড়া দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু অমিয় যেমন ঘুমুচ্ছিল, তেমনিই ঘুমুতে লাগ্‌ল।

কালীধন তার মাথাটা নিয়ে বারকতক ঝাঁকি দিয়ে বল্‌লে, "হতভাগাটা মড়ার মত ঘুমুচ্ছে। যাক্‌, আমরা তিনজন ত এখনও জেগে আছি।"

প্রতাপ জড়িতস্বরে বল্‌লে, "হয় ত—তবুও—"

কালীধন তাকে একটা ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তবুও কি রে? তোর মতলবখানা কি?"

প্রতাপ তার হাতখান চেপে ধরে' বললে, "অমিয়টাকে জাগাও কালী-দা'—কেমন যেন সব বিশ্রী লাগছে।"

কালীধন বল্‌লে, "কিন্তু অমিয় যে রকম ঘুমুচ্ছে, তা'তে আজকে ত দূরের কথা, কবে যে ঘুম ভাঙবে, তা' বলা যায় না।"

প্রতাপ প্রায় কাঁদকাঁদভাবে বল্‌লে, "আমিও ত সেই কথাই ভাব্‌ছি কালী-দা'।"

কালীধন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "ব্যস্‌, আর না—সত্যিই ব্যাপারটা ক্রমশঃই গুরুতর হয়ে পড়্‌ছে। প্রতাপ, তুই পা দু'টা ধর; নির্ম্মল, তুই বতিটা নে। ওকি—কে?—দরজায় কে টোকা দিলে না? ঠিক্‌ যেন সেই রকম শব্দ হ'ল একটা—তোরা শুন্‌তে পেয়েছিস্‌?"—তারপর খানিক চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "প্রতাপ, তোল। এক—দুই—ও কি রে—প্রতাপ—প্রতাপ!"

প্রতাপ কিন্তু ততক্ষণে একেবারে মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে এক সময়ে দু'টা হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সে মেঝের উপর কখন অসাড়ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কালীধন অনেক চেষ্টা ক'রে তাকে একটুও সজাগ কর্‌তে পার্‌লে না—তারপর যেন হতাশভাবে বল্‌লে, "প্রতাপটাও ঘুমুল!"

সুনির্ম্মল বাতিটা হাতে নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

কালীধন একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "চল্, নির্ম্মল, আমরা পালাই।"

সুনির্ম্মল একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে, "কিন্তু এদের ফেলে?"

কালীধন বল্‌লে, "নিশ্চয়ই! এরপর যদি তুইও ঘুমুস্? আমি এখনি পালিয়ে যাব।"

তারপর সুনির্ম্মলের হাতটা ধরে' চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে, "এখুনি—শীগ্‌গির - চ' পালাই!"

উত্তরে সুনির্ম্মল তার হাতটা ছাড়িয়ে শুধু বল্‌লে, "না, না!"

তারপর প্রতাপ ও অমিয়ের কাছে গিয়ে তাদের জাগাবার জন্য আবার কিছুক্ষণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর হতাশভাবে বল্‌লে, "না, বৃথা চেষ্টা! কিন্তু তুমিও কি ঘুমুবার চেষ্টায় আছ না কি?"

কালীধন খুব জোরে বারকতক মাথাটা নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "না, ঘুম কোথায়?"

সুনির্ম্মল বললে, "দরজাটা বন্ধ ক'রে দেওয়া যাক্; কি বল?"

কালীধন মাত্র মাথাটা নেড়ে সেকথায় সায় দিলে।

সুনির্ম্মল দরজাটা বন্ধ ক'রে ফিরে আস্‌তে আস্‌তেই দেখতে পেলে যে,—কালীধন একগাদা ধূলাবালির উপরেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে! সুনির্ম্মল ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌ল, "কালী-দা' কালী-দা'!"

কালীধনের কোনও সাড়া না পেয়ে সে মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মধ্যে বাতিটার মিট্‌মিটে আলোতে ঘুমন্ত লোকগুলার কালো কালো ছায়া দেওয়ালের উপর পড়ে বিভীষিকার সৃষ্টি কর্‌ছিল। ঘরের বাইরেও একটা অজানা আতঙ্ক যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে একটা চীৎকার ক'রে নিজেকে সজাগ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে—কিন্তু তার গলার ভেতর থেকে অস্ফুট একটা শব্দ ছাড়া কিছুই বার হ'ল না।

সে দু'-একবার ঘাড় নীচু ক'রে কি-একটা শব্দ শোন্‌বার চেষ্টা কর্‌লে; কিন্তু কোথাও কোনও শব্দ শুন্‌তে পেলে না। বাহিরের গম্ভীর নিস্তব্ধতা যেন আরও গম্ভীর থম্‌থমে হয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ সিঁড়িতে একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুন্‌তে পেয়ে সে চীৎকার করে বল্‌লে, "কে ওখানে?"

শব্দটা যেমন হঠাৎ আরম্ভ হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল।

সে দরজাটা খুলে বেরিয়ে একেবারে বারান্দার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তখন যেন তার সমস্ত ভয় চলে গেছে। সে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগল, "আয়, তোরা যে ক'টা আছিস, সব ক'টা আয়! সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড়া—দেখি একবার তোদের সব!"

তারপর সে হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল।

ঘরের ভিতর ঢুকে একবার সে ঘুমন্ত লোকগুলোকে দেখে নিলে; তারপর বারান্দা দিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই তার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

কালীধন এতক্ষণ চুপ ক'রে চোখ বুজে শুয়েছিল; এবার সে ভয় পেয়ে উঠে বস্‌ল। "প্রতাপ, প্রতাপ, ওঠ না, নির্ম্মলটার মাথা খারাপ হয়ে গেল বুঝি রে!"

কা'রও কোনও সাড়া নাই; সে বারকতক খুব জোরে জোরে দু'জনকে নাড়া দিয়ে দিলে—তখনও কোনও উত্তর নাই।

—"বেশ বেশ, তোরা কি ভাবছিস্? ভয় পাবার ছেলে নই, এটা বুঝি তোরা জানতিস না?" সে তাক থেকে বাতিটা নামিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে বাহিরের দিকটা একবার তাকিয়ে নিলে।

ঘন মসীঅন্ধকার—সামনের দু'হাত দূরের জিনিষগুলোও দেখা যায় কি না সন্দেহ! সমস্ত বাড়ীটা খাঁ খাঁ কর্‌ছে—তার সেই বিরাট

নিস্তব্ধতা যেন অন্ধকারটাকে আরও গাঢ় ক'রে তুলেছে !

কালীধনের হাতের বাতিটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল—সে কাণ পেতে বাইরের কোনও শব্দ শোনবার চেষ্টা করতে লাগল। তার মনে হ'ল,—সিঁড়িতে যেন কার ওপরে ওঠ্‌বার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে সাম্‌নে এগিয়ে সিঁড়ির ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সিঁড়ির এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে—কোনও প্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আবার সে ফিরে বারান্দায় দাঁড়াল। পায়ের শব্দটাও যেন ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

বাতিটার আলো যতদূর সম্ভব নীচে উঠনের উপর ফেলে সে চারিদিক দেখবার চেষ্টা কর্‌লে। বৃথা চেষ্টা—কোনও কিছুই দেখতে পেলে না। আর একবার পিছন ফিরে তাকালে—সেদিকেও কিছু দেখা যায় না। সে তখন নীচে নামবার জন্য সিঁড়িতে ফিরে এল। সে চীৎকার করে ডাকলে, "নির্ম্মল, নির্ম্মল, কোথা তুই ?" ফাঁকা বাড়ীটায় সে চীৎকারটা প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

কাঁপতে কাঁপতে সে সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে গেল ; তারপর আলোটা যতদূর সম্ভব এদিক-ওদিক ফেলে সে নীচেটা সব দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগল। খালি ঘরের বন্ধ দরজাগুলো খুলে তার ভিতরটা যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করতে লাগল—কিন্তু তার ভয় যেন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁপুনিটাও যেন খুব বেড়ে গেল।

হঠাৎ তার সামনে যেন কার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘরের দরজা একবার খুলেই তখুনিই বন্ধ হয়ে গেল ! সে ঘরের দিকে ছুটে এগিয়ে গেল, "নির্ম্মল, আমি, আমি !"

একটা দমকা বাতাসে তার হাতের বাতিটা নিভে গেল।

ঘরের ভিতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। সে স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হ'ল,—কে যেন এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে—মাথার উপরে দোতলার বারান্দায় কে যেন চলাফেরা করছে। সে ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাতড়াতে হাতড়াতে অন্ধকারে সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছল ; তারপর নিঃশব্দে সে সিঁড়ির ওপর উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। অন্ধকারের মধ্যে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ; কিন্তু তার মনে হ'ল,—কে যেন তার সামনে দিয়ে সরে গেল। কোনও রকম শব্দ না পেয়ে সে ছায়াটার অনুসরণ ক'রে এগিয়ে যেতে লাগল—ক্রমশঃ সে ছাতের কাছাকাছি এসে পড়ল—তখনও ছায়াটা যেন তার সামনে এগিয়ে এগিয়ে চলেছে—সে যতদূর সম্ভব চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে, "নির্ম্মল, নির্ম্মল, শোন্‌, দাঁড়া !"

ছায়াটা কিন্তু তখনও আগেকার মতই এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

একটা দমকা বাতাসে নীচেকার জানলার খড়খড়িগুলা একসঙ্গে একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ ক'রে উঠ্‌ল—পাশের গাছগুলাও যেন একসঙ্গে বিকট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—কালীধন সেই শব্দে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল—ছায়াটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। কালীধন ভয়ে পাথর হয়ে গেল। সে সুধুই জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌ল—"নির্ম্মল, তুই না কি রে ? নির্ম্মল তুই ?"

প্রত্যুত্তরে বাতাসটা সুধু একবার 'হা-হা' ক'রে উঠ্‌ল।

কালীধন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল—ছায়াটার নড়বার কিন্তু কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তখন সে সোজা নীচের দিকে ছুট দিলে ; দোতলায় নেমে পাগলের মত এঘর-ওঘর দৌড়োদৌড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল—বাড়ীটার এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে

বেড়াতে লাগল অমিয়দের সন্ধানে—কিন্তু তাদের কিছুতেই খুঁজে পেলে না। কান্নায় তার সমস্ত বুকটা একেবারে ভরে' উঠ্‌ল; কিন্তু চীৎকার ক'রে কাঁদবারও সাহস হ'ল না। কেবলই তার মনে হ'তে লাগল,—পায়ের শব্দগুলো বুঝি আরও কাছে এগিয়ে আসছে। সে একটা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়্‌ল; আবার তখনি সেখান থেকে বেরিয়ে এল। সে যথাসাধ্য জোরে সাম্‌নের দিকে দৌড়তে লাগ্‌ল। সে জান্‌ত যে, সিঁড়িটা বারান্দার একদম শেষের দিকে। সেই দিক লক্ষ্য ক'রে সে প্রাণপণে ছুট্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু পায়ের শব্দটা বরাবর ঠিক্ যেন তার পিছনে-পিছনেই চল্‌ছিল।

হঠাৎ একটা মোড়ের দিকে এসে সাম্‌লাতে না পেরে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়্‌ল; পা-টা একটু টলে উঠ্‌ল—তারপর হুম্‌ড়ি খেয়ে সোজা দোতলার বারান্দা থেকে সে নীচে পড়ে গেল।

* * *

ভোরের আলো সবেমাত্র জানলাগুলি দিয়ে উঁকি মারছিল। প্রতাপ চোখ রগড়'তে রগড়াতে মেঝের ওপর উঠে বস্‌ল। নতুন জায়গায় নিজেকে দেখতে পেয়ে, প্রথমটা সে একটু চমকে উঠ্‌ল—তারপর ক্রমশঃ সব ঘটনাগুলো আবছায়ার মত মনে পড়্‌তে লাগল।

অমিয়ও খানিকক্ষণ পরে উঠে তার পাশে গিয়ে বসল।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা দু'জন কোথায় গেল জানিস্?"

অমিয় বল্‌লে, "আমরা ঘুমুচ্ছিলাম দেখে হয় ত সোজা লম্বা দিয়েছে।"

তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে ঘুমের ঝোঁকটা কাটিয়ে তারা বেরুবার জন্য উঠে পড়্‌ল। বারান্দার এককোণে কে যেন শুয়ে রয়েছে, অমিয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল; সুনির্ম্মল তখনও ঘুমুচ্ছে; অমিয় বারকতক চীৎকার করে' নাম ধরে ডাকতেই সে চোখ চেয়ে দেখলে। তারপর নিজের অবস্থা দেখে সুনির্ম্মল বল্‌লে, "আমি এই-খানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কখন এলুম বল ত? আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না।"

প্রতাপ একটু হেসে বল্‌লে, "ঘুমুবার খুব চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছিলি ত?" তারপর সামনের ভাঙ্গা বারান্দাটা দেখিয়ে বল্‌লে, "আর এক পা—ব্যস্—চিরনিদ্রার ব্যবস্থা"!

তারপর একটু এগিয়ে সেই ফাঁকের মধ্যে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখেই একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে পিছিয়ে এল, "কি সর্ব্বনাশ! কালী-দা'!" তারপর আর কোনও কথা না বলে' তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল।

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অমিয় সুনির্ম্মলের পিছনে পিছনে নেমে এল।

উঠনের একটা পাশে কালীধনের মৃতদেহটা লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে—মুখটা নীচের দিকে মেঝের উপর গুঁজ্‌ড়ে পড়েছে—আর দুই কস্ বয়ে তখনও রক্ত পড়্‌ছে—টস্-টস্-টস্!

—টিউবওয়েল—

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

পাঁচ

রমেশ চলে' গেলে গৃহিণী বল্‌লেন—"আর রাত ক'রে কি হবে ; আমি কাজকর্ম্ম সেরে আসি।" এই বলে' তিনি চলে' গেলেন। ঘরের মধ্যে আমি আর নরেশ রইলাম।

নরেশ বল্‌ল—"বাবা, এবার পূজার সময় আমরা কোথাও বেড়াতে যাব না। আপনি গেল দু'বছর কোনখানে যাননি। আমি বলি কি, মাকে নিয়ে আপনি এবার বেড়িয়ে আসুন। সঙ্গে নিয়ে যান দীনেশকে আর রমেশকে।"

আমি বল্‌লাম "এবার একটু বেড়িয়ে আসবার কথা আমারও মনে হয়েছে ; তোমার সঙ্গে সে সম্বন্ধে পরামর্শ করব বলে'ও মনে ক'রছিলাম। তা দেখছে, আমার মনের কথা তুমি আগে থাকতেই জান্‌তে পেরেছ। কিন্তু, তোমায় ছেলে-মেয়ে ছেড়ে কি তোমার মা যেতে চাইবেন ? তিনি হয় ত বলে' বসবেন,—ছেলেমেয়ে' বৌমা সবাইকে নিয়ে যেতে হবে। আমি কি এতগুলিকে নিয়ে চল্‌তে পারব।"

নরেশ বল্‌ল—"না, না, অত লটবহর নিয়ে যাওয়া হবে না। সে সব আমি মাকে বলে' ঠিক করব। আপনি, মা, দীনেশ আর রমেশ ; আর একটা চাকর, একজন রাঁধুনী ; আর কেউ নয়। আপনাকে কোন গোলমালে থাকতে হবে না ; দীনেশ আর রমেশ সব গুছিয়ে চল্‌বে। দীনেশের বয়স কম হ'লে কি হয়। সে একেবারে একক্সপার্ট। সেবার আমাদের সঙ্গে যখন দীনেশ বোম্বাই গিয়েছিল, তখন আমাদের কিছু করতে হয় নি ; সবই সে করেছিল। তারপর তার সঙ্গী হবে রমেশ—একেবারে সোনায় সোহাগা। তাই ঠিক করব ; কি বলেন বাবা ?"

আমি বল্‌লাম—"রমেশ কি ক'রে যাবে। তাদের ছাপাখানার যে দশ দিনের বেশী ছুটী নেই। আমরা যদি যাই, তা' হ'লে ফিরতে যেমন ক'রে হোক একটা মাস ত বটেই।"

পরেশ বল্‌ল—"তা'তে কি। প্রেসের ম্যানেজার আপনাকে যথেষ্ট খাতির করেন। তিনি কি আর রমেশকে পনের-কুড়িদিনের ছুটী দেবেন না ? মাইনে দিতে না চান, বিনা মাইনেতেই ছুটী দেবেন।"

আমি বল্‌লাম—"তা' অবশ্য হ'তে পারে। কিন্তু, জান ত রমেশ বিধবার একমাত্র সন্তান ; ওর বড় বোনটীও নিঃসন্তান বিধবা। পুজোর সময় রমেশ বাড়ী না গেলে তাঁদের মনে যে কষ্ট হবে।"

পরেশ বল্‌ল—"এরই মধ্যে একটা শনিবার প্রেস কামাই ক'রে শুক্রবারে ও বাড়ী যাক্‌ না। সোমবার ফিরে আস্‌বে। আরও এক কাজ করা যেতে পারে। গঙ্গাস্নান করবার জন্য পূজার কিছু আগে রমেশের মাকে আর দিদিকে এখানে দিন কয়েকের জন্য আনলেই ত হয়।"

আমি বল্‌লাম—"রমেশ কি তা'তে সম্মত হবে ?"

পরেশ বল্‌ল "মা আর আপনি যদি বলেন, আর আমরা সবাই যদি 'বেশ, বেশ' ক'রে উঠি, তা হ'লে রমেশের সাধ্যও হবে না যে, সে অস্বীকার করে।"

আমি হেসে বললাম—"তোমার এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি পরেশ।"

পরেশ বল্‌ল—"তা' হ'লে আর দেরী করা হবে না। বেড়াতে যাওয়ার কথাটা এখন একেবারে চাপা থাক। ওঁরা এলে সুবিধামত কথাটা তোলা যাবে।"

রমেশ শুতে যাওয়ার পর আমাদের এই সব কথাবার্তা শেষ হ'তে বোধ হয় দশ-পনের মিনিট লেগেছিল; তার বেশী নয়। দেখি রমেশ তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত।

আমি বল্‌লাম—"কি হে, এখনও ঘুমুতে যাও নি?"

পরেশ বল্‌ল—"ওর বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে; তাই মায়ের কাছে এসেছে। কেমন, আমি ঠিক বলি নি রমেশ?"

রমেশ বল্‌ল—"বড়দা', আপনার কথার অর্দ্ধেক ঠিক, আর অর্দ্ধেক ভুল। আমি মায়ের কাছে এসেছি, এটা ঠিক; কিন্তু আমার ক্ষিদে পায় নি। একটা বিশেষ দরকার আছে।"

পরেশ বল্‌ল—"এই রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় মায়ের কাছে এমন কি দরকার, যার জন্য তুমি ঘুম কামাই ক'রে ছুটে এসেছে?"

রমেশ বল্‌ল—"মা না এলে সে কথা হবে না।"

গৃহিণী দুয়ারের গোড়ায় এসে ছিলেন, এই কথা শুনে আর বিলম্ব না ক'রে ঘরের মধ্যে এসে বললেন—"কি রমেশ, এত রাত্রে মায়ের খোঁজ পড়ল কেন; ক্ষিদে পেয়েছি বুঝি?

নরেশ বলল—"আমিও সেই কথা বল্‌তেই তোমার ছেলে বল্‌লেন, ওটা মিথ্যা কথা। ওঁর আর একটা কি না কি বিশেষ দরকার আছে। আমরা বাইরে যাব না কি রমেশ?"

রমেশ বল্‌ল—"দেখ্‌ছেন মা, দাদার সব কথাতেই তামাসা।"

গৃহিণী বল্‌লেন—"যাক ও সব; তোমার কথাটা কি, বল ত?"

রমেশ বল্‌ল—"আমি ত ঘরে গিয়ে শুয়ে-ছিলামই; কিন্তু ঘুম যে এলো না মা! আমি ভারি একটা অন্যায় কাজ না বুঝে ক'রে ফেলিছি। আপনাদের কাছে সে কথাটা না বল্‌লে আমি রাত্রে ঘুমুতে পারব না।"

পরেশ বল্‌ল—"এমন কি অন্যায় কাজ তুমি ক'রে বসেছ রমেশ? আমাদের ত দৃঢ় বিশ্বাস তোমার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হ'তেই পারে না।'

রমেশ বল্‌ল—"শুন্‌ছেন মা, বড়দা'র কথা। উনি নিজে কখনও কোন অন্যায় কাজ করেন না, করতে পারেন না; তাই উনি মনে করেন, সবাই ওঁরই মত শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সিংহ। কেমন মা, ঠিক বলি নি?"

পরেশ শেষে বল্‌ল—"বাবা, আপনিও কোন দিন আমাকে এমন সার্টিফিকেট দেন নি। তা' যাক্, তোমার অন্যায় কার্য্যের কথাটা বলে' ফেল না ভাই; আমি শুনে নিশ্চিন্ত মনে শুতে যাই।"

রমেশ বল্‌ল—"মা, এই একটু আগে প্রেস থেকে এসে আপনার কাছে যে চারটে পয়সা দিলাম, সে কাজটা কি ভাল হয়েছে?"

পরেশ বল্‌ল—"কোন কাজটা? মায়ের হাতে চারটী পয়সা দেওয়ায় তাকে তুচ্ছ করা হয়েছে, এই কি তুমি বল্‌তে চাও?"

রমেশ বলল—"শুন্‌লেন মা বড়দাদার কথা; তিনি তামাসা ছাড়া কথা বল্‌তেই পারেন না। আমি কি তাই বল্‌ছি। মা, আপনার এই বড় ছেলেটীর বুদ্ধি বড় কম।"

গৃহিণী সহাস্যমুখে বললেন—"ঠিক বলেছ বাবা। আমার এই পরেশটার বিষয়বুদ্ধি একটুও নেই। ও যে কি ক'রে অতবড় চাকরীটা করে, তাই আমি দিনরাত ভাবি। যাক্ গে সে কথা; এখন তুমি বল, কোন্ কাজটা ভাল হয় নি?

কারই পক্ষে তা' ভাল হয় নি—তোমার না আমার।"

পরেশ বল্‌ল—"শুনার জন্যই ত বসে আছি, তুমি যে খুলে কোন কথাই বল্‌ছ না।"

রমেশ বল্‌ল—"কথাটা কি জানেন মা, প্রেসের ম্যানেজারবাবু যে জলপানি ব'লে প্রত্যেককে দু' আনা ক'রে পয়সা দিয়েছিলেন, সে কিসের জন্য ?"

গৃহিণী বল্‌লেন—"তোমাদের জলযোগের জন্য।"

রমেশ বল্‌ল—"এই দেখুন। জলযোগের জন্য যে দিয়েছেন, তা' ত সকলেই জানে।"

আমি বল্‌লাম—"তাঁর এই দু' আনা দেওয়ার মধ্যে ত কোন অন্যায় নেই। তোমরা সেই সকালে ন'টায় কাজ করতে গিয়েছ, তোমাদের যদি রাত ন'টা পর্য্যন্ত কাজ কর্‌তে হয়, তা' হ'লে তোমরা ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তারই জন্য তোমাদের এই জলপানি দিয়েছেন। কেমন ?"

রমেশ বল্‌ল—"সেই ত কথা! এখন আমি যদি সেই পয়সা খরচ ক'রে না খেয়ে পুঁজি করি, সেটা কি অন্যায় হয় না ?"

পরেশ বল্‌ল—কিছু না', কোন অন্যায় হয় না।"

রমেশ বল্‌ল—"না বড়দা', আপনার কথা ঠিক হচ্চে না। বাবু যা' বল্‌লেন সেই কথাই আসল কথা। জলপানি ম্যানেজারবাবু আমাদের উপর দয়া ক'রে দেন নি। তাঁর কাজ যাতে সমান জোরে চলে তারই জন্য দিয়েছেন। পেট জ্বলে যায়, তা' হ'লে কি কাজে হাত এগোয়, না মন লাগে। যে এক ষ্টিক কম্পোজ করতে ভরা পেটে পাঁচ মিনিট্ লাগে, পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠ্‌লে সেই এক ষ্টিক দশ মিনিটেও নামে না। সেই কথা ভেবেই প্রেসের ম্যানেজার বাবুই জলপানির ব্যবস্থা করেছেন। আমরা যদি জল না খেয়ে ক্লান্ত শরীরে ওভারটাইম খাটি, তা' হ'লে সেই তিন ঘণ্টায় যা' কাজ করব অন্য সময় তা দেড় ঘণ্টায় না হোক দু' ঘণ্টায় করতে পারি। কেমন না, এ কথা ঠিক নয় ?"

গৃহিণী বললেন—"তুমি ত তা' কর নি রমেশ। তুমি ত সে দু' আনাই পকেটে ফেলে ক্ষুধার ক্লান্ত হয়ে কম কাজ কর নি। তুমি ত বল্‌লে মুড়ি-ফুলুরী দিয়ে পেট ভরিয়েছ। তবে আর তুমি অন্যায়টা কি করলে ?"

রমেশ বল্‌ল—"আমার যখন চার পয়সাতেই পেট ভরে' গেল, তখন অবশিষ্ট চার পয়সা তখনই ম্যানেজারবাবুকে ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল। তা' না ক'রে আমি সেই চারটে পয়সা পকেটে করলাম। একে চুরী না বলতে পারেন বড়দা', কিন্তু এটা যে অন্যায়, অসঙ্গত, একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। বাবু, আপনিই বলুন, কাজটা অন্যায় হয়েছে কি না? আমি গরীব মানুষের ছেলে বলেই তখন এই চারটে পয়সার লোভ সামলাতে পারি নি। এখন ঘরে গিয়ে শুয়ে ঐ কথাটা মনে হোলো। এ্যা! ছিঃ, ছিঃ! গরীব হ'লেই কি আর অন্যায় বোধ থাক্‌বে না। এই চারটে পয়সার লোভ যে সামলাতে পারে না, তার মত অপদার্থ মানুষ কি আর আছে। এই কথাই আমাকে ব্যথা দিচ্ছিল। তাই ছুটে এলাম মায়ের কাছে। মা, আপনি বলুন—'রমেশ তোমার এ কাজটা অন্যায় হয়েছে। এমন কাজ আর কোরো না। কালই প্রেসে গিয়ে ম্যানেজার-বাবুকে চারটে পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।' মা, আপনি এই কথা বল্‌লে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হ'তে আশীর্ব্বাদ করলে আমার মনে আর কোন গ্লানি থাক্‌বে না।"

কথা ত অনেক শুনেছি, এই সুদীর্ঘ জীবনে পড়েছিও অনেক, মিশেছিও অনেক লোকের সঙ্গে। সাধুধর্ম্মাত্মাও অনেক দেখেছি। কিন্তু এই আঠারো বছরের ছেলে যে সকলকে পরাজয় করল! এমন কথা ত কখন শুনি নি! কে এই রমেশ? গরীব মাহিষ্যের ঘরে নিরক্ষর কৃষকের ঔরসে এ কে জন্মগ্রহণ করেছে? কোন্ সুকৃতির ফলে এই নবীন যুবক আমার কাছে এসে আমাকে ধন্য করল!

আমি আর ব'সে থাকতে পারলাম না, উঠে গিয়ে রমেশকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লাম—"রমেশ, আজ আমার জীবন সার্থক হোলো!"

ক্রমশঃ

—শেষ রাত্রি—

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

'শান্তি-সেনা' সন্ন্যাসিনী দলের যে মেয়েটীর তরুণ বয়সের তন্বী তনুলতার সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া মধু-রূপ-রাশি গৈরিক বসনের আবেষ্টনে আরও প্রশান্ত প্রীতি কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল, সে সরযূ!

একদিন কাশীর পথে পথে যখন শান্তিসেনা সন্ন্যাসিনীর দল ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল, সরযূ আসিয়া তাহাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। নিজের আপনজন যারা ছিল, তাদের সকলকে হারাইয়া এই উনিশ বছর বয়স অবধি সে না কি পথে পথেই ঘুরিতেছে।···পথকেই যাহারা স্বেচ্ছায় ঘর করিয়াছে, ইহার অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন তাহাদের নিকট হয় ত আবশ্যক হয় নাই; কাজেই তাহাদিগের সঙ্ঘে স্থান পাইতে সরযূর বিলম্ব হইল না। তবু কিন্তু একটা দিনের কথা আজও সে ভুলিতে পারে না।

মাস ছয় আগে—

সরযূ তখন সঙ্ঘের কেহই ছিল না—কলিকাতার কোন রংদার-পল্লীর হল্লা-মাতামাতির জের টানিতেই যেন বন্ধুদের সঙ্গে কাশী আসিয়াছিল; ইচ্ছা ছিল, দিনকতক ঘুরিয়া বেড়াইবে।··· কিন্তু যাহাদের সহিত আসিয়াছিল, তাহারা জবাব দিল, আসিয়াছে খরচা করিয়া; দিনকতক জীরেন লইবে।

সরযূর তাহা ভাল লাগে নাই। যদি এখানেই বসিয়া চুপচাপ কাটাইতে হয় তো কলিকাতা কি অপরাধ করিল?

সে যেন দলে থাকিয়াও দল ছাড়া, গোত্র ছাড়া! মানুষের সাধারণ চিন্তাধারার সঙ্গে তাহার যেন কোথায় একটা মস্ত বড় অমিল সৃষ্টিদিন হইতেই লাগিয়া আছে!

একটী নূতন ট্রেণ সেদিন সর্ব্বপ্রথম কাশী হইতে ছাড়িবে। দমকা হাওয়ার মত তার গতি, তাই লোকে নাম দিয়াছিল,-তুফান মেল। ষ্টেশনে অত্যন্ত ভীড়।

সকলেই ব্যস্ত-ব্যাকুল হইয়া দেখিতে আসিয়াছে—তুফান মেল কখন তুফানের গতিতে ছুটিয়া চলিবে। কিন্তু সাহস করিয়া কেহই গাড়ীতে উঠে না কি জানি ছুটিতে ছুটিতে সহসা যদি গাড়ী মধ্যপথে উল্‌টিয়া পড়ে!

কিন্তু দুঃসাহসী যে মেয়েটী ঝোঁক করিয়া টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিল, রেলের কর্ম্মচারী হইতে প্লাটফর্মের উপরকার জনতা, সাহেব, বাঙালী, পশ্চিমা সকলেই প্রশংসমান মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সে সরযূ!

সরযূ গাড়ীতে উঠিয়া জানালার ধারে বসিল।

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে,—ইংরাজ গার্ড বাঁশী মুখে করিয়া হাতের সবুজ নিশান সরযূর জানালার কাছে খানিকটা নীচু করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেল। সে যেন Green Flag অবনমিত করিয়া ওই তরুণীর দুঃসাহসকে অভিনন্দিত করিল।

সরযূর বুকখানা একটু কাঁপিয়া উঠিল—হাজার হাতুড়ীর ঘা—যদি পথে—

মা-বোন্ আপন বলিতে যার কেহ নাই, পথে পথে আজ যাহার ঠাঁই, তার আর দুঃখ কিসের?··

তবুও কিন্তু—এই ধরণীর রূপ, রস, স্পর্শ, সৌন্দর্য্য—

এক মাথা চুল বাতাসে উড়াইয়া নীরেন আসিয়া তাড়াতাড়ি সরযূর কম্পার্টমেণ্টেই উঠিয়া পড়িল। সমস্ত মুখে, কপালে তার ঘাম। ট্রেণ ধরিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে—

সারা ট্রেণটা ঘুরিয়া দেখিয়াছে কেহই নাই— শুধু ওই ইন্‌টার ক্লাস কম্পার্টমেণ্টটায় ঐ মেয়েটী ছাড়া—

অতখানি সাহসী যে, তাকেই আজ সাথী করিয়া লইতে হইবে—এই তুফান মেলের তুফান গতি সাথে -তাই নীরেন সরযূর কামরাতেই উঠিল—

দু'মিনিট—তারপর গাড়ী ছাড়িল।

হাওড়া আসিয়া গাড়ী যখন ইন্ করিল— নীরেন, সরযূ দু'জনেই দু'জনের দিকে চাহিল—

তারপর মৃদু হাসিয়া নামিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল—

তাদের হাসি যেন বলিতেছিল—আজ আমরা দু'জনেই জয়ী...

সমস্ত বাংলার লোকের মধ্যে আমরাই তুফান মেলের প্রথম যাত্রী হইয়া তুফান গতিকে অভি-নন্দন দিয়াছি।

তারপর নীরেন সেই যে তাহাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিল, আর সে একটা ভুল ঠিকানা বলিয়া চলিয়া গেল, সেই হইতে আর তার সঙ্গে নীরেনের দেখা হয় নাই।

সরযূর বুকটা টন্‌টন্ করিত—কেন বেচারীকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল! হয় ত সে তাহারই খোঁজে গিয়া অযথা অপদস্থ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি সে গিয়াছিল—না, তার কথা তার মনে আছে! হয় ত নাই-ই—

তবু সে তার ট্রেণের সেই একরাত্রির বন্ধু—

তার সেই দীর্ঘ সবল চেহারা, সুদীর্ঘ কেশ, হাসিভরা মুখ—

সারারাত্রি ধরিয়া তুফান মেলের চলার তালে তালে তুফান ঝড়ের মতই তাদের আলাপ—

বুকের রক্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে...মনে হয়, আবার তেমনি করিয়াই তারা চলুক, অমনি একটা নূতন গড়া মেলে।...

আর কেহ থাকিবে না – শুধু ওরা দুইজনে— নিশীথিনীর বুক চিরিয়া গাড়ী ছুটিয়া যাইবে—

দু'জনে গল্প করিবে—

একস্বরে গান গাহিবে...

কখনো বা হয় ত ট্রেণের দোলানীতে নীরেনের বুকের ওপর ওর দেহ হেলিয়া পড়িবে—

ওর বাহুতে নীরেনের বাহু—

নীরেনের বুকের হৃৎপিণ্ডের সাথে ওর বুকের হৃৎপিণ্ডের মিলিত ছন্দ, তাল···

সমস্ত শিরার রক্ত একস্থানে জড় হইয়া তোলপাড় করিয়া তোলে···

সরযূর সমস্ত কাজ-কর্ম্মের নেশা কোথায় হারাইয়া গেল। তুফান মেলের সেই রাত্রির কথা, নীরেনের সেই সাহচর্য্যের স্মৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—এই বেদনার অন্তরালে আজ নূতন করিয়া মনে উঠিল তার অতীত জীবনের দিনের কথা—

মাসীমার স্নেহচ্ছায়ে দু'টী বোন সরযূ আর যমুনা, দুজনেই একজুটী...

আজ কোথায় তারা!

সেই যে সেদিন স্নান করিতে আসিয়া ভীড়ের ধাক্কায় যমুনার হাত হইতে হাত খসিয়া গেল, তারপর সে হাত আজ কতদূরে! এ জীবনে আর তাহার নাগাল পাওয়া বুঝি স্বপ্ন হইতেও অসম্ভব। কোথা দিয়া কেমন করিয়া মনিয়া বাইজীর কৃপায় রঙদার-পল্লীর অধিবাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া সে আজ পরিচয়হীন হইয়া পড়িয়াছে ভাবিতে গিয়া অশ্রুর বন্যায় তাহার সারা অন্তর ভাসিয়া গেল।···

সন্ধ্যাকাল।

কলিকাতার আলোভরা পথে অন্ধকার ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারে নাই।

সরযূ তাহার ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—নীরেন ব্যাচারী! কিন্তু দুর্ভাগ্য কি শুধু নীরেনেরই। এ মিথ্যা অভিনয়ের জন্য তাহার অন্তর কি ভাঙিয়া পড়ে নাই? সমগ্র হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা মুহূর্ত্তের জন্যও কী তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছে! তথাপি এ মিথ্যা ছাড়া উপায় ত কিছু ছিল না। আর যাহার নিকট হউক, নীরেনের কাছে সে আপনার পঙ্কিল জীবনের কথা বলিতে পারিবে না!

বারান্দার নীচেকার পথে ওই যে অগণিত লোকের যাওয়া-আসা, ওর মধ্যে সে কি নাই?—যে কয়েকঘণ্টার জন্য একদিন তার বুকে দোলা দিয়া গেছে।

দু' মাস পরে—

সরযূ কাশী আসিয়াছিল—কিন্তু নীরেনের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই—অবশেষে কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 'শান্তি-সেনা' সন্ন্যাসিনীর দলকে দেখিল! এতো বেশ!··

নিজের কামনা স্বার্থকে ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া জগতের নরনারীর কল্যাণের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া এর চেয়ে সার্থকতা বুঝি আর নাই।···

সরযূ ঠিক করিল—এদের সহিত সে মিশিবে—

তার জীবনের চারিপাশে যে কলঙ্ক কালিমার আওতা, ধুইয়া-মুছিয়া তা' নির্ম্মল করিয়া তুলিবে সে...

হয় ত একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে···নীরেনের স্মৃতি তাহাকে এপথে আরও অগ্রসর করিয়া দিল···

তারপর গয়া, বৃন্দাবন, এমন কি রামেশ্বর অবধি ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু নীরেনের চিন্তা হইতে সে মুক্তি পাইল না।

মোহমুগ্ধা তরুণী এক-একদিন নিদ্রাঘোরে স্বপন দেখিত নীরেন আসিয়াছে—

সেই,—সেই রাত্রির মত তার এলোমেলো বড় বড় চুল!

তেমনি কপালে, মুখে ঘাম···সেই দিনকার মত তার সেই প্রাণখোলা কথা—

চট্ করিয়া ঘুম ভাঙিয়া যায়—একা শুধু সে...

কিন্তু তবু অনুভব করে, তার দেহের সুবাস···

বঞ্চিতা নারী লুটাইয়া প ড়িয়া কাঁদে—

সন্ন্যাসিনী কালীতারার কাছে তার এই দুর্ব্বলতাটা ধরা পড়িয়া গেল—

কালীতারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সরযূ, তুই কি ভাবিস্ বল তো? প্রথমটায় অস্বীকার করিলেও সরযূকে শেষে সমস্ত বলিতে হইল।···

সকল কথা বলিয়া বলিল, আবার ভাবি পথেরই পরিচয়···হয় ত আমার কথা তার মনেই নেই।

কালীতারা বলিল, হয় ত কেন, সত্যিই। তুই মিছিমিছি কেন অমন মরীচিকার পিছে ছুটিস্ বল তো! কে কোথাকার ঠিকানা চেয়েছিল ব'লেই যে সে তোকে খুঁজ্‌বে এর কি মানে আছে!

সরযূ বলিল, সে খুঁজ্‌বে ব'লে তো আমি ভাবি না দিদি, কিন্তু তার কথা আমায় ভাবিয়ে তোলে—

কালীতারা বুঝিল এ জোয়ারের মুখে বাধ দেওয়া সহজে সম্ভব নয়!···

সেদিন শান্তিসেনা সঙ্ঘের সহিত ষ্টেশনে ভিক্ষা করিতে আসিয়া তুফান মেল দেখিয়া সরযূর সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। সে কালীতারার দিকে চাহিয়া বলিল, আমার মন কেবলই বল্‌ছে ফিরে চল! দিদি চল্‌লুম, আশীর্ব্বাদ কর যেন শান্তি পাই!

অন্য সঙ্গীরা বাধা তুলিয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। কালীতারা আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমি কায়মনে বলছি তোর মনস্কাম

পূর্ণ হ'ক! যদি কোনদিন সময় হয় তোর দিদিকে মনে রাখিস্।

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া সজল চোখে সরযূ গিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

এবার আর তুফান মেল সেই প্রথম দিনকার মত জনবিরল নয়—

লোকে ঠাসা···

মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল।··

সরযূ দেখিল—নীরেনের মত কে যেন প্লাটফর্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল - নীরেন বাবু!

এই ডাকটীর জন্যই নীরেন যেন কতকাল হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। ঘুরিয়া, দুই চোখে অসীম আশা কৌতূহল ভরিয়া চাহিয়া দেখিল সেই-ই তো—

সরযূ তুমি—

বলিয়া উন্মাদের মত নীরেন ছুটিয়া আসিল; তারপর গাড়ীভরা লোক প্লাটফর্ম্‌পোরা জনতাকে তুচ্ছ করিয়া সবলে সরযূর হাত চাপিয়া ধরিল।

বলিল, ওঃ! কত তোমায় আমি খুঁজেচি সরযূ -

সরযূ আস্তে আস্তে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, আসুন এই গাড়ীতে—

নীরেন বলিল, না সরযূ, আমাদের সেই প্রথম রাত্রির মত দু'জনে একলা যেতে হবে—

কিন্তু এতো আর সেদিনকার গাড়ী নয়,— সমস্ত গাড়ী খালি প'ড়ে আছে।

আচ্ছা, আসচি আমি, দাঁড়াও—

মিনিট পাঁচ পরে নীরেন দু'খানি সেকেণ্ডক্লাস টিকেট কিনিয়া আনিয়া বলিল, চল, সেকেণ্ডক্লাসে যাই; দু'-একটা কামরা খালি আছে।

সরযূ আপত্তি করিতে পারিল না—নামিয়া আসিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল—নীরেন চলতি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

আচ্ছা তো তুমি সরযূ, এমন একটা বাজে ঠিকানা আমায় দিয়েছিলে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ! শেষে লোকে মারতে আসে—

সরযূ হাসিল—

নীরেন বলিল, হাসচো তুমি, তোমাদের কি বল না! তোমাদের মেয়েজাতটা ঐ রকমই কঠিন বটে। কিন্তু যদি জানতে আমি তোমার জন্য কত ঘুরেচি—শেষে তোমার বোন যমুনাকে—কি আশ্চর্য্য, তোমরা দু'টী বোন দেখ্‌তে অবিকল এক রকমের!

সরযূ বলিল, আমার বোন যমুনা—

হ্যাঁ গো বলিয়া নীরেন এক নিশ্বাসে সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

গলাটা ভারী হইয়া উঠিয়াছিল, অতি কষ্টে সরযূ বলিল, আসুন—আপনাকে সেদিনকার মত খেতে দিই—

নীরেন আবেগভরে বলিল, আমি খেতে চাই না সরযূ, আমি চাই গল্প, আমি চাই তোমায়, আমি চাই—

সরযূ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, কিন্তু না খেলে আমি কিছুই শুন্‌বো না। সেদিনকার মত আপনাকে খেতেই হবে—

খাইতে খাইতে নীরেন বলিল, আচ্ছা আমিও ছাড়ছি না—সেদিন আমাকে মিথ্যে ঠিকানা কেন দিয়েছিলে বলতেই হবে।

সরযূর মুখখানি ম্লান হইয়া আসিল—তবে মুহূর্ত্তের জন্য—

পরক্ষণে ধীরকণ্ঠে বলিল, খান তো। তার পর শুনবেন।

নীরেন বলিল, না—আমি খেতে খেতেই শুন্‌বো—

সরযূ একবার একটু ইতস্ততঃ করিল না, ধীরে ধীরে সেই হারাইয়া যাওয়া হইতে কি জন্য নিজের ঠিকানা সে বলে নাই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিল।

তারপর বলিল, তবু আমি সুখী নীরেনবাবু, বোনটী আমার সুখী আছে। আর আবার আপনার দেখা পেয়েচি।···

নীরেন বলিল, কিন্তু সরযূ আমি তো সুখী হবো না, তোমায় আমি আমার ক'রে নিতে চাই।

সরযূ বলিল, অসম্ভব। জানি ব'লেই সেদিন সত্য গোপন ক'রেছিলুম।···আমার জীবনে কলঙ্ক না থাক্, কলঙ্কের পাঁচীল তার চারি পাশে—

নীরেন বলিল, কে তাতে বাধা দেবে সরযূ! এই দুনিয়ায় তুমি আমি দুজনেই একা। দু'জনে আমরা দু'জনের সাথী। বাধা দেবার কেউ তো নেই সরযূ।

সরযূ বলিল, কেউ নেই কে বলতে পারে, আমার মাসী বোনের আবার আমি খোঁজ পেয়েচি, তেমনি হয় ত একদিন আপনি আপনার মা-বাপকেও ফিরে পেতে পারেন। হয় ত তখন এর জন্য আপনাকে অনুতাপ ক'রতে হবে।

নীরেন কথা কহিল না। বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ট্রেণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিতেছিল।···গাড়ীর ঝড়ের গতি নীরেন সরযূর রক্তে রক্তে ঝড় তুলিয়া দিয়াছিল।

সরযূ এক-একবার ভাবিতেছিল—বরণ করিয়া লয়—

জীবনের মধু-মাধুর্য্য···

তাদের দু'জনের সংসার, ঝঞ্ঝাট-গোলমালের বাইরে অনাবিল প্রীতি, প্রেম···

নারী হইয়া কেন সে সর্ব্বরকমে নিজেকে বঞ্চিত করিবে!

কিন্তু·····

না, সে যে ভাবিতেও পারে না।

তার এই বুকখানা কি ভাবনায় ভাবনায় চুর-মার হইয়া যাইবে অবশেষে—

গাড়ীর ঝড়ের গতি···

পাশে পাশে ছুটিয়া চলা জমাট অন্ধকার—

ঝড়ো হাওয়ার বিপুল, সুগম্ভীর শব্দ···

ওদের ওই দুটো নরনারীর কামরা—

যেন নির্জ্জন—

ও দুটো মানুষ যেন থাকিয়াও নাই···

পরের পর, ষ্টেশন সরিয়া যাইতেছে—

সরযূ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল এক-একবার।

এ কী সে হারাইতে বসিয়াছে!···একটী কথায় তার—

একটা নয়, দু'টা জীবন···

গাড়ী লিলুয়া ছাড়িয়া গেল—

নীরেন এতক্ষণ কথা কহে নাই, এইবার বলিয়া উঠিল, না না—সরযূ, এমন ক'রে আমি তোমায় পেয়ে হারাবো না!··· বিশ্ব-সংসার আমার একদিকে প'ড়ে থাক, কিন্তু তোমাকে আমার জীবনে চাই!···এই তুফান মেলে আমাদের অগণিত রাত্রির যাওয়া-আসার আজ শেষ ক'রে দিতে হবে—

উন্মত্তের ন্যায় অধীর আগ্রহে নীরেন সরযূকে বুকের কাছে টানিয়া লইল—

ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে, চিত্তের তুমুল আলো-ড়নের মাঝে সরযূ চুপ করিয়া রহিল।···

এ যেন তার জীবনের পরিস্ফুট বিকাশের ক্ষণ!···

একে সে ব্যর্থ হইতে দিবে না, দিবে না!···

গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

---

* 'একটী রাত্রি' ও 'আর একটী রাত্রি'র উপসংহার

সন্ত্রস্তা

শিল্পী দ্বিজেন সরখেল
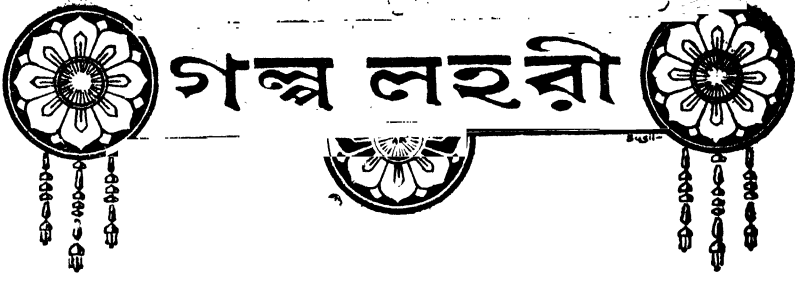
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৮ | ষষ্ঠ সংখ্যা

—ভিখারীর ভালবাসা—

৺ যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি-এল

এক

বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ বিলাসপুরের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দানশীল জমিদার। প্রতি রবিবারে তাঁহার গৃহে তণ্ডুল বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক ভিক্ষার্থীর জন্য অর্দ্ধসের তণ্ডুল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং, রবিবারের দিন অতি প্রত্যুষ হইতে অসংখ্য ভিখারী-ভিখারিণী তাঁহার দ্বারে সমবেত হইত।

ভৃত্যেরা তণ্ডুল বহিয়া আনিত এবং তাঁহার কিশোর পুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণ স্বহস্তে সকলকে তণ্ডুল বিতরণ করিত। পিতা এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে পুত্রকে বদান্যতা শিক্ষা দিতেন।

সুকুমার সুরেন্দ্র তণ্ডুল বিতরণের পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিত; সূর্য্যকিরণে তাহার গৌরগণ্ডে অরুণাভা ফুটিয়া উঠিত; তথাপি সে ইহাতে ক্লান্তি বোধ করিত না। সে সহাস্যমুখে প্রীতির সহিত সকলকে ভিক্ষাদান করিত। পিতা পুত্রের ধর্ম্মপালনের আগ্রহ দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

এই বিপুল ভিক্ষুকশ্রেণীর মধ্যে একটী মাতৃহীনা কিশোরী বালিকা তাহার অন্ধ পিতার হস্ত ধরিয়া প্রতি রবিবারে রাজেন্দ্রনারায়ণের দ্বারে ভিক্ষা লইতে আসিত। ক্ষীণা বালিকা ভিখারী-ভিখারিণীর ঠেলাঠেলি ও ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। সে সকলের নিকট হইতে দূরে একটী বকুলবৃক্ষের তলে নীরবে পিতার নিকট বসিয়া থাকিত।

সকলকে ভিক্ষা দেওয়া শেষ হইলে সুরেন্দ্র বৃক্ষতলে আসিয়া বালিকাকে ভিক্ষা দিত। অনেক সময় সে ভিক্ষাবশিষ্ট সমস্ত তণ্ডুল বালিকার অঞ্চলে ঢালিয়া দিত। অশ্রুপূর্ণ কৃতজ্ঞতা বহন করিয়া ভিখারিণী বালিকা অন্ধ পিতার হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইত।

এমনি করিয়া বালিকার জীবনে সুখে দুঃখে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। কাল কাহাকেও উপেক্ষা করে না। অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে যৌবন তাহাকে স্বীয় সম্পদভারে দিবা-রাত্রি লুকাইয়া মনোমত করিয়া সাজাইল। লজ্জা তাহার পূর্ব্বের স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টিকে আকুল করিল। আকাঙ্ক্ষায় তাহার প্রাণে অনল জ্বালাইল। অন্তরের অন্তর হাহাকার ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

কিশোর সুরেন্দ্রের সুগঠিত দেহও নবীন যৌবনের অপূর্ব্ব সুষমা ধারণ করিল। বালিকা এখন আর সুরেন্দ্রের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারে না, ভিক্ষা গ্রহণ করিতে তাহার হস্ত কাঁপিয়া উঠে, তাহার বিবর্ণ জীর্ণ বস্ত্র তাহার নিকট লজ্জা-নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। সে সঙ্কুচিত হইয়া পিতার অন্তরালে যথাসাধ্য আপনাকে গোপন করিতে চেষ্টা করে।

সেদিন বসন্তের প্রভাত। প্রকৃতির অন্তস্তল কাঁপাইয়া সেদিন জলে-স্থলে আনন্দের অপূর্ব্ব রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল প্রভাতের স্বর্ণকিরণ চারিদিকে অনন্ত সুষমা ছড়াইয়া দিয়াছে। কলকণ্ঠ বিহঙ্গনিনাদ নীলাকাশ প্লাবিত করিয়া সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করিতেছে। শ্যামল বকুল বৃক্ষটী ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ফুলের সুগন্ধ বহিয়া স্নিগ্ধ বায়ু চারিদিকে অপূর্ব্ব মোহ সৃজন করিতেছে। অন্ধ পিতার সহিত বকুলমূলে উপবিষ্টা ভিখারিণী তারার ক্ষুদ্র হৃদয় আজ থাকিয়া থাকিয়া স্বপ্নে, আনন্দে, মোহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। আজ তাহার মনে হইতেছিল, যেন আর সে ভিখারিণী দৈন্যপীড়িতা উপযাচিকা নহে, আজ যেন সে অনায়াসে হৃদয়ের অনন্ত ঐশ্বর্য্য অবিরল মুষ্টিতে চারিদিকে বর্ষণ করিতে পারে, যেন সে তাহার হৃদয়ের অসীম আনন্দ দিয়া জগতের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট অভাবের করাল কঙ্কাল মুহূর্ত্তে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে।

সুখ-স্বপ্নবিভোর তারার সংজ্ঞা ছিল না। সুরেন্দ্র ভিক্ষা বিতরণ সমাপ্ত করিয়া কখন যে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সুরেন্দ্রের মধুর কণ্ঠ শুনিয়া সে চকিত হইয়া সম্মুখে চাহিল। মরি মরি কি সুন্দর! তারা সুরেন্দ্রকে আর কখনো এমন সুন্দর দেখে নাই। তাহার কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশদামের উপর সূর্য্যকিরণের স্বর্ণ-কিরীট, তাহার বিশাল নয়নে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি, তাহার অকলঙ্ক বদনে অপার্থিব সুষমা। স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া তারা এই মূর্ত্তিমান দেবতার দিকে ক্ষণকাল অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিল। সুরেন্দ্র আবার মধুর-কণ্ঠে বলিল—"ভিক্ষা নাও।"

তারা শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল; তাহার সুপ্ত হৃদয় অব্যক্ত বেদনায় সহসা কাঁপিয়া উঠিল। সে লজ্জা নিবারণের জন্য ত্রস্তহস্তে সর্ব্বাঙ্গে তাহার জীর্ণবস্ত্র টানিয়া দিল।

আজ সে ভাল করিয়া সুরেন্দ্রের দিকে অঞ্চল প্রসারিত করিতে পারিল না। তাহার কম্পিত হস্ত তাহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র প্রীতিভরে অবশিষ্ট সমস্ত তণ্ডুল বালিকার অঞ্চলে ঢালিয়া দিল। সুরেন্দ্রের কোমল অঙ্গুলি মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি তারার হস্তস্পর্শ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার অবসন্ন কম্পিত হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া সমস্ত তণ্ডুল মাটিতে পড়িয়া গেল।

সুরেন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিল—"আহা, চাল-গুলো পড়ে গেল! একটু দাঁড়াও, আমি আবার চাল এনে দিচ্ছি।"

পিতা চীৎকার করিয়া উঠিল "কি করলি সর্ব্বনাশি! চালগুলো সব ফেলে দিলি!"

লজ্জায় তারার মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র ক্ষণমধ্যে আবার চাউল লইয়া উপস্থিত হইল। তারা এবার আর তাহার দিকে চাহিতে সাহস করিল না। সে নতমুখে সাবধানে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পিতার হস্ত ধরিয়া গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু জানি না কেন, আজ প্রতিপদক্ষেপে তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ড কে যেন সবলে নিষ্ঠুর আকর্ষণে ছিঁড়িয়া লইতেছে।

দুই

ভিখারিণী তারার জীবনে কি যেন দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে আর তাহার সঙ্গী-সঙ্গিনীদের সঙ্গে ভাল করিয়া মিলিতে পারে না।

তাহাদের ইতর ব্যবহার, কুৎসিৎ রসিকতা, ঘৃণ্য অপরিচ্ছন্নতা তাহাকে যেন পদে পদে পীড়িত করে। কোথাও কোন ধনবানের মৃত্যু-সংবাদে শ্রাদ্ধোৎসব স্মরণ করিয়া সে আর উল্লসিত হয় না, ধনী গৃহে নিমন্ত্রণের পর সুস্বাদু উচ্ছিষ্ট ভোজনের আশায় তাহার জিহ্বা আর সরস হইয়া উঠে না। সে সকলের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকে, কেহ কোন কথা কহিলে তাহার উত্তর দেয় না, শূন্য মনে আকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে থাকে।

অনেক সময়ে তাহার বারের কথা স্মরণ থাকে না। সে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে সেই বকুলতলে গিয়া উপস্থিত হয়, জমিদার ভৃত্য রূঢ়বাক্যে বারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে লজ্জিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

এইরূপ অবস্থায় একদিন অকস্মাৎ তাহার অন্ধ পিতার মৃত্যু হইল। তারা আত্মীয়হীন সংসারে একান্ত অসহায় হইয়া পড়িল।

বিদেশী বলিয়া তারার এক প্রতিবেশী ভিক্ষুক ছিল! বিদেশীর ভিখারীসমাজে সৌখীন বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, তাহার বুদ্ধির খ্যাতিও বড় অল্প ছিল না। এই দুই কারণে সে ভিখারী সমাজে নেতার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাহারও কাঙ্গালীভোজনের প্রয়োজন হইলে বিদেশীকে সংবাদ দিলেই হইত। বিদেশী সকলকে যথা-স্থানে লইয়া যাইত এবং স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া শ্রেণীবিভাগ ও পংক্তি সন্নিবেশ করিয়া সকলের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিত। এই সকল কারণে সকলেই বিদেশীর প্রীতিলাভ করিতে ইচ্ছুক ছিল এবং সুযোগ পাইলেই ভিখারিণী যুবতীরা তাহার প্রতি কটাক্ষের শক্তি পরীক্ষা করিতে ত্রুটী করিত না।

বিদেশী কিন্তু আপনার গর্ব্বেই থাকিত, সে কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করিত না। কেবল সম্প্রতি কিছু দিন হইতে তারার যৌবনসমৃদ্ধ দেহযষ্টি তাহার দৃষ্টিকে কিছু প্রলুব্ধ করিতে-ছিল।

তারার অসহায় অবস্থা দেখিয়া বিদেশীর প্রীতি সহসা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে একদিন মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া ভিক্ষাসঞ্চিত দীর্ঘ ইংরাজী কোটে দেহ আবৃত করিয়া তারার কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বিদেশী ভাবিয়াছিল তাহার এই অসীম অনুকম্পা অসহায়া তারাকে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করিয়া দিবে। কিন্তু ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। তারা এই প্রস্তাব শুনিয়া সহসা ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল। এবং বিদেশী ঈষৎ রসিকতা করিবার চেষ্টা করিবামাত্র বংশখণ্ড গ্রহণ করিয়া বিদেশীর পশ্চাতে ধাবমান হইল। বিদেশী প্রণয়সম্ভাষণের অভিনব পন্থা দেখিয়া বেগে পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিল।

দেখিতে দেখিতে তারা-বিদেশীর সংবাদ ভিক্ষুক সমাজে বিদ্যুৎবেগে প্রচারিত হইল। শুনিয়া বিদেশীর প্রণয়প্রয়াসিনী ব্যর্থ মনোরথা যুবতীবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া হাসিল, বৃদ্ধারা তারার দুর্বুদ্ধি দর্শনে দুঃখিতা হইল, প্রৌঢ়ারা এই প্রত্যাখ্যান ব্যাপারে তারার প্রতি অতি কুৎসিৎ অভিসন্ধির আরোপ করিয়া তাহাকে গালি দিল।

কিন্তু তারা ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় অর্থহীন দৃষ্টিতে সংসারের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিন

সুরেন্দ্রনারায়ণ এখন স্বয়ং জমিদার। তণ্ডুল বিতরণের ভার এখন অন্যের উপর পড়িয়াছে। তিনি এখন কদাচিৎ কোনদিন বিতরণ কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসেন মাত্র। সুতরাং তারা সুরেন্দ্রকে এখন আর প্রায়ই দেখিতে পায় না। এদিকে বিদেশীর প্রতাপে ভিক্ষুকসমাজেও তাহার স্থান নাই। কেহই তাহার প্রতি সহানুভূতি

প্রকাশ করে না। কেহ গালি দেয়, কেহ বিদ্রূপ করে, কেহ দুশ্চরিত্রতার আরোপ করে। সুতরাং তারার জীবন ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। একদিন ভিক্ষাশেষে সে বাটী ফিরিয়া দেখিল, তাহার জীর্ণ কুটীরখানি ভস্মাবশেষ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্থাবর সমস্ত বস্তুগুলিও অপহৃত হইয়াছে। দেখিয়া তারা তাহার পরলোক গত অন্ধ পিতাকে স্মরণ করিয়া দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার একজন প্রতিযোগিনী যুবতী বলিল —"কান্না কেন ? বিদেশীর ঘরে যা' না। বিদেশী তোকে মাথায় ক'রে রাখবে।" শুনিয়া তারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ সমস্তই বিদেশীর ষড়যন্ত্র। ক্রোধে তাহার সমস্ত হৃদয় বিদেশীর প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। সেই দিনই সে সেস্থান পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল।

কিন্তু হায়, বন্ধুহীন সংসারে অসহায়া বালিকার আশ্রয় কোথায় ? তারা ঘুরিতে ঘুরিতে অন্যমনে আবার সেই বকুলতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রমে দুঃখে-কষ্টে সে সেইখানেই মাটির উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

মধ্যাহ্ন আহারান্তে সুরেন্দ্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন প্রচণ্ড রৌদ্রে এক দরিদ্র রমণী অবশভাবে মাটির উপর পড়িয়া আছে। সুরেন্দ্রের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি একজন ভৃত্যকে অনাথা বালিকার সংবাদ লইতে পাঠাইলেন। ভৃত্যের ডাকাডাকিতে তারা জাগিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার কথার কোন উত্তর দিল না। ভৃত্য মনে মনে ভিখারিণীকে গালি দিতে দিতে প্রভুর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ভিখারিণীর কথা নিবেদন করিল। সুরেন্দ্রবাবু ভৃত্যের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া স্বয়ং তাহার নিকটে গেলেন। তারা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। সুরেন্দ্রবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে সেখানে পড়িয়া আছে কেন ? তারা অশ্রুপূর্ণলোচনে আপনার দুরবস্থার কথা নিবেদন করিল। শুনিয়া করুণ-হৃদয় সুরেন্দ্রনারায়ণ নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। তখনি নায়েবকে ডাকিয়া তাহার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

তারা সুরেন্দ্রবাবুর উদ্যানস্থ এক কুটীরে বাসা পাইল। সরকারি ভাণ্ডার হইতে তাহার দৈনিক আহার্য্য দিবারও ব্যবস্থা হইল। নিরাশ্রয় তারা আশাতীত আশ্রয় পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাচিল।

চার

কিছুদিন পরেই গঙ্গার এক চর লইয়া প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে সুরেন্দ্রের বিবাদ বাধিল। বিবাদ ক্রমশঃই আদালত ও আইন ছাড়িয়া লাঠি ও তরবারির আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। বিবাদ সুরেন্দ্রনারায়ণ বরাবরই জয় হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং কালীকিঙ্করবাবুর ক্রোধ ক্রমশঃই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিবার জন্য কুটিল হইতে কুটিলতর পন্থার অনুসরণে বাধ্য হইতেছিল।

শেষ পরাজয়ের পর কালীকিঙ্করবাবু কিছুকাল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সুরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষ আশ্বস্ত হইয়া তাহাদের সতর্ক দৃষ্টি কিছুদিনের জন্য শিথিল করিয়া দিল।

বহুদিন পরে সুরেন্দ্র কালীকিঙ্করবাবুর এক চিঠি পাইয়া বিস্মিত হইলেন। পত্র ক্ষমা ও ঔদার্য্যে পরিপূর্ণ। কালীকিঙ্করবাবু লিখিয়াছিলেন—"আমরা উভয়েই সম্ভ্রান্তবংশীয়। আমাদের মধ্যে সামান্য বিষয় লইয়া বিরোধ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাতে বিনা বিবাদে ইহার একটা সুমীমাংসা হইয়া যায় তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমার ইচ্ছা, যদি আপনি স্বয়ং একবার বিবাদের স্থলে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যায়। সঙ্গে অধিক লোকজন আনিবার প্রয়োজন নাই। আমি ও আপনি দুইজনে পরামর্শ করিয়া সমস্ত স্থির করিয়া

ফেলিব। আমাদের লোকজনেরা বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহারা বিবাদ মিটিতে দেয় না। কারণ, বিবাদ চলিলেই তাহাদের লাভ। পত্রের উত্তর পাইলে আপনার অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিব।”

পত্র পাঠ করিয়া সরল সুরেন্দ্রনারায়ণ পরম প্রীতিলাভ করিলেন। নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন—“আমি একলা সাতই তারিখে কালীকিঙ্কর-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব। কেবল একজন দরোয়ান আমার সঙ্গে যাবে।” সতর্ক নায়েব বলিল—“যদি এর মধ্যে কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকে?” হাসিয়া সুরেন্দ্র বলিলেন—“তোমরা সকল জিনিষেই গূঢ় অভিসন্ধি দেখ। ‘বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।’ আর ঝগড়া-বিবাদ ভাল লাগে না। যাও, তুমি সব ঠিকঠাক কর গে।”

নায়েব আর কোন আপত্তি করিল না, কিন্তু কথাটা তাহার মনোমত বোধ হইল না। সে অবিশ্বাসভরে ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময়ে একাকী অশ্বারোহণে সুরেন্দ্র কালীকিঙ্করবাবুর মনোহরপুরের কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। কাছারি গ্রাম হইতে বহুদূরে চরের নিকটে অবস্থিত। কালীকিঙ্করবাবু পরম সমাদরে সুরেন্দ্রনারায়ণের অভ্যর্থনা করিলেন। রাত্রে আহারাদির প্রচুর আয়োজন হইল। হাস্যে, রহস্যে, গল্পে, আমোদে সন্ধ্যাকাল কাটিয়া গেল। স্থির হইল, পরদিন প্রত্যুষে সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক হইবে। কাছারি বাটীটি দ্বিতল। উপরে একটী মাত্র কক্ষ। কালীকিঙ্কর স্বয়ং সঙ্গে করিয়া সুরেন্দ্রকে উপরের ঘরে শয়ন করাইয়া আসিলেন। পথক্লান্ত সুরেন্দ্র ক্ষণমধ্যে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন।

দ্বিপ্রহর রাত্রে কাহার হস্তস্পর্শে সুরেন্দ্র চকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। যে তাঁহাকে জাগাইয়াছিল, সে তাঁহাকে মুখে হাত দিয়া ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ করিল। বাতায়ন রন্ধ্রগত অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সুরেন্দ্র দেখিলেন, যে তাঁহাকে জাগাইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত! আগন্তুক চুপি চুপি বলিল—“শীঘ্র আমার সঙ্গে নীচে চলে আসুন।”

সুরেন্দ্র কিছু না বুঝিয়া মূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আগন্তুক সবলে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল “আর সময় নাই, শীঘ্র আসুন!”

আগন্তুক বলপূর্ব্বক সুরেন্দ্রের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিল। নীচেকার এক অন্ধকার ঘরে সুরেন্দ্রকে বসাইয়া আগন্তুক চুপি চুপি বলিল “কদাচ রাত্রে এখান থেকে অন্যত্র যাবেন না। গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। আমি আবার এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।”

সুরেন্দ্র কম্পিত হৃদয়ে সেই অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার নিকট একটা জটিল প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে উপরের ঘরে কাহার অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিয়া সুরেন্দ্রবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। তারপর তিনি অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, কিন্তু আর কিছুই শোনা গেল না। কেবল মনে হইল, কে যেন উপরের ঘর হইতে নিঃশব্দে জানালা দিয়া নামিয়া গেল। কম্পিতবক্ষে সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন। উষার অস্পষ্ট আলোক যখন বাতায়ন-পথে দেখা দিল, তখন সুরেন্দ্রনারায়ণের চৈতন্য হইল। তিনি রাত্রের ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন। উপরে উঠিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া গেল! তাঁহার শয্যার উপরে বস্ত্রাবৃত দেহে কে যেন শুইয়া আছে! তাহার সমস্ত বস্ত্রখণ্ড শোণিত সিক্ত। লোকটীকে দেখিবার জন্য সুরেন্দ্র কম্পিত পদে তাহার দিকে অগ্রসর

হইলেন। মুখের কাপড় তুলিয়া দেখিলেন,—মৃতা তাহারি আশ্রিতা ভিখারিণী তারা। তারার বক্ষের উপর কি একটা শোণিতসিক্ত চতুষ্কোণ পদার্থের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। সসঙ্কোচে বস্ত্র সরাইয়া সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন,—চতুষ্কোণ পদার্থটী তাঁহারই একখানি ক্ষুদ্র আলোক-চিত্র। শিহরিয়া সুরেন্দ্র পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন। এক বিন্দু অশ্রু নীরবে তাঁহার নয়ন-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে আলোক চিত্র-খানি বক্ষ হইতে তুলিয়া লইয়া সুরেন্দ্র নীচে নামিয়া আসিলেন। নীচে আসিয়া দেখিলেন জনপ্রাণী কোথাও কেহ নাই। অশ্বশালায় গিয়া দেখিলেন, তাহার অশ্ব সেইখানেই রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুরেন্দ্র স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। উপেক্ষিতা ভিখারিণীর করুণ মূর্ত্তি সহসা অপূর্ব্ব বিভায় তাহার চক্ষুর উপর ফুটিয়া উঠিল।

—মায়া—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার অবসর অল্প, গৃহিণীও সেরূপ শিক্ষিতা নহেন, সে কারণ ছেলে-মেয়ে কয়টির শিক্ষার জন্য গৃহে একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করি। আমার বিশ্বাস, শৈশবে শিক্ষার ভার কোন সুশিক্ষিতা নারীর হাতে থাকিলে তাহা যেন সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। কিন্তু প্রায় এক পক্ষকাল হইল, মহিলাটি পরলোকের পথে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার এই বিচ্ছেদ শিশু কয়টির ক্ষুদ্র অন্তরে বড় নির্ম্মমভাবে বাজিয়াছে। তাহাদের মুখে সে হাসি নাই, চোখে শুষ্ক অশ্রুরেখা—তিনটিতে গোপনে তাঁহার ত্যক্ত কক্ষ কোণে নীরবে বসিয়া থাকে। আমরাও যে মুক্ত আছি, তাহা নয়—এই শোক আমাদেরও অন্তরতল স্পর্শ করিয়া সমগ্র গৃহখানিকেই বেদনার ম্লান ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

মহিলাটির জন্মভূমি কোথায়, আত্মীয়-স্বজন কেহ আছেন কি না, এ সকল পরিচয় বিশদভাবে কোনদিনই জিজ্ঞাসা করি নাই। এবং তিনিও তাহা অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা, সরল সুমিষ্ট আচরণ, মানুষের প্রতি গভীর দরদ ও অমলিন শুভ্র মুখচ্ছবি সকলকে তাঁহার আপনার করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে গল্পের ছলে একবার যেন শুনিয়াছিলাম, আমার জনৈক বন্ধুর যে গ্রামে বাস তিনি সেই গ্রামের। এ কারণ, মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে আগ্রহভরে তাঁহার বিষয় আরও দুই-চার কথা জানিতে বন্ধুর কাছে পত্র দিই। তাহাতে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ছেলেমেয়ে কয়টিকে ও আমাদের কিরূপ ব্যথিত করিয়াছে, সে কথাও লিখি। কিন্তু বহুকাল বন্ধুটির সহিত পত্রাদিযোগ ছিন্ন, মনে সন্দেহ ছিল, ইতিমধ্যে সে হয় ত গ্রাম ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া গিয়া থাকিবে, পত্রখানি তাহার নিকট পৌঁছিবে না। সৌভাগ্যবশতঃ সাতদিন প্রতীক্ষার পর তাহার কাছ হইতে একটি সুদীর্ঘ ও ব্যথিত উত্তর পাইয়াছি। নির্ম্মম অনুযোগের পর বন্ধু লিখিয়াছে—

"যে অন্তরকে এতদিন তপস্যা-বহ্নিতে শুষ্ক করিয়াছিলাম, তুমি সহসা তোমার দুঃখের স্পর্শে তাহাকে অশ্রুসিক্ত করিলে। যাহার কথা তুমি লিখিয়াছ, তাহাকে আমি জানিতাম এবং এক দিন চিনিবারও সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু ধরিতে পারি নাই। বিগত পাঁচ বৎসরে আমার জীবনে যে কয়েকটি আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তোমার কাছে সেগুলি আজ ব্যক্ত করিব। দরদী বন্ধুর কাছে নিভৃতে হৃদয়ের ভার নামানো অপেক্ষা সংসারে মানুষের তৃপ্তিকর আর কি আছে জানি না। তুমি তাহা হইতে তাঁহার বিষয়ে সকল কথাই জানিতে পারিবে।

"তোমার বোধ হয় মনে পড়ে, পড়া শেষে যখন আমি স্বগ্রামে বাস করিতে আসি, তখন তুমি বলিয়াছিলে গ্রাম্য-জীবনে উন্নতি কোথায়? অর্থকে জীবনের কাম্য করিলে, এ কথা সত্য। কিন্তু ভাই, তুমি তো জান, সংসারে আমি বন্ধন-হীন, আমার প্রয়োজনও তাই অল্প। সাত পুরুষের এই নিরালা ভিটাখানি, কয়েক বিঘা জমীর ফসল ও বাগানখানির কয়েক প্রকার ফল-ফুলই আমার প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর। প্রয়োজনের অধিক আয়ে পাপই হয়। তাহা ছাড়া, আমার এই শান্ত সুশীতল ক্ষুদ্র গ্রাম-

খানিকে আমি বড় ভালবাসি। ইহার প্রতি-দিনকার জীবন ধারার মধ্যে এমন একটি মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধতা আছে, ইহার সুদূরপ্রসারী সবুজ প্রান্তরে, ক্ষেত্রে এমন একটা স্বপ্নমায়া আছে যে, ইহাকে আমি ভুলিয়া থাকিতে পারি না। কর্ত্তব্যের দিক দিয়াও ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমাদের সকল শক্তি গ্রামমুখী না করিলে অপব্যয়ের ক্ষতি আরও ভয়াবহ মূর্ত্তিতে দেখা দিবে।

"তাই গ্রামে ফিরিয়া সঙ্কল্প করিলাম, যে অভাবটি গ্রাম্য-জীবনে এক সুগভীর নৈরাশ্য আনিয়া দিয়াছে, তাহা দূর করিতে আমার সকল সম্পদ নিঃশেষে ব্যয় করিব। লোকশিক্ষাই আমার জীবনের পরম কাম্য হইবে। বস্তুতঃ তাহা অপেক্ষা মহৎ আর কিছু কল্পনাও করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সঙ্কল্পকে কর্ম্মে রূপ দিবার পথে প্রথমে দুইটি অন্তরায় দেখা দিল—একটা গ্রামবাসীদের ঔদাসীন্য, অপরটি আমার অনভিজ্ঞতা ও কৃত্রিম জীবনযাত্রা। যাহারা চাষ-বাস করে, দিন-মজুরী যাহাদের উপজীবিকা, তাহাদের সহিত মিলিতে গিয়া দেখিলাম, আমাদের মধ্যকার যোগ-সূত্রটি বহুকাল পূর্ব্বে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এত দিন গ্রামের স্নিগ্ধশ্রীর প্রতি আমার মোহ ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার অন্তরালে গ্রামলক্ষ্মীকে আমি অবহেলা করিয়া আসিয়াছি।

"আমার সকল কাযের পরম সহায় ছিলেন, পণ্ডিত-মশায়। তিনি কেবল পাঠশালারই পণ্ডিত ছিলেন না, বিদ্যায় ও মনুষ্যত্বে সাধারণ হইতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতেন। মায়াকে আমরা তাঁহারই কন্যা বলিয়া জানিতাম! শিক্ষায়, দীক্ষায় সে তাঁহারই প্রতিচ্ছায়া ছিল। শৈশবে তাহাকে আমি বহুবার দেখিয়াছি, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তারপর গ্রামে ফিরিয়া আবার তাহাকে নূতন করিয়া দেখি। তখন সে কৈশোরে সীমানা পার হইয়া গিয়াছে,—দেহশ্রী পরিপূর্ণ, লজ্জার একটি স্নিগ্ধ আবরণে তাহার প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটী গতি, দৃষ্টি, হাসি ছন্দোবদ্ধ ও সুন্দর। পণ্ডিত-মশায়ের কাছে নানা কাযে আমাকে প্রায়ই যাইতে হইত। সেই সময়ে তাহার সহিত আমার পরিচয়টা একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে! তুমি হয় ত স্বীকার করিবে, কোন নারীকে তাহার নিত্যকার গৃহকর্ম্মে জানা যত সহজ, এমন আর কিছুতেই নহে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাযেই তাহার চিত্তখানি ফুটিয়া ওঠে। আমি সেই অবসরে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। কিন্তু লোকাচারের দিক দিয়া সে আমার জীবনে দুর্ল্লভ ভাবিয়া সংযত হই। এবং এই সংযমের বৃত্তটীকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া পণ্ডিত-মশায়ের গৃহে যাওয়া পরিত্যাগ করি। বুঝিতে পারিতেছ, কাজটা আমার পক্ষে কতটা বেদনাসূচক। তথাপি ততোধিক পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল লোকনিন্দা। তাহারা প্রকাশ্যে যে মসী বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, তাহা আর বলিতে ইচ্ছা করে না—আর তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা দুই জন। কিন্তু ইহাতে আমারও কাযের গতি এমন ভাবে সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল যে, মনে হইতে লাগিল, আমার জীবনের লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত না করিলে আর উপায় নাই। ইহা অবশ্য আমার গ্রামে বাস করিবার প্রায় এক বৎসর পরের কথা।

যাহা হৌক, অবস্থা যখন এইরূপ তখন এক দিন পাশের গ্রাম হইতে সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া দেখি আমারই জন্য গ্রামের একজন অপেক্ষা করিতেছে। লোকটা আমাকে দেখিবামাত্র বিনা ভূমিকায় কহিল, 'পণ্ডিত মশায়ের বড় অসুখ—এখনই এক বার সেখানে যেতে হবে।'"

শরীর তখন ক্লান্ত। কিন্তু সংবাদটা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহে ছুটিলাম। গৃহের কাছে পৌছিয়া কেমন-একটা অজানা আশঙ্কায় সারা মন ভরিয়া গেল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, তথাপি মনে হইতে লাগিল, একখানি কালো ছায়া যেন

আকাশ হইতে গৃহখানির উপর নামিয়া আসিয়াছে। প্রায় মাসাবধি তাঁহাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই। মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম, হয় ত ইহা আমারই মনের প্রতিচ্ছায়া। কম্পিত পদে ঘরে গিয়া দেখি, পণ্ডিত-মশায় মুমূর্ষুর মত শয্যায় শুইয়া আছেন, গৃহকোণের মৃৎ প্রদীপের কম্পিত ম্লান আলোকে তাঁহাকে বড় স্থবির, বড় বৃদ্ধ দেখাইতেছে। মুখে জরার লক্ষণ, চোখ দু'টী মুদিত। মায়া মাথার কাছে নতশিরে বসিয়া তাঁহার শুভ্র কেশগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি বুলাইয়া তাঁহাকে আরাম দিবার চেষ্টা করিতেছে। বেদনা ও দুশ্চিন্তায় তাহার মুখখানি ম্লান। আমার পদশব্দে সে সচকিত হইয়া উঠিল। অতি কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ নত করিল। পণ্ডিত-মশায় ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে সে গৃহে এমন পরিবর্ত্তন, আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। তাঁহাদের কাছে নিজেকে মহা অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বস্তুতঃ, আমারই জন্য লোকে তাঁহাদের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। অধ্যাপনা তাঁহার উপজীবিকা হইলে, বোধ করি তাঁহাদের দু'টীকে অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিতে হইত।

"আমাকে দেখিয়া অতি ক্লান্তস্বরে তিনি কহিলেন, 'বাবা, আজ সারাদিন তোমাকে মনে করেছি।' তারপর তাঁহার শয্যাপার্শ্বের মোড়াটির উপর আমাকে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন।

"আমি কহিলাম, 'আপনি যে এমন অসুস্থ, এ আমি জানতুম না। আমি এই রাত্রেই সহরে ডাক্তার আনতে যাব।'

"স্নিগ্ধ হাস্যে তিনি কহিলেন, 'আমার ছুটীর ঘণ্টা শুনছি বাবা, আর তোমরা আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। যাবার পূর্ব্বে, যে কথাটী এতদিন কারো কাছে বলি নি, তা' তোমাদের বলে' যাব।' বলিয়া তিনি পরম স্নেহভরে মায়াকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটী গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তারপর কহিলেন, 'আঠারো বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। তার সব কথা মনেও পড়ে না, আর সময়ও অল্প। তখন বর্ষার নূতন জল আমাদের গ্রামের বিল ও দূরের ছোট নদীটাকে খাড়িপথে যোগ ক'রে দিয়েছে। আমি সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে নৌকো পথে তাঁর পিত্রালয়ে যাচ্ছিলুম। দীর্ঘ পথ—কিন্তু নৌকো ব্যতীত যাবার অন্য কোন উপায়ও নেই। পথে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট; কিন্তু বিধাতা তাঁর এই ক্ষুদ্র কীটটীকে চিরদিন সযত্নে রক্ষা ক'রেছেন। প্রথম দিন কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল না। দ্বিতীয় দিনও সারা দিনমান চলে' সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ বর্ষা নামল। তখন আমরা একখানি গ্রামের নীচে পৌঁছেছি। কিন্তু বৃষ্টির তেমন বেগ আমরা পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নি—আকাশ যেন পৃথিবীর বুকে ভেঙে পড়ল। সেই দুর্য্যোগে নৌকোয় থাকা সমীচীন নয় বিবেচনায় সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে তীরে উঠি এবং বহুকষ্টে গ্রামে পৌঁছে একখানি গৃহে আশ্রয় নি। সেইখানে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে বিধাতা আমাদের হাতে একটী অমূল্য সম্পদ তুলে দেন। সে দৃশ্য বর্ণনা করতে পারছি না। তবে এইটুকু জেনে রাখ, সেই দরিদ্রা গৃহস্বামিনী সন্তানটি প্রসব করবার অল্পক্ষণ পরেই সংসার জ্বালা হ'তে মুক্ত হন। তিনি একরূপ পরিত্যক্তার মতই গ্রামপ্রান্তে বাস করতেন। কি তার পরিচয় কোথায় বা তাঁর স্বামী, তিনি কোন বর্ণভুক্ত পরদিন এ সকল তথ্য গ্রাম হ'তে সংগ্রহ করি। কিন্তু সে সকল শুনে আমরা বিচলিত হই নি। নিষ্কলঙ্ক শিশুটিকে বিধাতার দানরূপে আমরা বুকে তুলে নিয়েছিলুম। সে ভূমিষ্ট হয়ে যে মায়ায় আমাদের

ভুলিয়েছিল, সে বাঁধন ছিঁড়ে আমার সহধর্ম্মিণী বহুকাল চলে গেছেন, কিন্তু আমি আজও তা' ছাড়্‌তে পারি নি। সহধর্ম্মিণীই তার নাম দিয়াছিলেন—মায়া' বলিয়া তিনি পরম ক্লান্তিভরে নীরব হইলেন। মায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, তাহা বিবর্ণ, শুষ্ক পুষ্পের মত। মনে হইতে লাগিল, সে বুঝি এক বিরাট শূন্যতার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। যে বৃন্তটি এতদিন তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন ছিন্ন হইয়া বহু নিম্নে ধূলিমাঝে তাহাকে নিক্ষেপ করিল। রূপকথার মত ঘটনাটি শুনিয়া আমিও চমৎকৃত হইয়া পড়িলাম।

"পণ্ডিত-মশায় আবার ধীরস্বরে কহিলেন, 'সুশিক্ষা, সদপরিবেষ্টনী, মহৎ আদর্শ এইগুলিই মানুষকে উন্নত করে—জন্ম কাহারো মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী নয়। মায়াকে আমরা সযত্নে পালন ক'রেছি। একে সর্ব্বগুণে ভূষিতা কর্‌তে চেষ্টার অবধি রাখি নি, একটু গর্ব্বও ছিল, এর উপযুক্ত পাত্র অতি অল্পই আছে। সকলেই জানে মায়া আমারদেই সন্তান। তথাপি একে এতকাল অনূঢ়া রেখে কলঙ্কভাজন হয়েছি, একে মর্ম্মপীড়াও ভোগ কর্‌তে হয়েছে। এর স্ববর্ণে বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমার সমবর্ণে একে দান করবার মত প্রবৃত্তি মনে জাগে নি। কিন্তু এই বিদায়ের কালে মনে হচ্ছে,—লৌকিক আচারের যে গণ্ডী, তা' কাল্পনিক; যা' আজ আছে, তা' কাল নাই এবং যা' কোনদিন ছিল না, তাই বড় হ'য়ে উঠেছে। মানুষের সহিত মানুষের মিলন যত সহজ হয়, ততই তা' কল্যাণের। কিন্তু এই ভুলটি সেরে নেবার অবসর এ জীবনে আর পেলুম না। তোমাকে আমি পুত্রের মত স্নেহ করি—তোমার শুভবুদ্ধি ও সদ্‌গুণে আমি মুগ্ধ। আমার এই কন্যাকে আজ তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি। ভরসা করি, তুমি স্বেচ্ছায় কখনও এর মর্ম্মপীড়ার কারণ হবে না।'

"তারপর তিনি অশ্রুমুখী মায়াকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইলেন। নিস্তব্ধ গৃহে মায়ার সেই মর্ম্মভাঙা চাপা কান্নার প্রতিধ্বনি আজও আমি নিশীথে ঝাউবনের সর্ সর্ শব্দস্রোতে যেন শুনিতে পাই।

"সেই রাত্রিশেষেই পণ্ডিত-মশায় অসহায় মায়াকে আমার কাছে রাখিয়া পরলোকের পথে যাত্রা করেন। স্বেচ্ছায় একদিন যাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছিলাম, তাহাকেই তিনি এমনি করিয়া আমার জীবনের মধ্যে রাখিয়া গেলেন! ইহাতে মায়ার জীবনেই যে দুঃসহ বেদনা নামিয়া আসিল। বুঝিতেই পারিতেছ, এ ব্যাপারে শত দিকে শত রসনা কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"তারপর মাত্র একটী মাস কাটিয়া গিয়াছে—মায়ার মুখখানি দিন-দিনই যেন বেদনাক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাহার মন সারাক্ষণ একটী চিন্তার ভার বহিয়া ক্লান্ত ও কাতর। লোকের বাক্য-বিষ সময়ে সময়ে সীমা ছাড়াইয়াও যাইতে লাগিল। অবশ্য ইহাতে তাহাদের অপরাধ কি? নারী-পুরুষের সম্বন্ধটাকে আমরা যে দৃষ্টির মধ্য দিয়া দেখি, তাহা যে অতি সঙ্কীর্ণ। ইহাকে প্রশস্ত করিতে কতদিনের যত্ন ও শিক্ষার প্রয়োজন? মায়াকে আমি কখনও ছাড়িতে পারিব না। মন কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের ভাররূপেই তাহাকে সেদিন গ্রহণ করে নাই, মনে মনে তাহাকে একদিন কামনাও করিয়াছে। আমি গ্রাম চাহি না, এই আদর্শ ধূলিসাৎ হোক, ইহা অপেক্ষা মায়াকে লাভ আমি বড় বলিয়া মানি। ইহার মধ্যে বিধাতারই ইঙ্গিত দেখিতেছি যেন। স্থির করিলাম, তাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিব। ইহা ছাড়া আর পথও তো কিছু নাই। আশা ছিল, এ প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করিবে না। তাহার

আচরণে মনে হইয়াছে, এমনি কথা সেও হয় ত নিভৃতে আপন-মনে ভাবিয়া থাকে।

"সেইদিনটি আমার জীবনে চির-স্মরণীয় হইয়া আছে। তাহাকে একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিলে ভরসা রাখি, বন্ধুর জীবনের একটী সুরভিত মূহূর্ত্ত বলিয়া অনুকম্পাবশে আমাকে মার্জ্জনা করিবে। আজ আবার বিশেষ করিয়া তাহাকে মনে পড়িয়া গেল।

"বর্ষা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিলের পূর্ব্ব ধারে কেয়াফুলের সিক্ত সৌরভ অলস বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া গ্রামের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গৃহের দক্ষিণে প্রান্তর ভরিয়া কাশের মেলা। অঙিনায় শেফালীর ম্লান গন্ধ। রৌদ্রমাখা কোমল নীল আকাশ পথের বহু দূর হইতে মেঘের কেতন উড়াইয়া মনে হইতেছে যেন কোন্ বিজয়ী, ধরার বুকে নামিয়া আসিতেছে। দ্বিপ্রহরের এই স্বপ্ন ছায়ায় বসিয়া মায়ার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। কহিলাম, 'যে কাজে আমি নেমেছিলুম, যার প্রতি শরীর মনের সকল শক্তি ঢেলে দিতে কোনদিন শৈথিল্য ঘটে নি, আজ তা' থেকে আমার অবসর ঘটেছে। এদের প্রতি মন আর ছুটে চলে না—তোমার পাশে এই আদর্শ নিষ্প্রভ ও ক্ষুদ্র।'

"মায়া ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল—'আত্মসুখ কি এতগুলি লোকসেবার তুলনায় তুচ্ছ নয়? পৃথিবীতে আমি অনাকাঙ্ক্ষিতরূপে মাতৃক্রোড়ে এসেছিলুম। তাঁকে কোনদিন দেখি নি। কিন্তু ভাগ্যে স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা লাভ হয়েছে প্রচুর। এরপরও যে সুখভোগের সৌভাগ্য আমার লাভ হ'ত, তা' আমার ব্যক্তিগত জীবনে কতখানি, একথা বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌ব না। তবু আমি তা' অপেক্ষাও এই গ্রামখানিকে বড় ক'রে দেখ্‌ছি। যে অন্তর এদের প্রতি দরদ ঢেলে দিয়েছিল, তা'কে নিতান্ত স্বার্থপরের মত কেড়ে নেব কোন্ অধিকারে? তা'তে যে আমাদের মহা অকল্যাণ হবে। পিতাঠাকুর শিখিয়েছিলেন, 'মা, আত্মসুখকে সবার পিছনে রেখো; দেখ্‌বে জীবন সুরভিত হয়ে উঠেছে।' সকল সাধনার প্রারম্ভেই ত্যাগ থাকে—আজ আমার সে সাধনার শুভক্ষণটি উপস্থিত। আমার ব্যক্তিগত সুখ আনন্দকে এই গৃহে রেখে যাব। এরা তোমায় আমায় একত্রে চায় না—' বলিতে বলিতে তাহার চোখ দু'টি অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। আমি মন খুঁজিয়া তাহার কথার কোন উত্তরই পাইলাম না। একটী কথা কেবলই মনের মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল—'আত্মসুখকে সবার পিছনে রেখো।' তাহাই হউক।

"সন্ধ্যায় সে কহিল—পরদিন পণ্ডিত-মশায়ের জনৈক বন্ধুর গৃহে সে চলিয়া যাইতে চায়। প্রস্তাবটা আচম্বিত। কিন্তু তাহার ইচ্ছায় বাধা দিলাম না। আমি তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিলে, সে তাহাতেও সম্মত হইল না। পরদিন একাকীই চলিয়া গেল।

"মনে পড়ে, যাইবার কালে জলভারাতুর চোখ দু'টি তুলিয়া বারবার সে আমার দিকে তাকাইয়া ছিল। আমি আপন অশ্রু গোপন করিয়া বলিয়াছিলাম—'রাণি, এই শেষ নয়--' সে কহিয়াছিল—'না, এই আরম্ভ—'

"কলিকাতায় পৌঁছিবার পাঁচ দিন পরে তাহার একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাই। তাহাতে সে লিখিয়াছিল, একটী গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কাজ পাইয়া সে অন্যত্র যাইতেছে। এবং সেই তাহার শেষ পত্র। তাহার পর সে কোথায় গেল, এতকাল কোথায় থাকিত, এ সকল সংবাদ পণ্ডিত-মশায়ের বন্ধুটির কাছ হইতে জানিবার চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই।

"তোমার পত্রে জানিতেছি, এতদিন আমাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল অল্প, কিন্তু আজ সত্যই সে তাহার সুখ-দুঃখের ভার নামাইয়া দিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে! যাইবার কালে, কাহারো কথা হয় ত বারবার তাহার মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু আমি যে আজও তাহারই দেওয়া বন্ধনে বন্দী—কবে ইহা হইতে মুক্তি পাইব, নক্ষত্র-লোকের কোন্ দূরতম রাজ্যে তাহার সহিত আবার একদিন দেখা হইবে, কে জানে!"

—দৈববল—

[নাট্য চিত্র]

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু

প্রথম দৃশ্য

স্থান—চিৎপুর রোড ও গ্রে ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থল। সময় সন্ধ্যা। বাস্, মোটর ও ট্রামের ছুটা-ছুটিতে রাস্তায় পা বাড়াইতে ভয় হয়। ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানেরা তাহার উপর যতটা পারিয়াছে, পথটাকে দুর্গম করিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে। জনকয়েক পকেটমারা রাস্তার উত্তর দিকের ফুটপাতের মোড়ে শীকার অন্বেষণে ফিরিতেছে। ফেরিওয়ালার উচ্চ কণ্ঠধ্বনি—কাবুলী বেদানা, আঙুর, 'লিবার্টি','আনন্দবাজার' বাবু। জনৈক খোনা ভিখারী গুণগুণ স্বরে গান গাহিতেছে—'গাঁ তোঁলোঁ, গাঁ তোঁলোঁ—একটী পয়সা দিয়ে যাবেন বাবু!'

কেরাণীদের অফিসের ছুটীর পর ক্লান্তদেহ টানিয়া ঘরে ফিরিবার কসরৎ। বারান্দায় বার-নারীদের হুড়াহুড়ি। জনৈক পল্লী-পথিক 'হাঁ' করিয়া সেইদিকে চাহিতে চাহিতে বাসের তলায় গিয়াছিল আর কি! পুলিশ হাত ধরিয়া ধাক্কায় ধাক্কায় তাহাকে রাস্তাটা পার করিয়া দিল।

ডাক্তার অবনীবাবু চলিয়াছেন। হাতের মোটা লাঠিগাছটা ভুমিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থাপিত। তিনি মুখ বিকৃত করিতেছেন; বোধ হইতেছে, যেন কোন আন্তরিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন। মোড়ের কাছটায় আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। একটী গৌরবর্ণ ছিপ্‌ছিপে চেহারার ছোকরা হঠাৎ আসিয়া তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া প্রণাম করিল। ডাক্তার ত অবাক্! মনে হইল ইহাকে পূর্ব্বে আর কখন তিনি দেখেন নাই; কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলাও চলে না—বিশেষ এত অতিরিক্ত ভক্তি-প্রদর্শনের পর।

ছোকরা (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)-ভাল আছেন?

ডাঃ—অ্যাঃ, হাঁ, তা' আর কই বাপু; ভুগ্‌ছি, বিশেষ এই পাথুরীর বেদনাটায়।

ছোকরা (উৎসাহদীপ্ত মুখে)—বলেন কি, আপনি ভুগছেন! নিজে এত বড় ডাক্তার হ'য়ে?

ডাঃ (নিরাশভাবে)—কি করি বাপু, যেমন কর্ম্মফল! অনেক লোককে ভুগিয়ে মেরেছি—

ছোকরা—কি যে বলেন। হাঁ, নিজের ওষুধ বোধ হয় ব্যবহারই করেন না। দেখুন ত, এই ত আপনার দোষ। মিছে কষ্ট পেয়ে লাভ? দু'ডোজ পড়্‌লে রোগ বাপ বাপ' বলে পালাত! লোক কি, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! জানি ত।

ডাঃ (আনন্দে গলিয়া গিয়া)—কি জান বাবা, খাচ্ছি; তবে নিজের চিকিৎসা নিজে হয় কি—হয় না। গোলমাল ওঠে কি না-জানই ত?

ছোকরা (সমর্থনের হাসি হাসিয়া)-তা' সত্যি। আচ্ছা, রোগটা কি বল্‌লেন, পাথুরীর ব্যথা? প্রথম কোমর থেকে আরম্ভ হয় ত; শেষে কাটা ছাগলের মত যন্ত্রণা? জানি, জানি, আর বল্‌তে হবে না; বাবাকে নিয়ে কি কম ভুগেছি! ভগবানের কৃপায়—(মাথায় হাতটা ঠেকাইল)

ডাঃ (আগ্রহভরে)—আরাম হয়ে গিয়েছেন?

ছোকরা (আর একবার কপালে হাতটা ঠেকাইয়া)—আজ্ঞে হ্যাঁ। বল্‌তে নেই, বাবার কৃপায় আজ বছর দুই ত আছেন ভাল।

ডাঃ—কিসে গেল?

ছোকরা—সে না বলাই ভাল; আপনার কি বিশ্বাস হবে? তার চেয়ে বলা ভাল ভোগ আর ছিল না তাই—

ডাঃ (সাগ্রহে)—কিন্তু বাবা যতদূর জানি,

এ সে ব্যায়রাম নয়। আমার বলে' দাও, বড় কষ্ট পাচ্ছি।

ছোকরা (মাথা চুলকাইয়া)—তা' বল্‌তে পারি; কিন্তু কি জানেন—বিশ্বাস কর্‌তে পারবেন কি? সেরেছে দৈবে—

ডাঃ—কেন বিশ্বাস হবে না বাবা, দৈবই ত সব! মানুষ নিজের চেষ্টায় কি পারে? আমি ডাক্তার, হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝি। দু'জনের ব্যায়রাম ঠিক এক নেচারের—দেখে-শুনে ওষুধ দিলুম; একজন গড়িয়ে গড়িয়ে সেরে উঠ্‌ল—আর একজন দেনা পাওনায় ছুটি নিলে। বল ত এর পেছনে দৈব না থাক্‌লে—

ছোকরা—তা' বটে। আমরা সেই অবধি খুবই বিশ্বাস করি। বিশেষ, বাবা বড় জাগ্রত! যাকে যাকে আনিয়ে দেওয়া গেছে, কেউ নিষ্ফল হয়েছে বলে ত শুনি নি।

ডাঃ (সাগ্রহে)—সেই ওষুধ আমায় একটু আনিয়ে দিতে পার না কি?

ছোকরা (মাথা চুলকাইয়া)—তাই ত! কি জানেন ডাক্তারবাবু, আমার নিজের হাতে ত নয়।

ডাঃ। তবে থাক।

ছোকরা - রাগ করলেন না ত? বলুন, আমি আপনার ছেলের মত, আমার মাথায় হাত রেখে বলুন।

ডাঃ—খেপেছ! তোমার নিজের হাতে যা' নয়, তা' তুমি স্বীকার পাবে কি ক'রে; আমি কি বুঝি না। আর আমিই বা বল্‌তে যাব কোন লজ্জায়।

ছোকরা (চিন্তিতভাবে)—দেখুন, পর এমন যে কেউ তা' নয়—আমার বোনের পিস-শাশুড়ীর সই। বড় ধার্ম্মিক মেয়েমানুষ—কেবল জপ-তপ নিয়েই আছেন—বল্‌লে স্বীকার কর্‌বেন না কি? কে জানে!

ডাঃ—না বাবা, না। ও নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানা। কত রকম বেরকমের রোগী তীর্থের কাকের মত বসিয়া আছে। হাতে শিশি, চোখে জল। ইচ্ছা, কোন-রকমে দাওয়ায়ের পয়সা ক' গণ্ডা ফাঁকি দিবে। মুখে হা-হুতাশ! ডাক্তারবাবু ধীরভাবে একজন রোগীর রোগের ইতিহাস শুনিয়া যাইতেছেন। কীর্ত্তনীয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া করতাল বাজাইয়া গান ধরিল—'নিতাই আমার প্রেমময়, গৌর আমার—' 'দোয়ারকি মুখের বিড়িটায় বেশ একটু জোরে টান দিয়া ধুয়া ধরিল—'গৌর আমার—'

ব্যস্তসমস্তভাবে গত দিবসের সেই ছোকরা বাবুটী আসিয়া দাঁড়াইল। রোগীর কথার মধ্য পথে বাধা দিয়া ডাক্তারবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—যাক্, ভগবানের দয়া বল্‌তে হবে ডাক্তার বাবু; তিনি রাজী হয়েছেন।

ডাঃ—গেছ্‌লে না কি?

ছোকরা—যাব না, বলেন কি আপনি! না, যা' বলছিলুম, বোধ হয় ভগবানের দয়াতেই আপনার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল। আমি বল্‌ছি আপনি নিরাময় হয়ে যাবেন। বাবাকে গিয়ে বল্‌তে, কি বকুনি! বলেন, এমন দয়ালু-লোকের একটা কাজে এলি না হতভাগা! তবে কিসের জন্য গিল্‌ছ দু'বেলা! বেরো' বাড়ী থেকে। সত্যি, কাজটা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে।

ডাঃ—না, না, না।

ছোকরা—আপনি না বল্‌লে কি হবে, আমি ত প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌ছি। যাক্, এখন আর প্রাণে কোন দুঃখ-দরদই নেই। হ্যাঁ, কাল বেরুবেন ......পথে না কি বড় কষ্ট—দু' দুটো নদী পেরুতে হয়। তেমনি কোট্‌কেনা—মাথায় ক'রে আস্‌বার পথে শৌচাদি পর্য্যন্ত কর্‌বার উপায় নেই—

যাক্, উনি নিজে যখন যাচ্ছেন, আমাদের ভাবনাই নেই।

ডাঃ—কত খরচ পড়্বে?

ছোকরা—কিছু না, কিছু না—তবে তিনি কষ্ট করে যাচ্ছেন এই য’। তার ওপর কাজ কি তাঁর পয়সা খরচ করিয়ে, কতই বা! পূজো, তা’ দিতে হয় বই কি? যৎসামান্য যে যা’ পারে, আরাম হ’লে দিতে হবে বটে। না, না, এর জন্যে আপনাকে আর ব্যস্ত হ’তে হবে না; আমিই দিয়ে দেব’খন। তবে বলে কি না, দণ্ড না দিলে রোগ সারে না, তাই যা’ -

ডাঃ (সাগ্রহে মনিব্যাগ খুলিতে খুলিতে)—বিলক্ষণ, দিতে হবে বই কি,তুমি এতটা যে কর্‌লে, তারই ঋণ—

ছোকরা—কি যে বলেন, আপনার এটুকু যদি না করি, গতরে পোকা পড়ে যাবে না। আপনি কি একটা কম লোক—মহাপুরুষ, মহাপুরুষ!

ডাঃ (ধীরভাবে মাথা নাড়া দিয়া)—ওসব বল্‌তে নেই বাবা—একজন ক্ষুদ্র সংসারী কীটকে অতটা বাড়ান ভাল নয়।

ছোকরা—বেশ, আপনি ত লুকুবেনই। ওসব বলুন গে, যে জানে না তাকে। না, না, এত কি হবে, আবার আমার গাড়ী ভাড়া! ভবানীপুরে যেতে-আস্‌তে—না, এটা কিন্তু আপনি অন্যায় কর্‌লেন।

ডাঃ—কিছু অন্যায় নয় বাবা, তোমাদের কল্যাণে সেরে যদি উঠি, সেই আমার ঢের।

ছোকরা—বটেই ত, বটেই ত! তা’ হ’লে উঠি। ও আপনি মনে ভাবুন সেরেই গেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ডাক্তারবাবুর বাটী। ডাক্তারবাবু সবে কল হইতে ফিরিয়া অবশভাবে শুইয়া পড়িয়াছেন। একজন চাকরে তেল মাখাইতেছে। বেরালটা দুধের কড়ায় বুঝি মুখ দিল। উনানটা খাঁ খাঁ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে।

ডাঃ (বিরক্ত চীৎকারে)—না পার্‌বার যো নেই—এরা সব গেল কোথায়?

ছোকরা (দ্বারের নিকট হইতে)—মামা, বাড়ীতে না কি?

ডাঃ—এই যে বাবাজী এসেছ, পেয়েছ না কি?

ছোকরা—হ্যাঁ। চিল হয়ে যখন পড়েছি, কুটো না নিয়ে উড়ি! তবে খরচটা কিছু বেশীই হয়ে গেছে। থাক্, সে কথা আপনার আর শুনে কাজ নেই।

ডাঃ—না, না, তা’ কি হয়! এসব কাজে, বিশেষ দেবতার কাজে কারুকে ঋণী ক’রে রাখ্‌তে নেই।

ছোকরা (অনিচ্ছায়)—হ্যাঁ, বাবাও তাই বল্‌ছিলেন। আর একটা কথা—একলা বুড়োমানুষ ভরসা করেন নি, তাই একজনকে সঙ্গে দিতে হয়েছিল; বিশেষ, কোট্‌কেনার কথাটা ত জানেন—

ডাঃ—তা’ কত পড়্‌ল?

ছোকরা—নেহাৎ শুনবেনই? খরচ পড়েছে এমন বেশী কিছু নয়—যা’ দিয়েছেন, তার ওপর আর গোটা দশেক টাকা। অপর কেউ হ’লে পঞ্চাশ টাকার এক পয়সা কমে যদি আন্‌তে পার্‌ত ত কি বলেছি। তা’, হ্যাঁ, ওষুধ বটে! কাল ধারণ করুন ত। পরশু বাদে তরশু এতটুকু ছিটে ফোঁটা বেদনা যদি ধরে, বল্‌বেন - এখান থেকে ভবানীপুর এস্তক জুতো খেতে খেতে—

ডাক্তার টাকাটা বেশী যাইতেছে মনে মনে বুঝিলেও মুখ ফুটিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না।—তা’, তা’, এ আর এমন বেশী কি—দিতে হবে বই কি! দয়া ক’রে এতটাই যখন তিনি করেছেন তা’ এবেলা এখানেই খেয়ে-দেয়ে—

ছোকরা—আজ্ঞে না, না, মা সেখানে হাঁড়ী নিয়ে বসে আছেন; গেলে তবে তিনি মুখে জল

দেবেন। নইলে, এত ঘরের কথা। আসি তা' হ'লে।

ডাক্তারের স্ত্রী মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা। কপাটের আড়াল হইতে এতক্ষণ তিনি উস্‌খুস্ করিতেছিলেন। এইবার বাহির হইয়া স্বামীর অনুমতি অপেক্ষায় একবার মাত্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"তা' কি হয় বাবা, তোমার আর এক মা'ও যে এখানে রয়েছে; আমাকে কষ্ট দিয়ে যেতে পারবে?"

ছোকরা হঠাৎ ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল—"তা' কি পারি, তবে কি না মা নেহাত ছেলেঅন্ত প্রাণ—একদণ্ড না দেখলে অস্থির হয়ে পড়েন—নইলে এত ভাগ্যের কথা।—তা' দিন এক গেলাস জলই দিন—আপনার কথাও ত ঠেলা চলে না।

জলের নামে অনেক কিছু পেটে লুকাইয়া ছোকরা আর একবার সভক্তি প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রকাণ্ড বাড়ী। অভিনব সাজসজ্জা। দাসী-চাকর অগণ্য, কিন্তু 'টুঁ' শব্দটী নাই। সকলের বিরস মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া—কখন কি হয়, কখন কি হয়! রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ছোট বাবু হাঁকিলেন—সোফার, মোটর।

বাড়ীর নিত্য অন্নভোজীর দল সোৎসুকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল—যেন তাহাদের এ যাত্রাটার খুঁটিনাটি না জানিলে একান্তই চলিবে না। একজন চাকর বলিল—ডাক্তারকে খবর দেব বাবু?

একটা ঝড়ের মত আপত্তি সকল কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া বেচারীকে হতভম্ব করিয়া দিল। ছোটবাবু কিন্তু সময়োপযোগী প্রীতিভরে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না মাণিক, যাচ্ছি ত, আমিই খবর দেব 'খন। তুই বরং আমার সঙ্গে আয়, বিশেষ দরকার।

তাহারা চলিয়া গেল। সকলে রোগীর কক্ষের দিকে উৎসুক নয়নে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দৃশ্যান্তর

রোগীর কক্ষ। পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পত্নী শুশ্রূষায় নিযুক্ত। একধারে ষ্টোভে জল গরম হইতেছে। দাসী ফ্ল্যানাল ভিজাইয়া দিতেছে, স্ত্রী বড় যত্নে তাহা স্বামীর রোগক্লিষ্ট স্থানটীতে চাপিয়া ধরিতেছেন। বৃদ্ধা মা একপাশে বসিয়া পাখা নাড়িতেছেন ও অনবরত অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ডাক্তারবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রোগী—ডাক্তার, ডাক্তার, এবার আমার শেষ। ওঃ! মা! আচ্ছা, বল্‌তে পার, কলির দেবতারাও কি চোখ বুজে ঘুমিয়েছেন—

ডাঃ—ভয় কি। এখুনি সেরে যাবে।

রোগী—আর সেরে যাবে! এমন প্রত্যক্ষ জাগ্রত দেবতা যখন মুখ ফিরিয়ে রইলেন, তখন—বল কি, সবার সারল, তবে কি বুঝব—দেবতার একচোখোমী, না, আমার নিয়তি! মা! উঃ!

ডাঃ—আচ্ছা, এইটুকু খেয়ে নাও ত।

রোগী—কি হবে, মিছে চেষ্টা। দাও। এ আমার সারবার রোগ নয় ডাক্তার, নিয়ে যাবার।

ডাঃ দেবতার কথা কি বল্‌ছিলে?

রোগী—আর বল' কেন, মার মুখে শুনে একশ' টাকা পাঠালুম—যাক্! আর দু-শ' চায় দিতে রাজী—কিন্তু, কিন্তু, না দেবতাও অভাগার ওপর বিমুখ!—

ডাক্তার রোগীকে একটু স্বচ্ছন্দ দেখিয়া তাহার মাতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ব্যাপারটা কি বলুন ত?

রোগীর মাতা—কে জানে বাবা, অমন ভাল ছেলেটী, অত কষ্ট নিয়ে ওষুধ এনে দিলে, কিছু হ'ল না ত। তাও বলি, রোগের ভোগ থাক্‌তে তিনিই বা কি করবেন?

ডাঃ (উৎসুকভাবে)—ছেলেটী পাতলা ছিপ্ ছিপে গড়নের, বাঁ কাণের নীচে একটা আঁচিল আছে ?

রোগীর মা—হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ। তুমি চেন কি তাকে ?

ডাঃ (চঞ্চল হইয়া)—বলেছিল, দুটো নদী পেরিয়ে ওষুধ আনতে হয়, তার বোনের—

রোগীর মা—ঠিক্ ঠিক্, ওই লোকই বটে !

ডাঃ—উঃ, মানুষ চেনবার যো নেই ! (বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন)

রোগীর ভাই—একটা লোককে টানিতে টানিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া—এই নিন,আপনাদের ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে। লোকটা পাকা বদমাস। প্রথম দেখেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল, কোথায় যেন দেখেছি। ভাগ্য ভাল, তাই একচোটে এ দেবতার দর্শন পাওয়া গেছে - শ্মশান যাত্রীদের গাঁজার আড্ডায়। এখন বলবে কি ছোকরা, কোথাকার সে দেবতা ? আমি জান্‌তে চাই, সেখানকার কাণ্ডখানা কি ? বলি, জুচ্চুরীর আর জায়গা পেলে না।

ডাঃ—এখানে নয়, এখানে নয়, নীচে, নীচে চল, ওর সঙ্গে আমারও কিছু বোঝবার আছে।

ছোকরা (সহসা রোগীর মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া) মা, আমায় রক্ষা করুন, বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি ! এ'রা—

রোগীর মা—কি বল বাপু, দেবতার নাম নিয়ে জুচ্চুরী—

ছোকরা—হ্যাঁ মা, তাই। কি করি, পেট চলে না, কাজেই এই ব্যবসা। আপনি মা, আপনার কাছে—

রোগীর মা—ছেড়ে দে অঘোর, ওকে মারলে কি টাকাটা উঠবে ?

ছোকরা—না, স্বীকার করছি, টাকা আমি মারব না, ফেরৎ দেব—আপনাদের ও ডাক্তারবাবুর। উঃ, কি যে বুদ্ধি হ'ল, কেন এমন কাজ করলুম ! এবারটা আমায় বাঁচান।

রোগীর ভাই—হ্যাঁ, বাঁচাব—পুলিশে দিয়ে।

সে তাহাকে টানিতে টানিতে পথে আনিয়া ফেলিল। সেখানে লোক জমিয়া গেল।

একজন ছুটিয়া আসিয়া পায়ের জুতা খুলিয়া ছোকরাকে মারিতে মারিতে—এখানেও আমার মুখ পোড়াতে এসেছ—হতভাগা, মর, মর, মর ! আঃ, কি বলব মশায়, আমার সর্ব্বস্ব ওর জন্যে যেতে বসেছে—তার ওপর এই কলঙ্কের কালি ! আঃ, তবু তোর এ নেমোখারামী যাবে না ! আমায় ছেড়ে দিন, ওকে আমি খুন করব—ও আমার মায়ের পেটের ভাই নয়, কেউ নয় ! এমন ক'রে যে মুখে চুণকালি দেয়, পেটের ছেলে হ'লেও তাকে—

সকলের অনুরোধে কিঞ্চিত শান্ত হইয়া—কত টাকা নিয়েছে আপনাদের, একশ' ? আবার আপনারও পনের ? আবার ডাক্তারবাবুরও ? দাঁড়া রাস্কেল ! দেব, আমিই দেব। আজ দয়া ক'রে ছুটী দিন। পরশু মাসকাবার—মাইনের টাকা পেলে কিছু কিছু ফেল দেব- একটু রয়ে-বসে নিতে হবে আপনাদের। কি করি বলুন না—

তাহারা প্রস্থান করিলে একজন ভদ্রলোক প্রায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া—কই, কোথায় গেল ? ছেড়ে দিয়েছেন ? টাকাটা পাবার অঙ্গীকারেই গলে গেছেন বোধ হয় ! ওরা সব জোচ্চোর, সব জোচ্চর ! ওই ওদের ব্যবসা। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আজ পর্য্যন্ত জানাশোনার মধ্যে দু'শ' লোককে ঠিক্ এমনি করেই ওরা ঠকিয়েছে।

সকলে হতভম্বের মত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

যবনিকা নামিয়া আসিল।

—সখ—

শ্রীবিমলা দেবী

এক

মায়ের নাম ছিল কাত্যায়ণী, মেয়ের নাম হ'ল কল্যাণী !

সখ বুঝি সবাইকার আছে, নইলে কাদম্বিনী নামটা হাতের কাছে থাক্‌তেও কাত্যায়ণী মেয়ের নাম রাখ্‌লে কল্যাণী !

ঐ মেয়েটীই সবাইকার ছোট, কিন্তু সবাইকার আদুরে নয়। পূর্ব্ববর্ত্তীদের ধমক-চমক কল্যাণী নিঃশব্দে বহন করে না, কিন্তু বাহাল করে। দিদিদের ছেলে কোলে নিয়ে রাত্রিদিন এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়াবার সময় মাসীত্ব গর্ব্বে কল্যাণীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে না, বরং কালো হয়েই ওঠে !

ডুরে কাপড়পরা ছোট্ট রোগা মেয়েটী, পথে-ঘাটে, মাঠে-বাটে, কোথায় না তা'কে দেখা যায়। ছোট পল্লীর সর্ব্বঘটেই সে আছে। দুপুর রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করে, কল্যাণী রায়েদের আম বাগানে আম কুড়োতে যায়, বোসেদের পুকুরে পা ডুবিয়ে বসে থাকে। রুক্ষ চুল সুদর্শন-চক্র খোঁপার বাঁধন এড়িয়ে মুখের উপর উড়ে উড়ে পড়ে।

প্রাণ রসে উজ্জ্বল মেয়ে। মা বলেন—'দস্যি', বাপ বলেন—'দুরন্ত', বোনেরা বলে—'অস্থির', ভাজেরা বলে—'বাচাল'।

বাপের কাছে পায় প্রশ্রয়, মায়ের কাছে পায় আশ্রয়, বাড়ীশুদ্ধ আর সবারি কাছে পায় তাড়না, তবু তার দুরন্তপণা বাধা মানে না। রান্নাঘরে বসে' বড়-বৌ মেজ-বৌকে লক্ষ্য ক'রে বলে—"মাই ত এমনধারা আদর দিয়ে দিয়ে ঠাকুরঝির মাথা খাচ্ছেন।"

—"ওঁর আর কি বলো—ভুগ্‌তে আছি আমরা, ও মেয়ে যে কেমন শ্বশুরঘর কর্‌বে সে আমিই জানি।"

—"বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে আমরাও ছিলাম, কিন্তু এমনধারা বাচাল হ'লে মা আমাদের দু'খানা ক'রে কেটে ফেল্‌তেন।"

ছোটখাট ঝড়ের মত কল্যাণী এসে ঘরে ঢুক্‌ল—"ও বড়-বৌদি', একটা পয়সা দাও না, কুলপি বরফ খাব। ন্যাপলা, সাধন সবাই খাচ্ছে।"

—"আমি কি পয়সা নিয়ে বসে' আছি না কি ! সর, সর, কাজের সময় জ্বালিও না বাপু, হ্যাঁ ! তোমার আর কি দিন-রাত্তির ওই ক'রে বেড়ালেই হ'ল !" বড়-বৌ জ্বলন্ত উনুন থেকে তরকারির কড়াটা নামাতে নামাতে বল্‌লে।

মেজ-বৌ অস্ফুট-স্বরে বল্‌লে—"মেয়েমানুষের দিন-রাত্তির ভাল খাই, ভাল খাই কি বাপু ! ভালোর মাথা আগে খায়।" বসন্তের দুরন্ত বাতাস দেয়ালে লেগে থমকে গেল ! কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে—ওসব বিধাতার অক্ষয় বসন্ত।

সেই পথে বাপ বাইরে যাচ্ছিলেন, কল্যাণী ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধর্‌ল। এমনি করেই দিন যায়, দ্বাদশ হেমন্তের ঝড়ে শিউলি কল্যাণীর মাথায় বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত ঝরে গেল। আর ত মেয়ের বিয়ে না দিলে নয়। কাত্যায়ণী সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লেন। বাপের ওই শেষ কাজ; বলেন—"থাক না দু'দিন।"

কিন্তু দু'দিন আর গেল না, ছেলে পেলেন ভাল, কাজেই ইতঃস্ততঃ কর্‌বার কারণ রইল না।

কিন্তু শেষ কাজের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরও শেষ নিঃশ্বাস নেওয়া হ'য়ে গেল !

কাত্যায়ণী নূতন ক'রে যাত্রা স্থরু কর্লেন। কর্ত্রীত্বের উচ্চ আসন থেকে কখন নেমে এলেন কে জানে, কিন্তু নেমে এলেন ! বৌয়েরা ওঁর বুদ্ধিমতী, সংসারের ভালমন্দ সব বোঝে ! তবু কোথায় যেন বাধে, তাই একবার ক'রে বলে যায়—"মা, ওটা এমনি করেই কর্ছি।"

—"কর" কাত্যায়ণী শুধু বলেন। ওরা ত আদেশ চায় না, সংবাদ দেয় কি না !

কাত্যায়ণী বোঝেন সব, তবু প্রৌঢ়া গৃহিণীর মত নির্লিপ্ত হ'তে সময় লাগে। বলেন—"হ্যাঁ বৌমা, হরিশ যে টো-টো ক'রে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল, বাজার যাবে না। ডাক ত ওকে।"

বড়-বৌ বলে—"হরিশ যাবে না, নরেন যাবে 'খন। ও বাজার গেলে মিণ্টুকে খেলা দেবে কে।" ব'লে নিজের কাজে চলে যায়।

কাত্যায়ণী অপ্রতিভ লজ্জায় ক্ষোভে জিব কামড়ে ধরেন।

কিন্তু স্বভাব যে; একদিনে ত সে যায় না। ছেলেদের পাতের কাছে বসে' আহার তদারক কর্‌তে কর্‌তে চেঁচিয়ে বলেন—"অ বৌমা, শিবুকে আরেকখানা মাছ দিয়ে যাও ত।"

—"বসে' আছে আর মাছ ! কি যে দরকার মার ওখানে বসে থাকার, তা' জানি না। বসে' বসে' হুকুম কর্‌ছেন, এসে নিয়ে গেলেই ত পারেন। ছেলেটা তখন থেকে কেঁদে কেঁদে পায়ে পায়ে ঘুরছে।"

সেজ-বৌ গজগজ কর্‌তে কর্‌তে মাছ নিয়ে এল। অল্প একটুখানি ঘোমটা টানা, শিবুর পাতে ডালনা দিতে দিতে ফিস্ ফিস্ ক'রে মৃদু তর্জ্জনের সুরে সেজ-বৌ বল্‌লে—"আপনি যান না মা, শুয়ে পড়ুন গে, অনর্থক রাত কর্‌ছেন কেন।"

অপ্রস্তুত কাত্যায়ণী উঠে পড়েন; চোখে জল আসে বুঝি ! ভাবেন, সেই প্রথমদিন থেকেই যে তিনি ছেলেদের নিজে হাতে খেতে দিয়েছেন; তিনি না থাক্‌লে ছেলেরা কি পেট ভরে' খেতে পার্‌বে ! শিবু যে তাঁর চাইতেও জানে না !

দুই

কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ নেই। চার বছর পরে কল্যাণী ফিরে এল মায়ের পাশে। এ যেন—"শঙ্করাকে ডাকে—" ভায়েরা গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। এ শুধু বোনের দুর্ভাগ্য নয়, তাদেরও দুর্ভোগ ! সেদিনের দুরন্ত মেয়ে ঝড়ের দোলায় শ্রান্ত হ'য়ে এলিয়ে পড়্‌ল !

বড়-বৌ জনান্তিকে মেজ-বৌকে বল্‌লে—"হ'বে না অমন ! যে ধিঙ্গি মেয়ে !"

মেজ-বৌ সায় দিল—"ভুগ্‌তে আছি আমরা, যা' হ'বার তা'ত হ'ল। এখন দিন-রাত্তির সোহাগ ক'রে পড়ে থাক্‌লে গেরস্থ-ঘরে পোষায় কি ক'রে !"

কথা কাণে হাঁটে !

কল্যাণী আবার উঠে দাঁড়ায়, দৃঢ়পদে কঠিন অন্তরে। সেজ-বৌ ইলিস মাছের কাঁটা চুষ্‌তে চুষ্‌তে কল্যাণীর দিকে একবার দেখে নিয়ে ছোট-বৌকে সম্বোধন করে বল্‌লে—"আমার পিস্‌তুত বোন্ এমনি হওয়ার পর ছ'মাস বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারে নি, এত লেগেছিল; ঠাকুরঝি ত তবু একমাসে সাম্‌লে নিয়েছে।"

ভাতের গ্রাসটা গলায় আটকে এসেছিল, কল্যাণী শুধু মুখ তুলে চাইলে একবার। কেমন একটা অদ্ভুত হাসির অস্পষ্ট রেখা তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠ্‌ল।

মেজ-বৌ বাঁ হাতে ক'রে ইলিস মাছের অম্বল নিতে নিতে বল্‌লে—"না বাপু, মাছ না হ'লে ভাত খাওয়া যায় না ! নিরিমিষ যে কি ক'রে মানুষে খায় !"

দিন-রাত্রি যায় আসে। আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, অনাবশ্যক জীবনের বোঝা তবু টান্‌তে হয় !

একটী সংসারে একটী গৃহিণীই যথেষ্ট, কল্যাণীর

সেখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। মূল্যহীন হাঁড়ি ঠেলা! বড়-বৌ ভাবে—রয়েছে তাই; বলি, না থাক্‌লে কি আর আমরা পার্‌তাম না।

নিষ্ঠুর, কিন্তু সত্যি! কল্যাণী-হীন সংসার ওদের সহজভাবেই চলেছিল অনেকদিন।

সেজ-বৌয়ের মেজ মেয়ে আশা, দুরন্তের একশেষ; কোথা থেকে ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে—"পিসিমা, আম-তেল খাব, দাও না।"

ছোট-বৌ ভাঁড়ারঘরে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"শিখ্‌ছ এখ্‌নি থেকে, মেয়েমানুষের অমনধারা নোলা কি! দিন-রাত্তির ভাল খাই ভাল খাই কর্‌লে ভালর মাথা আগে খেয়ে বসে থাকে।"

কল্যাণী উঠেছিল, কিন্তু আবার বসে' পড়ল। ছোট-বউয়ের লক্ষ্য সে বুঝেছিল। সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রণাম কর্‌তে গিয়ে চোখের জল বাধা মানে না; চন্দ্রালোকিত উঠানের একপাশে মঞ্চের উপর তুলসীগাছে বাতাসের দোলা লাগে শুধু।

একাদশীর দিন নাপ্‌তিনীর কাছে গোল হ'য়ে বসে' কন্যা-বধূরা আল্‌তা পরে। কল্যাণী দূরে বসে নতনেত্রে নখ কাটে। ছোট-বৌ বলে—"আলতা না হ'লে পা মানায়?—"

কল্যাণী মুখ তুলে চায়।

—"আলতার ওপর আলতা পরলে কি হয়? সতীন? ভারি সাহস যে দেখছি তোমার!—"

কি যেন কেমনধারা মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, নিজের দুর্ভাগ্যকে বারে বারে নতুন ক'রে মনে পড়ে!

দ্বাদশীর দিন সকালবেলায় কল্যাণী সবে জল খেতে বসেছে, আশা এসে বল্‌লে—"পিসিমা, আমি খাব।"

আশা হাত পেতে নিলে; কিন্তু মুখে তোলবার আগেই বড়-বৌর উচ্চস্বর শোনা গেল—"কে দিলে শুনি? নিশ্চয় ঠাকুরঝি দিয়েছে। ফেল্‌ ফেল্‌ রাক্কুসী, সাতজন্মে খেতে পাও না! আর তাও বলি বাবু, ও যেন ছেলেমানুষ চাইলে, ঠাকুরঝি বুড়ো মাগী, ওকে কি বলে' দ্বাদশীর জিনিস হাতে তুলে দিলে! নিজের অম্‌নিধারা হয়েছে বলে' সকলের হোক, এত বড় ভয়ঙ্কর পিরকিতি!"

চোখে জল আসে না, সমস্ত দেহমন আড়ষ্ট স্তব্ধ হ'য়ে যায় শুধু!

তিন

ঘাট থেকে ফিরে এসে সেই যে কল্যাণী মুড়ি দিয়ে শুলো, তিন দিন আর চোখ চাইলে না। গ্রামের অবৈতনিক বুড়ো কবিরাজ লাঠি ঠক ঠক করতে করতে একবার ক'রে এসে দেখে যান।

কাত্যায়ণী বুড়োমানুষ, মেয়ের শিয়রে বসে' থাকা ছাড়া, তাঁর দ্বারা আর কিছুই হয় না। বড়-বৌ সময়মত ঘরে ঢোকে, অসময়ে ওষুধের বড়িটা কল্যাণীর মুখে দিয়ে দেয়; মেজ-বৌ সাবুর বাটী রেখে যায়।

কল্যাণী কিন্তু চোখ চায় না, আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে থাকে—আর আপন-মনে এলোমেলো কথা কয়ে চলে!

ঝিল্লীর নূপুর পায়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে; বাঁশবনের ওপর দিয়ে দীঘির স্বচ্ছ জলে ছায়া ফেলে, উঠান ছাপিয়ে ঘরে ঢোকে।

ঘরের এক কোণে একটী প্রদীপ মিটমিট ক'রে জ্বলতে থাকে। কল্যাণীর চারপাশ ঘিরে যেন আসন্ন মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসে।

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ গৃহকে চকিত ক'রে কল্যাণী চোখ চেয়ে ভীতি-বিহ্বল-কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠে—"না, না, আমি যাব না, আমি যাব না, আমার ভয় করছে!"

শেষের কথাগুলো এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে থেমে আসে। শুধু বেঁচে থাকবার একটি বেদনাময় ব্যর্থ চেষ্টার ব্যাকুল আকুতি নিবিড় হ'য়ে ঘরের বাতাসকে ভারি ক'রে তোলে!

বৌয়েরা চকিত-বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে যায়; বেঁচে থাকার সখ সবারি আছে!

* * *

কল্যাণী কিন্তু চলে গেল!—দূরে—দূরে—বহু দূরে—কোথায় তা' কে জানে! পাড়ার ঠান্‌দি' আসেন, কাত্যায়ণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—"কি কর্‌বে দিদি! জন্ম-মিত্যু ত বিধাতার হাতে! অবিশ্যি পেটের সন্তান, কষ্ট কি কম হয়, তা' নয়, তবু সে তোমার জুড়িয়ে গেছে!"

কাত্যায়ণী কেমন ভাবে চেয়ে থাকেন! বড়-বৌ মেজ-বৌর দিকে অন্যমনে চায়। কল্যাণার ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠ কোন দূরান্তর থেকে যেন কাণে এসে বাজে—

—"আমি যাব না!—"

—কড়ি ও কোমল—

শ্রীহরিপদ গুহ

এক

রাত্রি তখন গোটা দশেক হইবে।

রেবতীমোহন টেবিল-ল্যাম্পের সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্ট-মনে কবিতার মিল খুঁজিতেছিল।

স্ত্রী সুনয়না ছেলে দু'টিকে খাওয়াইয়া পাশের ঘরে কোলের ছোট মেয়েটিকে ঘুম পাড়াইতেছিল।

ছেলে দু'টি অনেকক্ষণ হুটোপুটি ও কলরব করিয়া মায়ের ধমক খাইয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

পাশের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিয়া গেল। রেবতীমোহন তখনো পাতার পর পাতা লিখিয়া চলিয়াছে।

সহসা উল্কার মতো সেই ঘরে প্রবেশ করিল সুনয়না। কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া গলাটাকে একটু ঝাড়িয়া লইয়া বলিল—"কী অত লেখা হচ্ছে? এদিকে রাত ক'টা হলো, সে হুঁস্ আছে কি?"

রেবতীমোহন মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল; তাড়াতাড়ি সে খাতাটা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া কি-একটা বলিতে গিয়া হঠাৎ একেবারে থামিয়া গেল।

বারুদের স্তূপে আগুন লাগিল।

সুনয়না দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল—"কেন এমন ক'রে তুমি আমাকে রোজ রোজ জ্বালাও বল তো? কতদিন তো বলেছি—রাত্রে আলো জ্বালিয়ে তোমার কাব্যি করো না। অত তেল জোগাব কোত্থেকে? নিজে তো এক পয়সা উপায়ের চেষ্টা দেখ্‌বে না, আমি সংসার চালাই কি ক'রে বল ত?"

রেবতীমোহন এই নিদারুণ কশাঘাতটাকে বেমালুম হজম করিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা গো, আচ্ছা, এবার থেকে আর আলো জ্বালিয়ে লিখ্‌বো না; ও পাট দিনের বেলাই সেরে ফেল্‌ব, কেমন?"

সুনয়না রুক্ষ মেজাজেই জবাব দিল—"এ আর তোমার নূতন কথা কি? অনেকদিন তো ও কথা শুন্‌লুম। আজ নিয়ে ক'দিন হলো গা?

রেবতীমোহন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সুনয়না মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"কী অত হাস? গা জ্বলে যায়, ভাল লাগে না।"

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না; বেগে বাহির হইয়া গেল।"

একটু পরেই ডাক আসিল—"খেতে এসো।"

রেবতীমোহন খাইতে বসিয়া সহস্র-কণ্ঠে রান্নার প্রশংসা করিয়া রাঁধুনীকে খুসী করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সুনয়নার দিক্ হইতে খুসীর কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

সুনয়নার আহারে আর প্রবৃত্তি হইল না; খাবার ঢাকিয়া রাখিল। নিজের মনাগুণে নিজেই পুড়িয়া মরিতে লাগিল। সারা রাত্রি চোখের জল ফেলিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল।

দুই

রেবতীমোহন দরিদ্র পিতৃর সন্তান। ছেলেবেলা হইতেই সে পড়াশোনায় খুব ভাল এবং সাহিত্যানুরাগী ছিল। সেকেণ্ড ক্লাস হইতেই সে মাসিকে মাঝে মাঝে পদ্য লিখিয়া পাঠাইত। সেই

রোগটা তাহার ঘাড়ে এমনই চাপিয়া বসিয়াছিল যে, আজ পর্য্যন্ত তাহা ত্যাগ করিতে পারে নাই। হাত খুব মিষ্টি; সকলেই তাহার লেখা পছন্দ করে এবং সাহিত্যের আসরে তাহার বেশ একটু সুনামও হইয়াছে।

ম্যাট্রিক পাশের পরই রেবতীমোহনের পিতা সুনয়নার সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। তিনি মেয়ের রূপ অপেক্ষা মেয়ের বাপের রূপাকেই অধিক পছন্দ করিয়াছিলেন। কাজেই রেবতীমোহনের ভাগ্যে রূপসী স্ত্রী ঘটে নাই।

মনোমতো পত্নী না পাওয়ায় প্রথম প্রথম রেবতীমোহন খুবই মনোকষ্টে ছিল; কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু সুনয়না নিজের গুণে স্বামীকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেলে; ফলে সুনয়না স্বামী-সোহাগিনী হইয়া তাহার হৃদয় রাজ্য জয় করিয়া বসিল।

রেবতীমোহনের শ্বশুর ছিলেন খুব ধনী। তাঁহার তিন পুত্র এবং একমাত্র কন্যা এই সুনয়না। তাহার বিবাহে তিনি খরচের কোন প্রকার কার্পণ্যই করেন নাই। প্রচুর যৌতুক তো দিয়া ছিলেনই, এমন কি যতদিন জীবিত ছিলেন,— —কন্যার হাতখরচের সঙ্গে জামাতাকেও কিছু কিছু করিয়া দিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সুনয়নাকে মাসিক একশত করিয়া টাকা দিতে পুত্রদিগকে অনুরোধ করিয়া যাইতেও ভুলেন নাই।

যতদিন সুনয়নার মা জীবিত ছিলেন, ততদিন কোন গোল হয় নাই; কিন্তু তাঁহার লোকান্তরের পর হইতে টাকা দিবার সময় ভায়েদের মুখ ভার হয় এবং বৌদিদিরাও কুট্-কুট্ করিয়া কামড়াইতে কসুর করে না। ওই টাকা কয়টা লইতে যেন লজ্জায় সুনয়নার মাথা কাটা যায়; অথচ ওই ছাই না লইলেও চলে না। সে একেবারে মরমে মরিয়া যায়!…

রেবতীমোহন বি-এ ক্লাস অবধি পড়িয়াছিল। যেবার সে ফাইনাল দিবে, সেবারই তাহার পিতার মৃত্যু হয়; কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

বাবা তো এক পয়সাও রাখিয়া যান নাই, বরং কিছু দেনাই রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং রেবতীমোহনকে চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে হইল। কলেজ লাইফে সে মনে মনে অনেক আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করিয়াছিল; কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া বুঝিল,—সব ফাঁকা; বি-এ অবধি পড়িয়াছে বলিয়া তাহার গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই।

অনেক হাঁটাহাঁটির পর এক বিলাতী বণিকের ঘরে সে একটী কাজের জোগাড় করিল। বেতন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। কপাল ঠুকিয়া সে তাহাতেই লাগিয়া গেল।

তাহার অদৃষ্টে কিন্তু বেশীদিন চাকুরী করা ঘটিল না।

তখন বর্ষাকাল। বাহিরে ঝম্‌ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নামিয়াছে। একদৃষ্টে তাহা দেখিতে দেখিতে রেবতীমোহনের কবি-চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে স্থান-কাল ভুলিয়া গেল। খেয়ালের বশে লেজার বুকের পৃষ্ঠায় লিখিয়া ফেলিল—

এ মধু-বরষা আজি হরষ আনে—
পুলকিত তনু-মন কাজরী-গানে!
আজ নব বরষায়,
হিয়া কার ভরসায়
নূতন নবীন-আশা জাগাল প্রাণে!
এ মধু বরষা আজি হরষ আনে!

সহসা তাহার লেখনী বন্ধ হইয়া গেল—বড় সাহেবের কঠিন স্পর্শে। সাহেব বলিলেন— "তোমায় আর কাজ করতে হবে না। আমি একখানা খাতা দিচ্ছি, বাড়ীতে গিয়ে বসে' বসে' কবিতা লেখো গিয়ে।"

সেই যে চাকুরী গেল, আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও একটি পাইল না।

সময় পাইয়া সে প্রাণের আবেগে খাতার পর খাতা কবিতায় ভরাইয়া তুলিতে লাগিল।

তিন

সুনয়নার মেজদা'র ছেলের অন্নপ্রাশন। নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল—তাহাকে যাইতে হইবে।

সুনয়না মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। কোন পথই খুঁজিয়া পাইল না। একবার মনে করিল, সে যাইবে না। কিন্তু তাহা কি ভাল দেখায়? মাসের মাঝামাঝি তাহার হাত একেবারে খালি। সে খোকনকে কি দিবে? পিসিমা হইয়া কিছু না দিলেও ভাল হয় না। এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া স্বামীকে লজ্জিত করিতেও তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তাঁহার হাত যে খালি তাহাতো সে ভাল করিয়াই জানে। অগত্যা নিজের চুড়ি ভাঙ্গিয়া সে খোকনের জন্য এক ছড়া চেনহার তৈয়ারী করাইল। তাঁহার মনের আশঙ্কা কিন্তু ঘুচিল না। সে জানে সামান্য একছড়া হার বৌদিদিদের মনঃপূত হইবে না।

রেবতীমোহনের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সেও স্ত্রীর সঙ্গে যায়; কিন্তু সুনয়নার ভাব-গতিক দেখিয়া সে ইচ্ছা তাহাকে মনে-মনেই পোষণ করিতে হইল।

একদল আত্মীয় কুটুমের মধ্যে স্বামীকে হেয় অবহেলিত করিতে সত্যই সুনয়নার ইচ্ছা ছিল না। সে ভাল করিয়াই জানে,—তাহার দাদারা তাঁহাকে কত অবজ্ঞার চোখে দেখে; এবং জানে বলিয়াই স্বামীর যাইবার কথায় মুখ ভার করিয়া সে তাঁহার যাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিল।

রেবতীমোহন কিন্তু ঘটনাটা এমন করিয়া ভাবিয়া লইতে পারিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

* * *

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও নিমন্ত্রিতে বাড়ী সরগরম। প্রথমটায় সুনয়নার মনে হইল যে, সে এক অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি নূতন মুখ স-প্রশ্নদৃষ্টিতে তাহার দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিল।

সুনয়না বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সহসা তাহার বড়দা'র মেয়ে উমা সেখানে আসিয়া তাহাকে বাঁচাইল। সে তাড়াতাড়ি তাহার পায়ের উপর ঢিপ্ করিয়া একটা নমস্কার করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—"মা, শীগ্‌গির এসো, পিসিমা এসেছে।"

অনেকেই তখন তাহার সহিত গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসিল। সুনয়নাও হাসিয়া সকলের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

একে একে বৌদিদিরা সকলেই সুনয়নার সঙ্গে মিষ্টিমুখে আলাপ করিয়া গেল; তাহার ছেলেমেয়েগুলিকেও আদর করিল; কিন্তু কেহই তো তাহার স্বামীর কথা ভুলিয়াও একবার জিজ্ঞাসা করিল না। ব্যাপারটা খচ্ করিয়া কাঁটারই মতো গিয়া তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইল। আজ তাহার কত কথাই মনে পড়িল; যদি মা বাঁচিয়া থাকিতেন! সে আর ভাবিতে পারিল না; অন্তর ছাপিয়া তাহার কান্না আসিল!

উমা আসিয়া সুনয়নার চিন্তা-স্রোতে বাধা দিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—"পিসিমা, ওপরে চলো, ছোটকাকী তোমায় ডাকছে।"

চল্ যাই" বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

বৌদিদের মধ্যে ছোট সুধীরাই সুনয়নাকে একটু ভালবাসে। সে প্রায় তাহারি সমবয়সী। এক সময়ে দু'টিতে প্রাণের অনেক গোপন কথাই কহিয়াছে। সুধীরা যখন নব-বধূর বেশে প্রথম এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, তখন বড় এবং মেজো বউ সারাদিন তাহার খুঁত ধরিয়া ফিরিত, আর শাশুড়ীর কাছে সত্য-মিথ্যায় লাগাইত। সেই সময়ে সুনয়না সর্ব্বদা তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে; অনেক সময়ে সে তাহার দোষ নিজের ঘাড়ে লইয়া তাহাকে তিরস্কারের হাত হইতে

রক্ষা করিয়াছে। সুধীরা সে সব কথা ভুলিয়া যায় নাই; তবে অনেকদিনের ছাড়াছাড়ি এবং বড় ও মেজোর দেখাদেখি মধ্যে মধ্যে দুই-একটা কথা বলিয়া ফেলে বটে।

সুধীরা সুনয়নার ছেলেমেয়েদের হাতে কয়েকটা মিষ্টি দিয়া একখানি ডিসে করিয়া সাজাইয়া সুনয়নার সম্মুখে ধরিয়া বলিল -"নে ভাই ঠাকুরঝি, আগে একটু জল খেয়ে নে। তোর মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

সুনয়না অনেক আপত্তি করিল, অনেক ওজর দেখাইল, কিন্তু সুধীরা শুনিল না। তাহাকে মাথার দিব্য দিয়া, জোর করিয়া খাওয়াইয়া ছাড়িল। স্নেহের কাছে কোন যুক্তিই চলে না; পরাজয় অবসম্ভাবী!

সুনয়না যে ঘরে ছিল, তাহার পাশ দিয়া দুপ্-দাপ্ করিয়া পা ফেলিয়া যাইতে যাইতে কে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া হন্-হন্ করিয়া তেতলায় উঠিয়া গেল।

সুনয়না স-প্রশ্নদৃষ্টিতে সুধীরার মুখের দিকে তাকাইল।

সুধীরা অধর কোণে হাসির রেখা টানিয়া বলিল—"চিন্‌লে না? মেজদি'র বোন্। উঃ, কী অহঙ্কারী! না হয় বড়লোকের মেয়েই আছিস্; অত দেমাক্ কিসের লা! কাল এসেছে। ঘরে এনে একটু আলাপ কর্‌তে গেলুম—কি সব চালের কথা ভাই! গা জ্বলে যায়!"

সুনয়না আলোচনাটা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা অন্য প্রশ্ন করিয়া বসিল।

* * *

মুখে ভাতের সময় সকলেই একে একে আসিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে লাগিল। খোকার মামারা বড়লোক; সকলেই খুব দামী দামী জিনিষ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সুনয়না একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। সকলের আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সসঙ্কোচে হারছড়াটি খোকার গলায় পরাইয়া দিয়া আবার এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

মেজ-বউর বোন্ প্রীতি ওধার হইতে বলিয়া উঠিল—'সর সর দেখি—পিসি কি দিলে?" কাছে আসিয়া হারছড়া দেখিয়া নাকসিঁটকাইয়া বলিল—"ওমা, এই! কেমন পিসি গো!"

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিতে লাগিল।

সুনয়না লজ্জায় এতটুকু হইয়া মরমে মরিয়া গেল।

আহারাদির পর বিকালে মেয়েদের মজলিস্ বসিয়াছে। সকলেই উপস্থিত। সংসারের সুখ-দুঃখের আলোচনা হইতেছিল।

মেজ-বউর মা সুনয়নাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'তুমি ওধারে চুপ করে বসে কেন মা? এদিকে এসো, দুটো আলাপ করি।"

সুনয়না দ্বিধাজড়িত পদে ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া বসিল।

তিনি প্রশ্ন করিলেন -"ক'টি ছেলে-মেয়ে; সংসারে আর কে আছে?"

সুনয়না ধীরে ধীরে তাহার জবাব দিল।

"জামাইটি কি করে?" বলিয়া তিনি সুনয়নার মুখের দিকে চাহিলেন।

তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে কোন উত্তর দিল না।

উত্তর দিল মেজো-বউ। বলিল—"কর্‌বে আর কি, ছাই! বসে' বসে' না কি ছড়া বানায়; যেমন কপাল! মাস মাস একশ' ক'রে টাকা হাত খরচ পায়, তাই খাচ্ছে।"

তাহার মা অবাক্-বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আর সুনয়না—তাহার মুখে কে যেন এক পোঁচ কালী মাখাইয়া দিয়াছে।

* * *

পরদিন সুনয়না তাহার বড়দা'র কাছে গিয়া যাইবার কথা জানাইল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"দু'দিন থেকে গেলেই পারতিস্ ”

সুনয়না বাড়ীর অসুবিধার কথা জানাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বড়দা' বলিল—"তবে ওবেলা যাস এখন। যাবার সময় তোর বড়-বউদি'র কাছ থেকে ওমাসের হাত খরচটা চেয়ে নিস্। পাঠাতে দু'দিন দেরী হ'লেই তো আবার তাগাদা দিবি'খন।"

সুনয়না কোন উত্তর দিল না। নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধীরা সুনয়নাকে তাহার ঘরে লইয়া তাহার হাতে একশ' টাকার পাঁচখানি নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"এ তোমাকে নিতেই হবে ভাই। এ টাকা এখানকার নয়; আমার বাবার দেওয়া।—ঠাকুরজামায়ের নাম করে আলাদা রেখেছি!

সুনয়না কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুধীরা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আমি তোর কোন কথা শুনব না—এ তোকে নিতেই হবে। তুই ঠাকুরজামাইকে দিয়ে বল্‌বি এদিয়ে যেন তাঁর কবিতার বইখানা ছাপিয়ে ফেলে। সত্যি ওঁর লেখা আমার বড় ভাল লাগে।"

সুনয়নার চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

যাইবার সময় বড়-বউ উপদেশ দিলেন—"এবার রেবতীকে যা' হোক্ একটা কিছু কর্‌তে বলিস্। এভাবে আর কত দিন চল্‌বে!'

সুনয়না কোন উত্তর করিল না; ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

চার

অন্তর্যামী বোধ হয় সুনয়নার প্রাণের নীরব নিবেদন শুনিয়াছিলেন।

গাড়ী আসিতেই রেবতী বলিল—"সু, আমার একটা কাজ হয়েছে।"

আনন্দের আতিশয্যে সমস্ত ঘটনাটা বোধ করি সুনয়নার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল না; সে অর্থ-হীন দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। রেবতী বলিতে লাগিল—"তুমি ভাবছ বোধ হয়, কদিনই বা কাজ থাক্‌বে? না সু, কিন্তু আমি এবার মানুষ হয়ে গেছি! এই দেখ, তুমি যাবার পর থেকে একদিনও খাতাগুলোয় আর হাত দিই নি; আজ তোমায় প্রাণ খুলে বল্‌ছি—ওগুলো ফেলে দিতে পার, এর জন্যে এতটুকু অভিমান কর্‌ব না।"

সুনয়নার নয়ন প্রান্তে অশ্রুর ঝারি নামিয়া আসিতেছিল, সে প্রাণপণে তাহা রোধ করিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না!

রেবতীমোহন একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল; স্ত্রীর কান্নার কারণটা ঠিক্ ঠিক্ ধরিয়া উঠিতে পারিল না।

সুনয়না তাহার পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল—"পরের হাত তোলার হাত থেকে আপনাদের বাঁচাতে অনেক দিন অনেক রকমে তোমাকে আমি কষ্ট দিয়েছি, বল আজ তুমি আমায় ক্ষমা করলে!"

'কি পাগল! তোমার ওপর কখনও কি রাগ করেছি!" বলিয়া রেবতী তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বুকের কাছে লইয়া আসিল।

সুনয়না আপন-মনে বলিয়া চলিল—"সামান্য ওই ক'টা টাকার জন্যে দাদারা যেন আমাদের মাথা কিনে নিয়েছেন—একবার তোমার নাম পর্য্যন্ত কর্‌লে না—"

রেবতীমোহন হাসিল; বলিল—"তা'তে কি

হয়েছে সু ; চিঠি লিখে দিও,—এখন থেকে আর টাকা পাঠাতে হবে না।”

সুনয়না বলিল—“কালই লিখে দেব। বাঁচা গেল! শাক ভাত খাই, তাও ভাল—আর যেন ওটাকা নিতে না হয়।”

তারপর ছোট বউদির দেওয়া পাঁচশো টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল—“সে বারবার মাথার দিব্যি দিয়ে নিতে বলেছে ;—এ দিয়ে তোমার বই ছাপিও!”

রেবতীমোহন কিছুক্ষণ কি ভাবিল ; তারপর টাকা কয়টা হাত পাতিয়া লইয়া বলিল—“বেশ, তাই হবে। কিন্তু তুমি আজ আর অত দূরে থাক্‌তে পার্‌বে না! আরো কাছে সরে এসো—আরো কাছে। আরো—!”

“যাও, তুমি ভারি ইয়ে!” বলিয়া সুনয়না তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

রেবতীমোহন তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

এই দুইটী স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ে আজ যত আনন্দ, জগতের আর কোথাও বুঝি তাহার তুলনা নাই।

—ভবিতব্য—

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

এক

প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া সমীরণ বাসায় ফিরিতেই ডাকপিওন আসিয়া তাহার নামীয়া পত্রখানি দিয়া গেল। পত্র খুলিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল সরমার হস্তাক্ষর দেখিয়া। আশ্চর্য্য হইবারই কথা ;—কারণ, সরমা তাহার উপর অভিমান করিয়া আজ এক বৎসর হইল পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিতেছে। সমীরণ পত্র লিখিলে সরমা তাহার উত্তর দেওয়াটাও কর্ত্তব্য বিবেচনা করে নাই। অথচ আজ সেই যাচিয়া পত্র লিখিয়াছে—

শ্রীচরণকমলেষু—

আজ অনেক দিন হইল, তোমার কোন পত্রাদি পাই নাই। আশা করি ভাল আছ। তুমি একবার অতি অবশ্য অবশ্য আসিবে; আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। এখানে আমি আর থাকিতে চাহিনা। আজ আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে ; এতদিনে বুঝিয়াছি—জীবনে একটা বড় ভুল করিয়াছি বলিয়াই তাহার জের টানিয়া চলিতে হইবে, মানুষের ইতিহাসে কোথাও ইহা লিখে না ; বরং নিজের দুর্ব্বলতারই জন্য আজ আমি অনুতপ্ত—আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। নচেৎ আমায় আত্মহত্যা করিয়া আবার এ অপমানের জ্বালা জুড়াইতে হইবে। ইতি, তোমার—"সরমা।"

পত্র পাঠ করিয়া সমীরণ মৃদু হাসিলমাত্র আপনমনেই বলিল—যাক্, মতি ফিরেছে দেখ্‌ছি। এখনও আনা হবে না। আরও কিছুদিন থাক— কিন্তু পরক্ষণেই পত্রের লিখিত আত্মহত্যার কথাটা মনে পড়িতেই তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল তাহাকে বিশ্বাস নাই। শুধু তাহাকে কেন, বেশীর ভাগই মেয়েদের আর কিছু থাক বা নাই থাক্,—অভিমান করিয়া আত্মহত্যা করিবার ক্ষমতাটুকু যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তা' ছাড়া, সরমার আত্মসম্মান ও অভিমানটাই ছিল সব চেয়ে বেশী।

শিহরণ আসিয়া বলিল—দাদা, চা খাবেন না ?

"চল" বলিয়া সমীরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর বলিল—শিহরণ তোর বৌদি আস্‌বে বলে পত্র লিখিচে রে ?

আনন্দিত হইয়া শিহরণ বলিল—কবে আস্‌বেন ?

সমীরণ বলিল—তা' তো কিছু লেখে নি ; তবে আমায় যাবার জন্য লিখেছে। কালই যাবো মনে কর্‌ছি—কিন্তু তার আগে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিতে চাই।

—বেশ তো বলিয়া শিহরণ অগ্রসর হইল।

*　　*　　*

এই শিহরণকে লইয়াই তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

হঠাৎ যখন সাতদিনের নোটিশে সমীরণের চাকরীটি গেল, তখন সে দশদিক্ অন্ধকার দেখিল। এমন কোন সংস্থান নাই, যাহাতে কিছুদিন বসিয়া খাইলে চলে। বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল, সমীরণ প্রত্যেককেই নিজের অবস্থার কথা জানাইয়া পত্র লিখিল ; কিন্তু আজ তাহার এ দুঃসময়ে কেহ সাহায্য করা তো দূরের কথা, সামান্য দুই পয়সার একখানা কার্ড খরচ করিয়া উত্তর দেওয়াটাও উচিত বিবেচনা করিল না। অগত্যা

তখন শিহরণকেই পত্র লিখিল তাহার বাসাতেই যাইবে বলিয়া।

সমীরণ বাড়ী ফিরিতেই শুষ্কমুখে সরমা বলিল—তা' হ'লে কি কর্‌বে ?

সমীরণ বলিল—শিহরণের বাসাতেই যাবো বলে' স্থির করেছি।

সরমা ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া বলিল—তার চেয়ে চল না, দাদার বাসাতেই যাই।

সমীরণ যে এ কথা না ভাবিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু সস্ত্রীক এই দুর্দ্দিনে শ্যালকের গৃহে আশ্রয় লইতে তাহার মনঃপুত হইতেছিল না। তা' ছাড়া, শ্বশুর-গৃহে কে কবে বেশীদিন থাকিতে চায় ? তাই উত্তর দিল - তাও কি হয় ?—তার চেয়ে—

সরমা ছিল চিরদিনের 'রাসভারী' লোক। অভিমানটা তার ছিল যেমন বেজায়,—তেমনি বেশী পরিমাণে ছিল তার অহঙ্কার। তাই সে বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলিল—তা'তে কি তোমার জাত্‌ যাবে না কি ?

হাসিয়া সমীরণ বলিল ;—যদি যায়—

দৃঢ়তার সহিত সরমা বলিল—বেশ, আমার ভায়ের বাসায় যেতে তোমার অপমান বোধ হয় যেও না। কিন্তু আমিও তোমার ভায়ের বাসায় কিছুতেই যাব না। না খেয়ে মরি ; তবুও না।

সরমার এই দৃঢ়তা দেখিয়া সমীরণ আর কিছু বলিল না।

শিহরণের বাসায় সরমার না যাইবার যে কারণটা ছিল, তাহা যে সমীরণ না জানিত তাহা নহে, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল—শিহরণের ওখানে তোমার না যাবার কারণটা কি ?

সরমা সমীরণের কথার জবাব দিল না।

* * * *

কারণটা ছিল এই—

মাতার মৃত্যুর পর সমীরণ দেশের জমীজমা বিক্রয় করিয়া যখন কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিল, তখন হইতেই শিহরণ আসিয়া পড়িল সরমার স্কন্ধে। সরমাও তাহার এই মাতৃহীন দেবরকে মাতার মতই স্নেহে বুকের পাশে টানিয়া লইল।

সমীরণ ও শিহরণ দুই সহোদর। তাহাদের যখন পিতৃবিয়োগ ঘটে, শিহরণ তখন নেহাৎই শিশু। সমীরণ তখন ঝরিয়ার কোন একটা কোলিয়ারীতে চাক্‌রী করিতেছিল। সমীরণ মাতাকে লইয়া কর্ম্মস্থানে আসিতে চাহিলে, তাহাদের মাতা চক্ষুর জল চাপিয়া বলিয়াছিলেন — স্বামীর ভিটায় সন্ধ্যা দীপ-দিবার জন্য তাহাকে এখানে পড়িয়া থাকিতেই হইবে। সমীরণ যেন তাহাকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাইয়া দেয়।

তাহাই হইতেছিল। শিহরণ মাতার নিকটেই মানুষ হইতেছিল। এই ঘটনার অনেক দিন পরে মাতার মৃত্যু হইলে সমীরণ আসিয়া শিহরণকে লইয়া গেল ঝরিয়ায়।

তারপর দিন যায়—

পুত্রহীনা তরুণী সরমার মাতৃত্বের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া শিহরণের দিন কাটে।

সমীরণ মাঝে মাঝে সরমাকে বলে—আদর দিয়ে ছেলেটার মাথাটা দেখ্‌ছি তুমিই খেলে।

হাসিয়া সরমা বলে - ঠিক কথাই তো —

যথাসম্ভব গম্ভীরতা অবলম্বন করিয়া সমীরণ বলে ;—হাসির কথা নয় সরমা, মাঝে মাঝে এক-আধটু শাসন না কর্‌লে শেষে যে 'গোমুখ্যু' হবে।

ফোঁস করিয়া সরমা বলে - বেশ, হয় হবে। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটা মাত্র ছেলে বাড়ীতে—

একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার ব্যথিত বুকখানাকে মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়। সরমা সেটাকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখে। সমীরণ তাহা বোঝে—কিন্তু কিছু বলিতে পারে না। ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ নিষ্পলক

নয়নে সরমা বাহিরের খোলা জানালাটার দিকে চাহিয়া থাকে—অজ্ঞাতে তাহার সেই চাপা দীর্ঘ শ্বাসটা বাহির হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়! দেবর শ্রীমান্ শিহরণ তখন বেশ বিজ্ঞের মত একটা দেশালাইয়ের 'খোলে' খানিকটা ব্যাণ্ডিলের সুতা বাঁধিয়া পাশের বাড়ী পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়া তাহাতে কাণ লাগাইয়া বলিতেছে—

—"হ্যালো"—"হ্যাঁ, এখানে গাড়ী ছেড়ে চলে গেছে"। "ওখানেও ছেড়েছে"? "আচ্ছা"—তারপর খোলটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় রাখিয়া পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে বাঁধা একটা সুতায় টান দিতেই অদূরে বাঁখারীর আগায় বাঁধা টনের পাটার সিগ্‌ন্যালটা পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটী দোদুল্যমান লোহায় টিং টিং করিয়া ঘণ্টা দিয়া বলিল—প্যাসেঞ্জার ছোড়া হ্যায়—টিকিট লেও।

সরমা হাসিয়া বলিল—ওগো টিকিটবাবু, আমাকে একখানা যমপুরীর টিকিট দাও তো—

সরমার কথায় চমক ভাঙিয়া হাসিয়া শিহরণ বলে—যাঃ, সেখানে বুঝি গাড়ী যায়?

হাসিয়া সরমা বলে—যায় না? কেন সব গাড়ীই তো যায়। তোমার গাড়ী তবে ছাই—

অভিমান করিয়া শিহরণ বলে—হ্যাঁ, ছাইই তো—

চোখের কোণে তার জল দেখা যায়। দেবরের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় সরমা বলে—আমিও খেলবো—আমায় খেলায় নেবে ভাই?"

মহা উৎসাহে শিহরণ রাজী হইয়া যায়। এমন সময় পাশের বাড়ীর ম্যাণ্ডা, পি—পি—হিস্—হিস্ শব্দ করিতে করিতে প্যাসেঞ্জাররূপে আসিয়া হাজির হইল।

* * * *

হাসি, আনন্দ, গল্প, ও খেলার মাঝে কখন কোন্ ফাঁকে শিহরণ আসিয়া পড়িল তের' ছাড়াইয়া চৌদ্দয়। এবং বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই খেলার অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার ব্যতীত লেখা-পড়ায় তাহার কোন উৎসাহই দেখা গেল না।

সেদিন সমীরণ শিহরণকে শাসন করিতে গিয়া সরমার নিকট হইতে রীতিমত ধমক খাইয়া বাস্তবিকই হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু 'হাল্' ছাড়িল না, বলিল—তোমার 'আস্কারা' পেয়েই ত দেখছি ওর পরিণামটা ঝর্ঝরে হ'য়ে যাবে।

ঝঙ্কার দিয়া সরমা বলিল—থাক্‌গে বাপু! একটা ভাইই তো—যদি মুর্খ্যই হয়, তা' বলে কি একমুঠো খেতে পাবে না?—আমাদের যদি জোটে, তা' হ'লে ও উপোস যাবে না।

এর বেশী কথা নাই সুতরাং সমীরণের যত 'জারীজুরী' এক মূহূর্ত্তেই কোথায় লীন হইয়া গেল।

বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়ায় মাতার অত্যধিক স্নেহে ও যত্নে শিহরণের শিশুকাল হইতেই একটা 'গোঁ' ছিল। সে 'হাঁ' বলিলে 'না' বলায় কাহার সাধ্য। তেমনিই 'না' বলিলে 'হাঁ' বলানও একটা দুরূহ ব্যাপার। সেই জন্যেই লোকে তাহাকে 'একগুঁয়ে' 'একরোখা' ছেলে ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিত।

ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর কথোপকথনটা সেদিন তাহার প্রাণে একটা আঘাত দিয়াছিল। সমীরণ অফিস গেলে শিহরণ আসিয়া দাঁড়াইল সরমার ঘরে।

সরমা বলিল—কি ঠাকুর পো, হঠাৎ খেলা ছেড়ে?

শিহরণ বলিল—আমি পড়্‌বো!

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সরমা বলিল—সে কি! তা' হ'লে সে নতুন ইঞ্জিনটা তৈরী হবে না?

অধীর ভাবে শিহরণ বলিল—চুলোয় যাক্ ইঞ্জিন! আমি পড়্‌বো—তুমি আমাকে পড়াবে কি না বল?

পড়িবার নেশা তাহাকে তখন ভূতের মতই পাইয়া বসিয়াছিল। সরমা এই দুইটী বৎসরেই শিহরণের স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছিল ; তাই বলিল সে তো ভাল কথা। উনি অফিস থেকে আসুন, তারপর বল্‌বো—কাল থেকেই স্কুলে যাবে।

শিহরণ জেদ্ করিয়া বসিল,—সে স্কুলে যাইবে না, সরমার নিকট লেখাপড়া শিখিবে।

অগত্যা সেইদিন হইতেই সরমা তাহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গেল।

শিহরণ সেইবার ম্যাট্রিক দিবে। এমন সময় সরমার জ্বর হইল। প্রথমতঃ অল্প অল্প, তারপর ক্রমশঃ দিনের পর দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—টাইফয়েড। শিহরণ প্রাণপণ যত্নে বৌদিদির সেবা করিয়াও একজামিনের পড়া করিতেছিল ; অথচ, দাদার অফিসের ভাত রান্না আছে। সকল দিক ভাবিয়া সমীরণ শ্যালককে পত্র লিখিল।

সংবাদ পাইয়া সরমার দাদা তাহাদের দূর সম্পর্কীয়া এক মাসীমাতাকে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, মাসীমাতা ঠাকুরাণী সরমার দাদার গলগ্রহ স্বরূপ ছিলেন।

মাসীমাতা আসিয়া রোগিনীর সেবা এবং সংসার তো নয় যেন ভূতের বোঝাটাকে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া ধরিলেন।

আট-চল্লিশ দিনের দিন সরমা পথ্য গ্রহণ করিল এবং যদিও ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল কিন্তু মাসীমাতার আর ফেরা হইল না।

নাতি মুখ দর্শনের আশায় মাসীমাতা চাঁদ রায়, কেদার রায়, পাঁচু ঠাকুর প্রভৃতি নানা জানা-অজানা দেবতার দ্বারে মাথা কুটিয়া ষোলআনা মানসিক করিয়া তাঁহাদের আস্তানায় পর্য্যন্ত গিয়া নানা রং বেরংয়ের মাদুলী আনিয়া সরমার কণ্ঠদেশ ভর্ত্তি করিয়া তুলিল।

সরমা বলিত—ও কি হবে মাসীমা ; হবার হ'লে এতদিন হ'ত। মিথ্যে তুমি ঠাকুর-স্থানে গিয়ে মর।

মাসীমাতা বলিতেন—ছিঃ মা, ও কথা বল্‌তে নেই। দেবতার দয়া হ'লে কি না হয়!

সরমারও বুবুক্ষু মাতৃত্বটাও যে প্রাণে একটা আলোড়ন না তুলিত, তাহা নহে। কিন্তু এই বিশটা বৎসরেও যখন তাহার এতটুকু আশাও পূর্ণ হইল না, তখন সে হতাশ হইয়া পড়িল। তাই সে তাহার দেবরকে লইয়া পড়িয়াছিল—তাহাকে দিয়াই তাহার মাতৃত্বের অভাব পূর্ণ করিতে।

* * *

মাসীমাতার সহিত কিন্তু শিহরণের মোটেই 'বনিবনাও' হইত না। সকল সময় সে তাহার বৌদি'র কাছে কাছে থাকিত বলিয়া মাসীমাতা বিরক্ত হইয়া বলিতেন—অত বড় ধিঙি ছেলে, দিনরাত বাড়ীর ভেতর মরিস কেন?—যা' না, বাইরে।

মুখ খিঁচাইয়া শিহরণও জবাব দিত—আমাদের বাড়ীতে আমি থাক্‌ব তা' তোর কি? যা' না তুই ওই ভাগাড়ে গিয়ে মর।' টেনে নিয়ে যেতে হবে না। বুড়ো মাগী উড়ে এসে জুড়ে বসে' জোর দেখ।

বচসা জোর বাধিলেও মাসীমাতার হইত পরাজয়। তখন তিনি কাঁদিয়া-কাটিয়া ভাসাইয়া দিতেন। শেষে সরমা আসিয়া থামাইয়া দিত এবং মাসীমাতাকে বলিত—তুমি ওর সঙ্গে লাগো কেন মাসীমা।

মাসীমার রাগ হইত। তখন আবার সরমা তুষ্টবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া দেবরকে লইয়া পড়িত ;—বলিত হতভাগা ছেলে যদি দু'দণ্ড চুপ করে থাকে—আসুক আজ সে বাড়ী, তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় ক'রে তবে ছাড়বো।

শিহরণও হটিবার পাত্র নয়। বলিত ;—বুড়ী আমাকে মর বল্‌লে কেন?

ঝঙ্কার দিয়া সরমা বলিত—বেশ করেছে বলেছে! স্কুল থেকে এসে কি আর বাইরে যেতে নেই? পায়ে কি হয়েছে? রাগে গরগর করিতে করিতে সরমা আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিত, মাসীমাতাও নিজের ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেন।

সরমা যদিও রাগ করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিত, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না। পুনরায় বাহিরে আসিয়া দেখিত যে, দরজার পার্শ্বে মুখ নামাইয়া শিহরণ দাঁড়াইয়া আছে। সরমা তাহাকে নিজের ঘরে টানিয়া আনিত।—অভিমানে শিহরণ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত।

* * *

মাদুলী ধারণের ফলেই হৌক, অথবা মানসিক লোভী দেবতাদের ইচ্ছাতেই হৌক্ কিম্বা প্রকৃতির প্রেরণাতেই হৌক্ মাসীমাতার আশা পূর্ণ হইয়াছে। ফলে তখন কোন্ এক অজানা সময়ে সরমার সবটুকু স্নেহ আসিয়া পড়িয়াছে এই ফুটফুটে শিশুটীর উপর। এখন আর তাহার শিহরণের দিকে তাকাইবার অবসর নাই। ইহাতে সময় সময় শিহরণের মনে ক্ষোভ যে জন্মিত না তাহা নহে; কিন্তু সে সাময়িক।

সেদিন সরমা তাহার তিনমাসের শিশুপুত্রকে লইয়া উঠানের মাঝখানে বসিয়া তেল-হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় 'হন্তদন্ত' হইয়া শিহরণ আসিয়া 'থপ্' করিয়া তাহার বৌদিদির পাশে বসিয়া পড়িল।

সরমা বলিল—কি ঠাকুরপো?

শিহরণ বলিল—দাও না বৌদি', খোকাকে একবার কোলে নিই।

হাসিয়া সরমা বলিল—কেমন ক'রে নেবে ভাই, এখনও যে ঘাড় সোজা হয় নি।

শিহরণ কিন্তু ছাড়িবে না। অগত্যা সরমা খোকাকে শিহরণের কোলে দিল।

নিমেষের মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাসীমাতা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া একপ্রকার ছোঁ মারিয়াই শিহরণের কোল হইতে খোকাকে উঠাইয়া লইতেই খোকা কাঁদিয়া উঠিল। আর ক্রোধে ক্ষোভে শিহরণ কাঠের পুতুলের মত মাসীমাতার এই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

ঝঙ্কার দিয়া সরমা বলিল—এ কী হ'ল মাসীমা?

মাসীমাতাও স্বরে স্বর মিশাইয়া বলিলেন——নেকি কোথাকার! সব জানো, এটুকু জানো না? ছেলেটাকে খাবার জন্যে ছোঁড়ার যে মতলব রয়েছে, তাও কি তোকে শিখিয়ে দিতে হবে?

সরমা বিরক্ত-কণ্ঠে বলিল—ছিঃ মাসীমা! তোমার অন্তঃকরণ বড় নীচ।

অসহিষ্ণু-কণ্ঠে মাসীমাতা বলিলেন—তা' বলবিই তো লো! ওই যে কথায় বলে—'যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর।' কত ক'রে কত ঠাকুর-দেবতার দোর ধরে' ওই শিবরাত্রির সলতেটুকু তোর কোলে এনে দিলুম, আর আজ তুই কি না আমাকে চোখ রাঙাস্। কলির ধর্ম্ম কি না! কিন্তু তুই জানিস্ সরি, ওই ড্যাকরা ছোঁড়া তোর ছেলেকে খাবে, খাবে, খাবে!

সরমার এসব কথা ভাল লাগিতেছিল না; সস্নেহ-কণ্ঠে সে শিহরণকে বলিল—তুমি খেলা কর গে ভাই।

চোখের জল চাপিয়া শিহরণ বাহির হইয়া গেল। আজ মাসীমাতার ব্যবহারে তাহার প্রতিকার করিবার প্রবৃত্তিটা যেন লোপ পাইয়াছিল। শিহরণ চলিয়া গেলে পর মাসীমাতাও সরমার কোলে ছেলে দিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু সেই দিন হইতেই শিশুর ক্রন্দন আরম্ভ হইল। ক্রমাগত চীৎকারে শিশু নীলবর্ণ হইতে লাগিল; চক্ষু কপালে উঠিল।

সমীরণ ডাক্তার ডাকিতে চাহিলে পর মাসীমাতা বলিলেন—ডাক্তার-বদ্যি নয় বাবা, ওঝা ডাকো।

এই আকস্মিক বিপদে পড়িয়া সরমা যেন কী এক প্রকার হইয়া গেল; বলিল—তাই ডাকো।

ওঝা আসিল। শিশুকে দেখিয়াই সে বলিল—এ যে দেখ্‌ছি নজর-দোষ; ছেলেকে ডাইনে খেয়েছে।

মাসীমাতা মাথা নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ বাবা।

ওঝা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—বড় অসময়ে ডেকেছ বাপু! দেখি, কতদূর কি হয়?

তারপর মন্তর-তন্তর, ঝাড়-ফুঁক যথেষ্টই হইল। জলপড়া খাওয়ানো, মন্তর পড়া জলে শিশুকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় স্নান করানো হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিন দিনের দিন শিশুর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া গেল।

সরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—খোকা বাপ আমার!...

মাসীমাতা সান্ত্বনা দিতে গিয়া বলিলেন—এমনটি যে হবে, সে তো আমি আগেই বলে ছিলুম।

এই ব্যাপারে শিহরণ ভাবিল, কেন সে খোকাকে লইতে গেল, সে যদি না লইত তাহা হইলে খোকা হয় তো বাঁচিত।

* * *

ফলে এই হইল যে, মাসীমাতার কুচক্রে পড়িয়া শিহরণ সরমার বিষ-নয়নে পড়িল। কারণে-অকারণে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শিহরণের নিত্য-প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইল। সে সমস্ত অত্যাচার নীরবে মাথা পাতিয়া লইল; কারণ, তাহারও ধারণা ছিল যে,হয় তো বা সেই-ই খোকার মৃত্যুর কারণ।

একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পর পর দুই বৎসর শিহরণ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারে নাই; কারণ, প্রথম বৎসরে সরমার অসুখ এবং পর বৎসরও পরীক্ষার সময়েই খোকার মৃত্যু হয়। এবার সে পরীক্ষা দিবেই।

পরীক্ষার দিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বেলা নয়টার সময় শিহরণ স্নান করিয়া খাইতে আসিয়া শুনিল, ভাত তখনও হয় নাই। উপরন্তু, মাসীমাতার নিকট হইতে কতকগুলি অপ্রিয় কথা শুনিতে হইল।

সে অনেক সহ্য করিয়াছিল, আর পারিল না; ক্রোধে ক্ষোভে মাসীমাতাকে বেশ দু'চার কথা শুনাইয়া দিল। ফলে কুরুক্ষেত্র বাধিবার উপক্রম দেখিয়া সরমা বাহিরে আসিয়া বলিল—তোমাদের হচ্ছে কি? বাড়ীতে কি একটা লোককেও টিক্‌তে দেবে না?

শিহরণ কথা বলিবার পূর্ব্বেই মাসীমাতা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই রূপ—শিহরণ আসিয়া তাহার নিকট ভাত চাহিলে তিনি বলেন যে, দু' দশ মিনিট দেরী কর বাপু—ভাজটা নামিয়ে দিচ্ছি—ইহাতে শিহরণ তাঁহাকে অপমানসূচক কথা বলিয়াছে।

সরমা শিহরণের দিকে ফিরিয়া বলিল—বলি ঠাকুরপো, তুমি কি ভেবেছ;—ক'টা রাধুনি রেখেছ যে মাসীমাকে চোখ রাঙাও—ও কি আমার পুরুষ রে!—যার রোজগার কর্‌বার ক্ষমতা নেই, তার সাত সকালে খাবার সখ কিসের?

মর্ম্মাহত শিহরণের বাক্য স্ফুরণ হইল না, চোখের জল চাপিয়া পড়িবার ঘর হইতে দুইখানি বই ও কলমটী লইয়া বাহির হইতেই সরমা বলিল—না খেয়েই যাচ্ছ যে?

—সময় নেই। বলিয়া শিহরণ বাহির হইয়া গেল। মাসীমাতা বলিলেন—ও মা গো, বিষ নেই, কুলপানা চক্কর আছে! রাগ ক'রে চলে' যাওয়া হ'ল। ওই যাওয়াই যেন শেষ যাওয়া হয়।

শেষের কথা কয়টা শিহরণের কাণে আসিয়া তীরের মতই বিঁধিল। তাড়াতাড়ি সে স্কুলের পথে চলিয়া গেল।

কিন্তু আর সে ফিরিল না—সমীরণ সকল শুনিয়া অনেক খোঁজ-খবর করিল বটে, কিন্তু শিহরণকে পাওয়া গেল না। অগত্যা সমীরণ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিল—

* * *

প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শিহরণের পত্র আসিল, সে গৌরাঙ্গডি কোলিয়ারীতে চাকুরী করিতেছে। সে পত্রের জবাব গেল না। আরও পাঁচ বৎসর পরে খবর আসিল, শিহরণ একটা কয়লার খনি কিনিয়া ফেলিয়াছে, দাদাকে ম্যানেজার করিতে চায়; বৌদিদিকে তাহার সংসার দেখিতে হইবে। সরমা জবাব দিতে দেয় নাই। কিন্তু কে জানিত বৎসর ঘুরিবার আগে গৌরাঙ্গডিতেই তাহাদের বিধাতাপুরুষ অন্ন নিজে মাপিয়াছেন!

—রাত্রি-শেষে—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল

হাওড়ার ষ্টেশন। অসংখ্য লোকজন কোলাহলের মধ্যে আসিয়া নীরেন, সরযূর যেন চমক ভাঙ্গিল।

সরযূর ঠোঁটের উপর নীরেনের তপ্ত চুম্বনের দাগ তখনও রহিয়াছে। নীরেনের বক্ষের স্পন্দন এখনও যেন তার বুকের মাঝে সাড়া দিয়া উঠিতেছে। তাহার জীবন-দেবতা আজ তাহার কাছে একান্তভাবে ধরা দিতে আসিয়াছে, সে কি তাহাকে আদর করিয়া ঘরে তুলিবে, না বুকের উপর হইতে ছিনাইয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে—কি করিবে সে—তাহার মাথার মধ্যে ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল—সে চোখ বন্ধ করিয়া গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া দিল।

ট্রেণ অনেকক্ষণ আসিয়া পৌঁছিয়াছে—যাত্রীর দল একে একে প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে; ষ্টেশনে ক্বচিৎ দু'-একটা লোক চলাচল করিতেছে- শুধু নীরেন ও সরযূ তাহাদের কামরায় তখনও বসিয়া ছিল। গাড়ীটাকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য একটা ইঞ্জিন আসিয়া উপস্থিত-সে ধাক্কায় গাড়ীটা একটু কাঁপিয়া উঠিল—নীরেন ডাকিল, "সরযূ, এখন নামতে পারবে?"

সরযূ তাহার ভাসা ভাসা চোখ দু'টী নীরেনের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "ওঃ, নামতে হবে, না?"—তখনও যেন সে প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই।

নীরেন তাহার এই দেরীতে একটু যেন বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু আরও বিরক্ত হইল সরযূ নিজের উপর নিজে। কতদিন কত কামোন্মত্ত পুরুষের আলিঙ্গন যে অবাধে সহ্য করিয়াছে—সেই সে; আজ নীরেনের স্পর্শ তাহাকে এত বিচলিত করিল কেন?

সরযূর এমন দিন ত এর আগে কখনও আসে নাই—সে যে কিছু বুঝিতে পারিতেছে না—তাহার অন্তরের মধ্যে যে একটা কাঁপুনি ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া তাহাকে দোলাইয়া দিতেছে—সেটা হর্ষ, না আতঙ্ক!

সরযূ ধীরে ধীরে কম্পার্টমেণ্ট হইতে নামিয়া আসিল। প্লাটফর্ম্মের পাশেই ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে; নীরেন গিয়া তাহাকে একটা খালি ট্যাক্সিতে তুলিয়া নিজেও উঠিতে গেল। সরযূ হাতজোড় করিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল, "মাফ করবেন নীরেনবাবু, আমার শরীর অসুস্থ, আমি আজ একলা থাকতে চাই।"

নীরেন বাধা পাইয়া অন্তরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেও মুখে কিছু বলিতে পারিল না; শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "আজ বিকালে যেতে পারি কি?"

সরযূ বাধা দিয়া বলিল, "না, না, আজ আর যাবেন না; কাল সমস্ত রাত্রিটা ট্রেণে জেগে কেটেছে; তার চেয়ে বরং বেশ করে ঘুমুন গে যান।"

আসল কথা সরযূর তখন আর নীরেনের খুব কাছে থাকিবার সাহস হইতেছিল না। তাহার বুকের মধ্যে আশা-নিরাশা, ভয়, আনন্দের যে তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল, ইহার মধ্যে নীরেনকে টানিয়া আনিয়া নিজেকে আরও দুর্ব্বল করিতে সে রাজী নয়—সে যেন ক্রমশঃই নিজের উপর নির্ভরতা হারাইয়া ফেলিতেছিল। নীরেনকে দূরে

সরাইয়া রাখিয়া মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে দেখিতে চায় ইহার শেষ কোথায় ?

মনে পড়িল, কাশীতে কালীতারা দিদির আশীর্ব্বাদ—"তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হোক।" কিন্তু হা ভগবান, আজ যে সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না তার কামনা কি, কোনটী তার পথ !

নীরেন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল,"আমার যাওয়ায় কেন তুমি এত আপত্তি তুলছ ? না, সরযূ, কত দিনের পর যদি আজ তোমার দেখা পেলুম, তুমি কি আমায় এমনি করে দূরে ঠেলে দেবে ?"

সরযূর বুক ঠেলিয়া একটা কান্না যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিল, সে সেটা প্রাণপণে চাপিয়া রহিল—সে কি দূরে ঠেলিয়া দিতেছে ? তার চির-বাঞ্ছিত দয়িত আজ তাহার দুয়ারে অতিথি, অথচ—অথচ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইতেছে—এ যে কি দুঃখ, এর যে কি জ্বালা, তা' যদি অপরে বুঝিত ?

নীরেন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি চুপ্ করে রইলে যে, সত্যিই কি তুমি আমার যাওয়াটা পছন্দ কর না ?—বল, আমায় আর দোটানার মধ্যে রেখ না, সরযূ।"

সরযূ তার উদ্গত অশ্রু প্রাণপণে গোপন করিয়া বলিল, "না, না, নিশ্চয়ই যাবেন। তবে কি না আজ আমার শরীরটা মোটেই ভাল লাগছে না, তাই বলছিলুম—বেশ ত, আজই যাবেন।"

নীরেন উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"যাব ত—যেতে তোমার আর কোনও আপত্তি নেই ? ঠিকানা তোমার ঠিকানাটা দাও।"

হাসিয়া সরযূ বলিল—"তিনের সাতের এক রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট।"

নীরেনের এতখানি আশা যেন একেবারেই ভূমিসাৎ হইয়া গেল ; তাহার মুখখানা কালো হইয়া উঠিল, ম্লানমুখে সে বলিল, "আবার সেই ! —তা' হ'লে সত্যিই তুমি আমার যাওয়াটা পছন্দ কর না—বেশ।"

নীরেন ফিরিবার জন্য ট্যাক্সির ধার হইতে সরিয়া আসিতেছিল। তাহার হাত ধরিয়া ফিরাইয়া সরযূ তার স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া বলিল, "ঠাট্টাও বোঝেন না, আপনি কি রকম বলুন ত ?—বাব্বাঃ, কি রকম রাগী লোক আপনি ; একটুতেই চটে ওঠেন—যাক গে—আপনি আজই আসবেন—উনত্রিশ নম্বর বিডন রোতে থাকি আমি—আসবেন।"

নীরেন আবার ফিরিয়া ট্যাক্সির ধারে দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এবার আগেকার মত ঘোরাবে না ত ?"

সরযূ নিজের কপালে হাত দিয়া বলিল, "আপনাকে ঘোরাতে বাধ্য করেছিল আমার অদৃষ্ট—আজও যদি তার প্রয়োজনে আমায় বাধ্য করে—কি করব বলুন ?"

নীরেন হাসিয়া বলিল, "ঘুরিয়ে বল্‌তে বেশ শিখেছ দেখছি। বেশ, বাড়ী গিয়ে জিরোও গে—আমি ঠিক যাব 'খন।"

সরযূর ট্যাক্সি হাবড়ার পুল পার হইয়া ধীরে ধীরে হ্যারিসন রোড ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে আজ যুগপৎ অনেক-গুলা ঘটনা একত্র আসিয়া যেন সব ওলট-পালট করিয়া দিল। তাহার নিজের পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি, কাশীর সন্ন্যাসিনীদের কথা, তার ছোট বোন যমুনা, তার মাসী, তারপর নীরেন সবাই যেন বায়স্কোপের ছবির মত একে একে তাহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। সে কি করিবে—যমুনার কাছে ফিরিয়া যাইবে ?—কিন্তু তাহার সে মুখ কোথায় ? স্নেহময়ী মাসীমা—মাতৃহীন শিশু যাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল—সেই মাতৃসমা মাসীমার কাছে ফিরিয়া যাওয়া সেও প্রায় অসম্ভব—মাসীমার দিক হইতে না হইলেও, তাহার দিক হইতে একেবারেই অসম্ভব—তার

কলঙ্কিত জীবনের স্মৃতি—সে কি সেটা ভুলিতে পারে? ভুলিবার সে যাদুমন্ত্র কই? কই সে দেবতা—কই তাঁহার সেই ভৈরব-মন্ত্র!

নীরেন—নীরেন—নীরেন কি সেই মহামন্ত্রের অধিকারী! সরযূ ভাবিতেছিল, সে কি সত্যই সে প্রেমের অধিকারী হইতে পারিয়াছে—যে মহা-প্রেমের স্বাদ পাইলে মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিতে একটুও ইতস্ততঃ করে না, সত্যই কি সে, সে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে। নিজের কথা ত সে নিজেই ঠিক জানে না—কিন্তু নীরেনের কথা। তাহার জীবনে তাহাকে অনেক পুরুষের সম্পর্কে আসিতে হইয়াছে; নীরেনকে তাহাদের হইতে আলাদা বলিয়াই ত বরাবর সে মনে করিয়া আসিয়াছে। তাই ত নীরেনের স্মৃতি তাহার নিকট এত মধুর—তবে কেন আজ এ সন্দেহ? তার নিজের উপর নিজেরই রাগ হইতেছে--এই ঘৃণিত সন্দেহের জন্য।—কিন্তু, তবুও—।

ট্যাক্সি অনেকক্ষণ রাস্তার একপাশে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু সরযূ নিজের চিন্তায় এত বিভোর ছিল যে, মোটেই তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল একটা 'বন্দেমাতরম্' চীৎকারে। সে চোখ চাহিয়া দেখিল রাস্তায় এত ভিড় যে, গাড়ী চলা অসম্ভব—সেই ভিড়ের মধ্যে শতাধিক পুলিশ—তাহারা মধ্যে মধ্যে সেই বিপুল জনতার উপর লাঠি চালাইতেছে—আর জনতা মধ্য হইতে হাজার হাজার লোক সেই প্রহারে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, "মহাত্মাজীকী জয়।"

সরযূ অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল। পুলিশেরা অনবরত দু'ধারে লাঠি চালাইয়া যাইতেছে, আর রাস্তার লোকগুলা সে বেদনা নির্ব্বাকভাবে সহ্য করিতেছে; যখন নিতান্তই অসহ্য হইতেছে, তখন দেশমাতৃকার নাম স্মরণ করিয়া 'বন্দেমাতরম' কখনও বা 'মহাত্মা গান্ধিজী কী জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—এতগুলা লোক, কিন্তু কোনওরূপ গোলযোগ নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা নাই—যেন এক শান্ত সংযত মহা তপস্বীর দল।

সরযূর চোখে এ-এক নূতন জগৎ। কাশীতে সে শান্তিসেনা দেখিয়াছে; কিন্তু তাহারা যেন আর এক রকমের—তাহাদের গৈরিক বাস, ব্রহ্মচর্য্য যেন তাহাদের রুক্ষ করিয়া তুলে, কিন্তু ইহাদের ভাব অন্য - বড়ই শান্ত, বড়ই স্নিগ্ধ! সে নির্নিমেষ-নেত্রে বুবুক্ষুর মত তাহাদের পানে তাকাইয়া রহিল। পাশের একটী যুবককে সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি, এখানে এত ভিড় কিসের?"

যুবক বিস্মিতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া উত্তর দিল, "আপনি জানেন না, আমাদের নারী সত্যাগ্রহ সমিতি বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছেন। আপনি একটু এগিয়ে যান না, তা' হ'লেই দেখতে পাবেন।"

'পিকেটিং', 'পিকেটিং' কথাটা যেন তাহার নিকট নূতন বলিয়া মনে হইল না, বহুবার বহুরূপে যেন এ কথা সে শুনিয়াছে, কিন্তু কি তা' জানে না—আজ যদি বিধাতা দয়া করিয়া সে অবসর তাহাকে দিয়াছেন—হেলায় সে সুবিধা সে হারাইবে না—সে ট্যাক্সির বাঙ্গালী ড্রাইভারকে বলিল, "দেখুন, আমি এইখানেই নেমে যেতে চাই।"

সে তার প্রাপ্য ভাড়া চুকাইয়া দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

সামনের দিকে আগাইয়া যাইতেই পুলিশ বাধা দিল, "উধার মাত যাইয়ে—পিকেটিং হোতা।"

কিন্তু সরযূ বাধা মানিল না, আগাইয়া চলিল। জনতা সসম্ভ্রমে সরিয়া গিয়া তাহাকে রাস্তা করিয়া দিল। সে একেবারে পিকেটিংয়ের মধ্যে গিয়া পড়িল। কিন্তু নিজের দিকে তাকা-ইতেই তাহার সারা দেহ যেন লজ্জায় রি-রি

করিয়া উঠিল। সেখানকার সকলেরই পরিধানে খদ্দর ছাড়া কোনও জিনিষ নাই, কিন্তু তাহার অঙ্গে বিলাতী বস্ত্র—তাহার মনে হইল, যেন পূত দেব-মন্দিরে হঠাৎ অস্পৃশ্য অশুচি একজন আচম্বিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—সে কোন রকমে ছুটিতে ছুটিতে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটা চল্‌তি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল, "চালাও—বিডন রো।"

* * *

নীরেনের যেন আর দেরী সহিতেছিল না। সে সোজা হাওড়া ষ্টেশন হইতে কালীঘাটে আসিয়া প্রবোধ দাদাকে সরযূর কথা বলিয়া তাহার মনটা হাল্কা করিয়া ফেলিল।

প্রবোধ দা' সব কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তারপর ?"

নীরেন বলিল, "তারপর কি হ'বে—তাই জানতেই না আপনার কাছে এলুম।"

প্রবোধ দা' বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন "সমস্যার কথা! এখুনি কি ক'রে জবাব দিই—এখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে জিরোও, তারপর ভেবে চিন্তে দেখি—একটা উপায় ত ঠাওরাতেই হবে।"

নীরেন তাঁহার কথার রকম দেখিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল; হতাশভাবে বলিল, "না দাদা, থাক্, কথাটা মাত্র আপনাকে জানিয়ে দিতে এসেছিলুম—এখন মেসে গিয়ে যা'হোক হবে 'খন।"

প্রবোধ দাদা এবার রীতিমত চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেখ নীরেন, ফাজলামী করো না, এত বেলায় উনি যাবেন মেসে খেতে; এ কথা শুনলে মা আমায় কি বলবেন বল ত।" ও সব চলবে না, এখানে স্নান, খাওয়া সেরে দিব্যি একটা ঘুম দিয়ে বিকেলে যা' হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে—এর যেন নড়চড়্ না হয়—আমি মাকে খবর দিচ্ছি, তুমি এসেছ।"

নীরেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সরযূ ?"

প্রবোধ দা' গম্ভীরভাবে বলিলেন "আমি নিজে দেখে-শুনে এসে যা' হয় বলব—তুমি যেন ইতি-মধ্যে বাড়ীতে কিছু বলে' ফেল না।"

দাদার সাবধানতার অর্থ নীরেন যেন ঠিক বুঝিতে পারিল না—বোনের খবর বোনের কাছে দিতে এত বাধা কিসের—তবে কি এরা তাহাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাহার মনটা প্রবোধ দা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, একবার তাহার মনে হইল, এখনি এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত—সরযূর অপমান-কিন্তু সেটা নিতান্তই অশোভন দেখাইবে বলিয়া সে মনের ক্ষোভ মনেই চাপিয়া বসিয়া রহিল।

যমুনা নীরেনকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া খুবই আনন্দ-প্রকাশ করিল; প্রবোধ দাদার মা নীরেনের মাথায় হাত রাখিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "আর কতকাল সন্ন্যাসীর মত এদিক্-ওদিক্ ঘুরে বেড়াবি বাবা; যে গেছে, তার পিছনে মিছে ছুটোছুটী কেন—একটা ভাল দেখে মেয়ে ঠিক্ করি, সংসার পেতে বোস্।"

প্রবোধ দা' আর একবার চোখ মটকাইয়া নীরেনকে সাবধান করিয়া দিলেন; নীরেন বেশ নম্র সহজভাবে বলিল, "হাঁ মা, এইবার চুপচাপ্ এক জায়গায় বস্‌ব বলেই মনে করেছি, আর ঘুরে বেড়াতেও ভাল লাগ্‌ছে না।"

মা খুব খুসী হইলেন, এ কথায় যমুনাও খুব আনন্দ-প্রকাশ করিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর প্রবোধ দাদা বৈঠকখানা ঘরে একটি বিরাট নিদ্রা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেচারা নীরেনের চোখে ঘুম নাই—সরযূ, সরযূ—কতক্ষণে আবার তাহার সঙ্গে দেখা হইবে—এই চিন্তায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যা হয় হয়। প্রবোধ দাদা বলিলেন "চল নীরেন, সরযূকে দেখে আসি।"

নীরেন আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিল, "আপনিও যাবেন প্রবোধ দা' ?"

প্রবোধ দাদা বলিলেন, "যাব না ? সম্পর্কে সে যে আমার শ্যালিকা হে।"

নীরেন খুব খুসী হইয়া প্রবোধ দাদার সঙ্গে চলিল।

বীডন্ রো—সন্ধ্যার অন্ধকার উজ্জ্বল বিজলীর আলোকে যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে পাণওয়ালার দোকানের সামনে দু'চারজন সৌখীন বাবু ঘোরাফেরা করিতেছে - কুলফি বরফ-ওয়ালা হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া গেল কয়েক ছড়া মালা লইয়া একটা ফুলওয়ালা এদিক্-ওদিক্ ফেরাফেরি করিতেছে—নীরেন ও প্রবোধ দাদাকে দেখিয়া সে আগাইয়া আসিল—হাসিয়া প্রবোধ দা' মালা ফেরৎ দিলেন।

উনত্রিশ নম্বর বাড়ী—বেশ ঝরঝরে ফিট্‌ফাট্, উপর হইতে হাসির হর্‌রার সঙ্গে গানের সুরের রেশ ভাসিয়া আসিতেছে—আজ সেখানে উৎসব সুরু হইয়াছে।

প্রবোধ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভেতরে যাবে না কি ?"

নীরেন বলিল, "কি রকম, এতটা এসে ফিরে যাব।"

প্রবোধ দাদা উপরের আলোকিত ঘরগুলার দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিলেন, "শুনছ।"

নীরেন বলিল, "ও সে নয়, অন্য—"

প্রবোধ দাদা বলিলেন, "যাবে, চলো ; কিন্তু না গেলেই ভাল কর্‌তে।"

দোতলার সিঁড়ির পাশেই ঘর - প্রশস্ত—মেঝেয় একটা গালিচার উপর শাদা ধবধবে চাদর পাতা—সেইখানে মজলিস বসিয়াছে—আসরে তখন পুরুষের দল – গায়িকা নাই—বোধ করি উঠিয়া এইমাত্র কোথায় গিয়াছে। দুইজন আগন্তুককে দেখিয়া সকলেই একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু প্রবোধ দাদা তার উপস্থিত বুদ্ধিতে সব ব্যাপারটা সামলাইয়া লইলেন—বলিলেন, "গান শুন্‌তে এসেছি – পুরোন বন্ধু কি না।"

তাহারা সকলে সমাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "আসুন, আসুন, ফিরোজা বিবি অনেকদিন পরে ফিরেছে, আজ ত এখানে স্ফূর্ত্তির বান ডেকে যাবে। বসে পড়ুন।"

একজন একটা মদের বোতল ও একটা গেলাস আগাইয়া দিয়া বলিল, "বাইজী কাপড় ছাড়্‌তে গেছে—ততক্ষণ চলুক।"

প্রবোধ দাদা সেটা ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "না, না, আমাদের ওসব চলে না, আমরা খালি গান শুন্‌তেই এসে থাকি।"

একজন বলিল, "সাদা চোখে গান ভাল লাগে, এ কথা ত কখন শুনি নি বাবা।"

নীরেন কিন্তু একদম চুপ—তার এই সব দৃশ্য দেখিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—সে যে প্রবোধ দাদাকে কি বলিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না—সে সরিয়া একটু অন্ধকার কোণে গিয়া বসিল।—প্রবোধ দাদা একেবারে আসরের মধ্যে গিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরোজা বিবি ঘরের মধ্যে ঢুকিল—পরণে একটা ফিরোজা রংয়ের পাতলা সাড়ী, আর সেই রংয়েরই একটা আঁটসাঁট ব্লাউস গায়ে – অন্ধকার কোণ হ'তে নীরেন সে মূর্ত্তি দেখিয়া যেন পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই একজন 'অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখিয়া ফিরোজা যেন একটু চমকিয়া উঠিল – প্রবোধ দাদা কিন্তু বেশ নির্ব্বিকারভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "সেলাম্ বিবি সাহেব ; আমায় না চিন্‌লেও আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নন—আমি নীরেনের বন্ধু, কোল্‌কাতায় ফিরেছেন শুনে দেখা কর্‌তে এলুম।

ফিরোজা ততক্ষণে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল ; সে বলিল, "আসুন, আসুন, আমার

কি সৌভাগ্য! আপনার মত লোকের পায়ের ধূলো আজ আমার বাড়ীতে পড়্‌ল।”

প্রবোদ দাদা বলিলেন, “এতদিন লোকমুখে ফিরোজা বিবির গানের সুখ্যাতিই শুনে আস্‌ছিলুম, আজ তার গান শোন্‌বার সৌভাগ্য পেয়েছি বলে’ নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্‌ছি।”

ফিরোজা এইবার ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইল, যাহার জন্য তাহার এত আয়োজন, সে কোথায়? নীরেনকে ঘরের এক কোণে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “অত দূরে বসেছেন কেন নীরেন-বাবু, এগিয়ে আসুন।” তারপর সামনের দু’-একজন লোককে বলিল, “তোমরা একটু সরে বসো ত ভাই—বাবুকে জায়গা দাও।”

তাহারা বাইজীর কথায় সরিয়া গিয়া নীরেনকে বলিল, “আ রে, আ রে, সে কি কথা—চলে আসুন মশায়, এগিয়ে আসুন।”

নীরেন সে কথার কোনও জবাব দিল না, বা তাহার সরিয়া বসিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। প্রবোধ দাদা নীরেনের অবস্থা কতকটা অনুভব করিয়া বলিলেন, “বেচারা ভয়ানক লাজুক—সবে আজ ওর হাতেখড়ি—আজ থাক্—কিছুদিন আসা-যাওয়া করুক, পরে সব ঠিক্ হয়ে যাবে।”

সঙ্গতের সুর আরম্ভ হইল; বাইজী গান ধরিল। গানের অর্থ এই রাত্রির রঙ্গীন স্বপ্ন ভোরবেলায় টুটিয়া যায়; রাত্রির ফোটা ফুল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝরিয়া পড়ে; শুধু সে স্বপ্নের স্মৃতি, সে রাত্রির সৌরভটুকু মাত্র বুকে জমা হইয়া থাকে!

গান থামিয়া গেল। তৃষ্ণার্ত্ত বাইজীর সামনে ফেনিল মদ গেলাসে আগাইয়া দিতেই ফিরোজা এক চুমুকে সেটা গলায় ঢালিয়া দিল; তারপর রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া সে প্রবোধ দাদার দিকে ফিরিয়া বলিল, “দেখুন, অভ্যর্থনার অনেক ত্রুটী রয়ে গেল—নিজগুণে মাপ কর্‌বেন।”

প্রবোধ দাদা বলিলেন, “ত্রুটী-বিচ্যুতির ঝগড়া কোনদিন করি নি, আশা করি আজকেও তা’ নিয়ে মাথা ঘামাব না। কিন্তু আজ যে সুর কাণে ঢুক্‌ল, এর পর অন্য আর কোনও গান শোন্‌বার ইচ্ছা থাক্‌বে কি না সন্দেহ।”

ফিরোজা তাহার হাত দু’টা কপালে ঠেকাইয়া বলিল, “আপনার মত গুণীলোকের কাছ থেকে অতটা বিনয় আশা করি না।”

নীরেন প্রবোধ দাদাকে সজাগ করাইয়া ডাকিয়া বলিল, “চলুন প্রবোধ দা’, রাত্রির অনেক হয়ে গেছে, ফির্‌তে হ’বে না।”

প্রবোধ দাদা সে কথায় সায় দিয়া বলিলেন, ”হাঁ, চল, এইবার ফেরা যাক্। বিদায় বিবি সাহেব। বেঁচে থাক্‌লে আবার দেখা হ’বে।’

ফিরোজা এবার একেবারে প্রবোধ দাদার পায়ের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল, তারপর তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, “ছি, ছি, ও কথা বল্‌বেন না; বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি, আশীর্ব্বাদ করুন।”

দু’ফোটা চ’খের জল প্রবোধ দাদার পায়ের উপর পড়িল—প্রবোধ দাদা বলিলেন, “আশীর্ব্বাদ করি, শান্তি পাও।”

তারপর নীরেনের কাছে গিয়া ফিরোজা জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কিছু বল্‌লেন না?”

নীরেন বলিল, “কি বল্‌ব?”

ফিরোজা বলিল, “একটু ভেবে দেখুন দেখি, কিছু বল্‌বার কি নেই?”

নীরেন বলিল, “ভাব্‌বার কোনও দরকার নেই—এরপর আর বল্‌বার কিছু থাক্‌তে পারে না।”

ফিরোজা হেঁট হইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে গেল। নীরেন সরিয়া গেল, প্রবোধ দাদা হাসিয়া ফেলিলেন।

একটু পরেই নীরেন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; পিছু পিছু প্রবোধদাদাও বাহির হইয়া পড়িলেন। ফিরোজা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

বন্ধুর দল আকস্মিক এইসব ব্যাপারে মূঢ়ের মত অবাক্-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—ফিরোজা তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ধন্যবাদ বন্ধু, দরকার ছিল বলে' আজ ডেকে পাঠিয়েছিলুম—আপনারাও কষ্ট ক'রে এসে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন—এর জন্যে আমি আপনাদের নিকট বিশেষ ঋণী রইলুম—এখন বিদায়—হয় ত ভবিষ্যতে আবার দেখা হ'বে।"

একে একে বন্ধুর দল সব চলিয়া গেল ; সুধু উৎসব-রজনীর ছেঁড়া বাসিফুলের মত সরযূ গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার অভিনয় সার্থক, কিন্তু তাহার জীবন—সব ব্যর্থ! আজ একসঙ্গে যেন সব জীবনের সব আলোগুলা হঠাৎ জ্বলিয়া তখনই নিভিয়া গেল! গাঢ় অন্ধকার! ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া সরযূ কাঁদিতে লাগিল।

—"ক্লাব কাপল—"

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

কুন্তলীন ও রঞ্জনের প্রথম পরিচয় 'নারী-জাগৃহি ক্লাবে'।

রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা। নারী-জাগৃহির বাৎসরিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া রঞ্জন গ্যাড়াতলার ময়দানে আসিয়াছিল। বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া সে বলিল—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

প্রত্যহ যে-রকম নারী-নিগ্রহের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা'তে আত্মরক্ষার জন্য এই মাতৃজাতিকে তৈরী করা দরকার। শিখেদের মত এদেরও কৃপাণ ধারণ করাতে হবে।

"জাগে সুপ্ত পরাণ
ধরি মুক্ত কৃপাণ
সেথা গর্জ্জে বিষাণ
যেথা রমণী জাগে।
ভেদি তুচ্ছ বিধান
করি রক্তে সিনান
তুলি উচ্চ নিশান
নারী সাম্য মাগে।"

একজন 'কর্ম্মী, নারী-জাগৃহির সম্পাদিকা মিস্ কুন্তলীন হাজরার সঙ্গে রঞ্জনের পরিচয় করাইয়া দিলে, কুন্তলীন বলিল—"আপনার বক্তৃতা শুনে ভারী আনন্দ পেয়েছি।"

রঞ্জন বলিল—"এটা আমার জীবনের একটা শুভ মুহূর্ত্ত, মিস্ হাজরা। তবে আপনার সঙ্গে আলাপের আনন্দটা বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারব না। আমায় এখুনি যেতে হবে, সাড়ে আটটায় 'বিড়ী-বারনী পরিসদ', সওয়া-নটায় 'মশক-সংহারিণী সভা'।"

মিস্ কুন্তলীন বলিল—"আপনার ত অনেক কাজ দেখ্ছি।"

"সময়ের মূল্য সম্বন্ধে আমি খুব সজাগ বলেই এটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। আমার পলিসি হচ্ছে—

Time is money
It is rice and sugar
And gold and gunny !!"

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

বিড়ী বারণী ও মশক-সংহারিণী সভার কাজ শেষ করিয়া সে বাড়ী ফিরিল রাত্রি দশটায়।

আহারাদি শেষ করিয়া পরদিন পণপ্রথা-নিবারণী সভার জন্য বক্তৃতা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিল। ভাবাবেশে সে লিখিয়া ফেলিল—

"ঘরে ঘরে নারী হত্যা, অশ্রু পুরুষের
দুর্ভিক্ষ করাল ছবি, এ দরিদ্র দেশ
ম্যালেরিয়া জীর্ণ সব, রক্তহীন দেহ,
তার মধ্যে বরপণ চাহে যদি কেহ,
সে অতীব মূঢ়মতি—"

রঞ্জন রায় ওরফে X'Roy পাঁচ বৎসর ষ্টক-হলমে থাকিয়া A. R. C. S (Associate of the Royal chuner's Society উপাধি পাইয়াছে। যদিও রঞ্জন X'Ray বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিত, তবু পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা তাকে রঞ্জন নামেই অভিহিত করিব।

ষ্টক্‌হলম হইতে সে ছানা তোলার বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তোলা ছানা সাধারণ ছানার চেয়ে

স্বাস্থ্যকর। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী। দুধ কিংবা ছানা কিছুই হাত দিয়া ছুঁইতে হয় না।

দেশে ফিরিয়া সে ছানা তোলার কাজ করিল না, দুঃখিনী মাতৃভূমির দুর্দ্দশার অন্ত নাই। মূকজনগণের মূঢ়তা পর্ব্বত প্রমাণ,দারিদ্র্য মর্ম্মস্পর্শী, তাই সে দেশের কাজে লাগিয়া গেল।

দেশসেবার উদ্দেশ্যে সে কতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে 'ডাইভোর্স প্রচার ফেডারেশন', 'হিন্দু-মোস্লেম এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মিলন-মঞ্চ', 'বিড়ী বারণী পরিষদ' প্রভৃতি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন, আরও প্রায় দেড় ডজন সভা-সমিতির সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট; সে ইহার সব গুলিরই কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য, কোন কোনটার ডিরেক্টর, চারটার সম্পাদক, দু'টার সহকারী সভাপতি।

পরদিন রঞ্জন উঠিল সাতটায়। বিছানা হইতেই সে ডাকিল—"জগঝম্।"

ভৃত্য জগঝম্প একতালা হইতে উত্তর করিল—"হুজুর।"

রঞ্জন বলিল—"গাড়ী।"

সকালে সাড়ে সাতটায় লেজিস্লেটিভ এসেমব্লীর ওড়িয়া সভ্য রায়সাহেব ধাইকিড়ি মিশ্রের সঙ্গে দেখা করার কথা। ন'টায় এটর্ণী দাশরথি সোমের কাছে বিধবা ব্যাঙ্কের প্রস্পেক্টাসের জন্য যাইতে হইবে। তার উপর সময় থাকিলে কুন্তলীনের সঙ্গেও দেখা করিবার ইচ্ছা আছে। কতগুলি সভা সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। কাজগুলি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি জরুরী। মিনিট পাঁচের মধ্যেই সে প্রস্তুত হইয়া লইল।

রঞ্জন নীচে আসিয়া দেখিল, কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। সে সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আমার উঠ্‌তে দেরী হ'য়ে গেছে। কাল রাত্রে ঘুম হয় নি। এই যে ডক্টর মিট্রা,আসুন, গাড়ীতেই কথা হবে। আপনাকে বাড়ী রেখে আসব 'খন।"

"হ্যালো নরেশ. তোমাদের ক্লাবে প্লে হচ্ছে কবে? চাঁদার জন্য এসেছ বুঝি? আচ্ছা, পাঠিয়ে দেব 'খন। জর্জ্জ,Kindly ওবেলা এসো। তোমার গার্ল স্কুল সম্বন্ধে তখন কথা হবে।"

জর্জ্জ বলিল—"তোমায় সেক্রেটারী হ'তে হ'বে।"

—"অল্ রাইট্।"

নুটু, রাধেশ, হরিসাধন প্রভৃতি প্রত্যহই প্রাতে রঞ্জনের বাড়ীতে চা খায়। চায়ের পর কাগজ পড়ে। ঝানু ইংরাজি জানে না। বাংলা এক পয়সা, দু'পয়সার সাপ্তাহিক হইতে মত গঠন করে; ষ্টেট্সম্যানের ছবি দেখে। বেলা ন'টা আন্দাজ সকলেই উঠিয়া পড়ে।

রঞ্জন—"Excuse me নুটু দা', Excuse me হরি দা'।" বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, ঠিক্ এই সময় সাতকড়ি উপস্থিত হইল।

সাতকড়ি একাধারে রঞ্জনের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, কেসিয়ার, একাউণ্টেণ্ট্, বক্তৃতা লেখক ও টাইম কিপার, তার পদের খেতাব Confidential Assistant.

সাতকড়িকে কতগুলি কথা বলিয়া সকলের দিকে চাহিয়া—"Excuse me" বলিতে বলিতে রঞ্জন বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে ডক্টর মিট্রা।

রঞ্জন চলিয়া গেলে নুটু বলিল—"একটা মানষের মত মানুষ বটে! এত পয়সা, নামডাক, তার উপর বিলেত-ফেরতা। বে'করে নি, অথচ কোনও বদখেয়ালী নেই; দেশ দেশ ক'রে পাগল হ'তে চল্‌ল।"

হরিসাধন বলিল—"আহার নেই, নিদ্রে নেই।"

একটু পরেই টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল; সাতকড়ি ফোন্ ধরিয়া বলিল—"হ্যালো, আপনি কে? ওঃ! কাকে? নুটুবাবুকে? আচ্ছা—ওঃ—

বল্‌ব যে বিধবা ব্যাঙ্কের - কি বল্‌ছেন ? আচ্ছা ?"

মুটু বলিল—"ব্যাপার কি ?"

সাতকড়ি বলিল—"মিঃ এক্স রে রাস্তা থেকে ফোন করলেন, আপনি যেন আপনার শ্বশুর-মশায়কে একটু অনুরোধ করেন - তাঁকে আমাদের বিধবা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হ'তে হ'বে।

—"তা' বলব'খন। রঞ্জুর কাজ,ও আমার আর্লি ফ্রেণ্ড। আমি বললে শ্বশুর মশায় নিশ্চয়ই রাজী হ'বেন। আমার অনুরোধ এড়াতে পারবেন না। এই মেয়ে তাঁর খুব আদরের কি না! ছেলে বেলায় টাইফয়েড হয়েছিল, একবার ছাদ থেকে পড়ে গিছল, জলে ডুবেছিল, তাই এর উপর বড় টান।" নিশ্বাস লইয়া আবার আরম্ভ করিল—"আর তা' ছাড়া, শ্বশুর-মশায় এত কোম্পানীর ডিরেক্টর যে, তাঁকে ডিরেক্টর জেনারেল বললেও চলে। বহু কোম্পানীর সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট, 'ঝামরা ঝোড়া টী কোম্পানী', 'ধরমবাদ কোলিয়ারি' 'বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ' ও 'টিংচার অর্জ্জুন লিমিটেড্' এবং আরও কত কি।

কুন্তলীন রঞ্জনকে বলিয়াছে—নারী জাগৃহি ক্লাবের সহযোগী-সম্পাদক হিসাবে—ডাইভোর্স প্রচার-কার্য্যে সে তাহার সহায়তা করিবে।

এতদিন রঞ্জন খালি বাধা পাইয়াই আসিয়াছে। আজ কুন্তলীনের মত সহকর্ম্মী পাইয়া সে সকল বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। স্থির করিল, নারী-জাগৃহি ক্লাবকে কেন্দ্র করিয়া ডাইভোর্স্ প্রচার-কার্য্য চালাইতে থাকিবে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই নারী-জাগৃহির এক বিশেষ সভায় ডাইভোর্সের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইল। রঞ্জন ভারতবর্ষের সকল সংবাদপত্রে সে খবরটা ছাপাইয়া দিল।

তার এক পিতৃবন্ধু কাশী হইতে লিখিলেন—"তুমি যে এতটা অপদার্থ হ'য়েছ,তা' জান্‌তুম না। জ্যাঠার টাকা পেয়ে সেগুলো বাজে খেয়ালে উড়িয়ে দিচ্ছ। শিখেছ গয়লার কাজ, কথায় বলে গয়লার বুদ্ধি।"

রঞ্জন মনে মনে রাগ করিলেও পিতৃবন্ধুকে ক্ষমা করিল। সে সাতকড়ি, রাধেশ ও মুটুকে চিঠি দেখাইয়া বলিল—"এগুলো হচ্ছে আমার অগ্নি-পরীক্ষা।"

কিছুদিন হইতেই রঞ্জন ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ্‌ট কাটিয়া খরচা চালাইতেছে।

টাকার টান পড়ায় একদিন সাতকড়ি বলিল—"আয় বাড়াবার একটা পথ দেখুন, আর না হ'লে খরচা কমান।"

রঞ্জন বলিল—"খরচা কমাবার দরকার হ'বে না। আর কমাবই বা কি? আয়েরই একটা পন্থা দেখছি। মনে করছি ছানার ফ্যাক্টরীটা খুলে দি'।"

ছোটখাট কাজ করার অভ্যাস তার নাই, তাই রঞ্জন সাঁকরাইলের কাছে গঙ্গাতীরে অনেক-খানি জমি lease লইল। ভাগলপুর হইতে গাভী ও মহিষ আনাইবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। ছানা তোলার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অর্ডার দিল—'ইণ্ডো-অঙ্গো কোম্পানী'কে। প্রচার-কার্য্যও চলিতে লাগিল।

সাতকড়ি বলিল—"দু'-চারটা সভা ছেড়ে দিন; আপনার একসঙ্গে এত কাজ।"

কিন্তু রঞ্জন জানিত প্রতিভাশালী লোকের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

মার্চ্চমাসের প্রথম সপ্তাহে বৈজ্ঞানিক ছানার ফ্যাক্টরী খোলার কথা; কিন্তু সাধারণের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়ায় রঞ্জন তার নিজের কাজ কিছু-দিনের জন্য পিছাইয়া দিল।

নারী-জাগৃহি ক্লাবের বাৎসরিক প্রসেশনের তারিখ পড়িল মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে। রঞ্জন আজকাল নারী-জাগৃহির সহযোগী-সম্পাদক। তার ইচ্ছাও ছিল দিনটা পিছাইয়া দেয়; কিন্তু তাহার সহযোগী মিস্ কুন্তলীন হাজরার ইচ্ছা উৎসবটা মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহেই হয়।

রঞ্জন কুন্তলীনকে বলিল—"বেশ, আপনার কথাই রইল, লেডিস্ ফার্ষ্ট।"

একদিন বৈকালে প্রসেশন বাহির হইল। প্রথমেই পতাকাধারী রঞ্জন। পতাকায় লেখা up, up, women, পাশে কুন্তলীন ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির যূঁই, চামেলী, বকুল ও বেলা।

প্রসেশনের দু'ধারে আশাসোটাধারী দারোয়ানগণ। একদল তরুণ-তরুণী গাহিতে লাগিল—

"জাগ্রত আজি রমণীজাতি
ললাটে সিঁদুর উজলভাতি
জয় নারী, জয় নারী, জয় নারী
সবে হাঁকে।
ত্যজিয়া অন্ধ শাস্ত্রবিধান
হাতে করি সব রক্তনিশান
জয় নারী, জয় নারী, জয় নারী
সবে ডাকে।

গানটী রঞ্জনের লেখা।

প্রসেশনের পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা হইল। বাংলার নারী-প্রগতির প্রাণস্বরূপ লেডি অ'ডটী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন। কুন্তলীন, রঞ্জন এবং আরও কয়েকজন বক্তৃতা করিল।

রঞ্জন সুইজারল্যাণ্ডের রমণীদের দোহাই দিয়া ভারত-রমণীদের আহ্বান করিল। তুর্কী রমণীরা বোরকা ত্যাগ করিয়াছে, ভারত রমণীরাই বা ঘোমটা ছাড়িবে না কেন? ইংলণ্ডে মেয়েরা এরোপ্লেন চালায়, জার্ম্মানীতে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, আমেরিকায় পাইলট হয়; ভারতের মেয়েদেরও তাদের পন্থা অনুসরণ করা উচিত। এসো নারীজাতি, জাগো, বল—"নারী, জাগৃহি।"

তার পরদিন রঞ্জনের মনটা খুব খারাপ হইল। প্রসেশনের খবর প্রায় সব কাগজেই বাহির হইয়াছিল। কিন্তু কোন কাগজেই তার বক্তৃতা ছাপায় নাই। 'লাঠী' নামে একটী একপয়সার দৈনিক নারী-জাগৃহি ক্লাবকে খুব ঠাট্টা করিয়াছে। লেডী অডিটী ও কুন্তলীনের নাম তা'তে উল্লেখ আছে, কিন্তু রঞ্জনের নামগন্ধ নাই।

রঞ্জন সাতকড়িকে ডাকিয়া বলিল—দেখুন, এতগুলি কাগজ রেখে আমাদের দরকার নেই। ওদের সব চিঠি লিখে দিন, আর যেন না পাঠায়। এদেশের কাগজগুলোয় না থাকে খবর, না আছে এদের কোন opinion। কাগজ পড়তুম ষ্টক্‌হলমে। সেখানকার দৈনিকগুলো যেন এক একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া।

ইহার কয়েকদিন পরেই ধূমধামের সহিত সায়েন্টিফিক্ ছানা ফ্যাক্টরীর কাজ আরম্ভ হইল। বাংলাদেশের এক মন্ত্রী প্রথমে কলটা চালাইয়া দিলেন। মন্ত্রী-পত্নী ও কয়েকজন মহিলাকে প্রথম দিনের উৎপন্ন ছানা উপহার দেওয়া হইল; কুন্তলীনও খানিকটা পাইল।

রঞ্জন বিজ্ঞাপনে লিখিল—

"জমাটবাঁধা জ্যোৎস্না যেন ধবধবে এ ছানা;
হাত দিয়ে ত হয় নি ছোঁয়া, যন্ত্র দিয়ে টানা।
বদ্যি বলে গব্য খাও, পুষ্ট হ'বে দেহ;
রায়ের ছানা জমাটবাঁধা মায়ের মধু-স্নেহ।"

যতগুলি সভার সঙ্গে রঞ্জন সংশ্লিষ্ট ছিল, তার প্রত্যেকটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদিগের বাড়ীতে বিনামূল্যে ছানা পাঠান হইল। এটা ছিল প্রচার-কার্য্যের একটা অঙ্গ।

কাজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনের আজকাল

মনে হয় যে, তার একজন দরদী সহকর্মীর দরকার, যার উপর নির্ভর করা চলে। অবশ্য প্রেমের বালাই তার ছিল না। সে বলে ওটা একটা রোগ। নাইকারগুয়ার কোন এক ডাক্তার না কি বলিয়াছেন যে, "প্রেমিকের হাইপোমটর নামে একটী অতিরিক্ত গ্রন্থি (gland) থাকে। সেই গ্রন্থির রস চুঁয়াইয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে মানুষ প্রেমিক হয়।"

তবে কাজের সহায়তার জন্য একটী লোকের অভাব রঞ্জন অনেকদিনই বোধ করিতেছে। এমন যদি একটী লোক পাওয়া যায়,যার মুখ সাতকড়ির মুখের চেয়ে একটু কমনীয়, চোখ দু'টী কোমল, স্নিগ্ধ, তাতে সুবিধা বই অসুবিধা হইবে না।

আলাপের প্রথমদিন হইতেই কুন্তলীনকে তার ভাল লাগিয়াছে, মেয়েটী ভালই, খুবই আপ্-টু-ডেট্। সকল বিষয়েই তার সঙ্গে মতের ঐক্য হইতেছে। সে মনে করিল, কুন্তলীনের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবে।

কুন্তলীন একদিন সেলায়ের কল চালাইতেছে, এমন সময় রঞ্জন ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। কুন্তলীন তা'কে বসিতে বলিল। পাশের ঘর হইতে তার মা দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন—"বোধ করি কাজ-কর্ম্মের জন্য ক'দিন এদিকে আসতে পার নি। একটু বস', চা এনে দিচ্ছি।"

"তা' আনুন ; আমার মিনিট পনের সময় আছে।"

পনের মিনিটের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া গেল সভা-সমিতি সম্বন্ধে আলোচনায়। তারপর মিনিট দুই রঞ্জন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, একবার চাহিয়া দেখিল কুন্তলীন সত্যই সুন্দরী।

দু'-একমিনিটের মধ্যেই কুন্তলীনের মা চা লইয়া আসিবেন, কথাটা এখনই বলা দরকার। অথচ বলিতে কেমন বাধবাধ ঠেকিল। এত সভার উদ্যোক্তা এবং প্লাটফর্ম্মের বক্তা হইয়াও শেষে একটী মেয়ের সামনে নার্ভস্ হইয়া পড়িবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

যা'হোক, শেষটায় ঢোক গিলিয়া বলিল—"মিস্ হাজরা, আজ দখিন হাওয়াটা ভারী মনোরম! সাধে কি আর বিশ্বকবি ঐ হাওয়ার দোদুল দোলায় দুলতে চেয়েছেন।"

কুন্তলীন বলিল—"হ্যাঁ, আজকের বাতাসটা বেশ।"

রঞ্জন বলিল—"আকাশটা কি গভীর নীল!"

কুন্তলীন এবার কোন উত্তর করিল না।

"আর, বৈকালী সূর্য্যের আলোটা কি ঝক-ঝকে, কি উজ্জ্বল!"

কুন্তলীন বলিল—"আপনি যে কবি হয়ে উঠছেন দেখছি।"

রঞ্জনের ইচ্ছা ছিল বলে যে—"এর সবার চেয়ে আপনি সুন্দর।" কিন্তু বলিতে পারিল না। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। আজ ছ'টায় তার বক্তৃতা দিতে হইবে ; এখন উঠা দরকার। সে বলিল—"মিস্ হাজরা, আপনার মার মত নেওয়ার আগে আপনার অনুমতি—"

কুন্তলীন বলিল—"ওঃ, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলছেন?"

এমন সময় একটী বেহারা চা আনিয়া বলিল—"মা একটু পরে আস্‌বেন।"

চা খাইয়া উঠিবার সময় রঞ্জন বলিল—"আমার আর বসবার সময় নেই ; আপনার জবাবটা জেনে যেতে চাই।"

কুন্তলীন হাসিয়া বলিল—"এত ব্যস্ত কেন?"

রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল—"জীবনটা সংক্ষিপ্ত এবং কাজ বিস্তর। কবি সত্যই বলেছেন—'Life is short and art is long'."

পরের দিন টেলিফোনে কুন্তলীনের সম্মতি

পাওয়া গেল। তার মা অনেকদিন হইতেই রঞ্জনের প্রস্তাবের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বিবাহের দিন দুপুরের পর হইতে রঞ্জন নিরুদ্দেশ। রাত্রি আটটায় বিবাহের লগ্ন। আটটা বাজিল, নয়টা বাজিল, রঞ্জনের দেখা নাই। রঞ্জনের বাড়ীতে বরযাত্রীর দল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধেরা অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করিতেছে।

যে সাতাশটা সভার সহিত রঞ্জন সংশ্লিষ্ট, সাতকড়ি তাহাতে মোট সাতচল্লিশবার টেলিফোন করিয়াছে। 'Rational Club' এর হাতেম আলীখাঁ বলিয়াছেন যে, সন্ধ্যার কিছু আগে হাওড়া পুলের উপর একটা ট্যাক্সিতে তিনি রঞ্জনকে দেখিয়াছিলেন।

নৃত্য-চক্রের চক্রী (অর্থাৎ সম্পাদক) বলিলেন—"চারটার সময় মিঃ রায় নৃত্য-চক্রে এসেছিলেন, তার বিবাহ উপলক্ষে এক সপ্তাহ পরে একটা নাচের ব্যবস্থা করতে।"

কিন্তু সাতটার পরের খবর কেহ বলিতে পারিলেন না।

কুন্তলীনের মা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি হাসপাতালে ও পুলিশে লোক পাঠানোর কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রঞ্জন ফোন করিল —"সাতকড়িবাবু, বরযাত্রীদের ক'নের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। সেখানে উদ্যোগ-আয়োজন চলুক; খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হোক। আমি এগারটায় আসছি। আমার জন্য কুন্তলীনের বাড়ীতে গরমজল, টিনচার আইডিন ও Antiphlogistin যোগাড় করে রাখবেন। অনন্ত ডাক্তারকে বলবেন, সে যেন উপস্থিত থাকে; তাকে দরকার হ'তে পারে। তবে...

হঠাৎ টেলিফোন কাটিয়া গেল। টেলিফোন-বালাকে বারবার ডাকিয়াও কোন সুরাহা হইল না। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় এগারটায় রঞ্জন কুন্তলীনের বাড়ী উপস্থিত হইল সঙ্গে কতকগুলি লাঠিধারী হিন্দু ও মুসলমান। রঞ্জনের মাথায়, হাতে ও হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তার বন্ধুদের প্রায় সকলেরই সেই অবস্থা। একজনের নাক ফুলিয়া উঠিয়াছে, একজনের চোখের নীচে কাল দাগ।

লিলুয়ায় বৈকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে। 'হিন্দু-মোস্লেম-এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মিলন-মঞ্চে'র নেতা রঞ্জন কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান লইয়া দাঙ্গা থামাইতে গিয়াছিল; সেখান হইতেই সরাসর বিবাহ-সভায় আসিয়াছে।

উপস্থিত সকলেই রঞ্জনের এই সাহসের জন্য গৌরব বোধ করিল। কুন্তলীনের মা বলিলেন— "রঞ্জন লিডার হওয়ার উপযুক্ত ছেলে বটে!"

অনন্ত ডাক্তার বলিলেন—"বরের যা'তে ধনুষ্টঙ্কার না হয়, তার জন্য একটা ইন্‌জেকসন্ দেওয়া দরকার।"

রঞ্জন ইন্‌জেকসন্ লইতে সম্মত হইল না; কিন্তু খানিকটা ব্রাণ্ডি খাইয়া ফেলিল।

বিবাহের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রঞ্জন কুন্তলীনকে তা'র সভাগুলিতে লইয়া গেল। তাকে পরিচিত করাইয়া দিবার সময় সে বলিত —"ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী, কুন্তলীন; নারী-জাগৃহি ক্লাবের সম্পাদিকা, আর তা'ছাড়া, কতগুলি সভার···"

রঞ্জনের বন্ধু নুরআমেদ এই দম্পতির নাম দিল—'ক্লাব কাপ্‌ল।'

ট্যাক্সি করিয়া সভায় যাইতে অসুবিধা হয়, খরচা অনেক। রঞ্জনের প্রায়ই সাঁকরাইল যাইতে হয়। সাঁকরাইল অনেকটা পথ, তাই রঞ্জন একটা মোটর বাইক কিনিল; সঙ্গে একটা সাইড কার।

চোখে ধূলোবালি যাওয়ার ভয়ে সে আজকাল গগ্‌ল্‌স্ পরিতেছে। কুন্তলীনকেও একটা গগ্‌ল্‌স্ দিয়াছিল, কিন্তু সে পরিতে সম্মত হয় নাই।

বাইক কিনিবার একমাসের মধ্যেই বেশী জোরে গাড়ী চালাইবার জন্য সে ছ'বার জরিমানা দিল। ৺টু এই সম্বন্ধে তাকে সতর্ক করিয়া দিলে রঞ্জন বলিল—"কাজের সময় স্পীডের কথা মনে থাকে না। কার্জ্জন প্রায়ই জরিমানা দিতেন, বর্ত্তমানে বার্ণাডশ আমার চেয়েও বেশী জরিমানা দেন।"

একথার কোন জবাব ছিল না।

আট মাস পরের কথা।

অতিরিক্ত কাজের ও অকাজের চাপে পড়িয়া কুন্তলীনের শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দিবারাত্র সভা-সমিতির কাজে ব্যস্ত থাকিতে তার আর ভাল লাগে না। এখন একটু বিশ্রামের দরকার। কিন্তু রঞ্জন তাকে রেহাই দেয় না।

সংসারের বিধি-ব্যবস্থার ভারও কুন্তলীনের উপর। সাতকড়ি প্রায় দেড়হাজার টাকা চুরি করিয়া পলাইয়াছে।

রঞ্জনের বন্ধু-বান্ধবেরা পুলিশে খবর দিতে বলিয়াছিল।

রঞ্জন উত্তর করিল—"অভাবে পড়ে নিয়েছে। এতদিন আমার আশ্রয়ে ছিল, ওকে আর উদ্ব্যস্ত ক'রে দরকার নেই।"

মুদির পাওনা, দর্জ্জির বিল কিছুই শোধ করা হয় নাই। পাওনাদারের তাগাদায় কুন্তলীন অস্থির হইয়া পড়িল। ব্যাঙ্কেও আর over-draftএ টাকা পাওয়া যায় না। কুন্তলীন রঞ্জনকে প্রায়ই সাম্‌লাইয়া চলিতে বলে; কিন্তু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে বলে—"সব ঠিক হ'য়ে যাবে 'খন।"

এই সময় রঞ্জন মোটর বাইকের সাইড্ কারটা বেচিয়া ফেলিল। কুন্তলীন অনেক আপত্তি করিয়াছিল, বলিয়াছিল—ইহাতে অসুবিধা হইবে; কিন্তু রঞ্জন বলিত যে—ওটা আজকালকার ফ্যাসান্ নয়।

আজকাল বাইকের পিছনে সিটে বসিয়া কুন্তলীনকে সভা-সমিতিতে যাইতে হয়, শরীরে অত্যন্ত ঝাঁকুনি লাগে, বসিবার অসুবিধাও যথেষ্ট। হঠাৎ একদিন ব্যারাকপুরে শ্রমজীবীদের সভা হইতে ফিরিবার পথে বাইকটা ইটে ধাক্কা খাওয়ায় কুন্তলীন সিট্ হইতে পড়িয়া যায়। সেই আঘাতে কুন্তলীনকে কয়েকদিন শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বাইকে আর চড়িবে না, সভা-সমিতিতেও যাইবে না।

এদিকে রঞ্জন তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। শ্রমিকদের একটা সভায় তাকে বক্তৃতা করিতে হইবে। ধীরে ধীরে শ্রমিকদের নেতা হইবার তার ইচ্ছা। সে অনেক পরিশ্রম করিয়া একটা বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়াছিল। সে মুখস্থ করিতে লাগিল—"শ্রমিকদের উন্নতি মানেই দেশের উন্নতি। তাদের মধ্যে নারায়ণ সুপ্ত আছেন। তাঁকে জাগ্রত ক'রে, উদ্বুদ্ধ ক'রে দেশব্যাপী এমন একটা শক্তি গড়ে তুল্‌তে হ'বে, যা' দেখে বিশ্ববাসীর চমক লাগ্‌বে। য়ুরোপ বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে, আমেরিকা বলবে—'Thou too India.'"

সভা-গৃহের দরজায় রঞ্জন মোটর বাইক হইতে নামিলেই ক্ষিপ্রকর্ম্মী সুধীর বাঁড়ুয়ে বলিলেন—"ভাগ্যিস তবু এলেন।"

রঞ্জন কথার অর্থ বুঝিল না; কিন্তু সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে আর একটা

মোটরের নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল,—"আসুন, আসুন, মিঃ দাশগুপ্ত।"

দাশগুপ্ত সুধীরের পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন। রঞ্জন সুধীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সুধীর তখন একজন মহিলার সামনে দাঁড়াইয়া হাসিতে-ছিল, আর হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিতে-ছিল—"মিসেস্, হেঃ হেঃ, আপনি ধন্য! আজ আমাদের ধন্য করেছেন।"

ছাপান কার্য্য-তালিকায় রঞ্জনের নাম ছিল। কিন্তু সভাপতি যথাসময়ে তাকে ডাকিলেন না। রঞ্জন সম্পাদক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

"কেন? আপনি ত বক্তৃতা করতে পারবেন না বলে' জানিয়েছেন। এমন কি সদস্য পদও ত্যাগ করেছেন।"

রঞ্জন বলিয়া উঠিল—"what, what? It is Himalayan fabrication, আমি ত কিছুই জানি না।"

সম্পাদক একখানি চিঠি তা'র হাতে দিয়া বলিলেন—"আপনার পরিবর্ত্তে কুমুদ বোস বক্তৃতা করবেন ঠিক হয়েছে।"

রঞ্জন চিঠি পড়িয়া দেখিল, কুন্তলীনের লেখা। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পদত্যাগ-পত্র।

রঞ্জনের চোখ দু'টা জ্বলিয়া উঠিল; মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হইল। সে নিজের হাত দু'খানা রগড়াইতে রগড়াইতে গরম করিয়া ফেলিল।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া রঞ্জন কুন্তলীনের সঙ্গে কোন কথা বলিল না। ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—"মাথা ধ'ছে, কিছু খাবে না।"

তার পরদিনও স্বামী-স্ত্রীতে কোন কথাবার্ত্তা হইল না। বাড়ীতে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। চাকর-বাকর সকলেই আশঙ্কা করিতেছে যে, এই নিস্তব্ধতা ঝড়ের আগে বাতাস বন্ধ হওয়ারই মত।

বৈকালে মুখ গম্ভীর করিয়া কুন্তলীন বলিল—"স্বামী-স্ত্রীতে যেখানে বনিবনাও না হয়, সেখানে ডাইভোর্স হওয়াই উচিত···"

"কেন? কেন?"

"একই বাড়ীতে থেকে আমরা কথা বল্‌ব না, আর চাকর-বাকরেরা হাসবে, আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বে তুমি আমায় সভায় নিয়ে যাবে, আর আমি সব সভায় তোমার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেব, এরকম ক'রে একসঙ্গে থাকা চলে না।"

রঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল—"সব সভায়? এটা তুমি ভারী অন্যায় করেছ। সমস্ত জীবন-ব্যাপী আমার পরিশ্রমটা···"

কুন্তলীন বলিল—"বেশ, তা' হ'লে ডাইভোর্স হওয়াই ভাল দেখছি।"

রঞ্জন বলিল—"কিন্তু আমি যে ডাইভোর্স সম্বন্ধে মত বদলে ফেলেছি।"

"তাই না কি!" বলিয়াই কুন্তলীন ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রঞ্জনও হাসিয়া তা'র দিকে ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিল—হ্যাণ্ডসেক্ করিবার জন্য।

খানিকক্ষণ দু'জনে ডাইভোর্স সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা হইল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘড়ি দেখিয়া রঞ্জন বলিয়া উঠিল—"সিনেমা।"

কুন্তলীন বলিল—"ফাইভ্ মিনিটস্ প্লিস্" বলিয়া সে বোধ করি প্রসাধনের জন্য পাশের ঘরে চলিয়া গেল।*

* "সাহিত্য-সেবক সমিতি"তে পঠিত।

—টিউবওয়েল—

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

ছয়

ইহার কয়েকদিন পরে এক রবিবার বিকেল-বেলায় রমেশ উপরে এসে আমাকে বল্‌ল, "একটী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

আমি বল্‌লাম, "কে এসেছেন? তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেছ?"

রমেশ বল্‌ল, "তিনি আমার চেনা লোক; আপনিও তাঁর বাবাকে জানেন, তিনি আপনার বন্ধু।"

আমি বল্‌লাম, "কে বল ত?"

রমেশ বল্‌ল, "আমি মেদিনীপুরে যাঁর বাড়ীতে ছিলাম, যাঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসে আপনার আশ্রয় পেয়েছি, ইনি সেই নটবরবাবুর ছেলে।"

আমি বল্‌লাম, "নটবরবাবুর কোন্ ছেলে?"

রমেশ বল্‌ল, "নটবরবাবুর বড় ছেলে শ্রীপতি-বাবু। উনি এখন মেদিনীপুরেই ওকালতী করেন।"

আমি বল্‌লাম "শ্রীপতি এসেছে। আরে, যাও যাও, তাকে এখানেই ডেকে নিয়ে এস। সে নীচে বসে' থাকবে কেন?"

আমার কথা শুনে রমেশ তাড়াতাড়ি নীচে চলে' গেল; একটু পরেই শ্রীপতিকে নিয়ে উপরে এল।

আমি বল্‌লাম, "তুমি অমন পরের মত নীচে থেকে খবর দিয়েছ কেন শ্রীপতি? এটা যে তোমার বাড়ী, উকিল হয়ে বুঝি সে কথা ভুলে গিয়েছ।"

শ্রীপতি আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌ল, "নীচে এসে রমেশের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ও বল্‌ল, আপনাকে খবর দিয়ে আসি। আমি তাতে আপত্তি করি নি।"

আমি বল্‌লাম, "যাক্ গে, কখন এলে? নটবর-বাবু কেমন আছেন? বাড়ীর সব ভাল ত? তোমার বাবার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি। তিনি ভুলেও কখন কোলকাতায় আসেন না, দেখাও হয় না।"

শ্রীপতি বল্‌ল, "বাড়ীর সবাই ভালই আছেন। আমি আজই এগাটার সময় এখানে এসেছি।"

আমি বল্‌লাম, "এগারটায় এসেছ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

শ্রীপতি বল্‌ল, "কাল প্রাতঃকালে আমার পিসেমশাই মেদিনপুরে গিয়েছিলেন, আজ তারই সঙ্গে এসেছি, তাঁর মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এতক্ষণ দেরী হয়ে গেল।"

আমি বল্‌লাম, "ভাল কথা। এখন যে কয়দিন কলকাতায় থাকবে, আমার এখানেই থাকতে হবে।"

শ্রীপতি হাসিয়া বল্‌ল, "আমি যে কালই বাড়ী যাব। বাবা আপনার কাছে একটা নিবেদন জানাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আস্‌ছে শনিবার আমার ছোট বোনের বিয়ে। সেই উপলক্ষে আপনাদের সকলের পদধূলি তিনি মেদিনীপুরে চান। এই আবেদন নিয়ে আমি এসেছি। অনেক দিন আপনাদের দেখা-শোনা হয় নি। এই উপলক্ষ ক'রে সে অভিযোগটা মিটিয়ে আসুন না।"

আমি হেসে বল্‌লাম, "শ্রীপতি, তুমি যে

আদালতে এরই মধ্যে বেশ পশার জমিয়েছ, তা' তোমার এই আবেদন শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি। তাই বল, তুমি তোমার বোনের বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছ; কোলকাতায় বেড়াতে এস নাই। দেখ বাবা, আমার শরীরের যে অবস্থা, তাতে এখন আর কোল্‌কাতা ছেড়ে কোথাও যেতে সাহসে কুলায় না। তোমার বোনের বিয়ে, আমার পরম বন্ধু নটবরবাবুর মেয়ের বিয়ে, এতে যে আমাকে সকলের আগে গিয়ে দেখা-শোনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা আর তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু কি করি বাবা, আমি একেবারে স্থাবর হয়ে পড়েছি। বেশ, নটবরবাবুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। বিবাহের দিন ছেলেদের পাঠিয়ে দেব। তুমি নটবরবাবুকে আমার শরীরের অবস্থা জানিয়ে আমাকে ক্ষমা করতে বল' বুঝেছ শ্রীপতি।"

শ্রীপতি বল্‌ল, "সবাই না গেলে বাবা বড় দুঃখিত হবেন।"

আমি বল্‌লাম, "তুমি তাঁকে ভাল ক'রে বল্‌লে তিনি দুঃখিত হবেন না। আসছে শনিবারে বিয়ে। বেশ দিন স্থির হয়েছে। সেদিন মুসলমানদের একটা পর্ব্ব উপলক্ষে বন্ধ আছে। ছেলেদের যাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। রমেশ, তুমি নিশ্চয়ই যাচ্ছ, কি বল ?"

শ্রীপতি বল্‌ল, "রমেশকে ত যেতেই হবে, ও যে আমাদেরই।"

আমি বল্‌লাম, "তোমাদেরই রমেশ এখন আমাদের হয়েছে। ও রমেশ, শ্রীপতিকে একটু জল খাওয়াবে না ? তোমার মাকে বলে এস।"

শ্রীপতি বল্‌ল, "এই তিনটের পর ভাত খেয়েছি। ট্রেণ থেকে নেমেই পিসেমশায়ের সঙ্গে গিয়ে জিনিস-পত্র কিছু কিন্‌তে হয়েছিল। তাই বেলা হয়ে গিয়েছিল। এখন ত আর কিছু খেতে পারব না। এ যে আমাদের ঘরের কথা। আমাকে এখনই যেতে হবে। পিসেমশাই বাসায় অপেক্ষা করছেন, আবার তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে হবে। আমি এখনই উঠি। আপনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবারই ব্যবস্থা করবেন। বাবা বলেছিলেন, রমেশকে দু'-তিনদিন আগে পাঠাতে। তা' কাজ নেই। রমেশ, তুমি সকলকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার বিকেলের গাড়ীতেই যেও।"

আমি বল্‌লাম, "সে সব ঠিক ক'রে আমরা আগেই তোমাদের সংবাদ দেব, তার জন্য কিছু ভাবতে হবে না।"

শ্রীপতি তখন আমাকে প্রণাম ক'রে রমেশের সঙ্গে নীচে চলে' গেল।

গৃহিণী পাশের ঘরেই ছিলেন ; সেখান থেকেই সমস্ত কথা শুনতে পেয়েছিলেন। শ্রীপতি চলে গেলে তিনি ঘরের মধ্যে এসে বল্‌লেন, "তা' হ'লে মেদিনীপুরে বিয়ের নেমতন্ন রক্ষা করতে যেতে হবে ?"

আমি বল্‌লাম, "যাওয়া ত কর্ত্তব্য। নটবর-বাবু আমার পরম বন্ধু। কিন্তু, শরীরের এ অবস্থায় আর কোথাও যাওয়া চলে না। শনিবারে রমেশের সঙ্গে ছেলেদের একজনকে পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিছু তত্ত্বও করতে হবে।"

গৃহিণী বল্‌লেন, "কাকে পাঠাবে ?"

আমি বল্‌লাম, "ছেলেরা এলে সে কথা ঠিক করা যাবে। তাদের মধ্যে যে যেতে চাইবে, সেই যাবে।"

গৃহিণী তখন এক প্রস্তাব ক'রে বস্‌লেন। তিনি বল্‌লেন, "যে যাবে, তাকে বলে' দিতে হবে, সে যেন ঐদিক দিয়ে একবার রমেশের বাড়ী হয়ে ওর মা বোনকে দেখে আসে। আর যদি পারে তা' হ'লে তাদের একবার এখানে নিয়ে আসে।"

আমি বল্‌লাম, "একথা যদি রমেশ জান্‌তে পারে, তা' হ'লে সে মেদিনীপুরেই যাবে না।"

গৃহিণী বল্‌লেন, "সে কথা তাকে আগে কে জানাতে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে সব ঠিক ক'রে

নিতে হবে, রমেশ আর তখন বাধা দিতে পারবে না।”

আমি বল্‌লাম, “তোমার ব্যবস্থা মত কাজ করতে পারবে, দীনেশ। রমেশ দীনেশের উপর কথা বল্‌তে পারবে না।”

—“কার উপর কে কথা বল্‌তে পারবে না মা ?” এই বলে’ রমেশ এসে উপস্থিত।

গৃহিণী বল্‌লেন,“উনি বল্‌ছিলেন তোমার উপর কেউ কোন কথা বল্‌তে পারবে না। নরেশ বল, পরেশ বল, দীনেশ বল, বৌমারাও বল, এমন কি কর্ত্তা পর্য্যন্তও তোমার উপর কোন কথা বল্‌তে পার্‌বেন না। এক পারব আমি - কেমন রমেশ ?”

রমেশ হেসে বল্‌লে, “না, না, তা’ নয়। আমার উপর সবাই কথা বল্‌তে পারবেন। আমি যে সকলের ছোট মা।”

গৃহিণী বল্‌লেন, “যে ছোট, সেই ত সকলের বড়।”

রমেশ বল্‌ল, “সে আলাদা কথা। ও সব বড় কথা আমি বুঝি নে। আমি জানি, এ বাড়ীর আমি সকলের ছোট, সবাই আমার বড়। তাঁরা যা বল্‌বেন, আমাকে তাই মাথা পেতে পালন করতে হ’বে। কেমন মা, এই কথাই ঠিক না ; উল্‌টো কথা বল্‌লে চল্‌বে কেন ?”

আমি বল্‌লাম, “সেই কথাই ঠিক। এখন আমি তোমাকে আদেশ করছি, তুমি একটু বেড়িয়ে এস। অন্য দিন ত কাজ নিয়েই কাটে। আজ রবিবার। একটু বেড়ালে ভাল হয়।”

রমেশ বল্‌ল, “তা’ ত হয়। কিন্তু, অনেক কথার যে মীমাংসা করতে হবে।”

গৃহিণী বল্‌লেন, “এমন কি সব কঠিন সমস্যা উপস্থিত হ’ল যে, এখনই তার মীমাংসা না করলে চল্‌ছে না ?”

রমেশ বল্‌ল,“কোন কাজই কাল করব বলে’ ফেলে রাখতে নেই। এই ধরুন শ্রীপতিবাবু যে মেদিনীপুরে যাবার জন্য বলে’ গেলেন, তার কি করা হবে ?”

আমি বল্‌লাম, “কালই ত যেতে হবে না। এখনও বিয়ের সাত দিন বিলম্ব আছে। ছেলেরা সবাই আসুক, তখন সকলে মিলে পরামর্শ ক’রে যার যাওয়া হয়, ঠিক করা যাবে।”

রমেশ বল্‌ল, “তা’ কেন! আপনি যা’ বল্‌বেন, সকলেই তা পালন করবে।”

গৃহিণী বল্‌লেন, “বেশ ত, উনি যা বল্‌বেন, তাই হবে। কিন্তু ওঁকেও ত একটু ভেবে-চিন্তে কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে।”

রমেশ বল্‌ল, “ওর আর ভাবনা-চিন্তা কি ? এখনই ঠিক করা যাক্ না।”

আমি বল্‌লাম, “তোমার যদি বিলম্ব করা না সয়, তা’ হ’লে তুমিই বল না কি করতে হবে।”

রমেশ বল্‌ল,“আমার মত কি শুন্‌বেন ? আমি বলি, কর্ত্তার গিয়ে কাজ নেই। ওঁর শরীর ভাল নয়। সেখানে গেলে নানা অনিয়ম হবেই ; তাতে ওঁর শরীর আরও কাতর হ’য়ে পড়বে। উনি থাকুন। আর উনি থাকলেই মাকে থাকতে হবে। শনিবার ত ছুটী আছে। বড়-দা’, মেজ-দা’ ছোট-দা’ তিনজনই চলুন। মেদিনীপুর ত কেউই যান নি, একটা নূতন স্থান দেখা হবে। আর বড় বৌদি’ মেজ বৌদি’ যদি যান, তা’ হ’লে কি যে আনন্দ হয়, তা’ আর বলতে পারি নে। আমাদের দেশ যে কেমন সুন্দর, তা’ একবার দেখেই আসুন না।”

গৃহিণী বললেন, “আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, যদি তুমি সকলকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে যাও।”

রমেশ হো হো ক’রে হেসে উঠে বলল,“এইবার মা পাগলের মত কথা বলেছেন। ওঁরা যাবেন আমাদের গ্রামে। এ যেন দিল্লী, লাহোর! আমাদের গাঁয়ে ভদ্রলোকের বাস নেই। আমরা সবাই চাষা। সারা গ্রাম খুঁজলে একখানা ইট

কেউ বা'র করতে পারে না। আমরা, যাকে বলে কুঁড়েঘর, তাতেই বাস করি। তাই কি কারও বাড়ীতে বেশী ঘর আছে। আর সে সব ঘর দেখ্‌লে আপনারা ভয়েই সারা হয়ে যাবেন—দু'ঘণ্টা বসা ত দূরের কথা। আমরা গরীব চাষা মানুষ; আমরা যে কি ভাবে বাস করি, কি খাই, কি পরি, কেমন ক'রে আমাদের দিন চলে, সে ধারণাই আপনাদের নেই। সেইখানে যেতে চান আপনারা—একে পাগলামী ছাড়া কি বলব। মা, আপনি কিছুই জানেন না; পাড়াগাঁ যে কেমন স্থান, তা' আপনি মোটেই জানেন না। সেখানে এঁদো পচা পুকুরের জল খেতে হয়। চার-পাঁচ ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার মেলে না। লোকের রোগ হয়, ভোগে, তারপর মরে যায়। এই আমাদের গ্রাম। পথঘাট নেই। যেতে পারবেন গরুর গাড়ীতে? সে আর পারতে হয় না। ও সব কথা ছেড়ে দিন। বুঝেছি মা, অমনি অমনি কথাটা বল্‌লেন।"

গৃহিণী বল্‌লেন, "না রমেশ, তুমি ঠাট্টা মনে কর' না, তুমি যদি সকলকে নিয়ে যেতে স্বীকার কর, ওঁরা যাবেন।"

রমেশ বল্‌ল, "আপনাদের মত আমি ত পাগল হই নি। অসম্ভব মা, একেবারে অসম্ভব। তার চাইতে বলুন সোজা ক'রে যে, কারও মেদিনীপুরে যাওয়া হবে না।"

আমি বললাম, "যেতে হবেই। তবে, তুমি যা বল্‌ছ, তা' হয় ত হবে না। তোমার সঙ্গে ছেলেদের দু'-একজনকে পাঠাব, এই ঠিক কথা। অতএব, তোমার সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল; এখন তুমি অনায়াসে বেড়াতে যেতে পার; তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।"

রমেশ বলল, "আচ্ছা মা, ওই বিয়েতে আপনারা ত তত্ত্ব দেবেন?"

গৃহিণী বললেন, "তা' দিতে হবে বই কি। ওঁর বন্ধুর মেয়ের বিয়ে, সাধ্যমত যা' হয় দিতে হবে।"

রমেশ বল্‌ল, "আমাকেও তা' হ'লে কিছু দিতে হবে।"

গৃহিণী বল্‌লেন, "দেওয়া ত উচিত। তুমি যখন সেখানে ছিলে, তাঁরা যথেষ্ট করেছেন তোমার জন্য, তখন কিছু উপহার দেওয়া উচিত। বিশেষ, তুমি যখন উপার্জ্জন করছ।"

রমেশ বল্‌ল, "আমার এই চাকরীর টাকার একটি পয়সাও আমি খরচ করতে পারব না। সব আমাকে জমাতে হবে। বাড়ীতে সামান্য যা' জমি আছে, তার থেকে যা' আয় হয়, যে ধান পাওয়া যায়, তাতে দুটি বিধবার চলে যায়। আমি বাড়ীতে থাকলেও চাষবাস ক'রে সংসার চালাতে পারি। তবে যে চাকরী করতে এসেছি, সে টাকা জমাবার জন্য। এর এক পয়সাও কোন দিন খরচ করব না। সেই জন্যই ত মা এত বলেন, তবুও বাড়ীতে টাকা পাঠাই নে। টাকা আমাকে জমাতেই হবে, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

গৃহিণী বল্‌লেন, "টাকা জমিয়ে কি করবে?"

রমেশ বলল, "যেদিন মা, আপনার কাছে আমার পাঁচ শ' টাকা জমবে, সেই দিন বল্‌ব, টাকা দিয়ে কি করব; তার আগে নয় মা।" এই বলেই রমেশ হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমশঃ

—চোর জামাই—

শ্রীমতিলাল দাশ, এম-এ, বি-এল

এক

ছুটীর দিন। আকাশ ধূসর মেঘে ঢাকা। বসিয়া বসিয়া ভাল লাগে না। থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি নামে, ঝড়োহাওয়ায় টেবিলের ফুলদানী উড়াইয়া লয়। বসিয়া বসিয়া কি করি ভাবিয়া পাই না। ছাতা লইয়া দাদার বাসায় রওনা হইলাম।

এইস্থানে ভূপেনদার বিষয় কিছু বলিয়া রাখা ভাল, তিনি রক্তের সম্পর্কে আমার কেহই নন; কিন্তু মানুষের দাবীতে সহোদরেরও অধিক। মেকির বাজারে খাঁটি সোনা চেনা দুর্ঘট বলিয়া যখন একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া মানুষকে অবিশ্বাস করিতে সুরু করিয়াছিলাম, তখন বিধাতার অযাচিত করুণারই মত দাদার সহিত আমার পরিচয় হয়। নূতন স্থানে আসার কোন চিন্তাই আর আমার মনে স্থান পায় না। ভূপেনদা'র এবং বৌদি'র যত্নে বাড়ীর কথা পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছি।

সেখানে, পৌঁছিয়া দেখি দাদা ও বৌদি' বর্ষামঙ্গল করিতেছেন, বৌদি' পিয়ানোয় সুর ভাঁজিতেছেন, দাদা ইজিচেয়ারে বসিয়া আকাশের মেঘের খেলা দেখিতেছেন।

দাদার বৃহৎ সংসার। তিনটী ছেলে আর পাঁচটী মেয়ে। রাত্রিদিন তাহারা বাড়ী গুলজার করিয়া রাখে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত দাদাও দুহিতা-মঙ্গল শঙ্খ বাজাইতে রাজী, তাঁহার কন্যারা পিতার উজ্জ্বল স্নেহে জীবনকে ধন্য মনে করে।

পৌঁছিয়া ডাকিলাম—"বুঁচি।"

ভাবসাগর হইতে মন ফিরাইয়া দাদা স্মিত-হাস্যে আমার দিকে চাহিলেন ও বলিলেন—"ওরা কেউ বাড়ী নাই। এস সুরেশ, বস'।"

বৌদি' গান থামাইতেছিলেন, দাদার অনুরোধে সুরলহরী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গান শেষ হইলে দাদা বৌদি'কে বলিলেন—"এখন অতিথি সৎকার কর, বর্ষার দিনে গরম গরম পাঁপরভাজা বেশ ভাল লাগবে।"

অন্য লোক হইলে হয় ত সভ্য বলিতে হইত, বলিতে হইত—"না দাদা, এই খেয়ে আসছি, আর কেন? মাপ করতে হবে।" কিন্তু দাদার এখানে মিথ্যাচরণের সে বালাই নাই। বৌদি' পাপর ভাজিতে চলিলেন। দাদার সঙ্গে আমার গল্প চলিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"কাল গৌরী এসেছে, তাই ক্লাবে যেতে পারি নি; তারপর তোমাদের গানের মজলিস কেমন হ'ল?"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম—"দাদা, সুরলক্ষ্মী আমার প্রতি নিতান্ত অকরুণ; সুর সপ্তকের লীলাচাতুর্য্য আমি মোটেই ধরতে পারি নি। তবে ওস্তাদী হজম না করতে পারলেও ওস্তাদীর চালবাজি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।"

দাদা গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন "দেখ, বাংলাদেশের মানুষের মনে সত্যকার দরদের চেয়ে আজ চালবাজি কাজ করে। তোমার সম্বন্ধে আমার নিরাশ হ'তে হচ্ছে, আমি যেমন অকর্ম্মা হয়ে রইলুম, তুমিও—"

কথা কাড়িয়া লইয়া উত্তর দিলাম—"তাই হোক দাদা, আপনার মত হ'তে যদি পারি, আমি নিজেকে সার্থক মনে করব। ভড়ং আর ফাঁকি দিয়ে আমি জয়ী হতে চাই না।"

"যাক্, তারপর তোমার ওস্তাদের কথা ত খুব

জোরগলায় সবাই বলছে যে, বাংলাদেশে এমন গাইয়ে খুব কম।”

“সে কথা ঠিক, গলার জোর থাকলেই চলে দাদা, আমি ত শুধু দাঁতখিচুনি দেখেছি, আর মাঝে মাঝে ওস্তাদীপনা ‘হো’ শুনেছি। গানের কলি শেষ হ’তে না হ’তে গায়ক সেই যে বিকট ‘হো’ ক’রে প্রশংসাসূচকভাবে তালটিকে অভ্যর্থনা করে, তা’ দেখে ত আমার হাসি চাপাই দায় হয়েছিল। আমাদের আর্টিষ্ট হরেন দা’ ত মাথা নেড়ে আর রাগিনী ফরমাস ক’রে খুবই বাহবা দিচ্ছিলেন। শচীনাথও খুবই মাথা দোলাচ্ছিল।”

বৌদি’ পাঁপর লইয়া আসিলেন। তারপর দু’খানি ডিসে পাঁপর সাজাইয়া দিয়া পাশে চেয়ার লইয়া বসিলেন।

খাওয়ার মাঝে বৌদি’ জিজ্ঞাসা করিলেন— “শুনেছ ঠাকুরপো, ‘পচা’ নামে একটা চোর সহরে বড় উৎপাত আরম্ভ ক’রেছে?”

সংসারে খুঁটিনাটি নিয়ে থাকা আমার ধাতুসহ নহে, কিন্তু দাদা ও বৌদি’ সহরের গেজেট। সকলের সহিত তাঁহাদের স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ; সকলের খবরই তাঁহাদের ওখানে মেলে।

আমি বলিলাম—“কাল ক্লাবে কে যেন বলছিল, পুলিশ না কি বেটাকে চালান দেওয়ার চেষ্টায় আছে। সেদিন জেল থেকে বেরিয়েছে, পুরাণ-পাপী; কিন্তু এখনও ওর ঘাড়ে দোষ চাপান যায়, এমন কিছু পায় নি। সহরের লোক না কি ভয়ে অস্থির।”

বৌদি’ বলিলেন—“অস্থির হবে বই কি? সেটা ত কম পাজী নয়, কাল হারাণবাবুর বৌ বলছিলেন—তাঁদের পাশের বাড়ী থেকে সন্ধ্যাবেলায় এসে পচা-চোর একটা হার নিয়ে পালিয়েছে। সাবধানে থাকবে ঠাকুরপো।”

দাদাও সুরে সুর ধরিলেন—“না ভাই, সাবধানের মার নেই, আমি ত জজ সাহেবের বন্দুকটা কিনেছি, দেখবে?”

দাদা বন্দুক বাহির করিতে চলিলেন। দাদার ছেলেমেয়ে তখন সদলবলে বাড়ী পৌঁছিল। গৌরী দাদার বড় মেয়ে। আমি গৌরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—“কেমন শাশুড়ী হয়েছে গৌরী।”

গৌরী লজ্জাজড়িত পুলকভরে কহিল—“যান, আপনি বড় দুষ্ট কাকাবাবু।”

বুঁচি আসিয়া বলিল—“কাকাবাবু, কাকীমা আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন।”

আমি বলিলাম—“যাও, মিথ্যে কথা।”

বুঁচি সেমিজের তলা হইতে লব্ধ উপহার দেখাইয়া বলিল—“না কাকাবাবু, এই দেখুন না কাকীমা আমায় সন্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে যদি না বলি, তা’ হ’লে সন্দেশ আর দেবেন না বলেছেন।”

বর্ষা-সন্ধ্যায় মৌনতা প্রিয়ার ভাল লাগিতেছে না বুঝিলাম। দাদার বন্দুক আনা হইলে, তাড়াতাড়ি বন্দুক দেখা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিলাম।

দুই

দাদার সহিত কয়েক দিন দেখা হয় নাই।

সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে দেখা। দাদা বলিলেন— “চল সুরেশ, আমার বাসায় যাবে।”

আমি বলিলাম—“দু’-এক হাত ব্রিজ খেলা হবে না?”

দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“না। চল, ব্রিজ খেলার চেয়ে মজার কথা তোমায় শোনাব।”

কাজেই পরম প্রিয় খেলা ছাড়িয়া দাদার অনুবর্ত্তী হইলাম।

দাদা আরম্ভ করিলেন—“আমার জামাই ভোলানাথকে তুমি ত জান?”

আমি বলিলাম—“খুবই চিনি।”

ভোলানাথকে চিনিবার বিশেষ কারণ ছিল। দাদার মেয়ে গৌরীর শ্বশুর সেকেলে মানুষ। গৌরীকে যখন দেখিতে আসেন, তখন গৌরী

হাঁটুর উপর পড়া ফ্রক পরিয়া চুল ছাড়িয়া দিয়া রাস্তায় হল্লা করিতেছিল, তিনি আমায় তাই বলিয়াছিলেন—"না বাপু, এসব আমাদের নিকট দৃষ্টিকটু—এই সমস্ত উলঙ্গ বিবিয়ানা আমাদের চোখে সয় না।"

দাদা সব শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম—"দাদা, জামাইকে দেখে যেতে বলুন, তা'হ'লে দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।" এ যুক্তি ফলপ্রদ হইয়াছিল।

দাদা বলিতে লাগিলেন—পরশু শুক্লা প্রতিপদ গেছে—সারা দিন-রাত বর্ষা হয়েছিল; রাত্রে এক মজার কাণ্ড হয়েছে। রাত দু'টায় যে গাড়ী কোলকাতা থেকে আসে, সেই গাড়ীতে জামাই বাবাজীবন এসেছেন। খবর নেই, বার্ত্তা নেই, কাজেই কেউ কিছু জানি না।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"প্রথম বয়সে আর প্রথম প্রণয়ে এরূপ একটু-আধটু হয়।"

"তা' হয় বই কি। জামাই বাবাজী ত এক রিক্সা ক'রে এসেছেন—এসে হয় ত আমাদের দু-একবার ডেকেছিল, কিন্তু সাড়াশব্দ না পেয়ে যে ঘরে গৌরী শোয়, তার কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাকে ডেকেছে। আমার হল ঘরের পাশেই ওরা কয় বোনে রাতে শোয়। মাথার জানালা বরাবরই খোলা থাকে। সাড়া না পেয়ে জামাই বাবাজী গৌরীর শাড়ীর আঁচল ধরে' টান দিয়েছেন।

সেদিন চোরের গল্প শুনে ওদের—ঐ যে কি বল অবচেতন মনে ভয়ের বীজ ছড়ানো ছিল। আঁচলে টান পড়্‌তেই গৌরী ভয়ে চীৎকার করে উঠেছে। জামাই তখন জানালার ফাঁকে হাত-ছানি দিয়ে বারণ করে।

ঘরের ভিতর নিভু নিভু করা বাতি জ্বলছিল —গৌরী ভাবল চোর ছোরা মারতে চাচ্ছে। কাজেই আতঙ্কে সে 'চোর চোর' বলে' আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। তখন বুঁচি, ফেলী, পারুল, সেজুড়ী সবাই সমস্বরে চীৎকার করে ডাকছে— "চোর। চোর।"

তোমার বৌদি' আমায় গা নাড়া দিয়ে বললেন —"ও গো, শুনছ?" নির্ভর-নিদ্রাসুপ্ত আমার সাড়া পাওয়াই ভার। ঘুম ভাঙ্গলেও কি ব্যাপার হয়েছে বুঝতে না পেরে হতভম্ভ হয়ে যাই। যখন ব্যাপার বোঝা গেল, তখন সজাগ হ'য়ে পৌরুষ দেখাবার সঙ্কল্প করলুম।

জামাই বাবাজী বারান্দায় এসে দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিয়ে বলছিল—"আমি ভোলা"

কিন্তু সোরগোলের মধ্যে আর ভোলানাথের লজ্জাবিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা বুঝতে পারলুম না। তোমার বৌদি' ভয়ে ভয়ে বলল,—"ও বোধ হয় পচা চোর।"

আমি ভৃত্য জলধরকে ডাকতে লাগলুম—"ওরে জলা, বন্দুক নিয়ে আয়। জলধরের চেহারা যেমন ভূতের মত, বুদ্ধিতেও তেমনি হাঁদাকান্ত। ঘুম তার কিছুতেই ভাঙ্গে না। সোরগোলের শেষে যখন বন্দুক এসে উপস্থিত হ'ল, তখন চোর পলাতক দরজা খুলে বাইরে আমরা সবাই বসলাম, আলো টর্চ্চ আর লাঠি নিয়ে জলধর,ঠাকুর,পাশের বাড়ীর ঠাকুর ও চাকর সবাই বার হয়ে পড়ল।

তিন

রাত প্রায় শেষ হয়েছে বলে' বারান্দায় বসে জটলা আরম্ভ করা গেল। বুঁচি বললে—"বাবা, চোরটার যা' চেহারা, যেন কালো এক যমদূত!"

সেজুড়ি ভয়ে তখনও কাঁপছিল। সে আস্তে আস্তে বলল—"আচ্ছা দিদি, চোরটার চোখ দুটো যেন ভাঁটার মত জ্বলছিল, না?

গৌরী উত্তর দিল—চোর বাছাধন আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছে। ভাবছিল, বুঝি ছোরা দেখিয়ে আমায় ভুলোবে; আমি যেন তেমনি মেয়ে!"

বুঁচি বলল—"কিন্তু দিদি, ওর ছোরা যেমন

ধারোলো, তাতে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছিল—"

—"ভয় না ভয়, আমার হাতের কাছে লাঠি থাকলে আমি এমন খোঁচা মারতুম যে, গুণ্ডাটার পোতা নাক ভোঁতা হয়ে যেত।"

দাদা বলিলেন—"গৌরীর সাহসের কথা শুনে তোমার বৌদি' মনে মনে খুসী; কারণ আসলে তিনি বড়ই ভীতু—তাই সাহসের কাহিনী শুনলে তিনি খুসী হয়ে ওঠেন। তোমার বৌদি তখন বললে—'আজও বেশ শিক্ষা হ'ল,রাত দশটা-বারটা যে বন্ধুদের দল নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াও, এখন বুঝলে বাড়ী সকাল সকাল আসতে কেন বলি, আপদ-বিপদ কখন যে কি হয়, কে বলতে পারে' ?"

আমি চুপ করে থাকা শ্রেয় মনে করলাম।

জামাই বাবাজী বন্দুকের কথা শুনে বাইরের উঠানের আম গাছের পাশে লুকিয়ে ছিলেন। জলধর খুঁজতে খুঁজতে দেখা পেয়ে বলল—"শড়া চোর।"

ভোলানাথ বলল, "জলধর, আমি জামাইবাবু।"

জলধর তখন সসম্ভ্রমে চোরকে নিয়ে এল; চোর ধরা পড়েছে ভেবে বুঁচির দল মহা উৎসাহী।

ভোলানাথকে দেখতে পেয়ে গৌরী লজ্জায় দে ছুট! তোমার বৌদিও' ঘোমটা টেনে দিয়ে হাসতে হাসতে অন্তঃপুরে পলায়ন করলেন।

আমি লজ্জা-পাণ্ডুর জামাতাকে বললাম—"এস, বাড়ীর সব ভাল ত ?"

পায়ের ধুলো নিয়ে ভোলানাথ উত্তর দিল—"হাঁ, ভাল! কলেজে আমার শিল্ড পেয়েছি, তাই সাত দিনের ছুটী।"

সেজুড়ি বলল—"সাতদিন দাদাবাবু!"

বুঁচি বলল—"কি মজা!'

কথা বলিতে বলিতে দাদার বাড়ী আসিয়া পড়িলাম। দাদা বৌদি'কে পেটুক ঠাকুরপোর উপস্থিতি জানাইতে গেলেন। গৌরী তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া পিয়ানোয় সুর দিয়া গাহিতেছিল—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম ধন্য হ'ল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর!"

গৌরীর বিবিয়ানার চেয়ে গৌরীর গান ভোলানাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

সত্যকার আবেগ দিয়া ভাব-মধুর গান গৌরী গাহিতেছিল। সুর, লয় ও তালের সমন্বয়ে যেন চারিদিকে রসলোকের মাধুর্য্য বিতরিত হইতে লাগিল। আমি বলিলাম—"ও গান কেন গৌরী!"

গৌরী লজ্জাবিনম্রকণ্ঠে উত্তর দিল—"কেন কাকাবাবু, এ গান ত আপনার বেশ ভাল লাগে অনেকদিন বলেছেন।"

—"বলতে পারি মা, কিন্তু মত না বদলালে ত আর মস্ত জিনিয়াস হওয়া চলে না।"

—"বেশ, আপনি যে গান ফরমাস করেন, সেই গান গাইব।"

—"গাইবে ত লক্ষ্মী! এটা নূতন রচনা, তোমার গানের সুরেই গাওয়া যাবে।"

উদগ্র হইয়া গৌরী বলিল—"বা! বলুন না কাকাবাবু—"

আমি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলাম—"তবে শোন—

"এই দেখিনু রঙ্গ তব, তস্কর হে তস্কর!
তৃপ্ত হ'ল চিত্ত মম দৃপ্ত হ'ল অন্তর,
তস্কর হে তস্কর!"

গৌরী পিয়ানো ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া উঠিল, লজ্জায় ও ক্ষোভে চীৎকার করিয়া বলিল—"কাকাবাবু! আপনাকে মেরে ফেলবো—"

"মেরে ফেলবে কেমন ক'রে মা! আমি বাবা ভোলানাথের শরণাপন্ন হ'ব।"

গৌরী ত্রস্তে পলায়ন করিল। বুঁচি সেজুড়ীর দল হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল।

—ভাগ্যচক্র—

শ্রীনলিনীকুমার নাগচৌধুরী

এক

উভয়ে পথ চলিতেছিলাম।

তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। সিঙ্গাপুর প্রায় সুপ্তিমগ্ন।

লোকটি আপনার পরিচয় দিলেন—অষ্ট্রেলিয়া-বাসী—নাম টমাস্ রবার্ট্সন। হাতে একটা ব্যাগ। তিনি যে একজন ধনী, তাহা তাঁহার পরিচ্ছদ ও হাবভাবেই সুপ্রকাশ।

কথায় কথায় তিনি বলিলেন—"আমি যে তোমায় সাহায্য করিব, তাহার কারণ আছে। —তোমাকে দেখিয়া মনে হয় তোমার অবস্থা এক সময় ভাল ছিল; সদ্বংশজাত। তোমার বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট।"

আমার নাম এ্যালেন কেদারনাথ, দেশীয় খ্রীষ্টান। পিতা একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন —ধনী, জ্ঞানী, গুণী। আমি বোম্বায়ে বি-এ পড়িতাম। কিন্তু সেদিন আর নাই—ভোজ-বাজীর মত পিতার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থ আমার আমোদ, বিলাসিতা ও সুরাপানে উড়িয়া গিয়াছে—আজ আমি রিক্ত, পথের ভিখারী!

মিঃ রবার্ট্সন নতমস্তকে ঈষৎ দ্রুতপদক্ষেপে পথ চলিতেছিলেন। আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"আমিও ঠিক তোমার ন্যায় সিঙ্গাপুরে সম্পূর্ণ অপরিচিত। জাহাজ হইতে আজ সবে নামিয়াছি।"

কিছুকাল নীরবে পথ চলিবার পর, তিনি একটি অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বাহির হইতে অট্টালিকাটি সুপ্তিমগ্ন বলিয়াই বোধ হইল। ফটকে দারোয়ান ঝিমাইতেছে। মিঃ রবার্ট্সনের আহ্বানে সে ভিতরে গিয়া একজন ফ্ল্যাট কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া আনিল।

তিনি আসিয়া জানাইলেন—ম্যানেজার নিদ্রিত। কল্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।—আমাকে দেখিয়া প্রথমে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন; পরে আমি হয় ত রবার্ট্সনের কোন দরিদ্র বন্ধু ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলে, মিঃ রবার্ট্সন অঙ্গুলী সঙ্কেতে আমায় একটি ঘরে উপবেশন করিতে বলিলেন। কক্ষটি উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। প্রাচীর-গাত্রে বিচিত্র আলেখ্য; চেয়ার-টেবিল ব্যতীত মেঝে পারস্যের গালিচায় সমাচ্ছাদিত ছিল।

মিঃ রবার্ট্সন কহিলেন—"কাল প্রভাতেই একটা বাসা ঠিক কর, তাহার মাসিক ভাড়া ও তোমার আহারাদির টাকা আমিই দিব। তাহার পর যদি আমার কথামত চল, আমার কাজে টানিয়া লইব। লোকের ভাগ্যের কথা বলা যায় না—আজ গরীব আছ, কালই ধনী হইতে পার।"

বিনীতভাবে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি ভাবিয়া একবার পকেটে হাত দিয়া পুনরায় কহিলেন— "বাসা ভাড়া ও আহারাদিস্বরূপ তোমাকে কিছু অগ্রিম দিতেছি—দাঁড়াও।"

এই বলিয়া তিনি কক্ষের এক কোণে চলিয়া গেলেন। সেখানে একটি দেরাজ ছিল; দক্ষিণ করের সাহায্যে তিনি তাহার একটা ড্রয়ার খুলিয়া ফেলিলেন।

ড্রয়ার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিরাবহুল হাতখানি কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম,—তাঁহার মুখে কী যেন এক অবসাদের ভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে! আমি তাঁহার নিকট দ্রুত ছুটিয়া গেলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, আমার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কম্পিত কলেবর কার্পেট আচ্ছাদিত মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"মিঃ রবার্টসন!..."

দুই

কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরীক্ষা করিয়া নাড়ী পাইলাম না—দেহ নিস্পন্দ—শীতল! ড্রয়ার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ঘটনা ঘটিল দেখিয়া ড্রয়ার পরীক্ষা করিতে লাগিলাম—কিন্তু তাহার ভিতর বিভিন্ন কাগজ-পত্রাদি ও একটা পিস্তল ব্যতীত কোন বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ বা এমন কোন পদার্থ দেখিলাম না, যাহার জন্য তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে।

তখন কি কর্ত্তব্য—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইল, সম্মুখে ঘোর বিপদ!—হয় ত নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইতে হইবে! মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে দ্বারসমীপে অগ্রসর হইলাম। দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি করি? পলাইয়া যাই? কিন্তু পলাইব কোথায়?—ইহারা আমাদের একত্র আসিতে দেখিয়াছে। যদিও পলাই,—সহজেই ধরিয়া রবার্টসনের হত্যাকারী বলিয়া সনাক্ত করিবে; আমার মুখের কথা বিশ্বাস করিবে না। আমি ভিক্ষুক—আত্মগোপন করিতে পারিব না—পেটের দায়ে পথে বাহির হইতেই হইবে।...

একটা পেটা ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল। আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। অতঃপর রবার্টসনের মৃতদেহ অপসারিত করাই আমার প্রথম ও প্রধান কার্য্য মনে হইল।

সহসা পার্শ্বস্থিত কক্ষে দুই-একজনের নিদ্রা-জড়িত কথোপকথন শ্রুত হইল। ফ্ল্যাটের এদিক-ওদিক হইতেও মধ্যে মধ্যে ঠুক ঠাক শব্দ পাইতে লাগিলাম। বুঝিলাম,—তখনও ফ্ল্যাটখানি সম্পূর্ণ সুপ্তিমগ্ন হয় নাই; দুই-চারিজন জাগিয়া আছে। অতএব এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আরো কিছুকাল পরে মৃতদেহ নির্ব্বিঘ্নে অপসারিত করিব এই ভাবিয়া পূর্ব্বকথিত দেরাজের নিকট ঘুরিতে লাগিলাম।

মুহূর্ত্ত পরে আমি আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। দেরাজস্থিত বিভিন্ন কোম্পানীর সেয়ার সার্টিফিকেটগুলি, কয়েক সহস্র টাকা ও বিভিন্ন বহুমূল্য পত্রাদি সেই উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আমার মানস চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল! আমার মনে হইল,—যেন ভাগ্যবলে কোন যাদুমন্ত্রে কোন ধনাগারে উড়িয়া আসিয়াছি!...

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি ক্ষিপ্র হস্তে আত্মহারা হইয়া সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। সহসা একটা নাতিদীর্ঘ ছিন্ন-পত্রের একাংশ আমার করতলে আসিল। তাহাতে কেহ যেন আত্ম-জীবনীর এক অধ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছে।—

"আমার নাম আলেকজেণ্ডার শ্যামুয়েল—বাটী ইংলণ্ডে। আমার এক অন্তঃরঙ্গ বন্ধু ছিল—নাম কোলেরিজ হাওয়ার্ড। সে ও আমি একত্রে এক কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। পরীক্ষান্তে কলেজ ত্যাগের পর তাহার সহিত আমার আর প্রায় পাঁচ বৎসর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

"দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন বন্ধুর এক পত্র পাইলাম। পত্রখানি অষ্ট্রেলিয়া হইতে

আসিয়াছিল। সেখানে সে এক কারবার স্থাপন করিয়াছে এবং তাহা বেশ পুরাদমেই চলিতেছে। কিন্তু একা সব দেখিয়া-শুনিয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া আমায় সেখানে গিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছে। তখন আমারও কোন স্থায়ী কর্ম্ম ছিল না, সুতরাং এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

"অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হইলে কয়েক মাসের মধ্যেই সে আমাকে তাহার কারবারের সিকি অংশীদার করিয়া লইল। কালক্রমে আমি তাহার এতই বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলাম যে, ব্যবসায়ের সকল ভারই সে আমার উপর ন্যস্ত করিল। তাহার অনুপস্থিতিতে যখন ইচ্ছা ব্যাঙ্ক হইতে চেক-পত্রাদি সাহায্যে অর্থ তুলিয়া আনিতে পারিতাম।

"দুর্ভাগ্য আমার, আমাদের সে মিত্রতা ভঙ্গ হইল। আমি দিন দিন তাহার বিষ-নয়নে পড়িতে লাগিলাম। ক্লারা তাহার রূপসী স্ত্রী। বন্ধুর সন্দেহ, আমি তাহার প্রেমে পড়িয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমি ক্লারার সহিত অল্পই মিশিতাম। আমি যে এই সব ঘৃণ্য ব্যাপারে নাই—ইহাও তাহাকে জানাইলাম। কিন্তু সে বিশ্বাস করিল না।

"সেদিন সে ও আমি কারবারের খাতিরে অষ্ট্রেলিয়া হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। সঙ্গে কোন কর্ম্মচারী ছিল না।

"তখন জানুয়ারি মাস—বৈকাল। সূর্য্যদেব ক্রমশঃ অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। আমরা ধীরে ধীরে পথ চলিতেছিলাম। সহসা তাহার পত্নী-সম্বন্ধীয় সেই পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সে আমাকে যা' তা' বলিয়া গালি দিতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত সে কেবল নীরব রোষ প্রকাশ করিয়াই আসিয়াছে, কখন গালিগালাজ করে নাই। আমিও ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। বচসা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। শেষে আমি আর থাকিতে পারিলাম না।—বক্ষাভ্যন্তর হইতে রিভলবার বাহির করিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িলাম। সেই এক গুলিতেই সে ভূতলশায়ী হইল। আমি ত্বরিতপদে অদূরস্থিত এক নিবিড় জঙ্গলে অদৃশ্য হইলাম।

"কেবল প্রতিশোধ লইয়াই ক্ষান্ত হইলাম না।—এই সুযোগে তাহার সমগ্র ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিবার লোভও আমায় পাইয়া বসিল। এবং পাইতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়া পরিত্যাগ করিলাম।

"বোম্বায়ে আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।—কিন্তু সেখানেও বেশীদিন থাকিতে পারিলাম না। আরও দূর দেশে পলাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। সিঙ্গাপুর যাওয়াই ঠিক হইল। আমার মতন লোকের সিঙ্গাপুরই উত্তম আশ্রয়।"

এই অবধি আসিয়া আমি থামিয়া গেলাম। এই কয়েকটী লাইনেই আমার আজিকার এই পথিক-বন্ধুটীর আত্ম-জীবনীর একাংশ সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে একটা অদম্য প্রলোভন—

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার দারিদ্র্য—আমার ভিক্ষা—ধনী হইবার এই ত সুবর্ণ সুযোগ!—

দেরাজ হইতে অর্থ ও সেয়ার সার্টিফিকেটগুলি বাহির করিয়া ভূপতিত ব্যাগে পুরিয়া ফেলিলাম।

তখন সারা ফ্ল্যাট্‌খানি নিস্তব্ধ। এই সুযোগে আমি ক্ষিপ্রহস্তে রবার্টসনের পরিচ্ছদাদি খুলিয়া নিজে পরিধান করিলাম এবং আমার পোষাকাদি তাহার দেহ আবৃত করিল—মুহূর্ত্তে সে আমি এবং আমি তাহাতে রূপান্তরিত হইয়া গেলাম!

দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া আপনাকে দেখিয়া লইলাম। ধরা পড়িবার কোন লক্ষণই নাই! কাহার নিকটেই বা ধরা

পড়িব ? সিঙ্গাপুরে আমরা উভয়েই অপরিচিত। যে ফ্ল্যাট্ কর্ম্মচারীর সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহাও মিনিট পাঁচেক মাত্র। তাহার উপর রাত্রিকাল—মিঃ রবার্টসনের মৃতদেহটি স্কন্ধে তুলিয়া দেরাজ হইতে পূর্ব্বোক্ত পিস্তলটী সংগ্রহ করিলাম ; এবং কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিবার পূর্ব্বেই বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

সম্মুখেই বৃহৎ দরদালান। ভূতের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই দালান অতিক্রম করিতে লাগিলাম। দালানের এক পার্শ্ব দিয়া দীর্ঘ সোপানাবলী নামিয়া গিয়াছে। যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, সেটা উদ্যান। ফ্ল্যাটের চতুঃপার্শ্ব ঘিরিয়া সেই উদ্যান একেবারে রাজপথে আসিয়া মিশিয়াছে।

সেখানে আসিয়া আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইলাম—না কেহই নাই। নির্ব্বিঘ্নে রাজ-পথের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে দেহটাকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া আমি ক্ষিপ্রপদে উদ্যানে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল ; মনে করিলাম, —এইবার পলাইয়া যাই। কিন্তু প্রলোভন আমার মনকে জয় করিল। সেই অসংখ্য সেয়ার সার্টিফিকেট—সেই লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আমি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।···

কক্ষে আসিয়া আমি পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিয়া দীপ প্রজ্জ্বালিত করিলাম। বহুক্ষণ কিছুই করিতে পারিলাম না—মানুষ অর্থের লোভে কি হইতে না কি হইতে পারে—এবং মৃত রবার্টসনের মত আমিও যে আজ অভিনয় করিতে চলিয়াছি—এই দুই বিষয় ভাবিয়া নিজেই মনে মনে হাসিয়া উঠিলাম !···

তিন

পরদিন চা পানান্তে আমি ব্যাঙ্ক উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য, কেহই আমায় সন্দেহের চক্ষে দেখিল না।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পার্শ্বেই একজন সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন। টাকা জমা রাখিবার কাজে তিনি আমায় বিশেষ সহায়তা করিলেন।

লোকটি ভূতপূর্ব্ব পল্টনের ডাক্তার—নাম হুরমুস্জি—পারসী, খ্রীষ্টান ধর্ম্মী।

ম্যানেজার লোকটি একটু গম্ভীর। সেয়ার সার্টিফিকেটগুলি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নামটি কি লিখিয়াছেন ?"

নাম বলিলাম।—যদিও ভয়ের কোন কারণ ছিল না, তবু আমার স্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল।

ব্যাঙ্কের কাজ সারিয়া পথে আসিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় সেই বৃদ্ধ ডাক্তারটী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমার পিঠ চাপড়াইলেন। লোকটির সহিত পূর্ব্বেই একটু আলাপ হইয়াছিল। বেশ মিষ্টভাষী। বয়স আন্দাজ ষাট-পঁয়ষট্টি হইবে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। আমার পরিচয়াদিও তাঁহাকে দিলাম।

আমি এখানে কি করিতে আসিয়াছি তাহা জানিতে চাহিলে, কহিলাম—"আমি কোন লাভ-বান ব্যবসা করিতে চাই।"

বিদায় লইবার সময় আমাকে সন্ধ্যাকালের চা পানের নিমন্ত্রণ করিয়া ডাক্তার হুরমুস্জি চলিয়া গেলেন।

দিনের পর দিন যায়।

একটানা আরামে আমার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

হুরমুস্জির বাটীতে আমি প্রায় নিত্যই যাইতাম ; তিনিও আমার ফ্ল্যাটে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। 'গুল' নামে তাঁহার এক রূপসী, বিদুষী কন্যা ছিল।

বৃদ্ধের পরামর্শে অল্পদিনেই আমি সেখানকার

একজন প্রধান ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়াইলাম এবং গুল ও আমি উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম।

সেদিন বানিজ্যস্থল হইতে আমি একখানি 'ক্যাবে' চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। পথ-ঘাট একরূপ নির্জ্জন। সহসা পথিমধ্যে গাড়ীখানা থামিয়া গেল; এবং উপর হইতে ক্যাব ড্রাইভার নামিয়া আসিল।

হঠাৎ এরূপ থামিবার কি কারণ, জানিবার জন্য আমি যেমন গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিতে যাইব, দেখি ড্রাইভার একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; বলিতেছে—"কি, চিনিতে পার?"

সেই নিস্তব্ধ নিশীথে নির্জ্জন পথে যাহাকে দেখিলাম —যে আমার সহিত কথা কহিতেছে,—তাহাকে যে আবার দেখিব,—স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই!

মিঃ রবার্টসন! আমার কম্পিত কর ধরিয়া আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"তুমি ভাবিয়াছিলে, আমি মরিয়াছি। ভাবিবারই কথা। মৃগীরোগে অনেক সময় মানুষের নাড়ীই পাওয়া যায় না—অথচ লোকটি বাঁচিয়াই থাকে। যাহা হউক, খুব ধাপ্পাবাজি করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। তুমি ছিলে ফকীর, আমি ছিলাম ধনী—আর এখন? আমি তুমি, তুমি আমি! ঈশ্বরের কি বিচার!—না ঈশ্বরকেই বা দোষ দিই কেন? ইহা আমার ভাগ্য'!

"সে রাত্রে ভোরের দিকে জ্ঞান হইল। আমি আমার সাজ-পোষাক দেখিয়া পাগল হইয়াছিলাম। সেই এক বেশ পরিবর্ত্তনেই তোমার যে কি উদ্দেশ্য তাহাও বুঝিলাম। সেই রাত্রেই তোমাকে শাস্তি দিবার জন্য আমি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অষ্ট্রেলিয়ার দুষ্কর্ম্মই তোমার রক্ষা-কবচ হইল!"

আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

মিঃ রবার্টসন বলিতে লাগিলেন—"আমায় বাঁচাও, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও নিরাপদ হও। অষ্ট্রেলিয়ার পুলিশ না কি আমার সন্ধান করিতে সিঙ্গাপুরে আসিয়াছে। বন্ধু হাওয়ার্ডের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আমি যে পলাইয়া আসিয়াছি, তাহা আর তাহাদের অগোচর নাই। আমাকে ধরিতে পারিলে, তাহারা আমাকে ফাঁসিতে লট্‌কাইবে! তুমি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাও—আমি কোন দূরদেশে পলাইয়া যাই! তুমি আমাকে বাঁচাও!"

—"কিন্তু আজই আমি কিরূপে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব? ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি—"

—"অন্ততঃ কয়েক শত এখন দিতে পারিবে ত?"

—"হাঁ, তা পারিব।" বলিয়া পকেট হইতে তিনখানি এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম; কহিলাম—"আজ হইতে এক সপ্তাহ পরে আবার এখানে দেখা পাইবেন।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি তাঁহাকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া একেবারে ডাক্তার হুরমুস্‌জির নিকট আসিলাম এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলাম।

বিবাহান্তে আমি আর সিঙ্গাপুরে থাকিতে ইচ্ছা করিলাম না। কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায়াদি করিতে মনন করিলাম। ডাক্তার হুরমুস্‌জি তাহাতে সম্মতি দিলেন।

ভাবি-জীবনের শেষ দিনগুলা এরূপ নির্ব্বিঘ্নে কাটিলে বাঁচি।...

আগামী সংখ্যায় লিখিবেন—
শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

—নেপথ্য—

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল্

ভাগ্যের চক্রান্ত।

চাকা আবার কখন তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া যায়। চোখের পলক ফেলিবার পর্য্যন্ত সময় থাকে না। কাশী আসিয়া অলি-গলি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পরেশ একদিন কেদার ঘাটে অপ্রত্যাশিতভাবেই সুধার দেখা পাইল! একটি বাঙালী যুবকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া এক কীর্ত্তনওয়ালির গান শুনিতেছে। মুখে নম্র বেদনা, দুই চোখে অতল তন্ময়তা! পরেশ ভিড় ঠেলিয়া অদম্য আবেগে হঠাৎ সুধার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। আকস্মিক স্পর্শে সুধা ভয় পাইয়া কোথায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবে, পেছন ফিরিয়া হঠাৎ পরেশকে দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে সহসা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

হাত আর পরেশ ছাড়িতে পারিল না; কহিল,—তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। তিন দিন ধ'রে কাশী আছি, বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে বাষট্টি ঘণ্টাই টো টো। জানতাম যদি দেখা হয় তবে ঘাটেই একদিন হ'বে।

সুধা পরেশের পায়ের কাছে প্রণত হইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—দেখা আমাদের একদিন হ'তই।

তারপর আরো সন্নিহিত হইয়া কহিল,— আমাকে আজই কলকাতা নিয়ে যাচ্ছেন ত'?

—হ্যাঁ, আজই, এক্ষুনি। বীরেন যা ব্যস্ত হ'য়ে আছে।

সুধা মুখ ভার করিয়া কহিল,—ও! উনি বুঝি সেখানেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন? আমি ভাব্‌ছিলাম কাশীর ঘাটে ওঁকেই একদিন কুড়িয়ে পাব। তিনি ত' আমাকে হারান নি, আমিই বরং তাকে হারিয়েছি। কলকাতায় গিয়ে আর কাজ নেই, পরেশ-দা'।

পরেশ হাসিয়া কহিল,—সে কি একটা কথা হ'ল? কল্‌কাতায় নয় ত' যাবে কোথায়?

—কেন এইখেনেই থাক্‌ব। একটা ঝি-র কাজ জোগাড় করে' নিতে দেরি হবে না। কি বলেন প্রদোষবাবু। পারবেন না জোগাড় করে' দিতে? ইনিই আমাকে বিপদে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরেশ দা'।

—ও! পরেশ দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রদোষকে নমস্কার করিল। পরে সুধাকে কহিল,— ঝি-র কাজ একলা কাশীতেই জোটে না, সুধা। কলকাতাতেও মিলতে পারে, এবং সেখানে মাইনে হয় ত' বেশি পাবে। খোরপোষ পাবে, থাকতে পাবে, মর্য্যাদা পাবে—একটা রাজত্ব পেয়ে যাবে, সুধা। মেয়েমানুষ এমন চাকরানির পদ পেলে পৃথিবীতে কিছুই আর চায় না।

ইঙ্গিতটা সুধা বুঝিল, এবং সারা গায়ে তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল; কহিল,—না না অমন পোড়া পদ আমি চাই না। যে লোক আমাকে টেনে এনে ঠেলে ফেলে, আমি তার ছায়া মাড়াব না, পরেশ-দা'।

পরেশ সামান্য ভৎসনার সুরে কহিল,— ছেলেমানুসি কেরো না, ছি! আমি যখন তোমার আছি, তোমার আর কিছু ভয় নেই।

কথার সুরে অভয় আশীর্ব্বাদ! সুধার সত্যই আর ভয় নাই। একটি গভীর আন্তরিকতা কথাটাকে কেমন তাৎপর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

প্রদোষের দিকে একবার চাহিয়া সে ধীরে কহিল, —কখন ট্রেন ?

—এখুনি। একটা টাঙা ডাকি। জিনিস-পত্র নেবার সময় নেই। কি-ই বা আবার জিনিস! বলিয়া স্তম্ভিত, নির্ব্বাক প্রদোষের একটা হাত ধরিয়া খুব জোরে খানিকটা ঝাঁকুনি দিয়া পরেশ কহিল,—আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ! সুধার জন্যে আপনি যা করেছেন সমস্ত জীবনের কৃতজ্ঞতায় তার শোধ হয় না।

প্রদোষ ম্লানমুখে কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—না না, সে একটা কথা কি!

টাঙা আসিয়া দাঁড়াইল। আগে সুধা ও পরে পরেশ আসিয়া উঠিল। প্রদোষ পাথরের মূর্ত্তির মত খাড়া হইয়া আছে। তাহার চোখে এই চলমান জনস্রোত যেন সহসা ছন্দ হারাইয়াছে।

গাড়িতে টান পড়িতেই পরেশ প্রদোষকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—নমস্কার!

কিন্তু সুধা কি কহিল, বা শেষবার তাহাকে দেখিবার জন্য ঘাড় এতটুকু বাঁকাইল কি না তাহা লক্ষ্য না করিয়াই প্রদোষ কখন ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেছে।

চাকা ঘুরিয়া চলিয়াছে।

ট্রেণ ছাড়িতেই সুধা অন্তরঙ্গের মত কহিল,—আপনি যে আমার ও আপনার বন্ধুর মধ্যে ফের সেতু বাঁধবার চেষ্টা করবেন তা' আর হচ্ছে না, 'পরেশ-দা'। আমি না হয় মরব, কিন্তু এমন করে' নিজেকে মলিন করব না।

পরেশ কহিল,—কিন্তু বীরেন তোমাকে ভালবাসে।

সুধার ঠোঁটের ধারে বিদ্রূপের হাসি ভাসিয়া উঠিল, কহিল,—সে বিষয়ে আপনাকে সার্টি-ফিকেট দিতে হ'বে নাকি? বুঝতে আমি একাই পেরেছি, পরেশ-দা'। এই কয়দিনের নির্ব্বাসনে সমস্ত ফাঁকির কুয়াসা কেটে গিয়ে সত্য আমার চোখের সামনে সূর্য্যের মত জ্বলে' উঠেছে। আমরা কেউ কাউকে ভালবাসি নি। তিনি যদি আমাকে সত্যিই ভালবাসতেন তবে আমারই রথের সারথি হ'য়ে তিনি সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' নিজের নাম সার্থক করতেন, এমন ভীরুর মত কাশীতে পালিয়ে আসতেন না, বা ফের কলিকাতায় গিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দিতেন না আমার খোঁজ করতে। আর আমি যদি ওঁকে সত্যিই ভালবাস্‌তাম—যাক গে সে-কথা।

সুধা কথার মাঝখানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া থামিয়া গেল।

পরেশ সুধার করতলখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়া কহিল,—তুমি সব ব্যাপার ত' জান না, শোন আগে—

কথাটা সারিয়া নিয়া পরেশ কহিল,—বীরেন তোমার জন্যে পাগল হ'য়ে আছে!

সুধা ম্লান হাসিয়া কহিল,—কিন্তু আমি আর পাগল হ'তে চাই না, পরেশ-দা'। সব আচরণেই হয়ত একটা সারগর্ভ ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু অন্তর তাতে সায় দেয় না—

পরেশ কহিল,—ছেলেমান্‌ষি করো না, সুধা।

—না, না সত্যি বলছি, বরং আমি দরজা খুলে ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়্‌ব, তবু অমন একটা ভয়াবহ ভবিষ্যতে ঝাঁপ দেব না। আমার মরা মুখ দেখলেই কি আপনারা খুসি হ'ন?

তোমার মাথা দেখছি ঠিক নেই। তুমি এখন ঘুমোও দিকি। বলিয়া পরেশ সুধাকে বেঞ্চির উপর শোয়াইয়া দিল। শিয়রের বালিশ হইল পরেশের কোল।

গাড়িতে যে দু'-একজন যাত্রী ছিল তাহারা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এমন একটা মধুর সমর্পণের সম্ভাবনা আছে সেখানে মিথ্যা লজ্জাশীলতা বুঝি বাধা দেয় না।

সুধা কতক্ষণ নিঃশব্দে চক্ষু মেলিয়াই পড়িয়া রহিল, হয়ত ব্যাপারটা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা

রং, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব! নাক আর চোখ তাহাদের যেমন হয়, পার্ব্বতীর ঠিক সেরকম ছিল না। মঙ্গোলিয়ার রক্তে কোথাকার রক্ত আসিয়া মিশিয়াছে কে জানে! সে-সব দেখিবার মত বুদ্ধি বা অবসর তখন আমার নাই। আমি শুধু দেখিলাম সেই পার্ব্বত্য কুমারীকে। দেখিলাম তাহার অনবদ্য রূপ ও যৌবন। দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাহার সেই সুন্দর সুকোমল শুভ্র পদযুগল কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শে বুঝি আহত হইতেছিল, আদরে-অহঙ্কারে মাটিতে যে-সব মেয়ের পা পড়ে না, পার্ব্বতীর চলিবার ভঙ্গীটিও ঠিক সেই রকম। একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিলাম, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাংলায় সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিয়া বুঝাইয়া দিল—তাহার জুতা পরা অভ্যাস, এখানে দাসীর কাজ করিতে আসিয়াছে, জুতা পরিলে তাহার চলিবে কেন, তাই সে অমন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতেছে। সেদিন মনে হইয়াছিল, অম্‌নি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিলেই মেয়েদের বুঝি ভাল দেখায়।

তাহার পর দেখিলাম, সেদিন প্রত্যূষে পার্ব্বতী সিগারেট টানিতে টানিতে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছে। শীতকাল। ঘন কুয়াসায় চারিদিক ঢাকা। দৃষ্টি বেশিদূর অগ্রসর হয় না। সেই কুয়াসাবৃত প্রভাতালোকে রঙিন ঘাঘরা পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বতী একখানি রঙিন শাড়ী ঠিক ঘাঘ্‌রার মত করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পরিধান করিয়াছে, গায়ে রঙিন সিল্কের আঁটু জামা, বুকের উপর অজন্তার ছবির মত সিল্কের একটি ফেটি বাঁধা, পিঠের উপর কুঞ্চিত কৃষ্ণ আলুলায়িত কবরীগুচ্ছ। পার্ব্বতী আমার মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম আমাদের সেই পশ্চিমের ছোট্ট শহরটির কথা। মনে হইল, আমি যেন ঘন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন তুষারাবৃত দার্জ্জিলিং শহরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। শহরে আর জনপ্রাণী নাই। একমাত্র পার্ব্বতী আর আমি,—আমি আর পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে আমার মুখে খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—'কেয়া বাবুজি, কি দেখছেন?'

বলিলাম, 'তোমাকে দেখছি।'

হাসিয়া সে আমার মুখের উপর আরও খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া ঘাঘ্‌রা ঘুরাইয়া চলিয়া গেল। এবং তাহার সেই চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও পৃথিবী যেন সেই তুষারাবৃত শৈলনগরী হইতে অকস্মাৎ আমাদের সেই পশ্চিমবঙ্গের ছোট্ট নগরে রূপান্তরিত হইয়া তাহার সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য এবং বীভৎসতা লইয়া আমার চোখের সুমুখে প্রকট হইয়া উঠিল। বাহিরে রাস্তার উপর দোকানের জিনিস-বোঝাই গরুর গাড়ী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে শুনিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম, আমাদের বাড়ীর সুমুখের সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের উপর কাকের দল কা-কা করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, দৈত্যের মত লম্বা একটা শীর্ণ তালের গাছ আমাদের বাড়ীর উপর মাথা উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

এমনি করিয়া দিন চলিতে থাকে। ভূগোল খুলিয়া দার্জ্জিলিং শহরের বর্ণনা পড়ি, দার্জ্জিলিং-এর ছবির দিকে একাগ্র তন্ময় দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিসের চিন্তায় যে নিমগ্ন হইয়া যাই নিজেই বুঝি না। ভাবি সেই হিমালয়ের পাদদেশে ঘন অরণ্যাণী-পরিবৃত ছোট্ট একখানি কুটীর, এবং সেই কুটীরে মাত্র আমরা দু'জন অধিবাসী সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি। পার্ব্বতী ষ্টেশনে কাজ করিতে গিয়াছে, আমিও শহরে চাকরি লইয়াছি। অভাব নাই, অভিযোগ নাই, পৃথিবী সুন্দর, পৃথিবীর মানুষ সুন্দর, প্রকৃতি সুন্দর, আলো সুন্দর, বায়ু সুন্দর, আর পার্ব্বতী সুন্দরী!

এমনি করিয়া স্বর্গরাজ্যের পরিকল্পনায় মন আমার যখন একান্তভাবে তন্ময়, এমন সময় কোনো কোনোদিন দেখি, পিছন দিক হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া পার্ব্বতী আমার কাছে আসিয়া আমার চোখ দুইটি চাপিয়া ধরিয়াছে। হাত বাড়াইয়া তাহার সেই সুকোমল সুদৃশ্য হাত দুইটি স্পর্শ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। নাম বলিয়া দিলেই পার্ব্বতী হয়ত হাত ছাড়িয়ে দিবে, তাহার সে হাতের স্পর্শ যতক্ষণ পাওয়া যায় সেই-টুকুই লাভ, এই ভাবিয়া লুব্ধ মন আমার তাহার নাম আর কিছুতেই উচ্চারণ করিতে চায় না। জানি, এ পার্ব্বতী ছাড়া আর কেউ নয়, তবু কেমন যেন না-জানার অভিনয় করিতে বড় ভাল লাগে! হাতে হাত দিয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। পার্ব্বতীও কিছুক্ষণ পরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ডাকে —'বাবু!'

আমিও বলি, 'পার্ব্বতী!'

বাস্! আর কিছু নয়! শুধু নাম ধরিয়া ডাকা, শুধু মুখের পানে চোখের পানে একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া থাকা!

পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। পার্ব্বতী বলে, 'আমার একটি চিঠি লিখে দিতে হবে।'

বলিয়া একখানা রঙিন চিঠির কাগজ আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলে, 'ইংরেজিতে লিখো বাবু, বাংলা সেখানে কই জানে না।'

জিজ্ঞাসা করি, 'কাকে লিখতে হবে?'

পার্ব্বতী বলে, 'গনেশ সিং। দার্জ্জিলিং লাইট্ রেলে কাজ করে। আমাকে খুব ভালোবাসে।'

ভালোবাসে? চিঠির কাগজটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলি,—'পারব না লিখতে।'

'অত গোসা কেন?' বলিয়া হাসিতে হাসিতে কাগজখানি কুড়াইয়া আনিয়া পার্ব্বতী সেটি ভাঁজ করিয়া তাহার বুকের তলায় রাখিয়া দিয়া বলে, 'তবে থাক্।' বলিয়া সে এদিক-ওদিক চাহিয়া আমার অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলে, 'তুমিও আমাকে ভালোবাসো, না? আমি জানি।'

আমি তাহার মুখের পানে ফিরিয়া তাকাই-লাম। অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব পুলকে আমার ঘনঘন রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। সে যে কি অনুভূতি সেকথা বলিয়া বুঝাইবার নয়।

এমনি করিয়া কোথায় কোন্‌দিক দিয়া দিন যে আমাদের পার হইতে লাগিল কিছুই বুঝিতাম না। বাড়ীর বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা অসম্ভব। ঘন ঘন বাড়ী ফিরিয়া পার্ব্বতীর মুখখানি দেখিবার ব্যাকুল আগ্রহে মন আমার সর্ব্বদাই অস্থির।

মনে মনে কল্পনা করি, ম্যাটি কুলেশন পাশ করিয়াই পার্ব্বতীকে লইয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইব। চলিয়া গিয়া কেমন করিয়া কি খাইয়া সেখানে আমাদের দিন চলিবে সেসব দুর্ভাবনার স্থান তখন নাই। চলিয়া যাইব ইহাই শুধু জানি, দু'জনে আনন্দে থাকিব ইহাই সত্য।

পার্ব্বতী বলে, 'হ্যাঁ বাবু, সেই ভাল। তুমি চাকরি করবে, আমিও কাজ করব, বাস্!'

চাকরি? পার্ব্বতীর মুখে চাকরির কথা শুনিয়া এক একবার মনে হয়, হ্যাঁ, চাকরিত' করিতে হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিলে চাকরি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। না পাইলে যে-কোনো কাজ করিব, কুলি-মজুরের কাজ করিতেও রাজি, যদি পার্ব্বতী আমার সঙ্গে থাকে।

সুদীর্ঘ ছ'মাস আমাদের কাটিয়া গেল। পার্ব্বতীও এখন আর আমাকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারে না। স্কুল হইতে দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিলে রাস্তার ধারের বারান্দায় সে উদ্গ্রীব হইয়া পথের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখি, চোখ দুইটি তাহার অশ্রুভারে টল্‌মল্ করিতেছে।

সেদিন অমনি করিয়া কাঁদিতেছিল, চোখ-দুইটি তাহার মুছাইয়া দিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছি, দেখিলাম, পশ্চাতে আমার দাদা-মশাই খোলা একটি জানালার পাশে দাঁড়াইয়া কাশিয়া গলার শব্দ করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্যাপারটা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই।

ভয়ে ভাবনায় বুক আমার দুরদুর্ করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীকে হাতের ইসারা করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। পার্ব্বতী আমার পিছু পিছু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম,—'কি হবে পার্ব্বতী, চল—আমরা আজই পালাই।'

পার্ব্বতী কাঁদিতে লাগিল।

আমি কিন্তু চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। পার্ব্বতীই শেষে আমাকে বাধা দিল। বলিল, 'এখন থাক্, তুমি একটি পাশ অন্তত কর। পাশ না করিলে সেখানে চাকরি জুটিবে না এবং চাকরি না পাইলে আমাদের অনাহারে মরিতে হইবে।'

পার্ব্বতীর বুদ্ধির তারিফ্ করিলাম। এত ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সে পাইল কোথায়? আমার তখন এত সব ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবসর ছিল না।

যাই হোক্, এবার হইতে আমাদের অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে বুঝিলাম। দাদামহাশয় ব্যাপারটা যখন দেখিতে পাইয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত কি যে করিবেন কে জানে। পার্ব্বতীকে শিখাইয়া রাখিলাম,—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন বলে, ও কিছুই না।

শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপার অনেক দূর গড়াইল। চৈত্রমাস। শহরে তখন ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। শুনিলাম, পার্ব্বতীকে দাদামহাশয় আবার দার্জ্জিলিংএ পাঠাইয়া দিতেছেন। বলিতেছেন, এখানকার গরম তাহার সহ্য হইবে না।

পার্ব্বতীকেও দেখিলাম, গরম সত্যই তাহার পক্ষে অসহ্য। সমস্ত মুখখানা তাহার লাল হইয়া গেছে, দিবারাত্রি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছটফট করিয়া সিমেণ্টের মেঝের উপর গড়াগড়ি দিয়া বেড়াইতেছে।

পার্ব্বতীকে বলিলাম, 'তা' হ'লে কি হবে পার্ব্বতী?'

পার্ব্বতী বলিল, 'আমি এখন যাই, আবার শীত নামলেই ফিরে আসব। তোমায় না দেখে আমি থাকতে কিছুতেই পারব না।'

বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কিন্তু সে যে অনেকদিন পার্ব্বতী!'

পার্ব্বতী বলিল, 'তোমার কোনও ভয় নেই বাবু, ততদিন তুমি পরীক্ষায় পাশ ক'রে নিজেও অনায়াসে চলে যেতে পারবে।'

সুদীর্ঘ ছ'টি মাস পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিব বুঝিলাম না। অথচ, তাহার কষ্ট দেখিয়া আমারও কষ্ট হইতেছিল। চোখের জল গোপন করিবার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আমি সেখান হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিলাম।

কাল পার্ব্বতীর যাইবার দিন। আমাদের বাড়ীর একজন কর্ম্মচারী তাহাকে সঙ্গে করিয়া শিয়ালদা ষ্টেশনে চড়াইয়া দিয়া আসিবে, সেখান হইতে সে একাই দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইবে। ইহাই স্থির হইল।

আগের দিন রাত্রে বিষণ্ণমুখে পার্ব্বতী আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিলাম, বিদায় লইতে আসিয়াছে। সে কি করুণ দৃশ্য! সে দিনের কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। পার্ব্বতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমি চললাম।'

'কি যে জবাব দিব জানি না, আমারও চক্ষে

অশ্রুর ধারা, বক্ষে দারুণ বেদনা। একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

পার্ব্বতী আমার হাতখানা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, হঠাৎ আমার হাতের আংটিটি ধীরে ধীরে খুলিয়া সে তাহার নিজের হাতে পরিল। বলিলাম, 'ওটা তুমি নিয়ে যাও।'

পার্ব্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, নেবার জন্যেই খুললাম।'

বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া আমার গলার সোনার জিঞ্জিরটা খুলিয়া নিজের গলায় পরিয়া বারবার সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইতে তাকাইতে বলিল, 'এটাও নিলাম। এই দুটো দেখব আর তোমায় মনে পড়বে।'

বলিয়া সে আমার আংটি ও হারটি তাহার মুখের কাছে তুলিয়া কয়েকবার চুম্বন করিল। বলিল, 'তোমার একটা তসবির পেলে ভাল হ'ত।'

কিছুদিন পূর্ব্বে ছবি একখানি তুলাইয়া ছিলাম। তাড়াতাড়ি আমার ডেস্ক্ খুলিয়া ফটোখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, 'তাও আছে।'

ছবিখানি হাতে লইয়া পার্ব্বতীর সে কি আনন্দ! ছবির মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় সে আমায় জড়াইয়া ধরিয়া আমার মুখেও একটি চুম্বন করিল। ইহাই তাহার প্রথম ও শেষ চুম্বন! অপূর্ব্ব পুলকে আমার সর্ব্বশরীর তখন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমার ছবিখানি পার্ব্বতী সযত্নে তাহার বুকের তলায় লুকাইয়া লইয়া আমার হাতে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'চলি। চিঠি দিও। আমিও চিঠি দিব।'

চোখের জল মুছিয়া আমিও ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'দেবো।'

তাহার পর সেও উপরে চলিয়া গেল, আমিও সেখান হইতে অন্যত্রে একটুখানি নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া বোধকরি কাঁদিবার জন্যই উঠিয়া গেলাম।

পরদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া শুনিলাম পার্ব্বতী রাত্রি-শেষের ট্রেণে আমাদের কর্ম্মচারীর সঙ্গে চলিয়া গেছে। ভাবিয়াছিলাম, যাইবার সময় দেখা হইবে, কিন্তু তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে এত বেশি রাত্রি জাগিয়াছিলাম যে, শেষরাত্রে কখন্ যে সে আমারই ঘরের দরজার সুমুখ দিয়া পার হইয়া গেছে কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

কাল রাত্রে যেখানে বসিয়া তাহার সহিত শেষ বিদায় লইয়াছি, আমার সেই পড়িবার টেবিলের কাছে গিয়া বসিলাম। মনে হইল, এখনও সে ট্রেণে চড়িয়া দার্জ্জিলিং-এর পথে চলিয়াছে। একাকিনী ট্রেণের জানালার ধারে বসিয়া সেও বোধ হয় আমারই কথা ভাবিতেছে, হয়ত সে আমার ছবিখানি অতি সন্তর্পণে বুকের তলা হইতে বাহির করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে!

তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিঠি লিখিবার জন্য কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলাম। কয়েকছত্র লিখিতেই মনে হইল, এ কি ছেলেমানুষী করিতেছি, এখনও সে ঠিকানায় গিয়া পৌঁছে নাই, এখন চিঠি আমি পাঠাইব কাহার কাছে? চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ওয়েষ্ট্ পেপার-বাস্কেটে ফেলিয়া দিতে গেলাম। এবং এই ফেলিয়া দিতে গিয়াই সেদিক্ পানে তাকাইয়া আমার মাথাটা 'চম্' করিয়া ঘুরিয়া গেল।

দেখিলাম। কি দেখিলাম সে কথা আর নাই বা বলিলাম।

ঘরে ঢুকিয়া ছোট একটি বিছানা-পাতা তক্তপোষের উপর অরিন্দম আমায় বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। একাকী ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া অরিন্দমের আসবাব-পত্র দেখিতে লাগিলাম। গলিটা নোংরা, বাড়ীখানও টিনের, কিন্তু ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস বেশ পরিপাটিভাবে সাজানো। দেখিয়া মনে হইল, হ্যাঁ, ভালোবাসা ইহাদের সার্থক হইয়াছে বটে। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে কেমন যেন প্রেমাস্পদের মমতামণ্ডিত একটি সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করিলাম।

পাশের ঘরে হঠাৎ কেমন যেন একটা ক্রুদ্ধ বাক্য বিনিময়ের শব্দে কান পাতিয়া শুনিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতে মনে হইল, অরিন্দম স্ত্রীকে তাহার আমার সুমুখে বাহির হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু স্ত্রী নারাজ !

কিয়ৎক্ষণ পরে অরিন্দম বিষণ্ণমুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহার কোলে একটি বছর তিনেকের শিশু।

বলিলাম, 'কিরে! ছেলে হয়েছে না কি ?'

'হ্যাঁ, দু'টি। একটি ছেলে একটি মেয়ে। সে কথা আর বলিস্ কেন, সেদিক দিয়ে ভাগ্যবান আমি।'

বলিলাম, 'নিশ্চয়ই। তোকে দেখে আমার হিংসে হয়।'

'বেশ ত', অবস্থাটা একবার পরিবর্ত্তন ক'রেই দ্যাখ না ভাই। দু'দিনে মরে যাবি,—সহ্য করতে পারবি না।'

যে শিশুপুত্রটিকে কোলে লইয়া অরিন্দম আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিলাম, ছেলেটি যতদূর কদাকার কুৎসিত হইতে হয় ততদূর। জিজ্ঞাসা করিলাম,'হ্যাঁরে, এই কি তোর সেই প্রণয়িনীর ছেলে ? যার কথা আগে তুই আমায় প্রায়ই বলতিস্ ?'

ঈষৎ হাসিয়া অরিন্দম বলিল 'কেন বল্ ত ?'

বলিলাম, 'সে ত' বলেছিলি পরমা সুন্দরী ?'

অরিন্দম এইবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'এখনও তোর সেকথা মনে আছে ?'

বলিলাম, 'আছে।'

অরিন্দম হাসিতে হাসিতে আমার বিছানার উপর বসিল, তাহার পর ছেলেটিকে তাহার মা'র কাছে রাখিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাহার প্রেমের কাহিনীর যে পরিণতটা আমাকে শুনাইল তাহা চমৎকার। শুনাইতে সে প্রথমে চায় নাই। কিন্তু আমার শুনিবার প্রয়োজন বলিয়াই অনেক পীড়াপীড়ির পর তাহাকে বলিতে হইয়াছে।

বলিল, 'আমাদের অত ভালোবাসা অত প্রেমের মাঝখানেও হঠাৎ শুনলাম একদিন নীহারের বিয়ে হয়ে গেছে। শুনলাম, বিয়ে করতে সে চায় নি ; বাপ-মা তাকে জোর করে' বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। বিয়ের সময় কলকাতায় আমি ছিলাম না, দিন-কয়েকের জন্যে রংপুর গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ী। ফিরে এসে শুনে ত' একেবারে অবাক্! অবস্থা হ'লো ঠিক পাগলের মত। মনে হ'লো, ওকে আমি ছিনিয়ে আনি! কিন্তু কাজে তা' যখন আর হ'য়ে উঠলো না, তখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা,—কবিতার খাতা নিয়ে বসলাম। কবিতা ত' আমি আগেও লিখতাম, তখন আবার বেশি করে' লিখতে আরম্ভ করলাম। দু'-চারটি তার ছাপাও হয়েছিল। কবিতাগুলি সবই সেই নীহারের উদ্দেশে লেখা—সেত' তুই বুঝতেই পারছিস্। চব্বিশঘণ্টা কবিতার খাতা থাকতো আমার বগলে, বাবা-মা সবাই তখন মারা গেছেন, কলকাতায় একটি মেসে থাকি, দুটো ছেলে পড়াই আর কবিতা লিখি। চমৎকার জীবন! মাথায় রাখলাম লম্বা লম্বা চুল, চোখে চশ্মা ত' আছেই, পায়ে ছেঁড়া চটি জুতো, গায়ে ছেঁড়া জামা! দেহে-

মনে সব রকমেই কবি হয়ে উঠ্‌লাম। গল্পটা যথাসম্ভব ছোট করে' বলছি কিছু মনে করিস না ভাই। শুনতে চাইলি তাই বলা, নইলে একথা কাউকে বলবার নয়। কিছুদিন পরে হঠাৎ এক বন্ধুর বাড়ীতে তার বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে নীহারের সঙ্গে দেখা। নীহার আর তার স্বামী— সুধীরবাবু, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বেশ মোটা-সোটা গোলগাল মানুষটি, মাথায় কপাল-জোড়া টাক্, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, গায়ের রং কিন্তু সাদা ধপ্‌ধপে। বড় ভাল মানুষ। নীহারের সঙ্গে ভেবেছিলাম, কথা বলব না, কিন্তু এত কাছে চোখোচোখি দেখা, কথা না ক'য়ে আর থাকতে পারলাম না। বললাম,—'চিনিতে পার নীহার?' সলজ্জ একটু মিষ্টি হাসি হেসে নীহার বললে, 'কেন পারব না? একি চেহারা হয়েছে তোমার?' সত্যি বলতে কি ভাই, কথাটা শুনে আমার চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে এসেছিল, তাড়াতাড়ি মুখ লুকিয়ে সেখান থেকে তখন আমি পালিয়ে বাঁচলাম। যাক্! নীহার তাহ'লে এখনও ভুলতে পারেনি। প্রাণে মনে এখনও সে আমাকেই চায়। চাইবে না? প্রেম ত' ভোল্‌বার নয়। রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে পড়লো—'ভুলে থাকা নয় সে ত' ভোলা! বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা!' যাক্, তারপর কি হ'লো শোন্!—পরের দিন নীহারের স্বামীর সঙ্গে আলাপ। আমার সেই বন্ধুটি বলে' দিলে— 'কবি অরিন্দম রায়। নাম শোনেন নি?' আমি ত' লজ্জায় মরে গেলাম। তারপর আমার কবিতা শোনাবার পালা। সেইদিনই রাত্রে নীহারের স্বামী সুধীরবাবু আমায় তাঁর দোতলার ঘরে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার নাম আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে শুনলাম, আপনার কবিতা শুনব, মুখস্ত থাকেত' দু'একটি বলুন, শুনি।' ভাবলাম, এই আমার উপযুক্ত সুযোগ। নীহার বলেছে আমার কবিতার কথা! যার উদ্দেশে লেখা আমার কবিতা, তাকেই আজ পাব আমার চোখের সুমুখে। খাতা বের ক'রে বললাম, 'ডাকুন নীহারকে। সেও শুনুক।' নীহার এসে' দরজার কাছে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। আমি শোনালাম আমার কবিতা—

—'তোমারই উদ্দেশে দেবী, বাণীর চরণ সেবি…'

ও সব কবিতা তুই আমার শুনিস্‌নি, না?'

বললাম, 'আর একদিন শুনব। আজ তোর গল্প শুনি, তারপর কি হ'লো বল্।'

'ভাবলাম, কবিতা শুনে নীহার হয়ত বুঝলো— কি ব্যথা আমি পেয়েছি এবং সে কা'র দেওয়া। কবিতা শোনানো শেষ হ'লে সুধীরবাবুকে বললাম, 'আর হয়ত' দেখা হবে না। চিঠিপত্র দেবেন।' সুধীরবাবু বললেন, 'বেশ, বেশ; আপনার ঠিকানাটি?' বুঝলাম, এ-কথাও নীহারের শিখিয়ে দেওয়া! দিলাম ঠিকানা লিখে। উদ্দেশ্য, যদি নীহারের একখানি চিঠি পাই। ভাবলাম, অনুতাপ করে' চিঠি হয়ত সে লিখতে পারে।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অরিন্দম থামিল। পাশের ঘরে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া কিসের যেন শব্দ হইতেছিল, অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ফিরিবার সময় তাহার দুই হাতে দুই পেয়ালা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল।

তাহার পর আবার কথা!

অরিন্দম বলিল, 'চিঠির আশায় ব'সে আছি, কখনও ভাবছি, চিঠি হয়ত' নাও পেতে পারি, কখনও ভাবছি, নিশ্চয়ই পাব। প্রায় দিন-দশেক্ পরে আমার মেসের দরজায় পিয়ন এসে দাঁড়ালো। উদ্‌গ্রীব হয়ে তার মুখের পানে তাকাতেই আমার নাম করে' সে একখানি মণিঅর্ডারের ফর্ম্ম আমার হাতের কাছে বাড়িয়ে দিলে। দেখলাম,

নীহারের স্বামী সুধীরবাবু আমায় পঁচিশটি টাকা পাঠিয়েছেন। কুপনে লিখেছেন—'আপনার কবিতাগুলি আমার মন্দ লাগেনি। আমার স্ত্রীর ধারণা, অর্থাভাবে কবিতাগুলি আপনি ছাপতে পারছেন না, তাই তাঁরই অনুরোধে আপনাকে আমি যৎসামান্য অর্থ সাহায্য পাঠালাম। গ্রহণ করলে বাধিত হব।' হায়, হায়, আশা করেছিলাম, নীহারের একখানি চিঠি,—তার সেই নিজের হাতের লেখা চিঠি!—'তুমি এসো। লুকিয়ে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব। তোমায় না দেখে আমি থাকতে পারব না। না এলে আমি মরে' যাব। তুমি এসো। তোমার সঙ্গে আমি পালিয়ে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু ছি, ছি, তার পরিবর্তে কি এলো বল্ ত! অর্থ সাহায্য! ছি, ছি,—কি নিষ্ঠুর পরিহাস! পিওনকে বললাম, মণিঅর্ডার তুমি ফিরে নিয়ে যাও, আমি নেবো না।'

বলিয়া অরিন্দম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

বলিল, 'তার পরেই আমি বিয়ে করলাম।'

এই ত' গেল অরিন্দমের প্রেমের ইতিহাস!

আন্দাজি কল্পনা করিয়া অরিন্দমের যে-গল্পটা আমি লিখিয়াছিলাম, সেটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার আমাকে নূতন করিয়া লিখিতে হইবে।

প্রেমের কাহিনী লিখিতে গিয়া নারীকে পাষাণী বলিয়াছি, তাহা হয়ত' প্রেমের ব্যাপারে সর্ব্বত্র সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে মিলাইতে গিয়া মিলনান্তক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিণতিটুকুকে যদি এমনি করিয়াই বারে-বারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, মন-গড়া গল্পের খাতাটিকে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া প্রতিবারেই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হয়, তবেই ত' মুস্কিল!

—যুগল লিপি—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ বি-এল

এক

ঠিক্ তেমনিটি আছে সুকুমার—কোমল, অধীর, আত্মহারা। সে নিজেকে হারিয়েছিল নিজেরই অধীরতার সেবায়। তিন বৎসর পরে দেখা। সে প্রথম পরিচয় দিল নিজের পদ-মর্য্যাদার।

"হাল্লো! ছুটি নিয়েছি, এখন আমি সব-ডিভিসানাল ম্যাজিষ্ট্রেট—কাঁদির চার্জ্জে।"

"বাঃ! কে পঞ্চম লাট! এস এস"—জবাব দিলাম তারই কথায়। সে বল্‌ত, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট চতুর্থ শাসন কর্ত্তা—বড়লাট, ছোটলাট, কমিশনর অবশ্য বড়, মেজো, সেজো, রাজ-প্রতিনিধি।

সে ব'ল্লে—"নিশ্চয়। আর তুমি তো বাবা ভাড়াটে গুণ্ডা—যে পয়সা দেবে, আইনের ঠ্যাঙ্গা গাড়াসা নিয়ে তার পিছনে ছুট্‌বে, তার শত্রুর মুণ্ড ভাঙ্‌তে।"

ওকালতির মত একটা উদার পেশার এমন একদেশ-দর্শী বর্ণনা কেবল তারই মুখে শোভা পায়, যার ধার-করা রাজশক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা আর পক্ষ-পাতিত্ব নিত্য বাধা পায় ব্যবহার-জীবির বিচক্ষণতা আর বহুদর্শীতার প্রাবল্যে। গোঁয়ারের হাতের লাঠি কিন্তু চোট টা মেরেছিল জবর। আমি প্রথম তাল্‌টা একটু সামলে নিয়ে বল্লাম—মহাত্মা গান্ধী আর আমরা সমব্যবসায়ী—লর্ড রিডিঙও—একটু ভেবে চিন্তে কথা বল।"

সে বল্লে—"আচ্ছা ট্রুস্। এখন বড় একটা রোমান্টিক গল্প নিয়ে এসেছি। সাহিত্যিকের কল্পনাকে হার মানায় বাস্তবিকতা। ভারি মজার দুখানা চিঠি হস্তগত হয়েছে—যা থেকে দুজন অপরিচিতের জীবনের প্রহেলিকার পর্দ্দা খুলে যায়।

পরের পত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে তাকে একটা ছোট্ট সারগর্ভ বক্তৃতা দিলাম বটে, কিন্তু নভেল-পড়া ধাত চাইছিল চিঠি দু'খানা পড়তে। যখন বুঝলাম চিঠির মালিকদের সঙ্গে জীবনে সাক্ষাৎ হ'বার কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন ছুতো-খোঁজা সৌজন্য-বুদ্ধি পেলে নিজেকে অনাহত ভাব্‌বার সুযোগ।

"আরে ভাই, বেটা নেপালী চাকর—স্বাধীন জাত কিনা, মেজাজ আর পছন্দও বিধি নিয়মের বাহিরে। পাঁচটা টাকা দিলাম হ্যারিসন রোড থেকে একটা পুরাণো ওভার-কোট্ কিনে আনবার জন্যে। ছোঁড়া কিনে আন্‌লে এক ডাহা লেডিস্ ওভার-কোট—কিন্তু বেশ ভাল 'সার্জ্জের', দু'হাতে আর গলায় ভেলভেট দেওয়া। যত বলি মেয়েদের জামা, তত বলে রাম্‌রু ছে। শেষে পরিবার বল্লেন—থাক্ আমি সেলাই খুলে বদ্‌লে দব এখন।"

অতঃপর পাঁচোয়া লাট-পত্নীর কোট-পরিবর্ত্তন প্রচেষ্টার ফলে বন্ধুর হস্তগত হ'য়েছিল চিঠি-দুখানা। তারা ছেঁড়া পকেটের ফাঁকে ফাঁকে লাইনিঙের মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করে বসে ছিল প্রায় আঠারো মাস।

অধিক বাক্যব্যয় না ক'রে প্রথম পত্রখানা পড়লাম।

দুই

প্রথম লিপির মর্ম্মানুবাদ।

এথেল

যদি সমাধি-মন্দির ভেদ করে সেণ্টপল বা তেমন কোনো ঋষি এসে সাক্ষ্য দিতেন যে আমার এথেল বিশ্বাসের পাত্রী নয়—তা হ'লে সে সাক্ষ্য-বাক্য আমি বিদ্রূপের হাসিতে সমাধিস্থ করতাম। নিজের চোখের সাক্ষ্য কিন্তু উপেক্ষা কর্ব্ব কেমন ক'রে? কত তিরস্কার করেছিলাম আঁখিকে যখন সে দেখালে সেই দৃশ্য—ওঃ কেমন ক'রে সে দৃশ্য বর্ণনা করব ভগবন্। এথেলের মত সুন্দর-শ্রী লাবণ্যময়ী পৃথিবীতে না থাকাই সম্ভব। সে রকম প্রাণ হয়তো বিশ্ববিধাতা ডজন ডজন গড়েন না, প্রতি দেশে, প্রতি যুগে। কিন্তু পিছন থেকে দেখ্‌তে তার মত গড়ন, তার মত চলন লণ্ডনের ঘরে ঘরে থাকলেই বা আপত্তি কি? আর সেই কোট্—ইষ্ট এণ্ডে হাজার হাজার তৈরী হয় তেমন কোট, মাসের মধ্যে। ওরকম টুপীরও তো অভাব ছিল না বিশ্বে। সেগুলা তো বাহিরের খোলস—প্রকৃত এথেল তো ছিল তেমন পোষাক, তেমন গড়নের অন্তরে। সেই এথেল ছিল দেবী—কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি,—প্রেমময়ী নিজস্ব এথেল আমার।

প্রথমে ভেবেছিলাম সাধারণ জঘন্য উৎসুক্য বৃত্তির কাছে পরাজিত হবনা—আমি—জেম্‌স্ ডিউড্রপ—যে ইংলণ্ডের অন্ততঃ পাঁচটা লর্ড বংশের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধে বাঁধা। আমার কেম্ব্রিজের শিক্ষা আর সুষ্ঠু সমাজের নীতি দেখিয়ে দিলে আমার কর্ত্তব্যের পথ। কিন্তু প্রেমের বন্যার কি ভীষণ স্রোত—সে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—সকল শিক্ষা, সকল সাধনা, বংশ-গৌরব আর নিজের কৃতিত্ব—বিশেষ যেখানে সে ভাবে, তার মর্য্যাদা আহত। সংশয় প্রেমের একটা উপকরণ নিঃসন্দেহ। তাকে দমন করে ভদ্রতা আর সুশিক্ষা। বর্ব্বর প্রেমিকের সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বী-হত্যা নিত্য-নৈমিত্তিক। সভ্য য়ুরোপ এবিষয়ে উদার—পরিণীতা বধূকে অন্যের অঙ্কশায়িনী দেখলেও সভ্য নরের মন সেভাবে উত্তেজিত হয় না, উদ্বেলিত হয় না। কিন্তু তাব'লে মুহূর্ত্তের জন্যেও ভেবোনা এথেল, যে ঈর্ষার স্থান নেই তার উদার সংযত মনে। প্রেম যেখানে গভীর সেইখানেই সৃষ্টি হয় বিভীষিকা—হারাই-হারাই-ভাব।

কি জানি কোন্ কুহকের বশবর্ত্তী হ'য়ে দেখতে গেলাম তাকে, যে আমার এথেলের মত চল্‌ছিল—তারই মত বিভূষিতা হ'য়ে, তারই মত টুপিতে হয়তো তারই মত চুলের কনক-কান্তি লুকিয়ে। একটু এগিয়ে গেলাম—ঘুরে অপর দিক্ দিয়ে। তোমরা এলে আলোর সামনে।

এক ঘোর অবিশ্বাস এসে আত্মহারা কর্‌লে আমায়। সংসার মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, যীশুর শিক্ষা অলীক। সকল মর্য্যাদা, সব সম্ভ্রান্ততা, সব পবিত্রতা—যাদের ভাণ করে বিশ্ব সংসার, যাদের প্রতীক ব'লে সভ্য য়ুরোপ তার সমাজকে প্রাচ্যের সম্মুখে সগর্ব্বে রাঙিয়ে তোলে—তারা মিথ্যা, অলীক, অন্তঃসার-শূন্য। পৃথিবীর প্রথম সহরের গগন স্পর্শী ইমারাত গুলা বুকের মধ্যে পোষণ করে জমাট-বাঁধা অসত্য। তাদের ভিত্তিতে আছে ভণ্ডামী, তাদের অন্তঃস্থলে আছে বিশ্বাস-ঘাতকতা। চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল নর-নারী রূপে নৃশংস-বর্ব্বরতা—পায়ে হেঁটে, ট্যাক্সি চোড়ে, রোল্‌স্-রয়েসে ব'সে—সার্জ্জ কাশ্মেয়ার, রেশম-পশমের আবরণে আত্ম-গোপন ক'রে। হাঃ ভগবন্,- তুমি যদি সত্য, তুমি যদি ন্যায় তবে এমন অসত্য, অন্যায় বিশ্ব কেন সৃজন করেছিলে প্রভু। তোমার পুত্র করেছিলেন প্রায়শ্চিত্ত নিজের রক্তে, অভিশপ্ত মানবের মুক্তির উচ্চাশায়। ক্ষমা কর প্রভু! যুগে যুগে শত শত নরদেহ ধারণ ক'রে পবিত্র শোণিতের স্রোত বহালেও

পারবেন না তিনি, বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক-রেখা মুছে ফেল্‌তে, বিশ্বের ললাট থেকে।

মাত্র একবার তো নয় এথেল শতবার দেখলাম--তোমার মুখ। সে মুখের প্রতি ছত্রের যে ছায়াচিত্র আজো আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে। তেমনি সুখের নির্ভরতায় তুমি চলেছিলে তা'পরে ভর দিয়ে, যে নির্ভরতা, আমি জানতাম, মাত্র আমি তোমার হৃদয়ে জাগিয়ে তুল্‌তে সক্ষম। সেই অমায়িক হাসি, সেই মনোহর লাবণ্য, সেই প্রাণ-জুড়ানো সরলতা।

অন্ধ--প্রেমের দেবতা কিউপিড্। সে বাছেনা পাত্র পাত্রী। সমানে সমানে মেলাবার কোনো আকাঙ্ক্ষা রাখে না সে তার দেব-অন্তঃকরণে। গৌন যৌন-ভাব প্রকৃতির নিয়মে ইতর জীবকে অনুপ্রাণিত করে, এ বিশ্বাস জীবতাত্ত্বিকের। সেই বিধিরই অনুকরণে যুবা-পুরুষ অঙ্গ-বিন্যাস করে ললনার মন হরণ করবার আবেশে। তার এই দুর্ব্বলতার উপর বাণিজ্য করে শত শত দরজী আর নাপিত, বিলাসিতার সামগ্রী স্রষ্টা অসংখ্য শিল্পী। যার নয়ন-রঞ্জনের দুরাশা নিয়ে পুরুষের এত আয়োজন, সেই ললনা চায় নূতনত্বের উত্তেজনা, অসাধারণ, অর্থহীন, বে-খাপ্পাকে আপনার করতে। তাই কুৎসিৎ, দুর্নীতি-পরায়ণ, বিকলাঙ্গের আদর মহিলার কাছে। পণ্ডিত চায় না সে, সুপুরুষকে সে ঈর্ষা করে, শান্ত-শিষ্ট-শিক্ষিতকে দেখে তার হাসি পায়। তার প্রাণে প্রেমের উন্মাদনা আনে সার্কাসের ক্লাউন, মোটর গাড়ীর সারথি, পুলিস কোর্টের বীর, সিনেমার ছাত-লাফানো শিল্পী। সামাজিক নীতি-সম্মত নির্ভুল বেশ-ভূষা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু তার মনকে আকর্ষণ করে বাঁকা টুপি, ভদ্র-সমাজের বিধি-বিরুদ্ধ কাপড়।

সত্য, এথেল, যার বাহুর 'পরে ভর দিয়ে তুমি চলেছিলে—তার চাল-চলন পোষাক-পরিচ্ছদ কেবল নিম্ন শ্রেণীর নয়—সেগুলা ক্ষমা করো, চোরের। দরিদ্রের বেশ-ভূষা দীন বটে কিন্তু সে দীনতা উৎপন্ন করে শ্রদ্ধা। অনেকদিন জেলে বাস না করলে চাল চলন হয় না—তোমার সে রাত্রের গুপ্ত সহচরের চাল চলনের অনুরূপ; সাদা এংগ্লো স্যাক্সান জাতের অমন লাল রং হয় না চামড়ার। ডিউড্রপ বংশের ভবিষ্যত গৃহকর্ত্রীর উপযুক্ত সহচর। ও ভগবন্।

তোমার সেই নৈশ বিলাস দেখে উত্তর পেলাম অনেকগুলা সমস্যার! অনেক রহস্য আত্মপ্রকাশ করলে। বুঝ্‌লাম তোমার হীরের ব্রোচ্, মাণিকের আংটি, সোণার এনামেল-করা সিগারেট-কেশ কোন্ পথে গিয়েছিল। আমি কত স্নেহে তোমার উদাসীন ভাবগুলাকে দেখতাম—ভাবতাম এথেল আত্মহারা, সে তুচ্ছ হীরামুক্তার তোয়াক্কা রাখে না। চায় অনাবিল প্রেম, চায় আমায়, চায় আমার স্নেহের নদীতে ভেসে যেতে। আমার দেওয়া উপহারগুলা যোগাচ্ছিল আমার নীচ প্রতিদ্বন্দ্বীর সস্তার হুইস্কি ব্রাণ্ডির দাম—এ কথা কতখানি ঘৃণার সঙ্গে ভেবেছি বল দেখি। ছিঃ ছিঃ—ঘৃণা তোমার নির্ব্বাচন শক্তিকে করি না এথেল, ঘৃণা করছি নিজের অবিমৃষ্যকারিতাকে।

শেষ কথা বলি। তোমার মত সুন্দরী ওরকম পশুকে বাঁধতে পারে না—এ নিয়ম প্রকৃতির। ওর আবার নিশ্চয় মনের মতো একটা প্রণয়িনী আছে—সে সপ্তম-শ্রেণীর হোটেলের দাসী বা সরাবের দোকানের মাতাল খানসামার স্ত্রী। যে দিন তাকে দেখবে তোমার জানোয়ারের সঙ্গে জুতা মারামারি কামড়া কামড়ি ক'রে প্রেম করতে, সেদিন বুঝ্‌বে আমার আজকের অনুভূতি।

চিঠির উত্তর দেবার চেষ্টা ক'র না, সাক্ষাৎ করবার প্রয়াস পেয়োনা। যদি কোনো দিন বিপদে পড়, সাহায্য চাহিতে দ্বিধা ক'রনা।

জেম্‌স্ ডিউড্রপ।

তিন

পত্রপাঠ ক'রে বিস্মিত হ'লাম না। এমন ঘটনাতো জগতে নিত্য ঘটে—বিশেষ সেই দেশে যেখানে স্ত্রী পুরুষের মিলন অবাধ। বন্ধু সুকুমার কিন্তু নানা কথা ব'ল্লে। সে বল্লে চোর বদমায়েসের অন্ন খেয়ে তোমাদের কোমল বৃত্তির ওপর মর্ম্মরি পড়ে গেছে।

আমি বল্লাম পঞ্চম জর্জ্জের অন্নপুষ্ট পাঁচোয়া লাটদের যে ও বৃত্তিটা কোনোদিন আছে ব'লে, জানিনা। যাক্ আপোষে ঝগড়া না করে দ্বিতীয় পত্রখানা পড়া যাক্।

দ্বিতীয় পত্র এথেলের। সে লিখে রেখেছিল জবাব—শেষে বোধহয় পাঠাবার সাহস পায়নি ডিউড্রপ্‌কে। ডেপুটি হাকিম বল্লে—"কোটের পকেটে নিশ্চয় রেখেছিল। চোরা বেটা কোটটা চুরি করে বাঁধা দিয়ে বীয়ার খেয়েছিল। য়িহুদী উত্তমর্ণ সেটাকে লাটে বেচে দিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে কোট এসে পৌছায় হ্যারিসন রোড, পরে জিৎ বাহাদুরের অঙ্গে।

চার

দ্বিতীয় লিপির মর্ম্মানুবাদ।

জ্যাক্

জ্যাক্, জ্যাক্, এমন নিছক নিষ্ঠুর চিঠি লিখলে কেমন ক'রে? জানি তোমার ডিউড্রপ বংশের মর্য্যাদা, জানি তোমার কেম্‌ব্রিজের শিক্ষা—তোমার সুষ্ঠু উদার প্রকৃতি। সেই শিক্ষা-সাধনা নিয়েই তো পথের ধূলা থেকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়েছিলে শ্রমিক বুভুক্ষুকে। তোমার প্রতি পদবিক্ষেপ জানিয়ে দিত তোমার বংশ-গরিমা, প্রতি শব্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'র্ত্ত তোমার সুশিক্ষা ও জ্ঞান। আমি দোকানের দাসী, সন্ত্রস্ত—ভীত, সশ্রদ্ধ হ'য়ে তামিল কর্ত্তাম তোমার হুকুম। দীনের আকাঙ্ক্ষা হীন—এ শিক্ষা তোমায় কে দিলে জ্যাক্। অন্ততঃ দীনের আকাঙ্ক্ষা তার নিজেরই কাছে প্রতিভাত হ'ল হাস্যাস্পদ, যখন এই দোকানদার-বালিকার মন অক্টোপাসের মত সুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলে গোপনে তাকে, যে তার নিজের গৌরবে, উচ্চতার শিখরে বাস কর্ত্ত। তারপর এই পথের ধারের পিম্পার্ণেল্‌কে গোলাপের আদরে, কি স্নেহে বিলাস-প্রাসাদের ফুল-দানে সাজিয়ে ছিলে সে গল্প তো জান অতি-প্রিয়।

আচার-গর্ব্ব কেন তোমায় জান্‌তে দেয়নি আমার বংশ পরিচয়? একদিন আমি প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছিলাম—আমি পাড়াগেঁয়ে গরীব পাদরীর মেয়ে—তুমি হেসেছিলে জ্যাক্। শ্লাঘার সঙ্গে বলেছিলে—আমি ডিউকের মেয়ে কি সবজী-ওয়ালার মেয়ে সে সংবাদ তোমার পক্ষে নিরর্থক। তখন যদি সকল কথা শুনতে, প্রিয়,—

হ্যাঁ যার সঙ্গে আমায় দেখেছিলে সে চোর—যৌবন হ'তে সে গৃহ-ছাড়া—ঘোড়দৌড়ের মাঠে হ'য়েছিল তার শিক্ষা। সে কখনও আমীর হ'ত ক'নও হ'ত ফকীর - ঘোড়ার বেগ শাসন কর্ত্ত তার ভাগ্যের জোয়ার-ভাটা। সে তিন বৎসর পূর্ব্বে তোমারি গাড়ি থেকে চুরি করেছিল তোমার সুটকেশ। তাকে পুলিশকোর্টে নিশ্চয় দেখেছ। ঠিক বলেছ প্রিয়তম সে পুলিস কোর্টের বীর—তবে বাকী অনুমানগুলা অমূলক, নিদারুণ। সে জেল থেকে এসে খবর পেলে তুমি আমায় কণ্ঠহার করেছ—আমার ভাগ্যে আছে তোমার নাম গ্রহণ। সম্বন্ধ প্রকাশ করবার ভয় দেখিয়ে সে আমার নিকট অর্থশোষণ কর্ত্তে লাগলো। তোমার বুক ভেঙ্গে যাবে, তোমার বংশ মর্য্যাদা আহত হবে সেই ভয়ে তাকে এ তিন মাস অনেক অর্থ দিয়েছি—হ্যাঁ দিয়েছি ব্রোচ, দিয়েছি আংটি, সিগারেট-কেশ। রহস্যটা কি জান, জ্যাক? মিকি কিং—সেই জানোয়ার—আমার সহোদর।

ভেবেছিলাম তোমার নিষেধ মানবো—উত্তর

দিব না। মনের আবেগে সত্য কথা লিখলাম। যদি প্রাণ রাখি এ পত্র পাঠাবো না তোমায়। যদি আত্মঘাতিনী হই—এ পত্র তুমি পাবে। আমার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না জ্যাক—এক ফোঁটা!

এথেল।

পাঁচ

মনের একটা বোঝা নামল—এথেল জীবিতা। সুকুমারের ও সেই মত।

কিন্তু এথেল—জ্যাকের আলোচনায় বাধা দিলে ব্যাঙ্কের গ্রোট্ সাহেব যখন সে মোকদ্দমার কাগজ বোঝাতে এলো। তখনও সেই চিঠি দুখানা আমার হাতে ছিল। তাকে বল্লাম—মিঃ গ্রোট্ তোমাদের দেশের এক প্রণয়ীযুগলের পত্র!

ডিউ-ড্রপের স্বাক্ষর দেখে সে বিস্মিত হ'ল। সে শিস দিয়ে বল্লে—হ্যালো—ডিউড্রপ। জ্যাক আমার বাল্য-বন্ধু পাবলিক স্কুলের সহপাঠী। সে আছে কলিকাতায় দেড় বৎসর।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলাম। সে চিঠি দুখানা পড়ে শিহরে উঠলো—অনুমতি নিলনা, কোনা কথা কহিল না—ছুট্লো।

দ্বিতীয় দিন গ্রোট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে, ডিউড্রপের পক্ষ হ'তে কৃতজ্ঞতা জানালে। বল্লে—ডিউড্রপ্ আজই এয়ার-মেলে বিলাত যাবে। টেলিগ্রাফের উত্তর এসেছে।

"তা' হলে' এথেল জীবিত।"

"হ্যাঁ! কিন্তু দেড় বৎসর আছে সে পাগলা গারদে।"

অপরিচিতা প্রেম-পাগলিনীর উদ্দেশে আমার চোখ হ'তে দু'ফোঁটা জল পড়্‌ল।

—পিতা—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

শীতের সকাল—ছয়টা।

বাঁশী বাজল পোঁ·· পোঁ···পোঁ··পোঁ...ভোঁ··· তিন মিনিট। ঘুম ভাঙ্গতেই রহমন শুনতে পেল,—ছেলেটা খুব কাঁদছে। কয়লা-খাদের ধাওড়া। কাইমেরার নিঃশ্বাসের মত পঙ্কিল ধোঁয়া, দিনরাত সেই জীবজগতের মানুষ, কুকুর-বেড়াল যত রকমের প্রাণী আছে, সবগুলোকে তাল পাকিয়ে যেন একই মাপের বস্তুপিণ্ডে পরিণত করবার জন্য, হুস্ হাস্ ক'রে এদিক-ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। গত রাত্রে হয়ত চোলাই করা মদের জোয়ারটা একটু বেশী মাত্রাতেই চলেছিল, তাই তার অবসাদ-মুহ্য বিষাক্ত ফেনা রহমনের চোখ দুটোকে আজ সকালে এমনি পাঞ্জাচেপে আটকে ধরেছে যে, বেচারা অনেক টানাটানি ক'রেও পর্দ্দাদুটোকে আল্‌গা করে নিতে পারছে না। চোখ বুজেই সে সর্দ্দি চাপা গলাতে ডাকল—"লখিয়া, আরে লখিয়া, দেখত শালা বিড়াল বাচ্চাটা কাঁদছে কেন।" লখিয়ার কোনই উত্তর নাই। তখন সে তার বাদুড়ের পায়ের মত কাল কাল চেপ্‌টা আঙুল-গুলো দিয়ে চোখ দুটোকে ভাল ক'রে রগ্‌ড়ে নিয়ে এদিক-ওদিক, চারিদিকে চেয়ে দেখল—লখিয়া নাই! কেমন একটা অস্বস্তিতে তার মনটা ভরে উঠল। পরক্ষণেই সে ভাবল, হয়ত লখিয়া হাত-পা ধুতে গিয়েছে। পাশেই একটা কালো কিসের নেকড়া পড়েছিল। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সে সেটাকে পট্ করে উঠিয়ে নিয়েই, সেই সাতমাসের শিশুটির মুখের উপর একটু চাপা দিয়ে দিল, যেন সে আর না কাঁদে। ঘুমন্ত কুকুর উঠবার আগে, মাঝে মাঝে যেমন দু' একবার টান হয়ে নেয়, তার-পর দাঁড়িয়ে উঠেই বারকয়েক কান-মাথা ঝাড়ার পর চলতে থাকে, রহমনও তেমনি সোজা হয়ে দু'-চারবার এপাশ-ওপাশ করার পর খাটিয়া থেকে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কি যেন বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় যেতে যেতে সে ভাবছে—জুয়াতে কাল ত সাতাশ টাকা জিতেছি; কিছুদিন ত ফুর্ত্তি চালান যাক। তারপর আবার কাজে যাওয়া যাবে। এক হপ্তা ত কিছুতেই যাচ্ছি না। ডাক্তারবাবুকে আটগণ্ডা পয়সা ধরিয়ে দিলেই অখুনি একটা মিডিকাল টাট্টু ফিটিং পাওয়া যাবে—কিসের পরোয়া! কিন্তু বেইমান লখিয়াটা গেল কোথায়! হঠাৎ তার মাথার মধ্যে যেন কি একটা ঝাঁ ক'রে খেলে গেল। আধা রাস্তা হতেই সে আবার ধাওড়ার দিকে ফিরল। ঘরে ঢুকেই তাকের উপর হাত দিয়ে দেখে—টাকার থলিয়াটা নাই। দড়ি দিয়ে বাঁধা ঝুল-ময়লাতে ভর্ত্তি সেই ঝোলা বাতাটার উপর, লখিয়া যেখানে তার সেই মেহেদি রঙের ঝুটা আলপাকার সাড়িটা রাখত, সেটিও নাই।

ইঁদুরের মত সে সেই কয়লা-গুঁড়ো, আর ধোঁয়ায়-নেপা ঘরটির সবদিক তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এইমাত্র জানতে পারল—লখিয়ার পিয়ারের যা'-কিছু, বাজু, পৈঁচি, সব উধাও। রহমনের মনের ভিতর গত রাত্রের ঘোলাটে আকাশ, নূতন আলোর তীর-বেঁধান স্পর্শে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল—লখিয়া পালিয়েছে! কিন্তু কার সঙ্গে? সেই সাওঁতাল ছোঁড়াটা কি-যে কাল রাত্রেও

লখিয়ার গানের সঙ্গে বাঁশী বাজিয়েছে! উঁ···হুঁ ···! লখিয়া ওকে পিয়ার করে বটে, কিন্তু সে অন্য রকমের। এ কি তবে বেইমান আলিজানের কাজ? বাচ্চাটাকে আদর করার ছুতা ক'রে শালা হামেসা ঘরের মধ্যে ঢুকে ওই চৌপায়াটার ওপর বসে' খালি পা দোলাত, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুনিয়ার বাত্‌চিত্ আর হাস তামাসা। যদি দু'-একদিন ওর আসতে দেরী হয়ে যেত, লক্ষ্য করেছি,—লখিয়ার সে কি ছট্‌ফটানি! মাঝে মাঝে কেমন একটা চমক্ মনের উপর চোট্ মেরেছে বটে—কিন্তু ওদের খোলা-হাসি আর সাফা ধরণধারণ দেখে আমার মত পাকা বদমাইসের মনেও অন্য কিছু একটা জমাট বেঁধে দাঁড়াতে পারে নি। যদি নিশানা পেয়ে যাই, দু'জনাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

তারপর সে মনে-মনেই খুব একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে বলে উঠল—"আরে, যেতে দে! মাগী জাহান্নমে গেলেও রহমন তার কোনই তোয়াক্কা রাখে না!" এই বলে' সে মাথায় হাত দিয়ে খাটিয়ার উপর কিছুক্ষণ ঝিম্ হয়ে বসে' পড়ল। তারপর খুব একগাল হাসি নিয়ে হো হো করে হেসে উঠে আপনা-আপনি বিড়্-বিড়্ ক'রে বলে উঠল—"আচ্ছা, জোর চাপ্পড় মেরেছে কিন্তু! হা···হা···হা···হা!"

রহমন শিশুটির দিকে ফিরে চাইল। যেন একটু অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল—"এই ছুঁচোর বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি কি করব। মাগী কোথায় আছে শুধু এইটুকু যদি জানতে পারতাম, তার দোর-গোড়াতে এটাকে বসিয়ে দিয়ে এই কথাটি খালি বলে' আসতাম—"আরে, একে ত লে, এটা তোর।"

হঠাৎ তার মাথার ভেতর দিয়ে কেমন একটা বিষাক্ত চিন্তার মেঘ পাতলা হয়ে উড়ে গেল। তার চাপা নিঃশ্বাসে রহমনের মুখ ছায়ের মত বিবর্ণ হয়ে উঠল। সে তার উপরের ঠোঁটখানাকে শক্ত ক'রে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল—হাতটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে! বিড়ালের মত নিঃশব্দে সে শিশুটির দিকে এগিয়ে এলো। দু'-পাশ ছেঁড়া কম্বলের ময়লা টুকরাটাকে সে ওই বাচ্চার গায়ের উপর থেকে পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দেখে—শিশুটি তার কচি কচি পদ্মহাত দু'টিকে মুখের ভেতর গুঁজে নিয়ে, নিমেষ আনন্দে পান করছে, আর সামনের ওই অস্পষ্ট শূন্যতার ভেতর মাণিকের মত উজ্জ্বল চোখ দু'টিকে বসিয়ে দিয়ে—কি সুন্দর হাসিই না হাসছে!

রহমনের সমস্ত শরীর যেন শির্‌শির্ ক'রে উঠল। শিশুটির ওই মুখের টান্ ছাঁচ ডৌল প্রত্যেকটি যেন আর একজন কা'কে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে না! সে যেন রহমনের অতি নিকটের, অতি আপনার—এ ত সেই একটি মাত্র লোক, যে আজ আট্ বছর হ'ল তাকে এই নরক-দুনিয়ায় একলা ফেলে দিয়ে কোথায় নিবে গেল!—জুয়াড়ী রহমন তার কথা আজও মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় ওই গাব্‌তলাটার শানের উপর বসে' বসে ভাবে, আর তার ওই কঠিন চোখের পর্দ্দা ছিঁড়ে কোথা থেকে টস্‌টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে!

শিশুটির দিক্ হ'তে সে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোমরের কাপড়টাকে একটু শক্ত ক'রে কসে নিল। তারপর ঘরের শিকলটাকে টেনে দিয়ে কেমন যেন একটা লক্ষ্যবিহীন হয়ে রাস্তার উপর বেরিয়ে পড়ল। চলেই চলেছে, ঠিকানা নাই! মনটা যেন এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাচ্ছে। শিশুটির চীৎকার তার কাণের পর্দ্দার উপর ঘন ঘন চাবুক চালাতে লাগল—তার ওই অর্থহীন অস্ফুট ক্রন্দন যেন ভূতের মত তার সঙ্গে সঙ্গে পা জড়িয়ে জড়িয়ে চলেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—ওই যে খোকা, সে তার ছোট্ট ছোট্ট পা দু'টিকে নিয়ে আছড়াচ্ছে, আর গলাফাটানো

তার-স্বরে চীৎকার ক'রে কাঁদছে…! না, আর কিছুতেই এগিয়ে যাওয়া চলে না! ..ফিরতেই হ'ল! সহসা সে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, —আমি যদি ওকে এখন ধ'তে পারতাম, একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলতাম—এমনি টিপতাম…উঃ…রাক্ষুসির নরকেও স্থান হবে না!

সে এক পাঁউরুটির দোকানে ঢুকে একটা রুটি নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। শিশুট পূর্ব্বের মতই শুয়ে আছে - গায়ে চাদর নাই, কিন্তু হাসছে। শয়তান ছেলেটা কি পাজী! বেটা বেশ ফূর্ত্তিতে আছে দেখছি।

আবার সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বেশী দুর এগিয়ে যেতে পারল না। সব সময়েই মনে হ'তে লাগল,—যেন খোকা কাঁদছে—ইস, কি চীৎকার ক'রেই না সে কাঁদছে! তার মনের ভিতর ইস্পাতের একটা ধারাল ছুরি চালাতে লাগল।

এইবার সে লোহার মত শক্ত ক'রে ঘুসি পাকিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরল। দরজার বা'র হতেই শুনতে পেল সে কি ভয়ানক চীৎকার "মা - মা—মা—ম্মা!"

"তোর মা ?…হুঁ…কুত্তার বাচ্চা! তোর মা…যা' না বেরিয়ে যা'…দেখ্ কোথায় তোর মা।"

"মা · মা…মা · ম্মা!"

"ছু চোর বাচ্চা, তোর মার ওলাওঠা হয়েছে! তোর মা মরেছে!"

রহমন খোকাকে বুকের উপর উঠিয়ে নিল। সে তার ঘাড়ের উপর খোকার মুখটিকে আস্তে ক'রে রেখে, পিঠের উপর হাত বুলিয়ে আবল-তাবল নানা রকম বলে' খোকাকে ভুলাতে লাগল। শিশুটি তার সেই টুকটুকে ঠোঁট দু'খান দিয়ে পিতার মুখে, গলায়, কাঁধে কি যেন অতি ব্যাকুলভাবে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

ফুলের মত আলগা ক'রে রহমন খোকাকে কখনও বুকের ভিতর, কখনও ঘাড়ের উপর নাচিয়ে আদর দিতে লাগল—আর তার মায়ের উদ্দেশ্যে অজস্র অকথা কুকথা বলতে লাগল।

"বাবা, কাঁদিস না চুপ কর…তোকে হাত জোড় করছি…বাবা, চুপ কর!"

খোকা তার পাতলা ঠোঁট দু'খানি দিয়ে কেবলি কি খোঁজে, আর কচি কচি হাত দু'টিকে দুলয়ে দুলিয়ে, মাথা নেড়ে যেন কি বলবে বলবে,—এই রকম ভাব দেখাতে লাগল। সে তাকে আরও বুকের মাঝে টেনে নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তাকাতে লাগল যদি কোথাও একটু দুধ পাওয়া যায়। সে দেখল তাকের উপর একটা বাটিতে একটুখানি পড়ে আছে। রুটি-খানার খানিকটা সে তাতে ডুবিয়ে নিয়ে ছোট্ট একটি চামচে দিয়ে খোকাকে খাওয়াতে লাগল; আর খুব আস্তে আস্তে খোকার সঙ্গে গল্প করতে লাগল—"যাদু আমার, লক্ষ্মী আমার…খাও… তোর মা শয়তানী…নরকেও তার যায়গা হবে না…তোকে ছেড়ে পালিয়েছে…একটা কুকুরও তাদের বাচ্চাকে ছেড়ে যায় না। সে কুকুরের চেয়েও অধম কেঁদ না বাবা…না…না…আমি তোকে আর কিছুতে ছেড়ে যাব না… ইসাক ক'রে বলছি…কিছুতে না!…" খোকা যখন চুপ করল, সে তখন তাকে একটা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে 'ধাওড়া'র অন্যান্য ঘরের দিকে চললো। পড়সী কুলি-কামিনরা এই দৃশ্য দেখে ত অবাক! "আরে, রহমনের ঘাড়ের ওপর কেমন একটা নাদুস নুদুস্ সুন্দর চক্‌চকে ছেলে!" ছেলে মেয়ে চারিদিক হ'তে ভিড় ক'রে এলো। নাথুনের বৌ মনিয়া ত ঝাঁট-পাট সব ফেলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে রহমনের বুকের কাছে দুই হাত বাড়িয়ে দিল। "বাঃ…বাঃ…কি সুন্দর ছেলে! দেখি…দেখি…দেখি একবার"

দুষ্টু খোকা রহমনের কোল হ'তে একরকম

ঝাঁপিয়ে মনিয়ার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর সেই একরকম অস্পষ্ট মধুর শব্দে তাকে কত কি যে···হুঁ...হাঁ···ক'রে বলতে লাগল।

রহমনের ওই পাষাণ আঁখির মণিকোঠার কোণে কোণে বাদলা-মেঘের ছায়াবাজী খেলে উঠল। মনিয়া তাকে শক্ত ক'রে বুকের ভেতর চেপে ধরে' খোকার সেই খোদাই করা সুডোল চিবুকটি একটুখানি উঠিয়ে নিয়ে তার পাপড়ি-পাতলা ঠোঁটের পাশে পাশে দশ-বারোটা সবেগ চুমোর ছাপ পর পর বসিয়ে দিল।...খোকা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

"জিজাজী···কি সুন্দর খোকা হয়েছে···দেখ ত। আমি কতদিন দেখি নাই···দেখতে ঠিক খানিকটা তোমার মত, আর নচের মুখের ভাবটা অনেকটা লখিয়ার মত··না? দেখ···দেখ··ঠোঁট দু'খানি ···আর চিবুকের এই টোলটাও একেবারে না?···বাঃ .বাঃ...কি সুন্দর ছেলে!...আমাকে দিয়ে দাও।" এই বলে' সে খোকাকে বুক ঠাসা ক'রে রেখেই দোল দিতে লাগল। আর খোকার কাণ্ড দেখে·ছটফটানি মৎলব বুঝতে পেরে·· প্রথম প্রথম দু'-একবার তার চোখের ভিতর বিজলী খেলে গেল।···তারপর সে রহমনের দিকে পিছন ফিরে বুকের কাঁচুলিটা আলগা ক'রে দিয়ে তার ওই সুপুষ্ট গানের চাপা খোকার মাথার উপর ধীরে ধীরে ছুঁইয়ে দিতে দিতে কত রকমই না ভাবতে লাগল!

রহমন মনিয়ার দিক হ'তে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নাথনির সঙ্গে সজল গলায় কথা আরম্ভ করল। নাথনি বলতে লাগল—"চমৎকার ছেলে হয়েছে·বাপের নাম রাখতে পারবে। ওর মা কোথায়?"

"ওর মাকে আজ কবর দিয়ে এসেছি।" নাথনি অবাক হয়ে চেয়ে রইল। "মাগী টাকা-কড়ি বেবাক নিয়ে পালিয়েছে।" "আরে, এই বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে··?" "হাঁ।"

"ই···খুব খারাপ ত··খুবই খারাপ, ব্যাড আছে।"

ওদিক হতে নাথনির শালা বেরিয়ে এসে একটু যেন উপহাস ক'রেই বলল—"এইবার তা' হ'লে রহমন দাদকে কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ধাই হয়ে ছেলে পুষতে হবে।"

"আরে বাবা, তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। খোদা দিয়েছেন—খোদাই একে মানুষ করবে..। রহমন পুরা রহমনই থেকে যাবে। কিন্তু তুমি ত বাবা, আজও পরগাছা, কালও পরগাছা।"

মনিয়ার কোল হ'তে সে খোকাকে নিয়ে ধাওড়া পেরিয়ে মাঠের দিকে চলতে লাগল। তার মনে হ'তে লাগল·কেউ কেউ তার দিকে যেন আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে·কেউ বা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুচকি হাসছে।

মাঠের রাস্তার উপর মাঝখানেই একটা ঝোঁপের মত, তারি পাশ দিয়ে 'তিত্তিয়া'—একটা ছোট নদী তর্‌তর্ বেগে বয়ে চলেছে। সে ওই মহুয়া গাছটার নীচে বসে নদীর দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেউ কোথাও নাই। মহুয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে মেঠো বাতাস সাঁই সাঁই ক'রে ছুটেছে। ঐ অদূরে তিত্তিয়ার কাজল-কাল জল এক পাথরের উপর ঢল খেয়ে আর এক খাদ-পাথরের মাথার উপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

রহমন খোকাকে ওই নদী-ছোঁয়া শানটার উপর আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রমশঃ তার মনটার উপর কে যেন বেশ পুরু করে একটা বিষাক্ত কালির পোঁচ মাখিয়ে দিতে লাগল। খোকা তার সন্ধ্যাতারার মত উজ্জ্বল চোখ দু'টি পিতার ওই রক্ত-কমল আঁখির উপর বসিয়ে রেখে চুপ্‌চাপ আঙ্গুল চুষতে লাগল···যেন সেও আজ

গভীর চিন্তায় মগ্ন। ছেলেটিকে নিয়ে রহমন কি যে করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন তার হঠাৎ মনে হ'ল—ছেড়ে পালানই ঠিক...। পরক্ষণেই আবার ... এই অসহায় শিশু...তার নিজেরি রক্ত-মাংস, এই কথা মনে হওয়াতেই তার পাঁজরার ভিতর কে যেন ছুঁচ ফোটাতে লাগল। খোকাকে আবার সে বুকের উপর উঠিয়ে নিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধরে' তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করতে লাগল। প্রতি অবয়বে যেন তার মায়ের সেই কোমল-পেলব লাবণ্য রাগ-রেখা, নিকষ বুকে খাঁটি সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে—দেখতে দেখতে রহমনের মুখখানি এক দিব্য গোলাপী আভায় বিভোর হয়ে উঠল—চিরন্তন পিতৃ-স্নেহের অমৃত-বারি আঁখি-নিলীমার কোণে কোণে জমাট বেঁধে, দুই গণ্ড বেয়ে টুপ্ টাপ ক'রে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"বাবু, তুমি খুব জোয়ান ছেলে হবে...সব দিক্ দিয়ে তুই তোর বাপকে ছাড়িয়ে যাবি... এমনি জুয়াড়ি হবি যে, রাজা-বাদশাও তোর কাছে হার মেনে যাবে...বেইমান ওই বাবুগুলোর বুকে এমনি সাফা চাকু চালাবি যে,পুলিশ কব্বর খুঁড়েও তোর কোন পাত্তা পাবে না...তারপর তোরও সাদী হবে ...ছেলে হবে...আর তার মা...তাকে, তোর বাচ্চাকে ফেলে পালিয়ে যাবে ...কেমন? হাঁরে, তুই কি আমার মত তোর সেই মা-ছেড়ে ছেলেটিকে এমনি ক'রে বুকের ওপর নিয়ে ঘুরে বেড়াবি? তুই কি আমার মত তোর বাচ্চাটাকে পাঁজরার ভিতর লুকিয়ে রেখে এক টুকরো রুটির জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে পারবি? তুই কে? ...আ...হা...ঠিক আমার মত...তুই...আমি!"

তারপর সে চোরের মত নদীর বাঁকে বাঁকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে, শিকারীর চোখে যতদূর নজর যায় খুব ভাল ক'রে দেখে নিল, তারপর শিশুটিকে জলের ধারে একটা পালিশ পাথরের উপর শুইয়ে দিয়ে সামনের ওই সেগুন গাছটার আড়ালে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—বাচ্চাটা কি করে। খোকা তখন এদিক-ওদিক পায়ের ঠেলা দিয়ে যেন ওঠবার জন্যই ছট-ফট করতে লাগল।

পরক্ষণেই সে তার ডান হাতটি মুখের ভিতর পূরে দিয়ে আবার চীৎকার ক'রে উঠল—"মা... মা...মা...ম্মা!"

কাঠবিড়ালীর মত রহমন আর এক গাছের পিছনে গিয়ে দাড়াল ...তারপর......আর এক ... আর এক......এমনি ক'রে অনেকদূর পিছিয়ে পিছিয়ে চলে গেল। এইবার সে শুধু শুনতেই পাচ্ছে......কিন্তু চোখে আর তার কিছুই নজর হচ্ছে না। তারপর সে যেন তাড়া-খাওয়া হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে কোন দিকে পালাতে লাগল। কিন্তু পিছন পিছন সব শিকারীর সেরা শিকার সেই কচি শিশুর 'মা—ম্মা' রোদন-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রুতির উপর সওয়ার হয়ে তাড়া করে ছুটল।

"উঃ... ...হায়......হায়......এতক্ষণ হয় ত খোকা আমার জলের ভিতর গড়িয়ে গেছে! ..."

সমস্ত মাথাটা তার ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল... বুকের ভিতর কে যেন গরম লোহা চেপে ধরেছে। তবুও সে ছুটছে। হঠাৎ থেমে গেল .....বাণ-বিদ্ধ হরিণের মত ক্ষিপ্তদৃষ্টিতে সে একবার চারি-দিক তাকিয়ে নিয়ে মরি বাঁচি ক'রে দ্বিগুণ বেগে আবার নদীর দিকে ছুটতে ছুটতে ফিরে চলল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে যখন আবার সেই সেগুনতলাতে ফিরে এসে দাঁড়াল, তখন দেখে খোকা এত জোরে চীৎকার করে কাঁদছে, যেন তখুনি পাঁজরা ফেটে মরে যাবে। ছুটে গিয়ে সে তাকে বুকের উপর উঠিয়ে নিল। আর অদূরের ওই বাউরি-বস্তিটার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা-গলায় এক দুয়ার হ'তে আর এক দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন চির-ভিখারীর কাতর মিনতিতে চাইতে লাগল—"ওগো, এই কচি ছেলেটাকে একটু দুধ দাও মা এই কচি ছেলে-টাকে...এর মা...পা... মরে গিয়েছে...এই...!"

—নিধিরামের নির্বুদ্ধিতা—

৺যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, বি-এল

এক

নিধিরামের নিজের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই এবং সে যাহা কিছু বিষয় আশয় করিয়াছিল, তাহার প্রায় সমস্তই তাহার স্বোপার্জ্জিত। তথাপি নিধিরামকে চিরদিন দুর্ব্বহ সংসার-ভার বহন করিতে হইত। তাহার সংসারে লোকের অভাব ছিল না। ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী, বিধবা ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, পিসিমাতা—সকলকেই নিধিরাম আপনার সংসারে আশ্রয় দিয়াছিল।

যদি নিধিরামকে তাহার সম্পত্তির আয় হইতে কেবল নিজের ও পত্নীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহা হইলে তাহার যথেষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত হইতে পারিত। কিন্তু সেকেলে নিধিরাম অর্থ-বিজ্ঞানের এই গোড়ার কথাটাও কিছুতেই বুঝিতে পারিত না।

কেহ এ কথার উত্থাপন করিলে নিধিরাম বলিত—"বাপ-মা, ভাই-বোন—এদেরি যদি না করলাম, ত কার জন্য সংসার? তার চেয়ে ত বনবাসী হওয়াই ভাল!"

স্থূলবুদ্ধি নিধিরাম কিছুতেই বুঝিতে পারিত না যে, বাপ-মা ভাই-বোন্‌কে ছাড়িলেও সংসার বনবাসে পরিণত হয় না, বরং গাড়ী-ঘোড়া, অট্টালিকায় অলঙ্কারে, সজ্জায় উৎসবে তাহা ঔজ্জ্বল্যে ও মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

নিধিরামের স্ত্রী কাদম্বিনীর বুদ্ধিও স্বামীর বুদ্ধিরই অনুরূপ ছিল। সেও উপার্জ্জন সক্ষম স্বামীর ঘরণী গৃহিণী হইয়াও পীড়ার ভাণ করিয়া শয্যাগত না থাকিয়া প্রত্যূষ হইতে একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করিত, এবং দেবর, দেবর-পুত্র, দেবর-কন্যা, ননন্দা ও শ্বশ্রূর সেবাকে নিরবচ্ছিন্ন দয়ার কার্য্য না ভাবিয়া কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। এবং ইহাদের জন্য নিষ্ফল ব্যয়কে সঙ্কুচিত করিয়া দিলে তাহার অলঙ্কারের সংখ্যা ও গুরুত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, একথা তাহার স্থূল বুদ্ধিতে একবারও প্রবেশ করিত না। সে যখন-তখন তাহার দেবর-পুত্রদের উল্লেখ করিয়া বলিত—"ওরাই ত বংশের প্রদীপ। আমাদের আর কে আছে?" কিন্তু অন্ধকার চিরদিন অন্ধকারই থাকিবে, ইহা সংসারের নিয়ম নহে। অসভ্যতা, অরণ্যের অন্তরালে গিরিশৃঙ্গের প্রান্তভাগে মরুভূমির ব্যবধানে যেথানেই আত্ম-গোপনের চেষ্টা করুক, সভ্যতা একদিন তাহার 'বেয়োনেটে'র গুঁতা ও জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়া তাহাকে বীরবিক্রমে আক্রমণ করিবেই।

সুতরাং নিধিরাম এবং কাদম্বিনীর অজ্ঞানতা অধিকদিন শান্তিভোগ করিবার অবসর পাইল না; একদিন জ্ঞানের তীব্রজ্যোতি সহসা তাহাদের নির্বুদ্ধিতার উপর পতিত হইয়া তাহাদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। কাদম্বিনীর এক খুল্লতাত পুত্র কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়াছিল। বিদ্যালাভ তাহার বড় বেশী ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু পাশ্চাত্য-সভ্যতার সমস্ত আবর্জ্জনাগুলি সে সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে সে একদিন এই আবর্জ্জনাগুলি মস্তকে বহন করিয়া তাহার নিভৃত পল্লী ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাদম্বিনীর খুল্লতাত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। পুত্রের সভ্যতার তীব্র আলোক তাঁহার ক্ষীণ চক্ষে

সহিল না। তিনি আলোক এবং আলোকধারীকে চক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা বড় দুর্মূল্য বস্তু। অর্থাভাবে ইহা সম্পূর্ণ অচল। খেলা হইতে পানাহার পর্য্যন্ত, আমোদ হইতে পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত ইহার সমস্তই বহুমূল্য।

সুতরাং, পিতার বিসদৃশ আচরণে পুত্রের পক্ষে সভ্যতার সাধনা অল্পদিনের মধ্যেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। কল্পনা-নেত্রকে বহুক্ষণ পীড়িত করিয়া হরিদাস দেখিল,—নিধিরাম ব্যতীত এই বিপুল সংসারে তাহা আর কোথাও আশ্রয় নাই। সুতরাং, কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া হরিদাস নিধিরামের আশ্রয় গ্রহণেই কৃতসঙ্কল্প হইল।

নিধিরাম পরম সমাদরে শ্যালককে আশ্রয় দান করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হরিদাস দেখিল,—এখানেও তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

অর্থাভাবে হরিদাসের সাধনা একেবারে অচল। কাদম্বিনীর সংসারে অর্থের স্বচ্ছলতার কোনই লক্ষণ নাই। হরিদাস দেখিল,—কাদম্বিনীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে তাহার আর আশা নাই। সুতরাং, সে কায়মনোবাক্যে দিদির কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করিল। ক্রমে ক্রমে সে কাদম্বিনীর নিকট একথার উত্থাপন করিল। কাদম্বিনী বলিল—"এত বড় সংসার। খাইয়ে-পরিয়ে একটী পয়সা বাঁচে না। টাকা জম্‌বে কি ক'রে?"

হরিদাস বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল—"তোমাদের আবার কিসের সংসার? তোমরা ত মোটে দু'টী প্রাণী। তোমাদের আবার খরচ কি?"

কাদম্বিনী হাসিয়া বলিল—"তোমার হিসেব ত খুব! আমরা দু'টী প্রাণী কি ক'রে? আমাদের বাড়ীতে থেতে অন্ততঃ দশজন।"

হরিদাস বলিল—"সে, তোমরা যদি রাস্তার লোককে ডেকে খাওয়াও, তা' হ'লে দশজন কেন, তোমাদের দশ হাজার লোকেরও অভাব হয় না।"

কাদম্বিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। "রাস্তার লোক! দেওর, দেওর-পো, শাশুড়ী, ননদ এরা যদি রাস্তার লোক, ত ঘরের লোক কে? ইংরিজি প'ড়ে তোমার মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে দেখছি।"

দিদির বুদ্ধির স্থূলতা দেখিয়া হরিদাস নিতান্ত হতাশ হইল। এবং আপাততঃ বহুকষ্টে দিদির নিকট হ'তে একটী টাকা সংগ্রহ করিয়াই কোন প্রকারে অভ্যাসগত প্রবল অভাব পূরণের চেষ্টায় বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

তিন

কিন্তু স্বার্থ প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতিগত। বহু দিনের সাধনা ও অভ্যাসের ফলে ইহার সঙ্কোচ সাধিত হইলেও একেবারে ইহার বিলোপ ঘটে না। সুতরাং ক্রমাগত উপদেশের জল ঢালিয়া হরিদাস অবশেষে কাদম্বিনীর হৃদয় নিহিত স্বার্থের অদৃশ্য অঙ্কুরকে কথঞ্চিৎ বিকশিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইল।

কাদম্বিনীর ক্রমশঃ মনে হইতে লাগিল,—হরিদাস যাহা বলে, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়। আমার ছেলে-পিলে নাই, আমি কার জন্য দিন-রাত খাটিয়া মরি! ভগবান যাদের ছেলে-মেয়ে দিয়াছেন, তাদের ত আর হাত-পা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তারা ত অনায়াসেই নিজেদের কাজ নিজ করিতে পারে। বাস্তবিকই স্বামী জীবিত থাকিতে থাকিতে সে যদি নিজের কোন সম্বল করিয়া না লয়, তাহা হইলে এর পর যখন তাহাকে দু'টী অন্নের জন্য পরের দুয়ারে হাত পাতিতে হইবে, তখন কে তাহার সংবাদ লইবে?

যতদিন 'দাও থোও' ততদিনই আপনার লোক আপনার। অভাবে পড়িলে কেহ কাহারও নয়।

কাদম্বিনী ক্রমশঃ মনের বেদনা নিধিরামের কাছেও আভাসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নিধিরামের মুখে সেই একই কথা "যদি আপনার লোকেরই কিছু না করলাম, ত কার জন্যই বা রোজগার, আর কার জন্যই বা সংসার।" হরিদাসের শিক্ষামত কাদম্বিনী অনেকবার বুঝাইবার চেষ্টা করিল,—দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে 'বসুধৈব কুটুম্বকে'র দিন আর নাই; এক্ষণে 'আপনার' কথাটাকে কিছু সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু মূঢ় নিধিরাম বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কথাটার নূতন অর্থ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে কাদম্বিনীর নিকট যতই তাড়া খাইতে লাগিল, ততই নিজের চিরসঙ্গী হুঁকাটিকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতে লাগিল এবং নীরবে কাদম্বিনীর তীক্ষ্ণ তর্কজালকে সুগভীর ধূমান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। হরিদাস বলিল—"দিদি, শুধু কথায় হবে না, একটু পেড়াপীড়ি আরম্ভ কর।"

কাদম্বিনী তাহাই আরম্ভ করিল।

অল্পে অল্পে সকলের নিন্দা জুড়িয়া দিল—পিসিমা একবারও তাহার দিকে চাহিয়া দেখেন না, তাঁর যত দরদ সবই ছোট বউয়ের উপর। ননদের হাত বড় দরাজ—যাকে পায় সংসারের জিনিসপত্র লুটিয়ে দেয়। দেওর দিনরাত ব'সেই কাটায়; জমি দেখ্‌তে' যাওয়া ছলনা মাত্র—বোসেদের বৈঠকখানায় ব'সে পাশা খেলবার কেবল একটা অছিলা। ছেলেমেয়েগুলো যেন রাক্ষসের বংশধর, যত দাও, কিছুতেই আশ মেটে না, ইত্যাদি। ক্রমে চক্ষে বারিধারা দেখা দিল—খাওয়া বন্ধ হইল—কাদম্বিনী শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বিপন্ন নিধিরাম হুঁকা হস্তে অন্দর ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইল। কিন্তু অভাগার অদৃষ্টে 'ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর।' বাহিরে হরিদাস তর্কের সঙ্গীন লইয়া সর্ব্বদা উদ্যত হস্ত।

"অর্থনীতি, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র, আলস্যের প্রশ্রয়—!" নিধিরামের 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইবার উপক্রম হইল। এমন করিয়া অধিক দিন চলে না। বহুদিন ভূতভয়গ্রস্তের মত লুকাইয়া লুকাইয়া থাকিয়া একদিন নিধিরাম সহসা প্রসন্নমুখে রোরুদ্যমানা পত্নীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—"দেখ, ভেবে দেখ্‌লাম, তোমাদের পরামর্শই ঠিক। গ্রামের পাঁচ জনেরও সেই মত। পরের জন্য সারাজন্মটা কেন মিছে কষ্ট ক'রে মরি। ওরা যেমন ক'রে হোক্ সংসার চালাক গে; আমার অত দেখবার দরকার কি? চিরকাল ক'রে এসেছি, আর যদি নাই পারি।"

কাদম্বিনীর অশ্রুধারা মধ্যে আনন্দের বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। সে বহুদিনের পর অনুকূলভাবে প্রীতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। রাত্রে সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। হরিদাস সংবাদ পাইয়া আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্বাস্থ্যপান উপলক্ষে বন্ধুবর্গের মধ্যে কিছু সমারোহ করিয়া ফেলিল।

চার

সপ্তাহকাল হইতে নিধিরাম বাড়ী নাই। কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য-উপলক্ষে সে সদরে গিয়াছে। আজ তাহার ফিরিবার দিন। সে ফিরিলেই আজ সংসারের সমস্ত আবর্জ্জনা বিদূরিত হইবে।

পৈতৃক যৎসামান্য ভূসম্পত্তি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহারই একাংশ নিধিরামের ভ্রাতা যদুনাথ পাইবে। পিসি ও ভগিনী গোয়ালঘরের নিকট একখানি ঘর পাইবেন। তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য তাঁহারা যদুনাথ ও নিধিরামের নিকট হইতে মাসে চার মণ করিয়া ধান পাইবেন। যদুনাথ গ্রামপ্রান্তে একখণ্ড পতিত জমীর উপর ঘর করিয়া লইবে।

আজ সমস্ত গৃহ বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বেলা এক প্রহর হইয়া গিয়াছে। এখনও রন্ধনাদির কোনই আয়োজন নাই। সকলেই বিমর্ষ ও স্তব্ধ। ছেলেরা পর্য্যন্ত আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় নিম্নস্বরে কথা কহিতেছে।

কাদম্বিনীর মনটা আজ তেমন প্রসন্ন নাই। অল্পবয়স্ক শিশুরা বাড়ী হইতে কোথাও যাইবার নামে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, কিন্তু একবার সেখানে পৌঁছিলে আর সেস্থান ভাল লাগে না, আবার বাটী ফিরিবার জন্য তাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কাদম্বিনীরও আজ ঠিক তেমনই মনে হইতেছিল। হরিদাসের উপদেশ ও উৎসাহে তাহার চিত্ত প্রথমে উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু বিচ্ছেদের সন্ধিক্ষণ যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই তাহার প্রাণ একটা অব্যক্ত বেদনায় আকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এত তাড়াতাড়ি কেন করিলাম? এরা চলিয়া গেলে আমার বাড়ী অন্ধকার হইয়া যাইবে। কাকে লইয়া আমি সুখী হইব? কাদম্বিনী যতই ভাবিতেছিল, ততই তাহার হৃদয় স্নেহে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

সে কখনও তাহার দেবর-কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া নীরবে তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কখনও বাড়ীর শিশুপুত্রটীকে ক্রোড়ে লইয়া সজল চক্ষে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেছিল, কখনও বা আপনার মাকড়ি খুলিয়া লুকাইয়া কোন দেবর-কন্যার কাণে পরাইয়া দিতেছিল।

হরিদাস পরম আনন্দে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ইচ্ছা দিদিকে আপনার আনন্দের ভাগী করে। কিন্তু কাদম্বিনী চেষ্টা করিয়া আপনাকে ক্রমাগত দূরে দূরে রাখিতেছিল।

মধ্যাহ্নকালে ধূলি ধূসরিত চরণে শুষ্কমুখে নিধিরাম দ্রুতবেগে অঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করিল। অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে মানুষ যেমন করিয়া চকিত হইয়া উঠে, নিধিরামকে দেখিয়া বাড়ীর সমস্ত লোক তেমনই করিয়া চকিত হইয়া উঠিল। কাদম্বিনীর বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—হায়! এত শীঘ্র কেন?

নিধিরাম অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই শুষ্ককণ্ঠে ডাকিল—"যদুনাথ!"

যদু আসিয়া অপরাধীর মত নতমস্তকে দাদার সম্মুখে দাঁড়াইল।

নিধিরাম ব্যাগ হইতে তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"এই নাও। আর তোমার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব রইল না।"

যদু কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে কাগজ তুলিয়া লইল। কাগজ পড়িয়া সে একান্ত বিস্মিত হইল। তাহার সরল চক্ষে সহসা অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিল। সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"দাদা, এ কি!"

নিধিরামের সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা যদুর হস্ত হইতে টানিয়া লইয়া দেখিল - কি সর্ব্বনাশ! কাগজখানা রেজিষ্টারি করা দান-পত্র! নিধিরাম তাহার বসতবাড়ী, সমস্ত সম্পত্তি স্বেচ্ছায় ভ্রাতার নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছে!

নিধিরাম হরিদাসের প্রতি সস্মিত কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"আমরা মুখ্যু মানুষ, তোমরা সহর-ঘেঁসা লোক, দেখ ত কাগজখানা পাকা হ'ল কি না?" হরিদাস কথার উত্তর দিতে পারিল না।

নিধিরাম কাদম্বিনীকে ডাকিয়া বলিল—"এখন এ ঘর-দ্বার সবই যদুর। চল, যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যাক্।"

যদু নিধিরামের চরণে পতিত হইয়া বলিল—"সে কি দাদা তোমারই সব; আমরা তোমারই আশ্রিত! তোমার কাগজ তুমিই রেখে দাও।"

অশ্রুপূর্ণলোচনে স্বামীর পদধূলি লইয়া কাদম্বিনী বলিল—"আমায় মাপ কর, আমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছিল!"

হরিদাস অতঃপর আর সেখানে অবস্থিতি করা সঙ্গত মনে করিল না। নিধিরামের নির্ব্বুদ্ধিতার 'ভেড়ার শৃঙ্গে' পড়িয়া তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির 'হীরার ধার' সম্পূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গিয়াছিল!

কি লিখি ?—কখন লিখি ?—

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

গৃহিণী চায়ের বাটি রাখিয়া গিয়াছেন,—চুরুটও একটি ধরাইয়া লইয়াছি। চায়ের ধোঁয়া এবং চুরুটের ধোঁয়ায় মস্তিষ্ক বেশ ধূমায়িত হইবারই কথা। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার সঙ্গে হয়ত অনেক প্লট্-ই মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পূবের জান্‌লা খোলা,—সাম্‌নেই পার্ক; নীল এবং সবুজের অনেকখানিই দেখা যায়।—লিখিবার এমন সুন্দর স্থান আর আছে না কি ?

টং টং করিয়া ঘড়িতে ক'টা বাজিয়া গেল। উঠিয়া গিয়া প্যাণ্ডুলেম্‌টা বন্ধ করিয়া দিলাম। সাহিত্য-সাধনার এতবড় বিঘ্ন আমার ঘরে কি করিয়া এতদিন আত্মগোপন করিয়া ছিলো! ঘড়িটা কোন কেরাণিকে বিক্রয় করিয়া দিলে কাজে লাগিবে। সুনীলের কথা মনে পড়িল।—আহা, বেচারার বড় কষ্ট! ঘড়িটা না-হয় অম্নিই তাহাকে দিয়া দিব।

দোর খোলার শব্দ হইল।—কি বিশ্রী শব্দ! কালই মিস্ত্রী ডাকাইয়া কব্জা বদল করিতে হইবে; ঘরটার এখনো অনেক গলদ্ আছে। বিলাত হইলে,—

— এখনো লেখা চল্‌ছে !

সর্ব্বনাশ! খাতার পাতা যে সাদাই রহিয়া গিয়াছে! এতক্ষণ তবে কি করিলাম!

—একবার বাজার যাও না লক্ষ্মীটি!

বাজার!—কলমটা বাগাইয়া ধরিলাম। বলিলাম, বিরক্ত ক'রো না।

—খেতে হবে না? ছাই-পাঁশ লিখে কি হবে?

লিখে কি হবে!—হাসি আসিল। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মূল্য আজ এক-মুহূর্ত্তে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল! মনে করিতেও পারিলাম না,—গেটের কি বিবাহ হইয়াছিলো?

—কি ভাব্‌ছো?—ওঠো না!

—না, ভাবিনি কিছু।—এই উঠি।—কি আন্‌তে হবে?

কল্পনা-জগৎ হইতে একেবারে কঠিন বাস্তবে। দূরে—শুনিতে পাইলাম, আমার স্বপ্ন-বিলাসিনীদের নূপুর নিক্কণ।—বুঝি, অর্দ্ধপথে আসিয়া তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল!

দুপুরটা কাটিল গৃহিণীর কল-গুঞ্জনে। নাদ্ বলিলেই সত্য রক্ষা হইত—কিন্তু থাক্ সত্য; সত্য বলিয়া অসুন্দর করিব কেন? না হয়, গল্প-লেখা না-ই হইবে।

ভুল করিয়া খাতাটার উপরই বারবার চোখ পড়িতেছিলো। গৃহিণী উঠিয়া গিয়া নিজের বালিসের নীচে রাখিয়া দিলেন।—আঃ, বাঁচা গেল! নিশ্চিন্ততায় চোখ বুজিয়া আসিল। ইহাকে বিরাম না আরাম বলিব?—সময়টুকুর কি অপব্যয়ই না করিতেছিলাম! গৃহিণী বলিলেন, একটা গল্প বল না,—অনেক তো লেখো।

চোখ বুজিয়াই বলিলাম,—এক যে ছিলো রাজা…

—তোমাকে বল্‌তে হবে না, ও-গল্প আমি জানি।

আঃ, বাঁচা গেল!—কবে এম্নি করিয়া সকলে মিলিয়া চীৎকার তুলিবে,—থামাও তোমার কলম, আমরা জানি ও-সব জানি! বলিলাম, গল্প থাক্; ও-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এবার প্রমোদের মত মাষ্টারি-ই কর্‌বো।

—সত্যি?

সম্ভবতঃ মুখখানাকে যথোপযুক্ত গম্ভীর করিতে পারিনি।

—তোমার আবার সে-সুবুদ্ধি হবে! বলিয়া গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিলেন।

—একটা মাদুলি নিয়ে দেখ্‌লে হয়...

—তোমার হাস্‌তে লজ্জা করে না ?—আবার ঠাট্টা হচ্ছে! এরপর যে ভিক্ষে কর্‌তে হবে।

মাথার মধ্যে একটা গল্প জমিয়া উঠিতেছে ;—অর্দ্ধাশনে অনশনে সাহিত্যিকের অকালমৃত্যু। বলিলাম, খাতাটা দাও···

—এই নাও। বলিয়া গৃহিণী গায়ের উপর খাতাটা ছুঁড়িয়া দিলেন।

কলালক্ষ্মী এবারে বুঝি বিদায় লইলেন! বলিলাম, না,—ভূত ছেড়েছে।—মাষ্টারিই কর্‌বো।

গৃহিণী উঠিয়া গেলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না,—আবার আসিতে হইল। লক্ষ্মী ছাড়িলেও,—গৃহলক্ষ্মী ছাড়িবেন না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বলিলেন, পূজো আস্‌ছে,—সেটা মনে আছে ?

—বিলক্ষণ মনে আছে ; সম্পাদক প্রতিদিনই সেকথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

গৃহিণী সত্যই এবার চলিয়া গেলেন হাসিয়া, খাতাটার উপর বড় বড় করিয়া লিখিলাম—দম্পতি। বেশ হইবে,—দুইটি নর-নারীর লক্ষ্মী লইয়া বিবাদ। প্লটটা বেশ জম্‌কালো করিয়া তুলিতে হইবে।—একটা চুরুট ধরাইলাম।...

আজ দুইটা চুরুট পুড়িল। আর ক'টা পুড়িবে কে জানে!

—কানের মাথা খেয়েছো! নীচে যে প্রমোদ বাবু ডাকছে।

—আমার চুরুট!—বোধ করি 'এসো' বলিতে গিয়া ভুল করিয়া থাকিব। গৃহিণী মুখে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পালাইলেন। ব্যস্ত হইয়া ডাকিলাম, এসো প্রমোদ!

—কি, সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে নাকি ?

হাসিলাম।—বিজ্ঞের মতই প্রশ্ন হইয়াছে বটে!

—এসব 'লাইট্' জিনিস লিখে কি হয় ?

—তোমার জন্মক্ষণটা একবার দিতে পারো প্রমোদ ?

—বুঝ্‌লাম না!

—বুঝ্‌বার তো কথা নয়। -ব্যাকরণে এর সূত্র নেই। এই কিছুক্ষণ আগে,—গৃহিণী আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, তোমার মত স্কুল-মাষ্টার হইনি কেন ? তখন মনে হয়নি, তা হ'লে উত্তরটা দিয়ে দিতাম ; স্কুল-মাষ্টার কি হওয়া যায়,—স্কুল-মাষ্টার হ'য়ে জন্মাতে হয়।

—তুমি যতই বল, গল্প-লেখককে আমি 'জিনিয়াস্' কিছুতেই বল্‌বো না।

—মাষ্টারের মুখে কোন মন্তব্যই শুন্‌বার জন্যে সাহিত্যিকের উৎকণ্ঠা নেই।

—তুমি কি বলতে চাও, আমরা কিছু বুঝি না ?

—আহা, বুঝ্‌বে না কেন ?—বি, এ পাশ করেছো,—শব্দের প্রতিশব্দ তো তোমাদেরই জন্যে। কিন্তু আর না—ব'সো, চা নিয়ে আসি।

—হাঁ, তা হ'লে তর্ক জম্‌বে ভাল।

—তর্ক! আমি আর যাই করি, সাহিত্য নিয়ে তর্ক,—মাষ্টার আর কেরাণির সঙ্গে করি না।

—এই যে,—'ওয়েল্-কাম্' কেরাণি! বলিয়া প্রমোদ লাফাইয়া উঠিল।

চাহিয়া দেখি, দরজার সম্মুখে সুনীল! বলিলাম, এসো—তোমার কথাই হচ্ছিলো ; অনেক-দিন বাঁচ্‌বে।

—কেরাণির ওটা আশীর্ব্বাদ নয়।

বলিলাম শতং জীবেৎ ; - বরং সাহিত্যিক-বংশ নির্ব্বংশ হোক্‌,—বৌগুলো খেয়ে বাঁচ্‌বে।

চা প্রস্তুতই ছিলো ; গৃহিণী—পাকা গৃহিণী!

বলিলাম, কিছু না হোক্, শেষ কালটায় চায়ের দোকান কর্‌লেও চলবে—কি বল ?

—লজ্জাও করে না !

লজ্জা হয়ত করিতেছিলো। বলিলাম, চুপ্-চুপ্,—এখনো তোমাদের কণ্ঠকে আমরা বীণা-কণ্ঠই বলি।

সুর উঠিল। মনে পড়িল, সুর সপ্ত ! সভয়ে বলিলাম, থাক্,—পরে হবে।

নাঃ, প্রমোদকে বলিতেই হইল ! রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবি হউন,—আমরা মাষ্টারি-ই করিব।

বাহিরে আসিয়া দেখি, প্রমোদ ও সুনীল তাহাদের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব কষিতেছে !

মুহূর্ত্তের জন্য কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল।—রবীন্দ্রনাথ ভুল করিয়া এ-কোথায় জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন ! বলিলাম, ইকনমিক্‌স্-এর প্রথম রচয়িতা কে সুনীল ?—তিনি ভাগ্যবান ! ভাবীকালের অমর কাব্য !

সুনীল ঢক্ ঢক্ করিয়া চা গিলিতে লাগিল।—

আঃ, তাই ভাল। তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করিয়া একবার বাহির হইতে পারিলে বাঁচি ! পৃথিবীকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়া যাহারা ইকন-মিক্‌স্-এর পাতা উল্টাইয়া মরিতেছে—মরুক, তাহাদের প্রতি আমাদের ঈর্ষা নাই।

ভিতরে আসিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, চল,—আজ তোমাকে বায়োস্কোপ দেখিয়ে নিয়ে আসি।

—সে আবার কি গো !—এত দয়া ? বলিয়া গৃহিণী হাসিলেন।

ভাগ্যিস্ খরচের কথা উঠিয়া পড়েনি, তাহা হইলে জলে ডুবিয়া লজ্জা ঢাকিতে হইত। গৃহিণীকে জানাইয়া দিলাম, খাবার তৈরি ক'রে নাও,—আপদ বিদায় ক'রে আসি।

—আজকের কাগজের খবর জান ? বলিয়া সুনীল আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিল।

বলিলাম, বলই না,—শুনি।

—রাজসাহীর কোথায়—পেটের জ্বালায় মা-বাপ তার ছেলেকে বিক্রী করেছে।

বুঝিলাম, ইকনমিক্‌স্-এর বক্তৃতা এবার দীর্ঘ হইবে। জামাটা কাঁধে ফেলিতেই সুনীল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ড্যাম্ ডিফিট্।

মনে মনেই বলিলাম, ডিফিট্ তো বটেই। 'ডিফিট্' এবং 'ডিভিড্'—এই দুটোই তো ইকনমিক্‌স্-এর আসল কথা। ইকনমিক্‌স্ না পড়িয়াও আজো দেবতার ভাগেই অমৃত পড়ি-তেছে,—আমরা মরিতেছি কপাল ঠুকিয়া ঠুকিয়া !

প্রমোদ সেই-যে চুপ্ করিয়াছে, আর একটিও কথা বলেনি। বলিলাম, তোমার হ'লো কি হে ?

—কিছু হয়নি।—উঃ, কি ট্রাজেডি !—দেখ্‌ছো সুনীল, আজ রবিবার—আমরা ছুটি ভোগ কর্‌ছি, আর ঐ হরেন চলেছে কাজে ! বলিয়া প্রমোদ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কাহাকে যেন দেখাইয়া দেয়।

জানালার ধারে সরিয়া আসিলাম। দেখি-লাম, একটি শীর্ণ-কুব্জ দেহ বিড়ি টানিতে টানিতে পথ ভাঙ্গিতেছে !

বলিলাম, ঐ হরেন কে ?

—ওর পরিচয়—যেটুকু দেখ্‌ছো ঐটুকুই ! অন্য পরিচয়, আমার প্রতিবেশী,—কেরাণি।

কেরাণি ! যৌবনের এ কি অভিশপ্ত রূপ ! বলিলাম, ওর ছুটি নাই ?

—আছে ; কিন্তু ও আর-একটা কাজ করে,—সেখানে রবিবারেও ছুটি নাই।

বলিলাম, এত লোভ ?

—ভয়ঙ্কর ! বলিয়া প্রমোদ হাসিবার চেষ্টা করে। বলে, কাল্ ওর একটা ছেলে মারা গিয়েছে।

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ঘরের হাওয়া যেন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে !

—ছোটবেলায় কে-নাকি ওকে বলেছিলো, রাজা হবে। আজো হরেন হাসে।

হরেনের হাসি আমিও যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি! আজো যারা মরেনি, তারা অগ্নি করিয়াই তো হাসে!

—সবাই বলে, বাপ তো নয়—পিশাচ; ছেলেটার চিকিৎসা করালে না!

—কত মাইনে পায়?

—মাইনে?—বলিয়া প্রমোদ আবার হাসে। বলে, দু' জায়গায় কাজ ক'রে পায় চল্লিশ টাকা!

সুনীল হাসিয়া পকেট হইতে একটি অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি বাহির করে। ধরাইয়া লইয়া বলে, আর ওর প্রাসাদের কথাটা বল!

প্রমোদ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবে। বলে, প্রাসাদই বটে! কিন্তু থাক্,—রবিবারটা আর নষ্ট ক'রে কাজ নেই।

বলিলাম, না,—বলো। তোমার হরেনকে আমার ভাল লাগ্‌ছে।

—ওর স্ত্রী আরো ভাল। বলিয়া সুনীল হাসে। তারপর প্রমোদের দিকে ফিরিয়া বলে, তোমার টাকাটা দিয়েছে?

—না; দেবে কোত্থেকে! দেওয়া মানেই তো আর কোথাও হাত পাতা! ওর স্ত্রী আমাদের বাড়ী এসে চালটা-আস্‌টা ধার নিয়ে যায়,—জানি, সে আর পাবো না, তবু আমরা দি।

কত জনে কত কথা বলে,—বাড়ীওয়ালা তো জোচ্চোর না ব'লে কোনদিন জলস্পর্শ করে না। হরেন হাসে। ওর হাসি দেখেছো কখন? হাসি দেখলে কান্না আসে, এর আগে কোনদিনই আমি জান্‌তাম না।

—বাড়ী ছেড়ে দিলেই পারে।

—কোথায় যাবে? দুমাসের ভাড়া প'ড়ে আছে; যেতে হলে সব মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

কাহারও মুখে কথা নাই। সুনীল যেন মার খাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছে! অনন্ত আকাশের নীচে মানুষের স্থানাভাব!—ঐ ছোট নর্দ্দামাটায় অসংখ্য কৃমিও তো জন্মাইতেছে!—কে জানে কেন!

সুনীল উঠিয়া গিয়া দরজার পাশে চীৎকার জুড়িয়া দিল,—বৌদি, পান ··

তারপর একসঙ্গে দুইটি পান একেবারে মুখে পুরিয়া দিয়া বলে, তোমরা বড় 'সেন্টিমেণ্টাল্!' ছেলেদের পিঠে বেত চালাও কি ক'রে প্রমোদ?

অনেকক্ষণ পরে হাসিতে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম!—সুনীল ঠিকই বলিয়াছে, সেন্টিমেণ্টাল্ হইলে চলে কই? মনে পড়িল. গৃহিণীকে লইয়া আর একটু পরেই বায়োস্কোপে যাইতে হইবে।

পাশের বাড়ীর মেয়েটা গলা সাধিতেছে। গুণপণা না দেখাইলে বিবাহ হইবে কেন?—হয়ত হরেনের স্ত্রীও একদিন গান গাহিয়াছে!

একে একে সকল কথাই শুনিলাম।—

একতলার ছোট্ট একখানি অন্ধকার ঘরে—এতদিন ধরিয়া, না জানি কত অশ্রুই ঝরিল! বোবা পৃথিবী অশ্রুর সমুদ্র বুকে করিয়া হয়ত অনন্তকালই বাঁচিয়া রহিবে!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।—প্রমোদ ও সুনীল চলিয়া গিয়াছে। আলো জ্বালাইয়া খাতাটা লইয়া আবার বসিয়াছি। কিন্তু কি লিখিব? বারবার করিয়া হরেনের কথাই মনে পড়িতেছে। —ছেলেটা মরিতেছে···স্ত্রীর অসহায় ক্রন্দন—ওগো, আজ আর অফিস যেও না, চাকরি না হয় না-ই থাক্‌বে।

হরেনের মুখে ম্লান হাসি। বলে, খাবো কি? ছাতাটা বগলে করিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হরেন আগাইয়া চলে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া হরেন বাড়ী ফেরে। রোরুদ্যমানা স্ত্রীর মাথায় হাত বুলায়। প্রতিবেশীরা ঝাঁঝাঁইয়া আসে। বলে, গলায় দড়ি,···

পাড়া কাঁপাইয়া বন্ধুর দল শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসে,···বল হরি, হরিবোল···

ছুটিয়া হরেন বাহিরে আসে। তারপর প্রমোদের কানে-কানে বলে, কাউকে তো বল্‌তে পারি না ভাই, নরেন ম'রে আমার ভালই ক'রে গেল;···তবুও তো একটা কম্‌লো!

হঠাৎ—প্রবল একটা ঝাঁকানি খাইয়া আত্মস্থ হইলাম।—গৃহিণী বলিতেছেন,—খাবার দিয়েছি।

—দিয়েছো?—উঠিলাম।

লেখা আর হইল না;—না হোক্। কাল্ সকালে এইটাকেই গুছাইয়া সম্পাদককে দিয়া আসিব।

—সেতু—

শ্রীবগলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বাহির হইয়াছিলাম ভ্রমণে—

তীর্থ নয়—দেশ।

হাওয়া খাইতে যাওয়ার মধ্যে বাঙালীর স্ত্রী সঙ্গে লওয়ার যে একটি নিরর্থক মোহ আছে—আমি তাহা হইতে বঞ্চিত নই।

কাজেই পানের জন্য কৌটার মধ্যে জরদা এবং প্রাণের জন্য লটবহরের মধ্যে পরদা—আমার সঙ্গে ছিল।

বহু জায়গা ঘুরিয়া আসিয়া পুষ্করে ঠেকিয়াছি আজ বারো দিন। এখান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া, কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না।

অথচ পুষ্কর এমন কীই বা। কতকগুলি পাহাড় আর মরুভূমির সুন্দর সমাবেশের একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই ত নয়! কী জানি। হয়ত পৃথিবীর এই নিঃসঙ্গতাটুকু ভাল লাগিয়া থাকিবে।

বৈশাখী মধ্যাহ্ন। তীব্র—তীক্ষ্ণ—নির্দ্দয়। জানালার কাছে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া আছি।

চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতমালা—সৃষ্টির প্রথম প্রশ্নের মত।

সম্মুখের বালু-প্রান্তরে মরীচিকার আভাস। তাহারই ওপার হইতে একটা চীলের ডাক ভাসিয়া আসে। থাকিয়া থাকিয়া দূরে দূরে ময়ূর ডাকিয়া উঠে—যেন এই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের ছন্দ বজায় রাখিতেই।

জীবন যেন একটা স্বপ্ন···

আজ এই পর্ব্বত প্রান্তর, চীলের আর্ত্ত চীৎকার, ময়ূরের ডাক আর এই জনহীন প্রখর মধ্যাহ্নে মিলিয়া যে একটি ঐক্যতানিক রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছে, মনে হয় আমি তাহা হইতে পৃথক নই। এমন কি ঐ যে একটা নাম না জানা পোকা গুণগুণ করিতে করিতে এক জানালা দিয়া ঢুকিয়া—আর এক জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল সেও ইহার বাহিরে নয়।

তাইত ভাবি যে, সমগ্র ত্রিলোক ব্যাপিয়া একটি সুবিপুল অংশু অশ্রুত রাগিণীর আলাপ চলিতেছে অবিরাম। ধরিত্রীর সুখ, দুঃখ, ভালো, মন্দ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব সেই রাগিণীরই বিচিত্রতম প্রকাশ-ভঙ্গী মাত্র।

ঘরে ঢুকিল মঞ্জু, আমার স্ত্রী। ও যেন তাপসী সন্ধ্যা, সারাদিনের রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার শেষে অনন্ত রাত্রির তিমির মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে।

ধনীর মেয়ে—জীবনে ধন ছাড়া যে আর কিছুর প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার করিতে ওর কষ্ট হয়। অথচ বিশ্ববিধাতার এমনই পরিহাস যে, স্বামী নামক বস্তুটিকে তিনি অপ্রয়োজনীয় করিয়াও সৃষ্টি করেন নাই। কাজেই স্বামী হিসাবে আমার অর্থহীনতা এবং অর্থহীন হিসাবে আমার অক্ষমতা এই দু'য়ে মিলিয়া আমাকে নাকি দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে—মঞ্জু বলে।

কিন্তু মঞ্জুর বলা ঐ খানেই ত শেষ নয়,—আরও বিস্তৃততর অভিযোগ আমাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া ও হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে যে, বিবাহের পর

হইতে আমার ভালবাসা পাইবার সৌভাগ্য ওর হয় নাই। হইতেও পারে।

অথচ কলিকাতার পথে পথে যেদিন অসহায় অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম,সেদিন এই মঞ্জুরই পিতা সাগ্রহে আমাকে তাঁহার কারখানার কর্ম্মচারী শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আমাকে বিশ্বাস করিবার এমনই মোহ তাঁহার জন্মিয়াছিল যে, পরে একমাত্র কন্যা সম্প্রদানেও—এতটুকু ভাবিবার কারণ তিনি খুঁজিয়া পান নাই!

মঞ্জু বলে—তুমি উদাসীন, তুমি পাগল!

আমি বলি—না, আমি মানুষ।

ভালবাসিব! ভালবাসা বলিয়া সংসারে একটা নাম আছে জানি। কিন্তু কেহ কি আমরা কোন দিন খুঁজিয়া দেখিয়াছি—ওই নামের অন্তরালে বস্তুর সারবত্তা কতখানি?—নাই। তাই ত আমরা পরম প্রিয়জনকে নিকটে পাইবার চরম ব্যাকুলতার নাম দিয়াছি ভালবাসা। অতীত যুগের যে মানব সর্ব্বপ্রথম এই ব্যাকুলতাকে নামের বাঁধনে বাঁধিয়াছিলেন—তাঁহাকে নমস্কার।

পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু কেন ঘুরিতেছে তাহা আজও অনাবিষ্কৃত। আমি জানি, সে ওই ভালবাসা নামটির পিছনে তাহাকে আয়ত্ত করিবার বিপুল দুরাশায়—"তাহার লাগিয়া কাঙাল" হইবার একান্ত কামনায়।

মনে মনে বলিলাম—মঞ্জু! ভালবাসি বলিলেই ত আর ভালবাসা যায় না। তোমার আড়ালে যে মানুষটি আজ পাইবার জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে, আমার মধ্যের মানুষটিও তেম্নি দিবার আগ্রহে উন্মাদ। কিন্তু আশ্বস্ত হও তাহাদের মিলন ঘটিবে না। তোমার আমার শুভদৃষ্টির মাঝে আমরা ত পরস্পরকে দেখিয়াছিলামই, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে যে দেখে নাই—তাই ত এ ব্যবধান।

মঞ্জু তখনও দাঁড়াইয়াছিল—ডাকিয়া বলিলাম,—মঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকা মানেই দূরে থাকা—কাছে এস। সে বিড় বিড় করিয়া কি বলিল ঠিক বোঝা গেল না। বলিলাম, উত্তর না দেওয়াটা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু উত্তর পাওয়ার আগ্রহ আমার কমে যাচ্ছে—এটা তোমাকে মনে রাখতে বলি।

মঞ্জু হঠাৎ গট গট করিয়া আমার ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুখের অতি নিকটে মুখখানা লইয়া আসিয়া বলিল—কি?

হাসিয়া বলিলাম—'কি' এর জন্যে ত তোমাকে ডাকিনি আমি—কিছু না'র জন্যেই ডেকেছি।

—সে আমি জানি। বলিয়া মঞ্জু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

—মঞ্জু!

মঞ্জু নিঃশব্দে তাহার চোখ দুইটি আমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল।

—পুষ্কর কেমন লাগছে?

—যেমন লেগে থাকে।

—যেমন লেগে থাকে! তবে কাজ নেই এখানে থেকে,—চল কোলকাতায় ফিরি!

—কি হবে সেখানে ফিরে?

—কি হবে? কিছু যে হবে না তা ত জানিই। তবু—

মঞ্জু হঠাৎ ফাটিয়া পড়িল। না না-না তুমি আমাকে বিরক্ত করো না বলছি। আমি তা হ'লে আত্মহত্যা কোরব।

রাগ! মঞ্জু তা হ'লে স্ত্রী হইতে পারিয়াছে। ধনী কন্যার স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আজ ওকে পরিত্যাগ করিল! বলিলাম,—মঞ্জু! তুমি আমার ওপর রাগ কর কেন? তুমি তো জান, যদিও তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন আমার নামে,—তবুও তোমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে তোমাকেও আমার মনিব বলেই জানি।

—না-না, আমি তোমার কোন কথা শুনব না। তোমার ওই বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার ভিতরেই জোচ্চুরি আছে। আমি সব ধরে ফেলেছি।

—কি ধরে ফেলেছ ?

—সব, সব।

—কি সব ?

—কি সব ? এই দেখ।

অবাক হইলাম ! মঞ্জু এ ফটো কোথায় পাইল ? আশ্চর্য্য !

বলিলাম—ভাল করনি মঞ্জু।

—কি ভাল করিনি ? তোমার বাক্সের ভিতর থেকে পরস্ত্রীর ফটো সরিয়ে ভাল করিনি আমি ? আমি চিরকালই চুপ ক'রে এই চোর-কাঁটার জ্বালা সহ্য কোরব বলতে চাও ? বলিতে বলিতেই মঞ্জু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—তা বটে।

রাত্রি ন'টা।

মঞ্জু এই মাত্র শুইতে গেল। সেই তখন হইতে যে সে মুখটী বন্ধ করিয়াছে আর তাহা খোলে নাই। খুলিতে গেলে হয় অন্তরের পুঞ্জিত জ্বালা চক্ষু দিয়া গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িবে, নয় ত উত্তপ্ত বাক্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। ভালই করিয়াছে।

আমার বৈকালিক ভ্রমণ আজ ব্যর্থ হইয়াছে। হাঁটিতে গেলেই প্রতিপদে মনে হয়, কাহার যেন একখানি উত্তপ্ত কোমল বুকের উপর পা দিয়া দিয়া চলিয়াছি। চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, নির্জ্জন মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ কক্ষে এক নারী তাহার কুসুম-সুকুমার মুখখানিকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু-আবিল করিয়া তুলিতেছে। সুন্দরী স্ত্রীর কান্না কি সুন্দর, কিন্তু কি ব্যথাপ্রদ !

আলিসার ধারে আসিয়া বসিলাম।

একাদশীর চাঁদ ঘুমন্ত পুষ্করের উপর কী মায়া মোহই না রচনা করিয়াছে ! নীচে পুষ্করের পুষ্করিণীতে অস্পষ্ট ঝিলিমিলি। চারিদিকে ঝিল্লীর একটানা জপমন্ত্র গুঞ্জরণ। আঃ···আজ এই নিবিড় বিজনতায় কেবলই অতীতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। যেখান হইতে বেদনার পাথেয় লইয়া আমার যাত্রা সুরু করিয়াছিলাম। অতীত আমার সুন্দর প্রাণময়,—বিষতিক্ত অতীত।

প্রথম যেদিন দেখা, সে নমস্কার করিয়া বলিল—আপনি নাকি খুব ভাল গান গাইতে পারেন ?

হাসিয়া বলিলাম—খুব ভাল গান গাইতে পারি এটা মিথ্যা কথা। ভাল গান গাইতে পারি—এটাও সত্যি নয়, তবে গান গাইতে পারি —অস্বীকার কোরব না।

—কিন্তু ভাল গান গাইতে পারেন অস্বীকার কোরতে গিয়ে ভাল কথা কইতে পারেন, এটাকে বাতিল করবার ত কোন উপায়ই রাখলেন না ?

বলিলাম—ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।

মণিকা এখানকার মেয়ে নয়। তাহার পিতা পশ্চিমে চাকরী করেন, কিছুদিনের জন্য সে মামার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহার মামা, আমার গ্রাম সম্পর্কে কাকা। তিনিই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

গান এবং জলযোগ সারিয়া সেদিন বাড়ী ফিরিলাম। সেই গ্রামেই আমার বাড়ী নয়—মধ্যে একখানি মাঠ ব্যবধান। পথ চলিতে চলিতে মণিকার কথাগুলি কাণে বাজিতেছিল,—কাল আসছেন ত ? বাস্তবিকই

এখানে এসে অবধি দিনগুলো আমার আর কাটতেই চায় না, যদি আপনি দয়া ক'রে—

বিনয় নম্রমুখে বলিয়াছিলাম—আমাকে বেশী বলবেন না।

ইহার উত্তরে মণিকা একটু হাসিয়াছিল। যৌবনের পরিপূর্ণতায় ভরা সেই দু'টী ডাগর আঁখির মদির-চাহনী অন্ধকারের পটের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল। মনে হইল, সমস্ত বিশ্ব-সংসারের আমিই একমাত্র পুরুষ—এক শিক্ষিতা নারী যাহার সঙ্গ ভিক্ষা করিয়াছে। যাক্, এতদিনে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার একটা অর্থ হইল।

প্রাত্যহিক যাতায়াতের সুযোগে পরিচয় আমাদের নিবিড়তম হইয়া উঠিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট এদিক্ ওদিক হইলে মণিকা মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিত, অকারণে বাড়ীশুদ্ধ লোকের উপর রাগিয়া রাগিয়া উঠিত। এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম যে, কোথায় চলিয়াছি! কিন্তু যৌবনের এতদিনকার শুষ্ক জীর্ণ খাদ বাহিয়া যে বিপুল বন্যা নামিয়াছে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা ত দূরের কথা, মনে করিতেও আমার কষ্ট হইত। একদিন মণিকা হাসিয়া বলিল—তোমাকে আমার আপনি বলতে ভয়ানক লজ্জা করে—যদি আমি তুমি বলেই ডাকি, তাতে রাগ কোরবে না বল?

বলিলাম—রাগ কোরতে পারতাম, কিন্তু তাতে অনুরাগ কথাটার কোন অর্থ থাকে না বলেই কোরব না।

—আচ্ছা, তুমি এত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বল কী করে? কবিত-টবিতা লেখ নাকি?

—পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।

—বটে? আচ্ছা বলত মণিকার সঙ্গে কি মেলাবে?

—কেন—গণিকা।

—কী! বলিয়াই মণিকা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বুঝিলাম অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি। দোষটা কাটাইবার জন্য ধীরে ধীরে বলিলাম—ক্ষণিকা।

—ক্ষণিকা! শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌ছ? নাঃ, আমারই ভুল হয়েছিল। কারণ লেখাপড়া যতই শেখ না কেন, তোমরা সেই পাড়াগাঁয়েরই ছেলে, সভ্যতা আজও যেখানে পৌঁছয়নি। মণিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আর আমার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া।

মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম। এক মুহূর্ত্তের ভুলে এ কী করিয়া বসিলাম আজ? ছিঃ ছিঃ! কিন্তু আমি ত অর্থ না বুঝিয়াই শুধু খেয়ালের ঝোঁকে কথাটা উচ্চারণ করিয়াছিলাম। আমার কথাটাই হইয়া রহিল সত্য, —আর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভীতি-বিহ্বল ব্যথিত মুখশ্রী,—সেকি একেবারেই মিথ্যা—মায়া? মণিকার কি তাহা চোখেই পড়িল না? তবে কী হইবে আমার এই শিক্ষিতা নারীর সাহচর্য্যে,—ব্যথা ও বেদনা যাহার লক্ষ্যের বাহিরে, অন্তর বলিয়া যাহার কোন বালাই নাই?

বাহির হইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা নামিয়াছে। পশ্চিমাকাশে অস্ত রবির স্বর্ণসমারোহ। মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলাম—এসব কিছুই সত্য নয়, কিছুই সত্য নয়। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য কথাটার কোন মানে হয় না। সমস্তই মায়া, সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই ফাঁকি।

দিন চার-পাঁচ মণিকার সঙ্গে দেখা করি নাই। যদিও ইতিমধ্যে অনেকবার ইচ্ছা করিয়াছে, ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসি মণিকা কি করিতেছে। কথা কহিব না, কাছে-ও যাইব না, শুধু দূর হইতে দেখিয়া আসিব—আমার অনুপস্থিতিটা সে কী ভাবে উপভোগ করিতেছে।

কিন্তু পৌরুষ বাধা দিয়াছে।—এতদিনকার

সাহচর্য্য যদি তোমার একটী মাত্র উপহাসের আঘাতেই ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তবে যাক্ না। কী মোক্ষ লাভ হইবে তোমার অমন দুর্ব্বল পরিচয়ের উপর জীবন সমর্পণ করিয়া?

পরদিনই চিঠি পাইলাম। মণিকা লিখিয়াছে —"তুমি আর আস্‌ছ না! কিন্তু জিজ্ঞেস করি, দোষ কি করেছিলুম আমি?—মণিকা।

শেষের ঐ তিন অক্ষর আমার সকল চিত্ত দাহের সমাপ্তি করিয়া দিল। সত্যই ত! তাহার আর দোষ কী? সব অপরাধ ত আমারই। অবিবাহিতা তরুণীর নামের পিছনে গণিকা শব্দটী জুড়িয়া দিয়া অন্যায় ত করিয়াছিলাম আমিই। শুধু শুধু এতদিন—মনে মনে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। এই সহজ কথাটা আগে বুঝিতে পারি নাই কেন? আশ্চর্য্য!······

এতদিন আমার না যাওয়ার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করিতে গিয়া সেদিন মণিকার চোখের কোলে জল দেখিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলি নাই।

যাক্··· ··

যাই এবং আসি, ঠিক যেন উন্মাদ। সমস্ত দিনেও রাত্রিতে আমার মন মণিকাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে। যাইবার কথা তিন-টায়, যাই একটায়। মণিকা—মণিকা—মণিকা; রহিল পড়িয়া আমার গান শেখান, রহিল পড়িয়া মান-অভিমান, শুধু বেলা একটা হইতে রাত্রি আটটা অবধি পাশাপাশি হাস্য-পরিহাসে কাটে।

মণিকার মধ্যেও একটা গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সেই সংযত গাম্ভীর্য্য নাই, সময়ে সময়ে পরিহাসের মাত্রা স্বাভাবিকতাকেও অতিক্রম করে, কারণে অকারণে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। মনে হয়, তাহার পৃথিবী যেন আজ গোলাপী নেশায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

খুড়ীমা বলেন—তুই যতক্ষণ না আসিস্ বিজু, মণি আমার ততক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। তোকে যে ও কী চোখেই দেখেছে জানিনে।

দেশে ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—তথাপি সে গেল না। পিতার তাগিদ-পত্রের কী যে উত্তর লিখিল তাহা সেই জানে। কিন্তু তাঁহার আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

দ্বিধার সহিত বলিলাম—আপনি গেলেই ত পারতেন, বাবা হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন।

সে ঘাড় বাঁকাইয়া উত্তর করিল—আমি যাব না, আমার খুসী। তোমার তাতে কী? কেন? আমাকে তাড়াবার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

লজ্জিত হইয়া চুপ করিলাম।

একদিন মণিকার কাছেই যাইতেছিলাম। পথে পাড়ার কয়েকটি বন্ধুর সহিত দেখা। তাহারা আমাকে না পাইয়া পাইয়া আমার আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় চলেছ হে?

ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—এই একটু এখানে।

—এখানে? সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল রোজই ত যাও, একদিন নয় নাই গেলে? চল একটু বেড়িয়ে আসি।

বলিলাম—না ভাই আমাকে যেতেই হবে।

—যেতেই হবে বটে? তবে যাও। সে হাত ছাড়িয়া, কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল—তোমার এই শিক্ষিতা নারীটি কোথাকার হে?

মুহূর্ত্তে আমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সকলে আবার হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেই কে একজন পিছন হইতে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল—হায়রে, যদি গান গাইতেও জানতাম। তাহারা অন্যদিকে চলিয়া গেল।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। তবে ত এই কথা লইয়া পাড়ায় কানাকানি চলিতেছে। আমার নিজের জন্য চিন্তা করি না,—কিন্তু মণিকা ? সে ত এই আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না। তার চেয়ে, হ্যাঁ, এইখান হইতেই ফিরি। না—না, আর আমার সেখানে যাওয়া চলিবে না।

আমাকে অবেলায় শুইয়া পড়িতে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন—বিজু, এমন ক'রে শুয়ে পড়লি যে ?

বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কোনমতে উত্তর করিলাম—এমনি।

কথা রাখিয়াছি, আজ দুইদিন যাই নাই। জানিনা মণিকা কি ভাবিতেছে! যাহা ইচ্ছা ভাবুক, কিন্তু আমি যে তার মঙ্গলের জন্যই তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম—এ কথা ত সে জানিল না!

চিঠি পাইলাম, মণিকা লিখিয়াছে—

বিজু!

জানিনে আবার কী দোষ করেছি। কিন্তু গান শিখে তোমার পরিশ্রম আমি আর বাড়াব না। তুমি একবার এসো,—কয়েকটা কথা আছে।—মণিকা।

থাকুক কথা। আমি আর যাইব না—যাইব না—যাইব না। ঈশ্বর জানেন—আমি একদিনের জন্যও ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করি নাই। তথাপি যখন এ মিথ্যা বদনাম উঠিল, আমি সহিতে পারিব, কিন্তু মণিকা পারিবে না। মণিকার জন্যই আমি মণিকাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। জোর করিয়া নিজেকে দমন করিতে লাগিলাম।

পাঁচ-ছয়দিন কাটিয়াছে, হঠাৎ আবার আর একখানা চিঠি—

—আজ রাত্তিরে চলে যাচ্ছি, আর দেখা হবে না। বাবা এসেছেন নিতে। একবার আজকে এসো—তোমার দুটী পায়ে পড়ি—একবার এসো।—তোমারই মণিকা।

আমারই মণিকা আমাকে যাইতে লিখিয়াছে—আর আমি এখনও নিরুদ্বেগে—ঘরে বসিয়া বিলম্ব করিতেছি। কী আশ্চর্য্য! ত্রস্তে জামা গায়ে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। চলিয়াছি—পিছন হইতে ডাক শুনিলাম—বিজু, শোন। দেখি, জ্যেঠামশায় ডাকিতেছেন। গেলাম। ধীরস্বরে তিনি বলিলেন—চেহারাখানা কি রকম হয়েছে একবার আর্শীতে দেখ গিয়ে। তোমার নিজের জন্য ভাবো আর না ভাবো তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমরা সমাজে বাস করি—আমাদের মুখ আর পুড়িও না—এই অনুরোধ। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে একথা আমার বলবার দরকার ছিল না।—যাও।

ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জামা ছাড়িয়া দাওয়ায় বসিয়া রহিলাম। সম্মুখে রাত্রির ঘনান্ধকারে মণিকার কালো এলোচুলের ইসারা বহিতে লাগিল, আর দূর আকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র, মণিকার গাঢ়কৃষ্ণ আয়ত আঁখির সজল বিদায় অভিনন্দন জানাইতে লাগিল।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল…

তারপর—

মধ্যে চার বৎসরের ব্যবধান। মা মারা গিয়াছেন, দেশের বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও জানি নাই যে, উপসংহার বাকী ছিল।

গ্রীষ্মের দ্বি-প্রহর। হ্যারিসন রোড হইতে কারখানার কাজ সারিয়া পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। সমস্ত পথ উত্তপ্ত—জনশূন্য—খাঁ খাঁ করিতেছে।

একখানা মোটর আমাকে ছাড়াইয়া কিছুদূর গিয়াই থামিয়া গেল। দেখিলাম, একটী মহিলা মাথা বাড়াইয়া আমাকেই ডাকিতেছেন,—শোন—

বিস্মিত হইয়া নিকটে যাইতেই চমকিয়া উঠিলাম—একি ! মণিকা ! বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। মনে হইল, এখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইব।

মণিকা বলিল–তোমাকে দেখেই চিনেছিলুম। যাক। এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই, বলিয়া গাড়ীর মধ্যে যে সুদর্শন ভদ্রলোকটী বসিয়াছিলেন তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—ইনি আমার স্বামী, ব্যারিষ্টার। কোলকাতায় দু'-তিনখানা বাড়ী আছে—আর—আচ্ছা যাও। এই ! চলো।

ড্রাইভার ষ্টার্ট দিতেই সে বলিল–আর শোন—ইনি খুব ভাল গানও গাইতে পারেন। যেয়ো একদিন নেমন্তন্ন রইল তোমার—বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল। নারীর মুখে এ রকম পৈশাচিক হাসি আর শুনি নাই।

সাঁ করিয়া মোটর বাহির হইয়া গেল। আমার মনে হইল মোটরটা যেন সারাপথ ওই মণিকার মতই হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে, বিশ্বশুদ্ধ লোককে কি একটা জানাইয়া দিতে দিতে চলিল।

মনে হইল, আর আমি বাড়ী যাইতে পারিব না—কিন্তু পারিয়াছিলাম।

রাত্রি বোধ হয় শেষ হইয়া আসিতেছে। পুষ্করের বুকের উপর হইতে চাঁদ বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছে। আর নয়,—এইবার শুইতে যাই। মঞ্জু একলা একলা শুইয়া রহিয়াছে। হয়ত ঘুমের ঘোরে সে আমাকেই স্বপ্ন দেখিতেছে ! হতভাগিনী নারী !

মঞ্জু মণিকার ফটো ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে—ভালই করিয়াছে। কিন্তু তাহার স্বামীর বুকের যে নিভৃত অংশ মোটরের চাকার দাগে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আছে তাহার কি উপায় সে করিবে ? ফল্গুর বালি খুঁড়িলে এক-আধফোঁটা জলের দর্শন হয়ত মেলে কিন্তু তাহাতেও সমগ্র ভাবে—ফল্গুকে পাওয়া হইল না।—আর না এইবার উঠি।

'তাইত ভাবি, যে আমি যেন একটা সেতু। তাহার এপারে ওপারে দুই নারী। একজন প্রথম যৌবনে সগৌরবে, স্পর্দ্ধিত পদে আমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, আর এক জন বহুদিন পরে ইহার ভগ্ন জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া, পার হইবার বিপুল দুরাশায় তীরে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া মরিতেছে…

—পাগল—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

রোগমুক্ত দুর্ব্বল শরীরটাকে কোনরূপে টানিয়া লইয়া গিয়া ধাড়োয়া নদীর ধারে একাই বসিয়াছিলাম। বৈদ্যনাথের এই পাহাড়ী নদীতে তখন জল একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। বিস্তৃত বালুকারাশির মধ্য দিয়া যে সংকীর্ণ ধারা কয়টী বহিয়া যাইতেছিল, তাহা নিতান্তই অগভীর ছিল। লোকজন অবলীলাক্রমে নদী পার হইয়া যাইতে ছিল। সেই স্বল্পজলেই একদিকে দুইজন মৎস্যজীবি তাহাদের শীকার অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল। দৃষ্টি তাহাদের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াছিলাম, যদি কিছু সংগ্রহ হয় আমিই কিনিয়া লইব।

হঠাৎ গোলমাল শুনিয়া দৃষ্টি ফিরাইতে হইল। দেখিলাম, একটা লোক ওপার হইতে নাচিতে নাচিতে এপারে আসিতেছে। তাহার হাতে একটা বড় লাঠি রহিয়াছে, তাহাতে লাল কাপড় জড়ান। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া পাড়ের উপর হইতে চার-পাঁচটী বালক খুব হাততালি দিতেছে। লোকটা সুর করিয়া যে কি বলিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে সে যে পাগল, তাহা বুঝিতে আমার মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না।

লোকটা নদী পার হইয়া সোজা রাস্তায় না গিয়া আমার দিকেই আগাইয়া আসিতে লাগিল। একে দুর্ব্বল শরীর, আবার সঙ্গে কেহ নাই, পাগলের খেয়ালে যদি কিছু করিয়া বসে, মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। সঙ্গের সম্বল লাঠিটা একটু শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিলাম। পাগল আমার সম্মুখে আসিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর নিজের বাঁশের লাঠিটা খুব উঁচু করিয়া ধরিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। জড়ানো লাল কাপড়ের খানিকটা খোলা অংশ হাওয়ায় নিশানের মত উড়িতে লাগিল। বড়ই বিপদে পড়িলাম ; নিকটে কোন লোক নাই যে, সাহায্য চাহিব। হঠাৎ নাচ থামাইয়া, লাঠিটা পাশে ফেলিয়া দিয়া পাগল আমার পায়ের অতি নিকটে দণ্ডবৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। প্রায় দুই মিনিট কাল এইরূপে কাটিল। পরে লাফাইয়া উঠিয়া, উবু হইয়া বসিয়া জোড় হস্তে বলিল—“বড়বাবু, আমি এতোয়ারী।”

সাহস করিয়া বলিলাম—“কি চাই তোমার ?”

সহজভাবেই উত্তর পাইলাম—“চাই না কিছু। আমি যে আপনার বাড়ীর মিস্ত্রী।”

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।—তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের এখানকার বাড়ী তৈয়ারী হয়, তখন এতোয়ারী নামে একজন ছোকরা রাজমিস্ত্রী অনেক দিন কাজ করিয়াছিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সেই ত বটে। কপালের কাটা দাগটা ঠিক আছে, কিন্তু চেহারার কি বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! সুগঠিত পেশীবহুল দেহ এক্ষণে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। চক্ষু কোটরগত, সম্মুখের কয়েকটা দাঁত ভগ্ন। সযত্ন রক্ষিত নিশিদিন তৈলসিক্ত দীর্ঘ কেশদামের চিহ্ন মাত্র নাই, মস্তক একেবারে মুণ্ডিত। বয়স বড় জোর পঁচিশ হইবে, কিন্তু চেহারায় দেখাইতেছে যেন পঞ্চাশের কাছাকাছি।

মনে কষ্ট অনুভব করিলাম। বলিলাম—“তোমার কি খুব অসুখ করেছিল ?”

এতোয়ারী উত্তর করিল—“না বাবু, অসুখ করে নি। মতিয়া মারা গেছে!”

“মতিয়া!”

মনে পড়িয়া গেল। মতিয়া নামে একটী কিশোরী মজুরণীও আমাদের বাড়ী কাজ করিয়াছিল। একদিন এতোয়ারী মিস্ত্রী ভারায় উঠিতে যাইতেছিল, সেই সময় মতিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানায় সে পড়িয়া যায় এবং বাঁশের খোঁচায় লাগিয়া তাহার কপাস অনেকটা কাটিয়া যায়। আমিই সে সময় 'টিংচার আইওডিন' দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছিলাম এবং মতিয়াকে খুব বকাবকি করিয়া তৎক্ষণাৎ কায ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম। পরের দিনই মতিয়ার মা আসিয়া মেয়ের কাযের জন্য কান্নাকাটি করিয়া করযোড়ে অনুরোধ জানাইতে, বলিয়াছিলাম—ও রকম বদমেয়েকে এখানে আসিতে দিতে চাহি না, আমাদের কাযের ক্ষতি হইবে। তাহার মা জানাইয়াছিল—আমি ভুল বুঝিয়াছি। মতিয়ার মত ভাল মেয়ে তাহাদের গ্রামে আর নাই। এতোয়ারীর সঙ্গে উহার বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া রহিয়াছে এবং শীঘ্রই বিবাহ হইবে। যে ঘটনাটাকে বিশেষ গুরু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, সমস্ত শুনিয়া তাহা অতি লঘু হইয়াই গিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ আবার মতিয়াকে কাযে বাহাল করিয়া লইয়াছিলাম।

"মতিয়া মারা গেছে, আহা!—কি হয়েছিল তার?"

"কিছু হয় নি বাবু, বিষ খেয়েছিল!"

"বিষ খেয়েছিল! কেন?

"বাবু, যদি দয়া করে শোনেন, ত বলি।"

সহানুভূতিতে মন ভরিয়া গিয়াছিল। বলিলাম —"বল এতোয়ারী, সবটাই শুনবো।"

এতোয়ারীর মুখ হইতে যাহা শুনিলাম, তাহাতে জানিতে পারিলাম—

দুইজনের মধ্যে ছেলেবেলা হইতেই ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তাহারা পরস্পরকে না দেখিয়া একদিনও স্থির থাকিতে পারিত না। এতোয়ারী যেখানে রাজমিস্ত্রীর কাজ পাইত,সেখানে যেরূপেই হউক মতিয়াকে মজুরণীর কাযে ভর্ত্তি করাইয়া দিত। দুইজনে একসঙ্গে কাযে আসিত এবং কার্য্যের শেষে একসঙ্গেই ফিরিয়া যাইত। এতোয়ারী যাহা উপায় করিত, তাহার অধিকাংশই মতিয়া ও তাহার মাতার সাহায্যের জন্য ব্যয় হইয়া যাইত। মতিয়া লাল রংএর কাপড় পরিতে বড় ভালবাসিত। এতোয়ারীই তাহাকে বরাবর লালশাড়ী কিনিয়া দিয়াছে। মতিয়ার মা সকল সময় আশ্বাস দিয়াছিল যে, এতোয়ারীর সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবে। গ্রামের কোন লোকেরই একথা অজানা ছিল না। কিন্তু এতোয়ারীর মাত্র কয়েকদিনের অনুপস্থিতির সুযোগে বেশী টাকা পণ লইয়া, গ্রামের আর একটী যুবা 'শনিচরা'র সঙ্গে মতিয়ার বিবাহ দিয়া দেয়। এতোয়ারী ফিরিয়া আসিয়াই সমস্ত জানিতে পারে এবং হৃদয়ে বিশেষ আঘাত পায়। সুযোগ বুঝিয়া সে গোপনে একদিন মতিয়ার সঙ্গে দেখা করে এবং দুইজনে অন্য দূরগ্রামে পলাইয়া যাইবার প্রস্তাব করে। মতিয়া কিন্তু সে প্রস্তাবে রাজী হয় না, এবং তাহাকে ভুলিয়া যাইবার জন্য ও আর একটী পাত্রী দেখিয়া শীঘ্র বিবাহ করার জন্য এতোয়ারীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানায়। মতিয়ার পরামর্শ কিন্তু এতোয়ারীর আদৌ মনঃপূত হয় না। সে এক অন্ধকার রাত্রে বিষ-মাখান বর্ষার আঘাতে 'শনিচরা'কে তার আঙ্গিনাতেই হত্যা করে। মতিয়া স্বামীর হত্যাকারীকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু কাহারও কাছে তাহার নাম প্রকাশ করে নাই। এই ঘটনার তিনদিনের মধ্যেই মতিয়া বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে। এতোয়ারী খবর পাইয়া দেখিতে গিয়া, প্রণয়িণীর মৃতদেহের নিকটে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। পরে আর কি ঘটিয়াছিল, তাহা তাহার বিশেষ মনে নাই। তবে মতিয়ার ঘরে যে লাল শাড়ীখানি ঝুলিতেছিল, সেখানি সে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়াছিল। সেই সময় হইতে সে একবারও

কাপড়টী কাছ ছাড়া করে নাই। যদিও গ্রামের সকলকেই এতোয়ারী পরে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে-ই দুইজনের মৃত্যুর কারণ, তথাপি কেহই পাগল বলিয়া তাহার কথা বিশ্বাস করিতে চায় না।

এতোয়ারী এতক্ষণ বেশ সহজভাবেই সকল কথা বলিতেছিল। শেষে দেখিলাম, তাহার চোখের ভাব একবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবু, আমায় মতিয়া খুব ভালবাসতো, নয়?"

বলিলাম—"বোধ হয়।"

"বোধ হয়!"—পাগল তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর লাঠিটা উঁচু করিয়া ধরিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া গান ধরিল—

"কিদিয়েভু—লালিরে মোন
জানিবোকে—মোনে
আমি—জানিবোকে—মোনে।"

গাহিতে গাহিতে, নাচিতে নাচিতে, পাগল আমার কাছ হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। আর একবারও পেছু ফিরিয়া দেখিল না।

—কন্যাদায়—

রায় শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, বি-এ, ও-বি-ই

দীর্ঘকাল প্রবাস-বাসের পর উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে ফিরিতেছি। ধূসর বর্ণের ক্ষেত্র, শুষ্কবৃক্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী, বাংলা অভিমুখে আসিতে আসিতে ক্রমেই পিছনে পড়িয়া গেল। রেলগাড়ী যখন আসানসোলের নিকট পৌঁছিল, তখন শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির হরিৎবর্ণের সমতল তৃণক্ষেত্র সবুজ মখমলের ন্যায় চোখ জুড়াইতে লাগিল। সঙ্গে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং মাতাঠাকুরাণী ছিলেন। ভাবিয়াছিলাম যে, কলিকাতা পর্য্যন্ত কামরাটী আমরা খালি তিনজনেই দখল করিয়া থাকিব; কিন্তু তাহা হইল না, গাড়ী যখন আসানসোলে থামিল, একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গে ষোড়শী এক তরুণীকে লইয়া সসব্যস্তে গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "আঃ, বাঁচলাম, আর কতদিন যে তোর জন্যে ভুগ্‌তে হ'বে জানি না!" মেয়েটী লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিল। ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া মনে হইল তিনি দারুণ চিন্তাক্লিষ্ট। গাড়ী ছাড়িলে পর তিনি উৎসুক হইয়া আমার পরিচয় লইলেন। আমি আত্মগোপন করিলাম; কিন্তু তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলাম যে, তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত। ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার সঙ্গে যে দুইটী স্ত্রীলোক ছিলেন তিনি তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যথার্থ পরিচয় দিবার কি আবশ্যক; বিশেষতঃ, আজকাল রেলে কতপ্রকার মারাত্মক লোক সহযাত্রী হ'ন। এই ভয়ে পূর্ব্বে নিজের যথার্থ পরিচয় দিই নাই; এবারও মাতাঠাকুরাণী এবং সহধর্ম্মিনীকে শুধু নিকট-আত্মীয়া বলিয়া পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোকটী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি সাগ্রহে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বোধ হয় বিবাহ্ হয় নি?" হঠাৎ আমি 'না' বলিয়া ফেলিলাম। ঘোমটার ভিতর হইতে আমার স্ত্রী যেন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উঠিলেন। কিন্তু মাতাঠাকুরাণী ঈষৎ হাসিলেন। ভদ্রলোকটী তখন আমার হাত দুইটী ধরিয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, নিশ্চয় আপনাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিব। স্ত্রীর মুখখানি দেখিলাম আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি ঘোমটা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

দুই

এই সময়ে আমার সাংসারিক ইতিহাস একটু বলা আবশ্যক। আমার স্ত্রী নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে এবং তাঁহার ও আমার বয়সের এত পার্থক্য ছিল যে, তিনি আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিতেন না। স্বভাবতঃই তিনি ভীরু। কথাবার্ত্তা বেশী কহেন না এবং অত্যন্ত শান্ত-স্বভাবা। তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা শান্তকুমার; তিনিও একেবারে গো-বেচারী, বরং বোকা বলিয়াই মনে হয়। আমার সঙ্গে কিন্তু তাঁহার অভিন্নহৃদয়। তাঁহার ভগিনীকে ঠাট্টা-তামাসা করিয়া আমি প্রায়ই বেকুব বানাইয়া দিতাম। তাহাতে তাঁহার রাগ হইত না। গৃহস্থের ছেলে, অন্নবস্ত্রেরও বেশ সংস্থান আছে, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই। যখনই বিবাহের কথা বলিতাম, তখনই শ্যালক-মহাশয় বলিতেন, "হাঁ, আমার মত পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু ছেলেকে আজকালকার শিক্ষিতা কি কোনও মেয়ে বিয়ে করে?"

সত্য কথা এই, তাঁহার পিতামাতারও এ বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের ভিতর একমাত্র আমি বিদেশে থাকি, সুতরাং তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল।

তিন

যথাসময় ট্রেণ হাওড়া পৌছিল। ভদ্রলোকটী আবার তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। আমি তাহার ঠিকানা লইয়া দেখা করিব অঙ্গীকার করিলাম।

কলিকাতায় হইতে মাতাঠাকুরাণীকে দেশে পৌছাইয়া দিয়া শ্বশুর বাড়ীতে স্ত্রীকে রাখিতে গেলাম। পথে যাইতে যাইতে তিনি বাস্তবিক বিবাহ করিব কি না এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি রাজনীতিজ্ঞের মত উত্তর করিলাম, "দেখ্‌তেই পাবে। তোমার কি বিশ্বাস ?"

তিনি আর বেশী প্রশ্ন করিতে সাহস পাইলেন না। শ্বশুর-বাড়ীতে ভালমানুষ শালাটীকে তাঁহার উপযুক্ত ভগ্নী কিন্তু আমার সংকল্পের কথা বলিয়া দিলেন। শান্তকুমার আমাকে এই বিষয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে পুকুরধারে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রহসন কতদুর গড়ায় দেখিবার জন্য আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দেখ, ভদ্রলোক ভীষণ কন্যা-দায়গ্রস্ত, তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত। তুমি কি আমি ঐ রকম অবস্থায় পড়্‌লে কিরকম কষ্ট পেতুম ভেবে দেখ। এক যদি তুমি মেয়ে-টিকে বিবাহ কর তা' হ'লে ভাল, না হ'লে অগত্যা আমাকেই কর্‌তে হবে।"

শান্তকুমার বিবাহ করিতে একেবারেই নারাজ; তিনি আজকালকার দিনে অবিবাহিত থাকাই প্রার্থনীয় মনে করেন। দেশের সেবা এবং গ্রামের উন্নতি এই সকল কার্য্যে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, এইরূপ কতগুলি লম্বা-চওড়া কথা আমাকে বলিলেন। আমি বুঝাইলাম যে, তিনি এখন একলা দেশসেবা করিতেছেন, বিবাহ হইলে বিনা ব্যয়ে একটী সহকর্ম্মিনী পাইবেন, তাহাতে তাঁহার পরিশ্রমের লাঘবও হইবে, ইত্যাদি। কিন্তু বোকা শালাটী কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না। অগত্যা আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমিই কন্যাদায় উদ্ধার করিব ; কিন্তু তাঁহাকে আমার সহিত বিবাহে যাইতে হইবে। তিনি প্রথমটা ভগ্নীর জন্য ঈষৎ ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু দেশসেবার পথে আত্মীয়ের ভালমন্দ চিন্তার স্থান নাই, তাহাতেই তিনি রাজি হইলেন। কিন্তু ইহাও স্থির হইল যে, আমাদের এই সিদ্ধান্তটী তাহার পিতামাতা এবং ভগ্নীর নিকট একে-বারে গোপন রাখিতে হইবে। প্রকাশ করিলে অবশ্য বিশেষ দোষ হইত না ; কারণ আমরা কুলীন,এবং আমাদের বংশের অনেকেই বহুবিবাহ করিয়া-ছেন। বিদেশে চাকুরী করিবার দরুণ এবং সাংসারিক অবস্থা আমার সচ্ছল হওয়ার জন্য বহুবিবাহ করিয়া শ্বশুর-বাড়ীর অন্ন ধ্বংস করিবার আবশ্যক হয় নাই।

চার

নির্দ্দিষ্ট দিবসে আমি ও শান্তকুমার কন্যাগৃহে উপস্থিত হইলাম। কন্যার পিতা আমারই ইচ্ছানুযায়ী শুভকর্ম্মের যতদূর সম্ভব গোপনে আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারই একান্ত আত্মীয় ভিন্ন আর বিশেষ কেহ কন্যাপক্ষে উপ-স্থিত ছিলেন না। যখন আমাকে বিবাহ-আসনে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল, তখন আমি সেখানে একলা যাইতে আপত্তি করিলাম। বলিলাম, "বরযাত্রীর ভিতর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আমার এই সঙ্গিটীকে যাইতে না দিলে আমি যাইব না। আমার অনুরোধ গ্রাহ্য হইল। সম্প্রদান-স্থলে সজ্জিত নববধূকে দেখিয়া শান্তকুমার আমার কাণে কাণে বলিলেন, "সত্যই

তুমি জিতেছ, মেয়েটী খুব সুন্দরী, hearty congratulation !"

আমার মাথায় বরের টোপর দেওয়া হইল। পাশে শান্তকুমার। দেখিলাম, তিনি একেবারে নির্ব্বাক্ এবং অনিমেষ-নেত্রে নববধূর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। একেই ত বোকাসোকা লোক, তাহার উপর তাঁহার এই তন্ময় অবস্থা দেখিয়া হঠাৎ আমার মাথা হইতে বরের টোপরটী খুলিয়া তাঁহার মাথায় পরাইয়া দিলাম। কন্যাকর্ত্তা ও সমবেত নরনারী "ও কি, ও কি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শান্তকুমারের তখন ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহাকে পলায়নপর দেখিয়া চাপিয়া ধরিলাম। কন্যাকর্ত্তাকে বুঝাইলাম যে, শান্তকুমার অতি সুপাত্র, তাঁহার বিবাহ হয় নাই এবং আমারও একাধিক বিবাহের আবশ্যক নাই। তাঁহাকে আরও বলিলাম, আমি তাঁহার কন্যাকে নিজে বিবাহ করিব এরূপ অঙ্গীকার কখনও করি নাই। কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিব এই কথাই বলিয়াছিলাম। কন্যাকর্ত্তা যখন শুনিলেন যে, আমার শ্যালক তাঁহারই বন্ধুপুত্র এবং উভয় সংসারের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে, তখন আর তিনি বিবাহে আপত্তি করিলেন না। শুভকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল—তবে আমায় সারারাত্রি শান্তকুমারকে নজরবন্দীতে রাখিতে হইয়াছিল, পাছে 'বাসর-ঘর' হইতে তিনি পলাইয়া যান।

পাঁচ

পরদিন সশব্দে নববধূ ও শান্তকুমারকে লইয়া আমি শ্বশুর-বাড়ী উপস্থিত হইলাম। রঙ্গ করা আমার চিরকালই কুঅভ্যাস। সেজন্য বাজনদারদের সর্দ্দারকে আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে খবর দিতে বলিলাম যে, জামাইবাবু 'নূতন বৌ' লইয়া আসিতেছেন। বলাবাহুল্য, আমার স্ত্রী রেলগাড়ীর ঘটনা এবং আমার কন্যাদায় উদ্ধারের কথা তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন। নববধূর আগমন শুনিয়া আমার স্ত্রী কক্ষরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং শাশুড়ী-ঠাকুরাণী "ও গো আমার কি সর্ব্বনাশ হোলো গো !" এই চীৎকারে পল্লীগ্রাম তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। ঢাকের বাদ্য এবং তাঁহার চীৎকারে পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার বাটীতে আসিয়া পড়িল। আমি যখন অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম, তিনি আমাকে নানাপ্রকার সময়োচিত মধুর ভাষায় অভিভাষণ করিলেন। জানালা দিয়া দেখিলাম,—অর্দ্ধাঙ্গিনীর মুখ এবং চক্ষু কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া নব বর ও বধূকে গৃহে লইয়া আসিলাম। শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তখনও অঙ্গনে শায়িতা। যখন দেখিলেন তাঁহার গুণধর পুত্রের মাথায় টোপর এবং নববধূর সহিত তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল বাঁধা রহিয়াছে, তখন তিনি ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কর্ণে চীৎকার করিয়া প্রকৃত ঘটনাটী বুঝাইয়া দিলাম।

সুন্দরী পুত্রবধূ দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার কন্যাকে জানালা দিয়া ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। আমার সরলা অর্দ্ধাঙ্গিনী আরক্ত বিস্ফারিত নেত্র ও গণ্ডদ্বয় লইয়া হাসিমুখে নববধূকে পাল্কী হইতে নামাইয়া ভিতরে লইয়া গিয়া আমাকে বলিলেন, "উঃ, কত তামাসাই জান !"

—হারানো নক্ষত্র—

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সনেটের মাঝের দু'টো লাইনের মিল নিয়ে ভারি একটু বিপদে পড়েছি—যে মিলই দিই কিছুতেই পছন্দ হয় না—এমনি সময় চাকরটা এসে হঠাৎ ডাক্‌লে—"হুজুর!"

মাথা তুলে চাইতেই সে বল্‌লে—"দু'টো দেবদূত আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লুম—"দাঁড়িয়ে তো আছে, তাদের নামের কার্ড এনেছ?"

চাকরটা দু'খানা কার্ড চোখের সাম্নে তুলে ধর্‌ল—পড়্‌লুম—একজনের নাম হেলিল আর একজনের নাম জাফেল। দেবদূতই বটে! বল্‌লুম—"ভেতরে নিয়ে আয়।"

প্রথমে মনটা খিঁচ্‌ড়ে উঠেছিল, কিন্তু নাম দু'টো দেখে এইবার খুশী হ'য়ে উঠ্‌লুম। দেবদূত এসেছেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে—দেবদূত!

ডানা গুটিয়ে তাঁরা ঘরে ঢুক্‌লেন—মস্তবড় ডানা। প্রত্যেকখানা ডানাতে সাতটি ক'রে পালক। সেই পালক দিয়ে ঝর্‌ছে কুয়াসার গায়ে যেন প্রভাত সূর্য্যের আলোর ঝর্‌ণা - ঝর্‌ছে যেন রামধনুকের সাতটি রঙ্। বরফের ওপরে খানিকটা লাল আবীর ঢেলে দিলে যে বর্ণের আভা ফুটে' ওঠে দেহের বর্ণ তাদের ঠিক তারি মতো।

আঙুল দিয়ে দু'খানা আসন দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লুম—"বসুন।" তারপর স্নিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম তাঁদের এই আকস্মিক অভিযানের কারণ।

হেলিল বল্‌লেন—"ষোল বৎসর আগে শরতের এক সুন্দর রাত্রিতে আমি এবং জাফেল আকাশের সবুজ কার্পেটের ওপর বিলিয়ার্ড খেল্‌ছিলুম।"···

বাধা দিয়ে বল্‌লুম—"মাফ্ করুন, আমার মনে হয়, আকাশের রঙ্ শরতের রাত্রে হয় সমুদ্রের জলের মতো নীল।"

"বিপুল আকাশের কোনো কোনো যায়গার রঙ্ অবশ্য নীল ছিলই—কিন্তু পারস্যের ওপরে যে যায়গাটা তার রঙ্ ছিল গাঢ় সবুজ। সে রঙে দু'টো চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।"

আমি উত্তর দিলুম না।

হেলিল আবার বল্‌তে সুরু কর্‌লেন—

"বল ছিল আমাদের তারা—আকাশের সব চেয়ে সুন্দর তারাগুলো।

আমি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"কিন্তু কি দিয়ে ঘা দিচ্ছিলেন সেই তারার বলে?"

"ধূমকেতুর পুচ্ছ। খেলা তখন খুব জ'মে উঠেছে—জিৎ আমার হয়-হয়, খেয়ালের ঝোঁকে জোরে একটা ঘা বসিয়ে দিতেই হঠাৎ দু'টো তারা আকাশের প্রান্ত ডিঙিয়ে ছট্‌কে পড়্‌ল।"

"ছট্‌কে পড়্‌ল?"

"হ্যাঁ, দিক্‌চক্রবালের প্রান্ত ডিঙিয়ে ছট্‌কে পড়্‌ল। এ যে কতবড় দুর্ঘটনা তা' বোঝা কঠিন নয়। স্বর্গ থেকে দু'টো তারা হারিয়ে যাওয়া! স্বর্গের রাজা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন—যে পর্য্যন্ত তারা দু'টো খুঁজে' না বা'র কর্‌তে পার্‌ব, সে পর্য্যন্ত স্বর্গের কোনো আনন্দে আর আমাদের যোগদানের অধিকার রইল না।

"এই ষোল বৎসর ধ'রে আমরা খুঁজে' বেড়াচ্ছি সেই তারা দু'টোকে। দুনিয়ার এমন স্থান নেই যেখানে খুঁজি নি। কিন্তু হায়, কোথাও পেলুম না তাদের সন্ধান!

"এমনি ক'রে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠে' যখন স্বর্গের আনন্দ হ'তে চির-

নির্ব্বাসনের জন্য আমাদের হাত প্রস্তুত ক'রে তুলেছে, তখনই দু'টো দীপ্ত চোখের খবর পেয়ে আমরা তোমার কাছে ছুটে' এসেছি। আমরা তোমার স্ত্রীর চোখ দু'টোর কথা বল্‌ছি। আমাদের খবর যদি ঠিক হয়, এই মর্ত্ত্যে চোখের বদলে আমাদের স্বর্গের সেই তারা দু'টোকেই তিনি তাঁর চোখের ভেতরে পুরে' রেখেছেন। সেই তারা দু'টো তাঁর কাছ থেকে আমরা ফিরিয়ে নিতে চাই এবং আমাদের বিশ্বাস আছে, তিনি হয়তো তাতে অস্বীকৃতও হবেন না।"

আমার প্রিয়তমার চোখ দু'টো এরা নিয়ে যাবে —কথাটা মনে হ'তেই ভয়ের বিহ্বলতা বুকের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দোলা দিয়ে গেল। কিন্তু স্বর্গ-বঞ্চিত এই দু'টি দেব-দূতকেই বা কি ক'রে আমি প্রত্যাখ্যান করি! নিরুপায় হ'য়ে অবশেষে মানসীকে ডেকে পাঠালুম এবং সে আস্‌তেই অল্প কথায় বুঝিয়েও দিলুম তাকে অবস্থার পরিস্থিতিটা।

মানসী শুনে' বিস্মিতও হ'লো না, বিচলিতও হ'লো না। কেবল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কি একটা কথা ভেবে নিলে, তারপর আগন্তুকদের দিকে যতদূর সম্ভব চোখ দু'টো বিস্ফারিত ক'রে দিয়ে সে বল্‌লে—"দেখুন, এই তারাই আপনারা খুঁজে' ফির্‌ছেন কি না!"

আগন্তুকেরা আরো কাছে এগিয়ে এলেন, তারপর অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাঁরা দেখ্‌তে সুরু কর্‌লেন মানসীর অপূর্ব্ব উজ্জ্বল সেই চোখ দু'টোকে। ভালো ক'রে দেখে নিজেদের ভেতরেই মৃদুকণ্ঠে তাঁরা কি খানিকটা বলা-বলি কর্‌লেন। অবশেষে হেলিল বল্‌লেন—"না, ষোল বৎসর আগে যে জ্যোতিষ্ক দু'টো স্বর্গ হ'তে হারিয়েছিল এরা তারা নয়। আমাদের সে তারার দীপ্তি ছিল অবশ্য সেই শারদ রাত্রিতে আকাশে যতগুলো তারা ফুটেছিল তাদের সবার চেয়েই বেশী; কিন্তু এ চোখের ভেতরে যে তারা জ্বল্‌ছে, তাদের দীপ্তি সে তারা দু'টোর চেয়েও বেশী—এরা ঢের বেশী উজ্জ্বল।"

হতাশ হ'য়ে দেবদূতেরা ফিরে' গেলেন। তাঁদের সেই ম্লান বিষন্ন মুখের দিকে চেয়ে ভারি কষ্ট হ'লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সোয়াস্তির নিঃশ্বাসও ফেল্‌লুম এই মনে ক'রে যে, প্রিয়তমার চোখ দু'টোর তারা কোনো ক্ষতি কর্‌তে পারে নি।

কিন্তু মানসী? দেবদূতেরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে-না-যেতেই সে যেন অট্টহাস্যে একেবারে ফেটে পড়্‌ল। তারপর হাসি থাম্‌লে সে বল্‌লে —"ভারি চালাকি করা গেছে - কি বল?"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"কেমন?"

সে বল্‌লে—"মা আমাকে হাজারোবার বলেছেন যে, আমার জন্মের পরেই দু'টো তারা জানালা দিয়ে ঢুকে' সোজা আমার চোখের ভেতরে প্রবেশ করেছিল। স্বর্গদূতেরা যখন আমার চোখ অভিনিবেশের সঙ্গে দেখ্‌ছিলেন, তাই মনে মনে আমি তখন ভাব্‌ছিলুম সেই মুহূর্ত্তের কথাটা— যখন আমাদের মিলনের পর প্রথম চুমোর রেখা আমার অধরে তুমি মুদ্রিত ক'রে দিয়েছিলে। কারণ আমি ঠিকই জান্‌তুম, সেই আনন্দের স্মৃতি আমার চোখে এমন একটা আলোর ছাপ এঁকে দিয়ে যাবে, যার কাছে স্বর্গের তারার দীপ্তিও ম্লান হ'য়ে যায়।" *

---

* ফরাসী সাহিত্যিক Catulle Mendes-এর গল্প হইতে।

—টিউবওয়েল—

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

সাত

(দীনেশের কথা)

বাবা স্থির করলেন, রমেশের সঙ্গে আমাকেই যেতে হবে মেদিনীপুরে নটবরবাবুর ছোটমেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বড়-দা' যেতে পারবেন না, তাঁর কলকাতাতেই সেদিন কি বিশেষ দরকার আছে। মেজ-দা' ওই এক রকমের মানুষ, কোথাও তিনি যেতে চান না। বাবার শরীর ভাল নয়; তাঁর যাওয়া হ'তেই পারে না। অতএব, বাবা বল্‌লেন, "দীনেশ, তোমাকেই মেদিনীপুরে যেতে হচ্চে।"

বাবার আদেশ অমান্য করবার যো নেই। তিনি যদি অদেশ করতেন, তা' হ'লে হাজার কাজ ফেলেও বড়-দা', মেজ-দা'কে যেতে হ'ত।

আমি বল্‌লাম, "বেশ, আমিই শুক্রবারে রমেশকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুর যাব।"

মা বললেন, "সুধু শ্রীপতির বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করলেই হবে না; আরও একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। আর সে কাজ তুমি ছাড়া নরেশ, কি পরেশের দ্বারা হবে না। তারই জন্য কর্ত্তা তোমাকে পাঠাচ্ছেন।"

আমি বললাম, "তা' হ'লে আমি যে-সে ব্যক্তি নই। তোমার তিন ছেলের মধ্যে আমিই তা' হ'লে সবার ভাল, কাজের লোক।"

মা বললেন, "সে কথা যে সকলেই বলে। নরেশই ত তোমাকে পাঠাতে বল্‌ল।"

আমি বললাম, "তা' বেশ যাব; বিয়েতে খুব খাটব, পেট ভ'রে লুচিমণ্ডা খাব, আস্‌বার সময় তোমাদের জন্যও ছাঁদা বেঁধে আন্‌ব। কিন্তু, আর একটা কি কাজ করতে হবে, তা' ত বুঝতে পারছি নে।"

মা বললেন, "তোমাকে ওই পথে একবার রমেশদের গ্রামে যেতে হবে, আর সে কথা আগে তাকে কিছুতেই জান্‌তে দেবে না।"

আমি বল্‌লাম, "সে কি ক'রে হবে? সেখানে যাবার ব্যবস্থা তার সাহায্য না নিয়ে কি ক'রে করব। তারপর, সে যদি যেতে না চায়, তা' হ'লে কি হবে? আমি ত তাদের গ্রাম কোথায়, তা' জানি নে।"

মা বললেন, "শ্রীপতিকে বল্‌লেই সে সব ঠিক্ করে দেবে। সে ত আর বেশী কথা নয়। রমেশ-দের গ্রাম আমলাবেড়; মেদিনীপুর থেকে ছ' ক্রোশ। ভাল রাস্তা নেই, যা' আছে, তাতে গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায়; ঘোড়াগাড়ী সে পথে চলে না। তোমরা ত শুক্রবার রাত্রে মেদিনীপুর যাবে। শনিবার বিয়ে। তুমি শনিবার প্রাতঃকালেই শ্রীপতিকে সঙ্গে নিয়ে একখানা গরুর গাড়ী ঠিক্ কোরো। সে যেন রবিবার খুব ভোরে, চাই কি একটু রাত থাক্‌তেই নটবরবাবুর বাড়ী থেকে তোমাদের নিয়ে আমলাবেড়ে যাত্রা করে। ছ' ক্রোশ রাস্তা ঠিক বেলা ন'টা-দশটার মধ্যে পৌঁছে দেবে। আবার বিকেলবেলা রওনা হয়ে রাত আটটা-ন'টার মধ্যেই মেদিনীপুর আস্‌তে পার্‌বে। যেতে-আস্‌তে কষ্ট হবে; বারো ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে যাওয়া আসা। পাল্‌কীতেও যাওয়া যায়; কিন্তু, রমেশ তাতে আপত্তি করবে; সে যে

ছেলে, পাল্‌কী চড়তেই চাইবে না। কাজেই গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য উপায় নেই।"

আমি বললাম, "অত হাঙ্গামা কেন? হেঁটে গেলেই চল্‌বে। ছ' ক্রোশ রাস্তা আমি ঠিক যেতে পারব। এই যে সেবার আমরা বারাকপুর হেঁটে গিয়েছিলাম। তেমন কষ্ট ত হয় নি। তবে আস্‌বার সময় রেলে এসেছিলাম।"

মা হেসে বললেন, "মেদিনীপুর থেকে আমলা বেড়ে পর্য্যন্ত তোমার জন্য বারাকপুর ট্রাঙ্করোডের মত রাস্তা ত কেউ তৈরী করে রাখে নি। রমেশের কাছে শুনেছি, মাঠের মধ্য দিয়ে অমনি কোন রকমে পায়ে চলা পথ; সেই পথেই অতি কষ্টে গরুর গাড়ী চলে। আর এক কাজ করলে পারবে। রবিবার সেখানে গিয়ে যদি ক্লান্ত হ'য়ে পড়, তা' হ'লে সেদিন নাই বা ফিরলে। রাতটা সেখানে বিশ্রাম ক'রে, সোমবার সকালে ফিরলেই পারবে।"

আমি বললাম, "তার জন্য ভাবছি নে। যেতে পারব। গরুর গাড়ীতে যেতে যদি কষ্টবোধই হয়, মধ্যে মধ্যে গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে গেলেই হবে। কিন্তু, রমেশ যদি যেতে না চায়, তা' হ'লে কি করব।"

মা বললেন, "জোর ক'রে নিয়ে যেতে হবে ব'লেই ত তোমাকে পাঠাচ্ছি। তোমার কথা সে ফেল্‌তে পারবে না। নিতান্তই যদি সে জেদ করে, তা' হ'লে তুমি বোলো, 'না গেলে তুমি আমার সঙ্গে, আমি একলাই যাব।' এই ব'লে তুমি গাড়ীতে উঠে বস্‌লে রমেশ তোমার সঙ্গে না গিয়েই পারবে না।"

আমি বললাম, "তা' যেন হ'ল, তারপর সেখানে গিয়ে কি করতে হবে?"

মা বললেন, "রমেশের মা ও দিদিকে আমার নাম ক'রে বল্‌বে যে, তাঁদের কলকাতায় গঙ্গাস্নান করবার জন্য নিয়ে যেতে তোমাকে আমি পাঠিয়েছি। তাঁদের কলকাতায় আস্‌তেই হবে। তাতে তাঁরা যদি আস্‌তে না চান, তা' হ'লে আর কি করবে, ফিরে আস্‌বে। রমেশের অবস্থা কেমন, তার মা-বোন্‌ কেমন, সংসার চলবার কি সংস্থান আছে, এই সকলের খোঁজ নেবার জন্যই তোমার যাওয়া। তারপর, তাঁরা যদি আস্‌তে সম্মত হন, তা' হ'লে ত কথাই নেই। আর একটা কথা জান্‌তে হবে। রমেশ সেদিন বলছিল, পাঁচশ' টাকা জমিয়ে তখন সে বল্‌বে, কি জন্য বিদেশে চাকরী ক'রে সে টাকা জমাতে চায়। তার আগে কোন কথা সে বল্‌বে না। কিসের জন্য তাকে এমন ভাবে পরের চাকরী ক'রে পাঁচশ' টাকা জমাতেই হবে, এই খবরটা নেওয়া চাই।"

আমি বললাম, "এ সব খবর আমি ঠিক নিয়ে আস্‌ব। আর তাঁরা যদি আস্‌তে চান, তা' হ'লে এক-আধদিন ব'সে থেকে, সেখানে যদি পালকী না পাওয়া যায়, তা' হ'লে মেদিনীপুরে লোক পাঠিয়ে পাল্‌কী নিয়ে গিয়ে তাঁদের আন্‌তে হবে; গরুর গাড়ীতে তাঁদের আনা হবে না।"

মা বললেন, "সে ত ঠিক্‌ কথা। তার ব্যবস্থা তোমার বিবেচনা মত কোরো। কাল মঙ্গলবার; কাল-পরশুর মধ্যেই বিয়ের তত্ত্ব, আর রমেশের বাড়ীর জন্য কিছু জিনিষ-পত্র, তার মা আর বোনের জন্য কয়েক জোড়া কাপড় আমি গুছিয়ে রাখব। রমেশকে কোন কিছু দেখাবও না, জান্‌তেও দেব না।"

আমি বললাম, "বাবা এ সব কথা জানেন ত?"

মা বললেন, "তাঁর পরামর্শ মতই ত এ সব ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনিই ত বল্‌লেন, নরেশ কি পরেশকে দিয়ে এ সব হবে না; দীনেশই পারবে। তাই তোমাকে পাঠাচ্ছি।"

আট

শুক্রবারে রমেশ যখন নয়টার আগে প্রেসে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি বল্‌লাম, "মনে আছে ত, পাঁচটায় ট্রেণ। তুমি ঠিক চারটায় বাড়ী

আসবে। বাবা তোমার ম্যানেজারকে তোমার ছুটী দেবার জন্য ব'লে রেখেচেন; সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি দেরী কোরো না।"

রমেশ হাসতে হাসতে চ'লে গেল। আমি তখন মায়ের কাছে গেলাম। তিনি একটা নূতন ষ্টীল ট্রাঙ্ক খুলে তার মধ্যে যে সব জিনিষ ছিল, সব মেজেয় সাজালেন। তারপর আমাকে সেগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে বাক্সে তুল্‌তে লাগ্‌লেন; বল্‌লেন, "দেখ দীনেশ, এ নূতন ট্রাঙ্কে যা' কিছু দিচ্ছি, এ সব রমেশের বাড়ীর জন্য। এর কিছু-কিঞ্চিৎ তোমাদেরও দরকারে লাগবে। এই দেখ—রমেশের মা, আর তার দিদির জন্য চারখানা ক'রে আটখানা কাপড়, তারপর এই দু'খানা গামছা, এই দু'খানা বিছানার চাদর, এই দু'টো মশারী। এ তোমাদেরও কাজে লাগবে। যদি সেখানেই রাতটা থাক্‌তে হয়, তা হ'লে মশারীর দরকার হবে। তারপর দেখ, এই সব ঠোঙ্গাতে রান্নার মসলা, পানের মসলা সব রইল, বুঝলে। তারপর, সে ত পাড়াগাঁ, তোমার চা চাই। সেই জন্য চা দিলাম, চিনি দিলাম, কন্‌ডেন্স মিল্ক দিলাম, দু' সেট চায়ের পেয়ালা দিলাম, একটা কেট্‌লি দিলাম, একটা স্পিরিট ল্যাম্প, আর এক বোতল স্পিরিটও দিলাম। একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনও এই ট্রাঙ্কের মধ্যে দিলাম। এক বাণ্ডিল বাতি আর এক প্যাকেট দিয়াশলাইও রইল। এসব ফিরিয়ে এনো না, সবই সেখানে রেখে এসো; ট্রাঙ্কটাও রেখে এসো। এ ট্রাঙ্ক আর তোমাকে মেদিনীপুরে খুল্‌তে হবে না, একেবারে চাবি বন্ধ ক'রে রেখো। পথের মধ্যে রমেশকে কিছু দেখিও না। আর এই স্যুটকেসে নটবরবাবুর মেয়ের জন্য সাড়ী, ব্লাউস, আয়না, চিরুণী, কিছু এসেন্স, সিঁদুর, ফিতে প্রভৃতি রইল, ওখানে থেকে টাকা পাঁচেকের মিষ্টি কিনে এই সবগুলি দিও। রমেশের পক্ষ থেকে এই সাড়ীখানি দিও। আর তোমাদের দু'জনের কাপড়-জামা এই সব রইল। হোল্ডঅলের মধ্যে তোমাদের বিছানা মশারী সব রইল। আমলাবেড়ে যাবার সময় ওই নূতন ট্রাঙ্কটা আর এই হোল্ডঅল্‌টা নিয়ে যেও। রাত্রে থাকতে হ'লে বিছানার দরকার হ'তে পারে।"

আমি হেসে বল্‌লাম, "তা' হ'লে কিছু চাল-ডাল, নুন-তেল-ঘি আর বাদ রাখ্‌লে কেন মা? একেবারে ঘর-গৃহস্থালীর সব ব্যবস্থা হয়ে যেত।"

মা বল্‌লেন, "নিতান্ত দরকারী, অথচ পাড়াগাঁয়ে পাওয়া যায় না, এমনি যা' কিছু তাই গুছিয়ে দিলাম; চাল-ডাল সবখানেই মেলে। দেখ দীনেশ, আর একটা কাজ এখনই সেরে রাখ। এখনই গিয়ে দু'খানা টিকিট কিনে রাখ। কি জানি, রমেশের ছাপাখানা থেকে আস্‌তে যদি একটু দেরীই হয়, তা' হ'লে তখন তাড়াতাড়ি করতে হ'বে। তার চাইতে, টিকিট কেনা থাক্‌লে আর কোন গোল নেই। তাই যাও।"

রমেশ ঠিক্ চারটার সময় প্রেস থেকে এলো। তাকে হাত-মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিতে ব'লে আমি চাকরকে একখানা গাড়ী আন্‌তে পাঠালাম। একটু পরেই গাড়ী এলো।

চাকরেরা যখন বড় একটা ট্রাঙ্ক, একটা স্যুট কেশ্, আর একটা হোল্ডঅল গাড়ীতে তুলছিল, তখন রমেশ এসে বল্‌ল, "ছোড়্-দা', এত সব গাড়ীতে তুল্‌ছেন কেন? থাক্‌বেন ত একটা দিন, তার জন্যে এত লটবহর কেন? এ দেখে মনে হচ্ছে আমরা বুঝি মাস তিনেকের জন্য দিল্লী-লাহোর যাচ্ছি।"

আমি বল্লাম, "সে পরামর্শ তোমার কাছে নিতে হবে না। যাচ্ছি এক যায়গায়, বড় সহরে, দশজন সম্ভ্রান্ত লোক আস্‌বেন, সেখানে কি একবস্ত্রে যেতে পারা যায়। তারপর, তাঁদের বাড়ীতে আরও লোকজন নানা স্থান থেকে আস্‌বেন ত। এত লোকের বিছানা মশারী যোগান কি সহজ কথা। নিজেদের দরকারী যা' কিছু, তা' সঙ্গে নিয়ে গেলে কোন অসুবিধাই হবে না, বুঝলে পণ্ডিত। এখন গাড়ীতে ওঠো, সময় বেশী নেই।"

রমেশ বল্‌ল, "ও, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমার ছোট দাদা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় মেদিনীপুরে যাচ্ছেন।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তাই-ই। এখন বক্তৃতা বন্ধ রেখে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত গাড়ীতে ওঠো।"

রমেশ আর বাক্যব্যয় না ক'রে গাড়ীতে উঠ্‌ল। তারপর পথের মধ্যে বল্‌ল, "ছোড় দা', কাল বিয়ে শেষ হয়ে গেলে রাত্রি একটার গাড়ীতেই কিন্তু আমরা ফিরে আস্‌ব, কেমন?"

আমি বল্‌লাম, "এখনও হাবড়ার ব্রিজ পার হই নি, এখনই আস্‌বার কথা। চল ত যাই, তারপর দেখা যাবে, কখন কি করি।"

রমেশ এ কথার আর উত্তর দিল না। গাড়ী হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছলে রমেশ বল্‌ল, "দেখুন ছোড়-দা', এইটুকু পথ, এর জন্য পয়সা খরচ ক'রে গাড়ীভাড়া না করলেই হ'ত। ঘরের গাড়ীখানা যদি মেরামত হ'তে না যেত, তা' হ'লে কথা ছিল না, অকারণ পয়সা খরচ আমি সহ্য করতে পারি নে।"

এ পাগলের কথায় আর কি জবাব দেব।

কুলী ডেকে ট্রাঙ্ক বিছানা তার মাথায় দিয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে যেতেই রমেশ চেঁচিয়ে উঠল, "ও ছোড়-দা', গাড়ীতে উঠ্‌তে যাচ্ছেন যে, টিকিট কাট্‌লেন না। টিকিট না দেখালে গাড়ীতে উঠ্‌তে দেবে না, তা' বুঝি জানেন না?"

আমি বল্‌লাম, "ভাল বিপদে পড়লাম তোমাকে নিয়ে রমেশচন্দ্র! তুমি কোন চিন্তা কোর না, টিকিট ঠিক আছে, আগেই সে কাজ শেষ ক'রে রেখেছিলাম।"

আমি দু'খানি সেকেণ্ড ক্লাসের উইকএণ্ড রিটার্ণ টিকিট কিনেছিলাম, কুলীরা যখন গাড়ীর দুয়ার খুলে মালপত্র তুলতে যাবে, তখন রমেশ দৌড়ে এসে তাদের বল্‌ল, "ওরে, এ গাড়ী নয়। এ যে সেকেণ্ড ক্লাস। আমরা থার্ড ক্লাসে যাব।"

আমি হেসে বল্‌লাম, "রেল কোম্পানী আজ একেই থার্ড ক্লাস ক'রে দিয়েছেন। তোমার কাছে বেশী মাসুল কেউ চাইবে না।"

আচ্ছা মানুষকে সঙ্গী করেছি! যাক্, যথা-সময়ে খড়্গপুরে গাড়ী বদল ক'রে মেদিনীপুরে পৌঁছলাম। ষ্টেশনে শ্রীপতিবাবু উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা নটবরবাবুর বাড়ীতে গেলাম।

ক্রমশঃ

—জলসত্র—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি-মশায় শিষ্যবাড়ী যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েচে। জ্যৈষ্ঠমাসের খররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস আগুন। মাঠের চারিধারে কোনোদিকে কোন সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক-আধটা বাব্‌লা গাছ যা' আছে তা' পত্রশূন্য। মাঠের ঘাস রোদপোড়া, কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হ'য়ে উঠলো, আর গায়ে রাখা যায় না। এক-একটা আগুনের ঝলকের মত দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখ-মুখে সূচ বিঁধ্‌ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা এ মাঠ পার হ'তে যাওয়া যে ইচ্ছে ক'রে প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, এ কথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিম দিকে অনেকদূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যে দিকে চোখ যায়, সে দিকেই কেবল চক্‌চকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব চট্‌চটে হ'য়ে এল। তৃষ্ণা এত বেশী হ'ল যে, সাম্‌নে ডোবার পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা' তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্য্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তাতো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ কর্‌তেই হবে। ঘেমে তিনি নেয়ে উঠলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগল। জিব জোর করে চুষলে তা' থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মত শুক্‌নো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচ্‌চে, চক্‌চকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণী-হাওয়া গরম বালি, ধুলো, কুটো উড়িয়ে নাকে-মুখে নিয়ে এসে ফেল্‌ছে। অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখ্‌তে লাগলেন। মনে হ'তে লাগল,—একটু ঘন সবুজ মত যদি কোন পাতাও পাই, তা'হ'লে চুষি। জীবনে তিনি যত ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন, তা' এবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগ্‌ল। তাঁর বাড়ীর পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা, পাহাড়পুরের কাছারীর ইঁদারার জল সে তো একেবারে বরফ, কবে তিনি শিষ্যবাড়ী গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিনে তারা তাঁকে বড় শাদা কাঁসার ঘটী ক'রে নতুন কলসীর জল খেতে দিয়েছিল, সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কন্‌কন্ করে। আচ্ছা, এখন যদি সেইরকম এক ঘটী জল কেউ তাঁকে দেয়?...তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের কল্‌জে পর্য্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠ্‌ল। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচুচুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়ল তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই; আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হ'তে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জলতৃষ্ণায় তারা আর চল্‌তে অক্ষম হ'য়ে গরম বালির ওপর ছটফট্ করে প্রাণ হারিয়েছে!...

সত্যিও তো! এখনও তো দু'ক্রোশ দূরে গ্রাম, যদি তিনিও?...

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন। এই পথ হাঁটার শেষে কোথায় যেন এক ঘটী ঠাণ্ডা কন্‌কনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ হাঁটার বাজী জিতলে সেই জল ঘটীটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মত চল্‌ছিলেন। আধক্রোশটাক পথ চলে' উলু-খড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধ হয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোন পুকুর হয়ত থাক্‌তে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে?

বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র। চার-পাঁচটা নতুন জালায় জল। এক পাশে এক-রাশি কচি ডাব। এক ধামা ভিজে ছোলা। একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়। একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা। বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এমুখে অঞ্জলি পেতে জল পান কর্‌ছে।

গাছতলায় যারা বসেছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি-মশায়কে তারা খুব খাতির কর্‌লে। একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ঠাকুর মশায়ের আগমন হচ্ছেন কোথা থেকে?"

একজন বল্‌লে, "আহা, সে কথা রাখো, বাবা-ঠাকুর একটু ঠাণ্ডা হোন্।"

শিরোমণি-মশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটা, প্রায় দু'তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা ঝুরি চারি-দিকে নেমেচে। একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙ্গে নিয়ে এল নল করবার জন্যে। আঃ, কি ঝিরঝিরে হাওয়া! এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরী তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হ'ল। একজন বল্লে, "ঠাকুর-মশায়, হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। ভাল সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা, সেবা ক'রে একটু জল খান্, এই রোদে এখন আর যাবেন না, বেলা পড়ুক।"

তারপর শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—"এ জলসত্র কাদের?"

"—আজ্ঞে, ঐ আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস নাম শুনে ছেন?"—শিরোমণি মশায় বল্লেন,—"বিশ্বেস? সদ্‌গোপ?"

"—আজ্ঞে না, কলু।"

সর্ব্বনাশ! নতুন মাটীর জালা ভর্ত্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত্ত শিরোমণি-মশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর এক মুহূর্ত্তে কর্পূরের মত উবে গেল, কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কি ক'রে জল খাবেন? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্র প্রতিগ্রাহী; আজ কি তিনি—ওঃ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—নইলে, এখনি তো—

শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন—"এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া?"

"—তা আজ প্রায় পনের-ষোল বৎসর হবে। শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হ'য়েছিল কি বলি শুনুন। তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট চোদ্দ-পনের বছর বয়েস তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন'-দশ বছরের একটী বোন্ ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে কলা, বেগুন, কুমড়ো এইসব হাটে হাটে বিক্রী কর্ত্তো; এতে তাদের সংসার চল্‌তো। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোন্‌টীকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস

বিক্রী কর্ত্তে গিয়েছিল। ফিরবার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না, নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্য্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশী হবে তো-কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্য্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আস্‌তে তারাচাঁদের ছোট বোনটা অবসন্ন হ'য়ে পড়লো। তারাচঁদের নিজের মুখে শুনেছি ছোট বোনটী মাঠের মাঝামাঝি এসে বল্লে, 'দাদা আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে জল খাবো।'

"তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বল্লে, 'একটু এগিয়ে চল রতনপুরের কৈবর্ত্তপাড়ায় জল-খাওয়াবো।'

"সে 'একটু আগিয়ে' মানে দু'ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌ল, বারবার বল্‌তে লাগলো, 'ওদাদা তোর দুটী পায়ে পড়ি, দে আমায় একটু জল—'

"তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বটগাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেল্‌লে। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বল্‌ছে না, তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্ত্তপাড়া থেকে একঘটী জল চেয়ে এনে দেখে, তার ছোট বোনটা গাছতলায় মরে পড়ে আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা। এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টার যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে ক'রে তার রস চুষেছিল—সেই থেকে এই মাঠটার নাম হোল কচু-চুষির মাঠ।

"তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা ক'রে বড়লোক হ'য়েছিল। শুনেচি না কি তার সে বোন স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বল্‌তো,—'দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জলখাবার জন্যে তুই একটা জলসত্র ক'রে দে?…'তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছটা পিরতিষ্ঠে করে জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনের, ষোল কি বিশবছরের কথা হবে। ঠাকুর মশায়, কচুচুষির মাঠের এ জলসত্র দিগর সকলেই জানে। বলবো কি বাবা-ঠাকুর, এখনও শুনেচি, যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোকে না কি কেউ কেউ দেখেচে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে রদ্দুরে দাঁড়িয়ে বলচে, 'ওগো আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এস।'

"সত্যি-মিথ্যে জানি নে ঠাকুর-মশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে—"

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম কর্ল্লে।

ক্রমে বেলা পড়ে এল। কতলোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগলো। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙ্গল ছেড়ে বটতলায় উঠলো। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম ক'রে সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে গল্প কর্ত্তে লাগল।

এক বুড়ি অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা ক'রে ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বল্লে,—"আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা?"

আবদুলের মা একগাল হেসে বল্লে, "তা দ্যাওদিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরবোতো, খেয়েই মরি।"

একজন লোক পরণে টাট্‌কা কোরা কাপড়ের ওপর নতুন পাঠভাঙ্গা ধপধপে সাদা টুইলের সার্ট, হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তোলা, পায়ে একপা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশভাবে ধপ ক'রে ব'সে পড়ল। কেউ জিজ্ঞাসা কর্ল্লে, "ছমিরুদ্দি মিঞা যে? আজ ছানির দিন ছিল না?"

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটী বাক্য উচ্চারণ দ্বারা ভূমিকা ফেঁদে তার

মোকর্দ্দমার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা ক'রে গেল এবং যে উকিলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ কর্লে যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হ'ত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্য নিয়ে আধসের আন্দাজ ছোলা-ভিজে উদরসাৎ করে একছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে এল। বৈকালের বাতাসে নিকটবর্ত্তী ঝোপ থেকে ডাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদে রংএর সোঁদালী ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো ক'রে ছিল। একটা পাখী আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চ'লেছিল—বৌ কথা—ক', বৌ কথা—ক'।

শিরোমণি-মশায়ের বসে' বসে' মনে হ'ল বিশ বছর আগে তাঁর আট বছরের পাগ্‌লী মেয়ে উমার মতই ছোট একটী মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসার জল অভাবে বুনো কচুর ডাঁটার কটুরস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ-করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্ট-পীড়িত পল্লী-প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরী করেচে। এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে' সে মঙ্গলরূপিনী জগদ্ধাত্রীর মত দশহাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল যোগাচ্চে। চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে, তপ্ত মাঠ পথ যখন ছায়া শীতল হ'য়ে আসে, তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটী অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র আঁচল উড়িয়ে কোন অজ্ঞাত উর্দ্ধলোকে তার নিজের স্থানটীতে ফিরে চলে যায়!·· তার পৃথিবীর বালিকা-জীবনের ইতিহাস সে ভোলে নি।

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি মশায় তাকে বল্লেন,—"ওহে বাপু, তোমাদের ঐ বড় ঘটীটা বেশ ক'রে মেজে একঘটী জল আমায় দাও, আর ইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্যে আনা সন্দেশ আছে বল্‌লে না?"

—স্ত্রীয়শ্চরিত্রং—

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

নির্ম্মলকে আমরা সবাই বলিতাম আস্ত পাগল।

এই খামখেয়ালী ছেলেটীর জন্য তাহার বাপ কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন তাই রক্ষা, নহিলে যদি আমাদের মত দশটা-পাঁচটায় কাছারী যাইয়া মক্কেলের প্রত্যাশায় 'হাঁ' করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত তাহা হইলে সত্য-সত্যই বেচারীকে এতদিন রাঁচি নয় ত বহরমপুরের সরকারী আশ্রমে অতিথি হইতে হইত।

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন তাহার কবিতা লিখিবার বাতিকটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সে নিজের চেহারাখানা এমনি করিয়া তুলিয়াছিল যে, দেখিলে হাসি পায়। লম্বাচুল আর একমুখ গোঁফদাড়িতে তাহার মুখখানিকে এমনি বিকট করিয়া তুলিল যে, শচীন, সুরেশ প্রভৃতি সকলে তাহার নামকরণ করিল লোমশ মুনি।

গোঁফদাড়িওয়ালা লোক হঠাৎ গোফদাড়ি কামাইয়া আসিলে খুব পরিচিত লোকের পক্ষেও চিনিতে একটু বিলম্ব ঘটে, কাজেই সেদিন যে আমরা প্রথম দর্শনেই নির্ম্মলকে চিনিতে পারিলাম না, ইহাতে আমাদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

দেশে তখন সবুজ-সাহিত্যের বন্যা আসিয়াছে, সুতরাং নির্ম্মল তাহাতে মাতিয়াছে শুনিয়া বিস্ময় অনুভব করিলাম না। কিন্তু বিস্ময়ের অন্য কারণ যথেষ্ট ছিল, সেটা নির্ম্মলের কাহিনী শুনিবার পর বুঝিয়াছিলাম।

তাহার কয়েকটী কবিতা এবং সবুজ গল্প ফেরত দিবার সময় এক নামজাদা মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক-মহাশয় না কি তাহাকে বলিয়াছিলেন, যে,মনস্তত্বের বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টার পূর্ব্বে তাহার উচিত মনুষ্যচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করা। অতএব—

এই হিতোপদেশটী লাভ করিবার পরে সে যতগুলি কার্য্য করিয়াছে, তাহার তালিকা শুনিয়া হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া রাণীগঞ্জে কুলীজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া কি ভাবে তাহাকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল এবং তাহার ফলে কতগুলি ইনজেকসন লইয়া সর্ব্বাঙ্গে অনেকখানি বেদনা সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল তাহার সকরুণ ইতিহাসটী সে বিবৃত করিয়া জানাইল যে, এ ঘটনাতেও সে দমিয়া যায় নাই। ইহার পরেও একবার পল্লী-জীবন ষ্টাডি করিতে গিয়া পুলিসের হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি এমন একটী ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহার জন্য আমার সাহায্য না পাইলে না কি তাহাকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইবে।

উকীলের সাহায্য বিনা বিপন্ন হইতে হইবে এমন কি ব্যাপার জানিবার জন্য কৌতুহলটা স্বভাবতঃই বেশী হইয়া উঠিল।

নির্ম্মল তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল—

"কে এক বন্ধু আসিবার কথা ছিল, তাঁহাকেই অভ্যর্থনা করিতে নির্ম্মল সেদিন হাওড়ার ষ্টেশনে গিয়াছিল। বন্ধু আসিলেন না দেখিয়া সে হতাশচিত্তে ফিরিবার মতলব করিতেছিল, এমন সময়ে পাশের প্ল্যাটফরমে দেখিল এক তরুণী।"

তরুণীর বর্ণণাটী নির্ম্মল যেরূপভাবে করিল,

তাহাতে আর উচ্চহাস্য চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না।

সে বলিল, "একেবারে 'মোষ্ট আপ টু-ডেট'—সাড়ী, ব্লাউস, নাগরা এবং হাতের পেগি ব্যাগটীতে মিলে এমনি একটা সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছে যে, সে দিকে চাইলে মুগ্ধ না হয়ে আর উপায় নাই।"

মনের উচ্ছ্বাসে নির্ম্মল একটা সংস্কৃত শ্লোকের খানিকটা বলিতে যাইতেছিল, অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইলাম "তারপর?"

নির্ম্মল বলিল, "একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট খালি ছিল, তাইতেই তিনি উঠে পড়লেন।"

বাংলা-সাহিত্যের গল্পের নায়ক-নায়িকারা প্রায় সেকেণ্ড ক্লাসেই যাতায়াত করিয়া থাকেন, ইহাই ত গল্পে ও উপন্যাসে পড়িয়াছি। নির্ম্মলের কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, তাহার কথিত তরুণীটী তাহা হইলে আর একটু উচ্চতর স্তরের।

নির্ম্মল আবার সেই তরুণীর রূপবর্ণনা আরম্ভ করিল। বলিল, "একেবারে সাক্ষাৎ একটা উপন্যাসের নায়িকা।"

চাকরটা গুড়গুড়িটা পাশে দিয়া গেল। বাঁচা গেল। নলটীতে একটী টান দিয়া বলিলাম, "তারপর কি হ'ল নির্ম্মল?"

নির্ম্মল বলিল, "কেমন যে charmed হয়ে গেলাম, একেবারে উঠে পড়লাম সেই কামরায়।"

আমি বলিলাম, "সে কি হে? বিনা টিকিটেই?"

"আরে তখন ট্রেণ ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে, তখন কি টিকিট কেনবার সময়?"

বলিলাম, "কোথাকার ট্রেণ, বর্দ্ধমান প্যাসেঞ্জার কি পাঞ্জাব মেল, কিম্বা দিল্লী একস্‌প্রেস কি মাদ্রাজের ট্রেণ তাও দেখলে না?"

"কিছু না।"

নলটায় আর একটা টান দিয়া বলিলাম, "তারপর?"

"লেলুয়া, বেলুড়, বালী পার হয়ে ট্রেণ চলেছে, কামরাখানায় আমরা দু'টী প্রাণী, তিনি আর আমি। খানিক পরে তিনি একখানা খবরের কাগজ খুললেন।"

"তারপর?—তুমি?"

"আমি এতক্ষণ বসেই ছিলাম চুপচাপ। তারপর ভেবে দেখলাম যে, চুপ ক'রে বসে' থাকলে ত আলাপ করবার সুযোগ পাব না। হঠাৎ বলে' উঠলাম, 'ওটা কি আজকের কাগজ?'—ভেবেছিলাম 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' যা হোক্ একটা কিছু উত্তর পাব, কিন্তু কোন কথা না বলেই কাগজখানা তিনি গাড়ীর মেঝেয় ফেলে দিলেন। আমি কুড়িয়ে নিলাম।"

নির্ম্মল বলিতে লাগিল, "খবরের কাগজের একখানা পাতায় চোখ বুলিয়েই বল্‌লাম, 'হ্যাঁ, এ ত আজকের কাগজই দেখছি', বলেই কাগজখানা ভাঁজ ক'রে তাঁর বেঞ্চির উপর রেখে দিলাম। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।"

নির্ম্মল হতাশাব্যঞ্জক একটা ওষ্ঠভঙ্গি করিল। আহা' বেচারা!

গল্পটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। গুড়গুড়িতে আর একটা টান দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। নির্ম্মল বলিতে লাগিল, "ট্রেণখানা বোধ হয় এক্সপ্রেস্। উত্তর পাড়া, কোন্নগর—সব ছাড়িয়ে গেল। আমি ত ন জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কতদূর যাবেন?' কোনও উত্তর নাই। মিনিট পাঁচেক আরও চুপচাপ করে রইলাম, রিষড়ের প্লাটফরমখানাও চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল। তখন আবার বল্‌লাম, 'ট্রেণখানা বুঝি এক্সপ্রেস?' এবারেও তিনি নিরুত্তর।

আমার হাসি আসিয়াছিল। বলিলাম, "তা' হ'লে ত বড়ই মুস্কিলে পড়েছিলে নির্ম্মল!"

নির্ম্মল বলিল, "না ভাই, মুস্কিলে ত তখন পড়ি নি, মুস্কিলে পড়েছি এখন। আর, ছোট গল্পে বল, এ রকম বিদখুটে নায়িকা কখনও দেখেছো বা শুনেছো ? এই তো সেদিন একটা গল্পে পড়ছিলাম যে এক তরুণ ষ্টেশনে এসে দেখলেন যে, সারা ট্রেণখানাতে আর কেউ নেই, আছেন কেবল একটী তরুণী। তরুণীটী তাকে ডাকলেন, তারপর পথে আসতে আসতে তাকে লুচী খাওয়ালেন, সন্দেশ দিলেন, কত কি—"

আমি বলিলাম, "উঃ, কি পোড়া বরাত তোমার! তারপর বলে যাও তোমার গল্প।"

নির্ম্মল বলিল, "গল্প আর মাথামুণ্ডু কি বলবো ? কিছুতেই তাঁর মুখের একটা কথাও শোনা গেল না। এমন সময়ে ট্রেনখানা এসে শ্রীরামপুরে থামলো। জানলার বাহিরে দিয়ে একটা পাণওয়ালা হেঁকে গেল, 'পাণ বিড়ি—' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি!—তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললাম, "পাণ খাবেন ?"—যেই এই কথাটী বলেছি, আর অমনি যেন তুবড়িতে আগুণ দেওয়া হ'ল। তিনি সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—'হোয়াট্ ইডিয়ট! স্ত্রীলোককে -একজন মহিলাকে এইভাবে ইন্‌সল্ট করতে ডেয়ার করেন!' বলেই সেই খবরের কাগজ আর পেগি ব্যাগটা নিয়েই চক্ষের নিমেষে নেমে পড়লেন। নেমেই চীৎকার—'পুলিস!'—তাড়াতাড়ি একটা কনেষ্টবল ছুটে এল, ষ্টেশনের একটা বাবু ছুটে এল, কতকগুলো বখাট ছোকরা বিড়ি খাচ্ছিল, তারাও হুজুগ দেখতে এল। আমার তরুণীটী ত ইংরেজী-বাংলায় বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে হাবড়ায় ট্রেণে ওঠা পর্য্যন্ত আমি তাঁকে ত্যক্ত ক'রে মেরেছি, অবশেষে ইনসাল্ট করেছি।"

রেলের বাবুটী আমাকে বল্‌লেন, 'কোথায় যাবেন আপনি ?' কি আর বলি, মুখে এল চন্দননগর, তাই বললাম। তিনি বল্‌লেন, 'কি রকম, এটা হ'ল তারকেশ্বরের গাড়ী, আপনি চন্দননগর যাবেন তো এতে উঠলেন কেন ? কই দেখি আপনার টিকিট!'—কোথায় টিকিট ?—শ্যামবর্ণ মুখখানা ত একমুহূর্ত্তে একেবারে বেগুনীবর্ণ হয়ে গেল।—তারপরের কথা আর ব'লে লাভ কি ? বোধ হয় হাজারখানেক লোকের হাসিটিট্‌কারীর মধ্যে ত আমাকে নিয়ে গেল থানায়। অনেক কাণ্ড ক'রে তবে জামিনে খালাস হয়ে এসেছি। আজ বুধবার, আসছে সোমবারে কেস্।"

নির্ম্মল থামিল। এই কাহিনীটা বলিয়াই তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। আমি ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। নির্ম্মল তাহাতে যেন একটু অসন্তুষ্ট হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার সে নায়িকাটীর নাম ঠিকানা জেনে এসেছো ত ?"

"এসেছি বই কি। সে সব ত থানা থেকেই আমাকে দিয়েছে কি না। এই নাও না।" বলিয়া একখণ্ড কাগজ আমার হাতে দিল। পড়িয়া দেখিলাম যে, মহিলাটীকে অবমাননা করা হইয়াছে বলিয়া নির্ম্মল অভিযুক্ত, তাঁহার নাম 'লতিকা চ্যাটার্জ্জি।' ঠিকানা দেখিলাম কপালীটোলা অঞ্চলের একটা গলিতে।

অনেক কথায় আশ্বস্ত করিয়া তবে নির্ম্মলকে বাড়ী পাঠাইলাম।

দুই

ভাবিয়া দেখিলাম যে, এই ব্যাপারটাকে আদালত পর্য্যন্ত গড়াইতে দিয়া অনর্থক একটা কেলেঙ্কারী করিয়া লাভ নাই। তার চেয়ে যদি একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া যায় ত সেই সব চেয়ে ভাল।

সন্ধ্যাবেলা গেলাম একবার কপালীটোলার সেই ঠিকানায়।

একটা তেতালা বাড়ীর একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া লইয়া জনৈক মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী থাকেন, লতিকা তাঁহারই কন্যা।

বহুবাজার অঞ্চলের বাড়ীর একটা সস্তা

ফ্ল্যাট্ ভাড়া করিয়া যাহারা থাকে, তাহারা যে রেলে ফার্ষ্ট ক্ল্যাসে যাতায়াত করিতে পারে ইহা বিশ্বাস করিবার কথা নয়।

আমার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে যিনি আসিলেন, তিনি একজন বর্ষীয়সী মহিলা। আমি কে, কি জন্য আসিয়াছি, ইত্যাদি অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিবার পরে সম্মুখের ঘরে বসিবার অনুমতি পাইলাম।

তিনি ডাকিলেন, "লতি!"

যে মেয়েটী আসিল, তাহাকে ঠিক তরুণী বলা যায় না। বয়স বছর কুড়ি হইতে পারে। রংটা এমন কিছু উজ্জ্বল নয় যে, তাহাকে সুন্দরী বলা যাইতে পারে। ইহাকে দেখিয়াই যে নির্ম্মল এতবড় একটা বিপত্তি বাধাইয়া বসিয়াছে, একথা তাহার মুখে পূর্ব্বে না শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না।

টেবিলটার ওপাশে একখানা চেয়ার লইয়া লতিকা বসিল। বেশ সহজ স্বরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বুঝি উকীল? সেদিন-কার তিনি বুঝি আপনার বন্ধু?"

দুইটী প্রশ্নেরই 'হাঁ' জবাব দিয়া আমি জনাইলাম যে, অনেকদিন হইতেই নির্ম্মলের মাথাটা একটু গোলমেলে রকমের। কখন সে যে কি করে তাহার স্থিরতা নাই। কাজেই হঠাৎ একটা খেয়ালের বশে যদি একটু অভদ্রাচরণ করিয়াই থাকে, তাহা হইলে সেটা আদালতে গেলে অনর্থক উভয়পক্ষেরই কতকগুলি দুর্ণাম রটনা ছাড়া আর কি হইবে?—সুতরাং—

লতিকা বলিল, "কিন্তু কি ডেয়ারিং বলুন দিকিনি? আমি না হয়ে যদি একজন ইয়ুরোপীয় লেডী হতেন, তা' হ'লে?"

মনে মনে বলিলাম যে, শ্বেতচর্ম্ম দেখিলে হয় ত নির্ম্মলের এতটা দুঃসাহস হইত না।

একটা ছোকরা চাকর চায়ের ট্রে লইয়া আসিল। বর্ষীয়সী মহিলাটী বলিলেন, "আপনাকে চা—"

ধন্যবাদ দিয়া জানাইলাম যে, আপত্তি নাই।

লতিকা আবার বলিল, "আবার অসভ্যতার চূড়ান্ত কর্‌লেন কি না আমাকে বলে পান খাবেন? ছি ছিঃ, কি ব্যবহার বলুন দিকিনি? তিনি কি কখনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবার সুযোগ পান নি?"

মনে মনে হাসিলাম। বলিলাম, "আচ্ছা, এই যে আপনারা আমাকে চা খাওয়ালেন, আমি ও বিনা আপত্তিতে খেলাম, কিন্তু ধরুন, আমি যদি আপনাকে চা অফার করি, তা' হ'লে আপনি বোধ হয় রাগ করবেন?"

লতিকা বলিল, "না, না, রাগ করতে যাব কেন?"

আমি উৎসাহের সহিত আমার ওকালতীর আর্গুমেণ্ট সুরু করিয়া দিলাম। বলিলাম, "আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে পাণ হচ্ছে তেমনি মস্ত একটা সম্মানের জিনিষ। সেকালে তাম্বুল দিয়েই সব অর্চ্চনা-টর্চ্চনা হ'ত কি না। কাজেই, আপনাকে সেই শ্রেষ্ঠ জিনিষটী মনে করুন যদি আমিই অফার করি, তা' হলে আপনি নিশ্চয় রাগ করবেন বুঝতে পাচ্ছি।"

দু'জনেই এবার হাসিয়া উঠিল। লতিকা বলিল, "কিন্তু অফার করবার একটা ধরণ আছে ত? চেনা নেই শোনা নেই, হঠাৎ কেউ কখনও কাউকে কোন জিনিষ অফার করতে পারে? ও আপনার শ্রেষ্ঠ জিনিষ টিনিস যত অর্গুমেণ্টই আপনার বন্ধুর হয়ে করুন না কেন, কিন্তু আপনার সে বন্ধুটীকে আমি মনে মনেও কখনও ক্ষমা করতে পারবো না তা' বলে দিচ্ছি।"

মনের হাওয়াটা তখনও এলোমেলো বহিতেছে বুঝিয়া আমি তখন বর্ষীয়সী মহিলাটীর সঙ্গে অন্য কথা সুরু করিয়া দিলাম।

শুনিলাম তিনি না কি লতিকার মাসী হন।

লতিকার পিতা মিঃ চ্যাটার্জ্জী লাইফ ইনসিওরেন্সের দালালী করেন। তাঁরা খৃষ্টান। শ্রীরামপুরের কে একজন মিশনরী মহিলা লতিকাকে একটী বালিকাবিদ্যালয়ে চাকরী যোগাড় করিয়া দিবেন আভাষ দিয়াছেন। লতিকা সেদিন সেখানেই যাইতেছিল, ইত্যাদি সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা জানিয়া লইতে বড় বেশী দেরী হইল না।

তাঁহাদের সাংসারিক ইতিহাসের চেয়ে, মোকর্দ্দমাটা যাহাতে তুলিয়া লওয়া হয়, সেইজন্যই আমার আগ্রহ ছিল বেশী। কথাটা আবার পাড়িলাম। কিন্তু মাসী বলিলেন যে, চ্যাটার্জ্জী সাহেব কোথায় বাহির হইয়াছেন, তিনি না আসিলে এ কথার কোন উত্তর দিতে তিনি পারেন না।

আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু চ্যাটার্জ্জী-সাহেব তখনও ফিরিলেন না। কাজেই উঠিলাম। মাসী এবং লতিকা উহারা দুজনে আমার সঙ্গেই নীচে নামিয়া আসিল।

মোটরখানা দরজার সাম্‌নেই দাঁড়াইয়া ছিল। নেহাৎ ছেলেমানুষের মতই লতিকা বলিল, "আপনার গাড়ী বুঝি?"

বলিলাম যে, হাঁ, তাই বটে।

সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "উঃ মস্ত গাড়ী ত!"

গাড়ীখানা সেডান বডিড্, (Sedan bodied) সুতরাং নেহাৎ ছোট নয়।

একটু হাসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম নির্ম্মল কথিত কাব্যের নায়িকা না হইলেও কথাবার্ত্তা শুনিয়া মেয়েটীর মন ত বেশ সরল বলিয়াই বোধ হইল। তবে সেদিন বোধ হয় হঠাৎ আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়াই এতখানি কাণ্ড ঘটিয়াছে। আর নির্ম্মলটাও কি ছেলেমানুষ! বিনা টিকিটে, কোথাকার ট্রেণ তাও জানা নাই, বিনা দ্বিধায় একটী অপরিচিতা যুবতীর অনুসরণে ট্রেণে উঠিয়া পড়িল! বদ্ধ উন্মাদ আর কি!!

তিন

পরদিন সকালবেলা আবার গেলাম। কিন্তু চাটুয্যে-সাহেবের সঙ্গে তখনও দেখা হইল না, শুনিলাম একটী কাজের জন্য তিনি ভোরবেলা বাহির হইয়াছেন, ফিরিতে দ্বিপ্রহর হইতে পারে।

নীচে নামিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, কিন্তু হইল না, চা পান করিয়া—তবে ফিরিতে হইল। ইহাদের দুইজনের ব্যবহারে ত মনে হইল যে ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়া যাইবে। এখন চাটুয্যে সাহেবের সঙ্গে একটা কথাবার্ত্তা হইয়া গেলেই যে বাঁচি। ঝঞ্ঝাট আর কি!

সন্ধ্যাবেলা চাটুয্যে-সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল। লোকটীকে বেশ গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হইল। এ বেলাও চা পান করিতে হইল বটে, কিন্তু কাজের শেষ হইল না। চাটুয্যে জানাইলেন যে, মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে তাঁহার ব্যক্তিগত আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার উকীলের সঙ্গে একবার পরামর্শ না করিয়া তিনি কিছু করিতে পারেন না। সুতরাং কাল সন্ধ্যায় আবার আসিতে হইবে।

রোজ রোজ এই যাতায়াতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল—কিন্তু কি করি, উপায় নাই। ব্যাপারটার যা' হোক্ একটা শেষ করিতেই হইবে; সুতরাং পরদিন সন্ধ্যায় আবার আসিতে হইল।

চার

যাক্, বাঁচা গেল! নির্ম্মলের জয় হউক!

চ্যাটার্জ্জী জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার উকীলের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। ধার্য্য দিনে আদালতে উভয় পক্ষের একটা দরখাস্ত দিলেই গোলমাল মিটিয়া যাইবে।

তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া নীচে নামিলাম। একতলার সিঁড়ির চাতালের আধ

অন্ধকারে দেখিলাম লতিকা দাঁড়াইয়া আছে। এই গোলমালটা মিটিয়া যাওয়ার জন্য তাহাকেও ধন্যবাদ দিলাম।

সে কিন্তু আমার খুব কাছে সরিয়া আসিয়া চোখ দু'টাকে যেন কেমন একটু করিয়া, ভ্রূদু'টীকে যেন কি-রকম একটা বিশেষভাবে বাঁকাইয়া অত্যন্ত আস্তে আস্তে বলিল, "কেমন, এইবার সন্তুষ্ট হয়েছেন?'

সন্তুষ্ট আবার হই নাই? তাহাকে আবার ধন্যবাদ দিলাম।

সে বলিল, "কিন্তু আমি যদি ইচ্ছে করি, তা' হ'লে বাবার মত বদলে যায় তা' জানেন?"

এ মোকর্দ্দমায় অপমানিতা হইয়াছে লতিকাই, সুতরাং সে যদি সম্মতি না দেয় তাহা হইলে তাহার পিতার সম্মতিতে কিছুই হইবে না—তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। সুতরাং তাহার এই কথায় যথেষ্ট বিস্ময় অনুভব করিলাম। ভাবিলাম,তবে কি ইহাদের মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে না কি?

লতিকার কথার উত্তরে বলিলাম, "সে কি কথা! তুমি—আপনি—অমত করলে ত সবই গোলমাল হয়ে যাবে।''

সে আরও কাছে সরিয়া আসিল। ছেলেমানুষী ভাব?—সেই ভাবেই বলিল, "তা' হ'লে আমাকে একটা কথা দিন।"

আমার বিস্ময় চরমে উঠিয়াছিল। বলিলাম, "কিসের কথা?"

সে বলিল, "আগে বলুন কথা রাখবেন?"

কি যে তাহার কথাটা তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ ইহাকেই অসন্তুষ্ট করিয়া নির্ম্মলের এই অবস্থা, সেটাও বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছিলাম। কাজেই বলিলাম, "নিশ্চয়ই রাখবো। আপনার কথা রাখবো না?—কি আশ্চর্য্য!"

একটু হাসিল। স্ফিংসের হাসি?—বলিল, "বন্ধুর মোকর্দ্দামা মিটে গেল বলে যে আমাদের এমুখো আর হবেন না তা' হ'লে কিন্তু চলবে না। রোজ না হয়, অন্ততঃ সময় পেলেই আসবেন—বলুন, কথা দিন—"

কি সমস্যা! সে বোধ হয় আরও একটু সরিয়া আসিল। নিঃশ্বাসের শব্দটাও যেন শোনা যাইতে লাগিল।

উপর হইতে বোধ হয় চ্যাটার্জ্জি সাহেবই ডাকিলেন—লতি—না লটি—বা ঐ রকমেরই একটা কিছু।

চক্ষের নিমিষে সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। দু'-তিন ধাপ উঠিয়া আবার বলিল "ওই কথা রইলো কিন্তু। আমার কথা রাখবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এটা মনে থাকে যেন।" বলিয়াই আবার একটু হাসি—পরমুহূর্ত্তেই সিঁড়ির উপর অদৃশ্য হইল।

সেই চিরন্তন সমস্যা—মনালিসা হাসে কেন? —এও একই সমস্যা?

আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। গাড়ীতে যখন উঠিয়া বসিলাম, তখনও সর্ব্বশরীর যেন বাতাসের মত টলিতেছে। মনে হইল, ঠিক্ এই নারীটিকেই কি একটা কথা বলিতে গিয়া নির্ম্মল যৎপরনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়াছে? আর আজ—?

ভাবিলাম, আশ্চর্য্য নারীচরিত্র, দুর্জ্ঞেয় বটে!

—শুক্লা-একাদশী—

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

ই-আই-আর্-এর শাখা লাইনটি এইখানে আসিয়াই শেষ হইয়াছে—একটি ছোট্ট রেলওয়ে ষ্টেশন্। তাহাকে ঘেরিয়া চতুর্দ্দিকে রুক্ষ বৈরাগী প্রান্তর। বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্তে দূরে শ্যামল বনরেখা, মাঠের বুক বহিয়া চলে একটি শীর্ণ সর্পিল নদী এবং তাহারই পাশাপাশি সহস্র মানবের পদাবলী অঙ্কিত একটি সঙ্কীর্ণ পথ।...

শুক্লা-একাদশীর রাত্রি। রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে। জ্যোৎস্নার স্পর্শে লৌহবর্ত্মটি চিক্-চিক্ করিতেছে। বাতাসের বুকে ভর করিয়া একটি নাম-না-জানা পাখীর কণ্ঠসঙ্গীত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ষ্টেশনের একটি কক্ষে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া একটি চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক চেয়ারে বসিয়া তন্দ্রা যাইতেছে।

হুড়্মুড়্ করিয়া একখানি ট্রেন আসিয়া পৌছিল। ট্রেনের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। পরিমল তাড়াতাড়ি প্লাট্ফর্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত যাত্রী একে একে নামিয়া গেল। হাতের লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরিয়া প্রত্যেকখানি কাম্রার ভিতর পরিমল একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া লইতে লাগিল। হঠাৎ একটি দ্বিতীয়-শ্রেণীর কাম্রার কাছে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। লণ্ঠনের আলোকে আব্ছা-আব্ছা দেখিতে পাইল কে যেন বেঞ্চের উপর শুইয়া রহিয়াছে। দরজা খুলিয়া পরিমল ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল, একটি ভদ্রলোক দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া আছেন; সমস্ত শরীর একখানি পাত্লা চাদরে আবৃত, কেবলমাত্র মুখখানি বাহির হইয়া আছে।

ডাকিয়া তুলিতে গিয়া সে যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহার সমস্ত দেহমন শিহরিয়া উঠিল। গা ঠেলিয়াও কোনো সাড়া না পাইয়া বিশেষ সন্দেহবশতঃ তাঁহার নাকের নিকট হাতের তালুটি মেলিয়া ধরিয়া পরিমল অনুভব করিল তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহার কপালের উপর হাত রাখিয়া পাইল হিমশীতল স্পর্শ।

প্লাট্ফর্মের উপর নামিয়া পড়িয়া পরিমল ডাকিল,—মাধো সিং!

পোর্টার মাধোসিং প্লাট্ফর্মের উপর খাটিয়া পাতিয়া তাহার উপর শয্যা রচনায় ব্যস্ত ছিল। পরিমলের ডাকে সসম্ভ্রমে উত্তর দিল—জী!

পরিমল বলিল,—রামভজন আর মঙ্গলুকো বোলাও।

মাধো সিং চলিয়া গেল।

মাধো সিং ও মঙ্গলু আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রামভজনের সন্ধান পাওয়া গেল না। রাতের অভিসারে সে মাঝে মাঝে অনেকদূর অবধিই ঘুরিয়া আসে। আজও হয়ত' বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে।

মাধোসিং ও মঙ্গলুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় পরিমল ট্রেনের সেই কামরাটায় ফিরিয়া আসিল। তিনজনে মিলিয়া ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয় বুঝিল লোকটি মৃত এবং কোনো অস্বাভাবিব ভাবেই বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

লোকটির জামার পকেট হাতড়াইয়া পরিম

একটি নোট্ বুক্, একটি ফাউণ্টেন্ পেন এবং একটি প্রায়-শূন্য মনিব্যাগ্ ব্যতীত আর কিছুই পাইল না। রেলওয়ে টিকিটখানি পর্য্যন্ত নাই। কোনো লগেজও নাই।

কামরাটির জানলা-দরজা ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া জিনিস কয়টি লইয়া পরিমল নিজের কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিল। তাহার ডিউটি ওভার হইয়াছে! সংসার বলিতে তাহার একমাত্র চাকর ও সে। শুধু চাকর বলিলে ভুল হয়; কারণ, লোকটি রেলের পোর্টার এবং পরিমলের পাচক ও চাকর দুই-ই।

পরিমলের দেশ এখান হইতে তিনশত মাইল দূরে বাঙলার একটি গণ্ডগ্রামে। সেখানে আছেন তাহার বিধবা জননী ও দুইটি ছোট ভাই। মাসে মাসে পরিমল সেখানে টাকা পাঠায় ও সুবিধামত মাঝে মাঝে যাইয়া তাঁহাদের দেখিয়া আসে। পরিমলের জননী স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া অন্য কোথাও বাস করিতে চাহেন না। তাই পরিমলকে একাই থাকিতে হয়। বিবাহ সে করে নাই এবং না করিবার কারণও হয়ত' কিছু ছিল। সে কথা না বলিলেও এখানে কিছু আসিয়া যাইবে না।

নিজের শুইবার ঘরে গিয়া পরিমল টেবিল ল্যাম্প্টি জ্বালিয়া সেই নোট্ বুকটি খুলিয়া পড়িতে বসিল।

প্রথম পাতায় মোটা মোটা করিয়া লেখা—'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' নাম নাই, ঠিকানা নাই। দ্বিতীয় পাতা হইতে লেখা সুরু হইয়াছে—

"জীবন-প্রদীপের স্তিমিত আলোয় গুটিকত কথা লিখে রেখে গেলাম।

"—আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী একমাত্র আমি—আর মৃত্যুর একমাত্র কারণ আফিং।

"জীবনের কোনো আকাঙ্ক্ষাই অসম্পূর্ণ রাখি নি। সব দিক দিয়েই তাকে উপভোগ করেচি।

"কিন্তু একজনের কাছে হার মান্‌লুম—এইটেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ্।

"ললিতা যে এমনি ক'রেই আমাকে পরাজিত ক'রবে তা' কোনোদিনও ভাব্‌তে পারি নি।

"বন্ধু মারা গেল। স্ত্রী ললিতা আর তা'র একমাত্র শিশুপুত্রকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে।

"ললিতাদের নিয়ে এলুম আমার আশ্রয়ে। সুলেখা খুব আনন্দের সঙ্গেই ওদের অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে তুলে নিলে।

"দিন যায়। ললিতা, সুলেখা দু'টি বোনের মত ঘুরে বেড়ায়, মিলে-মিশে সংসারের কাযকর্ম্ম করে। কিশোরকে পেয়ে সুলেখা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। পর্-পর্ ওর তিনটি সন্তান হয়ে একটিও বাঁচে নি—আঁতুড়ের আওতাতেই ঝ'রে গেছে।

"সুলেখার আদর-যত্নে কিশোর তিলে তিলে বড় হ'য়ে ওঠে। ললিতার শোকের ঘোর অনেকটা ফিকে হ'য়ে আসে।

"এমনি ক'রে দিন যায়। সুলেখার গর্ভে আর একটি সন্তানের আগমনী সংবাদে আশা আকাঙ্ক্ষায় বুক দোলে।

"এবারে হ'ল ঠিক বিপরীত। চতুর্থ সন্তানের জন্ম দিয়ে সুলেখাই গেল ঝ'রে, শিশু নয়। সুলেখার মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশী শোক পেল ললিতা। এক বৃন্তে ফুটে থাকা দু'টি ফুলের একটি ঝ'রে গেলে যেমন অপরটি এলিয়ে পড়ে, ঠিক্ তেমনি এলিয়ে পড়্‌লো ললিতা। ওর মৃত্যুর সঙ্গে যেন ললিতার মনেরও অনেকখানি মৃত্যু হ'ল।

"সমস্ত ব্যথাকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে রেখে ললিতা খুকীকে বুকে তুলে নিলে। ওই-ই যেন ওর মা। ললিতার চেষ্টায় মা-মরা শিশু বাঁচে।

"কিশোরের পাশে পাশে নন্দিনীও বড় হ'য়ে

ওঠে। নন্দিনী জানে ললিতাই ওর মা। মা ব'লেই ওকে ডাকে।

"বছরের চাকা ঘুরে যায়।···

"আত্মীয়-স্বজনেরা বলে,—'আর একটা বিয়ে করো। এমন কী-ই বা বয়েস।'···

"হয়ত' ভালোর জন্যেই বলে। ওদের কথার মধ্যে অন্য ইঙ্গিতেরও আভাষ ফুটে ওঠে। যেটার অর্থ হচ্ছে,—বিধবা বন্ধুপত্নী ঘরে থাকার জন্যেই বিয়েটা করা যেন দরকার আগে।

"ওদের কথায় কান দিই না।

"ক্রমে আমার নামের সঙ্গে ললিতার নামটিকে জ'ড়িয়ে পাড়ার লোকেরা এমন সব অশ্লীল গুজবের সৃষ্টি ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লো যে, তা'র বিষ সহ্য ক'র্‌তে না পেরে ললিতা একদিন সারা দেহে কেরোসিন্ তেল ঢেলে সমস্ত মিথ্যা কলঙ্ক থেকে আপনাকে পুড়িয়ে শুদ্ধ ক'রে নিলে।

"বিদ্রূপের সুর ভেসে এল,—'এম্‌নিই হয়! যখন আর লুকোবার কোনো উপায় থাকে না, তখন আত্মহত্যা ছাড়া অন্য পথ নেই, ছিঃ ছিঃ!···"

"সুলেখা আগেই গেছে। ললিতাও সেই পথে গেল।

"ললিতার মৃত্যুর জন্যে হয়ত আমিই দায়ী। আমাকে বাঁচাতেই ত ও ম'লো।

"মৃত্যুর আগে একখানা চিঠিতে ললিতা লিখে রেখে গেছে—' * * * * * আপনার নির্ম্মল চরিত্রের পাশে রাহুর মত বেঁচে থাক্‌বার সাধ নেই—তাই বিদায় নিলুম। শতসহস্র জন্মেও আপনার ঋণ শুধ্‌তে পারবো না। কিশোর রইল আপনার চাকর হ'য়ে। নন্দিনীর মধ্যে সুলেখার রূপ ফুটে উঠ্‌ছে, ওকে কোনোদিনও অবহেলা কর্‌বেন না। * * ইতি চরণাশ্রিতা ললিতা।'

"কিশোর আর নন্দিনীকে—আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছি।

"আমার সমস্ত সম্পত্তি ওদের দু'জনকে সমান ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছি। আর আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ ক'রে এসেছি, কিশোর আর নন্দিনীর উপযুক্ত বয়স হ'লে, বিবাহের গ্রন্থিতে যা'তে ওদের দু'জনের মিলন হয় সে চেষ্টা যেন ওঁরা করেন। হোক্ কিশোর আমার কায়স্থ বন্ধুর ছেলে, বামুনের মেয়ে নন্দিনীকে তারই হাতে দিয়ে গেলাম। আশীর্ব্বাদ করি ওরা যেন সুখী হয়।

"জীবনের সমস্ত সাধ মিটেচে, এখন চাই মুক্তি।"

* * *

এইখানে লেখাটি শেষ হইয়াছে।

লেখাটি পড়িয়া পরিমলের মন কী এক অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া ওঠে। এই অপরিচিতের প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার মাথা নত হইয়া আসে। পরিমলের মনে পড়িয়া যায় এমনিই আর একজন মহাপুরুষের কথা—যিনি সমাজের বন্ধন না মানিয়া সমস্ত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া একটি নীচ-কুলোদ্ভবা নারীকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে সঙ্গে লইয়া ছিলেন এবং সেই নারীরই গর্ভে পরিমলের জন্ম। স্বর্গত পিতাকে স্মরণ করিয়া পরিমলের দু'টি চক্ষে অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসে।

সেরাত্রে পরিমল মোটেই ঘুমাইতে পারিল না, ঘরের মেঝের অনবরত পাইচারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাত্রি তখনও শেষ হয় নাই।

পরিমল চাকরকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া আরও তিন-চারজন পোর্টারকে ডাকিয়া তুলিল।

তারপর তাহাদের সাহায্যে সেই মৃতদেহটি অদূরে নদীতীরে লইয়া গিয়া সেটির সৎকার করিবার ব্যবস্থা করিল।

চিতায় আগুন ধরাইয়া দিয়া পরিমল সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

শুক্লা-একাদশী রাত্রির মৃত্যু হইয়াছে।

—শিল্পীর স্বর্গ—

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

এক

নলিনাক্ষের আভিজাত্যও ছিল না আর কাঞ্চনকৌলিন্যও ছিল না, তবে এ দুইটাই যাহাতে তাহার একসঙ্গে লাভ হয়, সে বিষয়ে তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই ত আর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া যায় না; তাহা পাইতে হইলে সাধনা চাই—তবে আকাঙ্ক্ষার বস্তু মিলে।

এ জ্ঞান নলিনাক্ষের যথেষ্টই ছিল; কাযে কিন্তু জ্ঞানটা সে কিছুতেই লাগাইতে পারে নাই। কাযেই তাহার আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাই রহিয়া গেল—কাযে কিছু হইল না। সে জন্য দুঃখ তাহার খুবই।

নলিনাক্ষ জাতিতে ভাস্কর—কৃষ্ণনগরে তাহার মাতুলের কাছেই থাকিত, আর মাতুলের কাছেই পুতুল গড়া শিখিত। সেইখানেই সে এক বড় মানুষ বন্ধু পাইল—কনক রায়। সুকণ্ঠ নলিনাক্ষের গানে আকৃষ্ট হইয়া কনক তাহাকে বন্ধু বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। কনকের সঙ্গে নলিনাক্ষ বহুদেশই ঘুরিয়াছে, এমন কি ইউরোপও বাদ পড়ে নাই। সেই সূত্রে ইটালীতে কিছুকাল থাকিয়া প্রস্তর মূর্ত্তি গড়িতেও সে শিখিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধি তাহার ক্ষুরধার।

এই বুদ্ধিই তাহার হইল সর্ব্বনাশের মূল। সে ভাবিতে লাগিল—কনকের যাহা হইয়াছে, তাহার সে জিনিসটা হইবে না কেন? হিংসার আগুন তাহার মনের মধ্যে এমনি ভাবিয়াই জ্বলিয়া উঠিল।

অথচ এই কনক রায়ই তাহাকে মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে, আর কনক রায়ের বাড়ীতেই তাহার অন্নের ব্যবস্থা। হায় রে ক্ষুরধারা বুদ্ধি!

কনক কিন্তু জানেও না যে, তাহার বন্ধু এমন বিষ বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। গাছপালা, পশুপক্ষী, ছবি আঁকা, গান বাজনা লইয়াই সে মস্‌গুল হইয়া আছে। নলিনাক্ষের এমন হীন মনের পরিচয় সে লইতেই পারে নাই—লইবার আবশ্যকও হয় নাই।

দুই

কনকের বাড়ীতে সেদিন 'জলসা'। গানের আসরে একটা প্রশ্ন উঠিল—ললিত কোন জাতীয় রাগিণী এবং তাহাতে কি বর্জ্জিত হয়।

ওটা যে খাড়ব জাতীয় এবং পঞ্চম বর্জ্জিত, সে কথা সে আসরের কেহই জানিত না। কনকই সে কথা সকলকে জানাইয়া দিল। নলিনাক্ষের তাহার জন্য ভারী রাগ। সে চাহে, ও কথাটা সেই বলিবে—কনক ও কথা বলিতে যায় কেন।

রাগটা কিন্তু প্রকাশ করিবার উপায় নাই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—"মূলতানীর জাতিটাও খাড়ব-সম্পূর্ণ। এ রাগে কোমল-রিখব, গান্ধার, ধৈবত এবং তীব্র-মধ্যম লাগে।"

কনক হাসিয়া কহিল—"তা ঠিক; তবে এ সুরের আরোহণে রিখব ও ধৈবত বর্জ্জিত হয়, আর এর বাদী পঞ্চম, সংবাদী গান্ধার; তোড়ী-ঠাট্ থেকে এ রাগের উৎপত্তি—এটা স্বীকার কর ত?"

"তুমি কি বল্‌তে চাও কনক, মুলতানী খাড়ব জাতীয় নয় ?"

"এমন কথা আমি বলি নাই ত. তুমি চীৎকার কর্‌ছ মিছামিছি। আমার বলা শেষ হোক্, তারপর ত তোমার মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত।"

নলিনের মেজাজ্ খারাপ ছিল—এক বুঝিতে সে আর বুঝিল। দীনতা-অনলে যাহারা দগ্ধ, তাহারা প্রায় এই স্বভাবেরই মানুষ হয়। নলিন বুঝিল—সে অন্নদাস বলিয়া কনক তাহাকে এমন করিয়া ভৎর্সনা করিল, অপমানিত করিল। টাকার মানুষ বলিয়াই এমন করিতে সে সাহস করিয়াছে।

কোনো কথা আর না কহিয়া নলিন আসর ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। ব্যাপারটা প্রথমে কনক বুঝিতে পারে নাই ; তাই সে জিজ্ঞাসা করিল—"যাও কোথা ?"

অশ্রুসিক্ত চোখ দুইটা বিস্তৃত করিয়া সে প্রত্যুত্তর দিল—"চুলোয় ।"

তাহার পর সে আর দাঁড়াইল না। অনেক ডাকাডাকি ও হাত ধরাধরিতেও সে ফিরিল না। কনক ত অবাক্—সে ভাবিতে লাগিল--ব্যাপার কি ?

তিন

নলিনাক্ষ সেই যে গানের আসরটা মাটী করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর আর সে ফিরে নাই। কনকের মনের অবস্থা খুবই খারাপ। সে কেবলই ভাবে—কি দুঃখে নলিন এমন করিয়া চলিয়া গেল, আর কি অপরাধেই বা তাহাকে সে এমন ভাবে ত্যাগ করিল। জ্ঞাতসারে ত সে তাহার কাছে কোনো অপরাধেই অপরাধী নহে।

শিখরিণী, কনকের পত্নী। নলিন তাহার অনুগত ছিল খুবই। সময় পাইলেই তাহার সঙ্গে সে গল্প করিত, কখনো কখনো বা তাহাকে গানও শুনাইত। শিখরিণীর কথা নলিন যেমন শুনিত, এমন আর কাহারই শুনিত না—এমন কি কনকেরও নহে। কনক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"নলিনের সম্বন্ধে তুমি কিছু জান শিখর ? সে ত তোমার লক্ষণ দেবর ছিল !"

অপরূপ সুন্দরী এই শিখরিণী। কনক এতদিন তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল কেবল হাসিতেই। বেদনা-কাতর মুখেও আজ সে তাহার সৌন্দর্য্যের আর একটা দিক্ দেখিল। বিষাদেও রূপসীর কি রূপ ! কনক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার প্রশ্নের কথা সে তখন ভুলিয়া গিয়াছে।

চোখের জল মুছিয়া শিখরিণী স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিল—"না।"

কনকের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সে বলিল—"কিসের না, শিখর ?"

—"ঠাকুরপোর চ'লে যাওয়া সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

—"তোমাকেও কিছু ব'লে যায় নি ?"

—"না।"

—"তুমি তা'কে কিছু বকাঝকা ক'রেছিলে ?"

—"না।"

এই ছোট্ট 'না' টুকুর মধ্যে সিন্ধু প্রমাণ অশ্রু লুকাইত ছিল। অশ্রু-সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে উদ্বেল দেখিয়া কনকের চক্ষুও নিরশ্রু রহিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অপার্থিব প্রেম, অনন্ত বিশ্বাস, অসীম নির্ভরতা। কনক যে এত উদার, সে ওই প্রেম, বিশ্বাস ও নির্ভরতারই গুণে। এ ত্রয়ী মানুষকে উদারই করে !

চার

মাস তিনেক পরে কনক জনরবে শুনিল, ক্রোশ পাঁচেক দূরে একটা গ্রামে কে একজন ভাস্বর এক জমীদারের বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা গড়িয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব। বহু লোকই সে প্রতিমা দেখিয়া আসিয়াছে—সকলেই বলে, প্রতিমা মাটীর নয়, যেন জীবন্ত।

কনকের মন বলিল—এমন প্রতিমা যদি কেহ গড়িতে পারে, তবে সে নলিন। নলিন ভিন্ন জীবন্ত প্রতিমা গড়া আর কাহারও সাধ্য নহে।

প্রতিমা দেখিয়া মানুষ ধরিবার জন্য কনক রায় তখনই ছুটিল। দেখার পর তাহার স্থির বিশ্বাস হইল,—অনুমান তাহার ভুল হয় নাই। কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়! সন্ধান ত তাহার কেহই বলিতে পারিল না।

অনেক অনুসন্ধানের পর একজন কাঠুরিয়ার কাছে কনক সংবাদ পাইল—নদীর ধারে নিবিড় জঙ্গলে একজন মানুষ পুতুল গড়ে, কাঠুরিয়া স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। কনক জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তা'কে দেখেছ ত' হ'লে।"

—"হাঁ।"

—"তুমি সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে পার্‌বে?"

—"হুঁ, খুব।"

তবে চল বলিয়া দুইজনে গন্তব্য পথে যাত্রা করিল।

পাঁচ

জঙ্গল ভাঙিয়া তাহারা যখন ঠিকানায় পৌঁছিল, তখন রবিকর খরতর—সূর্য্যদেব আকাশের মাঝখানে। পদ্মকাঠের দেওয়ালের ফাঁক দিয়া কনক দেখিল—কুটীরের মধ্যে নলিনাক্ষই দাঁড়াইয়া বটে। সে যেন কাহাকে তখন বলিতেছে—"কথা কও, কথা কও, কথা কও!" আর যাহাকে সে কথা কহাইতে চেষ্টা করিতেছে, সে শিখরিণী ভিন্ন আর কেহই নহে।

কনকের মাথা ঘুরিয়া গেল। কুটীরের মধ্যে এবার উঠিল সঙ্গীতের সুর। সেই পুরাতন গান—যে গান নলিন শিখরিণীকে শুনাইত।

কনক আর সহ্য করিতে পারিল না। কাঠুরিয়ার হাতের কুঠারখানা ছিনাইয়া কুটীরের দ্বার ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার পরেই কুঠারাঘাত করিল শিখরিণীর উপর—সে আঘাতে সৌন্দর্য্যের প্রতিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ ভূলুণ্ঠিতা হইল।

কিন্তু এ কি!—এ যে প্রস্তর প্রতিমা! প্রহারকর্ত্তার হাত হইতে কুঠার তখন খসিয়া গিয়াছে। প্রতিমা-শিল্পীর মুখের দিকে কনক এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। শিল্পীর প্রাণবায়ু আচম্বিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার প্রাণ ছিল সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে। সে সৃষ্টি নষ্ট হইতেই তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শিল্পী চাহিয়াছিল আভিজাত্য ও কাঞ্চন-কৌলিন্য—সে তাহা লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু মরিয়া অমর হইয়াছে।

পুস্তক-পরিচয়

মহাত্মা গান্ধী—লেখক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রকাশক—বরদা এজেন্সী, কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেট্, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

আজকালের দিনে গান্ধী জীবনী রামায়ণ-মহাভারতের মত হিন্দুর প্রতি ঘরে ঘরে বিরাজ করা উচিত। সে হিসাবে বইখানিকে আমরা সাদরে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য। তা' ছাড়াও লেখকের লিখন-ভঙ্গীগুণে এখানি সাহিত্যে স্থান লাভে সমর্থ হইয়াছে। অবান্তর কথা না বাড়াইয়া লেখক বেশ কৌশলের সহিত গান্ধীজির বাল্য জীবন হইতে বর্ত্তমান অবধি আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

লেখক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ

প্রকাশক—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

উপাদেয় পুস্তক। ভারতের, শুধু ভারতের কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে জগদীশচন্দ্র অন্যতম। তাঁহার জীবনী সঙ্কলন করিয়া লেখক বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আশা করি, বইখানি বাঙালীর ঘরে ঘরে আদৃত হইবে।

মানস-কমল—লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

প্রকাশক—গুরুদাস এণ্ড সন্স

দাম—এক টাকা।

নরেনবাবু বহুদিন হইতেই গল্প-সাহিত্যে সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তকখানির মধ্যে তাঁহার প্রখর দৃষ্টিশক্তি, সুনিবিড় রসবোধ এবং শব্দ-বিন্যাসে সুনিপুণ শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'ছবির খেয়াল', 'পথের কাঁটা', 'প্রেমের ব্যাঘাত', 'প্রেমের মিলন' প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ষড়-অবতার—লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

প্রকাশ—গুরুদাস এণ্ড সন্স

দাম—বার আনা।

এখানি লেখকের রসরচনা। প্রত্যেকটী গল্পই ষড়-অবতারের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গল্পপ্রিয় পাঠক-পাঠিকার নিকট এগুলি আদৃত হইবে।

প্রতিবিম্ব—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'গ্রন্থী-সংসদে'র এক আনা সিরিজের প্রথম গ্রন্থ।

৭৭ বি, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুশলী শিল্পির হাতে পড়িলে সামান্য ঘটনাও যে কতটা মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলা যায় 'প্রতিবিম্ব' তাহারই জলন্ত নিদর্শন। গল্পটীর আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটী করুণ সুরের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। কি ভাষা, কি ক্রমবিকাশ, কি শিল্পী সঙ্গত দৃষ্টি, সব দিক দিয়াই লেখক রচনাটিকে সার্থক করিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করিব।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থী-সংসদের গল্প-নির্ব্বাচন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার হাতে পড়িয়া এই নব-প্রকাশিত গল্প বিভাগ যে কথা-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে হইাতে আমাদের সন্দেহ নাই।
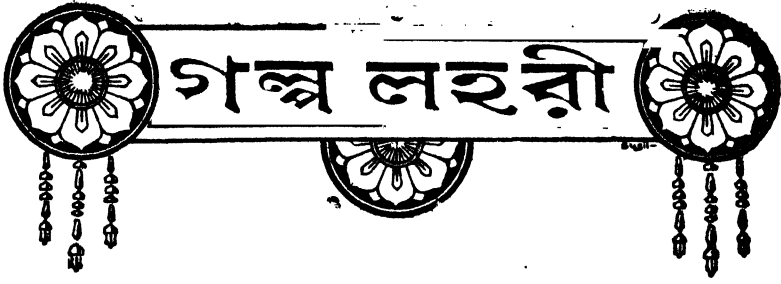
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ | অষ্টম সংখ্যা

—কুল-প্রদীপ—

শ্রীবলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাশীতে ছিলাম—তীর্থবাস অভিলাষ নয়, পসারের আশায়।

একখানা সস্তার মেটিরিয়ামেডিকা বা অনুরূপ গৃহচিকিৎসক নামক পুস্তকেই আমার হোমিওপ্যাথির সহিত শেষ সম্বন্ধ নহে; কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এম-বি পড়ি, সুখ্যাতির সঙ্গে পাশও করি; দু'-চার বৎসর জেলার সদর হাসপাতালে মোড়লগিরিও করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু দেবতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই ভাগ্যচক্র উল্‌টাপথে ঘুরিয়া আমার সব কিছু ওলট-পালট করিয়া দিল।

ঘটনাটা এই ভাবের।—

রোগী ধনী পরিবারের কন্যা—নাম অমিতা। টাইফয়েডের সঙ্গে দুই ফুস্‌ফুস্‌ই আক্রান্ত; মাথার গোলযোগও কিছু আছে। চিকিৎসা করিতেছিলাম। কিন্তু বিদ্যাই বল, অথবা অভিজ্ঞতাই বল, ঝুলি উজাড় করিয়া প্রয়োগ করিয়াও থৈ পাইতেছিলাম না। সহর তেমন বড় নয়, দু'-চার-জন রোগের পুলিশ যারা আছেন, মতবাদ তাঁদের যেমন অদ্ভুত, চিকিৎসা-প্রণালীও ঠিক্ তদ্রূপ; কাজেই হাতের কাছে যুক্তি-পরামর্শের লোক না পাইয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছিলাম।

সেদিন মেয়েটীর অবস্থা যাকে বলে 'যমে-মানুষে টানাটানি'—তাই, আধফোটা পদ্মফুলের মত কুমারীর উপর কেমন একটা অন্তরের টান আসিয়া গিয়াছিল, তাই তাহার বাপ-মায়ের সামান্য অনুরোধেই অমিতার শয্যাপার্শ্ব আশ্রয় করিলাম।

সামনে একখানা হোমিওপ্যাথি মেটিরিয়ামেডিকা পড়িয়াছিল। তাচ্ছিল্যভরে উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে হঠাৎ এক স্থানে কেমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম,—আমার সম্মুখের শয্যাগতার সমস্ত ক'টি লক্ষণই যেন তাহার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। খেয়ালের বশে একফোঁটা জলের ব্যবস্থাই করিয়া বসিলাম।

সে যাত্রা যম পলাইল। উৎসুক ও উৎফুল্ল হৃদয়ে আমি অধীত বিদ্যা বিসর্জ্জন দিয়া চিরদিনের অবজ্ঞাত বস্তুটীকেই আঁকড়াইয়া ধরিলাম।

দুই

কিন্তু সেকথা আজ শুনাইতে বসি নাই।

বাবার পত্রে মর্ম্মাহত হইলাম ; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সন্দেহ-দোলায় মন দুলিয়া উঠিল। অধী সন্তান হইয়া কি পিতার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে পারে—সেও ত আমারি ভাই! তবু পত্রে তাঁহাকে আমার নিকট চলিয়া আসিতে লিখিলাম। বেশ ধারণা হইল, বহুদিন রোগভোগ করিয়া বাবার মাথা খারাপ হইয়াছে। পথ-খরচা মণিঅর্ডারে পাঠাইলাম।

ভাবনা ছিল বাবার সেবা হইবে কিরূপে? বড়লোকের মেয়ে হইলেও অমিতা আমায় সে চিন্তার দায় উদ্ধার করিল। বাস্তবিক শেষ সময়ে তাহার হাতের সেবা পাইয়া বাবা খুব তুষ্ট হইলেন এবং প্রতি কথায় সকলের কাছে "কুলের লক্ষ্মী মাকে আমার এতদিন চিন্‌তে পারি নি! কিন্তু মা যে ছেলেকে ত ভুলতে পারেন না—তাই কাছে ডেকে কোলে তুলে নিয়েছেন!" ইত্যাদি ভাষায় সুখ্যাতি ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তাহাতে পূর্ব্বের সন্দেহ ত ভাসিয়া গেলই বরং একটা অন্যায় ধারণা মনের মধ্যে স্থান দিয়াছিলাম বলিয়া অনুতপ্ত হইলাম।

বাবা সেদিন বলিতেছিলেন—"একগাছের ফল হ'লে কি হয়, সব ক'টী ত আর দেবতা-ব্রাহ্মণের সেবায় লাগে না ; কোনটা বাদুড়ে বানরে খায়, আবার কোনটা আঁস্তাকুড় পগারে গিয়ে পড়ে। আমার ছোটছেলে ছোটবউ সেই ধাতের।"

অমিতা বারণ করে ; বলে—"বলবেন না বাবা, ঠাকুরপো, সতী তারা ত আপনারি।"

বাবা হাসেন ; বলেন—"ওই দুঃখই বড় মা, তারা আমার ছেলে, আমার বউ। কান্না এলেও ডাকছেড়ে কাঁদবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই আমার। লোকলজ্জা তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু আমার ত আছে। পেন্‌সনের টাকা তাদের হাতে তুলে দিয়ে দেখেছি, দরকারে পাওয়া ত দূরের কথা, পেটে খেতে পাই নি। তার শালা, শালাজ, শাশুড়ী এসে ঘর দখল ক'রে রেখেছে, আমি পড়ে আছি সিঁড়ির তলার ঝুলিঘরে। সকালের খোরাক লঙ্কা দিয়ে পান্তা ; রোজই বউমা চাল ঠাওর করতে পারেন না। তরকারীর নাম উচ্চারণ করবার যো ছিল না ; বল্‌লেই উত্তর—'কাঠ যে নেই, চোখের মাথা খেয়ে তা' কি দেখ্‌তে পায় না।' এদিকে কিন্তু বাপের বাড়ীর সবার জন্যে নিত্যি উৎসব।"

অমিতা তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিত—"থাক বাবা, কুটুম তাঁরা, তাঁদের কাছে যে মান-রক্ষে হ'য়েছে, তাও ত আপনারি।"

বাবা হাসিতেন ; বলিতেন—"ঠিক্ ওই কথা ভেবে আমিও গুম্ খেয়ে যেতুম মা ; কিন্তু, তারা চলে' গেলেও যখন ইতর-বিশেষ হ'ল না, তখন বুঝলুম—"

অমিতা হাসিয়া বলিত—"বলবেন না বাবা, শুনে শুনে আমিও তাই হ'য়ে যাব।"

বাবা চুপ করিয়া জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে খানিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতেন—"তা' হয় না মা, জাতকাঠে কখন ঘুণ ধরে না।"

অমিতা জবাব দিত না, মাথা নীচু করিয়া থাকিত। বাবাই খানিক পরে বলিতেন—"ওই দেখ, আমারি যে তারা একথা ভুলে গেছি। বুড়ো হ'য়ে ঠেকে দেখেছি, সব হয়, সব হয়। ও জাতকাঠ-মাথকাঠ নেই, ঘুণ সবেতেই ধরে।"

তিন

অধীরের পত্র আসিল। বাবাকে লিখিয়াছে—"এবারের পেনসনের টাকার দরখাস্ত এখনো তাহার হাতে কেন পৌঁছায় নাই? বাবার ঠাকুর, ক্রিয়া-কর্ম্ম, লোক-লৌকিকতা, ছাপোষা সে, তাহার ঘাড়ে যেন না পড়ে। রান্নাঘরখানা এবার বর্ষার প্রবল ধারা সহ্য করিতে পারে নাই—বুড়ো মানুষের যা' স্বভাব, মাথা হেলাইয়া কোমর ভাঙ্গিয়া কোন প্রকারে দাঁড়াইয়া আছে—সংস্কার

প্রয়োজন। বাবার যখন ভিটা ; তিনি থাকিতে সে কেন ঘুস গুঁজিয়া মরে, ইত্যাদি।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন—"এই দেখ অমরেশ, এর বাড়া প্রমাণ আরও চাস্ ?"

বলি—"যাক গে, সই ক'রে কাগজ একখানা পাঠিয়েই দিন না। এখানে আপনার আশীর্ব্বাদে অভাব ত কিছুরই নেই।"

বাবা বলেন—"জানি, রোজগার রোজ আমার হাতে এনেও দিচ্ছ। তবু কেন দেব, কেন ? অভাব কি তার। তা' ছাড়া, তারা কি করেছে জান ?"

অমিতা মাঝে পড়িয়া বাধা দেয় ; বলে—"যাক্ গে বাবা। সে আপনার ছোটছেলে, অবুঝ যদি পেটের ছেলে হয়, তার কথা ধরতে আছে কি ? আপনি যে বাপ।"

বাবা উত্তেজিত হইয়া বলেন - "তোদের মতলব কি বল্ ত। আমার বলতে যা' কিছু সব সে পাষণ্ডটাকে দেব। কেন, কেন, আমার কি সাধ-আহ্লাদ নেই, হাতে কি দুটো পয়সা রাখতে নেই, বুড়ো বাপ হ'য়েছি বলে···"

অভিমানে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া যায়। অমিতা তাহার নিজের যা' কিছু আনিয়া শ্বশুরের কোলে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলে— "এই নিন বাবা, এই নিন—এসব ত আপনারই। যা' ইচ্ছে করুন, যাকে খুসী দিন, মনের সাধ আহ্লাদ এতেই মিটিয়ে নিন।"

বাবা একটা জোর নিশ্বাস ছাড়িয়া বলেন—"এতটা ভাল হ'স নি তোরা, এ দুষ্ট পৃথিবীতে দুষ্টুমী না করলে পদে পদে ব্যথা পাবি।"

—"তা' বলে' কি তোমার কাছেও। এমন সুখে থেকে কাজ নেই বাবা।"

—"এই জন্যেই ত বলি, তোকে পেয়ে সত্যি বলছি মা,—আমার গর্ভধারিণীকে মনে পড়ে, মনে হয়, ঠিক এমনি করেই ত আর একজনও আমারি জন্যে কষ্ট পেয়ে গেছে! চোখে জল আসে ; রুখতে পারি না—কেবলতোর ভয়েই চোখ ফিরিয়ে নিই!"

চার

অধী আসিয়াছিল।

বাবার সঙ্কট অবস্থার কথা শুনিয়া কিছু ফল, সামান্য মিষ্টান্ন, কিছু মিছরী লইয়া। আসিতে কি সে চায়, কত করিয়া মাথার দিব্য দিয়া তাহার বউ দি' তাহাকে পত্র দিয়াছিল। সঙ্গে আমি গাড়ী-ভাড়া বাবদ টাকাটা দিতে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলাম—"একবার এস, নইলে চিরকালের আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে!"

আসিয়া বাবাকে তাহার প্রথম সম্ভাষণ—"তুমি ত চললে। আমাদের ভাগবাঁটরা কি ভাবে হবে ? বড় ছেলের কাছে আগুিল এনে ত পুরেছ, তারপব ?"

দাঁড়াইলাম না, পলাইয়া এ দারুণ অভি-শাপের হাত এড়াইতে চাহিলাম। সত্যই তবে অধী বাবা যা' বলেন, তাই।

দু'দিনও সে থাকিতে পারিল না ; স্পষ্ট বলিল—"বুড়োমড়াকে নিয়ে সোহাগ জানাবার সময় আমার নেই বউদি' ; চাকরী-রক্ষা ওঁর চেয়ে ঢের বড়। কাচ্ছাবাচ্ছা পাঁচটা হ'য়েছে, তাদের মুখে ত কিছু কিছু দিতে হবে।"

বাবা নিষেধ করিলেন ; বলিলেন—"বাধা দিস নি তোরা। মরুক ও পাষাণ্ডটা ; ওর মুখ দেখলেও পাপ হয়! তখনি বারবার বলেছি ও আমার পুত্র নয়, নয়!—"

গাড়ীভাড়া বাবদ টাকা বুঝিয়া লইয়া বলিল,—"আমার যে আরও কিছু পাওনা রয়েছে।"

বুঝিলাম না। অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে বলিল—"বারে, ফাঁকি! এ আসতে তবে বলা কেন ? ছেলেপুলের পেট কেটে পয়সা খুইয়ে আনলুম ফলমূল—তার দাম কই ?"

বড় কষ্ট হইল। তাড়াতাড়ি একখানা দশটাকার নোট হাতে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম "এই নাও।"

সে তখন স্মিতহাস্যে বলিল—"তা' তা' ভুল-ভ্রান্তি অমন হয়। বুঝলে, আমি কিছু মনে করি নি তার জন্যে। দরকার যদি হয়,খবর দেও—সঙ্গে টাকাটা পাঠালেই তাড়াতাড়ি আসতে পারব। নইলে, বুঝছ ত সবই, ছাপোষার সংসার!"

ভাই আমার আড়াইশ' টাকা মাহিনার চাকরী করে। অমিতা বলে—"তা'তে কি। চাকরী ত বাঁধা আয়—কাজেই কুলিয়ে উঠতে পারে না।"

বাবা হাসেন, বলেন—"তাঁর শেষদিনেও যেন ওকে খবর না দিই।

কিন্তু তা পারি কি—হ'জার হোক ভাই ত ; এক বাপেরই ত সন্তান!

—ভবঘুরে—

শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ, বি-এ

সুকুমার বিদ্রোহী,—তাই সে প্রথম বিদ্রোহ করিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিধানের বিরুদ্ধে। ফলে তাহাকে বি-এ উপাধি-প্রাপ্তির মুখেই কলেজ ছাড়িতে হইল এবং ইহার জন্য কাহারও কাছে কোন কৈফিয়ৎও সে দিতে রাজী নয়—কারণ, কৈফিয়ৎ দেওয়া দুর্ব্বলতা। এই কৈফিয়ৎ দেওয়া উপলক্ষ্য করিয়া সেদিন পিতাকে এমন ভাবে পিতৃত্বের দায়িত্ব এবং সন্তানোৎপাদন বিষয়ে তাঁহার সংযমের অভাব প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়াছে যে, ভবিষ্যতে সুকুমারকে আর কোনদিন তাঁহার মুখ দেখিতে হয় নাই।

কিন্তু পিতৃত্বের দায়িত্ব যত বড়ই হউক, তাঁহার জীবনের মেয়াদ একদিন শেষ হইয়া গেল। তিনি রাখিয়া গেলেন এক ঘর নিরাশ্রয় পরিজন, আর তাহাদের আতঙ্কস্থল প্রচুর দেনা। সুকুমারের নিষ্ক্রিয় আলস্যের মাধুর্য্য অকস্মাৎ এমনভাবে আহত হইয়া পড়িল দেখিয়া, সে বোধ হয় একটু বিচলিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। পাছে পিতার অদূরদর্শিতার ফলে সে বিপদ তাহার স্কন্ধে ভর করে এই আশঙ্কায় একদিন সে অদৃশ্য হইল—কারণ, সাধিয়া বিপদ মাথায় লওয়ার মধ্যে বাহাদুরী থাকিলেও সাহস এক তিলও ছিল না।

অদৃশ্য সুকুমার ভোজবাজীর মত কোথায় কোন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তাহা এবং সুকুমারের এই অসাধারণ মনোবৃত্তির মূলে কোন নিগূঢ় দার্শনিকতা নিহিত, ইহা গবেষণার বিষয় হইলেও, কোন মনীষিই তাহা লইয়া মাথা ঘামান নাই। দুই-চারিদিন খোঁজ-খবর করার পর স্বজনবর্গও তাহার সম্বন্ধে নিতান্ত অবিচার করিয়া বসিলেন। সকলেই তাহার অনুসন্ধান ব্যাপারে একান্ত নীরব হইয়া গেলেন।

কিন্তু সুকুমারের চুপ করিয়া থাকিলে চলে না। দেহের মধ্যে এমন কতকগুলি অবয়ব বিধাতার নির্ব্বুদ্ধিতায় স্থান পাইয়াছে,—যেগুলির খোরাক্ যোগাইতেই হইবে।

আজ যদি সে বিধাতা-নামক সেই অদৃশ্য বৃদ্ধটার দেখা পাইত, তাহা হইলে তিনদিন অনাহারে থাকার দুঃখ যে কতবড়, তাহা এমন করিয়া বুঝাইয়া দিত যে, বৃদ্ধ বিধাতা আর পলাইবার পথ পাইত না।

বিধাতা পলাইবার পথ না পাইলে হয় ত বিশ্ব-সৃষ্টির একটা সুরাহা হইতে পারিত। কিন্তু, সুকুমারের পক্ষে এখন যে উঠিয়া দাঁড়ানই দুঃসাধ্য। যে উপায়েই হউক, আজ কিছু আহার সংগ্রহ করিতে না পারিলে শুইয়া শুইয়া বিধাতার ত্রুটী বাহির করাও যে আর ঘটিয়া উঠিবে না।

সুকুমার দেহটাকে একবার নাড়া দিয়া দেখিল, সর্ব্বাঙ্গ বেদনায় অচল। মনের বেগ যে পরিমাণ বাড়িয়াছে, দেহটা ঠিক সেই পরিমাণেই অপটু হইয়া পড়িয়াছে। সে একবার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া উঠিয়া বসিল; তারপর কোন প্রকারে উঠিয়া দাঁড়াইল। তৃষ্ণায় জিহ্বাগ্র হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে পাইলে অগস্ত্যের সিন্ধু-শোষণ সে অনায়াসে করিয়া ফেলিতে পারে। পকেটে হাত চালাইয়া দেখিল, হাতটা পকেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবাধে তলা দিয়া বাহির হইয়া গেল; আটকাইবার মত সেখানে কিছুই নাই।

যা' হোক্, তবু তাহাকে চলিতে হইবে। সুকুমার হন্ হন্ করিয়া চলিতে সুরু করিল।

সহরে প্রবেশ করিবার পথে একটা চায়ের দোকান। সুকুমার কোনদিকে না চাহিয়া সেইখানে ঢুকিয়া পড়িল। দুই কাপ চায়ের সঙ্গে এক প্রকার পেট পূরিয়া কেক-বিস্কুট প্রভৃতি আহার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক গাল হাসিয়া দোকানদারকে বলিল—"কি জানেন, খিদে এমন পেয়েছিল যে, চোখে-কাণে কিছু আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। খুব সময়ে আপনি দোকান খুলেছিলেন।"

দোকানদার "আমিও দোকান খুলেছি, আপনিও এসে ঢুকেছেন—এখনও বউনি হয় নি।"

সুকুমার পকেটে হাত দিয়া ছেড়া স্থানটা মুঠা করিয়া ধরিয়া বলিল—"সে জন্য ভাববেন না। বউনি আপনার আজ না হোক কাল যে হবে, এ আমি লিখে দিতে পারি। চাই কি আজই আপনি এমন বড়লোক হ'য়ে যেতে পারেন যে, এ দোকানের আর আপনার কোন দরকারই থাকবে না। আচ্ছা, আপনারা সিগারেট রাখেন না বুঝি?"

—"কেন রাখব না, এই যে নিন না।"

সিগারেট লইয়া মুখে পূরিয়া সুকুমার বলিল —"দেশলাই আমার পকেটে থাকে না। কত যে কিনি, তার ঠিক নেই! অথচ যখন দরকার দেখি, পকেটে নেই। কেউ চাইলে না দিয়ে পারি না; এইটে আমার কেমন যেন একটা দুর্ব্বলতা।"

—"আমি দিচ্ছি।" বলিয়া দোকানদার দোকানের পিছনের দিকে ঘেরা যায়গায় গিয়া ঠিক যেখানে সেটি রাখিয়াছিল, সেখানে পাইল না। ফলে তাহার মিনিটখানেক দেরী হইল। পরে একটী ছালশূন্য ম্যাচবাক্স আনিয়া 'এই নিন' বলিয়া সাম্‌নে তাকাইতেই দেখিল,—সেখানে কেহ নাই। সুকুমার ততক্ষণ গলির পর গলি পার হইয়া বেশ আনন্দে চলিয়াছে।

দুই

সমস্ত দিনটা সে বিজয়োল্লাসে সহরটা টহল দিয়া ফিরিল। কিন্তু চলার শেষ না থাকিলেও শরীরের ত সহ্য করিবার সীমা আছে। ক্লান্তিতে তাহার সারাদেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সে রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা রকের উপর বসিয়া পড়িল।

সকালে দুই বাটী চা আর খানকয়েক বিস্কুট সে খাইয়াছে। তাহার পর প্রায় তের চৌদ্দ ঘণ্টা চলিয়া গেল। ক্ষুধা, হাঁ, ক্ষুধা বোধ এখন হইতে পারে বইকি। আচ্ছা, ঠিক এই সময়টাতে বাড়ী গেলে কেমন হয়।

সেখানে উপনীত হইতে পারিলে আশ্রয় এবং আহার্য্য দুইটারই দ্বন্দ্ব নিরুদ্বেগে সমাধান হইতে পারে বটে!

সুকুমার উঠিয়া পড়িল এবং অতি দ্রুত বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। কিন্তু অধিকদূর যাইবার পূর্ব্বেই তাহার চলার ভঙ্গী, চক্ষের দৃষ্টি, আর সাজসজ্জা দেখিয়া পুলিশ তাহাকে ধরিয়া চালান দিল

সুকুমারের হাসি পাইল। যাহার অভিনব আবিষ্কারের প্রতি স্থির লক্ষ্যে সমস্ত জগৎ উৎ-কণ্ঠায় প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহাকেও কিনা পুলিশে ধরে!

যথারীতি সুকুমারের দেহে তল্লাসী হইবার পর পুলিশ দেখিল, বৃথাই পথের একটা ভিখারীকে লইয়া এতটা সময় নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং, সুকুমার মুক্তি পাইয়া পথে আসিল। এখন উপায় কি? পথে দাঁড়াইয়া উপায় ভাবিতে গেলে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, সে বাড়ী যাইতেছিল, পথে পুলিশ তাহাকে আটকাইয়াছিল। সুকুমার আবার জোরে পা চালাইয়া দিল।

কিছুদূর যাইয়া সুকুমার দেখিল বিস্তর লোক পথে ভীড় করিয়া কিসের অপেক্ষা করিতেছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল,—বায়স্কোপে চারি আনা টিকেট কিনিবার আশায় এই জন সমাগম।

তাহার মাথায় একটা নূতন চিন্তা সাড়া দিল। বায়স্কোপে ফিল্ম তুলিলে কেমন হয়? কথাটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অভিনয় ভাল হইলে—তখনই কোম্পানীর সহিত একটা বন্দোবস্ত করিতে সে বায়স্কোপের ফটকের কাছে আসিতেই কে তাহার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"দাদা।"

সুকুমারও চমকাইল। আপন-জনের মুখ হইতে এই স্নেহের সম্বোধন তাহাকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিল। যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া সে বলিল—"হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমার অনেক কাজ—হাত ছেড়ে দে চারু।"

চারু অর্থাৎ চারুশীলা—সুকুমারের মাস্তুতো বোন। সুকুমার ইহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিত। সুকুমারের মনোবিকারের কথা শুনিয়া অবধি এই আধপাগলা দাদাটীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চারু বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছে এবং আজ অবধি স্বামী দ্বিজেনকে সুস্থির হইতে দেয় নাই। আজ সহসা এমন অসম্ভাবিত উপায়ে দাদাকে পাইয়া সে তাহার হাতখানি আরও চাপিয়া ধরিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিজেনকে গাড়ী ডাকিতে বলিয়া সুকুমারকে লইয়া ফাঁকা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমার ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি তুলিতেই চারু বলিল—"শুনব সব দাদা, তবে এখন নয়—এই যে গাড়ীতে ওঠো।" সুকুমার শান্ত শিশুর মত চারুর আদেশ পালন করিল।

তিন

—"তোমার বায়স্কোপ কি বলে দাদা?"

—"আমি কি ছাই গেছি সেখানে, যে বলব।" বলিয়া সুকুমার হাসিয়া উঠিল এবং মস্ত রসিকতা হইবে ভাবিয়া বলিল—"দাদাটী যে কি বস্তু সে কথা ত আর বোনটীর জানা নেই! যারা জানে, তারা কিন্তু বিসর্জ্জন দিয়ে বাঁচলে।"

—"সে তাদের দোষ, তোমায় তা'রা চিনলে না।"

—"কিন্তু আমাকে দিয়ে যে সত্যিই কোন কাজ তা'রা পায় নি, একথা না মানলে চলবে কেন?"

"কাজই কি সব?"

"সব কিনা জানি না, তবে—"চারু এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই যে, ঘরের ওই অন্ধকার কোণে আলমারীর আড়ালে দ্বিজেন কি করিতেছে। এইবার সাড়া পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যাও নি এখনও?"

"কেন কাজই কি সব।"

উচ্চহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া সুকুমার বলিল—"তোকে ভারী ঠকিয়েছে চারু।"

দ্বিজেন অন্ধকার হইতে আলোকে আসিল এবং চারুর মুখের প্রতি দুইটী অনুরোধ কাতর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"আজ থাক না ওসব, রোজই পাওয়া যায় ত।"

—"না না, সে হবে না—তুমি যে লোক, তা'তে আজ না হ'লে আর কোনদিনও হবে না।"

"মজা মন্দ নয়, দাদাটীর বেলা কাজ না করার দিকে ওকালতি, আর আমার বেলা এখনি কাজ চাই,যেন বড়বাবুর হুকুম। আমি পারব না যেতে।"

"—পারবে না ত, ঠিক্ পারবে না—না, হাসলে চলবে না, বল শীগ্‌গীর। যে না বলবে সে···।"

কিন্তু শুনিবার জন্ম দ্বিজেনকে আর সেখানে পাওয়া গেল না। খানিক পরে তাহার জুতার শব্দ মিলাইয়া গেল।

সুকুমার বলিয়া বসিল—"ভারী মজার লোক

এই দ্বিজেন! ওকে এখনও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না।"

"তা' হলে তোমার লোক চেনবার শক্তি আশ্চর্য্য! এমন দুষ্টু, তুমি দু'টী খুঁজে পাবে না।"

সুকুমার নীরবে কিছুকাল ধরিয়া চিন্তা করিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"বিয়ে ক'রে তুই সুখী হয়েছিস চারু?"

"তোমার কি মনে হয়?"

"মনে আমার অনেক কিছু হয়—তা' নিয়ে ত আর কথা হচ্ছে না। তুই বাস্তবিক সুখী কি না সেইটাই জান্‌তে চাই।"

"সত্যিই দাদা, আমি এর চাইতে সুখের জীবন কল্পনাও করতে পারি না।"

—"আমারও ঠিক ওই কথাই মনে হয়। বিয়ের আগে তোকে এমন পরিপূর্ণ দেখি নি।"

"উঠলে যে? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

সুকুমার কোন জবাব দিল না— বিভ্রান্তের মত ধীতে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

চার

নাঃ, চারুর মতলবে গোল আছে! ওরা যাদুকরীর জাত—ইচ্ছামত মানুষ লইয়া খেলা উহাদের ধর্ম্ম। তাই যদি না হইবে, তা'হইলে এমন করিয়া একটা সুন্দর দৃশ্য টানিয়া আনিয়া তাহার যাযাবর জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে কেন?

একটা লোকের গায়ে ধাক্কা লাগিতেই সুকুমার চাহিয়া দেখিল ঠিক সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড মোটর। ভিতরে একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক বসিয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণে দেখিল, লাল কাঁকরের পথটুকু পার হইয়া একটী মেয়ে আসিয়া ফটকের কাছে দাঁড়াইয়াছে—যাহাকে একবার দেখিলেই আশা মিটে না। সুকুমারের মনের মধ্যে নির্ব্বাসিত কল্পনার অনেকখানি ছুটিয়া আসিয়া কেমন যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। নাঃ, ইহারা সকলে মিলিয়া সুকুমারকে পথ চলিতে দিবে না!

মেয়েটী তাহার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটা দোলা দিয়া আধ হাত দুর দিয়া মোটরে গিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে নীল, ঠিক নীল নয় আসমানী রংয়ের সাড়ীর আঁচলের একটু স্পর্শ যেন লাগিয়াছে। সুকুমার হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। এসেন্সের গন্ধ যেন নাকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে।

পথে যেন ভিড়টা আজ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। এপথে মানুষ চলে কি করিয়া? সুকুমার গলির পথ ধরিল।

পকেটে হাত দিয়া দেখিল,—এখনও যাহা আছে তাহাতে বেশ চলিয়া যাইবে। জামা-কাপড়ে চারুও এক প্রকার বাবু সাজাইয়া ছাড়িয়াছে। আচ্ছা মেয়েটী—যদি কোন দিন বিবাহই সে করে, তাহা হইলে ওই মেয়েটীকে। বাড়ীর নম্বরটা দেখিয়া রাখা হয় নাই। কিন্তু ফটকওয়ালা ওই বাড়ীটার অবস্থান, সে কোন দিন ভুলিবে না। গাড়ীর নম্বরটা— একেবারে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। একদিন ওই সমস্ত তাহার হইবে। প্রচণ্ড উল্লাসে সুকুমার হাসিয়া উঠিল।

*   *   *

তারপর কিছুদিন কাটিয়া গেল।

সুকুমার চারুর বাড়ীর খোঁজ করিয়া দেখিল, সেখানে কেহ নাই। চারুর স্বামী বদলী হইয়া কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। ফটকওয়ালা বাড়ীটার আশে-পাশে কতবার ঘুরিয়াছে, কিন্তু সেই মেয়েটীকে আর একদিনও দেখিতে পায় নাই।

হঠাৎ সুকুমারের নজরে পড়িল সেদিন যে মেয়েটিকে পথের মাঝে একটা টাকা হাতে গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল, সেই সে একখানি নীলরঙের রেশমী চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া চলিয়াছে। সুকুমার তাহার

অনুসরণ করিল। মেয়েটী গলির পথে প্রবেশ করিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল এবং সুকুমারকে দেখিয়া বলিল—"আপনি বুঝি এই করেই বেড়ান? ও দিকে নয়, এই যে এই দরজা, চলুন ওপরে।"

সুকুমার উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল—"সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি কি না।"

"তাই মেয়েমানুষের পেছু নিয়েছেন। আচ্ছা মানুষ যা' হোক!"

পাঁচ

মাস তিনেক পরের ঘটনা। চারুরা ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়াছে। দ্বিজেন সকালেই বিশেষ কাজ আছে বলিয়া সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছে, বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল এখনও তাহার দেখা নাই। মনটা উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় এমনই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে যে চারু পথের ধারের জানালা ছাড়িয়া সরিয়া আসিতে পারিতেছে না। যদি বা সরিয়া আসে, মুহূর্ত্ত পরেই সেখানে গিয়া না দাঁড়াইলেই যেন আর তাহার চলে না। মোটরের শব্দে হঠাৎ দেখিল,—হাসিমুখে দ্বিজেন বাড়ী ঢুকিতেছে।

চারু ত্রস্তে বাহিরে আসিল। স্বামী উপরে আসিলে তাহাকে অকারণ এতবেলা করিয়া ঘরে ফেরার দোষ ধরিয়া বেশ একটু তিরস্কার করিবে —এবং যাহাতে ভবিষ্যতে কোনদিন সে আর তাহার উৎকণ্ঠার কারণ না হয় যেমন করিয়াই হউক তাহাই আজ স্বামীকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইবে মনে করিয়া বেশ একটু গাম্ভীর্য্য লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু সিঁড়ির সর্ব্বশেষ ধাপে যে লোকটী প্রথমে তাহার চোখে পড়িল তাহাকে এবং তাহার দেহের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া স্বামীর প্রতি প্রয়োগ করিবার মত সমস্ত আবেগ তাহার উড়িয়া গেল।

সে সমস্ত ভুলিয়া তীরের মত ছুটিয়া আগন্তুককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এবং সেই ক্রন্দনের মধ্যে সহস্র প্রশ্নে সে তাহার দাদার গতি-বিধি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। কিন্তু সুকুমার মুখ তুলিয়া চারুর দিকে চাহিতে পারিল না, বা তাহার কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না, শুধু চারুর কাঁধে মাথাটী রাখিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিল। তাহার চোখও শুষ্ক ছিল না।

"ভাই-বোনে গলা ধরাধরি ক'রে কাঁদলেই আমাদের পেট ভরবে, কেমন?"

"ওমা তাই ত" বলিয়া চারু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া সুকমারের হাতে তেল ও তোয়ালে আনিয়া দিয়া বলিল—"কলঘরে সাবান আছে শীগ্‌গির নেয়ে এসে। দেরী করো না যেন।"

সুকুমার শুধু একবার চারুর মুখের পানে চাহিল। বোধ করি মুখে হাসির রেখাও ফুটিয়াছিল, কিন্তু তাহা এমনই করুণ ও মর্ম্মন্তুদ যে চারু দেখিয়া ফিরিয়া উপরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। সুকুমার ধীরে ধীরে কল ঘরে ঢুকিল।

নিজের ঘরে আসিয়া চারু স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় পেলে?"

দ্বিজেন হাসিল, তারপর একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র চারুর হাতে দিয়া দাগ দেওয়া অংশটা দেখাইয়া দিল। চারু পাড়িল।—

পুলিশের তৎপরতা—

দক্ষিণ কলিকাতার পুলিস অবৈধ পল্লীর কোন গৃহে অতর্কিতে প্রবেশ করিয়া দু'টী স্ত্রীলোক ও চারিটি পুরুষকে বে-আইনী কোকেন রাখার অপরাধে গ্রেফতার করে। একটী স্ত্রীলোকের গৃহে রুগ্ন এক বাঙ্গালী যুবককে দেখা যায়। তাহার নাম সুকুমার সেন। পুলিশ সন্দেহক্রমে তাহাকেও চালান দেয়; পরে অনু-সন্ধানে সকলকে দোষী বিবেচনা করিয়া বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করে। আগামী কল্য তাহাদের বিচারের রায় বাহির হইবে।'

—"তারপর?" বলিয়া চারু স্বামীর মুখের দিকে সজল চোখ দু'টী তুলিয়া ধরিল।

"তারপর জজ সুকুমারকে নির্দ্দোষ জেনে খালাস দিলেন। আদালত থেকেই সরাসরি রত্নটীকে উদ্ধার ক'রে তোমাকে উপহার দিতে এনেছি। তবে এর মধ্যে একটা মস্ত সুখবর আছে। তোমার বিদ্রোহী ভাইটী অতঃপর বিদ্রোহ জীবন ত্যাগ করেছেন। অধমের কাছে অনুরোধ পেশ হয়েছে,—যত শীঘ্র সম্ভব যা' হোক ছোটখাট একটা চাকরী ও গেরস্থ পোষা একটী বৌ এনে দিতে হবে।"

চারু কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু কপাটের আড়ালে শব্দ শুনিয়া দেখিল—সুকুমার প্রবেশ করিতেছে।

আনন্দের বেদনায় চারুর চোখ দুটী অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

—দস্যি ছেলে—

—শ্রীতারাপদ মজুমদার—

পাঠশালা-পলাতক নেপালকে ধরিতে আসিয়া যখন প্রায় এক ডজন ছাত্র বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল, তখন গুরুমহাশয় বেত্র আস্ফালন করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, গেলি তো শ'খানেক, একটা এক ফোঁটা ছেলেকে ধরে' আনতে পারলি নে ?

প্রধান ছাত্র সন্ন্যাসী সাহস করিয়া উত্তর দিল, সে তো বাড়ীতে নেই গুরু-মোশাই।

অনুনাসিকস্বরে তাহার উক্তিটির অনুকরণ করিয়া গুরুমশায় বলিলেন, আরে গাধা, সে ইস্কুল পালায়, সে কি বাড়ীতে বসে লুচি-সন্দেশ খায় ?...গোঁসাইদের বাগানের সেই আটচালাটা দেখেছিস্ ? আর পূবদিকের সেই জামরুল গাছটা ?

উত্তর হইল, আজ্ঞে না।

না তো সেখেনে যা' এক্ষুনি,...তাকে যদি আজ ধরে' আন্‌তে না পারো, তো, তোমাদের পিঠেই এই বেত ভাঙ্গব।

পণ্ডিত-মশায় বেত্রখণ্ড তুলিয়া তাহাদের সম্মুখে একবার ঘুরাইয়া দিলেন।

ছাত্রগুলি বারেক বেত্রদণ্ডটীর দিকে, বারেক পণ্ডিত মহাশয়ের দুর্ব্বাসা-সদৃশ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বিবর্ণমুখে গুটি গুটি বাহির হইয়া গেল।

পথে চলিতে চলিতে তাহারা গুরুমহাশয়ের এই অন্যায় বিচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল; কেহ বলিল, কাল হইতে আর পাঠ-শালায় আসিবে না, কেহ বলিল, বাবাকে বলিয়া ইহার একটি প্রতিকার করিবে!

নিমাই বলিল, ওরে থাম্ কালকের কথা কাল হবে, এখন সেই ডাকাতটাকে ধর্‌বি কি করে তাই দেখ; আমি তো ভাই বাগানের মধ্যে ঢুকব না। সেদিন ওদের বাড়ীতে ধরতে গিয়ে পাজিটা এমন ইট ছুঁড়েছিল যে, সেখানা 'অকা'র কাণের পাশ দিয়ে বোঁ ক'রে চ'লে গেল। কাণে চোয়ালে লাগলে বাছাধন সেই খানেই খুপোকাৎ...ইট খাওয়ার চেয়ে পাঠশালায় গিয়ে গুরু-মশাইয়ের কাছে দু'-এক ঘা বেত ঢের ভাল।

যুক্তি-তর্কাদি করিতে করিতে তাহারা বাগানের ধারে আসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী মুখের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এই চুপ! খুব হুঁসিয়ার! টের পেলেই চম্পট দেবে... মেধো, রমা, তোরা ওই দিককার ঘাটি আগলাবি; কাছে এলেই সাপ্‌টে ধরবি। আমি আর কেষ্টা যাচ্ছি জামরুলতলায়। এই, তোরা তিনজনে আটচালার দিকে এগিয়ে যা'...

আক্রমণকারিগণ সেনাপতির আদেশানুসারে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইল। নিমাই সৈন্যাধ্যক্ষের কথা অমান্য করিয়া বহির্দ্দেশেই দাঁড়াইয়া রহিল,—পাঠশালায় গিয়া হয়তো তাহার 'কোর্ট মার্শ্যাল' হইবে।

তাহারা যখন বাগানের ভিতর কতকটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন সকলের অন্তরে ভয় জাগাইয়া দিয়া জামরুল গাছ হইতে হুঙ্কার আসিল, এই ছুঁচোরা, আর এক পা এগিয়েছ তো ইট খেয়েছ।...

সৈন্যগণ ন 'যযৌ ন তস্থৌ'! ইষ্টক ভক্ষন ব্যাপারটী মোটেই তৃপ্তকর নয়; কারণ, ইষ্টকগুলি

অনাবশ্যক শক্ত। নেপাল বসিয়া বসিয়া জামরুল খাইবে, আর তাহারা পড়িয়া পড়িয়া ইষ্টক খাইবে, —কখনই তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। সকলেই মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল এবং এক একবার নেপালের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, ইষ্টক নিক্ষেপের কোনও উদ্যোগ হইতেছে কি না।

উর্ব্বরমস্তিষ্ক সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল, তোরা সব এক-একটা বাঁদর দেখতে পাচ্ছি, জামরুল গাছে বসে ইট পাবে কোথায় রে ?

ঠিক তো! সকলে খুসী হইয়া পুনঃ অগ্রসর হইল। কিন্তু অধিকদূর নয়। সাঁই করিয়া একখানা শুষ্ক জামরুলশাখা রমার পায়ের নিকট আসিয়া পড়িল। সকলেই রণে ভঙ্গ দিবার নিমিত্ত তৎপর। সন্ন্যাসী সর্দ্দার হইয়া কোন্ লজ্জায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে ? বিশেষতঃ, বৃক্ষারোহণে সুদক্ষ বলিয়া তাহার একটা খ্যাতিও আছে। সে এক দৌড়ে গাছতলায় গিয়া একটা ডাল ধরিয়া একেবারে গাছে উঠিয়া পড়িল। নেপাল দেখিল, ভীতি-প্রদর্শন ফলপ্রসূ হইল না ; উপরন্তু শত্রুপক্ষ সন্নিকট —তাহার বন্দী হইতেও আর বিলম্ব নাই! চোখ-মুখ বুজিয়া এক লাফ! কিন্তু ভূমিতল হইতে উঠিতে-না-উঠিতেই মাধব আসিয়া ধড়মড় করিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। নেপাল বুঝিল, আর পরিত্রাণ নাই। সে সজোরে মাধবের নাক কামড়াইয়া ধরিতেই মাধব 'বাপ' বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পাঁচ হাত পিছাইয়া গেল। এত সব ঘটিয়া গেল মাত্র দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই। যখন সেনানীবৃন্দ প্রকৃতিস্থ হইল, তখন দেখিল শিকার হাতছাড়া।

সন্ন্যাসী তখন সবে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়াছে, মাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ভারি তো ননীর পুতুল তুই রে! নাকটায় একটা কামড় দিতেই ষাঁড়ের মতো চিল্লাতে চিল্লাতে ছেড়ে দিলি! চল, এখন মার খাবি গিয়ে। আমি শুধু তোর নামেই লাগাবো।

মাধব নাসিকায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অর্দ্ধ-ক্রন্দনের স্বরে কহিল,তোমার হ'লে দেখতে মজাটা! একেবারে দাঁতের দাগ বসে গেছে। মানুষের কামড়েও আবার বিষ হয়।

তোর মাথা হয়! পরাজয়ের ব্যথায় মুখখানি মলিন করিয়া সন্ন্যাসী সঙ্গোপাঙ্গ সমেত পাঠশালার দিকে রওনা হইল।

মাধবের নাসিকার আস্বাদ লইয়া নেপাল অন্তর্হিত হইল। কিছুদূর গিয়া দেখিল, কেহই অনুধাবন করিতেছে না। তখন সে ধাবনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া একটা স্তূপের উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল যে, বাগানটি এখন আর তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। পিছনে 'ফেউ' লাগিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়,—সুপক্ক সুমিষ্ট জামরুলগুলি হইতে বিচ্ছেদ!...কিন্তু আপাততঃ লুকান যায় কোথায় ? হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাদের নিজেদের বাড়ীর পাশের সেই ছোট পুষ্করিণীর কথা ;—তাহারই এক পার্শ্বে একটি ছোট খাটো জঙ্গলও আছে। অন্ততঃ, আজ বেলা চারিটা অবধি সেইস্থানে বেশ নিশ্চিন্তে আত্মগোপন করা যাইবে। যথা সঙ্কল্প, তথা কর্ম্ম। বোসেদের গোশালার কানাচ দিয়া, কর্ম্মকার-মামার গোলাবাড়ীর ভিতর দিয়া, অখিলবাবুদের ছোট ডোবাটীর ধার দিয়া সে ধীরে ধীরে অতি সঙ্গোপনে তাহার নবোদ্ভাবিত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। ব্যস, আর পায় কে ? কিন্তু দৌড়াইবার সময় আঁচলের জামরুলগুলির অধিকাংশই পড়িয়া গিয়াছে। যাহাই হোক, অবশিষ্টগুলি লইয়া সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গভীর মনোযোগের সহিত সম্পূর্ণ নির্ভীক চিত্তে সে জামরুল চর্ব্বনে রত। হঠাৎ বাম কর্ণে অতিরিক্ত আকর্ষণ হওয়াতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল কাকা-

বাবু—স্বয়ং শমনদেব হইলেও বোধ হয় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল।

দক্ষিণ গণ্ডে একটী সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কাকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইস্কুলে যাস নি কেন? জামরুল চুরি করেছিস কোত্থেকে?

নেপাল নিরুত্তর, চর্ব্বণ কার্য্যেরও বিরতি। বোধ হয় জামরুল পরিপাক সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া চড় পরিপাক করিতে লাগিল!

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া কাকাবাবু তাহার গালে আরও দুইটি চড় লাগাইয়া তাহার কাণ ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে পাঠশালায় হাজির!

গুপ্তধন উদ্ধারার্থে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে হতাশ হইয়া গিয়া অকস্মাৎ কোনও সন্ধান পাইলে মানুষ যেমন লাফাইয়া উঠে, ভাঙ্গা চেয়ারখানি হইতে স্প্রিংয়ের মত সেইরূপ তিন হাত লম্ফ দিয়া মুক্তকচ্ছ পণ্ডিতমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, এই যে, কোথায় গেলে ভায়া? ...মেধোটার নাকটা কামড়ে একেবারে তুলে নিয়েছে।

একটা ধাক্কায় নেপালকে গুরুমহাশয়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কাকাবাবু বলিলেন, শরীরটা ভাল ঠেকছিল না বলে সকাল-সকালই আজ বাড়ী ফিরেছি, ফিরে পুকুরপাড়ে গিয়ে দেখি শ্রীমান বসে' বসে' জামরুল চিবুচ্ছেন...খুব ক'রে লাগাবেন, যেন ভুলেও আর কক্ষণো ইস্কুল না পালায়। কটমট করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে কাকাবাবু বিদায় হইলেন।

ছাত্রগুলি তখন পুস্তকের দিকে মুখ রাখিয়া এবং এক একবার আড়চোখে গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া নেপালের শাস্তি সম্বন্ধে মনে মনে আন্দাজ করিতে লাগিল। কাকাবাবুর ধাক্কাতে নেপালের আঁচল হইতে পতিত জামরুলগুলির দিকেও দুই চারিটি শিশুর লোলুপদৃষ্টি পড়িল। মাধব চোখ হইতে যেন আগুন বাহির করিয়া নেপালকে ঝলসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গুরুমহাশয় কিছুক্ষণ স্থির নির্ব্বাক! প্রহার পর্ব্বটি কিরূপ ভাবে আরম্ভ করিবেন ও কতদূর পর্য্যন্ত চালনা করিবেন, তাহারই গবেষণায় নিমগ্ন। মিনিট চারি-পাঁচ সব চুপচাপ। অতঃপর জলদগম্ভীর-স্বরে শিক্ষক মহোদয় অনুজ্ঞা করিলেন, মনে, দুটো বিচুটীর লতা ছিঁড়ে আন্। গোবরা, আর দু'গাছা বেশ পাকা দেখে কঞ্চি...তুই খানচারেক ফর্ম্মা ইট নিয়ে আয় রে।

* * *

সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। গোসাঁইদের বাগানের একটা শ্যামলতার ঝোপের ভিতর লুকানো শ্লেট-বহিগুলি বাহির করিয়া লইয়া নেপাল বাড়ী ফিরিল। গিয়া দেখিল, মাতা গৃহে নাই। বড় ঘরে তালা লাগানো। রন্ধনাগারে গিয়া দেখিল দরজার মাত্র শিকলি দেওয়া। পুস্তক ইত্যাদি এক রকম ছুঁড়িয়াই ফেলিয়া সে রান্নাঘরের দরজা খুলিল—কোথাও খাবার নাই। ধীরে ধীরে জননীর সন্ধানে বাহির হইয়া যাইতেই বহির্দ্বারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ। মাতা পাশ কাটাইয়া গম্ভীরমুখে বাড়ী ঢুকিলেন; কোনও কথা কহিলেন না। নেপাল বুঝিল, ইহার পরও জননীর নিকট গালিগালাজ প্রাপ্য রহিয়াছে। প্রহারের অবশ্য আশঙ্কা নাই; কারণ,গুণ্ডা ছেলের গায় হাত তুলিতে মাতার বোধ হয় সাহসে কুলায় না। বেদম মারের পর দুই-চারিটি বকুনি—বোঝার উপর শাকের আঁটি। নচেৎ এখন যায়ই বা কোথায়? উদরজ্বালাও তো প্রবলভাবে আরম্ভ হইয়াছে। বাড়ীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাতা গুম হইয়া বসিয়া আছেন। আঙ্গিনাতে পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নেপাল কহিল, সন্ধ্যে লেগে গেল, ক্ষিদে পায় না বুঝি।

মাতার পক্ষ হইতে কোনও উত্তর নাই।

নেপাল মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেল। কর্ত্তব্য স্থির

করা তাহার পক্ষে সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। পুনরায় বলিল, বলি, খেতে-দেতে কিছু দিবি, না কি ?

এবারে মাতার বাকস্ফুরণ হইল ; বলিলেন, যা' না, জামরুল খেয়ে আয় গে না, পেট ভরবে না তাতে ? হতাচ্ছড়া, আমার হাড়ে নুন-মিত্তিকে দিয়ে তুই ছাড়বি রে ! আচ্ছা, পড়াশুনো করবি নে তো গরু চরাবি ?···

বাধা দিয়া নাকীসুরে নেপাল বলিল, চুলোয় যাক্ তোর লেখাপড়া ! ক্ষিদেতে নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে, না দিসতো চল্‌লাম। সে পথের দিকে মুখ ফিরাইল। সত্য-সত্যই সে তখন ক্ষুৎপীড়িত হইয়াছিল। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের দারুণ নিগ্রহ, তদুপরি ক্ষুধার উদ্রেক,—তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

সন্তানের অশ্রুর অদ্ভুত ক্ষমতা ! মাতার অশ্রু টানিয়া বাহির করে। জননীর দ্রবনীয় হৃদয় আর কঠিন রহিল না। বাহ্যতঃ সেটী প্রকাশ না করিয়া তিনি বলিলেন, আবার বেরুচ্ছ কোথায় ? নাও, গিল্‌বে এস। কি পুড়ুনিটাই পুড়ছি তোমায় নিয়ে, মা গো !

গিলিবার জন্য নেপাল প্রস্তুত। স্থতরাং হাত পা ধুইয়া দাওয়ায় উঠিয়া শান্ত শিষ্টটীর মতো বসিয়া পড়িল।

দুই

দুরন্ত বালকেরা মার খাইয়া খাইয়া সেটীকে কতকটা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলে। প্রহার যেন তখন তাহাদের কাছে বিভীষিকাময় থাকে না। নেপালের অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ হইয়াছিল। দুরন্তপনার জন্য সে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হইত পুনঃ পুনঃ, কিন্তু প্রহার-বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আবার তাহার ভিতরের শয়তানটী গা-নাড়া দিয়া উঠিত।

প্রায় দশ-বার দিন কাটিয়া যাইতেই একদিন জামরুল গাছটীর কথা নেপালের পুনরায় মনে পড়িয়া গেল। সেদিন ছিল শনিবার—পাঠশালায় পুরাতন পড়া। তাই শুধু বাঙলা বহিখানি হাতে করিয়া নেপাল পাঠশালার জন্য বাহির হইল। পথে বাহির হইতেই গোঁসাইদের বাগানের জামরুল গাছটী যেন নেপালকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সু-শ্বেত জামরুলের স্তবকগুলি তাহার মনের মধ্যে দোল খাইতে লাগিল ; স্থতরাং, পাঠশালার কথা ভুলিয়া গিয়া নেপাল পুস্তকখানি একটী গোপনীয় স্থানে রাখিয়া দিয়া বাগানে প্রবেশ করিল।

গোঁসাইদের বাগানটী তাঁহাদের বসতবাটীর পার্শ্বেই। গোঁসাই-বাড়ীতে পুরুষমানুষ বলিতে মাত্র হরিসুখ গোঁসাই—বৃদ্ধ, বাতগ্রস্ত। স্থতরাং, তিনি বাগানের তত্ত্বাবধান করিতে প্রায় অপারগ। বাড়ীর মহিলারা তো পারেনই না। কাজে-কাজেই নেপাল বাগানের মধ্যে সুখে রাজত্ব করিত।

আজ সশস্ত্র হইয়া নেপাল গাছে উঠিয়াছে—তাহার আঁচলে চারি-পাঁচ খণ্ড ইষ্টক। সেদিন পাঠশালার ছেলেগুলি আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়াছিল বলিয়াই আজ তাহার পূর্ব্বাহ্নেই এই উদ্যোগ। বেলা প্রায় এগারটা, বাগান জনশূন্য। নেপাল পরমসুখে নিশ্চিন্তমনে জামরুল চর্ব্বণ করিতেছে। এক-একবার গলা ছাড়িয়া গান গাহিবারও ইচ্ছা হইতেছে ; কিন্তু সাহস হইতেছে না। ঊর্দ্ধে কতকগুলি সুপুষ্ট ফল দেখিয়া সেগুলি পাড়িবার জন্য উপরের ডালে উঠিতেই তাহার বাগানের অন্তবর্ত্তী চত্বরের দিকে দৃষ্টি পড়িল ; অস্পষ্ট দেখিল, যেন অর্দ্ধখঞ্জ প্রবীণ হরিসুখ গোঁসাই লোকনাথ বাগ্‌দীর কন্যা সোহাগীর কেশাকর্ষণ করিতেছে এবং মেয়েটীও তাঁহার হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাব-কৌতূহলী নেপাল দ্রুত বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া চত্বরের দিকে ছুটিল এবং সমীপস্থ হইয়া সোহাগীকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি রে সোহাগী ?

সোহাগী লজ্জা-বিমিশ্রকণ্ঠে বলিল, ঘরে ঘুঁটে ছিল না বলে' ক'খানা শুক্‌নো কাঠ কুড়োতে এসেছিলাম। তারপর সে সব ঘেন্নার কথা দাদা-বাবু, তুমি ছেলেমানুষ, আপনাকে আর কি বলব! তাই কাঠ চুরির নাম দিয়ে এখন······

অশিক্ষিতা সোহাগীর ভাষায় বালককে বুঝাইবার মতো আর উপকরণ ছিল না!

ইতিমধ্যে হরিমুখ গোঁসাই সোহাগীকে ছাড়িয়া দিয়া নেপালের কাণ চাপিয়া ধরিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ সপ্রতিভভাবে বলিতেছেন, ওরে হারামজাদা, তাই ভাবি জামরুলগুলো যায় কোথায়? আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।······

সোহাগীর কথাগুলি সম্যক্‌ বোধগম্য না হইলেও নেপাল তাহার বালকোচিত বুদ্ধিতেই সেগুলিকে যেন বিশ্রী মনে করিল। সোহাগীর কথা শুনিয়াই সে ইষ্টকখণ্ডগুলির উদ্দেশে আঁচলে হাত পুরিয়াছিল; সেই সময় আবার গোস্বামীপ্রভু তাহার কাণ ধরিয়াছেন। একেবারে বিষধরের ফণায় হাত! সে জ্বলিয়া উঠিল—ধাঁ করিয়া গোসাইজির লোল গণ্ডদেশে একটা চড় মারিতেই পঙ্গু গোসাইজি ভূমিশায়ী। নেপালও তন্মুহূর্ত্তেই অদৃশ্য! সোহাগী ছাড়া পাইয়া পরক্ষণেই পলায়ন করিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর অতি শঙ্কাকুলচিত্তে নেপাল গৃহে প্রত্যাগমন করিল। গোস্বামীপ্রবর যে এই ব্যাপারটাকে সহজে এড়াইয়া যাইবেন, ইহা কখনই তাহার মনে হইতেছিল না। বুঝিল, বাড়ী গিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম অক্ষত রহিবে না।

কাকাবাবু একখানি চাবুক প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিলেন। নেপাল গৃহে পদার্পণ করিবা-মাত্রই তিনি তাহার কেশগুচ্ছ ধরিয়া অজস্র বেত্র বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। জননীও আজ ভীষণ রাগিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোর শিল, তোর নোড়া, তোরই ভাঙব দাঁতের গোড়া! গেছিস্‌ তো তাঁর বাগানেই জামরুল চুরি কর্‌তে; বল্‌তে এসেচেন তো উল্টে মার—বামুনের গায় হাত!·········খু-উ-ব মার, যেন একেবারে শেষ হ'য়ে যায়, ও ছেলের মুখ না দেখাই ভাল।······

প্রহার রীতিমতই হইল। নেপাল ঘটনাটা বলিবার ফুরসৎও পাইল না, বলিবার ইচ্ছাও করিল না; কারণ, সে জানিত, তাহার কথা কেহ আমলেই আনিবে না।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া মাতা দেখিলেন, নেপালের গাত্র যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তাঁহার মুখখানি কালি হইয়া গেল। বুকের মধ্যে যেন কাঁটা ফুটিতে লাগিল। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাকিলেন, নেপু······

মা বলিয়া নেপাল চোখ চাহিল।

হাঁ করিয়া উত্তর দিবার সময় নেপালের রক্তাক্ত দন্তপংক্তিদ্বয় দেখিয়া মাতার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি পাশের ঘরে গিয়া বলিলেন, ও ঠাকুরপো, রাগের মাথায় কি মার মেরেছ—ছেলের মুখখানা যে রক্তে ভরে গেছে—গা যে আগুন!······

ঠাকুরপো আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ও কিছু নয়। ওর দাঁত দিয়ে তো মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে তো জানোই; আর গা গরম হবে না?—যে রোদ্দুরে রোদ্দুরে বেড়ায়!

পুত্রের দূষিত দন্তের কথা মাতা জানিতেন, তজ্জন্য চিন্তিত হইলেন না; কিন্তু, গাত্রের উষ্ণতা তাঁহার নিকট ভাল ঠেকিল না। বুঝিলেন, অতিরিক্ত প্রহারের ইহা পরিণাম।

* * *

রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে নেপালের রোগও যেন বিকটরূপ ধারণ করিতে লাগিল। দুরন্ত পুত্রের শান্ত মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া মাতা অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন।

হঠাৎ নেপাল চীৎকার করিয়া উঠিল—মারব না? বেশ করেছি! কেন তুমি সোহাগীকে অপমান কর্‌লে! কেন তুমি বামুন হয়ে মিথ্যে কথা বললে!

মা পুত্রের মাথাটা নাড়িয়া দিয়া শঙ্কিতকণ্ঠে ডাকিলেন, নেপু! নেপু!

পুত্র সে ডাকের উত্তর দিল না—বুঝি দিবার শক্তিও তাহার লোপ পাইয়াছে। বিকারের ঘোরে সে তখন বলিয়া চলিয়াছে—আবার! আবার এগুচ্ছিস্ সন্ন্যাসী, ইট মেরে চোখ কাণা করে দেব বলে দিলুম। কে রে, মাধব, তুই আবার এসেছিস; নাকের ব্যথাটা সেরে গেছে বুঝি? এবার……

মা তাড়াতাড়ি ঠাকুরপোর ঘরে গিয়া ডাকিলেন—ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো, একবার ওঠ না ভাই, ছেলেটা যেন ভুল বক্‌তে সুরু করেছে।

বিরক্তিভরে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া কাকা একবার ভাইপোর দিকে চাহিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, পাগল হয়েছ বৌঠান্! দস্যি ছেলে শুয়ে শুয়েও দুষ্টুমী ভুলতে পারছে না! বিক্রম দেখ না। শুয়ে পড়, ও আপনি সেরে যাবে!

ঠাকুরপো নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। মাতা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া শুধু তাহার বিবর্ণমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

পুত্র আপন-মনে বলিতে লাগিল, কাঁদিস নি সোহাগী, কাকা মেরেছে বলে' ভয় আমি করি না! ও বুড়োকে একদিন শেষ করে তবে ছাড়ব!

কিন্তু শেষ তাহাকে আর করিতে হইল না—ভোরের দিকে নিজেই শেষ হইয়া গেল! মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওগো, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল!—নেপু যে আমার আর কথা কয় না গো!…

পাশের ঘরে ঠাকুরপো আপন-মনে বলিয়া উঠিলেন, ভাল বিপদ! যদি বা একটু স্থির হ'ল তো ডাক পাড়তে সুরু করেছেন। মার আস্কারা না পেলে কি আর অমন হয় তখন!

—প্রতিশোধ—

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

—এক—

বেলা অপরাহ্ণ। গৌরীপুর গাঁয়ে ঘোষাল-ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপে তখন পূরা মজ্‌লিশ চলেছে। গিরীশের ছেলে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে—বাপ মাকে একটি পয়সাও দেয় না, যদু মুখুজ্জে বিধবা ভাই বৌটাকে খুবই কষ্ট দেয়; পরেশ ঘোষের ভারি অহঙ্কার—মহাজনি করে দু'পয়সা হাতে হয়েছে বলে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না, ইত্যাদি পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় আসরটা বেশ পূর্ণমাত্রাতেই জমে' উঠেছে। এমন সময় রমাপতি ঘোষাল কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বল্‌লেন,—"আরে বল কি ভায়া, দেবু চাটুজ্জের ছেলে স'তেটার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক্ হয়ে গেছি। ছোঁড়াটা দু'পাত ইংরিজি পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। একটা ষোল বছরের ধিঙ্গী বোন পুষে রেখেছে; আবার বলে কি না আরও বেশী বয়স না হ'লে বে দেবো না—আমরা না কি মুখ্যু, যতসব কচিমেয়ে ধরে ধরে বে দিয়ে দেশটার সর্ব্বনাশ করছি।"

হলধর শিরোমণি পাশে বসেছিলেন। মোটা একটিপ নস্য নাকে টেনে দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন,—"বল কি! দেশ-সংস্কারক এখন ওরাই হবে না কি? শাস্ত্রবাক্য মিথ্যে হবে?—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা চ
রোহিণী, দশমে কন্যকা প্রোক্তা—"

—এ যাঁরা লিখে গেছেন তাঁরা মুখ্যু ছিলেন—বটে! সমাজের বুকে এরকম ব্যভিচার, চলবে না! সমাজ কক্ষনো এসব কদাচার সহ্য করবে না!"

শশিশেখর মুখুজ্জে বারকয়েক হাই তুলে কি-একটা কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার পদার্থ মুখ গহ্বরে নিক্ষেপ ক'রে বলে' উঠ্‌লেন,—"কখনই না—কখনই না! স'তেকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা হোক্; যদি সে এর ব্যবস্থা না করে, তবে আমরাই করবো। কেউ জলগ্রহণ পর্য্যন্ত ওর বাড়ী করব না।"

আলোচ্য সতীশের উপর দ্বারিকা চক্কত্তির খুবই রাগ ছিল, তা' রাগ করবারই কথা; যেহেতু, চক্কত্তি-মশায়ের ছেলেটিকে সতীশ তার ভগ্নীর জন্যে মনোনীত করে নি। স্পষ্টই তাঁর মুখের ওপর বলেছে—"প্রতিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি; আদর্শ হিন্দুনারী ক'রে গড়ে তুলতে। তাকে কোন শিক্ষিত পাত্রের হাতে দান কর্‌ব।"

তাই আজকের এই মজ্‌লিশে সতীশকে দস্তুরমত অপদস্থ করবার মতলবে মুখুজ্জে-মশায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চক্কত্তি-মশায় বল্‌লেন,—"শুধু জলগ্রহণ করবে না কি দাদা,—গাঁয়ের ভেতর সমাজের বুকে এ পাপ প্রশ্রয়ই দেব না। এতে যে সমাজের অমঙ্গল। ওর কত বড় ক্ষমতা তা' একবার দেখে নেব। কতদিন ওর ভগ্নীকে আইবুড়ো রাখতে পারে, তা' একবার দেখাচ্ছি। শুনেছ শেখর দা', স'তেটা আমায় বলে কি না আপনার ছেলের সঙ্গে যদি প্রতিভার বে দেন,—আশা কম নয়!

গোপাল ঘটক চিরকালই স্পষ্টবক্তা। চক্কত্তি-মশায়ের কথা শুনে বল্‌লেন,—"আরে, তাই নাকি! তাই নাকি! তা' চক্কত্তি, সত্যি কথা বলতে কি, সতীশের ভগ্নী ত দেখতে মন্দ নয়।

তোমার ছেলের সঙ্গে বে দিলে তোমার ছেলের ভাগ্য ভাল বল্‌তে হবে।"

চক্কত্তি-মশায় বাধা দিয়ে বল্‌লেন,—"কি রকম? আমার ছেলের ভাগ্য! কেন সে খারাপ কিসে শুনি? বাংলা লেখাপড়ায় তার মত গাঁয়ে কটা ছেলে আছে? মনকষা, সেরকষা মুখস্থ। মীরগঞ্জে গেলে, এখনি বড় মুদিখানায় আদর ক'রে ডেকে নেবে। আর স'তের বোনটার চেহারা, বল না, বল না? মুখ, চোখ, নাক, দেখলে হাসি পায়; তবে রংটা একটু ফরসা—এতেই সুন্দরী হ'ল? বলিহারি, তোমার পছন্দ-ঘটক! যদি এতই পছন্দ হয়ে থাকে, ভাগ্নেটার সঙ্গে বে দিয়ে দাও! হাসালে ঘটক—হাসালে! স'তে কি তোমায় কিছু ঘটকালি দেবে না কি?" বলে চক্কত্তি একটু শ্লেষের হাসি হাস্‌লেন।

ঘটক রুষ্ট হয়ে বল্‌লেন,—"সত্যি কথা তোমাদের কাছে ত চিরকালই অপ্রিয় হয় চক্কত্তি। কে না জানে যে, সতীশ তার ভগ্নীকে তোমার ছেলের সঙ্গে বে দেবে না বলেই তুমি অত চটে উঠেছ। তা' সে তোমার চেয়ে ধনী, বিদ্বান। বোন্‌কে সৎপাত্রে দেবার জন্যে তাকে উপযুক্ত ক'রে তুলছে। তোমার মত হা-ঘরে সে বে দেবে কেন? এ যে তোমার অন্যায় আবদার! তোমার ঐ পাঠশালা-ফেরৎ ছেলের সঙ্গে বে দেওয়াও যা', তার ভগ্নীকে জলে ফেলে দেওয়াও তা'—একই কথা।"

"যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! বুঝেছি, বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। ঘটক আর কত ভাল হবে। ঘটকালিটা মোটা রকমই কবলেছে দেখছি। আচ্ছা, দেখা যাবে কত ভাল পাত্রে বিয়ে দেওয়াতে পার।" বলে' চক্কত্তি আর রাগ সামলাতে না পেরে সভা ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

সেদিনকার সান্ধ্যআড্ডা ভঙ্গ হ'ল।

—দুই—

গৌরীপুর গাঁয়ে চাটুজ্জে-পরিবার বনিয়াদি বংশ। সতীশের বাপ দেবী চাটুজ্জে সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত মোক্তার ছিলেন। মোক্তারী ক'রে তিনি বেশ দু'-চার পয়সা অর্জ্জনও করেছিলেন। বার মাসে তের পার্ব্বণের কোন অনুষ্ঠানটাই বাদ দিতেন না। হৃদয়খানি ছিল তাঁর দয়া-মমতায় গড়া। পরের আপদ-বিপদের কথা শুন্‌লে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ত। পরের উপকারের জন্যে তিনি অনেক সময় নিজের অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করেও মুক্তহস্তে দান করতেন। আজ বাঁড়ুজ্জে বাড়ী অর্থাভাবে ভাল চিকিৎসা করান হচ্ছে না—অমনি তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। অর্থাভাবে চক্কত্তিদের কন্যা সৎপাত্রে দান করা হচ্ছে না—অমনি তিনি বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন। এমনি নিত্য নিত্য অজস্র পরের উপকার করায় তিনি গরীবের মা-বাপ বলে' বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। কাজে-কাজেই মৃত্যুকালে পুত্র-কন্যার জন্যে বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি।

স্ত্রী রমাদেবী কন্যা জন্মগ্রহণের চার বছর পরে স্বামী-পুত্রের মায়া কাটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন। দেবীবাবুও আর বিয়ে না ক'রে স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুত্র-কন্যাকে বুকে নিয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করছিলেন। মাত্র তিনদিনের জ্বরে হঠাৎ একদিন দেবীবাবুকেও সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হল।

যাবার সময় পুত্রের হাত ধরে' তিনি বলে' গেলেন—"বাবা সতীশ, আমার সময় হয়েছে—আমি চল্লুম! তোমাদের জন্যে বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারলুম না। তবে মোটা ভাত-কাপড়ের কষ্ট হবে না। লেখাপড়া ছেড়ো না। প্রতিভাকেও তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। তাকে তুমি সৎশিক্ষা দিও। আমাদের বাংলার আদর্শ করে তুলে তারপর সৎপাত্রে দান ক'রো।

সে আজ দু'বছরের কথা। সতীশ এখন আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছে। ভগ্নী প্রতিভার

বিয়ের জন্যে যে তার একেবারে চেষ্টা ছিল না, এমন না কিন্তু উপযুক্ত পাত্র অভাবে বিয়ে দিতে দেরী হচ্ছিল।

তিন

সেদিনকার ঘটনায় দ্বারিকা চক্কত্তি গোপাল ঘটকের ওপর মনে মনে খুবই রেগে উঠ্‌লেন। স'তের জন্যে তার এত মাথা ব্যথা কিসের? এর প্রতিকার করতেই হ'বে। তা' যদি না করতে পারেন, তবে তাঁর দোয়ারি চক্কত্তি নামই বৃথা।

ছোট গাঁখানির বুকে একটা দলাদলির সৃষ্টি হয়ে বেশ একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। দ্বারিক চক্কত্তি, ঘোষাল-ঠাকুর শশিশেখর মুখুজ্জে প্রভৃতি ক'জন তথাকথিত গাঁয়ের নেতা এবং সমাজের মাথাদের নিয়ে বৃহৎ একটা দল সৃষ্টি হ'ল।

ঘটকও দমবার পাত্র ন'ন। তিনিও গাঁয়ের দু'-পাঁচজন নিরপেক্ষ ভদ্রলোকদের নিয়ে আর-একটা দলের সৃষ্টি করলেন। চক্কত্তি-মশায় ও তাঁর দলস্থ লোকদের চেষ্টা হ'ল যা'তে সতীশের বোনের বিয়ে না হয়—আবার ঘটক-মশায়ের দলের লোকদের চেষ্টা হ'ল যা'তে সতীশের বোনের বিয়ে বেশ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

এই রকমে দু'টি দলে বিবাদ চল্‌তে লাগ্‌ল।

সতীশ যখন শুনলে যে, তা'কে নিয়েই গাঁয়ের মধ্যে এরূপ দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে, তখন তার মনটা বিষাদে ভরে' উঠ্‌ল। বড় দুঃখ হ'ল তার, পল্লীগ্রামের কুশিক্ষার কথা ভেবে।

সতীশ ঘটক-মশায়ের কাছে গিয়ে বল্‌ল—"ঘটক কাকা, শুনলুম আমার জন্যই গাঁয়ের ভেতর অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে?"

ঘটক-মশায় বললেন,—"আরে বাপু, চক্কত্তির কথা ছেড়ে দাও—আমি তোমার হয়ে দু'কথা বলেছি বলে' সে কি না লোকের কাছে বলে বেড়ায় আমি ঘটকালি পাবার আশায় তোমার পক্ষ নিয়েছি।"

সতীশ এ ক্ষেত্রে বলবার মত কোন কথা খুঁজে পেলে না ঘটক বলতে লাগলেন,—"তা' বলুক, বলুক, গোপাল ঘটক তাতে ভয় করে না। তোমার মা-বাপের দয়ায় আমি আজও বেঁচে আছি। তাঁদের আশীর্ব্বাদে সে সাহস আমার খুবই আছে। আমি স্পষ্টবক্তা। অন্যায় দেখ্‌লে আমি না বলে' থাকতে পারি না। এতে যে যা' মনে করে করুক, আমি কারো এক চালায় চাল দিয়ে বাস করি না।"

সতীশ নিশ্বাস ছেড়ে বল্‌ল, "কিন্তু সেই আপনাকেও ত জড়িয়েছে। ঘটক হেসে বল্‌লেন, —"আসল কথা হচ্ছে, চক্কত্তির ওই গুণধর ছেলের সঙ্গে প্রতিভার বিয়েটা যদি দিতে পারতে, তা' হ'লে আর এসব গোল কিছুই হ'ত না। সেইটেই হয়েছে তোমার মহাদোষ।"

এ বলে ঘটক-মশায় হোহো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। তারপর সতীশকে বল্‌লেন, -"যাও বাবা,যাও। তোমার এ ঘটক কাকা বেঁচে থাকতে তোমাকে জব্দ করে, এমন লোক এ গাঁয়ে কেউ নেই।"

চার

ক্রমে প্রতিভার বিয়ের অনেক সম্বন্ধ আস্‌তে লাগল; কিন্তু চক্কত্তি দলের কৌশলে সব সম্বন্ধই ভেঙ্গে যেতে লাগ্‌ল।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটীতে সতীশের বন্ধু অরুণ তা'দের গাঁয়ে বেড়াতে এসে প্রতিভাকে দেখে এবং প্রতিভার শিক্ষা ও গুণের পরিচয় পেয়ে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

তারপর সতীশ যখন অরুণকে তার বিরুদ্ধে গাঁয়ের আক্রোশের কথা বল্‌লে তখন সহানুভূতির ভাষায় সে বলে উঠ্‌ল,—"সতীশ, তোর যদি মত হয়, তবে আমি প্রতিভাকে বিয়ে করতে পারি।"

সতীশ আনন্দের আতিশয্যে অরুণের গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে,—"অরুণ, তুই আমার বোন্‌কে বিয়ে করবি, সে যে আমার ভাগ্য ভাই।"

অরুণ বি-এ পাশ ক'রে আইন পড়ছিল। তার

পিতা সঞ্জীব মুখুজ্জে কোলকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকীল। এ বিবাহের তিনিও আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন।

এক শুভদিনে শুভ লগ্নে অরুণের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে হ'য়ে গেল। বিবাহে রাত্রে সতীশ গাঁয়ের সমস্ত লোককই নিমন্ত্রণ করল। গাঁয়ের লোকেরা যাতে সতীশের বাড়ী না খায়, সে জন্যে দ্বারিক চক্কত্তি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু চক্কত্তির অনুরোধ অপেক্ষা লুচি-মোণ্ডার আকর্ষণটাই গাঁয়ের লোকের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় হয়ে উঠল। সুতরাং দু'-পাঁচজন দলপতি ছাড়া সকলেই সুড়্ সুড়্ করে এসে নিমন্ত্রণে যোগদান করলেন।

পুরোহিত শিরোমণি-মশায় যা'তে এ বিয়েতে পৌরোহিত্য না করেন সেজন্যেও চেষ্টার ত্রুটি হয় নি; কিন্তু মোটা দক্ষিণে পাওয়ার লোভে শিরোমণি-মশায়ের মত পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। তিনি চক্কত্তিকে স্পষ্টই বল্লেন—"কি জান দোয়ারি, দেবু চাটুজ্জের ছেলের জাত মারতে পারব না; ও অনুরোধ আমায় করো না। তারপর তার দোষই বা কি? সে ত এমন কোন অন্যায় কাজ ক'রে নি। বোন্‌কে লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স্থা করে সুপাত্রে দান করছে। তা' এত আমাদের শাস্ত্রেরই আদেশ—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধন রত্ন সমন্বিতা॥"

বলে শিরোমণি-মশায় নামাবলি কাঁধে নিয়ে বিয়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন। চক্কত্তির আর কোন কৌশলই খাট্‌ল না।

পাঁচ

বছরখানেক পরের কথা।

গাঁয়ের মহাজন পরেশ ঘোষ আহারান্তে নিদ্রার পর বাইরের ঘরে একটা মাদুরের ওপর বসে চোখে একখানি পিতামহ পরিত্যক্ত ডাঁটি-হীন সুতোবাঁধা চশমা খাটিয়ে হিসাবের খাতা দেখ্‌ছিলেন; এমন সময় দ্বারিক চক্কত্তি ব্যস্ত-সমস্তভাবে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখ শুষ্ক, বুকে যেন কি-একটা ভারি বোঝা চাপান রয়েছে।

চক্কত্তি-মশায়কে দেখে ঘোষজা বল্লেন,—"আসুন চক্কত্তি মশায়, প্রণাম হই।"

চক্কত্তি মাদুরের একপাশে বসে বল্লেন—"বড্ড বিপদে পড়েছি পরেশ দা', আজ আমার মেয়ের বিয়ে; দু'শ' টাকার অনাটন। কোনক্রমেই যোগাড় করতে পারলুম না। আপনি না ধার দিলে আমার জাত যায়। আপনিই এখন একমাত্র ভরসা। আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি।"

টাকার কথা শুনে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে ঘোষজা বল্লেন—"এ বছর বড্ড দুর্বচ্ছর—ধর গিয়ে—হাতে একটা পয়সা নেই।"

তারপর তিনি হিসাবের খাতায় চক্কত্তি-মশায়ের হিসাব বার ক'রে সাম্‌নে ধরে' বল্লেন—"পাঁচ বছর আগে ধর গিয়ে—আপনি পঞ্চাশটে টাকা কর্জ্জ করেন, তা'হ'লে ধর গিয়ে—মাসে সুদ হচ্ছে তিন টাকা দু'আনা; বছরে সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা; আজ পাঁচ বছরে ধর গিয়ে—পাওনা হয় একশ সাড়ে সাতাশী টাকা। কিন্তু ধর গিয়ে—আপনি সুদের অন্দরে নব্বইটাকা মাত্র জমা দিয়েছেন। এখনও তার সুদই বাকী—ধর গিয়ে - সাড়ে সাতানব্বই টাকা; তা' ছাড়া—ধর গিয়ে—আসল ত আছেই। এত টাকা বাকী থাকতে ধর গিয়ে—আমি আর কি ক'রে টাকা দেব। গাঁয়ের সকলে বলে,—পরেশ ঘোষের হাতে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা আছে—ধর গিয়ে—যদিই থাকে, তবে কি এমনি করে উড়বো—কেন আমি ত দাদা খয়রাত করতে বসি নি।"

চক্কত্তি নিরাশ হ'য়ে ঘোষাল-ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘোষাল-মশায় টাকার কথা শুনে বলে' উঠ্‌লেন—"এই দুর্বৎসরে সংসার চল্‌ছে না ভাই, টাকা কোথা পাব?"

চক্রবর্ত্তি বিষণ্ণভাবে বল্লেন—"দাদা, বড় আশা ক'রে তোমার কাছে এসেছি।"

ঘোষাল-মশায় তাঁর দন্তহীন মুখে একগাল হেসে বল্লেন—"তা' আস্‌বে বই কি—আস্‌বে বই কি—এত তোমাদেরই বাড়ী - তবে কি না হ'তে-পাতে একটি পয়সাও নেই—এই কথা; নইলে তোমার বিপদও যা', আমার বিপদও তা'।"

চক্রবর্ত্তি দ্বা'রে দ্বারে ঘুরেও যখন কিছুই যোগাড় করতে পারলেন না তখন ভগ্নমনে বাড়ী ফিরে এলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। কর্ম্মক্লান্ত সূর্য্যদেবের শেষ রশ্মিটুকুর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বাড়ী বর এসে উপস্থিত হ'ল।

সেদিন লগ্ন ছিল রাত্রি ন'টার পর। বরের পিতা পণের টাকা গুণতে বসলেন—এ কি! এ যে দু'শ' টাকা কম!

চক্রবর্ত্তি হাতযোড় ক'রে প্রার্থনা বিজড়িত-কণ্ঠে বল্লেন,—"এ টাকা আমি একমাসের মধ্যে আপনাকে নিশ্চয়ই দেব।"

বরের বাপ সে কথা শোনবার পাত্র ন'ন। তিনি রেগে বল্লেন,—"সমস্ত টাকা হাতে না পেলে আমি কখনই ছেলের বিয়ে দেব না।"

চক্রবর্ত্তি তাঁর হাত ধরে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"রক্ষে করুন, আমার জাত মারবেন না।" দুঃখে-কষ্টে চোখ দিয়ে তাঁর বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগল।

বরের বাপ কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে বর তুলে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। চক্রবর্ত্তি-বাড়ী কান্নার রোল পড়ে গেল।

চক্রবর্ত্তি-মশায়ের আত্মীয়-বন্ধু সকলেই এদৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলেন, কিন্তু কেউ কোন প্রতিকারের উপায় কর্‌লেন না।

সতীশ এসময় বাড়ীতেই ছিল। পূর্ব্বের স্মৃতি আজও ভুল্‌তে না পেরে চক্রবর্ত্তি তাকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করেন নি। একথা শুনে সে আর স্থির থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি চক্রবর্ত্তি-বাড়ী ছুটে এল।

সতীশকে চক্রবর্ত্তি বাড়ী উপস্থিত দেখে সবাই নির্ব্বাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সতীশ কারও দিকে না চেয়ে ধীরে ধীরে চক্রবর্ত্তিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে পকেট হ'তে দু'শ' টাকা বা'র ক'রে তাঁকে দিয়ে বল্লে,—"আমার বোন্—বোনের বিয়েতে ভাইয়ের এ যৌতুক নিতে কিন্তু কর্‌লে চল্‌বে না কাকা-বাবু।

আনন্দের আতিশয্যে চক্রবর্ত্তি কেঁদে ফেল্‌লেন। অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টি মুছে সতীশের হাত ধরে বল্লেন,—"বাবা সতীশ, তুমি মানুষ নও দেবতা! দেবী দা'র উপযুক্ত সন্তান। জানি অভাগা কাকার উপর তোমার কোন ক্ষোভই নেই, তবু..."

বাধা দিয়ে সতীশ তাড়াতাড়ি বর নিয়ে সম্প্রদান ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল

বিষাদ মাখা বাড়ীখানি আবার আনন্দে মুখরিত হ'য়ে উঠল। অন্তঃপুর হ'তে শুভ-বিবাহের মঙ্গল শঙ্খ বাজতে সুরু করল

— হরণ —

শ্রীহরিপদ গুহ
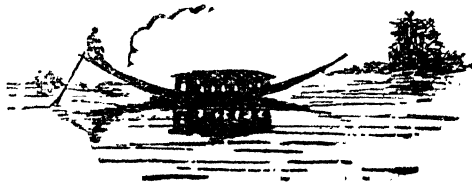
এক

সেবার সরস্বতী পূজায় গ্রামে থিয়েটার হইতেছিল। পালা ছিল—পাষাণী। যে ছেলেটি অহল্যার পাঠ লইয়াছিল, তাহার বাড়ী পাশের গ্রামে। তাহাকে স্ত্রী-ভূমিকায় খুব সুন্দর মানায়; বহুবার সে অভিনয় করিয়া সকলের নিকট প্রশংসা পাইয়াছে।

খুব অল্পদিনের চেষ্টায় অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। নলিনী কলিকাতায় থাকিয়া পড়িত। তাহাকে অহল্যার পাঠ লিখিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল,—পূজার দু'দিন পূর্ব্বে ছুটি লইয়া সে দেশে চলিয়া আসিবে এবং এখানে থাকিয়া পূজার দিন অভিনয় করিয়া চুপি চুপি আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। কারণ, সে তাহার জ্যাঠা-মহাশয়কে বাঘের মত ভয় করিত;—তাঁহার নিষেধ ছিল যে, বি-এ পাশের পূর্ব্বে যেন আর কোন থিয়েটার কিংবা যাত্রায় অভিনয় করা না হয়। পর পর দুই বৎসর আই-এ পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় তাহার প্রতি এই কড়া হুকুম। এইজন্য প্রথমে অভিনয় করিতে সে অস্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু সকলের অনুরোধে শেষে মতের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। লোকে লোকারণ্য। পাড়া গাঁয়ে কোন প্রকার অভিনয়াদি হইলে নিমন্ত্রণের বড় প্রয়োজন হয় না। সংবাদটা মুখে মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং পাঁচ-সাত মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে লোক আসিতে থাকে।

অভিনয় বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে 'বাহবা' আর ঘন ঘন হাততালির শব্দ হইতেছে। সহসা দর্শকদের মধ্য হইতে একজন কে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'কেরে, নলে? পাজী, আবার নেবেছিস্ প্লে করতে!'

পাশের কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহাকে ধরা-ধরি করিয়া বসাইয়া চুপ করাইয়া দিলেন।

দর্শকবৃন্দ চুপ করিল বটে, কিন্তু ষ্টেজের ভিতর আবার একটা গোলমাল উঠিল। সহসা অহল্যার অদৃশ্যই এই বিভ্রাট! চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। কোথাও তাহাকে আর পাওয়া গেল না। এদিকে ড্রপ পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে মহা হৈ চৈ।

সকলে বুঝিল,—নলিনীর জ্যাঠা-মহাশয় তাহাকে দেখিয়া ফেলাতেই যত বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সে যে ভয়ে ষ্টেজ হইতে এইরূপভাবে পলায়ন করিবে ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। যখন তাহাকে কোথাও খুজিয়া পাওয়া গেল না, তখন আর কি হইবে, অগত্যা সুরেশকে অহল্যা সাজাইয়া কোন প্রকারে অভিনয় শেষ করিতে হইল।

দুই

নলিনী অহল্যার বেশ পরিয়াই ষ্টেজ্ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। ছুটিতে ছুটিতে সে পল্লীর শেষ প্রান্তে আসিয়া একটি বাড়ীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন গভীর রাত্রি। চারি-দিক নিস্তব্ধ। নলিনী ভাবিল,—এখান হইতে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ষ্টেশনে

যাইবে; তারপর প্রথম ট্রেনেই কলিকাতা রওনা হইবে।

সহসা কোথা হইতে কি যে হইয়া গেল, সে বুঝিতে পারিল না। পিছন হইতে কাহারা আসিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, তারপর শূন্যে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। এতবড় একটা কাণ্ড যেন এক নিমিষে ঘটিয়া গেল। সে একটা কথাও কহিতে পারিল না।

নলিনী যে বাড়ীর পিছনে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য দাঁড়াইয়াছিল, সেই বাড়ীতে একটি সুন্দরী বিধবা বউ ছিল। গ্রামের কয়েকজন চরিত্রহীন মুসলমানের লোলুপ দৃষ্টি অনেকদিন হইতেই তাহার উপর পড়িয়াছিল। বহুদিন হইতে তাহারা সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। আজ স্ত্রী-বেশে নলিনীকে একা পাইয়া সেই বিধবা বউ ভ্রমে এই কাণ্ড করিয়া বসিল।

* * *

দুর্বৃত্তেরা নলিনীকে আনিয়া একটা ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তাহাদের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি-সব পরামর্শ হইল। একজন বলিল—'আগে হাঙ্গামা চুকে যাক্, পরে ভেবে-চিন্তে যা' হয় করা যাবে 'খন।' সকলেই তাহার এই যুক্তি মানিয়া লইয়া ঘরে তালাবন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রথমটায় নলিনীর খুবই ভয় হইয়াছিল। এখন তাহার ভারি হাসি পাইল। সে উঠিয়া কপাটের খিল্‌টা আঁটিয়া দিল। ছোট্ট একটি জানালা দিয়া নক্ষত্রের খানিকটা ক্ষীণ জ্যোতি ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে সে দেখিতে পাইল,—মেজেতে একটা চাটাই ও একটা বালিস পড়িয়া আছে। তখন তাহার খুব ঘুম পাইয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তাহাতে শুইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেকখানি বেলা হইয়াছে। এক ঝলক রৌদ্র দুরন্ত শিশুর মত তাহার শিয়রে খেলা করিতেছে। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—ঘরটি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার। এক পাশে একটা ভাঙ্গা আয়না পড়িয়াছিল। নলিনী সেখানি উঠাইয়া লইয়া নিজের মুখ দেখিয়া আপন-মনেই একবার হাসিয়া উঠিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ঘামেতে মুখের রঙ্ গলিয়া গিয়া বিশ্রী হইয়াছে, নাকের নীচ গোঁফের রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে বড় বেশী দেরীও নাই। সে কাপড়ের খুঁটটা দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া গালের রঙ তুলিয়া ফেলিল—হাত দিয়া মাথায় পরচুলটা ঠিক্ করিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া মাথায় ঘোমটা দিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই দেখা গেল,—ছোট্ট জানালাটিতে এক জোড়া কালো হরিণ চোখ। সে অনেকক্ষণ নলিনীকে লক্ষ্য করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—'আমাকে আপনার সেবার ভার দিয়েছে।—অনেকখানি ত বেলা হয়ে গেছে—একটু গরম দুধ এনে দি?'

নলিনীর তখন খুব ক্ষুধা পাইয়াছিল; সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

একটু পরেই এক শ্যামবর্ণা তরুণী একবাটি গরম দুধ ও দু'টা চাটিম কলা আনিয়া দিল। নলিনী এক চুমুকে সব দুধটা পান করিয়া কলা দু'টির সদ্ব্যবহার করিল। তারপর থিয়েটারী ভঙ্গীতে কাঁদ কাঁদসুরে বলিল—'আপনি আমাকে এ বিপদে রক্ষে করুন। আপনি নারী, আপনি যদি আমার দুঃখ না বোঝেন, তবে আর কেউ বুঝ্‌বে না!' বলিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নারীর হৃদয় অতি কোমল, সহজেই বেদনা স্পর্শ করে। সে নলিনীর কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার পিঠে সহানুভূতির পরশ দিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল—'দিদি, আমার ত কোন হাত নেই এতে। আমার সাধ্যানুসারে আমি তোমার সাহায্য কর্‌ব। আমার ভাই ওস্‌মান আজি বড়

বদলোক। আমি তার মার পেটের বোন, আমার উপরই সে কত অত্যাচার করে! কি করব, উপায় নেই, নীরবে সবই সইতে হয়! আজ যদি আমার সাধ হ'ত—' ব'লয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে থামিয়া গেল।

নলিনী প্রশ্ন করিল—'আপনার নাম কি বোন?'

তরুণী সহাস্য বদনে বলিল—'পিয়ারা-বানু।'

পিয়ারাবানু কহিল—'আপনার নাম?'

নলিনী ব'লল—'আমার নাম সরলা।'

এমনই করিয়া দুইজনের মধ্যে বেশ আলাপ জমিয়া উঠিল।

তিন

অনেকখানি রাত্রি হইয়া গিয়াছে। নলিনী প্রথমটা কিছুই খাইতে চাহে নাই। অনেকবার বিলাপ করিয়া মায়া কান্না কাঁদিয়াছে। পিয়ারা-বানু বহুবার তাহাকে বুঝাইয়া কিছু আহারের জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া গিয়াছে। প্রাণ যখন রাখিতেই হইবে, তখন আর জাতিবিচার করিয়া লাভ কি? এইরূপ বহু সদ উপদেশও দিয়াছে। অনেক অনুরোধের পর তাহাকে কিছু দুধ-মিষ্টি খাওয়াইতেও রাজী করিয়াছে।

পিয়ারাবানু তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া কপাট বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সারা দিন ভাবিয়া নলিনী একটা মতলব স্থির করিল। সেটা ভাবিয়া আপন-মনেই সে হাসিয়া উঠিল। বলিল এদের এমন জব্দ করব যে, জীবনে ভুলবে না। চিরকাল এরা হিন্দুর মেয়েদেরই হরণ করে আসছে। মুসলমানদের মেয়ে কখন হরণ হয়েছে বলে শোনা যায় না, এবার দেখাব প্রতিশোধ নেবার প্রয়োজন হ'লে হিন্দুরাও পেছপাও হয় না। আপন মনে এইরূপ অনেক আবোল-তাবোল ভাবিয়া দ্বারে খিল দিয়া সে চাটায়ের উপর শুইয়া পড়িল।

পূর্ব্বরাত্রে ভাল নিদ্রা না হওয়ায় একটু পরেই সে সুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িল।

পরদিন খুব প্রত্যুষেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শিয়রে একটা গ্লাসে জল ছিল, তাহাতে চোখ মুখ ধুইয়া সে বেশবিন্যাস করিয়া ঠিক্ হইয়া বসিল।

একটু পরেই দ্বার খোলার শব্দ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—পিয়ারা বানু। হাতে একবাটি গরম দুধ। নলিনী আজ বিনা আপত্তিতে তাহার হাত হইতে বাটিটা লইয়া এক চুমুকে সবটুকুই! শেষ করিয়া ফেলিল। বাটিটা লইবার সময় পিয়ারাবানু নলিনীর মুখ দেখিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিল। কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে ক্ষণেকের জন্য মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। নলিনী তাহার অবস্থা বুঝিয়া স্মিতমুখে ব'লল,—'অমন ক'রে ভয় পেয়ে চম্‌কালে চলবে কেন? যখন ভালবেসেছ,তখন বোন না হই,ভাই ত বটে! ভাইকে পর ভাবতে নেই।'

বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কাটিয়া গেল। সহাস্য-বদনে সে বলিল—'পেয়ারাবানু,'ভালই হ'ল আজ এক নূতন ভাই পেলুম। বেশ করেছ, তুমি খুব বাহাদুর বটে! ভাইজোন্‌কে খুব জব্দ করেছ। এবার তার অনেকটা শিক্ষা হবে। তার ভারি গুমর ছিল যে, তার বুদ্ধি খুব সাফ্। এইবার জব্দ হ'ল। আর তারই বা দোষ দেব কি, তোমার যা' চেহারা আমিই বুঝতে পারি নি। ব্যাপার কি বল ত?'

নলিনীর অধর কোণে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাটা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া দিল। সব শুনিয়া পিয়ারা-বানু খিল্‌খিল করিয়া একেবারে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

নলিনী তাহাকে তাহার ছদ্মবেশ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার ভাই ওস্‌মান আলির কথা জিজ্ঞাসা করিল।

পিয়ারাবানু বলিল—'পুলিশ হাঙ্গামার ভয়ে তারা ভিন্ন গ্রামে গেছে তিন দিন পরে ফিরে আস্‌বে। আমার ওপরই তোমার এ ক'দিনের ভার দিয়ে গেছে।'

নলিনী হাসল। বলিল—'দু'দিন তো এক প্রকার খাওয়াই হয় নি, শুনেছি, তোমাদের রান্না খুব ভাল; আজ আমার জন্য রামপাখীর বন্দোবস্তই কর না কেন।'

নলিনী যাহাই বলে, পিয়ারা তাহাতে একেবারে হো-হো শব্দে হাসিয়া ওঠে। তাহার প্রতি কথায় পিয়ারার হৃদয়ে নৃত্যের ছন্দ জাগিয়া উঠে।

সেদিন মধ্যাহ্নে নলিনীর ভোজন বেশ গুরুতরই হইয়াছিল। আহারান্তে দুই জনে অনেক আলাপ-আলোচনা হইল।

নলিনী হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—'আচ্ছা পিয়ারা, এখনো তোমার সাদি হয় নি কেন? অবশ্য যদি কোন বাধা না থাকে, আমায় বল্‌তে পার।'

পিয়ারাবানু কহিল—'সে অনেক কথা। আমি ভালবেসে ছলুম কাদেরকে। এই গাঁয়েতেই তার বাড়ী। সে এখন কোলকাতার কলেজে পড়ে। সে সাদির সমস্ত বন্দোবস্তই করেছিল, কিন্তু ভাইজান বাধা দিলে; বলে—তার এক দোস্ত ইব্রাহিমকে সাদি কর্‌তে হবে। আমি কিছুতেই সেই বুড়োকে সাদি কর্‌ব না।'

কাদের নাম শুনিয়া নলিনী মনে মনে খুব উল্লসিত হইয়া উঠিল। ঐ নামে একজন যুবক তাহারই সহপাঠী; দুইজনে ভাবও আছে বেশ। তাই সে পিয়ারাকে তার সম্বন্ধে খুঁটিয়া খুঁটিয়া অনেক প্রশ্ন করিল। বুঝিল—সেই পিয়ারার দিল চুরি করিয়াছে। তার ভারি আনন্দ হইল। সে মনে মনে যে মতলব করিয়াছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিয়া ফন্দি করিল।

সে পিয়ারাকে বলিল—'দেখ কাদেরকে আমি খুব জানি, সে আমার সহপাঠী! তবে আজই এখান থেকে পালাতে হবে। যদি রাজী হও, তা হলে আমি তোমায় সাদি করিয়ে দিতে পারি।'

পিয়ারাভানু অনেকক্ষণ মনে মনে কি ভাবল। তারপর বলিল—তোমায় যখন ভাই বলেছি, তখন অবিশ্বাস করতে পারব না। তাই চল, আজই এখান থেকে পালাই নইলে ভাইজান সে শয়তানের হাতেই আমাকে দেবে!'

নলিনী কহিল—'বেশ!'

সেই রাত্রেই দুইজনে কলিকাতায় রওনা হইল।

নলিনী ষ্টেশন হইতে কাদেরকে এক টেলিগ্রাফ করিয়া তাহাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিতে লিখিল।

—চার—

শিয়ালদহ পৌঁছিয়া দেখিল—কাদের প্লাটফরমের বাহিরে গেটের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। নিকটেই একখানি ট্যাক্সি ছিল। তাহারা তাহাতে গিয়া উঠিয়া বসিল। পেয়ারা বানুকে আগে হইতে বলিয়া কহিয়া নলিনী একেবারে ঠিক করিয়া লইয়াছিল সে একগলা ঘমটা দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ড্রাইভার গন্তব্যস্থান জানিতে চাহিলে নলিনী কাদেরের বাসার ঠিকানা বলিয়া দিল।

কাদের একেবারে অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ব্যাপারটা ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কে এই তরুণী? আর কেনই বা তাহারা তাহার বাড়ী যাইতেছে। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নলিনী কোন উত্তর দিল না। মৃদু হাসিয়া পিয়ারাভানুর একখানি হাত কাদেরের হাতের মধ্যে তুলিয়া দিল।

কৃতজ্ঞতায় পিয়ারাভানুর সমস্ত হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

কাদের মিঞার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া

উঠিল ; সে নলিনীর এই খেয়ালের কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইল না। মনে মনে তাহার এই পাগলামির জন্য বেশ একটু চটিয়া উঠিল।

তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া নলিনী হাসি সংবরণ করিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে পিয়ারাভানুর মুখের কাপড় সরাইয়া তাহার লজ্জারক্তিম আননখানি তাহাকে দেখাইয়া দিল।

কাদের একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি স্বপ্ন না সত্য! সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

নলিনী সংক্ষেপে তাহার ইতিহাসটা বিবৃতি করিয়া বলিল—'সেই বুড়ো পাজীটার সঙ্গে কিছুতেই পিয়ারার সাদি হতে পারে না। ও যখন তোমার আশাতেই রয়েছে ওকে তোমার নিতেই হবে ভাই! জানি, তুমি ওকে ফেলতে পারবে না, সেই বিশ্বাসের বলেই ওকে নিয়ে এসেছি।'

কাদের হাসিল। ঐ সামান্য হাসিটুকু দিয়া সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া-দিল।

ট্যাক্সি বাড়ীর কাছে পৌঁছিলে তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

* * *

চৈত্র মাসের এক শুভ লগ্নে পিয়ারাভানুর সঙ্গে কাদেরের সাদি হইয়া গেল। নলিনী উভয় পক্ষের হইয়া খুব স্ফুর্তি করিয়া ফিরিল। তাহার আজ ভারি আনন্দ! সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল যিনি এমন মধুর মিলন ঘটাইয়াছেন। সে প্রথম যে মতলব করিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা হইলে আজ পিয়ারার স্থান হইত কোথায়?

নব দম্পতি প্রাণ ভরিয়া নলিনীর মঙ্গল কামনা করিল।

* * *

ওসমান আলি সদলবলে আসিয়া দেখিল— তাহাদের সাধের চিড়িয়া উড়িয়াছে সেই সঙ্গে তাহার বেইমান বহিন ও ফাঁকি দিয়াছে!

সে শোকে দুঃখে ক্রোধে একেবারে ম্রিয়মান হইয়া গেল।

—মন্দাক্রান্তা—

—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ—

দূর-দিগন্তে তখন বিশ্ব-শিল্পীর সোনার লিখন লেখা শেষ হইয়া গিয়াছে। সামনের লাল রঙের বাড়ীটীর দেয়ালে প্রভাত সূর্য্যের রক্তিম বর্ণচ্ছটা অপরূপ রূপে লীলায়িত হইয়াছে। কিন্তু তাহা দেখিবার অবকাশ তখন সুতপার ছিল না। তাড়াতাড়ি ধড়্মড়্ করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পার্শ্ব-শায়িতা ছোট বোনটীকে আকর্ষণ করিয়া ডাকিতে লাগিল—"সুষী, সুষী?"

সুষী তখন মর্ত্তলোকের পরপারে নিদ্রার কুহেলি রাজ্যে; হঠাৎ দিদির ঠেলাঠেলির রূঢ় বাস্তবতায় জাগিয়া উঠিল। আবার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের পথে জীবনের রথ চলিতে সুরু করিল।

বিবাহের বয়স হয়তো সুতপার হইয়াছিল—কিন্তু তাহা হইলেও আজও সে অবিবাহিতা। পাড়াগাঁয়ের সমাজ নয় তাই রক্ষা; নতুবা এতদিন লোকনিন্দা আকাশকে অন্ধ করিয়া দিত।

স্নান করিয়া তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িতে হইল। সুষী একরাশ বাসন লইয়া উঠানে মাজিতে বসিল—ঝি আসে নাই।

ঘড়িটার দিকে একবার দেখিয়া সুতপা ঠন্ ঠন্ করিয়া খুন্তি নাড়িতে লাগিল। আর একঘণ্টার মধ্যে বাবার ভাত দিতে হইবে। কিন্তু তবু তাহার দেহ যেন চলিতে চায় না। গত রাত্রির অনিদ্রাজনিত অবসাদে সারাদেহ ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল। মা'র অসুখটা আকস্মিক কাল রাত্রে বড় বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বাতাস করিতে হইয়াছে। শেষে ভোরের দিকে কখন মেঝের উপর আঁচলটী বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা জানে না।

মা'র অসুখের চিকিৎসা-শাস্ত্রে যে কি নাম আছে তাহা সে জানিত না। তবে এইটুকু জানে যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে কোলের মেয়েটীকে প্রসব করিয়া সেই যে বিছানায় আশ্রয় লইয়াছেন, আর তাঁহাকে উঠিতে হয় নাই। রোজ দু'বেলা রান্না করা, ছোট্ট বোনটীকে নাওয়ান, খাওয়ান, কাপড় কাচা, মায় এক-একদিন বাসন মাজা পর্য্যন্ত সমস্তই করিতে হয়। ইহার উপর মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ আছে।—"কৈ রে, আমার অফিসের বেলা হ'ল যে," বলিয়া বিনোদ ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন।

—"এই যে হোলো বাবা, ঠাঁই ক'রে দিই।"

সুতপা আসিয়া ঠাঁই করিয়া পিতাকে ভাত দিল। বিনোদ আহার শেষ করিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে ছাতাটী বগলে করিয়া আফিস মুখো হইলেন।

এইবার বাড়ীর অবিশ্রাম কর্ম্মপ্রবাহ একটু মন্থর হইয়া পড়িল। সুবিধা বুঝিয়া সুতপারও বোধ হয় কর্ত্তব্যে একটু শিথিলতা আসিয়াছে। দালানের এক কোণে একটী জীর্ণ চেয়ারের উপর বসিয়া খোঁপা খসাইয়া দিয়া সে চুলের জট্ ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া কত কি সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করিতে লাগিল। আচ্ছা, সামনের বাড়ীর মেয়েটী সুহা' বেশ, না? কাল বলছিল কি ওর বিমল দা' নাকি আড়াল থেকে আমার কথা শোনে—বাঃ! তা' কি হতে পারে?···বিমল-দা'র মোটরকার আছে, না? আচ্ছা, ওদের বিমল দা'র সঙ্গে আমার যদি বিয়ে হয়? আমাকে

তখন হয়তো মোটরে ক'রে 'লেকে'র দিকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যেবেলা একটা ঝোপের ধারে অন্ধকারে চুপটি মেরে বসে থাকা ভারী মজার কিন্তু! আমাদের বাড়ীটা যেন কি! একটুও আলো-বাতাস নেই, মা গোঃ, এখানে আবার মানুষে থাকে!

সিঁড়িতে বেতালা চটির চটপট্ শব্দ হইল।

"ভাত দাও—ও—ও।"

সুতপার তখনো ধ্যান ভাঙ্গে নাই।—

আবার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার আরম্ভ হইল -"ভাত দাও।"

এবার ঘরের মধ্য হইতে কর্কশস্বরে গিন্নীর ডাক আসিল।—"বলি অ পোড়ার মুখী! ছেলেটা যে চেঁচিয়ে সারা হয়ে গেল! কাণের মাতা খেয়েচো নাকি? এতবড় কুড়ী বছরের ঢেঁকী মেয়ে, একটু কাজের বন্দেজ শিখ্‌লে না! রান্না-বান্না সব উচ্ছন্নে গেল, উনি কিনা এই অবেলাতে বসলেন চুল বাঁধতে।"

অকস্মাৎ মা'র মুখে এইরূপ একটা হীন বিদ্রূপ শুনিয়া তাহার ক্রোধ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। হঠাৎ মুখে কি একটা ভয়ানক শক্ত প্রত্যুত্তর আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কোন রকমে আপনাকে সংযত করিয়া দূরে গিয়া আপন মনে বলিল—"সমস্ত দিনরাত যে খাটচি তার বেলা কিছু নয়, আর একটু বসেচি তো অমনি চোক্ টাটিয়ে উঠেচে।"

ছেলেটীকে ভাত দেওয়া হইল। কিন্তু ভাতের থালার দিকে দাঁড়াইয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল —"দিদি, আজ আমাকে চার আনা পয়সা দিতে হবে কিন্তু, তা' না হ'লে ভাত খাব না বলে দিচ্ছি।"

—"রোজ রোজ পয়সা কিরে? এই ত সে-দিন মিথ্যে পট্টি দিয়ে আট আনা পয়সা নিয়ে গেলি, আবার আজ? আর দোব না।"

ছেলেটী এবার ভাতের থালা হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া নাকি সুরে বলিতে লাগিল—"কেন? কেন দেবে না? সেই কবে, কতদিন আগে নিয়েছিলুম—"

ঘরের ভিতর হইতে গিন্নী আবার উত্তর দিলেন—"আঃ, তা' দে না বাপু! বেটা ছেলে আজ দু' পয়সা নিচ্ছে, বড় হোলে অমন কতো পয়সা রোজগার ক'রে আনবে। এত আর শোরের পাল মেয়ে খাওয়ান নয়। দু'-দিন বাদে বিয়েটা হয়ে গেলে শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে, আর মরে গেলেও দেখ্‌তে আস্‌বে না।"

কাজেই সুতপাকে রাজী হইতে হয়। মনে মনে কিন্তু বলে —"ঐ ক'রেই ছেলেটা গোল্লায় গেছে!"

ছেলেটী সতু,—সুতপার ভাই। ফোর্থ ক্লাসে পড়ে। কিন্তু কি জানি কি কারণে পড়াশুনার সহিত তার ভাল বনিবনা নাই—তার যত কিছু আকর্ষণ ঐ গড়ের মাঠের ফুটবলের মাঠ-গুলো ঘিরিয়াই সৃষ্ট হ'য়াছিল। গ্রীষ্মকালে প্রায়ই একটা-না-একটা ছুতায় বাড়ী হইতে পয়সা লইয়া খেলা দেখিতে যায়, আর সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া বই মুখে করিয়া ঢুলিতে থাকে। সে-রাত্রে খাইবার সময় সুতপার বড় মুস্কিল হয়। সবার খাওয়া হইয়া যায়, কিন্তু তবুও ও খাইতে চায় না—মেজেয় শুইয়া ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া চীৎকার করে—"খাঁ—বঁ—না।"

সুতপা চড়, কিল, লাথি প্রভৃতি বহুবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া অনেক কষ্টে তুলাইয়া তাহাকে খাইতে বসায়।

কি করিবে, হাজার হোক দিদি তো?—

সে তখন এক পোঁটলা কাপড়-জামা, ঘটি-বাল্‌তি, সাবান প্রভৃতি লইয়া কলতলায় নামিয়াছে—

হঠাৎ নীচের একটী ঘরের দরজা খুলিয়া

গেল। ঘর হইতে একটী পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"সুষী, ক'টা বেজেছে ?"

উপর হইতে সুষী তাহা বলিল।

অদ্ভুত এই ছেলেটী! কি কুক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।' ঠিক যে দিন হঠাৎ সে এক তার স্কুলের সহপাঠির বইয়েতে ঐ কথাগুলি পড়িল, তারপর দিন হইতেই তাহার মনেও বুঝি দীঘল বর্ষা ঘনাইয়া আসিল সে বুঝিল এ ভবকূলে বসিয়া তাহারও বুঝি আর ভরসা নাই। তাই বাড়ীর নীচে একটী নির্জ্জন ঘরে ঢুকিয়া সেই যে খিল দিয়াছ, তারপর আর খুব কম সময়ই সে বাহির হয়। সমস্ত দিনরাত বসিয়া আপন মনে বিড়বিড় করিয়া কি বকে, আর খাতা খুলিয়া গোটা গোটা অক্ষরে তাহা লিখিয়া রাখে। এরূপ কত খাতাই যে সে শেষ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই!...

অন্ধকার অপরিসর একটী ঘরের মধ্যে দিন-রাত ছেলেটী আবদ্ধ থাকে। ঘরটী রাস্তার উপর হইতে সামান্য উঁচু। পাড়ার যত ময়লা আনিয়া লোকে সেইখানেই জানালার তলায় ফেলিয়া যায়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দুপুরবেলা এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেলে পর যখন রোদ ওঠে আর ঐ আবর্জ্জনা রাশি হইতে কুৎসিত গন্ধ উঠিতে আরম্ভ হয়, তখন ছেলেটী কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া দক্ষিণ হাওয়ার আর বন জ্যোৎস্নার স্বপ্ন দেখে।—

ছেলেটী আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সুতপা একবার বলিল—"দাদা, কলের জল চলে গেল যে—"

ঘরের মধ্যে হইতে কি একটু অস্ফুট উত্তর আসিল—বোঝা গেল না।

এতক্ষণ তাহার স্নান হইয়া গিয়াছে। থালায় করিয়া ভাত বাড়িয়া লইয়া নীচের ঘরে দাদাকে দিতে আসিল।

—"ওমা! এখনো তোমার চান হয় নি...?"

কথাটা হয়তো তাহার কাণে যায় নাই তাই অন্যমনস্কভাবে অলক ভাত ভাঙ্গিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

—"ও কি চান না ক'রে খেতে বসলে যে—"

অলকের এইবার হুস্ হইল। তখনি উঠিয়া স্নান করিতে যাইতেছিল, সুতপা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।—"তা' কি কখন হয়? খেতে খেতে উঠে চান করতে যাবে? বিকেলে না হয় কোরো।"

অলক আবার বসিয়া গেল।

সুতপার হাসি পাইল। এমন ভাল ভোলা লোকও কেউ কখন দেখেচে? কিন্তু সামনা-সামনি হাসিবারও জো নেই। একদিন হাসিয়া-ছিল বলিয়া ও এমন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে কথা মনে করিলে আজও মায়া হয়।

সুতপা তখন খাওয়া সারিয়া পানের বাটা লইয়া বসিয়াছে। পাশে সুষী—দিদির কোলটীর কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়াছে—হয়তো একটু আদরের প্রতীক্ষায়। সুন্দর এই মেয়েটী! চোখে তার বন হরিণের চঞ্চলতা, পদক্ষেপগুলি ভীরু—প্রথম প্রেমের কবিতার মত। হঠাৎ সামনের বাড়ীর জানালাটী খুলিয়া গেল। একটী মেয়ে রেলিঙের উপর দু'টী হাত রাখিয়া ডাকিল—"বলি কি হচ্ছে লো সই! খুব যে দু'বোনে মিলে পাণ খাচ্ছিস! আমাদের কি মনে পড়ে না ভাই?"

ইহার পর দু'জনে গল্পে মসগুল হইয়া গেল।

"হাঁ ভাই, কাল যে বইখানা দিয়েছিলে তা' ভারী সুন্দর কিন্তু! গল্পগুলি বেশ ছোট্ট, ঝরঝরে বইখানির নামও চমৎকার! দুপুরবেলা বই পড়ে

কাটাতে বেশ লাগে। তোমার কাছে আর কি ওরকম বই আছে ভাই? কিন্তু কখনই বা পড়ব।

গল্প হয় তো আরও কিছুক্ষণ চলিত, কিন্তু হঠাৎ মাঝখান হইতে পাশের ঘরে "ওয়াক্—ওয়াক্—বাপরে! গেলুম রে—ও মা!" প্রভৃতি চীৎকার আসিতে লাগিল।

"যাই ভাই, মা'র বুঝি আবার অসুখটা বাড়ল, দেখিগে একবার—"

গিন্নী এবার নর্দ্দামার কাছে আসিয়া বসিয়াছেন আর—ওয়াক—ওয়াক্ করিয়া বমি করিতেছেন—"অত বড় সব ধিঙ্গি মেয়ে মা'র মুখ চেয়ে দেখে না একটুও! খালি দু'বেলা খাচ্চেন-দাচ্চেন, আর গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্চেন—এর থেকে যদি আর দু'টো ছেলে হোতো, তাদের বউ এসে সেবা কোরত। পেটের মেয়ে নয় তো—যেন দুধ দিয়ে পুষে রাখা সব কাল সাপ! টাকার কাঁড়ি ঢেলে এক একজনকে বিদেয় করতে হবে।…"

মাসের পয়লা।

কেরাণীর বাড়ীতে আজ উৎসবের দিন—

সুতপা একটা বঁটী লইয়া উঠানে বড় মাছটা কুটিতে বসিয়াছে। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুষী—ঘাড় বাঁকাইয়া মাছ কোটা দেখিতে দেখিতে অযাচিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে—

"বড় বঁটীটা আনব দিদি? ওমা পিত্তি গলে গেল নাকি! তেতো লাগবে কিন্তু। মুড়োটা ঝোলে আর ল্যাজাটা অম্বলে, সরষে ফোড়োন দিয়ে, না দিদি? উনুনটায় হাওয়া দেব? এবারের কয়লাটা যেন কি! মোটেই ধরতে চায় না। ষ্টোভটা জ্বালবো—"

সুষী কতকি অবান্তর কথা বকিয়া যাইতেছিল। তাহা শুনিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। পিতার এই অনর্থক অর্থব্যয়ের বহর দেখিয়া তাহার সমস্ত আগ্রহ নিমেষে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছিল। এইটুকুই কেবল তাহার মনে হইতেছিল—আজ মোটে মাসের পয়লা, এখনো গোটা মাসটা পড়ে রয়েচে—এ রকম ক'রে খরচ করলে কি করে চলবে?

সুতপা মনে মনে কিছুক্ষণ ধরিয়া কি হিসাব করিল। তারপর আঙ্গুলের কড় গুনিয়া দেখিয়া মুখখানা অকস্মাৎ গম্ভীর করিয়া ফেলিল। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার মাছ কোটায় মনোনিবেশ করিল। কিন্তু তখনও তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে কেমন একটা হতাশ, উদ্দেশহীন ভাব,—মুখখানি ব্যর্থতার অভিমানে ছায়াম্লান, পাণ্ডুর।

মানুষের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কথা বুঝিবার মত বয়স না হইলেও দিদির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন সুষী লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই—যেহেতু দিদি বলিয়া দিয়াছে সব বিষয়ে কথা কইতে যাওয়ার মত বয়স তাহার হয় নাই।

হঠাৎ সিঁড়ির উপর হইতে একটী দুধের বাটী ঠন্ ঠন্ করিয়া উল্টাইতে উল্টাইতে আসিয়া সটান নীচেয় ছিট্‌কাইয়া পড়িল। কারণটা সামান্য—মার সাবুতে হয়ত চিনি একটু কম পড়িয়াছিল, অথবা নেবু দেওয়া হয় নাই তাই এ বিভ্রাট।

এরূপ নিত্যই ঘটিয়া থাকে, আজ তাহার পুনরভিনয় মাত্র।

কিন্তু এবার কর্ত্তার মুখ হইতে এমন কতকগুলো বেফাঁস কথা বাহির হইয়া পড়িল যে, সুতপার আর মাছ কোটা হইল না। উঠান ময় মাছ বঁটী ইত্যাদি ফেলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে হইল। গিন্নীও তখন ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁর রাগ আর তখন নাই—আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তিনি থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন।

কর্ত্তা তখন একটী মাদুর বিছাইয়া তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছেন। চোখ দুটী তাঁর জবা ফুলের মত লাল। পাশে একখানি দশটাকার নোট আর দু'-একটী টাকা ছড়ান। এগুলি তাঁর আজকের মাহিনা হইতে ফেরৎ—বাকী টাকা-গুলি 'রেশ' খেলায় পরীক্ষা করিতে গিয়া আর ফেরে নাই।

এই ক'টি টাকা দিয়া তিনি এই সংসারটীকে ভবিষ্যতের হাতে সঁপিয়া দিতে চাহেন।

সুতপার আর দেহ চলিতে ছিল না। তাহার পায়ের তলায় পৃথিবী যেন বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতে ছিল। সন্ধ্যার ম্লান সূর্য্যালোক তখন তাহার নিকট বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। সে রান্নাঘরের চৌকাঠটার উপর বসিয়া পড়িয়া কাপড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অতি অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হা ভগবান!"

বছর ঘুরিয়াছে। বৈশাখ মাস। কাল-বৈশাখী আসিয়াছে, ধূলির জটা দুলাইয়া ঝরা পাতার নূপুর পায়ে দিয়া। কত পাখীই যে আজ নীড়হারা হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। বৈশাখীর একটী নৃত্যক্ষিপ্ত রেশ এ বাড়ীর মধ্যে একটী ক্ষণ মর্ম্মর তুলিয়াছে।

সুতপার বিবাহ। গরীব কেরাণীর কন্যাদায়—সুতরাং সমারোহের কিছু ছিল না, কিন্তু তা' হইলেও একটা অনুষ্ঠান ত বটে। ইহার আনুসঙ্গিক উপাদান জোগাইতে সে ক'দিন ধরিয়া হিম্‌সিম্ খাইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেকটী ঘর পরিপাটি করিয়া গুছাইতে হইয়াছিল, ঘরের কোণের দিকের ভাঙা জানালাটীর অস্তিত্ব ঢাকিবার জন্য তার উপর একটী কাল রঙের পর্দ্দা টাঙাইয়া দিতে হইয়াছিল, বালিসের ছেঁড়া ওয়াড়গুলির পরিবর্ত্তন করিয়া তার স্থানে নূতন আর একটী পরাইতেও হয়, বিছানার চাদরগুলাও সাবানে কাচিয়া না ফরসা করিলেও চলে না।

স্বল্পায়তন ছাদটীর মধ্যে একটী ছোটখাট হোগলার চালা বাঁধা হইয়াছে, এক সঙ্গে অনেক-গুলি অ্যাসিটিলিন গ্যাস জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এরই মধ্যে কলকের উপর তামাকও বুঝি পুড়িয়াছে সের দুয়েক। বিনোদ একখানি গামছা কাঁধে জড়াইয়া চারিদিকে তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন।

যথাসময়ে বর আসিল। তারপর শঙ্খ হুলুধ্বনি প্রভৃতি যাহা বিয়ের সমস্তই হইল। রাত্রিটাও কাটিয়া গেল।

পরদিন সকাল।

সুতপাকে আজ প্রথম এই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এক ডাল হইতে অন্য ডালে গিয়া নীড় বাঁধা। সকাল হইতে অনেকের নিকট সে বিদায় লইয়াছে। সামনের বাড়ীর মেয়েটীর সহিতও কিছুক্ষণ কথা হইয়াছে। শেষে একটা নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে সে এই বাড়ী ছাড়িয়া গেল, আর রাখিয়া গেল সুমীকে ইহার সমস্ত ব্যর্থতা ও রিক্ততার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে।

আজ কয়েকদিন হইল সুতপা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। কলিকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীট অঞ্চলের একখানি দ্বিতল বাড়ী; স্বল্প পরিসর একখানি উঠান, এক ফালি বারান্দা- আকাশ দেখা যায়। বাড়ীটা সুতপার বেশ মনে ধরিয়াছে। এখানে আসিয়াই প্রথমে সে এ ঘর সে-ঘর উঁকি মারিয়াছে, বারান্দায় বুকে ভর দিয়া একবার ঝুঁকিয়া লইয়াছে, দাঁড়ের ময়নাটীকে আদর করিতে গিয়া একটা ঠোকর খাইয়াছে!

এ বাড়ীতে আসিয়া যে মুক্তি পাইয়াছে, এরূপ একটা অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাও বুঝি মনের মধ্যে স্থান দেয়।

কিন্তু তার এই অতিরিক্ত চঞ্চলতা বোধ হয়

বর্ষিয়সীদের সহ্য হয় না। তাই বধূ-দর্শনোৎসুক সমবেত প্রবীণাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠেন—"মা গো, মেয়ে কী চঞ্চল, যেন চর্‌কির পাক ঘুরচে!"

কথাটার পর বেশ এক চোট হাসির লহর বহিয়া যায়।

মন্তব্যকারিণী আর কেউ নন; রমেশের মাসী.—এ বাড়ীর গৃহিণী। তাঁর সহিত সুতপার সুগম্ভীর সম্বন্ধটা প্রথমে স্মরণ হয় নাই।

সমাগতরা চলিয়া গেলে পর তিনি বলিলেন,—"হ্যাঁ গা, তোমার বাপ-মা কি তোমাকে একটু থির হয়ে বসতে শেকায়নি বাপু? বিয়ের ক'নে যে রকম বেহায়াপনা করলে আমার মাথা কাটা গেল সবার কাচে—"

সে বুঝিল এ তাহারই ভুল। এ সংসার তার বাপের বাড়ীর সংসারের ন্যায়ই নিত্য স্বার্থ-সমারোহ, হীন কটূক্তি, নিলর্জ্জ বিদ্রূপ প্রভৃতির মধ্য দিয়া চলে। মুখস্থকরা সনাতন কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্যে কোথাও যদি এতটুকু বিচ্যুতি ঘটিল তাহা হইলে সে যে জীবনের পক্ষে একান্ত অচল, ইহাই নিত্য এখানে সাব্যস্ত হইতেছে।

দিন যায়।

নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ, সাংসারিক জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত তাহার নিকট দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল সুষীর একখানি চিঠি পাইয়াছে। সে লিখিয়াছে তারও জীবন নিত্য সংঘাত তরমধ্য দিয়া কাটিতেছে। সেই পিতার রেস্‌খেলার অত্যাচার, ছোট ভাইয়ের নিত্য নূতন আব্দার, সামান্য কারণ লইয়া গালাগালি প্রভৃতি তার প্রতি দিবসের অভিষেকবাণী হইয়াছে। এই চিঠি,—কিন্তু তবু তার ফেলিয়া আসা বোনটীকে কাছে আনিয়া দেয়; আর তা'তেই সে সুখী হয়।

দুপুরবেলাটা সুতপার বড় বিশ্রী কাটে। কথা কহিবার মত একটীও লোক বাড়ীর মধ্যে নাই। যা' আছেন মাসী, তা' তাঁর দিকে কাহার আগাইবার জো নাই; মেজাজ বড় ভারিক্কি, ভাষা বড় তীক্ষ্ণ। সুতরাং তাহাকে একা কাটাইতে হয়।

সেদিন দুপুরবেলা সুতপা জানালার ধারে বসিয়া রাস্তার লোক চলাচল দেখিতেছিল। হঠাৎ তাহার অপর ফুটপাথে একটী ভিখারী মেয়ের দিকে নজর পড়িল। মেয়েটীর কোলে একটী ছেলে—মাথা নীচু করিয়া, মুখে ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া সে পথবাসী লোকেদের নিকট পয়সা চাহিতেছিল। সে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। মেয়েটী দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্কোচ-কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিল—"একদিন আপনাদের মতই ছিলাম। ব্রাহ্মণের মেয়ে। তার পর—"

সুতপা বলিল—"থাক্ থাক্ বুঝেছি. আর বলতে হবে না। আহা, তোমার ছেলেটীর কিন্তু বড্ড কষ্ট!"

তারপর সে একটু এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল—"আমি আস্‌ছি।"

উপর হইতে একটী টাকা আনিয়া মেয়েটীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"আজ এস বোন্।"

মেয়েটী চলিয়া গেল। এবার উপর হইতে একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর আসিল—'বলি ও নবাবের বেটী! আমার বাড়ীখানাকে কী দানছত্তর খুলে বসেচো নাকি? টাকাগুলো কী বাপের বাড়ী থেকে এনেছিলে বাছা, যে দাতব্য করচো—"

পিতার সহিত বিশেষণ যোগ করিয়া সম্ভাষণ তাহার জীবনে এই প্রথম। তাই সহ্য করিতে না পারিয়া তার চোখ জ্বলিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের সংযম ভুলিয়া হয় ত কি বলিয়া বসিবে

ভাবিয়া সুতপা নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু তাহার মধ্যে যে এতটা সহ্যগুণ আছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল।

মাসীমা বলিলেন—"দেমাক দেখ না! অমন করে চাইছ কেন বাছা মারবে নাকি? না বাপু, মানে মানে যাওয়াই ভাল। তোমার স্বামীর ঘর—"

কিন্তু চলিয়া যাইবার লক্ষণ বিশেষ কিছু দেখা গেল না, বরং তিনি ভিতরে ঢুকিয়া সশব্দে নিজের ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অর্থহীন-দৃষ্টিতে সুতপা সেইদিকে চাহিয়া রহিল। কি করিবে সে, বাঙালী মেয়ের জীবনে দাসীবৃত্তি যে একান্ত সম্বল!

এতবড় ব্যর্থতার মধ্য দিয়াও সুতপার অন্তর রমেশের স্নেহ-সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সে ঘোরে-ফেরে, আর ঘড়ির দিকে চাহিয়া গোণে তিনটে—চারটে—পাঁচটা···

কর্ম্মশেষে রমেশ বাড়ী ফিরিয়া আসে। কোন রকমে খাওয়া দাওয়া সারিয়া পাশের বাড়ীর তাসের আড্ডায় চলিয়া যায়।

অদ্ভুত এই লোকটী! স্ত্রীর ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা ছাড়া যে তার প্রতি আর কোন কর্ত্তব্য আছে তাহা সে জানে না।

কাজ শেষ করিয়া সুতপা যখন ঘরের মধ্যে দাঁড়ায় তখন বারটা বাজিয়াছে। আস্তে আস্তে আসিয়া একবার জানালার সম্মুখে বসে। প্রত্যহ তার বয়সের সমস্ত মেয়েরই মত সন্ধ্যার সময় গা ধুইয়া একখানি ফরসা কাপড় পরিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আকাশ দেখিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত কোনদিন আর সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সেই সময় তাহাকে ধূম-মলিন রান্নাঘরের খোপটীতে বসিয়া তরকারিতে ফোড়ন দিতে হয়।···এখন আর ওখানে বসিতে ভাল লাগে না।···আকাশের একটী তারার দিকে চাহিয়া হয় তো ওর বাপের বাড়ীর কথা মনে পড়ে। সেই তাহাদের প্রতিক্ষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহ! সুতপার চোখে দুই বিন্দু অশ্রু টল্‌মল্ করিয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণে চোখে রাজ্যের ঘুম আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। দুরন্ত অবসাদে আর বসিতে পারে না—বিছানায় শুইয়া পড়ে। চোখের কোণের উদ্গত অশ্রুবিন্দুগুলি তার অলক্ষ্যে কখন শুকাইয়া যায়।

গভীর রাত্রে তাসের আড্ডা হইতে রমেশ পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ফিরিয়া সুতপার দিকে চাহিয়া দেখিল—অতি সন্তর্পণে বিছানার এক কোণে সে শুইয়া রহিয়াছে। জানালার মধ্য দিয়া বিছানার উপর পাণ্ডুর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। তাহারি মধ্যে সুতপাকে একটী চ্যুত নব মল্লিকার মত মনে হইতেছিল। সস্নেহে সে তার ঘন চুলগুলির উপর হাতখানি রাখিল। অনেক কিছুই তার বলিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সমস্তই অস্পষ্ট থাকিয়া গেল। ঠিক এমনই সময় হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল। পরদিন অফিসের বেলা হইতে পারে—সুতরাং সে শুইয়া পড়িল।

রাত্রি কাটে। আবার সেই পরিচিত সকাল আসে। বৈচিত্র্যহীন বাঙালী মেয়ের জীবন একই প্রবাহে বিষাদ মন্দাক্রান্তা তালে বহিয়া চলে।

—ভুলের ফসল—

—সুজাতা দেবী—

এক

বি-এ পাশ করিয়াও পুত্র নিখিলেশ যখন বিয়ের নামে সমান চটাই রহিয়া গেল, তখন মাতা সৌদামিনী স্পষ্টই বুঝিলেন—পুত্রবধূ, পৌত্র লইয়া আমোদ এ যাত্রা বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে লিখেন নাই। আবার কান্না, গালি-গালাজের চোখা চোখা বাণ বিনা আয়াসে সেই অদৃশ্য দেবতাটীকে হজম করিতে দেখিয়া নিরুপায় বিধবা এই ভাবিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন যে, না হোক বংশ রক্ষা, মরণকালে শিয়রে বসিয়া এক গণ্ডুষ জল দিবার জন্য ও যেন আমার বাঁচিয়া থাকে!

পাড়ার ঠাকুর দা' কিন্তু এতটুকুতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরিহাসের মধ্য দিয়া নাতির প্রাণের কথাটা কাড়িয়া লইতে চাহিয়া বলিলেন, "এবার তা' হ'লে ময়ূরচড়া ঠাকুরটীর অন্ন মার্‌লে দাদা, কি বল? কিন্তু দেখো ভায়া, সাবধান, পূজো পাবার লোভে বার-দিদিদের আঁচল না খুঁজতে হয়!"

নাতি জোরে জোরে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "সে ভয় নেই ঠাকুর দা', আমি ঘুমিয়ে নেই।"

ঠাকুর দা' বলিলেন, "কি জানি দাদা, যে বানের জোর, শেষ রক্ষে বড় রক্ষে!"

নিখিলেশ বলিল, "বাঁধ শক্ত হ'লে বানে কি করে দাদা?"

ঠাকুর দা' মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাই না কি হে, ভাল, ভাল, আমার কিন্তু উল্টোটাই জানা ছিল।"

তারপর শরীর-তত্ত্বের শিক্ষনবীশির ফলে পরের দেহে ছুরী চালাইবার ছাড়পত্র হস্তে সে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, সেদিন পল্লী-বৃদ্ধদের পরোপকার প্রবৃত্তি আর একবার জ্বলিয়া উঠিল—কন্যা-রত্নের বিনিময়ে তাহাকে আত্মীয়তা-সূত্রে বাঁধিয়া ফেলিতে। কার্য্যতঃ, কিন্তু নির্ম্মম বিধাতার গড়া অটল প্রকৃতিতে ঘূণ ধরাইতে না পারিয়া অবশেষে ভগ্নোৎসাহে সকলকেই ফিরিতে হইল।

দুই

প্রথম ডাক্তারীর নিমন্ত্রণ পত্র আসিল হাতী-শুঁড়োর জমিদার বাটী হইতে। নব-প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের অকেজো প্রাণগুলোর ব্যবস্থা পত্রের দায়ীত্ব ভার গেজেটী নব্য ছোকরার হাতে তুলিয়া দিতে নহে, নিজের হাতভাঙা মেয়ের ভবিষ্যত কদর্য্যতার পথ বন্ধ করিতে—পত্রের শেষে লেখা ছিল, "আজ নাগাদ সন্ধ্যা আসা চাই, পুরস্কার হাজার টাকা।"

পয়সার মায়া কি অজ্ঞাত নাম্নী তরুণীর কোমল বেদনা-বিধুর মুখের কল্পনা নিখিলেশকে বাটীর বাহিরে টানিল তাহা সে নিজেই জানে না। মা পূজা শেষ বিল্বপত্রের সম্পুট সযত্নে যখন পুত্রের মাথায় ছোঁয়াইয়া মলিন মুখে প্রশ্ন তুলিলেন, "কবে ফিরবি বাবা?"

পুত্র তখন বলিল, "পরের পয়সা ঘরে তোলাই যখন কাম্য মা, তখন ফেরবার দিক্‌টা না ভাবা ভাল নয় কি? ডাক্তারখানার চাকুরীটা যাতে হ'য়ে যায় সেই চেষ্টাই করব ভাবছি।"

পতনোন্মুখ নিঃশ্বাসটা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে রাখিতে মা বলিলেন, "আমায় তবে কবে নিয়ে যাবি বাবা?"

"দাঁড়াও, হাঁপ ফেলবার জায়গাটাই আগে পাই, তবে ত · "

যাত্রার পূর্ব্বে মায়ের পায়ে হাত রাখিয়া ছেলে তার পাওনা আশীর্ব্বাদ আদায় করিল। সজল নয়নে মাতা বলিলেন, "চিরজীবি হও বাবা, লক্ষ্মী লাভ হোক !"

তিন

ট্রেণ থামিলে নিখিলেশ দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজা ঠেলিয়া 'প্ল্যাট্‌ফরমে' নামিবামাত্র একটী লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতের ব্যাগটা একপ্রকার জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল। জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িবার সন্দেহ অনর্থক বারকয়েক মাথা চাড়া দিলেও জমিদার কন্যার প্রাণের দাবীতে এ আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবিয়া নিরস্ত হইল। পরন্ত নানা পত্র-পুষ্পশোভিত গাড়ীখানিতে পা তুলিবার মুখে বিস্ময় ও সঙ্কোচ কিছুতেই আর বাগ মানিল না। থতমত খাইয়া হতবুদ্ধির মত সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

লোকটী কিন্তু হাতের ব্যাগ ভিতরে তুলিয়া দিয়া বেশ প্রফুল্ল বিজ্ঞতাভরা হাসির সঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আসুন, আসুন, গাড়ীতে উঠুন ; দেরী হ'ল যে !"

চঞ্চল দৃষ্টি ফিরাইয়া নিখিলেশ বলিল, "এ গাড়ী ?"

"আজ্ঞে, চলুন গাড়ীতে উঠুন।"

"আমি কিন্তু যাব হাতীশুঁড়োর জমিদারের মেয়ের···"

"আমরা সেই বাড়ীরই লোক, উঠে পড়ুন।"

কথাটা কোনপ্রকারে শেষ করিয়া লোকটী 'ধাঁ' করিয়া মোটরে তাহাকে তুলিয়া বসাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পরে হাসিমুখে ফিরিয়া বলিল, "মাপ করবেন নিখিলেশবাবু, শুভ-মুহূর্ত্তের একচুলও নষ্ট হ'তে দেওয়া আমার স্বভাবের বাইরে।"

হঠাৎ শঙ্খ-মুখরিত কোলাহলে তাহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইল। ঘুমভাঙ্গা শিশুটীরই মত বিহ্বল-ভাবে চারিদিকে তাকাইয়া ঘটনার মূল তত্ত্বটা আবিষ্কার করিয়া লইবার পূর্ব্বেই তিন-চারজন ধরিয়া তাহাকে এক উৎসব প্রাঙ্গনের মাঝে আনিয়া বসাইয়া দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন গললগ্নীকৃতবাসে বৃদ্ধ মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, "সময় যায়, এদিকে কিন্তু বাবাজীর তরফের অনুমতি দেবার মত কেউই এসে পৌঁছয় নি, কি করা যায় ?"

দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া একজন মুখপাত্র স্বরূপ আরম্ভ করিলেন, "আরে, ভাবছ কেন ? অনুমতি, তা' আমরা দিলেই চলবে, কি বল হে নবদ্বীপ ভায়া, বাবাজীকে বাড়ীর ভেতর নেওয়া যাক্ ?"

প্রস্তাবকারক যাহারা, সমর্থক যখন তাহারাই, তখন না বলিবার লোকের অভাব হইল না—শুষ্ক কণ্ঠটা কোন প্রকারেই ফুটাইয়া তুলিতে না পারিয়া নিখিলেশ ভাবিতে লাগিল,—এটা মানুষের দেশ না স্বপ্নের পরিহাস !

যখন সত্য-সত্যই সকলে তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন সবার নিকট হাতযোড় করিয়া বেচারী বলিল, "ভুল করছেন, আমার প্রোফেসন···"

একটা উচ্চ হাস্য-তরঙ্গে তাহার সে আবেদন ডুবিয়া গেল। একজন কেশবিরল বৃদ্ধ দুই হাতে পক্ব শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তোমার প্রোফেসানির হিসেব নাতনীর দরবারে পেশ কর গে ভায়া, রোগ সেইখানে !···"

আবার হাসির রোলে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। নিরুপায় নিখিলেশ ভবিতব্যকে ভাগ্য-নিয়ন্তার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িল।

চার

প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ হইতে স্ত্রী-আচারের সময় পর্য্যন্ত যতবার সে নিজের পরিচয় দিতে গিয়াছে, ততবারই বাধা পাইয়াছে। নামমাত্রে সন্তুষ্ট

সকলে হো হো শব্দে হাসিয়া তাহার ক্ষুদ্র কণ্ঠের প্রতিবাদ অঙ্কুরেই নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছে।

রোষে ক্ষোভে সে তখন আপনাকে পাষাণেরই মত নির্ম্মম করিয়া তুলিল, ভাবিল, ভাল, এ অপমানের ফলে অপমানই উপযুক্ত প্রতিশোধ।

শেষে বেনারসী সাড়ীপরা মেয়েটীকে মাল্য-দানে উদ্যত দেখিয়া সে কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিল না। উচ্চ চীৎকারে বলিয়া উঠিল, "কত বড় ভুল করছেন আপনারা, তা' যদি একবার ভাবতেন!"

উত্তরে কিন্তু হুড়াহুড়ির মধ্যে মাল্যদানও শুভদৃষ্টির ক্রিয়াটুকু শেষ হইয়া গেল—পুরোহিত যজ্ঞেশ্বরকে সাক্ষ্য রাখিয়া বিবাহের শেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চলিলেন—অনিচ্ছায় নিখিলেশ মন্ত্র উচ্চারণে বাধ্য হইল। পঠিতের মধ্যে হয় ত কিছু অপঠিত রহিল; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করে কে? যাক্ সকলে হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। নীলিমা এ জীবনের মত নিখিলেশের সঙ্গিনী। অস্থির কণ্ঠে বেচারী বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, এমনি ক'রে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই কি আপনাদের দেশাচার?"

কন্যাকর্ত্তা এবার স্বয়ং উত্তর দিলেন, "কেন বাবা, আচার সব দেশেই ত সমান। এত ক'রে আইন ঘেঁটে ব্যারিষ্টার হ'লে, হিন্দু-ল···"

ঠিক্ সেই সময় বহির্দ্বারের পার্শ্ব হইতে কে একজন বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি রকম লোক বল ত বেয়াই, আমার ছেলে চুরী।"

প্রশান্ত হাস্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মেয়ের বাপ বলিলেন, "আসুন, আসুন, বেয়াই-মশায় আসুন। হ্যাঁ, কাজটা অসাক্ষাতেই সারা হ'য়ে গিয়েছে, কিছু মনে করবেন না।"

"এ্যাঁ! বলেন কি, মনে করব না, লুট্, লুট্, একেবারে ডাকাতি! তবু চুপ ক'রে থাকব?"

কন্যাকর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বেয়ান বল্‌ছেন, পরের কাজটা আগেই হ'য়ে গিয়েছে, তাতে—"

বরকর্ত্তা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কে বেয়ান? তা' তিনি বল্‌তে পারেন। হাজার হোক অভ্যাসের দোষ যাবে কোথা? এই যে সবই হ'য়ে গেছে দেখ ছি। একি! একি! এ ত আমার ছেলে নয়!—"

"নয়? তবে কে এ?"

"জানি না, জানতে চাই না, তবে জোচ্চুরীটা যে পাকাপাকি—"

কন্যাকর্ত্তার চক্ষু এবার জ্বলিয়া উঠিল; বলিলেন, "মুখ সামলে কথা কইবেন মশায়। জোচ্চোর আমি, না আপনি। ছেলে রইল বিদেশে, দেখ্‌তে দিলেন না। নিজে কথা কয়ে 'তার' দিলেন। তাও ছেলের সঙ্গে কেউ এলেন না। বলুন ত দশে-ধর্ম্মে আইনে জোচ্চোর এখন কে?"

দু'-চার জনে নিখিলেশকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভাবটা, যত অনর্থের মূলই যেন সে! ঘুসিশুদ্ধ হাতটা তাহার নাকের কাছে ঘুরাইয়া একজন বলিল, "বল বেটা, তুই কে?"

ব্যঙ্গের হাসিতে নিখিলেশের মুখ-চোখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "শাসনের কথাটা এতক্ষণে আপনাদের স্মরণ হ'য়েছে। আমি না বারবার বোঝাতে চেয়েছি। এখন মিছে কেন এ হুম্‌কি?"

পাঁচ

ঠিক্ সেই সময় একটী গৌরবর্ণ ছিপ্‌ছিপে যুবকের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সাত আনির জমিদার প্রভাতবাবু রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রঙ্গ, রঙ্গ, এই নে তোর জামাই। ডাক্তার ভেবে আমার লোক একে নিয়ে অনেক টানা-হেঁচড়া ক'রেছে।"

রঙ্গলাল বিমর্ষভাবে বলিলেন, "সমান ভুল এখানেও দাদা। হয় ত এতে লোকসান তোমার কিছু হ'য়েছে, আমার কিন্তু সর্ব্বনাশ!"

প্রভাতবাবু নিখিলেশের দিকে চাহিয়া গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম ?"

—"নিখিলেশ মিত্র।"

—"কি,কি,আমার ছেলের নাম পর্য্যন্ত চুরী !"

প্রভাতবাবু উচ্চহাসি হাসিয়া বলিলেন, "একটু তফাৎ আছে বেয়াই, আপনি ঘোষ, ও মিত্তির।"

"আরে রাখুন মশায় আপনার মিত্তির। চিত্তির চটিয়ে ছেড়েছে। রাত পোহালে আমার ছেলেটা যে দোপড়া হয় তার উপায় ?"

"সে উপায় আমাকেই ক'রতে হবে দেখ্‌ছি। আরে বাবা জামাই ডাক্তার, এবার শালির ডাক্তারীটা করবে চলো। ভালয় ভালয় যদি তাকে দাঁড় করাতে পার, এ ভদ্রলোকের ছেলের একটা উপায় হয়। ভোর রাতে একটা লগ্ন আছে না পুরুত-মশায় ?"

সানন্দে পুরোহিত তাহার দন্তশূন্য মেড়ে বাহির করিয়া কহিলেন, "আঃ, বড়বাবু যখন রয়েছেন, তখন আর উপায়ের ভাবনা! হা হা হা! আছেই ত, আছেই ত!"

সকলে আসিয়া ছোট তরফের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সুষমার হাতখানি ধরিয়া একটু নাড়া-চাড়া করিয়াই নিখিলেশ বুঝিল—আঘাত সামান্য। হাড়ে মোচড় লাগিয়েছে, ভাঙে নাই। পল্লীর বিচক্ষণ ডাক্তার তিলকে তালে পরিণত করিয়াছেন। সঙ্গে আনীত হাত ব্যাগটী চাহিয়া লইয়া সে যখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে ব্যস্ত, ঠিক্ সেই সময় নবাগত পুরোহিতের সহিত কন্যাপক্ষের বৃদ্ধ পুরোহিতের একপ্রকার মল্লযুদ্ধের সম্ভাবনা বাঁধিয়া গেল।

বরপক্ষীয় পুরোহিত গর্জ্জিতে ছিলেন, "হাত ভাঙা মেয়ের বিয়ে হবে কোন বিধানে ?"

কন্যাপক্ষের পুরোহিত শিখা দোলাইয়া ব্যবস্থা দিতেছিলেন, "রক্তপাত যখন হয় নি, তখন ও ভাঙা ভাঙাই নয়! বিয়ে ত বিয়ে, তার বড় যদি কিছু থাকে, তাতেও আটক খাবে না।"

এবার বড় তরফের রঙ্গলালবাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দক্ষিণা দ্বিগুণ পণ্ডিত মশায়।"

পণ্ডিত আপনার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইয়া বিকশিত-মুখে বলিলেন, "আপনারা দানে কর্ণ উপস্থিত থাকতে বিয়ে আটকাতে পারে না বাবু, তবে কি না, এ কেবল ভায়ার শাস্ত্রজ্ঞানটা ঝালিয়ে দেখা হচ্ছিল।"

অন্যদিকে বরকর্ত্তা কিন্তু চটিয়া খুন! হাত ভাঙা মেয়ে দিয়ে চালাকি! চাই না এমন বৌ, চল নিখিলেশ।"

বরটী কিন্তু নেহাত আধুনিক তন্ত্রের। ডাক্তার সাজিয়া শুভদৃষ্টিটা পূর্ব্বেই সারিয়াছেন, কাজেই বাপের কথার উত্তরে বলিলেন, "তা' হয় না বাবা, এখানকার লোকে তোমাকে যে অভদ্র বলে গাল দেবে, তা' আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। কাজেই এ বিয়ে করতেই হবে।"

বাপ সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, কি আমার পিতৃভক্ত বেটারে! নে, চল।"

শেষে কিন্তু হাজার টাকা ভাঙা হাতের দরুণ অতিরিক্ত পাইয়া তিনিও নিরস্ত হইলেন। নির্ব্বিবাদে প্রজাপতির শুভ-বন্ধন এস্থানেও তার কার্য্য করিল।

*　*　*

প্রথম ডাক্তারীর পুরস্কার বধূ লইয়া নিখিলেশ যখন বাড়ী ফিরিল, বৃদ্ধ ঠাকুরদা' তখন বহির্বাটীতে বসিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন, গলা খাঁকারি দিয়া তিনি বলিলেন, "কি হে ভায়া, বানের জোর বড়, না বাঁধ বড় ?"

নিখিলেশ হাসিয়া বলিল, "প্রথমটা দেবতার হাতে গড়া ঠাকুরদা', অন্যটা মানুষের; কাজেই জোরের তারতম্য একটু হয় বই কি ?"

হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "যা' হোক্, ফাঁকি দিয়ে হাতের জলটুকু শুদ্ধি ক'রে এসেছিস্, এইটুকুই যা' লাভ!"

— গানের খাতা—

শ্রীহেমন্তকুমার বসু, বি-এ

এক

প্রতুল ছেলেটী স্থানীয় উকিল অমর দত্তের বাসায় থাকিত।

প্রতুলের বাপ-মা নাই। তাহার মা যখন মারা যান, সে তখন নিতান্ত শিশু। তাহার বাবা প্রায় বছর সাতেক হয় গত হইয়াছেন। তিনি অমরবাবুর মুহুরী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রতুলের যখন কোথাও দাঁড়াইবার স্থান রহিল না, তখন অমরবাবু তাহাকে নিজের বাসায় রাখিয়া দিলেন। সেই হইতে প্রতুল সেখানে থাকে।

অমরবাবুর দুই কন্যা রেবা ও সেবা। সেবা শিশু, রেবা তেরোয় পা দিয়াছে। আর তাঁহার পুত্র-সন্তান না থাকায়, বলিতে গেলে প্রতুলই তাঁহার গৃহে পুত্রের স্থান লইয়া অবস্থান করিতেছে। প্রতুল শান্ত, বিনয়ী, সচ্চরিত্র। তাহার নম্র ব্যবহারে ও মিষ্ট আচরণে এ বাটীর কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের এই পরলোকগত মুহুরীর ছেলেটীকে পুত্রস্নেহেই পালন করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদেরই আশ্রয়ে ও অভিভাবকতায় প্রতুল ফোর্থ ক্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আই-এ দিয়াছে এবং বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছে।

অমরবাবুর বৃহৎ সৌধের নিম্নতলস্থ একটী কক্ষে প্রতুলের থাকিবার স্থান। এই কক্ষটী তাহার নিজের হাতের যত্নে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। তাহার কক্ষের ভিত্তিগাত্র মহাত্মা ও মনীষিগণের চিত্রে সজ্জিত। একদিকে গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, তিলক, আশুতোষ প্রভৃতি দেশনেতা, অপরদিকে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মগুরু। এই চিত্রাবলীর শীর্ষদেশে, উভয় রেখার মধ্যস্থলে একখানি সুবৃহৎ 'ওঁ' চিত্র। অসীম সমুদ্র, আবর্ত্ত গর্জ্জিতেছে, নীল ঢেউয়ের বুকে ঋষিকণ্ঠের এই প্রণবমন্ত্র মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। এই চিত্র-সজ্জার কিছুদূরে প্রতুলের স্বহস্তে অঙ্কিত ভারত-বর্ষের একখানি বৃহৎ মানচিত্র, এবং তাহার পার্শ্বে প্রতুলের স্বহস্তে মুক্তাক্ষরে লিখিত :—

> "প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
> প্রথম সামরব তব তপোবনে,
> প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
> জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী!
> অয়ি ভুবন মনোমোহিনী!"

এই সজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন কক্ষে গভীর, সৌম্য-দর্শন ও মৃদুভাষী প্রতুল অধ্যয়নের সাধনা করে।

বি-এ শ্রেণীর প্রথম বৎসর বলিয়া পড়িবার তেমন তাগিদ ছিল না। প্রতুল একখানি দৈনিক হস্তে বসিয়াছিল। এমন সময় অমরবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"তোমায় একটী সুখবর দিতে এলাম হে প্রতুল। তুমি দেখ্‌ছি একজন সঙ্গী পেয়ে গেলে।"

প্রতুল তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার নম্রদৃষ্টি অমরবাবুর মুখের প্রতি স্থাপন করিল। অমরবাবু যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার বাল্যবন্ধু এক জমিদারের পুত্র তাঁহার বাসায় থাকিয়া স্থানীয় কলেজে অধ্যয়ন করিবে। প্রতুল শুনিয়া যথার্থই উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং তাহার সেই ভাবী সঙ্গীকে যত

শীঘ্র হউক আসিবার জন্য অমরবাবুকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিল।

ইহারই সপ্তাহকাল পরে অমরবাবুর উক্ত বাল্যবন্ধুর পুত্র আসিয়া যথারীতি কলেজে বি-এস্ সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া গেল। ছেলেটীর নাম অশেষ। প্রতুলের প্রায় সমবয়সী। দেখিতে সে কালো, কিন্তু সেই স্নিগ্ধ কালো রং এমনি একটী শ্রী ও লাবণ্যে মণ্ডিত যে, তাহাকে সুন্দর বলিতে ইচ্ছা হয়। প্রতুল স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত; কিন্তু এরূপ কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ এই নবাগত যুবকটীর ছিল না। ফলে অতি সহজেই সে সকলের সহিত মিশিয়া গেল। দুইদিন যাইতে-না যাইতেই গৃহিণীকে 'জ্যেঠাইমা' ডাকিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল; কচি মেয়েটীকে বারবার কোলে লইয়া ও তাহার রাঙা গালে চুমা খাইয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আর তাহার হাসি, কৌতুক ও চঞ্চল নয়নের সঘন দৃষ্টিপাত আর একটী তেরো বৎসরের বালিকার হার-দোলানো বুকে কি সুর বাজাইয়া তুলিল কে জানে!

অশেষের সঙ্গ পাইয়া স্বভাবগম্ভীর প্রতুলও বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহার সেই আনন্দের যেন একটা সীমাই রহিল না যেদিন সে দেখিল তাহার এই সঙ্গীটী এস্রাজ বাজাইয়া যে গান গায়, তাহা যেমনই অপূর্ব্ব, তেমনই উপভোগ্য। অষ্টপ্রহর অশেষের গান শুনিয়াই তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

দুই

প্রায় দুই বৎসর পরের কথা। প্রতুল বি-এ ও অশেষ বি-এস্-সির টেষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অশেষ কখনও বেশী পড়িত না, এবং পড়িতে বসিলে আধঘণ্টা পড়িয়া আর আধঘণ্টা সে গুণগুণ করিয়াই কাটাইয়া দিত। তাই পরীক্ষা নিকটতর হইলে সে কিছু বেশী রকমই খাটিতে লাগিল। অশেষের সঙ্গ পাইয়া প্রতুলেরও এবৎসর তেমন পড়াশুনা হয় নাই। তথাপি প্রতুলকে কিন্তু তেমন খাটিতে দেখা গেল না।

বরং একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত অশেষের এই অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন সাধনার সময়টীতে প্রতুল যেন পড়িবার অভ্যাসটাই একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিতেছে। জানালার বাহিরে মাথা রাখিয়া দিনরাত সে যেন কি চিন্তা করিতে লাগিল। অন্ধকার রাত্রিতে তাহার উদাস অন্যমনা দৃষ্টি সম্মুখের সেই ঊর্দ্ধেই মিশিয়া যায়, যেখানে আকাশের অন্ধকারে সংখ্যাতীত নক্ষত্রের জলভরা চোখ জল্‌জল করিয়া জ্বলিতে থাকে। জ্যোৎস্না রাত্রে আকাশ ও ধরণীর কূলে কূলে জ্যোৎস্নার প্লাবন নামিলে প্রতুলের হৃদয় কোন অধীর বেদনায় ভাঙিয়া পড়িতে চায়।

তাহার এই ঔদাসীন্য হয় ত অনেকদিন পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এত পরিস্ফুট ছিল না। বর্ত্তমানে এইভাব এতটা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল যে, গোপন করিয়া রাখা একরূপ দুরূহ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু প্রতুলের এ ভাব এ পর্যন্ত অশেষের চোখে ধরা পড়ে নাই। তাহার কারণ অশেষ অনেকটা নিজের ভাবে ও গানেই মগ্ন থাকিত। পরীক্ষার তাগিদে পড়া ছাড়িয়া ইদানীং সে প্রতুলের ঘরে বড় একটা আসিবারও অবসর পাইত না।

দিনের পর দিন যাইতেছিল। সন্ধ্যার আকাশে একে একে নক্ষত্র বিকাশের ন্যায় পঞ্চদশবর্ষীয়া রেবার হৃদয়ে যৌবনের ফুলগুলি ধীরে ধীরে পরাগ মেলিতেছিল। যৌবনের দুরন্ত দেবতা সহসা কোন্ শুভক্ষণে বৈশাখী সন্ধ্যার মেঘমালার রংয়ে তাহার আঁচল ছোপাইয়া এই মাটীর মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গে তাহার ছাপ আঁকিয়া দিল। সেই বর্ণে সেই শোভাসম্ভারে তাহার সমস্ত দেহ সহসা বিচিত্র ও নবীন হইয়া উঠিল।

পরীক্ষার আর দিন পনেরো মাত্র বাকী। সহসা সকল ভাবনা চিন্তা ও ঔদাসীন্য সবলে ঝড়িয়া ফেলিয়া প্রতুল সে সকালটা গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতে বসিয়াছিল এবং অবিশ্রান্ত অধ্যয়নের ফাঁকে কখন যে তাহার ঘড়িতে এগারোটা বাজিয়া গেল, তাহা সে জানিতেই পারিল না। "কি প্রতুল দা', আজ যে তোমার স্নানের বেলা উৎরে চল্‌ল, সে হুঁস্ বুঝি নেই?"

চকিত হইয়া প্রতুল মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, রেবা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। নির্ব্বাক হইয়া সে ক্ষণকাল তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তারপর ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া অপ্রতিভ স্বরে কহিল—"সত্যি তো,আজ্‌কে বড় দেরী হ'য়ে গেল। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি। অশেষ কি কচ্ছে?"

—"অশেষ দা' তেল মেখে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যে পড়ার ধূম, না ডাক্‌লে বুঝি না নেয়ে না খেয়েই আজ থাক্‌তে?"

রেবা চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যায় প্রতুল নির্ব্বাক হইয়া তাহার গতিভঙ্গী দেখিল, এবং সে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

* * *

কোন্ শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে অন্তরের কোণে একটা যে বাসনার রেখা পড়িয়াছিল, প্রতুল তাহা নিজে জানিত কি না জানিত তাহা বলা শক্ত। কিন্তু একসময় হঠাৎ তাহার আভাস পাইয়া সে যেমনই চকিত তেমনিই চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই অন্তর কামনা সুস্পষ্ট হইয়াই তাহার কাছে ধরা পড়িয়া গেল সেইদিন, যেদিন সে নানাভাবে প্রথম বুঝিতে পারিল রেবা অশেষেরই বেশী পক্ষপাতী। তাহার সঙ্গেই তাহার যেন বেশী রকমের ঘনিষ্ঠতা। তাহার মনের গোপন তন্ত্রীতে কে যেন আঘাত করিয়া চকিতে তাহার প্রচ্ছন্ন বাসনা স্পষ্টরূপে জাগাইয়া তুলিল এবং তাহা দিনে দিনে দুর্দ্দম হইয়া উঠিতে লাগিল।

মিথ্যা! কি করিয়া সে এ আসক্তিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবে? সে যে সচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছে অশেষের সঙ্গ পাইলে রেবা আত্মহারা হইয়া যায়। অশেষ অনুপস্থিত থাকিলে যেমন বিমর্ষ, উপস্থিত থাকিলে তেমনিই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সে দেখিয়াছে কলেজে যাইবার সময় রেবা দ্বারে দাঁড়াইয়া অশেষের দিকে কেমন সাগ্রহে চাহিয়া থাকে, ফিরিয়া আসিলে কেমন প্রীতি-প্রফুল্ল-কণ্ঠে তাহার আগমন বার্ত্তা বাটীর সকলকে জানাইয়া দেয়। কিন্তু এ সকলকেও যদি মনের অনুমান বলিয়া ধরা যায়, তবে সেই যে এক দ্বিপ্রহরে অসময়ে কলেজ হইতে একাকী ফিরিয়া সে অশেষের ঘরে রেবাকে তাহার ফটোর পানে তন্ময় হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, এ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনাকে সে মিথ্যা বলিয়া কি করিয়া মানিয়া লইবে?

বস্তুতঃ, প্রতুলের কোন দিকেই সান্ত্বনা ছিল না। অশেষ যদি দুশ্চরিত্র হইত এবং ছলে কৌশলে রেবাকে ভুলা'ত, তাহাতেও না হয় কতকটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু এতো তাহা নয়। বরং সে লক্ষ্য করিয়াছে অশেষ নিজে যেন রেবার প্রতি নিতান্তই উদাসীন, এই ভাববিলাসী নিজের ভাবে মগ্ন থাকিয়া কাহারও বা কিছুর দিকেই তেমন একটা খেয়াল রাখে না। কিন্তু রেবা? রেবা নিজ হইতেই তাহার জন্য আত্মহারা।

আর কি বিচিত্র এই অশেষ! কালো ও কোঁকড়ানো চুলে যে এত মাধুরী, নয়নের দৃষ্টিতে যে এত যাদু থাকিতে পারে, ইহাকে না দেখিলে তাহার বিশ্বাসই হইত না। তারপর তাহার গান ও সুর? এও না জানি ভগবানের কি অপূর্ব্ব দান! যে তাহার এস্রাজে সুর বাঁধিয়া

গান গাহিতে শুনিয়াছে, সে কি তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে! ঐ কালো চোখের দু'টী মদির দৃষ্টি এবং এই গান ও সুরই ত রেবাকে এমন বিহ্বল করিয়াছে! করুক, কিন্তু এই রেবা? এক সময় যে তাহাকে ছাড়া কাহাকেও জানিত না। প্রতুল দা' বলিতে যেন আত্মহারা হইয়া উঠিত। আজ তাহার হৃদয়ে প্রতুলের জন্য এতটুকু পর্য্যন্ত স্থান খালি পড়িয়া নাই।

এই ব্যথাবিধুর চিন্তার মধ্যেও প্রতুল একটা কথা ভাবিয়া সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রেবা আজ কতদিন পরে তাহার ঘরে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া গেল। এই কথাটী যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই যেন তাহার এ আহত চিত্তে অমৃতসিঞ্চন করিতে লাগিল!

হঠাৎ এক সময় তাহার মনে হইল—না, এমন করিয়া দহিয়া সে আর মরিতে পারিবে না। রেবাকে তাহার অন্তর খুলিয়া দেখাইয়া তাহাকে তাহার এই ভুল পথ হইতে ফিরাইতে হইবে। দীর্ঘ নয়-দশ বৎসর ধরিয়া এই রেবার সহিত তাহার পরিচয়। যেরূপেই হউক এই পরিচয়কে চিরকালের মত অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যে মাত্র দু'দিনের আগন্তুক তাহাদের মধ্যে তাহার স্থান নাই।

তিন

টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়া মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে; শেষ পরীক্ষার আর অধিক বিলম্ব নাই।

অপরাহ্নে প্রতুল ও অশেষ নিজ নিজ কক্ষে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত। বর্ষাকাল না হইলেও হঠাৎ মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিল। প্রতুল বই বন্ধ করিয়া বাহিরে চাহিয়া উতল আকাশের এই মাতন-লীলা উপভোগ করিতে লাগিল।

হঠাৎ বারি পতনের ঘনধ্বনি ভেদ করিয়া প্রতুল পাশের ঘরে অশেষের কণ্ঠ শুনিতে পাইল। এস্রাজে সুর মিলাইয়া অশেষ গান ধরিয়াছে—

"শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে'
তোমার ঐ গানটী আমার মুখের পরে'
চোখের পরে'।"

প্রতুল শুনিতে শুনিতে বিছানার উপর সটান শুইয়া পড়িল। গান চলিতে লাগিল এবং প্রতুল নিজের শয্যায় নিস্পন্দ আলস্যে পড়িয়া সেই গুঞ্জন শুনিতে লাগিল। একে একে অনেকগুলি গান অশেষ গাহিল। কি মধুর না তার কণ্ঠ! সহসা প্রতুল আনন্দে ও আবেগের আতিশয্যে অশেষকে তাহার প্রাণের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া অশেষের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে অশেষ আর একটী গান সুরু করিয়াছে। প্রতুল শুনিতে শুনিতে মৃদু পদক্ষেপে চলিতে লাগিল। কিন্তু দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াই সে থমকিয়া সরিয়া আসিল এবং আড়াল হইতে অশেষ ও রেবাকে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল।

অশেষ শয্যার উপর একখানি ছিন্ন গানের খাতা মেলিয়া এস্রাজের বুকে সুরের তুফান তুলিয়া গাহিয়া যাইতেছিল এবং তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া রেবা নীরবে তাহার গান শুনিতেছিল। অশেষ মগ্ন হইয়া গাহিতেছিল; প্রতুলের মনে হইল হয়ত বা পিছনের রেবাকে সে এপর্য্যন্ত দেখিতেও পায় নাই।

বস্তুতঃ তাহাই। গান থামিলে অশেষ পিছন ফিরিয়া রেবাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কখন এলে রেবা?"

রেবা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, বলিল—"অনেকক্ষণ।"

অশেষ আর কোন কথা না বলিয়া খোলা খাতার পাতা উল্টাইয়া সুর তুলিল—"স্বপন ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে"

অশেষের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রেবা ডাকিল —"অশেষ দা'।"

অশেষ মুখ তুলিয়া চাহিলে, রেবা তাহার সুন্দর মুখ মিনতিতে ভরিয়া বলিল—"আমাকে এই গানের খাতাটা দেবে?"

অশেষ শুনিয়া বলিল "যা পাগ্‌লী, ও ছেঁড়া গানের খাতা নিয়ে কি করবি? ও আমি কাউকে দিই নে, এ আমার এক প্রিয়তম বন্ধুর দান।" বলিয়াই সে আবার এস্রাজে ঝঙ্কার তুলিল।

রেবার রাঙা মুখ অভিমানে অধিকতর রাঙা হইয়া উঠিলেও সে সরিয়া গেল না। যেমনি দাঁড়াইয়াছিল, তেমনিই রহিয়াই কখনো অশেষের মুখ কখনো বা তাহার খাতার দিকে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল।

প্রতুল আর দাঁড়াইতে পারিল না। কি একটা তীব্র ব্যথার গুরুভারে পীড়িত হইয়া, সে শয্যায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিবার পর এক সময় সে আপন-মনে বলিয়া উঠিল—আঃ কি সুন্দর! কিন্তু কি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন!

রাত্রে প্রতুল মনে মনে একটা কল্পনা আঁটিল। তাহার নিজের একখানি চমৎকার বাঁধানো গানের খাতা ছিল। খাতার গানগুলি তাহার নিজের হাতের মুক্তার মত অক্ষরে থরে থরে সাজাইয়া লেখা। নিশীথ প্রদীপের আলোকে প্রতুল খাতাখানি তুলিয়া ধরিয়া নিজেই তাহার চাকচিক্যে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গেল; এবং সে যে সঙ্কল্প আঁটিয়াছিল, তাহা তাহার মনের মধ্যে দৃঢ় হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরদিন সমস্ত দিনে একটীবারও ত সে রেবার দেখা পাইল না। সকাল হইতে রাত্রি অবধি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, রেবা ভুলিয়াও ত একবার তাহার ঘরে প্রবেশ করিল না।

পরদিন সকালবেলায় রেবাকে সম্মুখে পাইয়া প্রতুল মহানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কথা বলিতে গিয়া মুখে তাহার কথা ফুটিল না দেখিয়া সে নিজেই অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। কতবার সে চেষ্টা করিল, কিন্তু রেবার নাম ধরিয়া সে ডাকিতেই পারিল না। হায় রে, আজ কতবৎসর যাহাকে কতভাবে কত আদরের নামে ডাকিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকে ডাকিতে গিয়া সে ব্যর্থপ্রয়াসে বারবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাহাকে আহ্বান দূরের কথা, তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই পারিল না।

দিন দুই পর সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রতুল নিজের ঘরে শয্যার উপর চুপ করিয়া পড়িয়াছিল; এবং যাহার কথা ভাবিতেছিল, তাহাকে সহসা সম্মুখে পাইয়া সে নিজেকে দৃঢ় করিল। ডাকিতে গিয়া ভিতর হইতে দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিয়াও সে ডাকিল—"রেবা?"

কি একটা কাজে আসিয়া রেবা ঘর হইতে চলিয়া যাইতেই প্রতুলের ডাক তাহার কাণে গেল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে প্রতুলের মুখের দিকে চাহিল।

প্রতুল কহিল—"একটা কথা আছে, কাছে এস।"

রেবা কাছে আসিল, প্রতুল কহিল—"তুমি যে গানের খাতা চেয়েছিলে সেদিন - এই নাও!" বলিয়া তাহার গানের খাতাখানি রেবার হাতে তুলিয়া দিল।

খাতার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া রেবা বিস্ময়ের সুরে বলিল—"গানের খাতা! কবে তোমার কাছে গানের খাতা চেয়েছি আমি?"

প্রতুল কহিল—"আমার কাছে চাও নি। অশেষের কাছে চেয়েছিলে, আমি দিলুম।"

রেবা কহিল—"তার মানে?"

প্রতুল একেবারে বলিয়া ফেলিল—তার মানে আমি অশেষের চেয়ে তোমায় বেশী ভালবাসি।"

প্রতুলের কথায় রেবা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল। তারপর সহসা বলিয়া উঠিল—"তা'ত বাস্‌বেই, না হ'লে কাব্য হবে না যে! কিন্তু ছি,ছি, তুমি কী হীন প্রতুল দা', এত বড় নেমক-হারামী যে তোমার মধ্যে লুকনো রয়েছে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।" বলিয়া খাতাখানি টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রতুল শয্যার উপর কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

* * *

শৈশবে যাহাকে সে কোলে-কাঁখে করিয়া ফিরিয়াছে, কৈশোরে যাহার সহিত কত হাসি কৌতুক ও ক্রীড়া করিয়াছে, সেদিন পর্য্যন্ত যে প্রতুল দা' বলিতে অস্থির হইয়াছে, সেই রেবা কি করিয়া যে তাহাকে এমন করিয়া উপেক্ষা করিয়া গেল, গভীর বিস্ময়ে মর্ম্মান্তিক ব্যথায় এই কথাটাই রহিয়া রহিয়া প্রতুলের মনে আনাগোনা করিতে লাগিল। কিন্তু গভীর রাত্রে তাহার চিত্তে আর এক চিন্তার উদয় হইল। ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল,—সে নিজেই বা কেন এত কথা বলিতে গেল—কেন সে এতদূর অগ্রসর হইল? যতই সে এ কথা ভাবিতে লাগিল, ততই একটা লজ্জা ও আশঙ্কায় তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। বস্তুতঃই রেবার পিতৃ-অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার কন্যার প্রতি এ আসক্তি-প্রকাশ তাহার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তাহার এ কথায় রেবা যেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সমস্ত ঘটনাই সে বাপ-মাকে না বলিয়া ছাড়িবে না এবং যখন তাঁহারা ইহা শুনিবেন তখন কী ভয়ঙ্কর ছদ্ম অহি রূপেই না তাহাকে ভাবিয়া লইবেন! না, না, এই ভয়ঙ্কর কালসর্পের মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগকে দেখা দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব!

অতঃপর এই একমাত্র চিন্তায় প্রতুল ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল এবং অবিলম্বে গৃহত্যাগ যুক্তি-সঙ্গত মনে করিল।

তখনো খাতাখানি টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল। প্রতুল কি ভাবিয়া তাহা তুলিয়া লইল। খাতা হাতে সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর গানের খাতার পাতাগুলি এক একটী করিয়া টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। ছিন্ন-পত্র-গুলি স্তূপাকার হইয়া উঠিলে, সে কম্পিত হস্তে তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে তাহা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

পোড়াখাতার ছাই মুঠা ভরিয়া বাহিরে ফেলিয়া সে গভীর নিশীথে নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল। বি-এ পাশ করা তাহার জীবনের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা ছিল। যাত্রা-পথে সে কথাটা মনে পড়ায় আপন-মনে সে একবার হাসিয়া উঠিল।

চার

বছর তিনেক পরে।

উকিল অমর দত্তের বাসায় এক যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। অমরবাবু বাসায় ছিলেন না। গৃহিণী তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"এ কি! প্রতুল যে! কোথায় ছিলি বাবা এতদিন? সেই যে এক রাতে কোথায় উধাও হ'লি, আর খবরটীও দিতে নেই রে? আমরা ত ভয়ে মরি, কত খোঁজ তিনি করালেন, কেউ তোর পাত্তা পেলে না। কেন রে প্রতুল, কি করেছিলুম আমরা যে, না বলে' অমন ক'রে পালিয়ে গেলি?"

প্রতুল জিভ কাটিয়া বলিল—"সে কি, কি যে বল' তুমি মা, তোমরা আবার কি কর্‌বে! আমি হতভাগা, তাই বেরিয়ে গিয়েছিলুম!"

—"কেন বেরিয়ে গেলি?"

প্রতুল অবশ্য মিথ্যা কথাই বলিল। কহিল—"কি জানি মা, হঠাৎ মনে হ'ল, আর পড়ে'-

শুনে কি হবে? পড়ে’-পড়েই ত জীবনের অর্দ্ধেক চলে’ গেল। এবার একবার না হয় চাক্‌রীর চেষ্টা দেখা যাক্। যেই খেয়াল হওয়া, অমনি বেরিয়া পড়া। তা’ দেখ মা, বেরিয়ে আমার ভালই হ’য়েছে। তোমরা হয় ত শুনে খুসী হবে—আমি গোয়ালিয়রে একটা খুব ভাল চাকরী কচ্ছি, মাইনে চার শ’ টাকা। আজকাল-কার দিনে কি আর সহজে অমন চাক্‌রী মেলে?”

গৃহিণী বলিলেন—“তাই না কি বাবা, চার শ’ টাকা মাইনে! বেশ চাক্‌রী ত। তা’ তিনিও বলেছিলেন—প্রতুল যেমন বুদ্ধিমান্, ওর উন্নতি হবে। আমাদের আশ্রয় ছাড়্‌লেও সংসারে ও নিজের জোরে নিজের ঠাঁই ক’রে নিতে পারবে।’ তা’ দেখ্‌ছি,তাঁর ধারণা মিছে হয় নি।” বলিয়া থামিয়া কতকটা যেন আপন-মনে বলিয়া উঠিলেন—“তা’ আজ বেঁচে থাক্‌লে, সেও কি আর অমন একটা চাক্‌রী না করতে পারত, অবিশ্যি তার দরকার হ’ত না। অতবড় লোকের ছেলে, কি দরকার তার চাকরী করা। তবে যদি সখে পড়ে’ করতে যেত—” বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দু’টী সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

প্রতুল কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এ কি! তুমি কাঁদছ কেন মা! কার কথা বল্‌ছ? কে বেঁচে থাক্‌লে চাকরী করত?”

গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—“সে কি তুই জানিস্ নি বাবা? ও, তা’ জান্‌বি কি ক’রে? তুই যে আজ ক’বছর দেশ ছাড়া। তা’ দ্যাখ প্রতুল, অশেষের সঙ্গে রেবার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পর এক বছরও পেরুলো না—মা আমার!—”তিনি আর বলিতে পারিলেন না, আবেগে তাঁহার কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল।

এই অতি নির্ম্মম অপ্রত্যাশিত সংবাদ প্রতুলের বক্ষে যেন বজ্রাঘাত করিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না, এ কি শুনিতেছে সে! প্রস্তর মূর্ত্তিরই মত নিথর হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

গৃহিণীর ক্রন্দন থামিলে প্রতুল ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিল—“কতদিন হ’ল এ হয়েছে মা?”

গৃহিণী বলিলেন—“এই ত সেদিন। মাস তিনেকও পেরোয় নি।”

একটা অসহ্য ব্যথা প্রতুলের সমস্ত বক্ষে যেন দাগ দিয়া ফিরিতে লাগিল।

এই সময় সম্মুখের ঘর হইতে কে ডাকিল—“প্রতুল দা’, শুনে যাও।”

প্রতুল এ কণ্ঠ চিনিল, ধীরে ধীরে কক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

প্রতুল সম্মুখে আসিলে রেবা কহিল—“একটা কথা সত্যি ক’রে বল ত,—তুমি আমায় অভিশাপ দিয়েছিলে?”

প্রতুল বিস্ময়ের সুরে বলিল—“অভিশাপ! আমি দেব! তোমায়! কেন?”

রেবা বলিল—“তা’ না’ হ’লে এমনও কি হ’তে পারে? হাঁ প্রতুল দা’, সেই গানের খাতাখানা যা’ তুমি আমায় দিতে চেয়েছিলে—সে আছে? একবারটী দিতে পার আমায়? সেদিন সেধেছিলে নিই নি, আজ নিজে সাধ করে নিতে চাইছি—দেবে আমায়?”

প্রতুল বলিল—এ কি রেবা, তুমি এসব কি আবোলতাবোল বক্‌ছ। সে খাতা কি কর্‌বে তুমি?”

রেবা উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিল—“যা’ ফিরিয়ে দিয়েছিলুম, আজ তা’ গ্রহণ ক’রে দেখ্‌ব এ দুর্ভাগ্য আমার যায় কি না। আমি ত জানি প্রতুল দা’, তোমার খাতা নিই নি বলে সেই অভিশাপে আজ আমার এ দুর্গতি! খাতাটা আছে ত? দেবে ত আমায়?”

প্রতুল ব্যথা-কাতরকণ্ঠে বলিল—না, নেই। সে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।”

এ কথায় রেবা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে যেন সে সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। অধিকতর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"ও বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না! খাতা তুমি পুড়িয়ে ফেলেছিলে, আমিও বুঝেছিলুম, অম্‌নি একটা কিছু করে' থাক্‌বে—নইলে এমনও কি হয়! দ্যাখ প্রতুল দা', তোমার গানের খাতা নিজে পুড়েই শেষ হয় নি; তার আগুণে আমার জীবনের খাতা,—যার ভেতরে কত গান কত স্থর গাঁথা ছিল, তাকে পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে! সে আগুণ সর্ব্বক্ষণ আমায় ঘিরে আছে! নইলে জীবনভরা এত দাহ কেন হবে?" বলিয়া ক্ষণেক থামিয়া আবার বলিতে লাগিল—"কিন্তু প্রতুল দা', তোমার যা' পুড়েছে, সে ক'খানা কাগজ মাত্র। আর তার বদলে আমার যা' পুড়েছে, সে যে কি, এ তুমি বুঝ্‌তে পারবে না! কিন্তু এতবড় একটা প্রতিশোধ আমার উপর নিয়ে তোমার কি লাভ হ'ল প্রতুল দা'!"

রেবার প্রতি বাক্যে প্রতুলের হৃৎপিণ্ড কাঁপিতেছিল। রুদ্ধশ্বাসে সে তাহার কথা শুনিতে লাগিল। রেবার কথা শেষ হইলে একবার তাহার মনে হইল চীৎকার করিয়া বলে—"এ তুমি কী বলছ রেবা! তোমাকে অভিশাপ দিয়েছে, তোমার জীবনের সুখ সাধ পুড়িয়ে দিয়েছে, তোমার এই প্রতুল দা'! তোমাকে আমি ভাল-বেসেছিলুম, হয় ত বা এখনও বাসি, কিন্তু তোমার স্নেহে বঞ্চিত হয়ে তোমাকে অভিশাপ দিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌ব এতবড় হীন চিন্তা কেমন করে মনে স্থান দিলে? আমি খাতা পুড়িয়েছিলুম সত্য, কিন্তু তার মধ্যে নিজের অদৃষ্টটাকেই জড়িয়ে নিয়ে, তোমাদের নয়। যাকে ভালবাসা যায়, সে সর্ব্বতোভাবে সুখী হয় এই ত মানুষ চায়—আজ কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাব—তোমার এ বেশ দেখার চেয়ে আমি মরণটাকে বড় বলে' মনে করি!"

কিন্তু একটা কথাও সে বলিতে পারিল না। শুধু তাহার নয়ন-পল্লব অশ্রুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং সেই ব্যথিত মুখ ও সজল দৃষ্টির পানে চাহিয়া রেবা মৌন নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

—দীনেশের আবিষ্কার—

শ্রীপুলিনচন্দ্র নাগ

দীনেশ পাবনা জেলার এক জমিদারের ছেলে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। কলিকাতায় কোন আপনজন না থাকায় বাধ্য হইয়া সে হোষ্টেলে থাকিত।

দীনেশের যেরূপ পয়সা ছিল, সখও ছিল তাহার অনুপাতেই। বায়স্কোপ ত লাগিয়াই আছে, প্রতি শনিবারে তার থিয়েটারেও যাওয়া চাই-ই। তা'ছাড়া, বাঙ্গলা মাসিক মাত্রেরই সে নিয়মিত গ্রাহক। পত্রিকা পড়ার লোভে হোক, আর বড়লোক বলিয়াই হোক, হোষ্টেলে দীনেশের বন্ধুর অভাব ছিল না। বন্ধুমহলে তাহার নামডাকও যথেষ্ট ছিল। হোষ্টেলের কোন কাজকর্ম্ম উপস্থিত হইলে, দীনেশের মতামত ছাড়া কোন কাজ হইত না। বলা বাহুল্য, এই খাতিরের প্রতিদান সকলেই তার নিকট কিছু কিছু পাইত।

সেদিন ছিল শনিবার। বিকালবেলা কয়েকটী ছেলে হুড়োহুড়ি করিতে করিতে একটী ছেলেকে তার ঘরে টানিয়া আনিল।

দীনেশ বলিল—"ব্যাপার কি ?"

লাঞ্ছিত যতীন বলিল—"দেখ দেখি দীনেশ দা', শুধু শুধু এরা আমায় টানাটানি করছে।"

ধমক দিয়া অমিয় বলিল—"শুধু শুধু! আচ্ছা দীনেশ দা', তুমিই ওকে জিজ্ঞেস কর। এই বাবু সেজে প্রতি শনিবার রবিবার ও কোথায় যায়।"

দীনেশ একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—"সত্যি না কি রে, কোথায় যাচ্ছিস বল্ না ?"

যতীন কিছু বলিল না। নিরুপায় দৃষ্টিতে দীনেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় বিকাশ একখানা খোলা চিঠি হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল, চিঠি-খানা দীনেশের হাতে দিয়া বলিল—"পড় ত দীনেশ।"

দীনেশ জোরে পড়িতে লাগিল—

প্রাণের যতি!

আজ লেকে না গিয়ে আউটরাম ঘাটে যেও। অনেকদিন সেখানে যাওয়া হয় নি। একটু সকাল সকাল যেও। কাল থিয়েটারে যাব মনে থাকে যেন। আমি ভাল আছি। আমার ভালবাসা নিও। ইতি,

তোমার—

অরু।"

সকল ছেলেরা হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। যতীন লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল।

দীনেশ বিকাশকে বলিল—"এ চিঠিটা কোথায় পেলে বিকাশ দা' ?"

বিকাশ বলিল—"একটা দরোয়ান এসে জিজ্ঞেস করলে—'যতীনবাবু কে ?' সন্দেহ অনেক দিনই ছিল কি না, বল্লাম—'আমিই যতীনবাবু।' দরোয়ান সেলাম জানিয়ে এখানা আমার হাতে দিয়ে চলে গেল।" সকলে আবার হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিকাশ জিজ্ঞাসা করিল—"বল্ অরু, এ কার মেয়ে ?"

যতীন দেখিল আজ আর তাহার নিস্তার নাই। তাই আম্‌তাআম্‌তা করিয়া বলিল—"ভবানী-পুরের এক উকীলের মেয়ে।"

দীনেশ বলিল—"বয়স কত ?"

যতীন বলিল—"সতেরো-আঠারো হবে বোধ হয়।"

দীনেশ মুচকি হাসিয়া বলিল—"দেখ্‌তে কেমন?"

যতীন মাথা নীচু করিয়া বলিল—"সুন্দর।"

অমিয় বলিল—"তা' ত হবেই।"

সত্য ব'লল, "তার সঙ্গে তোর কতদিন থেকে আলাপ?"

যতীন বলিল—"মাস দুই হবে!"

বিকাশ বলিল—"প্রথম পরিচয় কোথায়, আর কি করে হ'ল?"

যতীন বলিল—"একদিন লেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার হাতে ঘড়ি দেখে, আমায় জিজ্ঞেস করল—'ক'টা বেজেছে?' তারপর লেকে দেখা হ'লেই আলাপ হ'ত।"

দীনেশ বলিল—"আমার সঙ্গে কবে আলাপ করিয়ে দিচ্ছিস বল?" যতীন কিছু না বলিয়া কেবল দীনেশের মুখের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া রহিল।

দীনেশ বলিল—"চেয়ে আছিস্ যে। বল্, কবে আলাপ করিয়ে দিচ্ছিস্?"

যতীন বলিল—"তা' হ'লে, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে নি।"

দীনেশ বলিল—"আচ্ছা, তুই এখন যেতে পারিস্।"

যতীন হাঁফ্ ছাড়িয়া বিকাশের দিকে একবার কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

যতীন চলিয়া যাইতেই বিকাশ বলিল—"যা' হোক্ 'লভ' এ পড়তে শিখেছে। যতীনকে ফরচুনেট চ্যাপই বল্‌তে হ'বে।"

অমিয় সে কথায় সায় দিয়া বলিল—"ও ইয়েস!"

দীনেশ বিকাশকে বলিল—"কি বল বিকাশ-দা', আজকের দিনটা ভালই কাটল।"

তারপর চা খাওয়া হইলে বন্ধুবর্গ সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গেল। দীনেশ কিন্তু আজ কোথায়ও বাহির হইল না। বোধ হয়, তার মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দীনেশ সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরের বাতি জ্বলিয়া উঠিল। তবুও দীনেশের হুঁস হইল না।

পরদিন হইতে দীনেশ হাতে হীরের আংটী চোখে চশমা দিয়া শান্তিপুরী ধুতি ভাগলপুরী সিল্কের জামা পরিয়া রীতিমত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতে লাগিল।

প্রথম কয়েকদিন ইডেন গার্ডেনে। তারপর লেকে। তারপর আউটরাম ঘাটে। এমন কি বোটানিক্যাল গার্ডেন অবধি দৌড়াদৌড়ি করিয়া দেখিল। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, একটী ষোড়শী যুবতীও চোখে পড়িল না।

যা' হউক, একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল।

দীনেশ সেদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনের বুকিং অফিসের সামনে দাঁড়াইয়া জাহাজের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তখনও জাহাজ জেটীতে ভিড়ে নাই। এমন সময় পিছন হইতে কোমল স্বর শুনিয়া দীনেশ ফিরিয়া দেখিল, নাগরা জুতা পায়ে খদ্দরের সাড়ী পরা চোখে চশমা দেওয়া এক সুশ্রী যুবতী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিতেছে।

দীনেশ বলিল—"আমাকে কিছু বল্‌ছেন?"

যুবতী একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল—"আমার কাছে দুটো টাকা ছিল। তা' গার্ডেনের কোথায় যে পড়ে গিয়েছে, টেরই পাই নি। আপনি যদি দয়া ক'রে আমাকে কয়েক আনা পয়সা ধার দেন, তা' হ'লে বড় উপকার করা হয়।"

দীনেশ যেন আজ হাতে স্বর্গ পাইল। এ কয়দিন ধরিয়া যাহার অন্বেষণে সে ঘুরিয়া মরিতেছে, এই ত তাহার সেই মানসী! দীনেশ আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া পকেট হইতে একটী পাঁচ টাকার

নোট বাহির করিয়া যুবতীর হাতে দিয়া বলিল—"তা'তে কি হয়েছে, এই নিন।"

দীনেশ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তখন ষ্টীমার জেঠীতে আসিয়া লাগায় যুবতী আর অপেক্ষা না করিয়া বুকিং অফিসের দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। দীনেশ তাহার গমন-পথের দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল।

যুবতী টিকিট লইয়া আসিয়া বলিল—"চলুন, জাহাজে যাই। ছেড়ে দিলে বলে।"

"হাঁ চলুন।" বলিয়া দীনেশ চিত্রার্পিতের ন্যায় গিয়া জাহাজে উঠিল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

উপরের একটা বেঞ্চেতে বসিয়া যুবতী দীনেশকে বলিল—"এই নিন আপনার টাকা। আমি এক টাকা রাখলুম।"

দীনেশ বলিল—"থাক্ না, যদি পথে আবার দরকার হয়। আমাকে পরে দিলেই চল্‌বে।"

যুবতী একবার আড়চোখে দীনেশের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—"না, আমার আর দরকার হবে না। এতেই চল্‌বে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দীনেশ টাকা চারিটা পকেটে রাখিয়া দিল। তারপর দু'জনেই চুপচাপ।

হঠাৎ যুবতী বলিল—"ভাল কথা, আমি ভুলেই গিয়েছিলুম, আপনার নাম, ঠিকানাটা দিন্ ত। টাকা এখনই পাঠিয়ে দেব 'খন।"

দীনেশ বলিল—"দীনেশ রায়। প্রেসিডেন্সি হোষ্টেল।" যতীনের চিঠির কথা মনে পড়িতেই দীনেশ আবার বলিল—"আমার হোষ্টেলে পাঠাবেন না। তা' হ'লে আমার হাতে আর সে টাকা পৌঁছবে না।"

যুবতী একটু চিন্তিত হইয়া বলিল—"তাই ত, তা' হ'লে কি করা যায়।" তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, আপনি লেকে বেড়াতে যান্ না?"

সোৎসাহে দীনেশ বলিল—"হাঁ, আমি প্রায়ই যাই।"

যুবতীও একটু খুসি হইয়া বলিল—"বেশ হ'ল। তা' হ'লে কাল আপনাকে লেকেই টাকা দিয়ে দেব, কি বলেন?"

ঘাড় নাড়িয়া দীনেশ বলিল—"বেশ, তাই হবে।"

তারপর খানিক ইতস্ততঃ করিয়া দীনেশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আপনি কি পড়ছেন? না অন্য—"

দীনেশের মুখের কথা শেষ হইতে-না-হইতেই যুবতী বলিল—"আমি ভিক্টোরিয়াতে পড়ি।"

পুনরায় দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার বাপ মা কি এখানেই আছেন?"

যুবতী বলিল—"হাঁ, আমরা সম্প্রতি কোলকাতায় এসেছি। এতদিন আমরা সিঙ্গাপুরে ছিলুম। আমার বাবা ওখানকার ডাক্তার ছিলেন। কিছুদিন থেকে বদলী হয়েছেন। এখন আমরা এখানেই থাক্‌ব।"

দীনেশ কথা কহিল না, চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

যুবতী বলিল—"গঙ্গার হাওয়াটা আজ বেশ লাগছে, নয়?"

দীনেশ বলিল—"হাঁ।"

ষ্টীমার বড়বাজার ঘাটে আসিয়া লাগিলে, দু'জনেই ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিল। তারপর তাহারা হাঁটিতে হাঁটিতে ট্রাম লাইনের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবতী বলিল—"আপনি এখন কলেজ ষ্ট্রীটেই যাবেন বোধ হয়?"

দীনেশ বলিল—"হ্যাঁ।"

সোৎসাহে যুবতী বলিল—"তা' হ'লে চলুন না, এক ট্রামেই যাই। আমিও ত পার্কসার্কাসের গাড়ীতে উঠ্‌ব।"

দীনেশ বলিল—"বেশ ত, চলুন না।"

তারপর ট্রাম আসিলে দু'জনেই তাহাতে উঠিয়া পড়িল। কলেজ ষ্ট্রীটে ট্রাম থামিলে দীনেশ

মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল—"আপনার নামটা জান্‌বার সৌভাগ্য—"

হাসিয়া যুবতী বলিল—"আমার নাম শ্রীমতী হেনা চৌধুরী।"

দীনেশ নামিয়া পড়িলে হেনা বলিল—"কাল্‌কে থেকে যেতে ভুলবেন না যেন।"

দীনেশ মাথা নাড়িয়া বলিল—"না, ভুলব না।"

ট্রাম চলিয়া গেল। দীনেশ সেদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিজয়ী বীরের মত হোষ্টেলের দিকে অগ্রসর হইল।

দুই

দিনকয়েক পরের কথা। একদিন বিকেলবেলা ইডেন গার্ডেনের একটা ঝোপের ভিতর একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া হেনা বলিল—"আচ্ছা দীনেশবাবু, বাড়ীতে আপনাকে কেউ বিয়ের জন্য পেড়াপীড়ি করে না?"

দীনেশ হেনার দিকে চাহিয়া বলিল—"বাড়ীর সবাই আমাকে বিয়ের জন্য পেড়াপীড়ি কর্‌ছে। কিন্তু আমি মোটেই সে কথায় কাণ দিচ্ছি না।"

সাগ্রহে হেনা বলিল—"কেন?"

মুচ্‌কি হাসিয়া দীনেশ বলিল—"একটু মানে আছে।"

হেনা দীনেশের একখানা হাত ধরিয়া বলিল—"বলুন না শুনি, কি মানে।"

দীনেশ বলিল—"মানে, আমি একটা কাপড়ের পুঁটলিকে বিয়ে করতে পারব না। নিজের পছন্দমত হয় ভাল, না হয় চিরকুমার থেকে যাব।"

হেনা বলিল—"আমারও সেই মত। সেদিন বাবা বলেছিলেন—'হেনা তোর বয়স ত প্রায় আঠারো হয়ে এল, এবার বিয়ে কর।' আমি বাবাকে স্পষ্টই বলে দিলুম—'বি-এ পাশের আগে ও কথা তুল না বাবা'।"

দীনেশ বলিল—"বিয়ের সম্বন্ধে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েকে ইউরোপের মত স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। কি বলেন?"

হেনা বলিল—"নিশ্চয়ই!"

তারপর দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ হেনা দীনেশের হাতের আংটীটা ধরিয়া বলিল—"আংটীটা বড্ড চক্‌চক্‌ করছে দেখ্‌ছি!"

দীনেশ বলিল—"এটা হীরের।"

হেনা বলিল—"তবে ত এটা খুব দামী, কি বলেন?"

দীনেশ বলিল—"হ্যাঁ।"

হঠাৎ এক সাহেব একটী মেমের হাত ধরিয়া ঝোপের মধ্যে তাহাদের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, তাহাদের বসিয়া থাকিতে দেখিয়াই ফিরিয়া গেল।

দীনেশ হেনার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—"ওরা বোধ হয় রোজ এই বেঞ্চিটা খালিই পায়। তাই একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে টপ্‌ ক'রে ঢুকে পড়েছিল। সন্ধ্যে হয়ে এল, চলুন এবার আমরা যাই।"

হেনাও মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ চলুন। ওদের একটু এখানে বসতে দেওয়া উচিত।"

তারপর দুইজনেই সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

যাইতে যাইতে হেনা বলিল—"দীনেশবাবু, আমায় একদিন থিয়েটারে নিয়ে যাবেন?"

সাগ্রহে দীনেশ বলিল—"নিশ্চয়! ও আর বড় কথা কি। যেদিন আদেশ করবেন।

হেনা বলিল—"আমার একা একা থিয়েটারে যেতে ভাল লাগে না। দাদাকে বল্‌লুম, তিনি বললেন 'অন্য কাউকে নিয়ে যা', আমি পারব না'।"

দীনেশ বলিল—"ষ্টারে যাবেন?"

হেনা বলিল—"না, কাল মনোমোহনে শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' হবে, সেখানেই যাব।"

দীনেশ বলিল—"বেশ, আজই বক্স রিজার্ভ করে রাখব 'খন।"

হেনা বলিল—"বক্সের কি দরকার।"

দীনেশ বলিল—"অত পুরুষের সাম্‌নে আপনার বসতে অসুবিধা হবে। না না, সামান্য পয়সার জন্য আপনাকে আমি অসুবিধায় ফেলত পারব না।

হেনার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে আর কোন আপত্তি করিল না।

সেদিন প্লে শেষ হইতে অনেক রাত হইয়া গেল। বাইরে আসিয়া হেনা বলিল—"রাত অনেক হয়ে গেছে, আমায় বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু।"

দীনেশ বলিল—"বেশ ত পৌঁছে দেব 'খন।"

তারপর একটা ট্যাক্সি করিয়া দু'জনে ইটিলীর অভিমুখে রওনা হইল। গাড়ী সাউথ রোড্ দিয়া চলিতে লাগিল। একটা তেতালা বাড়ীর একটু অদূরে গাড়ী থামাইয়া হেনা বলিল—"ঐ বাড়ীটাই আমাদের। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলাম, আমি একাই যাচ্ছি। এখন আপনাকে দেখে আবার কি মনে করবে, তাই এখানেই নামলুম।"

দীনেশ বলিল—"আচ্ছা, আসুন তা' হ'লে। কাল আবার আউটরাম ঘাটে দেখা হবে?"

হেনা বলিল—"না, লেকে।"

দীনেশ বলিল—"আচ্ছা।"

তারপর টেক্সিওয়ালা দীনেশের হুকুম পাইয়া গাড়ী ঘুরাইয়া চলিয়া গেল।

হেনা সেখানে একটু দাড়াইয়া রহিল। গাড়ী অদৃশ্য হইলে সেও ফিরিয়া চলিল।

পরদিন দীনেশ হেনার সদাহাস্য মুখে মলিনতার চিহ্ন দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল; বলিল—"আপনাকে আজ এত 'পেল' দেখাচ্ছে কেন?"

বেঞ্চিতে বসিতে বসিতে হেনা বলিল—"কই, না।"

দীনেশ তাহার হাত দু'টী ধরিয়া বলিল—"না না, লুকলে চল্‌বে না! বলুন, কি হয়েছে?"

হেনা বলিল—"কাল বাবা আমায় তিন শ' টাকা রাখতে দিয়েছিলেন। থিয়েটারে যাওয়ার উৎসাহে ভুলে আমি সেগুলো টেবিলের উপর ফেলে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি, টাকা নেই। কে যে নিয়ে পালাল কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। এখন বাবা চাইলে কি বল্‌ব, তাই ভাবতে ভাবতে মন খারাপ হয়ে গেছে।"

এই বলিয়া হেনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দীনেশ হেনার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"এই সামান্য তিন শ'টাকার জন্য আপনি এত ভাবছেন? হাতে আজ টাকা নেই, কালই আমি ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে আপনাকে দেব। আপনি কিছু ভাববেন না।"

হেনা একটু খুসি হইয়া বলিল—"তা' হ'লে আপনি আমার বন্ধুর কাজ কর্‌বেন।"

তারপর একটু ভাবিয়া হেনা বলিল—"কিন্তু কাল ত আমরা কোলকাতায় থাকব না।"

দীনেশ চমকিয়া উঠিল! বলিল—"কোথায় যাবেন?"

হেনা বলিল—"বিশেষ একটা কাজে ক'দিনের জন্যে আমাদের দম্‌দমের বাগান-বাড়ীতে যেতে হচ্ছে। আজই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজ যাওয়া হয়ে উঠ্‌ল না। কাল ভোরেই যেতে হবে।"

আশ্বস্ত হইয়া দীনেশ বলিল—"বেশ ত, টাকা নিয়ে না হয় বিকেলবেলা আমি আপনাদের বাগানেই যাব।"

হেনা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। বলিল—"যাবেন? যাবেন আপনি?"

দীনেশ হাসিয়া বলিল—"আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন। আমি যাবই! আপনার জন্যে আমি সব করতে প্রস্তুত আছি জানবেন।"

হেনার সমস্ত মুখে কে যেন আবীর গুলিয়া

দিয়াছিল—সে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দীনেশের আঙুলগুলার উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

দীনেশের এই পরিবর্ত্তন হোষ্টেলের অনেক ছেলেই লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু কেউ তাহাকে সাহস করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই।

বিকাশ আজ রাত্রে হঠাৎ দীনেশকে বলিয়া ফেলিল—"হ্যাঁ রে দীনেশ, আজকাল যে তোর অনেক চেঞ্জ হচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

দীনেশ গম্ভীর হইয়া বলিল—"কি রকম?"

বিকাশ বলিল—"এই বিকেলবেলা যে তোকে একদিনও দেখ্‌তে পাই না।"

দীনেশ রাগিয়া বলিল—"তোরাই কি রোজ বিকেলে ঘরে বসে থাকিস না কি?"

বিকাশ দমিবার পাত্র নয়; বলিল—"আমাদের মাঝে মাঝে বাদ যায়, আর সন্ধ্যার সময়ই ফিরে আসি। তোর ত একদিনও বাদ যায় না; আর ফিরিসও রাত ক'রে।"

দীনেশ বলিল—"তোদের যেদিন বাদ যায়, সেদিন আমি বেড়াতে যাই। আর আমার যেদিন বাদ যায়, সেদিন তোরা বেড়াতে যাস্। কাজেই বিকেলে দেখা হয় না।"

"তা হবে" বলিয়া বিকাশ গম্ভীর হইয়া চলিয়া গেল।

তিন

পরদিন সকালবেলা দীনেশ চেয়ারে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল—আজ হেনাকে একেবারে তিন শ' টাকা দিতে হইবে। উঃ, সে যে অনেক! কিন্তু না দিয়া উপায় কি? টাকার জন্য হেনাকে সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না। সে তাহাকে যেরূপ ভালবাসে, বিবাহের প্রস্তাব করিলে নিশ্চয়ই অমত করিবে না। কিন্তু নিজে হইতে কথাটা তুলিতে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। সে স্থির করিল—অধীর দা' দেশ হইতে আসিলে তাহাকে দিয়া একেবার হেনার পিতার নিকট প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিয়া দেখিবে। সেই ভাল।

বলা বাহুল্য, সেদিন আর দীনেশের কলেজে যাওয়া হইল না।

দুপুরবেলা খাইয়া-দাইয়া সে যখন ব্যাঙ্কে টাকা তুলিতে যাইতেছে, এমন সময় ডাক হরকরা আসিয়া তার হাতে একখানা পত্র দিয়া গেল।

চিঠিখানা দেশ হইতে তার মা লিখিয়াছিলেন। তা'তে লেখা ছিল—

"বাবা দীনেশ,

অনেকদিন অবধি তোমার কোন খবর পাইতেছি না। আশা করি, তুমি ভাল আছ।

তোমার বিয়ের জন্য একটী খুব সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছি। এবার বাবা আমার, কোন অমত করিও না। মেয়ের নাম অন্নপূর্ণা। আমার চিঠি পাইলেই বাড়ী চলিয়া আসিও।

আমরা সকলে ভাল আছি। তোমার মঙ্গল লিখিও। ইতি,

আশীর্ব্বাদিকা—
তোমার
মা"

চিঠিখানা পড়িয়া দীনেশ তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আপন-মনে বলিয়া উঠিল—"মেয়েকে দেখ্‌লুম না শুনলুম না, অমনি গিয়েই বিয়ে করব। আমার দ্বারা তা' কখনও হবে না। সুন্দরী নিয়ে আমি কি করব। সুন্দরী ধুয়ে কি জল খাব। মনের যদি মিলই না হয়, তবে অমন বিয়ে ক'রে কি লাভ। ছি ছি, কি 'ন্যাষ্টি' পছন্দ!—নাম রেখেছে, অন্নপূর্ণা! বেঁচে থাক্ আমার হেনা! যেমনি রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি তার নাম!"

তারপর তাড়াতাড়ি দীনেশ ব্যাঙ্কে গিয়া তিনশত টাকা তুলিয়া আনিল এবং বিকেলবেলা

যথাসম্ভব বেশভূষা করিয়া দমদম্ অভিমুখে যাত্রা করিল।

হোষ্টেল হইতে বাহির হইবার সময় সিঁড়িতে বিকাশের সঙ্গে দেখা। বিকাশ কিছু বলিল না, শুধু মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

হেনা গেটের সাম্‌নেই দাঁড়াইয়াছিল। দীনেশ আসিতেই বলিল—"এই যে দীনেশবাবু, আসুন। আমি আপনার জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। অনেক ঘুরেছেন বোধ হয়?"

দীনেশ বলিল—"না,মোটেই ঘুরি নি। ট্যাক্সি থেকে নেমেই তোমার কথামত সিধে চলে এসেছি।'

হেনা বলিল—"বেশ, চলুন ভিতরে যাই।"

বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। একটা ঘরে বসিয়া দীনেশ বলিল—"বেশী লোক-জন ত দেখতে পাচ্ছি না?"

হেনা বলিল—"আমরা সবাই ত আসি নি। বাবা, দাদা, একজন ঠাকুর, আর আমি। বাবা উপরে ঘুমচ্ছেন, তাঁর শরীরটা ভাল নয়। দাদা বাইরে কোথায় গেছেন।"

দীনেশ বলিল—"ও।"

তারপর পকেট হইতে ত্রিশখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া হেনার হাতে দিল।

হেনা বলিল-"আমায় মস্ত দায় থেকে উদ্ধার করলেন দীনেশবাবু, আমি আপনার কেনা হয়ে রইলাম।"

দীনেশ বলিল—"এর জন্য আমাকে আর ধন্য-বাদ দেওয়ার কোন দরকার নেই। আমি ত আর অপর লোক মনে ক'রে তোমায় দিচ্ছি না।"

হেনা একটু হাসিল। তারপর বলিল—"আপনি একটু বসুন, আমি টাকাগুলো ওপরে রেখে আস্‌ছি।"

হেনা উপরে চলিয়া গেলে, দীনেশ বারান্দায় আসিয়া বাগানের শোভা দেখিতে লাগিল।

ফিরিয়া আসিয়া হেনা বলিল—"আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। একটু সবুর করুন, দাদা এলেই আমরা একসঙ্গে খেতে বস্‌ব।"

দীনেশ বলিল—"আমায় ন'টার গাড়ীতেই ফির্‌তে হবে।"

হেনা দীনেশের দিকে চাহিয়া অভিমানের সুরে বলিল—"আস্‌তে-না-আসতেই যাবার জন্যে তাড়া; কেন, জলে পড়েছেন না কি? নাই বা গেলেন আজ—"

এমন সময় একটী যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবককে লক্ষ্য করিয়া হেনা বলিল—"এই যে দাদা।" তারপর দীনেশকে দেখাইয়া বলিল—"ইনিই দীনেশবাবু।"

যুবক দীনেশকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আপনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে হেনার বড্ড উপকার করেছিলেন।"

দীনেশ বাধা দিয়া বলিল—"না না, এমন কি করেছি; অমন ক'রে আর লজ্জায় ফেলবেন না আমায়।"

হেনা হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা বাবু, আর লজ্জায় ফেলাফেলিতে কাজ নেই, এখন খাবেন চলুন।"

যুবকটী বলিল—"মন্দ যুক্তি নয়, তুই দীনেশ-বাবুকে নিয়ে যা'। আমি ওপর থেকে জামাটা ছেড়ে আস্‌ছি।" বলিয়া হেনার দাদা চলিয়া গেল।

দীনেশ বলিল—"তুমি না চিনিয়ে দিলে, উনি তোমার দাদা বলে' আমি ধারণাই করতে পারতুম না। তোমার রং কেমন ফর্‌সা, আর ওঁর রং একেবারে কালো।"

হেনা সে কথার কোন উত্তর দিল না।

আহারাদির পর যুবকটী হঠাৎ দীনেশকে ধরিয়া বসিল—"ন'টার গাড়ীতে আর যাওয়া যাবে না। এখন আবার সেই এগারটার গাড়ী। তার

চেয়ে কোনরকমে চোখ-কাণ বুজে এখানেই রাতটা কাটিয়ে যান দীনেশবাবু, কি বলেন ?

হেনা বলিল—"বিলক্ষণ! বলাবলির কি আছে; আমরা ওঁকে ছেড়ে দিলে ত!"

আনন্দে দীনেশের সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে গদগদকণ্ঠে বলিল—"না থেকে আর কি করি বলুন। আপনারা ভাই-বোনে যখন একসঙ্গে জিদ্ আরম্ভ করেছেন।"

হেনার দাদা বলিল—"বাবার এখানে আসতে-না-আসতেই অসুখ হয়ে পড়ল। আমায় এখন তাঁর কাছে যেতে হবে। আমি চল্লুম। আপনার সঙ্গে আজ বিশেষ কথা বল্‌তে পারলুম না, সেজন্য মনে কিছু কর্‌বেন না। কাল তখন—"

দীনেশ বলিয়া উঠিল—"বিলক্ষণ, এ বিপদে আবার মানুষ কিছু মনে করতে পারে না কি! বলেন ত আমি বরং তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

"না না, কাল সকালেই দেখা করবেন।" বলিয়া হেনার দাদা চলিয়া গেল।

হেনা বলিল—"এখন ঘুমবার জোগাড় করুন। রাতও ত কম হয় নি।"

দীনেশের বুকের সমস্ত রক্ত তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ সে 'খপ' করিয়া হেনার হাত দু'টা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল—"হেনা!"

হেনার মুখে হাসির বিদ্যুৎ। সে কণ্ঠের উচ্ছলতা কোনরূপে চাপিয়া রাখিয়া বলিল—"কি ?"

দীনেশ আবেগভরে বলিয়া উঠিল—"হেনা, আমি তোমায় ভালবাসি! তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব! বল, তুমি আমার হবে, কালই তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে..."

হেনা হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল; বলিল—"বেশ, ত তাই করবেন। বাব্বা, আচ্ছা লোক যা' হোক্!"

আনন্দের আতিশয্যে দীনেশ আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

* * *

পরদিন বেলা সাতটার সময় দীনেশ ঘুম হইতে জাগিয়া দেখে হেনা তখনও উঠে নাই। তারপর তাহার শুইবার ঘরে গিয়া দেখে হেনা সেখানেও নাই। দীনেশ বারান্দায় আসিল।

বারান্দায় আসিতেই বাগানের এক মালী তাহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, আপনার জন্যে গাড়ী ডেকে দেব।"

দীনেশ অবাক হইয়া বলিল—"গাড়ী!"

মালী বলিল—"বাবুরা রাত্রে চলে গেছেন। যাবার সময় বলে গেছেন, আপনার অসুখ। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠ্‌লে গাড়ী ডেকে দিতে।"

দীনেশ চমকিয়া বলিল—"বলিস্ কি রে!" তারপর নিজের হাতের দিকে চাহিয়া দেখে,—আঙ্গুলে হীরের আংটীটা নাই।

তারপর তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া দেখে,—যেখানে রাত্রে শুইবার সময় হাত হইতে সোনার রিষ্টওয়াচ্‌টা খুলিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে সেটাও নাই।

দীনেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সর্ব্বনাশ! চার হাজার টাকার হীরের আংটী, তিন শত টাকা নগদ, এক শত পঁচিশ টাকার ঘড়ি। তবে কি ওরা সব চোর। আমি কি জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলাম।

দীনেশ দৌড়াইয়া বারান্দায় আসিয়া মালীকে বলিল—"ওপরে যাবার সিঁড়ি আমায় দেখিয়ে দে ত। দেখি, সেখানে কেউ আছে কি না।"

মালী বলিল—"আমরা ওপরটা কাউকে ভাড়া দিই না। আর যাওয়ার রাস্তাও নেই, তালাবন্ধ।"

দীনেশ চীৎকার করিয়া উঠিল—"চোর, চোর, নিশ্চয়ই চোর!"

মালী বলিল—"কি বল্‌ছেন বাবু ?"

দীনেশ মালীর কথায় কাণ না দিয়া বলিল—"এটা কার বাগান ?"

মালী জানাইল—এটা কলিকাতার কোন এক রাজার বাগান-বাড়ী।

আবার দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কবে ওরা ভাড়া নিয়েছিল ?"

মালী বলিল—"আজ পাঁচ দিন হ'ল।"

দীনেশ চোখে সরিষা ফুল দেখিতে লাগিল। মালীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কোলকাতা যাবার কোন ট্রেন আছে ?"

মালী বলিল—"সাড়ে সাতটায় একখানা গাড়ী আছে।"

দীনেশ উন্মাদের মত ষ্টেশনের দিকে দৌড়াইল।

শিয়ালদহ আসিয়াই সে ইটালী সাউথ রোডে হেনা সেদিন রাত্রে যে বাড়ী দেখাইয়াছিল, তাহার উদ্দেশে ছুটিল।

সেখানে গিয়া দেখে সে এক মাড়োওয়ারীর বাড়ী। দীনেশের মাথা আরও ঘুরিয়া গেল। সেখান হইতে সে থানায় দৌড়াইল।

থানাওয়ালারা প্রথমে খুব একচোট হাসিয়া লইল। তারপর যা' হউক ডায়েরী লিখিয়া লইয়া বলিল—"কোন ভয় নেই, আমরা দস্তুরমত তদন্ত করব।"

উপায়হীন দীনেশ কাজেই সোজা হোষ্টেলে চলিয়া আসিল।

মনে মনে বলিতে লাগিল—"যেমন কলম্বাসের মত আবিষ্কার কর্‌তে বা'র হয়েছিলুম, তেমনি তার উপযুক্ত ফল হয়েছে !"

বিকালবেলা খবরের কাগজে কলিকাতায় এক হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

কাগজওয়ালারা রাস্তায় রাস্তায় চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—"দীনেশবাবুর হেনা আবিষ্কার, পড়ে দেখুন একবার। দীনেশ বাবুর হেনা আবিষ্কার—"

সন্ধ্যার সময় বিকাশ একখানা খবরের কাগজ হাতে হোষ্টেলে আসিয়া ছেলেদের ডাকিল—"চার হাজার, চার শ' পচিশ টাকার লভারকে তোরা কে কে দেখ্‌বি আয় !"

হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া সকলে দীনেশের ঘরে গিয়া দেখিল,—সে ঘর অন্ধকার, জিনিষ-পত্র কিছুই নাই।

ব্যাপার কি ! দীনেশ গেল কোথায় ? সকলে হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে ছুটিল। সেখানে গিয়া জানিল,—দীনেশ বিকালের ট্রেনে দেশে চলিয়া গিয়াছে।

দীনেশের হেনা আবিষ্কারের কাহিনী পড়িয়া ছেলেরা সকলে হোহো করিয়া হাসিতে লাগিল।

দৃষ্টিহীনা

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

এক

মা বড় সাধ করিয়া একমাত্র কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন—হাস্‌নাহানা। রং তার শ্যাম, কিন্তু মুখশ্রী যেন ছাঁচে ঢালা। বিধাতা যেমন একদিকে গৌরবর্ণ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তেমনি অপর দিকে তাহাকে অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, চোক, নাক দিয়া সেটুকু পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বেথুন কলেজে পড়িবার সময় হঠাৎ একদিন একটা গাড়ীর সহিত হাস্‌নাহানাদের বাসের ধাক্কা লাগে এবং হাস্‌নাহানার মাথায় দারুণ আঘাত লাগায় সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তারপর হাসপাতালে মাসাধিক থাকিয়া সে আরোগ্য-লাভ করে বটে, কিন্তু জীবনের সব চেয়ে বড় যে চক্ষু রত্ন, তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইয়া যায়।

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া মাতা বিন্দুবাসিনী কোনমতে চক্ষু জল রোধ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। মায়ের প্রাণ, তাই কেবলই তাঁহার মনে হইত,—বিধাতা হাস্‌নাহানার পরিবর্ত্তে তাঁহার চক্ষু দুইটা লইলেন না কেন!

এই ত তাহার যৌবন—এরই মধ্যে জগতের জিনিষ দেখিবার উপায় তাহার চিরতরে ঘুচিয়া গেল!

এখনও সে অনূঢ়া! মা-বাপের তেমন অর্থ নাই যে, কন্যার বিবাহ টাকার লোভ দেখাইয়া দিবেন।

সেদিন অফিস হইতে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটিয়া হাসনাহানার পিতা যামিনীমোহন ঘরের মেঝের উপর আসিয়া বসিয়া পড়িয়া মিনিট দুই-তিন বিশ্রাম করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"হাসু!"

হাসনাহানা পার্শ্বের ঘরে বসিয়া কতগুলি ফুল লইয়া আপন মনে মালা গাঁথিতেছিল। পিতার ডাক শুনিয়া অসমাপ্ত মালাগাছটা একহাতে ধরিয়া অন্য হাতে দেওয়াল স্পর্শ করিয়া সে ধীরে ধীরে তাঁহার ঘরের দোরগোড়ায় আসিয়া কহিল—"কি বাবা?"

যামিনী কন্যার দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, এদিকে আয়, আমার কাছে এসে একটু বোস।"

হাস্‌নাহানা ঘরের ভিতরে আসিতে আসিতে কহিল—"তুমি কোথায় বাবা?"

"এই যে মা, এখানে।" বলিয়া যামিনী উঠিয়া গিয়া কন্যার একখানা হাত ধরিয়া বসাইয়া আপনিও তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

কন্যার হস্তে অর্দ্ধসমাপ্ত মালাগাছটা দেখিয়া যামিনী প্রশ্ন করিলেন—"কি করছিলি মা, মালা গাথ্‌ছিলি?"

হাস্‌নাহানা পিতার হাতের উপর আপনার একখানা হাত রাখিয়া কহিল—"আর কি করব বাবা! অন্ধ আমি, লেখাপড়া ত আর করতে পারি না!" বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল; দৃষ্টিহীন চক্ষুর দুই কোণ হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল।

হাস্‌নাহানা পড়িতে যে কত ভালবাসিত, তাহা যামিনীর অজানা ছিল না। কন্যার চোখে

জল দেখিয়া তাঁহার নিজের চোখেও জল আসিল।

চক্ষু মুছিয়া কন্যার চুলভরা মাথাটা আপনার উত্তপ্ত বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া যামিনী সান্ত্বনার সুরে কহিলেন—"তুই দুঃখ করিস্ নি মা! কি করি বল, ভগবান যে তোর উপর বিরূপ, তা' না হ'লে এমন হরিণ চোখের দৃষ্টি তিনি হরণ ক'রে নেবেন কেন!" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুর কোণ দুইটা আবার জলে ভরিয়া উঠিল। কন্যার দৃষ্টিহীন চক্ষুর দিকে চাহিবামাত্রই অশ্রু কোন বাধা না মানিয়া তাঁহার গণ্ড বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা একবিন্দু অশ্রু হাস্নাহানার গালের উপর পড়িল। তাহার দৃষ্টিহীন দুই চক্ষু পিতার উপর আন্দাজে নিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করিল—"তুমি কাঁদ্‌ছ বাবা?"

যামিনী তখন একটা কথাও মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কন্যার সেই রোদন রুদ্ধ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার অন্তর যেন আরো অসহনীয় যাতনায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

পিতাকে নীরব দেখিয়া হাস্নাহানা কহিল —"বাবা, তুমি আমার জন্য অত অস্থির হচ্ছ কেন? আমি বেশ জানি, ভগবান যা' করেন সবই ভালর জন্যে! আমরা মানুষ, ধরতে পারি না,তাই আমাদের অদৃষ্টের জন্যে তাঁকে দোষ দিই। তা'ছাড়া,আমার কি দুঃখ বাবা! আমি অন্ধ, তোমাকে, মাকে আর দেখতে পাই না', জগতের কোন কিছুই আর এখন আমি দেখতে পাব না। কিন্তু, এটুকু সান্ত্বনা ত তাঁর দয়ায় আমি পেয়েছি —আগে ত আমি জগতকে,তোমাকে,মাকে প্রাণভরে' দেখে নিয়েছি! যারা জন্মান্ধ, তাদের দুঃখটা আমার চেয়ে বেশী নয় কি বাবা? তারা, তাদের মা-বাপের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পায় নি; এর চেয়ে বড় দুঃখ আর তাদের কি থাক্‌তে পারে!" কিয়ৎক্ষণ থামিয়া পুনরায় কহিল—"আমি ত বেশ আছি, আমার বাবা আছে, মা আছে। কিন্তু যারা অন্ধ, অথচ যাদের মা নেই, বাপ নেই,দেখবার কেউ নেই, তাদের দুঃখটা কতখানি ভাবলেও যে আমি শিউরে উঠি। ভগবানকে মঙ্গলময় না বলে' থাক্‌তে পারি না বাবা!"

যামিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কন্যার বাহুবন্ধন হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দৃষ্টিহীন বৃহৎ দুই চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া হাস্নাহানা আপন-মনেই বলিয়া উঠিল—"ভগবান্, আমি তোমার কাছে কিছু চাই না—কেবল তুমি বাবা-মা'র দুঃখ দূর কর!"

তারপর আপনার দুই কর একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দুই

হাস্নাহানার বয়স বাড়িয়া চলিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবাহের কোন স্থিরই হইল না। কন্যার বয়সের গুরুত্ব বিন্দুবাসিনী স্বামীকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও না জানাইয়া ছাড়িতেন না।—কন্যা যে সতেরো ছাড়িয়া আঠারোয় পড়িল, বিবাহ দিবার মতলব বুঝি নাই, ঘরে বুঝি পাঁড় পুষিয়া রাখিতে হইবে, ইত্যাদি।

এ চিন্তা যে যামিনীর মনেও ক্ষণে ক্ষণে পীড়া দিত না, তাহা নহে. কিন্তু উপায় কি? গৃহিণী না হয় তাঁহারই উপর অভিযোগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু তিনি যান কোথা! বাঙালীর ঘরে সুন্দরী মেয়েরই বিবাহ হয় না, অন্ধকে কে গ্রহণ করিবে?

কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতা বোধ করি ক্ষণেকের জন্য ভুল করিয়া বসিলেন। বাপ-মা, মেয়ে, মায় পাড়া-প্রতিবাসীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। কোথা হইতে এক যুবক জমিদার আসিয়া তাহাদের খান দুই বাড়ীর পরই একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল। তাহার মাতা একদিন বিন্দুবাসিনীদের

বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া হাস্নাহেনাকে দেখিয়া এবং তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

বিন্দুবাসিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই, তোমার হাসু শুধু তোমারই মেয়ে নয়, আমারও বটে। যদি মত কর- আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে নিজের করে নি।"

একটু নীরব থাকিয়া হাস্নাহানার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিয়া পুনরায় বলিলেন—সৎমা, সৎশাশুড়ীর যে একটা ভারী বদনাম আছে, সেটা আমি সাধারণের মন থেকে দূর ক'রে দিতে চাই। সৎমা হ'লেই যে খারাপ হবে, সৎশাশুড়ী হ'লেই যে বউকে যন্ত্রণা দেবে, এমন কি কথা আছে ভাই?" মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া হাসিয়া পুনরায় বলিলেন—"মেয়েকে সৎশাশুড়ীর হাতে ছেড়ে দিতে তোমার মন চাইবে ত ভাই?"

আনন্দে বিন্দুবাসিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। মমতার একখানা হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তোমার মত সৎশাশুড়ী ও যেন জন্ম-জন্ম পায়, আমি ওকে এই আশীর্ব্বাদই করি! কিন্তু এ কথা শুনেও যে বিশ্বাস করতে পারছি না দিদি! হাসুর ভাগ্য কি···"

বাধা দিয়া মমতা বলিলেন—"ভাগ্য ভাল-মন্দ বিচার পরে করলেও চলবে, এখন বল ত শুনি, রাজী আছ কি না?"

বিন্দুবাসিনীর অশ্রু বাধা মানিল না। সে মমতার পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল, তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া তুলিয়া মমতা স্নেহ-ভরা কণ্ঠে বলিলেন—"দুটো গাল দাও বোন্, তা' বরং সহ্য করতে পারি, কিন্তু পান্‌সে চোখের জল, না না, ও আমি কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারব না। আগে থাক্‌তে বলে রাখছি, দু' বেয়ানে যেন এই নিয়ে শেষটা না মুখ দেখাদেখি বন্ধ করতে হয়।"

বিবাহ ত হইয়া গেল, কিন্তু গোল বাঁধিল হাস্নাহানার স্বামী নিখিলের রকম সকম দেখিয়া। গোড়া হইতেই এ বিবাহে সে অমত করিয়াছিল—একটা অন্ধ মেয়েকে তার চির-জীবনের সাথী করিয়া লইতে পারিবে না। মমতা সেকথা শুনেন নাই, দরিদ্র পরিবারের কন্যা-দায় দেখিয়া তাঁর কোমল হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। সপত্নী-পুত্র নিখিলকে জোর করিয়া মত করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে ফল হইল অন্য প্রকার। নিখিল একেই ত বিমাতার উপর বরাবরই অসন্তুষ্ট, তার উপর তিনি যখন জোর করিয়া একটা দৃষ্টিহীনা মেয়েকে তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিলেন, তখন আর তাহার রাগের সীমা রহিল না; সৎমা যে এমনি করিয়াই সপত্নী-পুত্রের সর্ব্বনাশ করিতে সুরু করে কেবল ইহাই তাহার মনে হইতে লাগিল।

এ কয়দিন নিখিল মাতার সহিত কোন কথাই কহিল না। তাঁহাকে দেখিলে সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত। হাস্নাহানা রাত্রে গিয়া ঘরে শয়ন করিলে, নিখিল একবার ফিরিয়াও দেখিত না, সে চক্ষু বুজিয়া নিদ্রার আরাধনা করিত।

সদাসর্ব্বদা হাস্নাহানাকে চলা-ফেরায় এবং অন্যান্য কাজে সাহায্য করিতে, মমতা একজন দাসী তাহার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মমতার এতটা দয়া, নিখিলের ভাল লাগিল না; সে ভাবিল, তাহার পিতা সৎমা'র নামে সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন বলিয়া তিনি যা' তা' করিয়া দু'হাতে টাকা উড়াইতে সুরু করিয়াছেন এবং এ ভাবে বিবাহ দিবার স্পর্দ্ধাও তাহারই জোরে। কিন্তু নিখিল মুখ ফুটিয়াও কিছু বলিতে পারিল না, মনে মনে সে বিষধর সর্পের ন্যায় ভীষণভাবে গর্জ্জাইতে লাগিল।

মমতা একদিন নিখিলের ঘরে গিয়া কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই ধীরে ধীরে কহিলেন --"হাঁ রে নিখিল, তুই কি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ ক'রে দিলি না কি? আমি যে তোর ওপর কত আশাই করেছিলুম—তুই যদি মানুষ হতিস্, সেটা বুঝ্‌তে তোর দেরী হ'ত না।" মিনিট দুই-তিন মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিলেন —"তুই বৌমাকে অযত্ন করিস্—তার দিকে একবার ফিরেও তাকাস না—এটা কি রকম বিশ্রী ব্যাপার বল্ ত বাবা? আহা, মাকে যে অন্ধ দেখেই আমি বড় গর্ব্ব ক'রে তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলুম রে! নিখিল, তুই আমার সে গর্ব্ব আজ ভেঙ্গে দিতে চলেছিস্!" সহসা তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি জোর করিয়া আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িয়া তাহা ব্যর্থ করিয়া দিল।

নিখিল একবার জ্বলন্ত-চক্ষে মমতার মুখের দিকে চাহিয়াই চীৎকার করিয়া কহিল—"তুমি সৎমা কি না, তাই আমার এ সর্ব্বনাশ করলে; আমার নিজের মা থাকলে, কখনই আমার এতবড় সর্ব্বনাশ করতে পারত না!"

মমতা অঞ্চল দিয়া চোখ মুছিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন—"আস্তে নিখিল, বাড়ীর চাকর-দাসীরা যে শুনতে পাবে—লোকে যে নিন্দে করবে বাবা!"

নিখিল ঠিক তেমনি চড়াসুরে কহিল— "নিন্দে করবে তোমাকে, আমাকে নয়। তা'তে আমার কি? লোকে বলবে— 'সৎমা কখনও সতীন-ছেলের ভাল করে না'।"

মমতা নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন— তা'তে তোরই অপমান বাবা! আমি সৎমা হই, আর যাই হই, তবু তোর মা! যদিও তুই আমার গর্ভে হস নি, তবুও আমি তোকে নিজের পেটের ছেলের মতই দেখি—এতে এতটুকু মিথ্যার অভিনয় নেই নিখিল! আমার নিজের ছেলে নেই, তোরা দুটীতেই যে আমার সে অভাব পূর্ণ করেছিস্!"

বলিতে বলিতে মমতার চক্ষু ফাটিয়া হুহু করিয়া গণ্ড বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

চক্ষু মুছিবার কোনপ্রকার চেষ্টা না করিয়া তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন—"হাসুর সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়েছিলুম তোর মন্দ করবার জন্যে নয় নিখিল। ওই দুঃখী অন্ধ মেয়েটীর ওপর তোর ভালবাসা পড়লে, তোকেই লোকে যে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করবে—আমাকে ত করবে না। তোকে বড় ক'রে লোকের কাছে পরিচয় দেওয়াই যে আমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল! নিজের অল্প-বিস্তর স্বার্থ ত্যাগ না করতে পারলে ত জগতে কোন মহৎ কাজই করা যায় না! আপাতদৃষ্টির লোকসানই ত সব নয় বাবা!" তারপর চক্ষু মুছিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন—"দৃষ্টিসম্পন্না অপ্সরার মত রূপসীকে ত সকলেই ভালবাসে, কিন্তু দৃষ্টিহীনা, শ্যামা, শান্ত মেয়েটিকে ভালবাসে কয়জন? যে বাসে, সেই ত প্রকৃত মানুষ! সুন্দরী দৃষ্টিসম্পন্না নারীকে ভালবাসার চেয়ে তাকে ভালবাসার মূল্য অনেক বেশী!"

নিখিল কি যেন বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখ হইতে তখন কোন বাক্যই নিঃসরণ হইল না; শুধু ক্ষণকালের জন্য একযোড়া নির্নিমেষনেত্র মমতার অশ্রুপূর্ণ চোখ দুইটার দিকে ফেলিয়া সে অন্যত্র যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

নিখিল ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেই সহসা হাস্নাহানার সহিত তাহার এক প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া গেল।

হাস্নাহানা নিখিলের সে ঝাঁঝাল বাক্য শুনিয়া তাহারই ঘরের দিকের দেয়াল ধরিয়া একাকী প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল। নিখিল হাস্নাহানাকে দেখিতে পায় নাই।

হাস্‌নাহানা সে ধাক্কা সামলাইতে পারিল না, সশব্দে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেই, চৌকাঠ লাগিয়া কপালের একপাশ চিরিয়া অজস্র ধারায় রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

শব্দ শুনিয়া, মমতা তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া পড়িলেন। হাস্‌নাহানাকে রক্তাক্ত মুখে সেইখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর একবার অশুভ আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে আপনার দুই বাহুর দ্বারা বেষ্টন করিয়া মমতা ধরিয়া তুলিলেন। তারপর আপনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া হাস্‌নাহানার মাথা একটা হাঁটুর উপর রাখিয়া ডাকিলেন—"হাসু—বৌমা!" হাসনাহানা কাঁপিয়া উঠিল। মমতা আবার ডাকিলেন -"বৌমা, বৌমা!"

ধীরে ধীরে হাস্‌নাহানার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। মমতা তাহার মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"ভয় কি মা, এখনি সেরে যাবে! ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছি, এসে পড়্‌লেন বলে।"

হাস্‌নাহানার নয়ন-পল্লব ভেদ করিয়া অশ্রুকণা বাহির হইয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে সে মমতার হাত দু'টী নিজের মুখের উপর টানিয়া আনিয়া ডাকিল—"মা?"

মমতা ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন—"এই যে আমি তোমার সামনে বসে' রয়েছি বৌমা?"

হাস্‌নাহানা তাঁহার হাত দুটো টানিয়া নিজের চোখের উপর চাপিয়া ধরিল। অশ্রুর বন্যা যেন তাহার সমস্ত হৃদয় উজাড় করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। মমতা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে ভাবিয়া না পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন—এমন সময় ডাক্তার আসিয়া যেন তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"দেখুন ত ডাক্তার বাবু, রক্তটা কোন মতেই থামছে না কেন?"

ডাক্তার অতি সন্তর্পণে রোগীর শিয়রে বসিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। চোখের পাতাটা ধরিয়া টানিতেই হাস্‌নাহানা চীৎকার করিয়া উঠিল—"আলো! আলো!"

ঘরশুদ্ধ সমস্ত লোক চকিত হইয়া উঠিল। বিহ্বলা বালিকার মত হাস্‌নাহানা চারিদিকে চাহিতে লাগিল। দীর্ঘ ঘুমের অবসানে যেন তাহার মনে জাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছে। ক্ষতস্থানে চাড় লাগায় রক্ত প্রবাহ আরো জোরে বহিতে সুরু করিল, কিন্তু সেদিকে সে লক্ষ্য পর্য্যন্ত করিল না, আনন্দোদ্বেলকণ্ঠে—মা মা, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি বলিয়া মমতার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছিতার মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া মমতা বলিলেন—শীগগীর যা হয় ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু, মাকে আমার যে করেই হ'ক বাঁচাতে হবে। আজ অভাগী তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, কিন্তু আমরা কোন মতেই আমাদের দৃষ্টি হারাতে পারব না, এ আগে থাকতে বলে রাখছি।"

ডাক্তার হাসিলেন। তারপর অতিযত্নে রোগীর মাথার উপর একটা ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া বলিলেন, জীবনের কোন ভয় নেই মা বরং এই আঘাতের ফলে ওঁর একটা অকেজো শির নবজীবন লাভ করে ওঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে এনেছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। নিখিল তখন চিত্রার্পিতের মত সেখানে দাঁড়াইয়াছিল—ধীরে ধীরে আসিয়া মমতার পায়ে নিজের মাথাটা লুটাইয়া দিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা কর মা!"

মমতা তাহাকে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"পাগল ছেলে! তোর ওপর কি রাগ কখন করতে পারি রে! আমি মনে-প্রাণে জানতুম নিখিল মা, আমার ভাল হয়ে উঠবে, নইলে ভগবানের নামই যে লোপ পেয়ে যেত বাবা!"

আকাশ-পটে তখন আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা সুরু হইয়াছে।
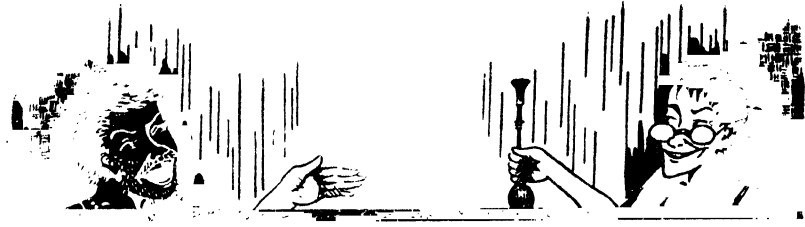
মাসিক-সাহিত্যের গল্প-সমালোচনা

ভারতবর্ষ—আশ্বিন, ১৩৩৮

(১) গণক ঠাকুর—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

একেবারে একটি আষাঢ়ে গল্প। মিষ্ট করিয়া লেখা।

অত্যন্ত মামুলী ধরণের হইলেও পড়িতে বেশ লাগে। ভাষার মধ্যে একটি অনাড়ম্বর সহজ গতি আছে।

(২) লক্ষ্মীর শঙ্খ—
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একাঙ্ক নাটিকা। মেয়েদের ব্রত-কথার উপাদানে গঠিত এই নাটিকাটির আখ্যানবস্তু নর-নারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ করে। ইহার অন্তর্নিহিত রূপক-তত্ত্বটিও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। লিখন-ভঙ্গীও সরল এবং সুন্দর।

(৩) খসবী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতিশয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর গল্প। সমালোচনার অযোগ্য।

(৪) মাতৃবৎসল পাঁচু—
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিকৃত মানবাত্মার বিচিত্র চিত্র। মাতৃবৎসল পাঁচুকে অঙ্কিত করিবার ছলে লেখক-মহাশয় যে satire সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যেমন তীব্র, তেমনি করুণ। গল্পের গঠন-প্রণালীর মধ্যে একটি সহজ নৈপুণ্য এবং অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) কামিনীর অভিসার—
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চমৎকার! সামন্য একটী ঘটনা;—কিন্তু তারই মধ্যে ভাষা এবং লিখন-ভঙ্গী, এই দুই দিক দিয়াই লেখক প্রচুর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র রচনাটির ভিতরে আগাগোড়া যে প্রচ্ছন্ন হাস্যরস বহিয়া গিয়াছে, তাহা অতিশয় মুখরোচক লাগে।

কার্ত্তিক, ১৩৩৮

(১) পাশাপাশি—
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

'অনাদি আর অক্ষয়—ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে টিকিট চেকারের কাজ করে।' 'অক্ষয় নির্ব্বিরোধী মানুষ, শান্তপ্রকৃতি, সাত চড়ে কথা কয় না। আর অনাদি? আছে তো বেশ—একবার খেপিলে রক্ষা নাই।' দুই জনের দুই স্ত্রী—অম্বুজা আর পদ্ম। পাশাপাশি বাস। বন্ধুত্ব নিবিড়। লেখক, অম্বুজা আর পদ্ম, এই দুই সখার দাম্পত্য-জীবনের যে দু'টী বিভিন্ন ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা পড়িতে ভালই লাগে।

(২) দিনের পর দিন—
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নিকটতম আপনজনও যদি চিরটা কাল ধরিয়াই রোগে ভুগিতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহার প্রতি অন্তরের মমতা লুপ্ত হইয়া যায়; মনে হয় মৃত্যু আসিলে শুধু সেই নয়, অনেকেই বাঁচে। মানুষের এ মনোভাব হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু মানবমনের অনেক স্বাভাবিক বৃত্তিকে সাহিত্যে রূপায়িত করা চলে না এবং অচিন্ত্যবাবুর স্বামীটিকেও ঐ পর্য্যায়ে ফেলা চলে। রুগ্না স্ত্রীকে নিজের হাতে মারিয়া ফেলার কামনা,—এ ক্রিমিন্যাল সাইকলজি বুঝি;—কিন্তু সত্যই নিঃসহায়া তাহাকে একদিন থিয়েটারী ধরণে সমুদ্রে ডুবাইয়া

রূপনগর রাজকুমারী।

সিটি পপুলার প্রেসের
সৌজন্যে

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ | পৌষ, ১৩৩৮ | নবম সংখ্যা

—বৈষ্ণব—

শ্রীমুঞ্জরী দেবী

নিত্যানন্দ দাস হালে গুরু উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল। লোকে ভাবিল, এবার সে এক হুলুস্থূল কাণ্ড করিবে। নিত্য মহোৎসব, বৈষ্ণব-সেবা, তাণ্ডব নর্ত্তনে কীর্ত্তন, আরও কত কি! কিন্তু সে তাহাদের কল্পনামত কিছুই করিল না। বরং পূর্ব্বে যাও বা একটু-আধটু ধর্ম্মে আস্থা দেখা যাইত, আজকাল তাহাও লোপ পাইল। অমন যে প্রেমদাস বাবাজীর আখড়া, তাহাতেও সে যায় না। পাষণ্ডটা এমনি দুর্ব্বৃত্ত যে, তিলক-মালা অবধি পরিত্যাগ করিয়াছে।

গৌরচরণ সাতপুরুষে বৈষ্ণব, বড় নিষ্ঠাবান; দিনে অন্ততঃ শতবার নামগান না করিয়া জল-গ্রহণ করে না। নিতায়ের এ ব্যবহার তার কিন্তু সহ্য হইল না। একদিন সে পাষণ্ড-দলনের অভিপ্রায়ে যাত্রা করিল।

গাঁয়ের শেষে ছোট্ট একটী স্রোতস্বতী। ঝির-ঝির করিয়া জল বহিয়া যায়। তাহারই তীরে নিতায়ের পর্ণকুটীর। ফুলে-ফলে চারিদিকটা এমন ভাবে সাজান যে, দূর হইতে দেখিয়া এক-খানি পটে আঁকা ছবি বলিয়াই ভ্রম হয়।

গৌর আসিয়া একেবারে কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়াই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিল—"বষ্টুম হ'য়ে তিলক-মালা ছাড়লি যে?"

নিতাই কথা কহিল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরের ক্রোধ আরও বাড়িয়া চলিল; সে বলিল—"অধিকার পেয়ে যদি নাম নিবি না, তবে জেনে-শুনে ধর্ম্মের অপমান করতে গেলি কেন?"

নিতাই মাথা তুলিয়া মৃদু হাসিল; বলিল—"কাজ কি ভণ্ডামীতে?"

গৌর গম্ভীর হইয়া বলিল—"তোর মতে তিলক-মালা, নাম এসব ভণ্ডামী?"

নিতাই ধীরকণ্ঠে বলিল—"কতকটা তাই বই কি।"

ঠিক্ বোমা ফাটার মত লাফাইয়া উঠিয়া গৌর নিতায়ের ঘাড় ধরিল। জোর করিয়া একটা ঝাঁকানী দিয়া বলিল—"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর, বৈষ্ণব বংশটাকে ভণ্ড বনাতে চাস!"

কিন্তু এ পাষণ্ডটার গায়ে বেজায় জোর।

অবহেলায় ক্রুদ্ধ গৌরের উদ্ধত হস্তটী ধরিয়া সে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে কুটীরের মধ্যে গিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। নির্ব্বিষ সর্পের মত খানিক গর্জ্জিয়া গৌর বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও দেখছি—এ অপমানের শোধ কিসে নিতে পারি!"

সারা বৈষ্ণব-মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। পাষণ্ড-দলনের জন্যই যখন প্রেমময়ের আবির্ভাব, তখন বিদ্রোহীকে ক্ষমা, না, হইতেই পারে না।

প্রেমদাসের আখড়ায় বৈঠক বসিল।

হরিদাস শপথ করিয়া বলিল—"আজ 'ক'দিন ধরে' দেখ্‌ছি বাবাজী, ঝণ্টু খাসীওয়ালার দোকান থেকে ওই পাষণ্ডটা তার বনান জিনিষ হাতে নিয়ে চলেছে। আমার এই মালার শপথ, যদি মিথ্যে বলি!"

মাধব হাতের মালা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"শুধু কাণ্ডটা ওইখানেই শেষ হ'লে ত বাঁচতুম, দেখেছি, ওই সব আবার নিজের হাতে পাক করা হয়।"

তখন কল্পিত-অকল্পিত অনেক অভিযোগই বেচারী নিতায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—জবাফুলের মালা গলায় পোড়া-মাকে প্রণাম হইতে, মত্ততায় মদের বোতলসহ বাটি ফিরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত।

একজন ছুটিয়া গিয়া নিতাইকে ডাকিয়া লইয়া আসিল। সেই অবিনীত লোকটি কিন্তু এতগুলি প্রভুপাদের সম্মুখে আসিয়াও নম্রতায় ভাঙ্গিয়া পড়িল না। এমন কি ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা অঙ্গ, তাহাও ভুলিয়া গেল। কেবল অঞ্জলিবদ্ধ হাত দু'টি কপালে ঠেকাইল, তার এ ব্যবহার অনেকের প্রাণেই ঘা দিল।

প্রেমদাস বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন; বলিলেন—"তোমার সঙ্গে আমাদের একটা বোঝা-পড়া আছে নিতাই।"

অভিযোগ বা অভিযোক্তার সম্বন্ধে নিতাই সমান উদাসীন। স্থির হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রেমদাস বলিতে লাগিলেন—"এঁরা বলছেন বৈষ্ণবের অনাচরণীয় সব কাজই না কি তোমাকে দিয়ে হয়। কি বলবার আছে তোমার এর বিরুদ্ধে?"

নিতাই উপস্থিত বৈষ্ণব-সঙ্ঘের প্রায় সবার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মাথা নাড়া দিল। একজন কর্কশকণ্ঠে বলিল—"দেখ, ও মিনমিনে ডাইন হ'লে চলবে না; এ সভায় দশজনে তোমার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি শুনতে চান।"

বেশ প্রশান্তকণ্ঠেই নিতাই উত্তর দিল—"এরা মিথ্যে বলেন নি।"

এ কথায় এমন কি অভিযোক্তার দলও বিস্মিত নয়নে বক্তার মুখের দিকে চাহিল। প্রেমদাস ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"তা' হ'লে এরপরও সমাজ তোমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখতে পারে কি?"

নিতাই বেশ শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল "না, তা' পারেন না। এরপর আমিও তফাতে থাকবার চেষ্টা করব।"

সে চলিয়া গেল। দলের সকলেই কিন্তু তার এ ব্যবহারে একটা স্পষ্ট অহমিকার ছাপ রহিয়াছে জানিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল।

তিন

বাড়ীর প্রত্যেকটি গাছ নিতায়ের প্রাণ। পুত্রাধিক স্নেহে সে সেগুলিকে পালন করিত। তার যত্নে কোন গাছে কোনদিন একটি মরা পাতা বা মরা ডাল থাকিতে পাইত না। তা' ছাড়া শিকড়ে আলো-হাওয়া পাইলে তারা সতেজ ও সুস্থ থাকে জানিয়া পরিশ্রমে সে কোনদিন কৃপণতা করিত না।

ঘটনার পরদিন প্রাতে উঠিয়া সে দেখিল,—বাগানের সে কি দুর্দ্দশা! মরণ প্রহেলিকায় প্রত্যেক গাছটী চির নিদ্রিত। দেখিয়া হয় ত তার বুকের মাঝে একটা ক্ষোভের ঝড় তাণ্ডব-নর্ত্তন তুলিল, বাহ্যিক কিন্তু তার কোন আঁচও পাওয়া গেল না। মাথা হেঁট করিয়া সে ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

একটা পরিস্ফুট পরিহাস চারিদিক হইতে বুঝি আর্ত্তনাদেরই মত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তথাপি নিতায়ের বাহ্যিক কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

বেলা অবসানে নিতাই সবেমাত্র আহারে বসিয়াছে, কোথা হইতে একজন মুসলমান আসিয়া বলিল—"তোফা কাবাব খেয়ে লও, হামি আপন হাতে পেকিয়েছি।" বলিয়া খানিকটা কি পাতের উপর ঢালিয়া দিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—"আমার চেয়ে ক্ষুধা তোমার নিশ্চয়ই বেশী, বসে' খাও।"

যবন ব্যঙ্গভরে' কহিল—"ঘেন্না হ'ল বুঝি?"

নিতাই শান্তকণ্ঠে বলিল—"না ভাই, ঘেন্না আমায় করতে নেই।"

লোকটী অবাক্-বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিয়া যেন মনোভাব পাঠ করিতে চাহিল, কিন্তু সে প্রশান্ত মুখে কোনপ্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না।

চার

অত্যাচারের ফোয়ারা ছুটিয়া গেলেও সেই শান্ত সমুদ্রে কোন তরঙ্গই উঠিতে দেখা গেল না। কাজেই এতবড় ধৈর্য্যশক্তির নিকট আততায়ী দলের অধৈর্য্য হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই রহিল না।

সেদিন নিতাই কি কাজে বাহিরে চলিয়াছিল। হঠাৎ কে একজন ছুটিয়া আসিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে মাটী ত ফেলিয়া দিল। পতনের আঘাত বড় সামান্য হইল না। ঘণ্টাখানেক পরে চেতনার কোলে ফিরিয়া আসিয়া সে বহুকষ্টে উঠিয়া বসিল। দেখিল,—পাশেই একটা লোক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পতিত।

নিজের কথা আর মনেই রহিল না। টলিতে টলিতে লোকটীর পাশে আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"জল দেব কি দাদা, তেষ্টা পেয়েছে।"

লোকটী মাথা তুলিয়া তার মুখের দিকে চাহিল; পরক্ষণেই সভীতি একটা গোঁয়ানীর শব্দ করিয়া মুখ ফিরাইল। নিতাই ধীর-স্নেহভরাকণ্ঠে বলিল—"ভয় নেই ভাই, আমিও ত মানুষ, আমার বাসা বেশী দূর নয়, যেতে পারবে কি?"

লোকটা তখন ফিরিয়া নিতায়ের মুখের দিকে আর একবার ভাল করিয়া চাহিল, তারপর মাথা নাড়া দিল। মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিতাই বলিল—"কি বলছ?"

আহত লোকটী বলিল—"তোমার বাসা নেই, পুড়িয়ে দিয়েছি।"

তথাপি নিতায়ের মুখভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিল না দেখিয়া, সে আবার বলিল—"এততেও তোমার রাগ হয় না?"

নিতাই হাসিয়া বলিল—"এতে রাগের কি আছে দাদা, ভাঙা আর গড়া এই নিয়েই ত সংসার! আজ গেছে, প্রয়োজন হ'লে আবার কাল হ'তেও ত পারে।"

লোকটী অশ্রুপূর্ণলোচনে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একখানা হাত ঘুরিয়া নিতায়ের পায়ের নিকটে আসিয়া পড়িল; অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিল—'তুমি না মনে করলেও ভগবান মনে করেন; এ আমি প্রাণে প্রাণে বুঝেছি—নইলে একঘণ্টাও তর সইল না, এমন ফল হাতে হাতে পেলুম যে, আর জীবনে উঠতে হবে না। জগা তার চিরদিনের রাগের শোধ আজ লাঠির ঘায়ে নিয়ে গিয়েছে!"

"ছি ভাই, ভগবানের ওপর অমন কথা বলতে নেই! ভয় কি তোমার, সেরে যাবে। কোথায় চোট লেগেছে, বল ত?" বলিয়া নিতাই তাহার সেবায় লাগিয়া গেল।

পাঁচ

সেদিন বাইজি মাতঙ্গিনী ওরফে মাতু তাহার গাছতলার আস্তনায় আসিয়া বলিল— "নাম নিতে পার না বাবাজী, শুধু দশজনের কাছে খোঁটা খেয়ে মর; আমার কাছে যেও, আমি শিখিয়ে দেব।"

কথাটার শেষে একটা শ্লীলতা বহির্ভূত হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল। সে আসা পর্য্যন্ত নিতাই কিন্তু একবারও ঘাড় তুলে নাই। অভিনিবেশসহকারে মাটিতে হারাইয়া যাওয়া কি যেন কিসের সন্ধানে ব্যস্ত ছিল; এখনও সেই অবস্থাতেই মাথাটা দোলাইয়া বলিল—"বেশ।"

সাত দিনের অপেক্ষায়ও মাতু নিতায়ের সে ছোট প্রতিজ্ঞার অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। আট দিনের দিন আবার সে তার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার বেশ একটু জোর দিয়াই বলিল—"রক্ষে করবার ক্ষমতাই যখন হারিয়েছ, তখন হলপ করতে যাও কোন লজ্জায়?"

নিতায়ের ঠোঁটের ফাঁকে বড় মধুর হাসি খেলিয়া গেল; সে ধীরকণ্ঠে বলিল—"সেই জন্যেই ত সবার ঠেলা হ'য়ে আছি।"

মাতু রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, যাহার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলে বড় বড় ধনীরা আপনাকে ধন্য মনে করে, এই দীন ভিক্ষুক তাহাকে উপেক্ষা করিল—কিসের লোভে?

পরদিন আঁধার-আলোকের তীর্থসঙ্গমে হরিনাথ আসিয়া খবর দিল,—কলেরা মাতুবিবির ঘর দখল করিয়া বসিয়াছে। সে নিজে তার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। তাহাকে পড়িতে দেখিয়া সুখের সঙ্গীদলের আর কেহ নাই, পলাইয়াছে। কথাটা কাণে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইল।

উদ্‌ভ্রান্ত হরিহর তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"যাও কোথায়?"

নিতাই হাসিয়া বলিল—"মাতুর ওখানে।"

হরিনাথ অর্থ বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে নিতায়ের মুখের দিকে খানিক চাহিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"সে কি! সে যে পতিত, তার ওপর এই—"

নিতাই হাসিয়া বলিল—"আমি কি কম পতিত হরিনাথ? সেদিন বুঝি তুমি ছিলে না, তাই জান না, আমার নীচতার বিচার হ'য়ে গিয়েছে।"

* * *

নিজের মাথাটা এ অযাচিত লোকটার ক্রোড়ে সযত্নে স্থাপিত দেখিয়া মাতু ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"বাবাজী!"

নিতাই হাসিয়া বলিল—"আজ তোমার নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে এসেছি মাতু- সঙ্গে সঙ্গে আমারও সত্যটা কোনরকমে বজায় রাখ্‌তে।"

মাতু একটু সরিয়া শুইতে চাহিল, নিতাই সযত্নে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলিল - "নড়ো না, ব্যথা পাবে।"

মাতু অধীরকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু, কিন্তু, তোমার ঘেন্না করে না?"

নিতায়ের মুখে আবার দীপ্তিভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল—"ঘেন্না কিসের? আমি যে আজ তোমার কাছে নাম শিখ্‌তে এসেছি।"

মাতু জোর করিয়া নিতায়ের পা দু'টি হাতড়াইয়া খুঁজিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল; বলিল—"আমায় ক্ষমা কর!"

নিতাই ব্যস্তসমস্তভাবে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"ছি, ও কথা বল্‌তে নেই! ক্ষমা সেই একজন ছাড়া আর কেউ কাউকে করতে পারে না! ও কথা আমায় বলে অপরাধী করো না।"

ছয়

সংসারে এখন তারা দু'জন লোকের হাসি-ঠাট্টার মধ্যে বাস করে। মাতু বিরক্ত হয়; অনেক সময় রাগিয়া মাথা ঠুকিতে থাকে, বলে—"এমন ক'রে নিজেকে গোপন করতে, জগতে কেবল একা তুমিই পার। আমায় কিন্তু বাধা দিও না, আমি শুনব না।"

নিতাই হাসিয়া বলিল—"ছি মাতু, এতটুকুতে অধৈর্য্য হ'লে! ভেবে দেখ ত কতবড় দায়ীত্ব তোমার ঘাড়ে।"

মাতু চঞ্চল হইল; বিস্ময়-বিহ্বলকণ্ঠে বলিল—"আমার!"

নিতাই ধীরকণ্ঠে বলিল—"হ্যঁ, তোমার! আমার গুরু হবার ভার নিয়েছ যে!"

মাতু ব্যথা পাইল; ছলছল নয়নে বলিল—"এখনও কি সে প্রতিশোধ নেওয়ার বাকী রেখেছ বাবাজী?"

নিতাই হাসিয়া বলিল—"বাকী সবই, জমিই তৈরী করলে না, ফসল ফলবে কোথায়?"

মাতু কথা কহিতে পারিল না, শুধু ছলছল নয়নে চাহিয়া রহিল। গাঁয়ের একজন শ্লেষভরে বলিয়া গেল—"না;মাঝগাঁয়ে বসে বেউশ্যে নিয়ে এ মাতামাতি সওয়া যায় না—আজই এর একটা বিহিত করতে হবে।"

কথাটা কাণে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাতু বলিল—"ঠাকুর!"

নিতাইয়ের মুখে তেমনি প্রসন্ন হাসি। সে ধীর-গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—"ও কথায় কাণ দিও না। বাইরে কে কোথায় কি বল্‌ছে না বলছে শুনতে গিয়ে আমাদের মায়ে-পোয়ের সুখের সংসার ত আর ভেঙে দিতে পারি না।

মাতু ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাত

পরদিন পঞ্চায়েতের বিচারে নিতাইকে গ্রাম-ত্যাগের আদেশ, অথবা মাতুকে পরিত্যাগ এ দু'য়ের একটা বাছিয়া লইতে বলা হইলে নিতাই মাতুর হাত ধরিয়া বিনা প্রতিবাদে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। ওই নির্লজ্জ দাম্ভিক লোকটার কথা মনে করিতেও যেন সকলের মাথা কাটা যাইতে লাগিল।

গৌরচরণ বলিল—"দেখলে কাণ্ডখানা!"

একজন উত্তর দিল—"মরবার সময় অমন হয়, নইলে দুর্ম্মতি বলবে কেন?"

—পত্র-লেখা—

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[শৈলজানন্দের লেখার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, তিনি তাঁহার উপন্যাসে বীরভূমের গ্রামকে কিরূপ জীবন্ত করিয়া তাঁহার লেখনী তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা 'ষোল আনা', 'মাটির ঘর,' 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী,' 'মাটির রাজা' এবং 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে' প্রভৃতি গল্পের কথাই বলিতেছি।

এই পত্র-লেখায় তাঁহার সেই পল্লী-ভবনের একটি চমৎকার আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। অগ্রহায়ণের পীত-শস্য-শিহরিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর-ভূমি, একখানি দীপালোকিত মাটির ঘর এবং সরল সহৃদয় পল্লী-জীবনে নবান্নের সমারোহ! নিম্নশ্রেণীর বলিষ্ঠ, সুন্দর নরনারীর গ্রাম্য-নৃত্যের অপূর্ব্ব পরিকল্পনা ইহাতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।]

গল্পলহরী সম্পাদক

শীত এখানে বেশ ভালই পড়িয়াছে। গায়ে লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া শুইয়া তোমাকে চিঠি লিখিতেছি! রাত্রি হয়ত তোমাদের শহরে এখনও খুব বেশি হয় নাই, কিন্তু এখানের এই ন'টা রাত্রিকেই আমি যদি গভীর রাত্রি বলি ত' কাহারও কিছু যায়-আসে না; বরং না বলাই অপরাধ। কারণ—নিস্তব্ধ পল্লী, চারিদিক নিঝুম। ঘরে ঘরে খিল বন্ধ করিয়া গ্রামের সকলেই ঘুমাইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্নার আলো, আমার বাড়ীর দরজায় তিনটী কদমগাছের তলায় একটুখানি ছায়া ফেলিয়া বহুদূর মাঠ প্রান্তর পার হইয়া স্রোতহীন শুষ্ক নদীটি অতিক্রম করিয়া ওপারের গ্রাম এবং সবুজ আখের ক্ষেতটিকে পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াছে। চারিদিকে অবিশ্রান্ত একটা একটানা ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনিতেছি। দিবসের কর্ম্মক্লান্ত পৃথিবী যেন একটুখানি বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। ঝিঁঝিঁ পোকা যে একরকম পোকা, এই যে অবিরাম ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ, এ যে তাহাদের পাখার ডাক, সেকথা যেন ভুলিয়া যাই, মনে হয় এ যেন এই, নীরব নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নালোকিত ধরিত্রীর শুভগান, এযেন তাহার অন্তস্থল হইতে উত্থিত হইয়া নিরন্তর উর্দ্ধে উঠিতেছে। আমারও অন্তর যেন তাহাতে যোগ দিতে চায়। সহসা একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ছন্দে আমার প্রার্থনার সুরটিকে আবিষ্কার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছি। কলম যেন আর চলিতে চায় না।

হাতের ঘড়িটা বন্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। কয়টা বাজিয়াছে, কতক্ষণ বসিয়াছিলাম জানি না। দূরের মাঠে শেয়ালের ডাক শুনিয়া চমক ভাঙ্গিল। আমার বাড়ীর সুমুখে ধানের মাঠ। পূজার সময় সবুজ দেখিয়া গিয়াছিলাম, এখন সব হলুদ্ হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতেছিলাম, এই শীতের রাত্রেও চাষীরা ধান কাটিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া বাড়ী লইয়া চলিয়াছে। সমস্ত বৎসরের সঞ্চয়।

ঘরে ঘরে নবান্নের ধূম পড়িয়া গেছে। অন্নের অভাব এখন আর কাহারও ঘরেই নাই। দারিদ্র্যের বিশ্রী বীভৎসতা গ্রাম হইতে যেন কিছু দিনের জন্য বিদায় লইয়াছে। সকলের মুখেই কেমন যেন একটি তৃপ্তির আনন্দ লক্ষ্য করিতেছি। প্রত্যেক গৃহস্থের দরজায় গোবরের

মাদুলির উপর পিটুলির আল্পনা দেওয়া হইয়াছে। ঘরে মা-লক্ষ্মী আসিয়াছেন। এখন আর অতিথিকে বিমুখ করিতে নাই। বাড়ীর কুকুর বিড়ালটীকেও তাড়ানো এখন পাপ।

কাল সন্ধ্যায় গ্রামের ছেলে-ছোকরার দল খুব খানিকটা হৈ হৈ করিয়া তোমার বড় বৌদি'কে ধরিয়া বলিল,—'চার আনা পয়সা চাই। লোটো নাচ হবে।'

লোটো নাচ! সে এক ভারি মজার ব্যাপার! পয়সা দেওয়া হইল। শুনিলাম, একটি টাকা তাহাদের দক্ষিণা, আর দশ সের চাল! বহুদূরের গ্রামের এই নাচের দলটি ঠিক্ এই সময়েই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া-গাহিয়া কিছু চাল-ধান সংগ্রহ করিয়া বৎসরের শেষে বাড়ী ফেরে। রাত্রে নাচ আরম্ভ হইল। ছেলেরা কিছুতেই ছাড়িবে না। আমায় যাইতেই হইবে। আমার জন্য তাহারা কোথায় নাকি একটা চেয়ার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

দেখিলাম, কালীতলার সুমুখে কয়েকটি গায়ের কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া রাত্রের হিম বাঁচাইবার জন্য চাঁদোয়া তৈরি করিয়াছে। চাঁদোয়ার নীচে মাঝখানে নাচের দল এবং তাহাদের ঘিরিয়া তাল-পাতা ও খেজুর পাতার চাটাইএর উপর ষোল আনার ব্রাহ্মণ শূদ্রের পৃথক পৃথক বসিবার ব্যবস্থা। মেয়েরা বসিয়াছে কালীঘরের ভিতরে। আসরের মাঝে এবং চারিদিকে চারটি লণ্ঠন ঝুলানো। নাচ তখনও আরম্ভ হয় নাই। চেয়ার তাহারা আমার জন্য সংগ্রহ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে বসিবার স্পর্দ্ধা আমার হইল না, কোনোরকমে মুড়িসুড়ি দিয়া বকুলগাছের তলায় গিয়া চুপ করিয়া বসিলাম।

নাচ দেখিয়া সত্যই বড় আনন্দ পাইলাম ছোটজাতের মেয়ে হইলেও স্বাস্থ্যবতী জন চার-পাঁচ যুবতী আর জন দুই স্বাস্থ্যবান যুবক, গলায় সাঁওতালদের মত লাল কাঁটির মালা, মাথায় বাবরি চুল, হাতে বাঁশী! মেয়েদের পরনে চওড়া লাল-পাড় মোটা শাড়ী, গায়ে জামা নাই, বুকের উপর একফেরতা কাপড় জড়াইয়া আঁচলটা কোমরে বাঁধিয়াছে, মাথায় সাঁওতালি এলো খোঁপা কানের কাছে ঘুরাইয়া বাঁধা, প্রত্যেকেরই খোঁপার উপর বকুলের কয়েকটি পাতা গোঁজা।

ঝুমুর গাহিয়া গাহিয়া যুবক যুবতী একসঙ্গেই নাচিতে লাগিল। বাঁশী বাজিল, মাদল বাজিল। দেহের সে কি অপরূপ গতিভঙ্গী! উদয়-শঙ্করকেও হার মানায়। নাচিতে নাচিতে মেয়ে-দের বক্ষবাস সরিয়া যায়, সে দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। নাচের নেশায় তখন তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে, কখনও বসিয়া, কখনও দাঁড়াইয়া, হেলিয়া দুলিয়া, কোমরে হাত দিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ চলিয়াছে—

> উলঙ্গিনী শ্যামা মা যে রণে মেতেছে!
> ও তার দাপটে কাঁপলো ধরা,
> মোরা সব ভয়ে সারা,
> ও ভাই বাবা ভোলা
> বোবোম ভোলা
> ধূলাতে শয়ন পেতেছে!

আবার গাহিল—

> সে বছর ভাদ্দ মাসে
> রেখেছিলাম তাল ঘসে
> কোথাকার কুকুর এসে
> এঁটো করে দিলেক তালের মাড়ি গো,
> এঁটো করে দিলেক তালের মাড়ি।

গান শেষ হইলে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে তোমাদের কথাই মনে হইতেছিল তোমাদের যদি দেখাইতে পারিতাম! *

---

* পত্রখানি শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

—হার-জিৎ—

শ্রীঅসিতকুমার সেন, এম-এ, বি-এল

দুই বোনে কথা হচ্ছিল।

লীলা চেয়ারে হেলান দিয়ে শরৎবাবুর 'শেষ-প্রশ্ন' পড়ছে আর বিমলা একটা পশমের মোজা বুনছে। লীলা সুন্দরী, দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। লোকে বলে, চোখ-ঝলসান রূপ। বয়স আঠার-উনিশ। বিমলা তার পিসতুতো বোন্। শ্যামবর্ণ, তবে মুখের বেশ শ্রী। বাপের আদরের মেয়ে ছিল। তিনি সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়েছিলেন। বছর চারেক হ'ল তিন দিনের আড়াআড়িতে বাপ-মা মারা যেতে মামীর কাছে আছে, তাই সর্ব্বদাই যেন 'কিন্তু কিন্তু' ভাব। বয়স ঐ লীলারই মতন।

লীলা হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে বল্‌ল—"দেখ্ ভাই, মা বলছিলেন এই রবিবার অমলবাবুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে, তোকে কিন্তু ভাই এক কাজ করতে হবে।"

বিমলা কাজ করতে কর্‌তে বলল—"কি করতে হবে লো আমাকে? নাচ্‌তে হবে?"

—"না ভাই, অমলবাবু সেদিন আমাকে বলেছিলেন—তাঁর মত এই, মেয়েরা যদি রান্নাবান্না ঘর-সংসার করতে না জানে, তা' হ'লে তারা একেবারে অপদার্থ আর কি। তাঁর মায়ের রান্নার খুব সুখ্যাতি করলেন। তিনি না কি খুব ভাল রাঁধতেন। আমি কথায় কথায় তাঁকে বলে ফেলেছি, আমিও বাড়ীতে রাঁধি। তিনি তাই খুব সুখ্যাতি করলেন।"

—ও বাবা এতদূর গড়িয়েছে!"—বলে বিমলা খিলখিলকরে হেসে উঠল।

লীলা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। বল্‌ল—"না ভাই, তুই ভারী ইয়ে! মাকে সব কথা বলেছি। তিনি বল্লেন—তা বেশ ত খাওয়া না। তোকে কিন্তু ভাই সেদিন বল্‌তে হবে আমিই সব রেঁধেছি, কেমন?"

বিমলা প্রথমে একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। সে বুঝ্‌তেই পারল না এ চাতুরী ক'রে ফল কি। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঠকানো—তারপর ত ধরা পড়বেই, তখন? লীলার ঔৎসুক্যে ও ব্যগ্রতায় শেষে রাজী হ'ল এবং খোঁটা দিতেও ছাড়ল না—"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু একটু সংসার করতে শেখ। দিনরাত প'ড়ে এবং মেয়ে ঠেঙিয়ে ত চল্‌বে না। কার ঘরে পড়বি শেষে।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, তুই শেখাস্ তখন একটু। তবে হাঁ, দিনরাত হাঁড়িঠেলা আমার দ্বারা হবে না, তা'তে বিয়ে হোক্, চাই নাই হোক্, বুঝ্‌লি।"

সেকথা বিমলা বেশ জানে। সেদিন কড়াতে দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে দুধ উথলে উনুন পর্য্যন্ত দিলে নিবিয়ে। বক্‌লে, হাততালি দিয়ে বলেছিল—"ভারী মজা ভাই, কেমন দেখ্‌তে!"

বিমলা প্রশ্ন করল—"অমলবাবুদের অবস্থা কেমন?"

লীলা উত্তর দিল—"বাবার কাছে উনি পড়তেন। দেখেছি ছোটবেলায়। অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। উনি যখন খুব ছোট, তখন ওঁর বাবা মারা যান। মা বেশ শক্তমানুষ ছিলেন। ছেলেও খুব ভাল স্কলার। বি-এসসি পাশ ক'রে—বছর কতক আগে রুড়কীতে গিছলেন পড়তে। তারপর ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে ফিরেছেন।

মাইনে না কি শ'দেড়েক টাকা। মাও মারা গেছেন পাঁচ-ছ' বছর। উনি পরশু ফিরে এসেই মাকে একটা চিঠি লিখেছেন, তাতে সব পড়েছি। বাড়ীতে আর আপনার জন কেউই নেই। এ দিকে চেহারাও বেশ। অবস্থা কিন্তু ওই, মাইনে সম্বল। কিন্তু সত্যি সুখী বল্‌তে গেলে আমাদের পাশের এই মিত্তিররা। সপ্তাহখানেক এসেছে, পাড়া জমজমাট। ছেলেমেয়েদের যেমন চেহারা, পোষাকও তেমনি সুন্দর। দু'দুটো মোটরকার। বাড়ীতে ঝি-চাকর গিস্‌গিস্ করছে। পোষা পাখী জন্তু কত। দুটো বাঁদর আছে, তাদের জন্যেই একটা চাকর। জীবন বলে একে। নইলে আমাদের, রামঃ! বেঁচে আছি কি মরে আছি, অনেক সময় টেরই পাই নে।"

—"ওদের কথা ছেড়ে দে। যার যেমন অবস্থা, তাকে সেরকমই থাক্‌তে হয়। তবে অমলবাবু কি দেড়শ' টাকা মাইনেয় ঝি চাকর, বামুন, মোটর রাখ্‌তে পারবেন তোর জন্যে—তাই ভাব্‌ছি। যাক্ গে, তাই হবে; সেদিন না হয় তোরই রান্নার কথা বল্‌ব। তবে মামীমাকে সাবধান করতে হবে ভাল ক'রে। যে গল্পে–যেটি বারণ করবে বল্‌তে, ঠিক সেটিই বলে' বসে আছেন।"

রবিবার সারা বিকাল বিমলা রান্নাবান্না ক'রে ঘর-দোর বেশ ক'রে সাজিয়ে রাখল। মামীমাও তদারক করলেন সব। তাঁর কথা থেকে বিমলা বুঝল, তাঁর ইচ্ছা অমলবাবুর সঙ্গে লীলার বিবাহ দেন। তাতে বিমলা সুখীই হ'ল। তবুও মনের মধ্যে ঐ মিথ্যার আশ্রয় নেবার কথা মাঝে মাঝে খোঁচা দিচ্ছিল।

বিমলা বরাবরই রাঁধে ভাল। তবুও সেদিন-কার রান্না না কি আরো বহুগুণ ভাল হয়েছে—একথা লীলা খাবার চেখে বারবার বলেছে। লীলা রান্না শিখ্‌তে গিছল,অর্থাৎ, এটা-ওটা নাড়াচাড়া ক'রে একটা কাণ্ড কর্‌ছিল ;তাতে বিমলা তাকে বলেছিল "যা' বাপু, আর বিরক্ত করিস্‌ নে। তার চেয়ে বরং শুয়ে শুয়ে 'রূপসী রণরঙ্গিণী' না কি ছাই-পাঁশ পড়গে যা'।"

সন্ধ্যার আগেই লীলা গা ধুয়ে চমৎকার ক'রে চুলবেঁধে মুখে রুজ্-পাউডার মেখে একটি মেঘ-রঙের সাড়ী পরে বাড়ীর পিছনের ছোট বাগান-টিতে বেড়াতে লাগ্‌ল। বিমলা কাজকর্ম্ম সেরে মুখ ধুয়ে আয়নার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখ্‌ল। পাউডারের তুলি হাতে নিয়ে মুখে মাখাবে হঠাৎ রেখে দিল। মুখ দিয়ে বেরল—"আহা যা ছিরি! কেউ তো ফিরেও চায় না, ও সব মানায় বটে লীলাকে। কী সুন্দর চেহারা, কী চোখ! কী চুলের বাহার! সুন্দরের কেমন আকর্ষণ। সবাই লীলাকে চায়। কেন? রূপেরই ত আদর দেখি—গুণের কদর কি কেউ করে না! তাও বটে, আমার আবার গুণ কি আছে! তবে লীলাকে নিয়ে অমলবাবু কি সুখী হতে পারবেন? ও যেরকম সৌখীন। যাক্ গে, ওসব কথা ভেবে আমার লাভ কি?" বলে' সে আয়নার সাম্‌নে থেকে সরে এল।

সাতটার সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হ'তে বাড়ীর চাকর এসে বললে—কে একজন অমলবাবু ডাক্‌ছেন। লীলা চাকরের সঙ্গে দরজা খুলে দিতে গেল। অমলবাবু! বিমলার বুক:ঢিপ-ঢিপ্ করতে লাগ্‌ল। কেন তা' সে বুঝতে পারল না। আগে তো লীলার কত বন্ধুই এসেছেন, তবে কি সেই প্রবঞ্চনার কথা ভেবে? হ'তে পারে।

খানিক পরে চমক ভাঙ্গতেই চেয়ে দেখে—অমলবাবু দাঁড়িয়ে। লীলা পরিচয় দিল। পলকে প্রণয় কথাটা সে নাটক-নভেলে অনেকবার পড়েছে। শুনে সে হাস্‌ত। কিন্তু তারও কি তাই হ'ল। নয়ন মুগ্ধ—পা নড়তে চায় না। বেশী লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা নেই। অমলের চেহারা এমন কি ভাল। তবুও তার মনে হ'ল বুদ্ধিতে এমন সমুজ্জ্বল সুন্দর চেহারা তো সে আর দেখে নি। লীলা তাকে প্রায়ই বল্‌ত—বিমলার

না কি হৃদয় নেই। কিন্তু এই তো হৃদয় আছে, সেখানে কী যেন তোলপাড় করছে। তার মুখে এক অপূর্ব্ব ভাব ফুটে উঠ্‌ল—অমলের সঙ্গে চোখোচোখী হ'তে সে চোখ নামিয়ে নিল।

মামীমা জিজ্ঞেস করলেন—"বাড়ী খুঁজতে কষ্ট হয় নি তো বাবা?" "না মাসীমা। এতো আর সহর নয়। আমি তো আগে কতবার এসেছি। ভোলা অত সোজা নয়।"

চা খাওয়া হ'লে লীলা গান ধরল। বেশ চমৎকার গায়! তার উপর সময় বুঝে গান ধরে সে গাইল—"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি! রেখেছি কনক-মন্দিরে কমল-আসন পাতি!"

বিমলার মনে হ'ল তার কনক মন্দির নয় বটে, তবে কমলাসন পাতা আছে। কিন্তু কোথায় সে অতিথি!—অমলবাবু!

অমল লীলার গানের খুব তারিফ করল এবং এবার বিমলাকে একটা গান গাইতে অনুরোধ করল। বিমলা মামীর মুখের দিকে চেয়ে একটু থতমত খেয়ে বলল—"মাপ করবেন আমায় অমল-বাবু, আমি গাইতে জানি না।"

রাত সাড়ে আটটার সময় গৃহিণী বললেন—"চল বাবা অমল, এবার খাবে। বিমলা চল, কি সব—"

লীলা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বল্‌ল—"এত রাত ক'রে এলেন যে,আমাদের বাগানটা দেখতে পেলেন না।"

তার মা তখন সাম্‌লে নিয়েছেন—"হাঁ, ওকে আবার তোদের বাগানের কথা বলছিস্। কত দেশবিদেশের বড় বড় বাগান দেখে এল। এস বাবা, দেরী ক'রে লাভ নেই। লীলা অনেক খেটে রেঁধেছে।"

বিমলা লজ্জায় মাথা নীচু না করলে দেখতে পেত অমলের মুখে একটু মন্দমধুর হাসি। অমল বল্‌ল—"বা, এই তো চাই! নইলে জুতো পরে দিনরাত প্রজাপতির মতন বেড়িয়ে বেড়ান—"

লীলার মুখে কি একটা উত্তর আস্‌ছিল, কিন্তু বিমলায় ইসারায় সে বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল। মা আরম্ভ করলেন—"আমাদের লীলা ঐ রকম। হাঁ, ভালবাসে না মোটেই, তবে দু'-একদিন দৈবাৎ যায় বটে, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে।"

—অমল বল্‌লে—"তা' যাবে না কেন, আমি ত একেবারে বারণ করছি না। তবে, ঘর-সংসার দেখা মেয়েদের আগে কর্ত্তব্য।"

মা বললেন—"যাও লীলা, এবার খাবার নিয়ে এস।" লীলা রান্নাঘরের দিকে গেল। বিমলা আসন পেতে জল দিয়ে পাখা হাতে ক'রে দাঁড়াল। তার কাজ তো আজ নেই—মাত্র মিথ্যার সহায়তা করা ছাড়া। নিজেকে গোপন করা—তা সে চির-দিনই ক'রে এসেছে। একবার ভাব্‌লে বিদ্রোহী হই। শেষে ভাবলে,—তা' হ'লে কৃতঘ্নতা করা হয়। মামীর ইচ্ছা—

হঠাৎ শুনতে পেল লীলা চেঁচাচ্ছে—"মা, মা, দেখবে এস কি কাণ্ডকারখানা!"

মা ও বিমলা ছুটলেন। পিছনে পিছনে অমলও হাজির হ'ল। গিয়ে দেখলেন—রান্নাঘরে জিনিষ-পত্র তছ্‌নছ করা রয়েছে। দুধ, জল, তরকারী পোলাও চারিদিকে ছড়ান—সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড! বিমলার কান্না এল। তার এত যত্নের রান্না।—পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে দেখা গেল একটা খাবারও ভাল নেই। তার চোখ জলে ভরে' গেল। অত কষ্ট ক'রে প্রস্তুত খাবার—ঘরে অভুক্ত অতিথি!

লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল, বানরের পায়ের দাগ। মা বললেন—"ঐ রে, আমার দোষেই এমন কাণ্ড ঘটেছে। রান্নাঘরটা বন্ধ ক'রে মনে করলুম, বড় গরমে রয়েছে, একটু বাতাস লাগুক। বলে' দরজাটা খুলেছিলুম, মনে ছিল না বন্ধ করার

কথা। কিন্তু তাই বলে' কি বাঁদর এসে এমন কাণ্ড করবে! আমি এখনি কালুকে পাঠাচ্ছি পুলিশে খবর দিতে। এখন বাছাকে কি খাওয়াই ?"

বিমলা ছলছল চোখে বল্‌ল—"সুজি আছে, লুচি আর মোহনভোগ ক'রে দিই, দাও লীলা। আর ডিমের আমলেট। অমলবাবু দয়া ক'রে তাই যদি খান—"

অমল বল্‌লে—"হাঁ, হাঁ, তাই। আমি আবার আমলেট খুব ভালবাসি।" লীলার দিকে চেয়ে বলল—"তাই দিন।"

লীলা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লে—"ডিম কি আর আছে!"

মা তাকে বাধা দিলেন—"নেই কি রকম? বিমলা কি—এই সকালে দশটা কেনা হয়েছে। খরচ হয়েছে ক'টা ?"

বিমলা বল্‌লে—"তার মধ্যে পাঁচটা তো লীলা রেঁধেছে।"

লীলা বল্‌ল—"হাঁ, হাঁ, আছে বটে। আমার কি মাথার ঠিক আছে, কি কাণ্ড বলুন তো। এখন খাই কি ?"

বিমলা বল্‌লে—"অমলবাবু দয়া যখন করলেন, তখন আর একটু অনুগ্রহ করুন। আমরা ঘরটা পরিষ্কার করে নিই, আপনি মামীমার সঙ্গে গল্প করুন ততক্ষণ। লীলা এই মিনিট পনেরর মধ্যে আপনার আমলেট নিয়ে যাচ্ছে।"

অমল পাশের ঘরে গেলে বিমলা লীলাকে বলল—"তুই এককাজ কর না। ভাব দেখা, যেন তোর বড় কষ্ট হয়েছে, ফিট হবার যোগাড়। আমি আর সব ঠিক ক'রে নেব।"

তাই হ'ল। দুই বোনে ফিরে গিয়ে শুনল অমল গিন্নীকে বল্‌ছে—"আমার মা যা' আমলেট রাঁধ্‌তেন শাকসব্জী দিয়ে। দেখি, আজ লীলা কেমন রাঁধেন।"

লীলা হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে বল্‌লে "আমি—আমি—আর পারব না রাঁধতে। সারাদিন রেঁধে রেঁধে আমার মাথা বড্ড ধরেছে—তার ওপর এই কাণ্ড!"

চমৎকার অভিনয়! তার ভঙ্গী দেখে ও কথা শুনে বিমলা অনেক কষ্টে হাসি সংবরণ করল।

বিমলা বললে—"আচ্ছা বোন্, আমিই না হয় রাঁধব। অমলবাবুর আজ বরাৎ খারাপ, লীলার রান্না খাওয়া হ'ল না। তা' না হয় একটু কষ্ট ক'রে আমার তৈরী খাবারই খাবেন। অমলের মুখের দিকে চাইতেই দেখে যেন তার ঠোঁটে একটু হাসি লেগে রয়েছে। সে বুঝ্‌তে পার্‌ল না।

অমল বলল—"না, না, আমি আর লীলাকে কষ্ট দিতে চাই না। উনি একটু বিশ্রাম করুন। আপনিই দিন ক'রে।"

বিমলা মনে মনে বল্‌ল—হাঁ, তা' কেন দিতে চাইবে। সুন্দরীর কষ্ট কি সহ্য হয়। নিজের ওপর ধিক্কার এল।

হঠাৎ সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হ'ল। চাকর দরজা খুলে দিয়ে একজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে এল। পাশের বাড়ীর মিত্তিরদের একমাত্র ছেলে অমিতাভ। সে এসে বললে—"আমাকে মাপ করবেন। আমরা এই পাশের বাড়ী থাকি। আমি এসেছি আমাদের বাড়ীর হ'য়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে। আমাদের দুটো বানর সন্ধ্যের একটু আগে শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছিল। একটু আগে ফিরে যেতে দেখা গেল, তাদের হাতে মুখে গায়ে নানারকম খাবারের চিহ্ন লেগে। রামসিং বললে—সে না কি দেখেছে তারা আপনাদের বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। তারা যে রকম ভালমানুষ, বামালও পেয়েছি—নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি করেছে আপনাদের। তাই এসেছি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে। মা নিজেই আসছিলেন, তা' আমি বললম—আগে আমি যাই, আলাপ পরিচয়

ক'রে আসি, তারপর। আমাদের মাপ করবেন।"

সুন্দর চেহারা। সুমিষ্ট গলা। সবাই মাপ করল; বল্‌ল—"না তা' আর কি।"

লীলা আগেই বলল—"এমন আর কি হয়েছে। তবে এঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ানো গেল না। বাঁদরের কাণ্ড দেখে হাসি পায়। যা' করেছে।"

বিমলা লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইল। লীলার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই—এত দুঃখেও হাসি পায়! তার মনে হ'ল এ অন্যায়। লীলা যেন অতিথির সম্মান রাখ্‌ল না। মন তার অমলের ওপর সহানুভূতিতে ভরে' গেল।

অমিতাভও রান্নাঘরে গিয়ে ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হ'ল। গৃহিণীর কাছে গিয়ে বল্‌ল—"মা, কি বলব। দয়া ক'রে আজ আমাদের ওখানে চলুন। খাওয়াদাওয়া ওখানেই করতে হবে।" তারপর অমলের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে' বল্‌লে—"আপনাকেও আমাদের ওখানে যেতে হবে। আমি ছাড়ব না। আপনার ওপরই অত্যাচার হয়েছে। মা ও বোনেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের নিয়ে যেতে। বলুন যাবেন?"

লীলা চুপি চুপি মাকে বল্‌ল,—"তাই চল মা। এত ক'রে বল্‌ছেন, না গেলে অন্যায় হবে।"

শুনে বিমলা লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'ল। মামীমা অমলকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিল—"তা' মাসীমা, আপনারা যদি বলেন, তাতে আমার আপত্তি নেই।"

অমিতাভও একবার লীলার মুখের দিকে কৃতজ্ঞভাবে চেয়ে দৌড়াল নিজেদের বাড়ীতে।

লীলা বল্‌ল—"যাই হোক্‌ অমলবাবু, আপনার বরাত ভাল। মিত্তিরদের বাড়ীর ভোজ আমাদের বাড়ীর চেয়ে শতগুণে ভাল হবে।"

অমল গম্ভীরভাবে বলল—"এ মস্ত ভুল ধারণা আপনার। তা' কখনও হ'তেই পারে না।"

সকলে শুনে অবাক হ'য়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল!

পাশের ঘরে গিয়ে গালে আর একটু পাউডার মাখাতে মাখাতে লীলা বল্‌ল—"যা'হোক্‌ বাহাদুরী আছে বাঁদরের। দেখ্‌লি বিমলা, কী সুন্দর চেহারা, যেন এ্যাপোলো!—"

"সুন্দর। অমলবাবুকে তো খুব সুন্দর বলা যায় না"

"আরে ধ্যেৎ! অমলবাবুর কথা কে বল্‌ছে। আমি বলছিলাম—" বিমলার মুখের দিকে চেয়ে কথাটা শেষ কর্‌তে পারল না।

মিত্তিরদের বাড়ীতে গিয়ে খাওয়াদাওয়া হ'ল। বিমলার মামী তো গল্পে মেতে গেলেন। লীলাও বেশ স্ফূর্ত্তিতে গল্প-গুজব করতে লাগল। সে যেন অমলের পাশে আর ঘেঁষছে না। বিমলা প্রথমে মধ্যে মধ্যে কথায় যোগ দিয়েছিল, তারপর উঠে গিয়ে একটা বেশ নিরিবিলি জায়গায় থামের পাশে বসে রইল। গান বাজনা হ'ল। অমলও গাইল। বিমলার মন তখন অমলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় ভরপূর। সে প্রায় সমস্ত ক্ষণই তাকে লক্ষ্য করছিল।

ওদিকে গান-বাজনা চল্‌ছে। অমল এক সময়ে উঠে এসে বিমলার পাশে বস্‌ল। বিমলা ঘাড় হেঁট ক'রে বসে রইল। কিছুক্ষণ কেটে গেল। বিমলা মুখ তুলে অমলের দিকে চাইতেই দেখে অমল যেন হাস্‌ছে। সে কিছুই বুঝতে পারল না। অনেক কষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে প্রশ্ন করল—"আপনি, আপনি, হাস্‌ছেন কেন অমলবাবু?"

"হাসব না। আমার যে বড় হাসি পাচ্ছে।" বলে' সে একটু জোরেই হেসে ফেল্‌ল। তারপর বল্‌ল—"আপনাকে এ ভাবে বড় সুন্দরই দেখাচ্ছে। আপনি বোধ হয় আমার বরাতের কথা ভাব্‌ছেন। কত যত্ন ক'রে রান্নাখাবার না খেয়ে এবাড়ীতে এসে রাজভোগ খাচ্ছি, না?"

"না—হাঁ—তাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম লীলার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—সে কত যত্ন করে রাঁধল আপনার জন্যে। আপনাকে আমি —আমরা কি বলে' যে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা' বুঝতে পাচ্ছি না।" তার গলা ধরে এল।

"হাঁ, তাতো বটেই। তবে দুঃখ আমার বেশী নেই। লীলাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি সত্যি, কিন্তু জানতুম আপনার কথা, শুনেছিলাম সব।"

বিমলা অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চাইল। অমলবাবু কি বল্‌তে চান। অমলের চোখে কি একরকম ভাব। সে বলে চলেছে —"হাঁ, সত্যিই আমি সব জানি। পরশুদিন বেড়াতে বেরিয়ে আপনাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাই। আপনাকে দেখেছি। সেই সময়েই তো লীলার সঙ্গে দেখা। তাঁকে দেখে চিন্‌তে পেরেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। আজও তো বিকালে আপনাদের বাড়ীর ধার দিয়ে গিছলাম। রান্নাঘরে চোখ পড়তেই দেখি—" বলে' সে হেসে ফেল্‌ল।

বিমলা লজ্জায় যেন মরে গেল। তা' হ'লে, তা' হ'লে তো তাদের সব অভিনয়ই ব্যর্থ হয়েছে। সে মুখ তুল্‌তে পারল না। লজ্জায় তার গাল লাল হয়ে উঠ্‌ল। ওদিকে তখন তার কাণের কাছে অমলের স্বর গুণগুণ করে' বলে' চলেছে— "দেখলাম আপনাকে আমার আদর্শ নারীর মত। লীলাকে ভাল লেগেছিল, কিন্তু তাকে ভালবাস্‌তে পারি নি। ওরকম সঙ্গী আমি চাই না। তার যোগ্যও আমি নই। তাকে দেখে বুঝেছি, তার ঐশ্বর্য্য চাই। আমি গরীব। আমার দরকার এমন একজন, যার ওপর ভর দিয়ে আমি একটু বিশ্রাম করতে পারব। যে হবে আমার সখী, আমার মন্ত্রী। আদরে সেবায় যে আমায় ঘিরে থাক্‌বে।"

বিমলা তখন ভাবছিল—ওমা কী লজ্জা! একেতো এই ছিরি, তার উপর রান্না করবার সময় না জানি কেমন ভাবে ছিলাম।

অমল বলে চল্‌ল—"তাই যখন তোমরা বললে লীলাই রান্না করেছে, তখন কত হাসিই পেয়েছিল। তোমার কথা, তোমার ব্যবহার, তোমার বুদ্ধি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি বিমলা!"

বিমলার মন তখন যেন কোথায় গিয়েছে, তার কাণে তখন এক মধুর সুর বাজ্‌ছে। হঠাৎ সে অনুভব করল,—অমল তার হাতের উপর হাত রেখে বল্‌ছে—"তুমি যদি বল, তা' হ'লে আমি এখানে মধ্যে মধ্যে আসি। তোমার রান্না আজ খেতে পেলাম না বলে যে দুঃখ, তা দূর করি। আর বোধ হয় বাঁদর আস্‌বার ভয় থাক্‌বে না, এঁরা নিশ্চয় তাদের ভাল করে বেঁধে রাখ্‌বেন। আস্‌ব কি বিমলা? আর যদি সাহস দাও তো বলি মাসীমাকে। আমি কি তোমার যোগ্য হব না, চুপ করে থাক্‌লে চলবে না, বল, উত্তর দাও?"

বিমলা কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু কার পায়ের শব্দ শোনা গেল, বলা হ'ল না।

—টিউবওয়েল—

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

(দীনেশের কথা)

নয়

খেয়েদেয়ে শান্ত হয়েছি ; এইবার মা, আমাদের আমলাবেড়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোন।

আচ্ছা লোককে আমার সঙ্গে দিয়েছিলে। রমেশকে নিয়ে যে আমাকে কি বিব্রত হ'তে হয়েছিল, সে আর বল্‌বার কথা নয়। গিয়ে উঠ্‌লাম ত মেদিনীপুরে নটবরবাবুর বাড়ীতে। নটবর বাবু একেলা আমাকে দেখে বল্‌লেন—"তাই ত দীনেশ, আমি মনে করেছিলাম, তোমার বাবা-মা আস্‌বেন, বৌমারা আস্‌বেন, তোমরা কয় ভাই-ই আস্‌বে। এই উপলক্ষে কয়েকদিন মহানন্দে কাটাব। তা' নয়, তোমাকে পাঠিয়ে তোমার বাবা নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। আমিও এর শোধ নেব। তোমার বিয়ের সময় আমি দুই পয়সার পোষ্টকার্ড লিখে নিমন্ত্রণ রক্ষা করব। যাক্, এখন সব দেখেশুনে নাও ; যাতে বিয়েটা সুসম্পন্ন হয়, তার ভার তোমাদের উপর দিলাম ; তোমরা যে আমার ঘরের ছেলে।"

শ্রীপতিবাবু আমাকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—"দেখ দীনেশ, এই ঘরটা তোমাদের জন্য রিজার্ভ করে রেখেছি। নানা লোকজনের গোলমালে তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। তুমি আর রমেশ ছাড়া এ ঘরে আর কারও নো এড্‌মিশন। তোমাদের সুটকেশ, বিছানা এই ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

শ্রীপতিবাবুর কথা শুনে আমি ভারী লজ্জিত হলাম ; বল্‌লাম—"আমরা কি আরাম-বিশ্রাম করবার জন্য এসেছি, আমরা কি মহামান্য অতিথি ? আমরা এসেছি খাট্‌তে।"

শ্রীপতিবাবু হেসে বল্‌লেন "সে ত ঠিক কথা। তা' হ'লেও শেষ রাত্রে একটু গড়াগড়ি দেবার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা ভাল, তাই এটুকু ক'রে রেখেছি।"

শুনলাম, বরের বাড়ী এই পাড়াতেই ; বিবাহের লগ্ন রাত্রি সাড়ে ন'টায়। বরযাত্রীর হাঙ্গামা নেই ; যাঁরা বরযাত্রী, তাঁরাই কন্যাযাত্রী। প্রায় চার-পাঁচ শ' লোকের আহারের আয়োজন হয়েছে। বর আসবে রাত আটটার পরে।

যখন শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে আমি কথা বল্‌ছিলাম, সে সময় রমেশ সেখানে ছিল না। আমি দেখ্‌লাম এই সুযোগ। এখনই আমলাবেড়ে যাবার ব্যবস্থার কথা শ্রীপতিবাবুকে না বল্‌লে এরপরে আর হ'য়ে উঠ্‌বে না, বিয়ের দিকেই সকলে যাবেন।

আমি তখন শ্রীপতিবাবুকে বল্‌লাম—"আমার একটা কাজ আপনাকে এখনই ক'রে দিতে হচ্চে, এরপর গোলমালে আর হ'য়ে উঠবে না।"

শ্রীপতিবাবু বল্‌লেন—"এমন কি জরুরী কাজ তোমার পড়ল যে, এখনই না করলে হবে না। কি কাজ বল ত ?"

আমি বল্‌লাম—"কাল খুব ভোরে আমি রমেশকে সঙ্গে নিয়ে তাদের গ্রাম আমলাবেড়ে যেতে চাই। দুই প্রহরের মধ্যেই ফিরে আস্‌ব। শুনেছি, গরুর গাড়ী ছাড়া সেখানে যাবার অন্য উপায় নেই। আপনাকে এখনই একখানি গাড়ী

ঠিক করে দিতে হবে; আমরা শেষ রাত্রিতেই রওনা হব।”

শ্রীপতিবাবু বল্লেন—“তুমি যাবে গরুর গাড়ীতে। কখন ও এ সুন্দর যানে চড়েছ? না, না, ও হবে না। কাল যাওয়াও হবে না, গরুর গাড়ীতেও নয়। পরশু পালকী ঠিক ক'রে দেব, তাইতে যাবে; বিশেষ কষ্ট হ'বে না।”

আমি বল্লাম—“আগে শুনুন আমার কথা। রমেশকে আগে থাক্তে জান্তে দেওয়া হবে না যে, আমি তাদের বাড়ী যাব; তা' হ'লে সে মহা গণ্ডগোল বাধাবে। তাকে সময়কালে জোর ক'রে নিয়ে যাব। সে কি আর পালকীতে যেতে স্বীকার করবে। তাই বাবা-মা গরুর গাড়ীর কথাই বলে' দিয়েছেন। আপনি যে বল্‌ছেন, আমি গরুর গাড়ীতে যেতেই পারব না, সে আপনার মিথ্যা আশঙ্কা। আমি সব পারি। এই যে পাঁচ-ছয় ক্রোশ পথ—এ আমি হেঁটেই যেতে পারি অনায়াসে; তা' হ'লেও সঙ্গে একটা কোন যান থাকা ভাল; আর কিছু জিনিসপত্রও সঙ্গে যাবে, তাই গাড়ীর কথা বল্‌ছি। মা বারবার বলে' দিয়েছেন কালই আমলাবেড়ে যেতে। সেখান থেকে ফিরে এসে আপনাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করব; আপনারা যেদিন ছেড়ে দেবেন, সেইদিন কোল্‌কাতায় যাব।”

শ্রীপতিবাবু বল্লেন—“তাই ত হে দীনেশ, আজ সারারাত্রি পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, বিয়ের ব্যাপার মিট্‌তে যেমন ক'রে হোক্ একটা-দুটো বেজে যাবে। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদেই কি ক'রে যাবে?”

আমি বল্লাম—“সে আমি ঠিক পারব, তার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। এখনই একখানা গাড়ী ঠিক করে দিন; গাড়োয়ান যেন রাত দুটো-তিনটের সময়, এমন কি তারও আগে এসে আমাদের নিয়ে যায়। যত শীঘ্র যেতে পারব, ততই ভাল; ফিরতে বিলম্ব হবে না।

শ্রীপতিবাবু বল্লেন—“তোমার বাবা-মা যখন আদেশ করেছেন, তখন আমি বাধা দেব না, বাবাকেও জানাব না। তিনি একথা শুন্‌লে কিছুতেই যেতে দেবেন না। গাড়ীর জন্য ভাবতে হবে না, আমি এখনই ঠিক্ করে দিচ্ছি। এই মাসখানেক আগে আমাকে একটা কাজের জন্য পলাশপুর যেতে হয়েছিল। সেখানে যেতে গেলে আমলাবেড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। আমাদের হরিশ গাড়োয়ান আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে এখন আমাদের বাড়ীতেই কাজ করছে। তাকে আমি ডেকে এনে বলে দিচ্ছি। তুমি যখন বল্‌বে, তখনই সে গাড়ী নিয়ে এসে তোমাদের নিয়ে যাবে।”

এই বলে' তিনি যেতে উদ্যত হ'লে আমি বল্লাম—“দেখুন, রমেশ যেন কোনরকমে এ কথা আগে থাকতে জান্‌তে না পারে।”

শ্রীপতি বাবু বল্লেন—“সে আমি বুঝেছি। রমেশ অতি গরীব, চাষী গৃহস্থ; তার বাড়ীতে তোমার মত লোককে নিয়ে যেতে সে কিছুতেই স্বীকার হবে না, তা' আমি জানি। তাকে জোর ক'রেই নিয়ে যেতে হবে। এই বলে' তিনি চলে' গেলেন। একটু পরেই হরিশকে নিয়ে তিনি এলেন। হরিশ বল্‌ল—এখানকার কাজ মিটে গেলেই সে গাড়ী আনবে। রাত একটা দুটোর সময় বেরুলে ভোর হ'তে না-হ'তেই সে আমাদের আমলাবেড়ে পৌঁছে দেবে। সোজা রাস্তায় গেলে ছয় ক্রোশই বটে, এখন মাঠে চাষ হচ্চে না, মাঠ দিয়ে গেলে প্রায় এক ক্রোশের বেশী পথ কম হবে।

হরিশকে কিছু অগ্রিম দিতে চাইলাম। শ্রীপতি বাবু বল্লেন—“তার দরকার নেই, সে পরে হবে।”

এদিক ত ঠিক হয়ে গেল; এখন রমেশ কি করে। আমি ঠিক্ করেছিলাম বুঝলে মা, রমেশ যদি নিতান্তই না যায়, তাকে মেদিনীপুরে রেখেই

আমি একেলাই যাব। হরিশ গাড়োয়ান আমলা-বেড়ে চেনে ; রমেশের বাপের নাম ঠাকুরদাস দাস, তাও আমি জানি। আমলা-বেড়ে ত আর কোলকাতা সহর নয় যে, কারও নাম বল্‌লে কেউ চিন্‌বে না, কেমন মা !

মা বল্‌লেন "সে ত ঠিক কথা। সেইজন্যই ত তোকে পাঠিয়ে দিলাম। তারপরে কি শুনি ?"

তারপরে রমেশকে ডেকে বাজার থেকে পাঁচ টাকার মিষ্টান্ন এনে কাপড়-জামা সব দিয়ে বাড়ীর মধ্যে তত্ত্ব পাঠিয়ে দিলাম।

আর যাব কোথায় মা ! দেখি, নটবারবাবু এসে উপস্থিত ! "এসব কি করেছ হে দীনেশ, তোমার বাবা-মা বুঝি এই সব দিয়ে তাঁদের না আসায় লজ্জা ঢাক্‌তে চেয়েছেন ! কাজ ভাল হয় নি বাবা ! তোমরা যে আমার ছেলের মত ! এ যেন কুটুমবাড়ী তত্ত্ব পাঠানো ! তুমি ছেলেমানুষ তোমাকে আর কি বল্‌ব। বিয়ে মিটে যাক্, তারপর তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য আমাকে কোলকাতায় যেতে হবে।"

আমি হেসে বল্‌লাম --"এ যে শাপে বর হ'ল কাকাবাবু। যাক্, এই অপরাধে যে আপনার পায়ের ধুলো আমাদের বাড়ীতে পড়বে সেই আনন্দে আপনার ভর্ৎসনা মাথা পেতে নিলাম।"

—"পাগল ছেলে!" বলে' হাস্‌তে হাস্‌তে নটবরবাবু চলে' গেলেন।

তারপর মা, চা আর জলখাবার যা' এল, তার যদি বর্ণনা দিতে যাই, তা হ'লে তুমি যে মা, তুমিও আমাকে পেটুক বল্‌বে। সে বর্ণনা আর করছি নে। খাবারগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম, যাতে রাত্রিতে আর খেতে না হয় !

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন আর কি, মহাসংগ্রামের বেশ। জামার হাতা গুটিয়ে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে, বিয়ের আসরে নেমে পড়লাম। কাজ যত করি না করি, দৌড়িয়ে চেঁচিয়ে বাড়ীটাকে একেবারে সরগরম ক'রে ফেললাম। নটবরবাবু একবার আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্‌লেন—"এই ত চাই বাবা ! আমার দীনেশ একাই এক সহস্র !" গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠ্‌ল। তখন আরও আগ্রহের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলাম।

সাড়ে আটটার সময় বর এল। মেদিনীপুর সহর হ'লে কি হয়, এখনও পাড়াগাঁয়ের মতই ব্যবস্থা ! শ'খানেক এসিটিলিন আলো, পাঁচ সাতদল বাজনদার, দিশী ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ ! ভাগ্যি বরকে যাত্রার দলের রাজা সাজিয়ে আনে নি, আর তাঞ্জামে চড়ায় নি ! বড় একখানা ফিটন গাড়ীতে বর এল, ধুতি জামা চাদরে।

আরে রাম কহো মা ! বর দেখেই আমি অবাক্ ! আমি মনে করেছিলাম, কে না কে বর ! তা' নয় মা। তুমিও যে তাকে চেন ; আমাদের বাড়ীতে সে কতবার এসেছে। বর হচ্চেন আমায় প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠী কল্যাণকুমার।

মা বল্‌লেন—"তাই না কি, কল্যাণের সঙ্গে শ্রীপতির বোনের বিয়ে হ'ল ! ছেলেটী বেশ। খুব ভাল হয়েছে !

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বল্‌লাম—"কি রে কল্যাণ, তুই বর ! যাক্, এতদিন পরে তোর শালা হ'তে হ'ল !"

কল্যাণ হেসে বল্‌ল—"তুই এখানে কি ক'রে এলি দীনেশ ?"

আমি বল্‌লাম -"তোর শালা হবার জন্য এসেছি। তোর শ্বশুর নটবরবাবু যে আমার কাকাবাবু !" সবাই এ কথা শুনে হেসে উঠ্‌ল !

তারপর যা' করলাম মা, তা' তুমি বিশ্বাস করবে না। সেই রাত ন'টা থেকে একটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিবেশন করে সেই পাঁচ-ছয় শ' লোককে খাইয়ে দিলাম—একটুও বিশ্রাম করি নি। আমার এই পরিশ্রম দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। আর তোমার ছেলে রমেশ কি করেছিলেন, জান মা ! ঘণ্টাখানেক তাকে এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখ্‌লাম, তারপর আর তার পাত্তা নেই। রাত একটার পর এক গ্লাস দই চুমুক দিয়ে আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে দেখি শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র মহাসুখে নিদ্রা দিচ্ছেন। আমি তাকে না ডেকে তার পাশেই শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টাখানেকও যায় নাই, হরিশ গাড়োয়ান এসে ডাক্‌ল -"বাবু উঠুন, রাত দুটো বেজে গিয়েছে।" অমনি লাফিয়ে উঠ্‌লাম।

তারপর আমলাবেড়ে যাবার কাহিনী আজ আর নয় মা, আর এক সময় বল্‌ব। এই বলেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ক্রমশঃ

বাঁশা ও কুঞ্জ—

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

বাঁশের বাঁশী,—দামী কিছু নয়। কিন্তু ঐ বাঁশীই যখন কুঞ্জর মুখে বাজিয়া উঠিত, তখন বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিত না! মন যেন ডানা মেলিতে চায়! ঐ বাঁশীই বুঝি একদিন শ্যামের হাতে ছিলো! বাজাইবার মত বাজাইতে পারিলে,—হয়তো আজো রাধা মেলে!—কুঞ্জও সেকথা জানে।

কুঞ্জ বামুনের ছেলে। রোদে রোদে ঘুরিয়া আসল রংটা ঘুচিয়া গিয়াছিল; নইলে রং তার অমন কালো নয়। কিন্তু কুঞ্জ পাইয়াছিলো দুটি চোখ—ভাসা-ভাসা টানা চোখ! চাহিলে মনে হইত, গোটা পৃথিবীটা সে দেখিতে পাইতেছে!—সদ্‌গোপদের বিধুমুখী একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলো, ইচ্ছা করে চোখ দুটো তোমার গেলে দি!

দুটি-দুটি খাইয়া কুঞ্জ বাঁশী বাজাইয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। মা নাই,—বিমাতা। বাপ অভ্যাস মত দিনান্তে একবার করিয়া বংশধরের জন্য দুঃখ করেন; বলেন বংশের কলঙ্ক!

কুঞ্জ কিন্তু ছেলে ভাল; বিপদ-আপদে কুঞ্জকে নহিলে কাহারও চলিত না। মূর্খ কুঞ্জ,—কিন্তু দরদী কুঞ্জ। হরিমতীর ছেলে হইতে কষ্ট হইত; আর প্রতিবারই শীতের রাত্রে এক ক্রোশ মাঠ ভাঙিয়া এই কুঞ্জই তাহার জন্য দাই ডাকিয়া আনিয়াছে। এই সেদিনো—একদিনের জ্বরে কামিনী যখন ঘরের মধ্যেই মরিয়া রহিল, কেহ ছুঁইল না,—কুঞ্জ একা টানিয়া লইয়া গিয়া নদীর ধারে পোড়াইয়া আসিল।

কুঞ্জকে লইয়া গল্প এইখান হইতেই আরম্ভ :—

কামিনীর না কি জাত নাই!—কুঞ্জ হাসে। দেহের কি আর জাত আছে?

গোল বাধিল। কুঞ্জকে লইয়া নয়—কুঞ্জর বাবাকে লইয়া। হয় প্রায়শ্চিত্ত কর,-নতুবা—

নতুবার প্রয়োজন হইল না। কুঞ্জই ঘর ছাড়িল।

ঘর ছাড়িল;—কিন্তু কুঞ্জ গ্রামেই রহিয়া গেল। কুমোরদের এক ভাঙা আটচালায় পাড়ার ছেলে-বুড়ো সমারোহ করিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া লইল।

কুঞ্জ আটচালা দেখিয়া বলিল, বাঃ—চমৎকার!

সন্ধ্যায় সেই আটচালায় কুমোরদের যাত্রার আখড়া বসে। আর গভীর রাত্রে কুঞ্জর বাঁশী বাজে।

তারপর?—তারপর অভাব কিছুই নাই। মালতী, হরিমতী, চপলা, কুন্দ ডাকিয়া ডাকিয়া আদর করিয়া খাওয়ায়; পান আসে—জল আসে,—

কুঞ্জ হাসে। বলে, আমার জাতজন্ম দেখছি আর রাখলি না তোরা!

—বেশ তো ঠাকুর আর ডাক্‌বো না। কোন বামুন আদর ক'রে খাওয়ায় দেখ্‌বো। বলিয়া কুন্দ ফিক্ করিয়া হাসে।

ডাকে না সত্যি। কিন্তু তাই বলিয়া কি এমন করিয়া বলিতে আছে,—লোকে যে নিন্দা করিবে!

কুন্দ একবার এদিক-ওদিক চায়, তারপর বলে, বামুনের ছেলে বলে বেঁচে গেলে!—মাসী-

মার যে ভক্তি! বলে, আমার ঘরে ঠাকুর অন্ন খাবেন, তাঁকে যেন চেয়ে খেতে না হয়!

কুঞ্জ ভাত মাখে আর হাসে।

বাহিরের ঐ বটতলার সাম্‌নেই আটচালা। একটা মড়া ডাল আট চালার মাথার উপর ঝুঁকিয়া আছে;—একটা ঝড়ের অপেক্ষা! তারপর? তারপর—তারপরেই থাক্। তারপর লইয়া কুঞ্জ কোনদিন মাথা ঘামায়নি।

পান হাতে করিয়া কুঞ্জ গিয়া আটচালায় ওঠে।—

দুপুরের রোদ বৈকালে নামে; বৈকাল গিয়া সন্ধ্যা আসে। কুঞ্জ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে! মাথার উপর মরা ডালে পাতা নাই;—ডাল থাকিয়াও কাজে লাগিল না!—

কুঞ্জ এক মুহূর্ত্ত কি ভাবে। তারপর বাঁশীটী লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়ে।

নদীর ঘাটে কুঞ্জ নাকি বাঁশী বাজায়।—

ঝাঁঝটা তারানাথেরই বেশী!—সে নূতন বিবাহ করিয়াছে। বলে, মুখ ভেঙে দেবো না রাস্কেলের!

কথাটা বিস্তৃত হইল। মুখ ভাঙা আর হয় না। তারানাথকে উল্টা তিরস্কার শুনিতে হয়। বৃদ্ধ রামরূপ ভট্‌চায্‌ জানাইয়া দিলেন, কুঞ্জ সম্বন্ধে তোমরা অন্যায় সন্দেহ ক'রো না; বেচাল দেখলে আমরা তার প্রতিবিধান কর্‌বো। তারপর বিনাইয়া বিনাইয়া বলেন,—বেশী দূর যেতে হবে না,—এই তোমার জেঠাইমার কথাই বলি।—তিনি বলেন, কুঞ্জর মত ছেলে আর হয় না,—মুখ তুলে চাইতে জানে না! আমি হাসি।—বংশ পরিচয়টা কি!—হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কারের পৌত্র! সমাজ নিয়ে কথা; নইলে কামিনীর সৎকারটা তো আর অপরাধ বল্‌তে পারি না।

—ঠিক বলেছো দাদা!—হরিশ চাটুয্যে যেন লাফাইয়া উঠিলেন,—

কুঞ্জর কথা আমিও একবার ক'রে রোজ ভাবি। অমন সাহস—বাপকে একঘরে হ'তে হবে ব'লে এই যে ত্যাগটা কর্‌লে, মুখে যাই কেন না বলি—কুঞ্জর প্রশংসা আমরা শতমুখে কর্‌বো।

—আর রাগ নেই! সমাজই বলি—আর যাই বলি, আমরাই তো তাকে ঘর ছাড়া করেছি। বলিয়া পঞ্চানন বাঁড়ুয্যে হুকায় লম্বা-লম্বা টান দিতে লাগিলেন।

শুনিতে শুনিতে রামরূপের মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, সেদিন কুঞ্জ এসে কি বল্লে জান পঞ্চানন? বল্লে, ঠাকুর্দা, ঠান্‌দিকে এবার আমার কাছেই দাও না কেন? তোমাদের সমাজের বাইরেই আমরা ঘর বাঁধবো!

পঞ্চানন হাসিতে হাসিতে কাসিয়া ফেলিলেন।

রামরূপের চোখে তখন জল দেখা দিয়াছে। বলিলেন, ছোঁড়াটা এত হাসাতে পারে!

•

তারানাথের সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৌটার উপর। বলিল, নদীরঘাটে অতক্ষণ ধ'রে কি হয় শুনি? ঘাটে যাবে—কাপড়টা ডুবুবে আর চলে আসবে, এই তো বুঝি। তা নয়, যত সব ইয়ে—

নূতন বৌ মুখ বুজিয়া শোনে।

এই মৌনতাই তারানাথকে উল্টা বুঝাইয়া দেয়। বলে, ফের্ যদি কুঞ্জর দিকে অমন ক'রে চেয়ে থাক্‌বে—

নূতন বৌ-র সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া ওঠে!

ঘাটে না গিয়াও উপায় নাই।—অথচ নিত্য এই কথা!

আটচালায় 'অভিসারে'র মহলা ভাঙে, কুঞ্জ ঘরে ঢোকে। সেদিন কি যে হইল, মধু খুড়ো কুঞ্জর হাতটা চাপিয়া ধরিল। বলিল, বাবাজি, কেষ্টোর পার্টটা তোমাকে এবার কর্‌তেই হবে। তোমার হ'লো গিয়ে সাধা বাঁশী—

কুঞ্জ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, খুড়ো,—অত খেয়ো না!—যাত্রাদলের বদনাম হবে।

—মাইরি বল্‌ছি তোমার গা ছুঁয়ে,—তুমি ব্রাহ্মণ—

—খাও নি?

—মিথ্যে ব'ল্‌বো না; তুমি ব্রাহ্মণ,- বর্ণের গুরু—

কথাটা এম্নি করিয়া সেদিন চাপা পড়িয়া গেল বটে,—কিন্তু কেহই ভুলিল না। পরদিন আবার কুঞ্জকে লইয়া টানাটানি।

কুঞ্জ বলিল, তোমরা কি পাগল হয়েছো! বামুনের ছেলে, যাত্রা করবো কি গো!

তারানাথ বাঁকিয়া বসিল। 'অভিসার' পালা তাহার বাড়ীতেই হইবে। বলে, কুঞ্জর জন্যেই তো তোমাদের ডাকা। নইলে, মতির দল দুবেলা আস্‌ছে।

তারানাথের এই অদ্ভুত-ইচ্ছার অন্তরালে যে-কথাটি লুকানো ছিলো, তাহা আর কেহই জানিল না বটে; কিন্তু কুঞ্জ সমস্তই বুঝিল।

কুঞ্জর চোখে ঘুম নাই। যাত্রার আখড়া আজ আর বসেনি। কুঞ্জ হাসে—আপন মনেই হাসে, সারারাত্রি ধরিয়াই হাসে। কৃষ্ণ····· অভিসার···

চোখের পাতায় ঘুম আসে, মনে তাহার বাঁশী বাজে।

শুক্লা একাদশীর চাঁদ মাথার উপরে,—ঠিক ভাঙা চালটার উপরেই। কুঞ্জ ধরমর করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসে।—আজ কি ঘুমাইবার রাত্রি! দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া অবারিত জ্যোৎস্না-শুভ্র মাঠের দিকে কুঞ্জ নির্নিমেষে চাহিয়া থাকে! সাধ যায়, ঐ মাঠের উপর দিয়া খালি পায়ে একবার দৌড়াইয়া আসে!

রাস্তার ওপারে—একটা ছোট ঘরে নিধু মণ্ডলের নাক ডাকিতেছে। চোখ বুজিয়া কুঞ্জ তখন ভাবে;—কুঞ্জ আছে ঐ নিধুর পাশে শুয়ে। নাক তো ডাকিবেই! রাত্রি চেয়ে শয্যা মধুর।

কুঞ্জ একবার নিজের শয্যার দিকে চোখ ফিরায়।—বিধবা শুক্লা-রজনী!

মুখ বিকৃত করিয়া কুঞ্জ বিছানাটি একপাশে গুটাইয়া রাখে। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, তারপর ঘণ্টা; ঘণ্টার পর ঘণ্টা···

কতরাত্রি হইল কে জানে! কুঞ্জ ধীরে ধীরে বাঁশীটি তুলিয়া ফুঁ দেয়।

স্তব্ধ রজনীর বুক চিরিয়া যেন একটি অখণ্ড কান্নার সুর ফোঁপাইয়া উঠিয়াছে!

নিধুর ঘরে কুন্দ কান খাড়া করিয়া শোনে।

পায়ের শব্দে বাঁশী কাঁপিয়া ওঠে! কুন্দ আসিয়া সোজা কুঞ্জর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়। বলে, তোমার কি ঘুম নাই?

কুঞ্জ হাসে। তারপর কি মনে করিয়া চম্‌কাইয়া ওঠে! চোখ ঘুরাইয়া বলে, নিধুর নাক-ডাকা থেমে গেল!

কুন্দ থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

—এমন ক'রে ঘর ছেড়ে কি আস্‌তে আছে? চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। বলিয়া কুঞ্জ আবার হাসে।

কুন্দ যেন এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল! ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না—আমি একাই যাচ্ছি।

সকাল বেলায় খুড়ো আসিতেই কুঞ্জ বলিল, কাল সারারাত্রি ঘুমাইনি খুড়ো! তোমাদের কৃষ্ণের একটা ছবি আঁক্‌ছিলাম।

—কই দেখি !

কুঞ্জ হাসিতে লাগিল। বলিল, সে ছবি নয়, —তারানাথের বাড়ীতে যিনি আস্‌বেন।

আনন্দে মধু খুড়ো কুঞ্জর একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, বাঁচালে বাবাজি !

—এবার আমাকে বাঁচাও খুড়ো !

– বল, কি কর্‌তে হবে ?

—কিছু না ;—আমার বাঁশীতে শুধু গজমুখ একটা লাগিয়ে দাও।

আনন্দে মধুখুড়োর সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। বলিল, আজ তবে মহলা –

কুঞ্জ বলিল, কিছু দরকার হবে না, – কেষ্টোর আবার বক্তৃতা কি ! জান না,—কৃষ্ণ হলো বংশীধারী !

তা ঠিক।—একথা দলের কাহারো মনে হয় নি। খুড়ো তারিফ করে আর বলে, তোমার কেষ্টোকে আমি চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি বাবাজি !—কুঞ্জ গলিন্‌মে...

কুঞ্জ হাসে। বলে, তোমাদের বইখানা একবার দিও—পড়ে নেবো।

সত্যই কুঞ্জর কৃষ্ণ দেখিয়া তারানাথও বিস্মিত হইল ! – এ কি অভিনয় ! বাঁশীর সুরে কী সে আকুল আহ্বান !—রাধা—রাধা – রাধা !

তারানাথ চঞ্চল হইয়া ঘর-বাহির করে !

অভিসার পালা শেষ হইল। রামরূপ দুহাত বাড়াইয়া কুঞ্জকে বুকে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, তারানাথ, কুঞ্জকে তোরা আজো চিনিস্‌নি।

তারানাথের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া ওঠে।—

যাত্রা করিয়াও কুঞ্জ হইল ভাল-ছেলে !

ঘরে আসিয়া তারানাথের বক্তৃতা চলে ;— আদার বনে শিয়াল রাঘ্‌ ! বাঁশী শুনেছিলাম বটে, সেবার কোল্‌কাতায় ! অবহেলা ক'রে শিখ্‌লাম না,—নইলে আজ—

নইলে কি হইত - সেকথা ঐখানেই চাপা দিয়া আবার বলে, আমাদের কি আর ও-সব ক'রে বেড়ালে চলে···

স্ত্রী কুমুদিনী নীরবে ঘাড় নাড়ে। তারানাথের মন ইহাতে খুসী হয় না। কুমু কেন বলে না, কুঞ্জর বাঁশী শুনিতে আমার ভাল লাগে না ! কুমু কেন বলে না, কুঞ্জকে দেখিলে আমার পিত্ত জ্বলিয়া যায় !

আর একটি জ্যোৎস্না-পক্ষ।

নদীরঘাটে কুমুদিনী যে-বাঁশী প্রত্যহ শুনিয়া আসে, বহুদিন আগে 'অভিসারে'র শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে-বাঁশী সে একদিন শুনিয়াছিল,—সেই বাঁশী এখন প্রতি-রাত্রে কুমুদিনীর কাণে গুঞ্জরণ করে ! —ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে কি স্বপ্ন দেখে ? কিন্তু সে তো স্পষ্ট দেখিতে পায়,—বন-পথ আলো করিয়া কুঞ্জ তাহারই প্রতীক্ষায় ঐ বকুলতলায় দাঁড়াইয়া !—হাতে তার মোহনীয়া বাঁশী ; মুখে মৃদু-মৃদু হাসি !

দিনের আলোয় গত-রাত্রিকে কুমুদিনীর দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কুঞ্জর সেই অভিসার-বেশ স্মরণ করিয়া দিনের বেলায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া ওঠে ! রাত্রির মাধুর্য্য তার দিনকে বিষাইয়া তোলে !

তারানাথ জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি অসুখ করেছে ?

কুমুদিনী নীরবে ঘাড় নাড়ে।

প্রশ্ন এইখানেই শেষ হয়। কিন্তু কুমুদিনীর মনে প্রশ্নের আর অন্ত নাই। সে-প্রশ্নের উত্তর কে-ই বা দিবে ?

স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সেই স্বপ্ন-

প্রত্যাশায় রাত্রির জাগ্রত-মুহূর্তগুলি যদি তাহার কাটিয়াই থাকে- তবে, দিনের মনকে সে কি বলিয়া বুঝাইবে ?—দুর্গ্রহ ?

সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কুমু স্বামীকে জাগাইয়া রাখিয়া গল্প করিল।

রাত্রি একটি মুহূর্ত্ত নয়,—তারানাথ বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিল।

কুমু আজ ঘুমাইতে চায় না; স্বপ্নকে সে আজ কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না। তাহার মগ্ন-চৈতন্যের উপর কোথাকার কুঞ্জ আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিবে ;—এ অসহ্য নয় বলিয়াই তাহাকে সাবধান হইতে হইবে।

চোখ বুজিয়া কুমু নিজের মনেই প্রশ্ন করে, — আচ্ছা, কুঞ্জ যদি এখন পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া তার মুখ হাত-পা বাঁধিয়া তুলিয়া লইয়া যায় ? কিম্বা—একখানা ছোরা লইয়া—

স্বামীর দিকে চাহিয়া কুমু শিহরিয়া ওঠে! তার পর নিজেই নিজেকে প্রবোধ দেয়,—না, কুঞ্জ ছেলে ভাল ;—কে না প্রশংসা করে!

দূরে অস্পষ্ট বাঁশীর-সুর ভাসিয়া বেড়ায়। কুমু চকিত হইয়া ওঠে! চোখ রগড়াইয়া কুমু বুঝিতে চেষ্টা করে—হ্যাঁ, বাঁশীই – স্বপ্ন নয়!

প্রতি রাত্রের মত আজো তবে বাঁশী বাজিল!

বাঁশীর সুর স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয়। তারপর নিকটে—আরো নিকটে...আমবাগানের ধারে ...জানালার সম্মুখে, ...

কুমু ধরমর করিয়া বিছানা ছাড়িয়া ওঠে।

জানালা খুলিতেই কুঞ্জর সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল।

কুঞ্জ নদীর ঘাট হইতে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে ফিরিতেছে। এই বাঁশীই বুঝি সে প্রতি রাত্রে শোনে,– স্বপ্ন নয়!

কুমু যেন জানালার ধারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে! বাঁশী বাজে ;—কুমুর সোন্নত স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন কুঞ্জর মুখের উপরই গিয়া পথ হারাইয়াছে!

পরদিন সকালে কুঞ্জ আসিয়া তারানাথের অঙ্গনে দাঁড়াইল। ডাকিল, কই-গো খুড়ো!

ঘরের ভিতর কুমুদিনীর তখন সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে!—সেই কুঞ্জ—রাত্রের কুঞ্জ আজ তাহারই বাড়ীর অঙ্গনে!

ছুটিয়া দরজা পর্য্যন্ত আসিতেই কুমু সচকিত হইয়া উঠিল! দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

—আমি গো নতুন খুড়ি,—কুঞ্জ। বলিয়া কুঞ্জ আরো খানিকটা আগাইয়া আসে।

কুমু প্রাণপণ বলে দরজার খিল চাপিয়া ধরে। ক্ষীণ-কম্পিত কণ্ঠকে যথাশক্তি তীক্ষ্ণ করিয়া উত্তর দেয়,—তিনি বাড়ী নেই,—হালদার বাড়ী পুজো করতে গেয়েছেন।

তারানাথ বাড়ী ফিরিতেই কুমু ঝাঁঝাইয়া আসিল,—পাড়ায় কি মানুষ নেই—ঐ কুঞ্জটা ঘাটের ওপর ব'সে বাঁশী বাজাবে—আর পারিনা বাপু,– না হয়, কিছু ধারধোর ক'রে খিড়কি-পুকুরটাই ঝালিয়ে দাও।

তারানাথ বিস্মিত হইলেও খুসী হইল।—তারপর হাতমুখ ধুইয়া তামাক টানিতে টানিতে নীরবে তারানাথ অনেক কথাই ভাবিল।—পুকুর ঝালাইতে একশোর উপর লাগিবে—আর কে-ই বা তাহাকে ধার দিবে! ধার না হয় পাইল,—কিন্তু তার পর ?—শোধ দিবে কি করিয়া ?

—বলি, কি খাচ্ছো!—তামাক কি আর আছে! মরা-পোড়া গন্ধে যে দম বন্ধ হ'য়ে এলো ;—একটু হুঁস নাই! বলিতে বলিতে কুমু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে।

তারানাথ হাসে। বলে, আমি অনেক ভেবে দেখলাম,—ধার-ধোর করাটা কিছু নয়,—বুঝলে ? তার চেয়ে যেমন চলছে তেম্নি চলুক,—কে কোথায় বাঁশী বাজাচ্ছে, আমাদের শুনবার দরকার কি! নিজের মনে যেখানে পাপ নেই, বাজালো বাজালোই বাঁশী!—হাঃ হাঃ হাঃ...

—ফুল—

শ্রীভুবনমোহন মিত্র

এক

জীবনের পূর্ব্বাহ্নের কথা কিছু না জানলেও আপনাদের বেশী কিছু পিছিয়ে থাকতে হবে না, কারণ আমার জীবন বল্‌তে যা' কিছু তা' নারীর হৃদয়-দেবতাকে বরণ ক'রে ঘরে তোলবার পরের, আগের নয়।

বিয়ের সাড়া মনের মধ্যে জেগেছিল অনেক আগেই, কিন্তু গরীব বাপ-মার ঘরের মেয়ে হয়ে সে দুরাশা অন্তরেই মুস্‌ড়ে যাচ্ছিল। বিনাপণে কোনও অনূঢ়াকে নারীত্বে অধিকারী কর্‌বে আমাদের সমাজ আজও এত উদার হয় নি, তা' হোক না সে যতই সুন্দরী।

ধীরে, ধীরে, ধীরে, আমার বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। গরীব বলে' এদিনে আত্মীয়-কুটুম্বের নেহাৎ অভাব হ'ল না। আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরখানি, আমাদেরই অনুরূপ উল্লাস-আনন্দে পরিপূর্ণ হ'ল। আনন্দে কি নিরানন্দে জানি না, আমার প্রাণটা আনচান্ করছিল। গুরু-স্থানীয়াদের আদেশে অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি অঙ্গ যন্ত্রচালিতার মত ক'রে এসেছিলাম, যে উপোস একদিনের জন্য সহ্য করতে পারি না, তা' সেদিন গায়েও লাগ্‌ছিল না।

বর এল। আমাদের বাড়ীখানি ঘন ঘন শঙ্খরোলে মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল, কেন জানি না আমার এই ছোট বুকখানি ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল - আশঙ্কায় না আনন্দে কি জানি!

লগ্ন যখন এগিয়ে এল, পিঁড়েশুদ্ধ আমায় ছানলাতলার দিকে নিয়ে যাচ্ছে- গোল উঠ্‌ল। বিয়ে হবে না। হাতযোড় করা ছাড়া বাবার তো অন্য উপায় ছিল না। তিনি সে ভাবেই বারবার কারণ জিজ্ঞেস্ করতে লাগলেন। জবাব এল এই কি বিয়ের জোগাড়? যেমন মুড়ি-পোড়া ঘর তোমার—তেমনি বিশ্রী আয়োজন!

বাবা হাতে-পায়ে ধরায়, অনেক কাকুতি-মিনতির পর তাঁদের মন হয় তো টল্‌লো, কিন্তু তখনই হাজার টাকার যোগাড় অসম্ভব হওয়ায় বিয়ের ফুল অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল।

বাবা বরকর্ত্তার পা জড়িয়ে ধরে ব'ললেন - দয়া করুন, আমি নিঃস্ব। টাকা থাকলে ছেলে-মেয়েকে দিতে কার অসাধ? লোকটি কঠোর স্বরে বললে—ওসব ভেল অনেক জানা আছে হে, বের করবে বই কি দোপড়া মেয়ে নিয়ে—

কে-একজন এগিয়ে এসে বল্‌লেন—বিয়ে আমি করতে চাই। দোপড়া হয় তো ওদের ছেলেই হবে, আপনার মেয়ে নয়।

কি যে হ'ল খানিক কিছু বুঝতেই পারলুম না। একটা হট্টগোলের মধ্যে দেখলেম, বাবা তাঁর দু'টী হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন, কী যেন বল্‌তে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেছে!

পুরুত ঠাকুর ডেকে বল্‌লেন—আর দেরী কর্‌বেন না, লগ্ন বয়ে যায়, কন্যা সম্প্রদান করুন।

জুড়িয়ে যাওয়া শাঁখ আবার দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠলো।

দুই

উষায় বাড়ার দরজায় স্বামীর মোটার এসে দাঁড়ালো, শাশুড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। কান্নার ভেতর দিয়ে এবার আমার বিদায়-পালা শেষ হ'তে চলল। হায় রে নারী জন্ম!

ফটকওয়ালা একটী বাড়ীতে গাড়ী এসে দাঁড়ালো, প্রকাণ্ড বাড়ীটী শাঁখের আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে। অল্প সময়, কিন্তু দেখলেম নববধূ দেখবার লোকের অভাব মোটেই হয় নি। সহজেই দৃষ্টি একজন পট্টবস্ত্রপরিহিতা প্রৌঢ়াতে আকৃষ্ট হ'ল। সহাস্য বদনে সকলকে অভ্যর্থনা করছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ও আশার্ব্বাদ ভিক্ষাও চল্‌ছিল—আমার বৌ কেমন দেখলে গো? তোমরা পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন সুখী হয়।

খানিক পরে আমার নূতন পাওয়া মা আমায় এক নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে গেলেন, সহস্র চোখের সামনে থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আমি আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

শাশুড়ী তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন—ও রে শোন, বিয়েটা তো কেউ জানলে না, বৌভাতের ব্যবস্থাটা কিছু ঘটা করেই করতে হবে। কা'কে কা'কে নেমন্তন্ন করবি একটা ফর্দ্দ ক'রে আন, দেখিস্ বাদ যেন কেউ না পড়ে।

উনি আড়চোখে আমার দিকে একবার চেয়ে চলে গেলেন। মা কাছে এসে বললেন—অমন আড়ষ্ট হয়ে বসে' কেন মা, আমার কাছে বাপু লজ্জাটজ্জা করা চলবে না, ভারি বকব। রমু আমার এক ছেলে, তুমি যে তার বৌ।

আর বল্‌তে পারলেন না। আমাকে দুই বাহুর মধ্যে নিয়ে বুকে চেপে ধর্‌লেন। কী যে করবো বুঝতেই পারলুম না। তিনি ছেড়ে দিলে, পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লুম--হয় তো অশ্রুজলে পা দু'টি ভিজিয়ে দিয়েছিলেম। অতি যত্নে তিনি তুলে ধরে' আবার বুকে নিলেন।

তিন

ফুল শয্যা! মা আমায় নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন—দেখ মা পছন্দ হ'লত? আমরা সেকেলে বুড়ো-হাবড়া মানুষ।

এমন লজ্জা হ'ল; হেঁট হয়ে প্রণাম করা ছাড়া কিছু জবাবই দিতে পারলুম না। হঠাৎ আয়নায় গায়ের গয়নাগুলো ঝক্‌ঝক্ ক'রে জ্বলে উঠলো। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম—এ কি সেই আমি! শাশুড়ী বারবার আমার মুখখানি নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখে বললেন—এতদিন পরে আমার মা--আবার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এল।

অর্দ্ধেক রাত্রে বাড়ীর গোলমাল কমলে মা বল্‌লেন যাও মা শুতে যাও, বেশী রাত্তির হ'লে অসুখ করবে। প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে তাঁর আদেশ পালন করতে চললুম। ঘরে গিয়ে দেখি সমস্ত বিছানা ফুলে ফুল। জান্‌লা দিয়ে জোৎস্নার রজত ধারা তার ওপর লুটিয়ে পড়েছে ঔজ্জ্বল্যে, স্নিগ্ধতায়! আনন্দে ভরপূর হয়ে ঘরখানি যেন ডেকে বল্‌ছে—এই তোর স্বর্গ আর ওই স্বর্গের দেবতা!

স্বামী অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলেন। আমি যে এসেছি, তা' জানতেও পারেন নি। চুড়ির আওয়াজে তিনি ফিরে চাইলেন। আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেলুম। উনি হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন—এস। মন্থর গতিতে এগিয়ে গেলাম। জোছনার শুভ্র আলোক হয় তো মুখের উপর পড়েছিল। উনি খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে প্রথম প্রণয়ের চিহ্ন আমার কপোলে এঁকে দিলেন, আমি সুখের আবেগে লুটিয়ে পড়লুম, সে দিনের পুলক শিহরণ আজও ভুল্‌তে পারি নি! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙ্গতেই চেয়ে দেখি আমি তাঁর বাহু দুইটীর ভিতর শুয়ে আছি। আমি তাঁর হাত অতি সন্তর্পণে নাবিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চার

দুদিনের আনন্দ ভবন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। একে একে সবাই চলে গেছেন। শাশুড়ী বল্‌লেন—মা তুমি এবার একলা পড়েছ, বড় কষ্ট হচ্ছে নয়? তা' বাছা তোমার এই বুড়ো মা ছাড়া

এখানে তো সমজুটী কেউ নেই, কি আর করবে বল? আমার কিন্তু খুব সুবিধে, যতদিন বাঁচি, ছোট্ট মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব ক'রে দিন কাটিয়ে দেব।

উনি এই সময় ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকতেই মা বললেন—"হাঁরে রমু, তুই নাকি মফঃস্বলে যাবি? কতদিন সেখানে থাকবি, বেশী দেরী করিস্‌নে বাপ।

উনি বল্‌লেন—ঠিক বোল্‌তে পারি না মা, যা' কাজ পনের দিনে মিটলে হয়।

শাশুড়ি বললেন—বলিস্ কিরে এতদিন? না বাপু, সেখানে গেলে একেবারে আধখানা হ'য়ে যাস্। থাকা হবে না।

উনি হেসে বললেন কাজ গুলোত করতে হবে। শাশুড়ি বললেন—তা'হ'লে আমিও তোর সঙ্গে যাব। কবে যাবি?

কাল।

শাশুড়ি সবিস্ময়ে বলিলেন—কাল, এত তাড়াতাড়ি! তবে বৌমাকে, তুই সঙ্গে ক'রে আজই একবার নিয়ে যা'। কতদিন মা-বাপ ছাড়া থাক্‌বে—একবার দেখা ক'রে আসুক।

বলা বাহুল্য, তাঁর এ ব্যবস্থায় কোন পক্ষই অসন্তুষ্ট হ'ল না।

পাঁচ

আজ আমাদের যাওয়ার দিন। সকাল থেকে সমস্ত জিনিষ পত্র বাঁধাবাধি আরম্ভ হ'য়ে গেছে। আমি ওঁর যা'যা' দরকার ট্রাঙ্কে গুছিয়ে রাখ ছি। এমন সময়ে উনি এসে বললেন—কি গো, গুছোন হ'চ্ছে? ওঃ, ঘেমে গেছ যে! একটু জিরিয়ে নাও। বোলে আমায় টেনে নিয়ে—আমি বললেম—আঃ, কি করো, দরজা খোলা রয়েছে না!

উনি একটু হেসে আমায় ছেড়ে দিলেন। আবার আমি আমার কাজ কর্‌তে লাগলুম।

উনি বললেন—ওই কাপড়গুলো বুঝি মায়ের? আচ্ছা দাঁড়াও, ওই ট্রাঙ্কে আমি মায়ের কাপড় গুছিয়ে দিচ্ছি। ব'লে তিনি কাপড়গুলো গুছুতে লাগলেন।

আমি হেসে বললুম—থাক্, আর গুছুতে হবে না, যা' গোছাবার ছিরি!

উনি গাম্ভীর্য্যের ভাণ ক'রে বললেন—বটে! আমার গোছান ভাল হচ্ছে না? দেখ সাবধান, অমন কথা বললে তোমার মহাপাপ হবে! জান না স্বামী—

আমি হেসে বললুম—ঢের হয়েছে পণ্ডিতমশায় ঢের হয়েছে। তোমার শাস্তর রেখে একবার উঠে পড় দেখি।

উনি বল্‌লেন—না! শাস্তর যখন মান না তখন তোমার দেখচি আর নিস্তার নেই।

এই সময় শাশুড়ী হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললেন—নিস্তার নেই, কেন রে রমু?

উনি মাথা চুল্‌কুতে চুল্‌কুতে বল্‌লেন—আমি তোমার বৌকে বল্‌চি যে, যেখানে যাচ্ছ সেখানে বড় ম্যালেরিয়ার ভয়, তাই কুইনাইনের পিল নিতে, না নিলে কারও নিস্তার নেই।

আমি আর হাসি চাপতে না পেরে মুখে কাপড় দিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচলাম। ধন্য লোক যা' হোক!

শাশুড়ী কিন্তু ডেকে বললেন—কৈ গো মা, এখন ফেলে রাখছ, কখন গুছিয়ে তুলবে?

আমি ঘরে এসে দেখি কোন ফাঁকে উনি সরে পড়েছেন।

শাশুড়ি বল্‌লেন—বৌমা, আমার কাপড়গুলো কে গুছিয়েছে? রমু বুঝি? ওর ছেলেমানুষী আর গেল না। যেমন আমার পাগলা বাবা, তেমনি হয়েছে আমার পাগলী মা, মিলেছে ভাল! বলে' হাস্‌তে লাগলেন। আমার গুছুনো শেষ হয়ে এল।

চাকরদের হাঁক-ডাকে শাশুড়ী চলে' গেছ্‌লেন। চোরের মত উনি ঘরে ঢুকে বললেন—

—কি গো, কুইনাইনের পিল নিয়েছো তো ? ওটি নিতে ভুলো না।

আমি হেসে বল্‌লুম -নিয়েছি।

ছয়

ভোরে আমরা নামলাম।

শাশুড়ী বললেন—রমু, এখানে আমি চান-আহ্নিক সেরে নেবো বাবা।

উনি উত্তর দিলেন—তার আর কি। আর ট্রেণ ফেল হওয়ার তো ভয় নেই।

আমার শাশুড়ী আমায় ডেকে নিলেন। স্নানের পর চায়ের পর্ব্ব। আপত্তি তুললে, উনি বললেন—কাল রাত্রে তেমন তো ঘুম হয় নি, খেয়ে নাও।

শেষে শাশুড়ীরও অনুরোধ—কাজেই খেতে হ'ল। বোটে নদী পার হচ্ছিলেম, কী সুন্দর বোটটি, যেন একখানি ছোটখাট বাড়ী! দু'পাশের বনকে পিছিয়ে রেখে দুরন্ত ছেলের মত নদীর বুকের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। পাঁচ-ছয় ঘণ্টার ভেতর আমরা গন্তব্যস্থানে এসে পড়লুম। আমাদের সম্মানের জন্য কত আয়োজন—রাস্তা লতায় পাতায় সাজান! দু'ধারে সবুজ মখমলের মাঠ, মাঝে শুরকী ঢালা পথ।

বাড়ীতে এলুম। বাসা ত নয়, যেন একখানি প্রাসাদ। চারিদিকে ফুলের বাগান—ফুলে ফুলে ছেয়ে রেখে দিয়েছে। আমার পক্ষে এ যেন স্বর্গ-পুরী। ছিলাম গরীবের মেয়ে, হ'লাম জমীদারের স্ত্রী—এ ভাগ্যের কি তুলনা আছে!

বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, শাশুড়ী দূর থেকে বকলেন—পাগলী কোথাকার—আস্‌তে না আস্‌তেই বাগানে ছুটোছুটি! যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে!

তারপর তিনি কাছে এসে হাসতে হাসতে বললেন—চুপ ক'রে বস', রোদ্দুরে ঘুরো না। এখানে একটু সাবধানে থেকো বাছা।

একটি পনের-ষোল বছরের মেয়ে এসে ডাক্‌ল—জ্যাঠাইমা।

শাশুড়ী চম্‌কে ফিরে বললেন—কে রে উমি এলি ?

চেয়ে দেখলাম একটী বালবিধবা। সুন্দর চোখ-মুখ, সরলতায় যেন মাখান। জীবন-প্রভাতেই তার সকল আশা-প্রদীপ নিবে গেছে!

উমা জিজ্ঞেস্ করলে—ওখানে বসে' কে গো জ্যাঠাইমা, বৌ বুঝি ? রসো, আলাপ ক'রে আসি। একদিনেই সে একেবারে আমায় আপনার ক'রে নিলে।

স্বামী এলে জিজ্ঞেস্ করলে—ভাল আছ দাদা ?

উনি বললেন—হ্যাঁ, তোরা কেমন আছিস্ ?

সে উত্তর দিলে—ভাল।

উমা আমায় বললে—আমি এখন আসি ভাই বৌদি', বেলা হ'য়ে গেল।

আমি বললুম—এস, বিকেলে আসবে তো ?

সে হেসে বললে—বিকেলে হবে না, দুপুরে আবার আস্‌ব। বলে সে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে' গেল। সত্যি, মেয়েটিকে আমার এত ভাল লাগলো!

আমি ওঁকে জিজ্ঞেস্ করলুম—হ্যাঁ গো, ও মেয়েটির কে কে আছেন ? কতদিন বিধবা হয়েছে ?

স্বামী বললেন—বুড়ো বাপ ছাড়া ও মেয়েটির আর কেউ নেই। মা দু' বছরের মেয়েটিকে রেখে মারা যান। বাপ ছেলেবেলাই ওর বিয়ে দেন। দশ বছরের মেয়ে-ছেলে ষোল। ঠিক যেন পুতুল খেলা। এক বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই ওর স্বামী মারা গেল। ব্যাচারী সুখের মুখ জীবনে দেখে নি।

আমার বুকটা ব্যথায় টন্‌টন্ ক'রে উঠলো।

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। হায় রে হিন্দু-ঘরের বালবিধবা!

সাত

ক'দিন ফুল আসে নি—বাগানের ফোটা ফুলের মাঝে বেড়াতে বেড়াতে আমরা দু'জনে ফুল পাতিয়ে ছিলাম। ওঁকে জিজ্ঞেস্ করলুম—হ্যাঁ গা, ফুল আসছে না কেন বল্‌তে পার?

উনি বললেন—তার বাপের যে বড় অসুখ, ডবল নিমোনিয়া।

শাশুড়ী শুনে বললেন—ডাক্তার দেখছে তো? তুই ভাল ডাক্তার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা রমু। গরীব বলে' চিকিৎসা অভাবে যেন মারা না যান।

উনি চলে গেলেন। শাশুড়ীকে ধরে' বল্‌লাম—একবার আমি গিয়ে দেখে আসবো মা?

তিনি বললেন—বেশ তো বিকেলে আমার সঙ্গে যেও।

রোগীর অবস্থা দেখে শাশুড়ী থাকতে পারলেন না। ওঁকে ডেকে বললেন—একটা বড় ডাক্তারের কথা কোল্‌কাতায় লিখে দে, যেন দু'-তিনদিনের মধ্যে আসে; আর রোগীকে পাল্কীতে ক'রে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে চ'।

পাল্কী পৌঁছল। চার-পাঁচজন চাকরে ধরাধরি ক'রে রোগীকে আমাদের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এল। ফুল কেঁদেই আকুল। তাকে সান্ত্বনা দেব কি, আমিও তার সঙ্গে কাঁদতে বসে' গেলুম।

ডাক্তার দেখে গেলে পর আমি ওঁকে আড়ালে ধরে' বল্‌লাম—হ্যাঁ গা, বাঁচ্‌বেন ত?

উনি বললেন—কি জানি, ডাক্তার ত আজ খুব সাবধানে রাখতে বলে' গেলেন।

রাত্রে রোগী ভুল বকতে সুরু করলেন। শাশুড়ী শিয়রে ছিলেন। আমি পায়ের তলায় বসে' হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। ফুলের দু'টি গণ্ড চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল। হঠাৎ রোগীর যেন চমক হ'ল; বলে' উঠ্‌লেন—কই রমু, বাবা কই?

উনি তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে বসলেন—কেন যতীশ কাকা?

রোগী একখানি হাত তাঁর হাতে রেখে, আর একখানি দিয়ে কী যেন হাতড়াতে লাগ্‌লেন। তারপর ফুলের হাতখানি ধরে' ওঁর হাতের ওপর দিয়ে কি বল্‌লেন—বোঝবার আগেই সব শেষ হয়ে গেল!

তিনি শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। ফুল আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠ্‌ল।

আট

কারও আর ভাল লাগ্‌ছিল না, তাই ফিরে যাওয়ার উদ্‌যোগ-আয়োজন চল্‌তে লাগলো।

আমি শাশুড়ীকে বললাম—মা, ফুল—

শাশুড়ী বললেন—ওকে আমাদের সঙ্গেই নিয়ে যেতে হবে মা। ছেলেমানুষ কে আছে, কার কাছে থাক্‌বে।

ফুলকে জিজ্ঞেস করলুম—কোলকাতায় কখনও গেছ্‌লে ভাই?

সে বললে—একবার গেছ্‌লুম বাবার সঙ্গে, সে অনেকদিন আগে।

কথাটা বলতে তার চোখ ভেঙ্গে এল, তাড়াতাড়ি আমি অন্য কথা পাড়লুম।

চললুম এখান থেকে। যেতে বড় মায়া হ'চ্ছে—কেমন সুন্দর এই বাগানটি! বারান্দায় বসলে ফুলের গন্ধে প্রায় যেন মাতিয়ে দেয়—আর কোলকাতায় কেবল বাড়ী, গাড়ী, আর ধোঁয়া।

শাশুড়ীর ডাকে ফুল চলে গেছ্‌ল। উনি যে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন, টেরও পাই নি। হঠাৎ বললেন—যাও, কী মানুষ, একটু লজ্জা-সরমও নেই!

উনি বললেন—কি দেখছিলে?

প্রকৃতির শোভা!

উনি হেসে বল্লেন—তা' ঢের। কিন্তু মশার ভ্যানভ্যানানি—আর ম্যালেরিয়ার প্রেমও খুব। লোকগুলোর যেমনি শ্রী—হাড় জিরজিরে, পেট জয়ঢাক।

আমি বললাম—বেশ তো, ওদের কিছু করা তো তোমারি হাত। পুকুর, নর্দ্দমা, রাস্তা সব পরিষ্কার করিয়ে দাও না। ওদের কষ্ট হয়, ওরাও তো মানুষ।

উনি হেসে বললেন—যো হুকুম, মহারাণীর যখন আদেশ হয়েছে।

উনি হাসতে হাসতে গিয়ে শাশুড়ীকে লাগালেন। সব শুনে শাশুড়ী স্নেহভরে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন—তা' বেশ তো, দরিদ্র প্রজাদের দুঃখে জমিদারেরই তো প্রাণ কাঁদা উচিত—ওরা যে তোদেরই সন্তান।

আমার দিকে চেয়ে বললেন—পুরুষ যদি ভুল করে মা, এমনি করেই তাকে কর্ত্তব্য-পথে চালিয়ে নিও। আশীর্ব্বাদ করছি—এই আদর্শ সংসার পথে যেন অক্ষয় হয়!

তাড়াতাড়ি স্নেহময়ী শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম—তা' ছাড়া করবা'র মত আর কিই বা ছিল!

নয়

ছয়-সাত দিন হ'ল আমার শাশুড়ীর শরীর ভাল নেই। উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘোরে। ওযুধ-পথ্য আমি ছাড়া কেউ দিলে খান না। বলেন—যে ক'দিন আছি, মায়ের সেবা নিয়ে নি। বৌ তো নয়, যেন মা!

উনি ডাক্তার নিয়ে এলেন। পাশের ঘর থেকে ওঁদের কথাবার্ত্তা শোনবার চেষ্টা করলাম; ইংরাজীতে—কাজেই বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার চলে' গেলে আমি ঘরে এলাম। উনি বলছিলেন—আমি তো তোমায় চেঞ্জেই যেতে বলেছিলাম মা, তুমি রাজি হ'লে না, কিন্তু এখন?

মা বললেন—চ' তবে যাই; কিন্তু কাশীতে নিয়ে যাস বাবা। শেষ সময়ে হাড় ক'খানা বিশ্বনাথের দরবারে যেন পড়ে।

ফুল এসে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তার এসেছিল, কি বলে' গেল দাদা?

উনি বললেন—মাকে চেঞ্জে নিয়ে যেতে বলেছেন।

শাশুড়ী আমায় ডেকে বললেন—মাথাটা ধরেছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো মা।

কিন্তু একটু দিতে-না-দিতেই বললেন—থাক্ মা, কষ্ট হচ্ছে, আর দিতে হবে না।

এমন শাশুড়ী বহু তপস্যায় পেয়েছিলেম। কন্যার স্নেহ, বধূর আদর যত্ন একাধারে অর্পণ করেও যেন তিনি তৃপ্ত হ'তেন না—বলতেন—লোকে বৌকাঁট্কী কি ক'রে হয়, একবার হয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। পেটের মেয়ের সঙ্গে বৌ কি ভিন্ন, বরং বেশী—এ যে ছেলে দিয়ে কেনা।

উনি নালিশ করতেন—দেখ তো মা, তোমার বৌয়ের কাণ্ড, শুধু শুধু আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।

তিনি হাসতেন। বলতেন—দূর পাগলা ছেলে! হিংসুটে কোথাকার! তুই-ই ত ঝগড়াটে!

কাশীতে এলাম। প্রথমটা স্থান পরিবর্ত্তনের জন্যই হোক্, অথবা বিশ্বনাথের করুণাতেই হোক্ কিম্বা শাশুড়ীর অন্তরের উৎসাহতেই হোক্ একটু সুরাহা বোঝা গেল।

শাশুড়ী বললেন—কাশীতে এলুম, কিন্তু বিশ্বনাথের দর্শন পেলুম না।

উনি বললেন—ভাল হও মা, এ আর বেশী কথা কি, গেলেই হবে একদিন।

শাশুড়ী বললেন—আর ভাল হয়েছি।

সে হতাশার সুরে আমার চোখ উপছে জল বেরিয়ে এল—থামিয়ে রাখতে পারলাম না। লুকিয়ে চোখ মুছছি, মা বললেন—ওই রে, পাগলী বেটী কেঁদে ফেলেছে! তাও বলি, রোগীর সঙ্গে কি

রোগী হয়েই থাকবে। মাকে একদিন বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে নিয়ে আয় না।

আমি মৃদু আপত্তি তুলেছিলাম, কিন্তু তিনি শুনলেন না।

উনি, আমি, আর ফুল গেলাম। শুনেছি রাজার দ্বারে শুধু হাতে যেতে নেই, উপঢৌকন কিছু নিয়ে যেতে হয়—তাই বুঝি বিশ্বনাথ আমাদের বেদনাতুর অন্তর চেয়ে নিলেন।

বিশ্বনিয়ন্তার পাশে অনেক কিছু প্রার্থনা রেখে হালকা বুকে ফিরে এলুম। ঘরে ঢুকতে মা বললেন – দর্শন হ'ল ? ভিড় হয়েছিল ?

বললুম – হ্যাঁ মা, তোমার জন্য প্রসাদ এনেছি।

পরম আগ্রহে তিনি প্রসাদ নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন—আঃ, বাচলুম !

আমার মনে হ'ল এইবার মা নিশ্চয় সেরে উঠবেন ! কিন্তু ঠিক তার উল্‌টো হয়ে গেল। মা আরোগ্যের পথে না গিয়ে অন্য পথ নিলেন। যমে মানুষে টানাটানি—আর বুঝি ধরে' রাখা যায় না !

সেদিন রাত্রে মা আমায় ডেকে কাছে বসালেন ; বল্‌লেন—আজ মনটা কেমন ভাল লাগছে না মা, এস গল্প করি।

কত কথাই তিনি বললেন, তার মধ্যে কত উপদেশ, কত আশীর্ব্বাদ, কত সংসারের খুঁটিনাটির কথা – কথা বুঝি আর শেষ হ'তে চায় না !

উনি বললেন—রোগামানুষকে এত বকাচ্ছ, কি তুমি !

মা বললেন—মায়ের সঙ্গে শেষ দু'-চারটা কথা কয়ে নিই বাবা ! বাধা দিস্‌নে, কাল তো আর কইতে আসবো না !

তিনি তাঁর কথা রাখলেন—কিন্তু বিশ্বনাথ !—

দশ

শুনেছি বিপদ একা আসে না ; অন্ততঃ, আমার ভাগ্যে ঘটল তাই। কোলকাতায় ফিরে এসে দেখলাম মার অসুখ, একেবারে পাত হয়ে গিয়েছেন।

আমায় পেয়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে', তাঁর উত্তপ্ত বুকের মাঝে চেপে ধরলেন। আমার চোখ দিয়ে জল ঝরে'পড়লো। তিনি তাঁর শীর্ণ হাতখানি দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিলেন ; বল্‌লেন—ছি, কাঁদ্‌তে নেই ! আশীর্ব্বাদ করি—

শেষের কথাটা না বল্‌লেও আমি বুঝ্‌লাম, তাঁর মত ভাগ্যবতী হওয়ার ইঙ্গিত ! আমার কপালে তা' কি সম্ভব ! মা বোধ হয় আমাকে দেখবার জন্যই বেঁচেছিলেন। আমি আসার পরের দিন তিনি আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেলেন।

বাবার চোখে এক ফোঁটা জল নেই—কিন্তু সেদিন থেকে আর কখনও তাঁর হাসি মুখও দেখ্‌লাম না। প্রায় দু' মাস বাপের বাড়ীতে ছিলাম। উনি মধ্যে মধ্যে আস্‌তেন ; কিন্তু, সেদিনই চলে যেতেন। মনে হ'ত, কি যেন পরিবর্ত্তন হয়েছে ! বাবার মনেও যেন ঠিক সেই কথাই উঠেছিল। আমায় পাঠিয়ে দিলেন, রাখলেন না।

তিনি কতটা অসহায় ভেবে আমি একটু আপত্তি তুলেছিলাম, কিন্তু বাবা বল্‌লেন—জীবনে ভোগ অনেক করেছি মা, আর কেন ? যার সংসার সেই যখন ছেড়ে দিতে পার্‌লে—না না, তুই যা'—তুই যা'।

বাড়ী এলাম। কিন্তু বাড়ীর আসল লোকটিকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। ফুলকে জিজ্ঞেস্ করলাম, জবাব দিতে পারলে না। বড্ড রোগা হ'য়ে গেছ্‌লো সে – মুখখানি বিষাদ-ভরা।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে উনি এলেন। এবার স্পষ্ট তাঁর আড়োআড়ো ভাব দেখা গেল। মুখ ফুটে বল্‌তে পারলাম না—ও গো, তুমি কেন যেতে না।

শুতে গেলাম। দেখি, উনি কি-একটা বই

পড়ছেন। আমার চাবির আওয়াজে ফিরে বললেন—আমার দেরী হবে, শুয়ে পড়।

কতদিন পরে এলাম, কিন্তু এই কি আমার অন্তর-দেবতার প্রীতি-সম্ভাষণ!

বিছানায় গেলুম। চোখ ফেটে জল ঝরে' পড়তে লাগ্‌লো—উনি জান্‌তেও পারলেন না। বালিসে মুখ গুঁজে ঘুমের ভাণ ক'রে পড়ে রইলুম। অনেক রাত্রে উনি শুতে এলেন—দেখলুম সে মানুষই নন্। আজ এ পরিবর্ত্তন কেন, কোন অপরাধে? সমস্ত রাত ঘুম হ'ল না। চোখের জলে উপাধান সিক্ত হয়ে গেল। ভোরের মৃদুল বাতাসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। রোদের প্রথম তেজে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, উনি বিছানায় নেই। আমি উঠে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা এল—উনি কি মনে কর্‌লেন, ছি! ছি!

এগার

প্রায় এক মাস কেটে গেছে। উনি তো আমার সঙ্গে তেমন কথা বলেন না—কী অপরাধ করেছি আমি তাঁর কাছে! এতদিন বাপের বাড়ী ছিলাম বলে' কি রাগ করেছেন!

আমি লক্ষ্য করেছি আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হ'লেই, ওঁর মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে যায়—কেন এমন হয়?

একদিন সে কেনর জবাব পেলুম। আমার সকল সন্দেহ দূর হ'য়ে গেল। আমি ঘরে বসে-ছিলুম। এ ঘরে যে আছি, কেউ তা' জানতো না, দেখেও নি। হঠাৎ শুনলাম, ফুল ওঁকে বলছে—তোমার চা জলখাবার দিয়ে গেলুম। ফুলকে দেখছি না যে—সে কোথায়?

উনি বল্‌লেন—কোথা জানি নে, বোধ হয় চান করতে গেছে।

বোধ হয় সে বেরিয়ে আসছিল; আমার স্বামীর স্বর শুনতে পেলুম—"শুনে যাও উমা। স্ত্রীসুলভ কৌতূহল আমার আগ্রহকে চঞ্চল ক'রে তুললে।

আমি দুরুদুরু বক্ষে ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালুম। জানলার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে দেখলুম,—ফুল দাঁড়িয়ে, আর স্বামী সে কেমন এক ক্ষুধার্ত্ত উগ্রদৃষ্টিতে ফুলের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—উমা, এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলাম, আর পারছি না—তোমায় আমি কত—কত—

মূর্চ্ছিতের মত কতক্ষণ ছিলাম, জানি না—ফুলের তীব্রকণ্ঠে চম্‌কে উঠলাম।

ফুল বল্‌ছে—ছি, ছি, আমি না তোমার ছোট বোন্? তবে কেন আমায় প্রলোভন দেখাচ্ছ?

উনি চুপ ক'রে রইলেন।

ফুল বল্‌লে—বুঝেছি, আমি তোমার ভার-বোঝা হয়েছি—বেশ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। ভগবান দাঁড়াবার জায়গা কি দেবেন না—নিশ্চয়ই দেবেন! বলে' সে বেরিয়ে গেল।

ওঃ! ঈশ্বর! আমার চোখের সামনে জগতের আলো নিবে এল! পৃথিবী যেন আমার চারিদিকে ঘুরতে লাগলো! তারপর যখন জ্ঞান হ'ল, দেখি মাটিতে শুয়ে আছি। গায়ে বড় ব্যথা। আমার পতনের শব্দ শুনে হয় ত উনি ঘরে ঢুকেছেন।

আজ এতদিন পরে আমি আমার স্বামীর কোলে। ফুল চোখে-মুখে গোলাপজলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলুম। তারপর আমার হৃদয়ে প্রবল ঝঞ্ঝাপাত তোলপাড় করতে লাগলো!

তাড়াতাড়ি উঠে ওঁকে বললুম—তুমি যাও—তুমি যাও—ও গো, এখান থেকে তুমি যাও।

উনি চলে গেলেন।

ফুল বল্‌লে—এখানে আর আমার থাকা হ'ল না ফুল! বাবা ভুল ক'রে এখানে রেখে গেছেন।

মর্ম্মান্তিক বেদনায় সারা অন্তর হাহাকার ক'রে উঠল। ভুল! ভুল! এতদিন শুধু ভুলের মধ্যে

দিয়েই আমি আমার জীবনের রথচক্র চালিয়ে এসেছি। রাত্রির সত্যকে পশ্চাতে ফেলে অরুণোদয়ের মিথ্যা স্বপ্নকে নিয়েই গৌরবের সিংহাসন রচনা ক'রে চলেছি! ছি! ছি! আমি কী!

সারা অন্তর খুঁজেও কিন্তু একবিন্দু অশ্রুর সন্ধান পেলুম না। আপন অজ্ঞাতে কে আমার ভিতরকার সমস্ত করুণতাকে নিঃশেষে হরণ ক'রে নিয়েছে! মনে হ'ল চীৎকার ক'রে বলি যদি এতটাই করলে, তবে আমার পূর্ব্ব-স্মৃতিটাকে ফিরে নিলে না কেন?

ফুলের দিকে চাইলুম—সমস্ত মুখখানি তার সহানুভূতিভরা! তার হাতটা চেপে ধরে' বললুম —তোমার দোষ কি ভাই, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব কেন?—না, না, তোমার যাওয়া হবে না, হ'তে পারে না!

ফুলের সমস্ত অন্তর নিঙড়ে যেন অশ্রুর বান তার দু'টী চোখের মাঝে উতোল হয়ে উঠল। রুদ্ধকণ্ঠে কোনরকমে ভাষা ফুটিয়ে বললে—ফুল, ফুল, তুমি মানবী নয়, তুমি দেবী!

মুখে হাসি এল, বললুম—হবে!

বার

পরের দিন বিছানা থেকে উঠতে পারলাম না। বুকে বড় ব্যথা হয়েছিল।

ফুল এসে বললে—বেলা হয়েছে, ওঠ।

কিন্তু গায়ে হাত দিয়েই চম্‌কে উঠ্‌ল! বললে —উঃ, গাটা যে পুড়ে যাচ্ছে! দাঁড়াও থারমমিটারটা নিয়ে আসি।

দেহের উত্তাপ নিয়ে বললে—একশ' তিন।

ডাক্তার এলেন, চিকিৎসাও চল্‌তে লাগলো। কিন্তু দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যথা বেড়েই চল্‌ল—কমলো না।

সেদিন রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। যত রাজ্যের ভাবনা এসে বুকে জমা হচ্ছে। ঘরে যেন হাঁপিয়ে উঠছিলাম। দুর্ব্বল দেহটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় চেয়ারটার উপর বসে' পড়লুম। দু' কস বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত আমার কাপড়ে ঝরে পড়লো।

প্রকৃতির ফুলশয্যা! আকাশে-বাতাসে যেন আজ তারই বিচিত্ররূপ লীলায়িত হয়ে উঠেছে! দূরে, দূরে, আরও দূরে, স্মৃতির ওপার হ'তে যেন কার আহ্বান এসে আমার কাণে বাজছে! পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শের সঙ্গে চির বিদায়ের দিন প্রিয়তম বন্ধুর মত নিকটতর হয়ে আমার উন্মুখ মনকে উদ্বেল ক'রে তুলেছে!

এই আনন্দটাই আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের ইতিহাসটাকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে যে, অসহায়ের মত আমি নিজেকে হত্যা করার সুযোগ কোনদিনই নিই নি, বরং চিকিৎসার সব ক'টি অলিগলিই সযত্নে পরিক্রম ক'রে এসেছি।

ফুল তার সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু ওপরওয়ালা যাকে মুক্তি দিতে চায়, নীচের আদালত তাকে বেঁধে রাখবে কেমন করে?

যাদের পরিপূর্ণ স্নেহে আজও আমার লোভাতুর মন স্বর্গ নন্দনের স্বপ্ন দেখে, তাদের কাছে যাবার দিন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! জীবনের সব চেয়ে প্রিয় যে মুক্তি তারই আনন্দে যে আমি উন্মাদ হয়ে উঠেছি!

কার হাতের কোমল স্পর্শে আমি চোখ চাইলাম। দেখি,—ফুল একটা ভিজে নেকড়া নিয়ে আমার দুই কস পুঁছিয়ে দিচ্ছে।

বল্‌ল—এখানে উঠে এসেছিস্ কেন দুর্ব্বল শরীর নিয়ে—দেখ্ তো।

হাসি এল। বললুম—যখন বেঁচে থাকবার কোন আকর্ষণই নেই, তখন যদি মৃত্যু আসে, মন্দ কি?

ফুল ধমক দিয়ে বললে—আবার যা' তা' বকতে সুরু করেছিস্। আহা, বেচারী সেই

থেকে যে কি অবস্থায় মনমরা হয়ে দিন কাটাচ্ছে কি বলব, দেখলে মায়া হয়! তাকে ক্ষমা কর ভাই!

ফুলের হাতটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লুম—অযত্নে একধারে পড়ে থাকা বন-ফুলকে যিনি নিজের মহত্ত্বে গলার মালা ক'রে নিয়েছিলেন, আজ যদি তার প্রয়োজনের শেষই হয়ে থাকে, তা'তে বলবার কি আছে ভাই? ক্ষমার কথা তুলে আমাকে অপরাধী করিস নি! সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাকে মেনে নিয়েছি; কিন্তু মনের মন্দিরে তাঁর যে পবিত্র দেবমূর্ত্তি গড়ে' তুলেছিলুম, তাকে যে আর কোনমতেই ফিরিয়ে আনতে পারছি না!

ফুল বল্‌তে চাইছিল—চেষ্টা—

বাধা দিয়ে বল্‌লুম—তা' আর হয় না! মিথ্যার সৌধ গড়ে' তোলবার সময় আমার নেই—আমি মুক্তি চাই!

ফুল কোন প্রতিবাদ ক'রল না। আমার রোগ-শীর্ণ হাতটা ধরে' আপন-মনে নাড়তে লাগল।

তার এক ফোঁটা চোখের জলও বোধ হয় আমার বুকের উপর ঝরে' পড়েছিল। হঠাৎ সে ব'লে উঠল—তবে তাই হোক ভাই! ধূমকেতুর মত তোদের দু'জনের ভাগ্যাকাশে যখন উদয় হয়েছি, তখন শেষ দৃশ্যটা দেখেই যাই! তবে আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি। দেশের ডাক আমার প্রাণে এসে বেজেছে—তারই মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হব!

একবার মনে হ'ল বলি—মত ও পথ ত সবাইকার এক হ'তে পারে না ভাই! তোমার পথ আনন্দের হোক্ কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনাই আমি করি!

মুখে কিন্তু কোন কথাই বল্‌তে পারলুম না। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম—পূর্ণচন্দ্রের বুকের উপর একখানা ভাসা মেঘ উড়ে এসে পড়েছে—সমস্ত তারার চোখ যেন অশ্রু সমুজ্জ্বল!

—পথে—

শ্রীমতী সুজাতা দেবী
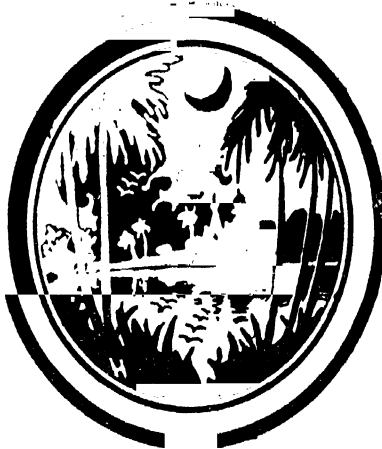
ট্রেণের যাত্রী,—মা আর আমি। লটবহরের বালাই ছিল না।

পথের নূতনত্বের আস্বাদ আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তাই মার বকুনি উপেক্ষা করেও আমি বসেই ছিলাম

মাঝের ক'টা ষ্টেশন পেরিয়ে বড় গোছের একটায় এসে শুনলুম, গাড়ী অনেকক্ষণ থামবে, আপ ও ডাউনে তিনখানা মেল পাশ করলে তবে এখানা ছাড়বে। তাই প্ল্যাটফরমে নেমে বেড়াবার লোভ দমন করতে পারলুম না।

একটু দুরে কয়েকজন যাত্রী কা'কে বা কাদের যেন ঘিরে রয়েছে দেখে, পায় পায় সেই দিকে এগিয়ে চল্লুম।

প্রহসনের নায়িকা একটী ছোট মেয়ে ভ্যাবা চাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স বড় জোর তের কি চোদ্দ। নায়ক একটী প্রৌঢ়, লাঠির আস্ফালন করে শাসাচ্ছে, "বল সে বেটা গেল কোথায়, মশায় সব জোচ্চোর, সব জোচ্চোর! বললে আমার স্ত্রী রইল, এক সঙ্গেই টিকিট ক'খানা কেটে আনি, দিন না টাকা। হারাম জাদী তখন যদি বলে—"

লোকটী রুক্ষদৃষ্টিতে মেয়েটীর দিকে চেয়ে বলে, "কেন তখন তোর মুখে কি কুড়িকিষ্টি হয়েছিল? দু'খানা নোট মশায় হাতে পেয়ে সেই যে স'রল ঘণ্টা দুই আগে, ট্রেণ এল; এখনো চুলের টিকিটি দেখতে পাচ্ছি না, সাত চড়ে রা' নেই মশায়,বলেন কেন দুঃখের কথা।

দর্শকের মধ্যেও তর্জ্জন গর্জ্জনের অভাব ছিল না। সবার সকল অভিযোগের লক্ষ্য মেয়েটী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কাঁদছিল, কাঁদার মত অবস্থাও বুঝি তার ছিল না। একজন উৎসাহী পুলিশ প্রহরী ডেকে এনে হাজির, কারুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি, কারুর টিট্‌কারী। তাদের কেন্দ্রীভূতা অপরাধিনী কিন্তু তেমনি নির্ব্বাক, যেন নিজের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছে না।

একজন কে দু' পা এগিয়ে এসে বললেন, "ও বুঝেছি গোবিন্দ ত? না মশায়, অতবড় পাষণ্ড আর দু'টী দেখি নি। যদি খাওয়াতে পারবিই না, তবে এ বিয়ে করা কেন! আর মেয়েটার মামাকেও বলিহারী! পই পই লোকে বারণ কর্‌লে, কিন্তু বাপ-মা মরা মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে একেবারে জলে ফেলে দিলে। ও:যে অমন কর্‌বে এত জানা কথাই।"

পেছন থেকে কে একজন বল্লে, "আহা বাছারে, আয় মা আমার সঙ্গে আয়! বুড়ো মিন্‌সে রকম দেখ না, নিজে খোয়ালে টাকা তা' ও কি করবে? কাণ্ডজ্ঞান যদি একটু থাকে!"

উন্মত্ত জনতার সুর অমনি দেখলুম ঘুরে দাঁড়িছে। সবার দৃষ্টি সেই অতিবড় বর্ব্বরের সন্ধানে ব্যস্ত, হ'য়ে উঠেছে! এই ফাঁকে মেয়েটীর হাত ধরে কে যে সরিয়ে নিয়ে গেল, খোঁজই মিল্‌ল না। সে দিকটায় বোধহয় কারুর হুঁসও ছিল না।

ট্রেণের সিটিতে ফিরে এসে কামরায় উঠলুম। আশ্চর্য্য! একি, মা একে পেলেন কোথায়! মার মুখে কিন্তু অপূর্ব্ব হাসি, মেয়েটীও উদ্বেগশূন্য!

—শীতল মাষ্টার—

শ্রীবলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাছা ছিল না, হাতে বেত, হন্তদন্ত হইয়া গ্রামের পোষ্টমাষ্টার শীতল বাঁড়ুয্যে হলধর উড়ের পিছনে ছুটিতেছিলেন। আশ্চর্য্য হইলাম! এই ভালমানুষ লোকটীর হঠাৎ এত রাগিবার হেতু কি?

কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি মাষ্টার-মশায়, হঠাৎ ও জগন্নাথের ওপর রাগলেন কেন?"

শীতল বাঁড়ুয্যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "কে ও রণেন? তিতিবিরক্ত করেছে দাদা, আর বল কেন? বলে, 'চার পয়সায় টিকিট কিনেছি ফাউ দাও।' কত ক'রে বোঝালুম, 'এসব জিনিষের ফাউ হয় না হলধরচন্দর।' তা'বেটা বলে কি জান,'ময়রার দোকানে, মুদিখানায়, মায় শাকসব্জীওয়ালাদের কাছে পর্য্যন্ত ফাউ আছে, আর তোমার নেই। উড়িয়া মনুষ্য পেয়ে আমায় ঠকাচ্ছ'?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বড় বিপদেই পড়েছিলেন বলুন।"

পোষ্টমাষ্টার পলায়নপর হলধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওই যা' গেল, হলা পালাল; আজও একটা পয়সা দেখছি দণ্ড গেল।"

আমাকে পকেটে হাত দিতে দেখিয়া বলিলেন, "আরে রাম রাম, হলা করলে চুরী, আর তুমি দেবে দণ্ড, কেন?"

বলিলাম, "ও আমার জন্যেই কিনতে গিয়েছিল যে।"

বলিলেন, "তাই না কি, তবে দাও দাদা, নেহাত পয়সাটার ভাগ্য ভাল দেখছি। তারপর শোন, ফাউ যখন পেলে না, তখন বলে আমার দস্তুরী? বোঝালুম, 'এসব জিনিষের কি দস্তুরী হয় রে, এ যে কোম্পানীর ঘর; এরা নিতে জানে, দিতে জানে না।' কে শোনে, তিনটে পয়সা ফেলে দিয়ে ছুট। কাজেই ভায়া পিছনে না দৌড়ে আর করি কি?"

হাসিয়া বলিলাম, "উড়িষ্যাবাসী যে, ওর চেয়ে ভাল কিছু ওর কাছে আশাই করা যায় না।"

কথায় কথায় পোষ্টঅফিসের পথ ধরিয়াছিলাম। শীতল মাষ্টার বলিলেন, "না হে না, গাঁয়ের ইতর-ভদ্র বাছবার দরকার হবে না, সব সমান। মাস কতক আগে গৌর, ওই যে সুদখোর গৌর হে, এসে ধরলে,কিছু টাকা কোম্পানীর ঘরে জমা রাখবে, জান্‌তে চাইলে সুদ কত? বল্লুম, 'সেভিং ব্যাঙ্কের হার।' শুনে লাফিয়ে উঠল। পাঁচশ টাকার খাতা খুললে। মাসকাবারে এসে পেড়াপীড়ি, সুদ দাও। বল্লুম, 'এখানে মাসিক হিসেব নয় গৌর, হিসেব হয় বৎসরে।' বললে,'এতদিন কোম্পানীর ঘরে ফেলে রেখে লাভ? ঘরে থাকলে যে সুদের সুদ আসত?' বললুম, 'সেইটেই ত ভাল। তবে টাকা মারা যাবার ভয় এখানে মোটেই নেই কি না, কাজেই কম সুদে লোকে রাখে।' সে চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, 'কম সুদ মানে? তুমিই ত বল্‌লে শতকরা তিন টাকা।' বল্লুম, 'বলেছি, এখনও বলছি, সুদের হার শতকরা তিন টাকা।' 'কম হ'ল না,ঘরে এমনি বন্ধকি খাটালে অন্ততঃ বার মাসে বারটা টাকা পাওয়া যায়'।"

বলিলাম, "সে বুঝি মাসিক হিসেব বুঝেছিল ?"

"তাই। ভুল বুঝে সে কি তম্বি! রিপোর্ট করলে আমার নামে—সুদের দায়ী আমাকেই ক'রে। কি আর করি, এখন তার গুনগার গুণছি।"

"আপনি!"

"হ্যা ভাই, আমি; নইলে চাকরী যে যায়। ইন্‌স্পেক্টার এসেও উল্‌টে তম্বি—তোমার গাফি-লতিতেই ও টাকা তুলে নিয়েছে, জান? কোম্পানীর কতটা লোকসান তুমি করেছ? সত্যনারায়ণের সিন্নি মেনে সে যাত্রা কোনপ্রকারে রক্ষা পেয়েছি। তার জন্যে দু'-বেলা খোঁটা খাচ্ছি ভায়া। বলে, 'মেনে ঠাকুরকে দেবে না, তুমি কেমন লোক!' লোক যে কেমন, তা' বোঝাতে চাই, কিন্তু কে বোঝে! মাস গেলে গৌর এসে হাত পেতে দাঁড়ায়; কড়ার মত তাকে দিই, নইলে আবার কি গণ্ডগোল লাগাবে। এ যে জ্যান্ত সত্যনারায়ণ!"

বেচারীর কথায় মনটা কেমন দমিয়া গেল। ভালমানুষ পাইয়া লোকে এমন করিয়াও ঠকায়!

গৌরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া চলিতেছে। সে বলে, "আর নয় আন্‌তে নাই গেলুম; কিন্তু হাতেপাওয়া যে টাকা, তা' ফিরিয়ে দিতে পারব না বাবু; ও আমার বুকের রক্ত!"

বুকের রক্ত যে, তা' জানি; কিন্তু, আর একজনের কতখানি রক্তশোষণ করিয়া সে যে ওই টাকাগুলি নিজের করিয়া লইয়াছে, ভাবিয়া বেশ জোর-গলায় অন্যায়ের প্রতিকার চাই; বলি, "নালিশ যদি হয়, ইন্‌স্পেক্টার যে তোমার কত বড় আত্মীয়, তা' লুকুনো যখন থাকবে না, তখন তার দিকটাও ভাব, চাকরী হারিয়ে শালা-শালাজ কাচ্ছাবাচ্ছাসমেত গলায় এসে পড়বে, তারপর—"

দৃশ্যটা হয় ত কল্পনায় ফুটিয়া উঠে; গৌর বলে, "আচ্ছা বাবু, ভেবে দেখি।"

তিন দিনের দিন শীতল বাঁড়ুয্যে আমার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলাম, উৎকণ্ঠায় ব্যাচারীর মুখখানি একেবারে শাক হইয়া গিয়াছে। বলিলেন, "ভায়া, এবার আমি গেলুম! ঠাকুর যে এতখানি চাক্ষুষ তা' যদি জানতুম ত পেট মেরে পূজোর ব্যবস্থা করতুম।"

ব্যাপারটা কতটা বুঝিলাম; বলিলাম, "ইনস্পেক্টার মাণিকলাল এসেছে বুঝি?"

তিনি বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "কি করে জানলে ভায়া? সে তোমায় ডাকছে। আমায় শাসিয়েছে, চাকরী খাবে; কোন বাপেও রক্ষে করতে পারবে না।"

হাসিয়া সঙ্গে চলিলাম। ব্রাহ্মণ পৈতাশুদ্ধ হাতে আমার হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এ যাত্রা রক্ষে কর ভাই রণেন! এ বাজারে চাকরী গেলে—"

ব্যাচারীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

পোষ্টঅফিসের ঘরে ঢুকিয়া বেশ একটু গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিলাম। ইন্‌স্পেক্টার আড়চোখে চাহিয়া বলিল, "তোমারি নাম রণেন চাটুজ্জে? এত দৌড় তোমার!"

একটু কর্কশ স্বরেই বলিলাম, "দৌড়ের এখন কিছুই দেখ নি; দরকার হয় পোষ্টঅফিসের বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার ওপরওয়ালারাও খবরটা জানবেন।"

সে বলিল, "বটে! তার আগে তোমার এ লোকটীকে রক্ষে করতে পারবে?"

আমি হাসিলাম ; বলিলাম, "সে তখন দেখা যাবে। তোমার যতটা ক্ষমতা কর ত।"

শীতল আমাদের কথা কাটাকাটির কিছুই বুঝিলেন না ; মূঢ়ের মত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। মাণিক কয়েকপদ আগাইয়া গিয়া ধমক দিয়া বলিল, "তুমি এই সব গুণ্ডার সঙ্গে মেশ, আমি তোমায় সসপেণ্ড করলুম। ফেল চাবি।"

আমি তদপেক্ষা গর্জ্জন করিয়া কহিলাম, "সাবধান মাণিকলাল! এ কাজটা তোমার বে-আইনি, জান?"

আড়ালে ডাকিয়া দু'-চারটী কথায় আমার যথার্থ পরিচয় দিতেই লোকটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। আমি বলিলাম, "এখন তোমায় আমি প্রসিকিউট করাতে পারি, তা' জান?"

কিয়ৎকাল পূর্ব্বের মাণিকলাল সে আর নয়। উঃ, লোকটা কি পাকা ধড়িবাজ! বলিল, "আপনি সব পারেন ; জেলার - "

আমি ধমক দিয়া বলিলাম, "পাঁচ কাণ করবার জন্য আমি তোমায় কথাটা জানাই নি ; জানিয়েছি, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে। তার কি?"

কাচুমাচু মুখে মাণিকলাল বলিল, "আমি নিজে গিয়ে সে বন্দোবস্ত করছি।"

বাধা দিলাম ; দু'জন পাষণ্ডকে এভাবে একলা ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না। বলিলাম, "তাকেই ডাকাচ্ছি। শীতল দা', একবার গৌরকে ডাকাও ত ভাই।"

সে চলিয়া গেলে, মাণিক কাছে আসিয়া খাট গলায় বলিল, "আপনি যখন জেলার মাথা হাকিম, তখন সবই ত বোঝেন। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে হুজুর পথে না দাঁড়াই—"

জবাব দিলাম না। গৌরের আগমন-পথের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বর্ষার জমাট-বাঁধা মেঘ প্রবল বাতাসের আঘাতে সারা আকাশ ছুটাছুটী লাগাইয়া দিয়াছিল। অফিসের পিছন দিক্‌টার কেয়া বনের মাতাল গন্ধ মধু ছিটাইয়া ঘরখানি মাতোয়ারা করিয়া রাখিয়াছিল। দূরের নারিকেল গাছটার ঝাঁকড়া মাথা লইয়া বাতাসের তখন সে কি মাতামাতি!

কার্য্যোপলক্ষে দুই বৎসর দেশে আসিতে পারি নাই। সেদিন সবার শেষে শীতল বাঁড়ুয্যের সহিত দেখা করিতে আসিলাম। আমাকে পাইয়া বেচারীর সে কি আনন্দ!

বলিলাম, "সত্যনারায়ণের সিন্নি বৌদি' কেমন দিলেন দাদা?"

দাদা মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, "আর বল কেন! ও মাগী জাতটাকে যদি একটু বিশ্বাস আছে! নিত্যি নিজের দোষে ভুগবে, মেয়েটাকেও ভোগাবে, তার খরচ যোগাব আমি, আর সেই ঠাকুর—"

দাদার কথার বাঁধ তখন খুলিয়াছে। নিজের বুকের এতদিনকার সঞ্চিত দুঃখ তিনি তখন উজাড় করিয়া ঢালিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মাগীটার হয়েছে যেমন, মরবেও না ভোগাবে! যেমন রোগে ভুগছে, তেমনি খিট্‌খিটেও হয়েছে। সাঁঝ নেই, সকাল নেই, কেবল বক বক, আর বক বক। যেটি বারণ করব, তাই আগে করবে ; তা' ভুগবে না। হাজার হোক আমি ওর গুরুজন ত, পাতান ত নয়। সাত পাক দিয়ে বিয়ে করেছি—নারায়ণ সাক্ষী ক'রে—"

ভিতর হইতে কি-একটা অস্ফুট শব্দ ভাসিয়া আসিল, ভাল বুঝিলাম না। শীতল কিন্তু লাফাইয়া উঠিল; বলিলেন, "শুনলে, শুনলে মাগীর কথা! আমি না কি পেট পুরে খেতে দিই না, তাই ভুগে মরে ; যত ওর অসুখ না খেয়ে। আরে, এই যে খেটে মরছি কার জন্যে, তোদের জন্যেই ত।"

দরমার বেড়ার ওপার হইতে আরও কতকগুলা কি অব্যক্ত শব্দ বাহির হইয়া আসিল; অনিচ্ছায় শ্রোতা হইয়াছিলাম, তাই কাণ দিই নাই। শীতলের ত আর তা' নয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মেয়ে জন্মানর জন্যে কেবল আমিই দায়ী, হ্যারে মাগী? মরবি, মরবি, ওই মুখের বাক্যি নিয়েই তুই মরবি! আরে, এটুকু জ্ঞান ত হওয়া দরকার—সেই কপালই যদি তোদের হবে, ত পাড়াগেঁয়ে পোষ্টমাষ্টারের হাতে এসে পড়বি কেন।"

একপ্রকার পলাইয়াই আসিলাম।

দু'দিন পরে আবার আসিলাম। কি জানি কেন, এই সরল লোকটীর কেমন এক আকর্ষণে মোহিত হইয়াছিলাম। শীতল বাঁড়ুয্যে ধামি করিয়া তখন বাল্যভোগ মুড়ি-বাতাসার সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এস এস ভায়া, বস'; চা করতে বলি—"

বাধা দিলাম; বলিলাম, "এই সবে খেয়ে আসছি, দরকার হবে না।"

যেন বাঁচিয়া যাওয়ার নিশ্বাস ফেলিয়া শীতল তৃপ্তিপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন, "তা' বটে। তোমাদের ওটা যখন নিত্যনৈমিত্তিক ভায়া, না খেয়ে কি এসেছ। আমার বোঝবারই ভুল। খাব বললে কিন্তু আমি বিপদে পড়তুম। ঘরে চা ত নেই-ই, চিনিও নেই, দুধ আজ দশবছর এ বাড়ীমুখো হয় নি। তোমার কাছে পেটের কথা লুকিয়ে লাভ কি? কে তরু, আয়, লজ্জা কি? ও যে আমাদের রণেনবাবু। কি এনেছিস্, গজা? একটু খাবে ভাই? সম্ভ্রম রক্ষে বল, আর যাই বল, ওই আমার সম্বল। খাও না ভাই, বাড়ীর তৈরী, জাত যাবে না। হ্যাঁ, এইটী আমার মেয়ে—না বিয়ে আর দিতে পারলুম কই? ওকে নিয়েই ত ওর গর্ভধারিণীর সঙ্গে ঝগড়া। বলে, আমি না কি না খাইয়ে মেয়েটার রং কালী ক'রে দিয়েছি।'

মেয়েটী নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত ঘামিতেছিল। ডাকিলাম, "খুকি, এদিকে এস। কি এনেছ, দেখি একটু খেয়ে।"

মেয়েটী পিছনদিকে বাটিটী লুকাইয়া বলিল, "না, এ আপনি খেতে পারবেন না।"

স্বরের পিছনে এমন একটু অব্যক্ত কাতরতা ছিল, যাহা লক্ষ্য করিয়া আমি শুধুই যে তাদের বাড়ীর তৈয়ারী ওই সামান্য তৈলপক্ক গজানামক বস্তুটী গলধঃকরণ করিলাম তাহা নহে, অজস্র প্রশংসাও করিলাম। কিন্তু মধ্য-পথেই হঠাৎ থামিয়া যাইতে হইল। দেখিলাম, মেয়েটীর চোখ দু'টী ছলছল করিতেছে।

আমি বলিলাম, "তুমি কাঁদলে কেন খুকি?"

মেয়েটী ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শীতলের কিন্তু এ ভাববিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার অবকাশ নাই। তিনি তখন আপন-মনেই বলিয়া চলিয়াছেন, "পারে, মেয়েটা অনেক রকমই না কি শিখেছে। কিন্তু কোথাই বা পাব। ভাল জিনিষ ত কিনে দিতে পারি না; যা' দিই, তা' দিয়েই কিন্তু ওই সব করে। খাওয়াতে এমনি ভালবাসে!"

পরের দিন আসিয়া দেখিলাম, বাপে-মেয়েতে কিসের যেন পরামর্শ চলিতেছে। আমাকে দেখিয়া মেয়ে লজ্জারক্ত-মুখে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, "বড় অসময়ে এসে পড়েছি ত, এমন যুক্তিটাই মাটি!"

শীতল হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তা' বুঝি জান না, বেটি তোমায় ফুলকপির সিঙাড়া ক'রে খাওয়াতে চায়। উচিত তা'। ফুলকপিওয়ালা এসেও না কি বাইরে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে—কথাটা হ'চ্ছে হোক্; তুমি

ত এখন আছ—আর একদিনই তখন হবে। মেয়েটা বেছে বেছে এমন দিনে বল্‌লে ”

তরু অস্ফুটস্বরে বলিল, “পয়সা আমার আছে। তুমি শুধু কিনে-টিনে দাও বাবা।”

শীতল কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—অবাক বিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! পয়সা যে তাঁহার কোনদিনই জোগাড় হইবে না, এ কথা জানা থাকাতেই আমি তাড়া-তাড়ি বলিয়া বসিলাম, “আমার কাছে তোমার কিছু পাওনা আছে শীতল দা’। বছর তিনেক আগে কি কি নিয়েছিলুম না?”

দেখিলাম এ ক্ষেত্রে কথাটা খাটিল না। বাপ বিশ্বাস হয় ত করিত, কিন্তু মেয়ে সঙ্গে থাকায় তা’ কার্য্যকরী হইয়া উঠিল না। বাহিরে ফুলকপি-ওয়ালা তখন ডাকিতেছিল, “বাবু, বাবু?”

শীতলবাবু কি বলিয়া যে তাহাকে তাড়াইতে পারা যায়, ঠিক্ বুঝিয়া উঠিবার অগ্রেই আমি ডাকিলাম, “এই শোন, ভেতরে আয়।”

বাধা দিয়া শীতল মাষ্টার বলিলেন, “কিন্তু, কিন্তু, ট্যাঁক্ যে খালি, দাম দেব কোত্থেকে? ধার, না, আমি নেব না রণেনবাবু, শুধতে ত একদিন না একদিন হবে; কিন্তু কোথা থেকে আসবে? যে আয়, ধরুন না –”

তার আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের জমাখরচ শুনিবার মত আগ্রহ মোটেই না থাকায় আমি তখন পরম উৎসাহে কপি বাছিয়া তুলিতে লাগিয়া গেলাম।

মেয়েটী কাছে আসিয়া বলিল, “এত বাছছেন যে, আমি ত মোটে, না আমি নিচ্ছি। আপনি—”

কে কথা শোনে! আমি মণিব্যাগ খুলিয়া ততক্ষণে দাম চুকাইয়া দিয়াছি।

মেয়েটী ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিল, “কাজটা কি ভাল কর্‌লেন?”

হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিলাম; বলিলাম, “দরকার পড়্‌লে আমি যে আমার নিজের জিনিষ কিনতে পাব না, এ কথা যে কোন্ শাস্ত্রে লেখে তা’ আমি ভেবেই পাই না!”

শীতল দা’ ভ্যাবাচাকা খাইয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন; উৎসাহভরে’ বলিলেন, “তা’ ত বটেই। এতে তোর আপত্তি করার কি থাকতে পারে তরু। কিনেছে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে—”

বাধা দিয়া মেয়ে বলিল, “জানি গো জানি! বেশ এদিক ত আমার হাতে। এমন অন্যায় কিছুতেই—কিছুতেই—বাবার কি?”

মাঠের তালগাছটার ছায়া তখন ক্রমশঃ লম্ব হইয়া পোষ্টঅফিসের দ্বারে আসিয়া পড়িতে-ছিল। মাঠের লীলা-চঞ্চল পাখীরা সারাদিনের বিদায়-অভিভাষণ জানাইয়া নীড়ে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। হল কাঁধে কৃষাণ গৃহাভি-মুখে ফিরিতে ফিরিতে সোৎসুকে তার দিনের কার্য্য গর্ব্বিত নয়নে দেখিয়া কতই না তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, “বেশ, খুড়োকে যদি বিপদে ফেলাই তোর অভিপ্রায় হয় তরু, তাই করিস। আমি কিন্তু বাড়ীতে বলে’ এসেছি, তারা সব এই এলেন বলে।”

কথাটা মিথ্যা বলি নাই। আমার মুখের কথা শুনিয়া বাড়ীতে সব এত আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন যে, নির্ব্বিকারে সম্মতি না দিয়া আসিতে পারি নাই।

শীতলবাবু কিন্তু কথাটা শুনিয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। হাঁকিতে হাঁকিতে ভিতরের দিকে গিয়া বলিলেন, “শুনছ, শুনছ সবিতা, তোমার দেওরের কাণ্ড! বৌমা, এঁদের সব আস্‌তে বলে এসেছে। এ কি বিপদে ফেলা বল ত! বল ত এখন মাকে আমার কোথায় বসাই, কি খাওয়াই? যে দরিদ্রের ঘর—”

তরু লজ্জারক্ত মুখে বাধা দিতে চাহিয়া বলিল, “আঃ, বাবা!”

আমি কিন্তু হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া

পড়িলাম। কেবল বলিয়া আসিলাম, “আসতে যখন বলেছি, তখন দায়ীত্ব আমার কতকটা আছে। আমি আমার কাজ সারতে চললুম; তরু, বাকী কাজ তোমার—”

দূরে মোটরের ‘হর্ণ’ শোনা যাইতেছিল। আমি দাঁড়াইলাম না; ভায়ের মান বাঁচাইবার জন্য বাজারে বাহির হইয়া পড়িলাম।

আগামী পূজায় কা’কে কি দিতে হইবে, তাহারই একটা ছক অনুসারে কাজ বুঝিয়া লইতেছি, হঠাৎ দাদা আসিয়া উপস্থিত। চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম।

দাদা ভূমিকামাত্র না করিয়া বলিলেন, “মেয়েটার বিয়ে একটা না দিলে ত চলছে না রণেন।”

জানিতে চাহিলাম, কোন পাত্র হাতের কাছে আছে কি না? উত্তরে যাহা জানিলাম, তাহাতে বিশেষ একটু কষ্টই হইল। কে-একজন না কি বলিয়াছে, পাত্র অতি সুপাত্র; তবে বয়স একটু বেশী, সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তিন চারটি উপযুক্ত পুত্র-কন্যা বর্ত্তমান; নাতি নাতনীরও হয় ত অভাব নাই।

দাদা বলিলেন, “আমার মত অবস্থায় এর চেয়ে সুপাত্র কোথায় পাব রণেন?”

এ লোকটিকে কোন কথা বোঝান বিড়ম্বনা; কাজেই সে পথ পরিত্যাগ করিলাম। বলিলাম, “ও পাত্র ছাড়ুন, তরুর সব ভার আমার ওপর রইল; আমি যা’ করব, তা’তেই কিন্তু স্বীকার পেতে হবে।”

আশ্বস্তকণ্ঠে দাদা বলিলেন, “বাঁচালি ভাই, এসব কি আমার কাজ! কেবল জানি কত তোলায় কত মাশুল, নয় টেরেটক্কা ব্যাস! বাপ, ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল! বলি গে সবিতাকে,তোমার দেওর যখন ভার নিয়েছে, ও মেয়ে ত মেয়ে, তার বাবার বিয়ে পর্য্যন্ত হয়ে যাবে।”

তিনি চলিয়া গেলে অনুপমা কাছে আসিয়া বলিল, “দেখ, তোমাদের পায়ে পড়ি, মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ভাসিও না! আহা, কাকিমা কাকিমা ক’রে বাছা কাছটিতে ঘোরে; এমন মায়া হয়! ওই প্রতিমার কি না বুড়ো বর—তার চেয়ে আইবুড়ো থাক, বিয়েয় কাজ নেই!

বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সবার মুখের সুখ্যাতির বন্যায় দম বন্ধ হইবার উপক্রম। দাদাকে নিভৃতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম,“একি ব্যাপার তোমার!”

অপরাধের গুরুত্বে মুখখানি চূণ হইয়া গেল; বলিলেন, “কি করেছি ভাই?”

“করেছেন, যা’ করা উচিত ছিল না তাই। যাক্ আপনাকে বলা বৃথা—”

বৌদি’ আসিয়া বলিলেন, “যেমন দিগ্‌গজ দাদা! বিশ্বাস হয় না ঠাকুরপো, যদি দাদার ভাই হয়ে সম্বন্ধ করে থাক। আজ রাত্রে মেয়েটার বিয়ে হবে ত, সম্বন্ধ পাকা ত?”

হাসিলাম। বলিলাম, “মেয়ে কি আমার কেউ নয় বৌঠাণ্? তরুর ওপর আমার কি মোটেই মায়া নেই?”

বৌদি’ বলিলেন—“দেখে-শুনে ভড়কে গেছি ভাই। সম্বন্ধ ত করলে, একবার চোখের দেখাও—”

কি-একটা জরুরি কাজে তখনি যাইতে হইল; কাজেই তাঁহার কথা আর সমাপ্তির পথে নামিল না।

দশজনে দাদাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বেচারী উত্তর দিতে না পারিয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া কেবলই বলিতেছিলেন, “বিয়ের খবর আমি কিছুই জানি না মশায়; রণেন কচ্ছে-কর্ম্মাচ্ছে,

সেই সব জানে। পাত্র, না এখনও চোখে দেখি নি। কি দরকার? সাদাসিদে মানুষ, জানবই বা কি, বুঝবই বা কি। সব জানে রণেন; করছে যা' কিছু, সব সেই; জিজ্ঞেস্ করুন তাকে, সে বল্‌বে।"

লগ্নের সময় অনুপমা আসিয়া ধমক দিল, "বর কই? মেয়েটাকে কি শেষে দোপড়া করবে—মতলব কি তোমাদের?"

মোহিত আমার পুত্র। হাত ধরিয়া তাহাকে বরাসনে বসাইয়া দিলাম। দাদা ছুটিয়া আসিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "রণেন রণেন, এ কি ভাই! না না, এ হ'তে পারে না—আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না—কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না!"

বলিলাম, "কেন দাদা?"

—"আমার মত গরীব অভাগার সঙ্গে—না না, এ—এ—"

বলিলাম, "কিন্তু এমন খাঁটি লোক খুব কম পাব দাদা! আমি তাই চাই।"

ছেলের মুখের দিকে চাহিলাম না; কারণ, মেয়ে খুব সুন্দরী। অনুপমার মুখের দিকে তাকান নিষ্প্রয়োজন; কারণ, তরুকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসে।

—ফল্গু—

শ্রীসুশীলচন্দ্র রায়

এক

বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া প্রায় তিন বৎসর ঘরে বেকার বসিয়াও কাজকর্ম্মের কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

হঠাৎ একদিন একখানি দৈনিকে দেখিলাম, রাণীগঞ্জ কয়লার খনিতে লোক চায়। গৃহে ফিরিয়াই একটী আর্জ্জি লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলাম। উত্তর আসিল দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে, এখনই রওনা হইতে হইবে। বেডিং ট্রাঙ্ক গুছাইয়া মনে অনেক আশা-ভরসা লইয়া জীবনে প্রথম ছুটিলাম কর্ম্মস্থল অভিমুখে। সম্বল রহিল পিতা-মাতার সজল নয়নের দু'টী ফোঁটা স্নেহাশ্রু, আর শুভাশীর্ব্বাদ!

* * * *

সকাল ছ'টা হইতে রাত্র সাতটা পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। মাহিনা কর্ম্মের অনুপাতে বড় কম। তাহাতেই রাজী হইলাম। না হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল!

একদিন সন্ধ্যা প্রায় সাতটাই হইবে—কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিতেছি। অক্লান্ত পরিশ্রমে দেহ শ্রান্ত। হঠাৎ পিছন হইতে একজন লোক টলিতে টলিতে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। তখন মেজাজ বড় রুক্ষ—তাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিলাম। বেচারী টাল সামলাইয়া হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিটাও তেমনি কদর্য্য। ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া আবার হন্‌হন্ করিয়া ছুটিলাম। মেসের দরজায় পা দিয়াছি, লোকটা টলিতে টলিতে ছুটিয়া আসিয়া টিপ্ করিয়া আমার পায়ে এক প্রণাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই হাসি। দুর্গন্ধ মুখে ভরভর করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—"রাগলেন না কি?"

কোন উত্তর দিলাম না। রাগ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। লোকটী আবার কহিল—"আপনি এখানে থাকেন? আমি থাকি ওই বস্তিটায়।"

"পরম আপ্যায়িত হ'লাম" বলিয়া মেসে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, লোকটা দরজার উপর বসিয়া পড়িয়াছে। ভাল বিপদ বটে! বন্ধু-বান্ধবেরা ধরিয়া বসিল—"দু'হাত খেলা যা'ক্।"

কথা এড়াইতে পারিলাম না।

রাত্রি তখন এগারটা। সবাই খাইতে গেল। আমিও যাইতেছিলাম; মনে পড়িল—সেই মাতালটার কথা। সে কি এখনও সেইখানেই বসিয়া রহিয়াছে? বৃষ্টি নামিয়াছে—ভিজিতেছে না কি? গিয়া দেখি, যা' ভাবিয়াছি, ঠিক তাই; বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে। মায়া হইল—হাজার হোক্ মানুষ ত! টানিতে টানিতে ঘরে আনিয়া ফেলিলাম।

উপরোক্ত ঘটনার দিন দুই পরের কথা। আবার তাহার সঙ্গে দেখা। তাহাদের বস্তির বারান্দায় সে বসিয়াছিল। আমি ওই রাস্তায় বড়বাবুর বাড়ী হইতে ফিরিতেছিলাম। তাহার হাতে একটা খাম; তখনও খোলা হয় নাই। দেখি, সে একটা অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি পুনরায় জ্বালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই

হাতের বিড়ি ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"এদিকে কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?"

সবিশেষ বুঝাইয়া বলিলাম। প্রত্যুত্তরে সে একবার হাসিল। তারপর এক পা আগাইয়া আসিয়া আমার হাতে খামটী দিয়া কহিল—"দাদা, কি লিখেছে যদি পড়ে' দিতেন—কা'কে দিয়ে পড়াই, তাই ভাবছিলুম—নোস্তে দা' ঘরে নেই —তা' আপনি যখন—"

আরও কি বলিতে যাইতেছিল, আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার হাত হইতে খামটী লইয়া খুলিতে আরম্ভ করিলাম। সে একদৃষ্টে আমার হাতের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবে বুঝিলাম, সে বড়ই ব্যগ্র।

আমি চিঠিখানা আগাগোড়া বার দুই পড়িয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হরমোহন কে ?"

—"আমার দাদা—বড়দা'।"

আবার সেই হাসি।—"তা' তিনি লিখেছেন, পরশু তোমায় বাড়ী পৌঁছুতে হ'বে, তোমার বিয়ে।"

সে হাসিতে হাসিতে হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া কহিল—"আবার কতগুলো খরচের মধ্যে পড়লুম। দেখুন দেখি, বড়দা' ত শুনবে না—"

তাহার হয় ত আরও কিছু বক্তব্য ছিল—আমি কিন্তু আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না—উঠিয়া দাঁড়াইলাম। শশব্যস্তে সেও উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা বিড়ি দিতে হাত বাড়াইল। ও-অভ্যাস আমার ছিল না, প্রত্যাখ্যান করিলাম। বেচারীর মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল। কহিল—"খান না বুঝি—ওঃ! তবে চল্লেন দাদা, আচ্ছা আসুন। আমি এই ঘরে থাকি, মাঝে মাঝে যদি পায়ের ধুলো—"

আর শেষ করিতে পারিল না।

—"আচ্ছা দেখা যাবে।" বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে আসিয়া বন্ধু-বান্ধবদের বলিলাম—"জানলে, আজ আবার সেই মাতাল-টার সঙ্গে দেখা।"

—"কোথায় হে—আবার তার পাল্লায় পড়েছিলে ?"

কোথায় কিভাবে দেখা হইয়াছিল, সমস্তই বলিলাম। অবশেষে ইহাও কহিলাম—"লোকটী ভদ্রলোকের ছেলে—নাম কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—পরশু তারিখে তার বিবাহও স্থির হয়েছে।"

সকলে আমাকে পাগল মনে করিয়া হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। ঘরে আর কেহই নাই, বেড়াইতে গিয়াছে। আমি একাই ছিলাম। মাকে একখানা চিঠি লিখিতেছি। শুনিলাম খট খট করিয়া সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল—মুখ তুলিয়া দেখি কালীমোহন। নূতন জামা-জুতা, হাতে অনেকগুলি জিনিষ-পত্র, একটা ট্রাঙ্ক। বুঝিলাম, সকলই বিবাহের আয়োজন।

ঘরে ঢুকিয়াই কহিল—"দাদা, চল্লেম—চার-পাঁচদিনের মধ্যেই ফিরবো।"

বসিতে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই চেয়ার-খানা টানিয়া লইয়া বসিল। আবার তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি দেখা দিল। সে কহিল—"বুড়ো বয়সে দাদা এ ঝকমারী আর ভাল লাগে না—কেমন বাধ বাধ ঠেকছে। তবু যাই, দেখি। একখানা শাড়ী পাঁচ টাকা নিলে—তাই নিয়ে যাচ্ছি।"

গল্প আরম্ভ করিল। কি কি জিনিষ কিনিল, তারপর কি কি কিনিবে, কত দাম, সব হিসাব-নিকাশ করিয়া তাহার খরচের একটী ফর্দ্দ করিয়া শুনাইল। সে আসায় আমার এ ক্ষুদ্র ঘরটী মদের গন্ধে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভাবিতেছিলাম, উঠিলেই বাঁচি। উঠিবার কোনরূপ লক্ষণ না দেখিয়া কহিলাম—"তবে আর দেরী করো না—ট্রেণের ত বিশেষ সময় নেই।"

—"হ্যাঁ দাদা, ঠিক বলেছ—আমার সে হুঁসই ছিল না—আচ্ছা আসি।"

—"আচ্ছা এসো।" বলিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কি যে মাথা-মুণ্ড লিখিতেছি, তাহার ঠিক নাই। মনে একটা দুর্ভাবনা কেবলই জাগিতেছিল—কেন এ লোকটী একটা কচি মেয়ের ইহ-পরকাল জর্জ্জরিত করিতে উন্মত্তের মতো ছুটিয়া চলিয়াছে! একটা মাতাল—ইহার হাতে কন্যাদান করে, এমন পাষণ্ড পিতা-মাতাই বা কে? ইচ্ছা হইতেছিল,—যাই, কালীমোহনের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া ফিরাইয়া আনি। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করা সম্ভব নয় বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আপন-মনে ফুলিতে লাগিলাম। চিঠিলেখা সেদিন আর হইয়া উঠিল না।

তিন

তিন মাস গত হইয়াছে। কালীমোহন নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ করিয়া ফিরিয়াছে। আর ও-মুখো হয় নাই। যাইতে বলিলে, বলে—"যাব দাদা, যাব। এত তাড়াহুড়ো কেন?"

বিবাহ করিয়া ফিরিবার পর একদিন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"কি হে, কেমন বউ হ'ল?"

প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় সে যেন মরিয়া গিয়াছিল। মাটীর দিকে চাহিয়া সংক্ষেপে কহিল—"কেমন আর হবে দাদা—তা' হ'ল একরকম।"

কথার সঙ্গে তাহার সেই স্বভাব-সিদ্ধ হাসি মিশ্রিত।

পুনরায় তাহার মনের ভাব জানিবার উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবু—"

—"তা' বলবো কি দাদা, আর লজ্জাই বা কিসের। সে যেন পরী—আমার সঙ্গে সাজে না দাদা! ওকে বিয়ে ক'রে বড় আহাম্মুকীই করেছি!"

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বাধা মানিল না—তাহার অজ্ঞাতেই বক্ষ হালকা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। কি উদাস সে চাহনি! কি কাতরতা তাহার সে দৃষ্টিতে!

সহানুভূতিতে আমারও একটা নিশ্বাস পড়িল। তাহার ব্যথা কোথায় বুঝিলাম। আজ আবার ভাবিলাম, মাতাল হইলে কি হয়, মানুষ ত বটেই!

তারপর কয়দিন আর তাহাকে দেখি নাই। এই সেদিন পথের মাঝে দেখা। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"বউয়ের নাম কি হ'ল হে?"

তাহার লজ্জা বুঝি কাটিয়া গিয়াছিল—দ্বিধা না করিয়াই উত্তর দিল—"ভাল নাম ফুলরাণী, তাকে ফুলী বলে ডাকে।"

আমোদ করিবার ইচ্ছায় কহিলাম—"কে ডাকে হে?"

—"সবাই—আমিও।" বলিয়াই হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"চিঠি-পত্র লেখ ত?" হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম।

"লিখ্‌তে কি আর জানি দাদা—অতদূর বিদ্যে নেই, নোন্তে দা' যা' লিখে দেয়, তাই—"

—"তোমার বউ লেখে তো?"

আনন্দের আতিশয্যে সে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ—রোজ, এই তো তিন মাসের মধ্যে পাঁচ-ছ'খানা পেয়েছি—সব চিঠিতেই যেতে লেখে—কালও একখানা এসেছে—দেখবেন?—এই দেখুন।" বলিয়াই সযত্নে রক্ষিত একখানা খাম পকেট হইতে বাহির করিয়া হাতে দিল। খুলিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল—খামের এদিক-ওদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছি, কালী পট করিয়া হাত হইতে খামখানা লইয়া চিঠি বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিল, তারপর আমার হাতে দিয়া কহিল—"পড়ুন না, পড়ুন না, তা'তে কি? নোন্তে দা'

তো পড়ে' শুনিয়েইছে—এমন তো কিছু লেখে নি।" বলিয়াই আবার রক্তরাঙ্গা দাঁতগুলি বাহির করিয়া হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অগত্যা পড়িলাম। গোটাগোটা অক্ষরে লেখা; বুঝিলাম, কাঁচা হাতের লেখা। অনেক কথাই লিখিয়াছে—যাইতেও বলিয়াছে, সভক্তি প্রণামও জানাইয়াছে—সমাপ্তে যাহা লেখা কর্ত্তব্য—নববিবাহিতার—তাহা লিখিতেও ভুলে নাই। লিখিয়াছে—ইতি, তোমার 'প্রাণেরসরি।'

প'ড়িয়া হাসি পাইল। কালী বলিয়া উঠিল,—"কি দাদা, পড়ই না শুনি।"

হাসিতে-হাসিতেই কহিলাম—"শুনেছই তো একবার।"

—"না দাদা,তবু পড়; নোন্তে দা' সব পড়ে না—বাদ দিয়ে যায়—বল্লে বলে—সব কি পড়া যায়।"

নাছোড়বান্দা; পড়িয়া শুনাইতেই হইল—আমিও যে কিছু বাদ না দিলাম, এমন নহে। চিঠিটা ফিরাইয়া দিতে গেলাম, সে হাত সরাইয়া লইয়া বলিল—"ইতি কি লিখেছে,তা'তো প'ড়লে না দাদা—হি হি হি—ওটা পড়তেই হবে—পড়ই না।"

বেজায় হাসি পাইল। কহিলাম—"লিখিয়াছে। ইতি, 'তোমার ফুলী'।"

সন্তুষ্ট হইল খুবই; প্রাণ খুলিয়া হাসিলও। তারপর অতি যত্নে ভাঁজ করিয়া আবার পকেটে রাখিতে রাখিতে নিজের মনেই বলিতে লাগিল—"উত্তরটা কাল দেব, রাতে যদি নোন্তে দা' লিখে দেয়—ভারী একগুঁয়ে লোকটা, ভারী তো লিখতে জানে! তারি জন্যে দেমাক্ দেখে বাঁচি নে—কত সাধাসাধি তবে যদি এক লাইন লেখে—তুমি লিখে দেবে দাদা, বড় উপ্‌গার হয়—ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় ফাঁকী দেবার এই পরিণাম!"

রাজী হইলাম। কালী যেন ছিনেজোঁক, পিছু ধরিল, ঘরে আসিয়া লিখিতে বসিলাম—অনেক কথাই লিখিতে হইল। ভাবিলাম, বিয়ের পরে দুই রাত্র তো ছিল, এত ভাব করিল কি করিয়া?

পত্র লিখিয়া দিলাম। সে প্রফুল্ল-চিত্তে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"এর উত্তর এলে আবার আসব; মনে থাকে যেন দাদা, হেঁ হেঁ।"

স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। তারপরও মাঝে মাঝে আসিয়াছে, চিঠি লিখাইয়াছে; আজ প্রায় চার-পাঁচদিন দেখা নাই। মনে ভাবি—কি এই কালীমোহন!

চার

আবার একদিন বড়বাবুর বাসায় যাইতে হইল—জরুরী কাজ। সেখানে যাইতে হইলে কালীমোহনের বস্তির সম্মুখ দিয়া যাওয়াই সুবিধা।—সেই পথেই চলিয়াছিলাম। একটা কোলাহল কাণে আসিয়া পৌঁছিল; দ্রুতপদে সেদিকে অগ্রসর হইলাম। যাইয়া শুনি, কালীমোহন প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে—কাহাকে যেন অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি জানিবার চেষ্টা করিলাম—জিজ্ঞাসা করিব কাহাকে? সকলেই ঝগড়া লইয়া ব্যস্ত—কাজেই আর দাঁড়াইতে প্রবৃত্তি হইল না।

ফিরিবার সময়ও দেখি ঝগড়ার মাত্রা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

আমি ডাকিলাম,—"কালী—ও কালী।" কে উত্তর দিবে? কাহারও কাণে আমার কণ্ঠধ্বনি প্রবেশ করিল না। তবু আমি ক্ষান্ত হইলাম না—উচ্চস্বরে ডাকিলাম—"কালী—ই।"

এবার বোধ হয় কাণে গিয়াছিল চীৎকার হঠাৎ যেন থামিয়া গেল—কিন্তু ও তরফে পূর্ব্বমতই চলিল।

কালী বাহির হইয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া সে যেন লজ্জায় মরিয়া গেল—জিজ্ঞাসা না

করিতেই বলিতে লাগিল—"দেখুন দেখি দাদা,—দু'টো তো টাকা পাবে, তাইতেই এই। বললুম—'দেশ থেকে ফিরে এসে দেব, হাতে টাকা নেই।' পট ক'রে কাঁধের চাদর ধরে' আমায় হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল—মাগীর আক্কেলটা দেখুন দেখি। আমি তো চোর নই; দুটো টাকার জন্যে দেশছাড়াও হব না। যার কাছ থেকে এতকাল এত শুষে নিয়েছিস্,তাকে তুই এই অপমান কল্লি,—হায়রে কলি! কালটাই এই দাদা, কালটাই এই! নইলে নটী বলেছে কেন।"

কিছু উপলব্ধি করিলাম। কালীমোহন অশ্লীল ভাষায় আরও অনেক কথাই কহিল। শুনিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না—সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম; কিন্তু তবু যাইতে পারিতেছিলাম না—ব্যাপারটা সঠিক জানিবার ইচ্ছায়। কালীমোহন কহিল—"চলুন দাদা, যাই; এখানে আর নয়। থাক্ তুই চাদর আঁকড়ে—আদায় করতে পারি কি না দেখে নেব।" আমার সঙ্গে-সঙ্গেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল।

চলিতে চলিতে কালী বলিতে আরম্ভ করিল—"পরশু রাতে হাতে টাকা ছিল না—দু' বোতল আনাতে হ'ল— তাই ওকে বল্লাম—'তুই টাকা দিয়ে আনিয়ে নে, পরে দেবো; আজ যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি। প্রায়ই চিঠি আসে, যেতে লেখে। যাই একবার, ওদিক থেকে না হয় ঘুরেই আসি; সেই বিয়ের পর এসেছি, আর তো যাই নি।' পেছন থেকে দৌড়ে এসে আমার চাদরটা ধরে' ফেললে—'টাকা দিবি, তবে যাবি'—এ কি ব্যাপার!"

তাহাকে বাধা দিয়া কহিলাম—"ঢের হয়েছে, থাম। দেশে কি এই ট্রেণেই যাওয়া ঠিক কল্লে?"

নৈরাশ্য যেন তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"সে আর হ'ল কই দাদা—পথে এমন বিঘ্ন—আজ আর নয়—দেখি, কাল-পরশু যদি হয়। টাকা শুধি—চাদর আদাই করি।"

তথাপি আমি তাহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম—"এসে না হয় শুধ্‌বে যাও, ঘুরে এস।"

সে শুনিল না—সেই একই যুক্তি আবার শুনাইল—"এত বিঘ্নে যেতে নেই দাদা, ধনে-প্রাণে যেতে হবে—আজ আর হবে না—কাল-পরশু একদিন যাব।"

যাইতে নারাজ, বৃথা আর অনুরোধ করিলাম না।

পাঁচ

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কোলের লোক চেনা যায় না। একটা মোটার গাড়ীতে তিনজন যাত্রী—প্রায় আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে আর কি! পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম; তথাপি ছোট্ট একটা ধাক্কা দিতে ছাড়িল না। চালকের এই অশিষ্টতায় এবং অপটুতায় রাগ হইল; ক্রোধান্ধ নয়নে ফিরিয়া চাহিলাম। দেখি তিনজনের মধ্যে একজন চালক—পিছনের দুইজনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক অচেনা; পুরুষটী কালীচরণ। আমাকে দেখিয়াই সে মাথা নীচু করিল। বিরক্তিতে সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। এত বড় নির্লজ্জের সঙ্গে কথা কওয়াও অন্যায়। এবার আসিলে আচ্ছা করিয়া দু'-চারকথা শুনাইয়া দিব।

পরদিন কালীমোহন নিজেই আমার নিকট আসিয়া হাজির। নমস্কার ঠুকিয়া কাছেই বসিল। তাহার মুখে কথা ফুটিতেছিল না। এক-একবার আমার মুখের পানে চাহিয়াই মাথা হেঁট করিয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছিল—পারিতেছিল না। আমি সমস্ত কারণই বুঝিলাম। আমারও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভাল লাগিতেছিল না। নীরবে আর কতক্ষণ

কাটে? অবশেষে আমিই বলিলাম—"কি, দেশে গেলে না?"

প্রশ্ন শুনিয়া সে যেন থতমত খাইয়া গেল। বার দুই "হ্যাঁ দাদা, না দাদা" করিয়া কহিল—"তা' দাদা, যাব যাব তো ভাবছিলুম—টাকা-কড়ি তো যোগাড় হ'ল না—গেলে দুটো টাকা তো হাতে ক'রে নিয়ে যেতে হয়—নইলে চলবে কি ক'রে?"

বড় রাগ হইল। বলিলাম—"বাজে এত টাকা ওড়াচ্ছ, তার বেলা ত পাও?"

কথার কোনই প্রতিবাদ করিল না।

দেখিলাম, তাহার চক্ষু ছলছল করিতেছে—মাথা হেঁট করিয়া রহিল। মুহূর্ত্তে আমার পূর্ব্ব সঙ্কল্প সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। ডাকিলাম—"কালী।"

আমার দিকে সে মাথা তুলিয়া চাহিল। আমি তাহাকে কহিলাম—"তুমিই তো ইচ্ছে ক'রে একজনকে আরও অসুখী করছো। সে যেতে লিখছে, যাওই না। এমন যদি করবে, তবে বিয়ে করলে কেন?"

ভাবের আবেগে কালী একেবারে আমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি দাদা, এইবার যাব। কাল-পরশু--এই হপ্তাটার মাইনে পেলেই।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা দেখা যাবে।"

ছয়

রবিবার। সারাদিন ঘরেই ছিলাম। যে গরম, ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য। সময় কাটিতেছিল না—বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী-খানা টানিয়া তাহারই পাতা উল্টাইতেছিলাম। হঠাৎ দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। উঠিয়া গিয়া খুলিতেই দেখি, একটা গামছায় জড়ান কি যেন হাতে করিয়া কালীমোহন ডাকিতেছে। তাহার সর্ব্বশরীর বহিয়া ঘাম গড়াইতেছে—রৌদ্রে মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। কাপড় কোমরে বাঁধা--জামা কাঁধে।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি?"

সে একটী টেলিগ্রাম আমার হাতে দিয়া বলিল—"দাদা, পড়ুন তো কি লিখেছে। নোন্তে দা' সব বোঝে না—কি বুঝতে কি বুঝলে—ফুলীর না কি বেজায় ব্যায়রাম!"

টেলিগ্রামে লেখা ছিল—"তোমার বউ সাংঘাতিকরূপে কাতর—শীঘ্র রওনা হও। হাবুল।"

ঘরে বসিতে বলিলাম। সে কহিল—"না দাদা, ট্রেণের আর সময় নেই। সত্যিই কি তাই দাদা, সত্যই ফুলীর ব্যায়রাম?"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—একটা বাজিয়াছে, গাড়ী সাড়ে তিনটায় ছাড়িবে। অনেক সময় আছে—কালীমোহন তথাপি বোঝে না।

—"না দাদা, আজকে 'মিস্' কল্লে চলবে না। না দাদা, আমি যাই—আর দেরী করব না। নোন্তে দা'র কাছ থেকে কত ক'রে ট্রেণ ভাড়াটা চেয়ে নিলুম—হাতে তো একটা আধলাও রাখতে দেবে না! যাই দাদা, যাই।"

দেখি সে সত্য-সত্যই উঠিয়া চলিয়া যায়; আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"ট্রেণ পেলেই তো হ'ল? তুমি বসো। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?"

—"কখন হবে দাদা। নেয়ে এসে পিঁড়ি পাতব, শালার পিওন এসে হাঁক দিলে—'টেলিগ্রাম হ্যায় বাবু।' রাঁধা ভাত পড়ে রইল'। —থাক্—কতই তো খেয়েছি। বাঁচবে কি না, যাই একবার দেখে আসি। দাদা, কি লিখেছে—বাঁচবে তো?" কি আর জবাব দিব, নীরবে রহিলাম।

মেসে থাকি—তাহাকে যে দুটো খাইতে বলি এমন সাধ্য নাই—ঠাকুর-চাকরেরা সমস্ত ভাত উজাড় করিয়া এতক্ষণ নাক ডাকিতেছে।

বলিলাম—"না খেয়ে রওনা হবে, দু'টা খেয়ে নিলে পারতে কিন্তু—"

কিন্তু কি যে খাইবে তাহা আমিই জানিতাম না। কালীমোহনও খাইতে রাজী হইল না। কহিল—"তার চেয়ে দাদা, যদি কিছু টাকা ধার দিতে, সুবিধা হত। শুধু হাতে যাচ্ছি—একটু কিছু ফলও নিলুম না—একেবারে শুধু হাত।"

মাথায় যেন বাজ পড়িল। টাকা পাইব কোথায়? হাতখরচের আনা আষ্টেক যা' পয়সা আছে—আর সবই শেষ।

তাহাকে সকলই খুলিয়া বলিলাম। সে কহিল—"লোক তো এখানে কম নেই দাদা, চেয়ে-চিন্তে যদি দিতে!—"

তাহার কাতরোক্তিতে ব্যথা পাইলাম। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে কোনরূপে গোটা দুই টাকা যোগাড় করিয়া দিলাম। কিন্তু আর তাহাকে বসাইতে পারিলাম না—সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে ভাবিলাম, ট্রেণের সময় হইয়াছে—যাই, ওখানে কালীর সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি। বাহির হইয়া দেখি, গ্রীষ্মের রৌদ্র টা-টা করিতেছে। তাহার মধ্যেই পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। ষ্টেশনে যাইয়া দেখি, কালীমোহন একটা থার্ড'ক্লাস গাড়ীতে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছে। একটী কাগজের ঠোঙ্গায় কিছু আঙ্গুর ও বেদানা; সেগুলো পাশেই রহিয়াছে।

কাছে যাইয়া ডাকিলাম—"কালী।"

চোখ চাহিল। অমনি গণ্ড বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বলিলাম—"গিয়ে চিঠি দিও, কেমন থাকে।"

বড়ই উদাসস্বরে কহিল—"দেব।"

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। জানলা দিয়া গলা বাহির করিয়া ইসারায় কি কহিল বুঝিতে পারিলাম না; তাহার দিকেই চাহিয়া রহিলাম। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম, সেও সকরুণ-নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া আছে।

ক্রমে ক্রমে রেলগাড়ী দিগন্তের গাছপালার আড়ালে পড়িয়া গেল, আর দেখা গেল না। শুধু মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া দেবদারু গাছের উপর দিয়া মাথা তুলিয়া উঁকি মারিতে লাগিল—যেন বলিতেছে—"আর কেন, এবার ফিরে যাও।"

যাহা হউক, কালীমোহনকে বিদায় দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সাত

প্রায় একমাস গত হইয়াছে। কালীর কোনও সংবাদ পাই নাই। যাইয়াও কোন চিঠি দেয় নাই। রোজই ভাবি, একখানা চিঠি লিখি; ঠিকানা তো জানাই আছে। কিন্তু হইয়া উঠে না।

একদিন দেখি, একটী পনের-ষোল বৎসরের ছেলে আমারই ঘরের এদিক-ওদিক কি খুঁজিতেছে। জিজ্ঞাসা করিতে কহিল—"যতীনবাবু কোথায় থাকেন বল্‌তে পারেন?"

কহিলাম—"যতীন কি? গুপ্ত?"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে কহিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গুপ্তই বটে।"

শুনিয়া কহিলাম—"হ্যাঁ, আমি। কেন বল দেখি, কোথা থেকে এসেছ?"

"হরিগঞ্জ থেকে। কালীমোহনবাবুকে চেনেন তো?—তিনি আমার দাদা।"

তাহাকে তাড়াতাড়ি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলাম। তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বৌদি' কেমন আছেন?"

সে কহিল—"তিনি তো আর নেই! দাদা যাবার আগেই—!"

কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, ইহারাও কম আঘাত পায় নাই। দুঃখ-সংবাদে আমারও চোখে জল আসিল। অবশেষে কালীমোহনের কথা

জিজ্ঞাসা করিতে সে কহিল—"দাদা যখন বাড়ী গিয়ে পৌঁছলেন—তখন আমরা শ্মশানে। বাড়ী এসে শুনলুম, তিনি না কি বাড়ী ঢুকেই সকলের মুখের দিকে একবার চেয়েই সব বুঝতে পারেন। একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ওরা বুঝি নিয়ে গেছে ?' তারপর হাতের ফলমূল সেই-খানে ফেলে রেখে ছুটে শ্মশানের দিকেই যান; পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হয় নি। বাড়ী ফিরতে মা বল্লেন—একবার ডেকে আনতে। গিয়ে দেখি,—চিতার পাশে দাদা বসে' আছেন—আর চোখ দিয়ে শুধু জল গড়াচ্ছে। ডাকলুম—কোন উত্তর দিলেন না। অনেক ডাকতে চম্‌কে উঠে আমার দিকে চাইলেন। বল্লুম—'বাড়ী চলুন, মা ডাকছেন।' বল্‌লেন—'তুই যা' আমি পরে যাব।' ফিরে এলুম। মা শুনে আমার উপর রেগে বললেন—'আবার যা', সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়।' গিয়ে আর তাকে খুঁজে পেলুম না। অনেক দূর পথ—প্রায় তিন ক্রোশ। ফিরতে রাত হয়ে গেল অনেক। রাত্রে আর খোঁজ করা গেল না। পরদিন সারা গাঁ খুঁজলুম-পেলুম না। ভেবেছিলুম, এখানে এসেছেন। তাই মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

সমস্ত শুনিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনই বাহির হইয়া আসিল।

তাহাকে অন্য অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; সমস্তই বলিল। মেসেই তাহার খাবার বন্দোবস্ত করাইলাম।

বিকালে আমার পরামর্শ অনুসারে সে কালীর ঘরে গেল। সঙ্গে আমিও ছিলাম। সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া কালীর সামান্য যা' কিছু জিনিষ-পত্র ছিল লইয়া রওনা হইয়া চলিয়া গেল। ভাবিলাম, যাক্, একজন লোকের সকলই এখান হইতে শেষ হইল!

মাস দুই পরের কথা। কাজের চাপে এবং সময়ের গুণে কালীর স্মৃতি অনেকটা ম্লান হইয়া আসিয়াছে। সেদিন বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, হঠাৎ আমার নামে একটা মণিঅর্ডার আসিল—প্রেরক কালী। কোন ঠিকানা দেয় নাই যে চিঠি দিব, কি খোঁজ করিব। দেখিলাম, কলিকাতা হইতে পাঠাইয়াছে। গভীর বেদনায় মনের ভিতরটা টনটন করিতে লাগিল।

তারপর দীর্ঘ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। ছিন্ন কন্থারই মত পূর্ব্ব জীবনকে বিস্মৃতির গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া বর্ত্তমানের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। এ চলার বোধ করি শেষও হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। হঠাৎ একদিন কালীর সহিত দেখা হইয়া গেল। কলিকাতার কোন ঘৃণিত পল্লীর মাঝে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে সকলকে সাধিতেছে—"বাবু ফিরুন, হতভাগার দুঃখের ইতিহাস একটু শুনে যান!"

কিন্তু সে ফেলা উপদেশ কেই বা শুনিতে চায়? পাগল বলিয়া প্রায় সকলে উপেক্ষা করিলেও দেখিলাম,--যাহাদের ব্যবসায়ের সে হন্তারক, তাহারাই শুধু তাহাকে "সাধু বাবা" বলিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাইতেছে।

দাঁড়াইলাম না। তাহার অলক্ষে যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি অলক্ষেই পিছাইয়া আসিলাম।

চেহারার একটা আঁচ ক'রে কিছু টাকাকড়ি রেখে গেলেন না কেন ?"

কোলের মেয়েটিকে দেখাইয়া বলিল, " খেঁদা, কালো, কুচ্ছিত যে নমুনা দেখাচ্ছ—"

কুবলয় ঝাঁঝিয়া বলিল, " আর নিজে যে রূপের ধুচুনী ! তবু যদি সায়ের দাঁত দুটো না উঁচু হ'ত ?"

অরুণ বলিল, " ওটা পুরুষের লক্ষণ। তোমার চ্যাপ্টা নাকের সঙ্গে ওর বেশ একটা মিল রয়েচে যে।"

রাগ করিয়া কুবলয় দাওয়া হইতে নামিয়া কহিল, " যার সঙ্গে যত মিলই থাকুক না কেন, কাল কিন্তু চাল নৈলে হাঁড়ি চড়বে না, বলে দিচ্ছি। কাজ না থাকলে মানুষ ব'সে ব'সে কেবল পরের খুঁতই ধরে !"

অরুণ বলিল, " এরই মধ্যে তাড়াতে চাও আমায় ? কুবলয়, কথাটা মনে পড়লো,—শোন। এই কাঁটাগুলো না থাকলে আজ কোকিলের ডাক ও চাঁদের আলো বেশ মিষ্টিই লাগতো, নয় ? আর কি কোনদিন ওগুলো তেমনি ক'রে দেখতে-শুনতে পাব, না মন দিয়ে ছুঁতে পারবো ?" বলিয়া মৃদু নিশ্বাস মোচন করিল।

কুবলয় ত্রাস্তস্বরে কহিল, " ষট্ ! ষট্ ! বাছাদের অকল্যাণ ক'রো না। অলক্ষুণে মিনসের কথা শুনলে হাড় পিত্তি জলে যায়।"

অরুণ ম্লান হাসিয়া বলিল, " কথটা আমিও ব'লতে পারতাম, বললাম না কেন না, কাঠরার সত্য শুনতে কেউ ভালবাসে না, এমন কে নিজের স্ত্রী ত নয়ই।"

কুবলয় শ্লেষমাখা স্বরে বলিল, " তাই ব'লে ছেলেমেয়ে গুলোকে ফেলে তোমায় নাচাতে হবে নাকি ? মরণ কথায় !"

অরুণ বলিল, " ডাব পাড়বার সময় লোকে লাথি মেরেই গাছে ওঠে। তবু—"

কুবলয় দাঁড়াইয়া আর কথা কাটাকাটি করিল না, বকিতে বকিতে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

ঘণ্টা খানেক পরে সে ডাকিল, " বলি খাবে, না ঘুমুবে ?"

অরুণ চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল।

কুবলয় বলিল, " নাও,—আসনটা পেতে কলসী থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে নাও। সংয়ের মত দাঁড়িয়ে রহলে কেন ?"

অরুণ বিনা বাক্যব্যয়ে আসন পাতিল, গ্লাসে জল ভরিয়া লইল।

অরুণ বসিয়া বলিল, " নূনটা পেতে পারি বোধ হয় ?"

বকুল বলিল, " এঁটোহাত—ঐ কুলুঙ্গীতে আছে- একটু নিয়ে আসতেও কি পার না ?"

অরুণ মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "থাক্, নূন না হ'লেও চলবে !"

খাইতে খাইতে অরুণ বলিল, "কুবলয়,—তুমি ভারি বুদ্ধিমান। তরকারী যাতে বেশী ক'রে না চাইতে হয়—তাইতেই বুঝি নূন দাও নি। ভাজা গুলোও পুড়িয়ে রেখেছ।"

কুবলয় ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "যেমন জানি—তেমনি রেঁধেছি। আন না একজন পাকা রাঁধুনী,—মনের মত ক'রে রেঁধে খাওয়াবে। বলে ইদিকে নেই একপয়সার মুরোদ,—তেল-ঘিওয়ালা ভাল রান্না খাবেন !"

অরুণ ম্লান হাসিয়া বলিল, "তেল-ঘি না দিলেও—আর একটা জিনিষে রান্না মুখরোচক হয়। সে ত আজ নেই! ছিল পাঁচ বছর আগে। আমার মনে আছে, মা একবার সজনের শাক তেল শাক করেছিলেন, তেল তাতে খুব পড়ে নি, তবু তিনবার সেই তরকারি চেয়ে খেয়েছিলাম।"

কুবলয় বলিল, "অথচ আমি সেদিন মাছের কালিয়া করলুম, মুখে দিয়েই থু-থু ক'রে ফেলে

দিলে। আঁতের জিনিষ না হ'লে কি মিষ্টি লাগে ?"

অরুণ উৎসাহের সঙ্গে বলিল, "ঠিক—ঠিক বলেছ—কুবলয়, দরদ না হ'লে কিছুই ভাল লাগে না।"

কুবলয় মুখখানা অন্ধকার করিয়া কহিল, জানি গো জানি, পর কখনও আপন হয় না।"

অরুণ কি বলিতে গিয়া বলিল না। দাওয়ায় বসিয়া মুখ ধুইতে লাগিল।

বিছনায় শুইয়া ঘুম আর আসে না। কাহারও প্রতীক্ষায় নহে,—এমনই নানা চিন্তা—অতীত দিনের নানা কাহিনীর আলোচনায় মাথার ভিতরটা কেমন করিতে থাকে।

সুখ বুঝি স্বপ্নই হইবে! ভালবাসা নিশার শিশিরবিন্দুর মত অচিরস্থায়ী। যতক্ষণ না সূর্য্য উঠে—ততক্ষণ সে কেমন—তৃণশিরে মুক্তার মত উজ্জ্বল। কিন্তু উত্তপ্ত রৌদ্রে শিশিরই থাকে না,—তার সৌন্দর্য্য! মনে একটা অস্পষ্ট ছায়ামাত্র দোল খাইতে থাকে।

সংসারে সুকোমল রাত্রির অবসান হইয়াছে। রাত্রির সঙ্গে স্বপ্নও মিলাইয়াছে,—স্মৃতি শুধু পড়িয়া আছে। সূর্য্য উঠিয়াছেন পূর্ব্ব সীমানার অনেকখানি উপরে;—পুত্র, কন্যা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা! হাসি আনন্দকে যেন জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইতে হয়।

এতক্ষণে গৃহের কাজ সারিয়া কুবলয় আসিল।

আধখোলা জানালা দিয়া চাঁদের আলো শয্যার খানিকটায় দেহ ঢালিয়া দিয়াছে। শয্যা ক্ষুদ্র। একটিমাত্র বালিশ মাথায় দিয়া অরুণ সেখানে শুইয়া আছে।

মেঝের উপর লম্বা মাদুর পড়িল, সারি সারি কয়েকটি বালিশ। ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে ক'টিকে দাওয়া হইতে টানিয়া আনিয়া কুবলয় তাহার উপর শোয়াইল এবং নিজেও সেই শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া হাত দিয়া হ্যারিকেনটা নিবাইয়া দিল। ঘর অন্ধকার হইল। শুধু, বিছানার জ্যোৎস্নাটা আর একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিছানার আলো যেন বহু বর্ষ পূর্ব্বের স্বপ্নাবশেষ। ঘরের বিরাট অন্ধকার 'হাঁ' করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে;—যে কোন মুহূর্ত্তে উহাকে গ্রাস করিবে।

উহারই কোলে শুইয়া কুবলয় পরম আরামে চক্ষু মুদিয়াছে।

সারাদিনকার পরিশ্রমও ত কম নহে। তাহাকে সকালে উঠিয়া উঠান নিকাইয়া ধান সিদ্ধ করিতে হয়, কাপড় কাচিতে হয়; রোগা ছেলেমেয়ের সাগু বার্লি যা' হয় কিছু পথ্যও নিত্য তৈয়ারী করিতে হয়। কাজেই রাঁধিতে বেলা হইয়া যায়। দুপুরে কুবলয় বিশ্রাম করে না। খাওয়া দাওয়া সারিয়া শান্তিপুরী কাপড়ে ফুল তুলিতে বসে। মাসে দু'তিনটাকা রোজগার তাহাতে হয়। তারপর—বৈকালের কাজ। পুকুর হইতে জল আনা, বাসন মাজা, ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেওয়া। চুলটা উহারই ফাঁকে একবার বাঁধিয়া লয়। সিঁথিতে সিঁদুর পরে। পায়ের আল্‌তা পুকুরের জলে ধুইয়া যায়,—তবু সে এয়োতির লক্ষণ রক্ষা করে।

সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বালিয়া খোকাখুকীদের গল্পও কিছুক্ষণ বলিতে হয়। না বলিলে—রোগা ছেলেমেয়েগুলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কর্ম্মক্লান্ত দেহকে অবসন্ন করিয়া তুলে। বনের মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে, অন্ধকারে জোনাকী জ্বলে; জল পাইলে—এই সকল ছাপাইয়া ভেকের ঐক্যতান সুরু হয়। ছেলেমেয়েগুলা অন্ধকার দেখিয়া মাকে আর ছাড়িতে চায় না।…মুখে কথা চলিতে থাকে—হাতে চলে সেলাই। তিনটি ছেলেমেয়ের মধ্যে দু'টির কাপড়-জামা রোজই রিপু করিতে হয়। ছোটটি দিগম্বর হইয়াই থাকে। অরুণের ও তার

নিজের দু'-একদিন অন্তর সারিলেও যায় আসে না। তারপর উনুন জ্বালিয়া মুড়ি ভাজিতে বসে। সকাল-বৈকালের জলখাবার। রাত্রির রান্নার পর্ব্বটা ত এইমাত্র শেষ হইল!

কাজেই— জ্যোৎস্নায় জানালার ধারে আসিয়াও শোয় না। ওর জীবনের স্বপ্নময় দিনরাত্রিকে কাজের চাপে চাপা দিয়া— ছেলেমেয়ে লইয়া— রাঁধিয়া খাওয়াইয়া বোধ হয় স্বচ্ছন্দেই দিন উহার চলে।

অরুণের কাজ নাই,— স্বপ্ন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার দেহ-মনে কলরোল তুলে।

আহা! বেচারী কুবলয়—কি দোষ উহার? সারাদিনকার পরিশ্রমের পর—এই কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামই ওর আদর,—সোহাগ,—তৃপ্তি যা' কিছু।

এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুচ্ছ রান্নার কথায় অরুণ কত কষ্টই না দিয়াছে উহার মনে! সমবেদনায় অরুণের মনটা কোমল হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে বিছানা হইতে নামিয়া কুবলয়ের শিয়রে আসিয়া বসিল এবং তার নিদ্রা-শিথিল হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া কোমল স্বরে ডাকিল, "কুবলয়।"

সেই পরম-মুহূর্ত্তের শুভ ডাক কুবলয় শুনিতে পাইল না। সে যেমন ঘুমাইতেছিল,—তেমনই ঘুমাইতে লাগিল।

শীর্ণ হাড়-ওঠা হাত—কাজের চাপে কর্কশ হইয়া গিয়াছে। পাতলা চামড়ার নীচে শুধু হাড়, রক্ত তার তলায় অতি ক্ষীণভাবে বহিতেছে। সেই রক্ত! পাঁচ বৎসর আগেকার টাট্‌কা—তাজা—ভালবাসায় ভরপুর। অন্ধকারে মুখ দেখা যাইতেছিল না, নতুবা প্রথম মিলনের স্মৃতিটুকু,—অধর সম্পুটে ভরিয়া অরুণ তাহাকে জাগাইয়া তুলিত।

সমস্ত স্পন্দন দু'টি করে ঢালিয়া সেই নিদ্রা-শিথিল হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অরুণ ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"কুবলয়।"

ধড়মড় করিয়া কুবলয় উঠিয়া বসিল। মাথায় কাপড়টা টানিয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "ছেলে-মেয়েগুলো রয়েছে - দেখ একবার আক্কেল। লজ্জা হয় না বুড়ো মিনসে?"

অরুণ অন্ধকারেই কাতর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বিছানায় উঠে আস্‌বে একবার? দেখ না, কেমন চাঁদ উঠেছে!"

অকস্মাৎ কুবলয় কাঁদিয়া উঠিয় তাহার পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল, "সারাদিন খেটে-খুটেও নিস্তার নেই, আবার রাত দুপুরে চাঁদ দেখবার জন্য জুলুম ক'রছো? মানুষের দেহ ত,—আর কত সয় বল। দাসী-বাঁদীরাও যে এর চেয়ে আরামে থাকে।"

তিক্ত দেহ--তিক্ত মন! ঠিক যেন মধ্যাহ্নের সূর্য্য মাথার উপরে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ তীব্র রৌদ্রধারায় জ্বালাইয়া দিতেছেন।

কুবলয় সত্যই বলিয়াছে, আর কত সয়!

স্বপ্ন থাকে ততক্ষণ - সংসারের প্রত্যুষ যেটুকু সময়ের মধ্যে। তারপর অভাব, দুঃখ-কষ্টের তাড়নায় শ্রমের কর্ম্মচক্রে সে স্বপ্ন গুঁড়াইয়া ধূলা হইয়া যায়! আলো অন্ধকারের মূল্য দিতে, সুখের দিনে আনন্দের আতিশয্যে মানুষ যেমন ভুল করে, দুঃখের প্রহার বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া সে তেমনই ভুলিয়া যায়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অরুণ শয্যায় আসিয়া শুইল।

তখন জ্যোৎস্না মেঘাবরণে কপিশ হইয়া উঠিয়াছে, আম্রকাননে কোকিলের ডাক থামিয়া গিয়াছে।

* শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'যৌবন স্বপ্নে'র পরিশিষ্ট।

—অবিচার—

শ্রীবিজয়কুমার বড়াল

বছর সাত পূর্ব্বের কথা। সেবার পূজার পর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা পুরী গিয়াছিলাম; আমরা অর্থাৎ মা, দাদা আর আমি। সমুদ্রের কাছাকাছি একটী বড় 'স্যানিটরিয়ম'এ একখানা ঘর নিয়ে আমরা থাক্‌তাম।

আমার বয়স এবং বুদ্ধি দুই-ই তখন অল্প; বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজনদের আদরে-সুখ্যাতিতে আমার নিজের রূপ-গুণ সম্বন্ধে গর্ব্বের আর অন্ত ছিল না; স্তুতি চাটুবাদে মনটা এতদূর বিগড়ে গিয়াছিল যে, ও দু'টি যার কাছ থেকে না পেতাম্ তাকে গ্রাহ্যই করতে চাইতাম না।

সেই 'স্যানিটরিয়মে' এ যাঁদের সঙ্গে মা ও দাদার আলাপ হ'য়েছিল, তারা সকলেই আমার রূপের প্রশংসা করত; যাঁদের সঙ্গে তা' হয় নাই, তারাও সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমায় দেখ্‌ত ব'লে মনে হ'ত।

কিন্তু এর ভিতর থেকে লক্ষ্য ক'রলাম যে, একটি লোক আমাদের দিকে বড়-একটা আসতেন না—অথচ, এই না আসাটাই আমাদের আশ্চর্য্য ঠেক্‌ত।

তাঁকে দেখলে খুব শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে ব'লে ম'নে হ'ত। ছাব্বিশ-সাতাস বছরের যুবক, লম্বায় চওড়ায় সুপুরুষ; আমাদের উপরের তলায় কোথাও থাক্‌তেন। তাঁর মুখখানিতে সর্ব্বদাই একটি বিষণ্ণতার শুষ্কতার ছায়া দেখতে পেতাম। বাইরে তাঁকে যখনই দেখতাম মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত পুরাদস্তুর সাহেব আর পোষাকের উপর গলা থেকে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত একখানি গরম কাপড়ের কালো রঙের ঢল্‌ঢলে জামা। সকালে বিকালে তিনি একাই বেড়াতে যেতেন, অন্য কা'রও সঙ্গে মিশতেন না, তাঁর কাছেও কাউকে যেতে দেখ্‌তাম না।

এই ভাবে কিছু দিন কাটবার পর আমার ভারি কৌতূহল হ'ল। কারও সঙ্গে কথা আরম্ভ ক'রতে আমার বিশেষ সঙ্কোচ ছিল না, তাই হঠাৎ একদিন তাঁর সাম্‌নে পড়ে' কথা বল্‌লাম। তিনি শান্তস্বরে খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু মনে হ'ল, তাঁর ম্লান মুখখানির উপর একটু আনন্দের ছায়াপাত দেখ্‌লাম।

সহসা আমার একটি খেয়াল জাগ্‌ল। সে জন্য দায়ী বোধ করি আমার চঞ্চল কৈশোরের তরল মতি। হাতে সেদিনকার ডাকে পাওয়া খানকয়েক চিঠি ছিল, অন্যমনস্কভাবে তাদের একখানিকে ভুঁয়ে ফেলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লাম; মনে করেছিলাম যে, তিনি দেখ্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখানি তুলে নেবেন; তারপর একটু হেসে, একটু ঝুঁকে কণ্ঠস্বরে কৃতার্থের পরিচয় ফুটিয়ে বল্‌বেন, আপনার অন্যমনস্কতার দরুন—ইত্যাদি।' কিন্তু সে সবের পরিবর্ত্তে তিনি আমার পা'য়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত শঙ্কাশীল দৃষ্টিতে দেখ্‌লেন, তারপর হঠাৎ চলে গেলেন,—চিঠিখানির কথা উল্লেখ করা দূরে থাকুক্, একটা কৈফিয়ৎও দিলেন না।

এরপর দেখ্‌লাম যে, দূর থেকে আমার দেখা পেলেই তিনি সরে যেতেন—যেন আমার গায়ের হাওয়া ছোঁয়াও তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক। এ রকম ব্যবহার কারও কাছ থেকে কখনও পাই

নাই, তাই রাগে, অপমানবোধে আমার মন ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল।

আরও কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলায় বেড়িয়ে ফিরছি। একটি গলির মোড়ে এসে দেখি, খানিকটা দূরে একজন বুড়ী একটা চুবড়ি মাথায় নিয়ে লাঠি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে চ'লেছে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছি এমন সময়ে দেখ্‌লাম, পথের শেষপ্রান্তে বুড়িটির প্রায় ঘাড়ের উপর পড়-পড় অবস্থায় সেই লোকটী!···তিনি অবশ্যই সাম্‌লে নিয়ে সরে দাঁড়ালেন, কিন্তু বুড়িটি এমন থতমত খেয়ে গেলনে যে সে হাত পা ছেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর চুব্‌ড়ির জিনিষপত্র সব পথের ওপর ছড়াছড়ি হ'য়ে গেল।

আমি ছুটে গিয়ে বেচারীকে তুলে বসালাম। তারপর লোকটির দিকে চাইতে খে্‌লাম যে, মুখখানি এতটুকু ক'রে অপরাধীর দৃষ্টি মেলে তিনি একপাশে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছেন! বিস্মিত ও বিরক্ত হ'য়ে আমি ব'ল্‌লাম, "ছি ছি, আপনি কি রকম ভদ্রলোক মশায়! এমন অবস্থায় চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে রইলেন!·· যাক্‌গে, এখন আপনার উচিত এ বেচারিকে কিছু দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া, আপনার কাছ থেকে এইটুকু ভদ্রতা আশা ক'রতে পারি হয় তো?"

তাঁর মুখখানি লাল হ'য়ে উঠল, ঠোঁট দুটও কম্পিত হ'ল। আমি ভাবলাম, তিনি কিছু বল্‌বেন; কিন্তু না, তিনি কিছুই বল্‌লেন না, কেবল একটু হাসিলেন। সে যে কি রকম হাসি তা আমি বুঝতে পারলাম না, কেবল এইটুকু বুঝলাম যে, সে অত্যদ্ভুত! তিনি এর পর সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্রও দাঁড়ালেন না।

এক্ষেত্রেও মনে হ'ল তিনি আমায় তাচ্ছিল্যই করালেন। মনটা যেন বিষের জ্বালায় জ্বল্‌তে লাগ্‌ল, পূর্ব্বেকার রাগ এইবার ঘৃণায় পরিণত হ'ল, তাঁকে অসভ্য বর্ব্বর ব'লে গালি দিলাম!

ঘরে ফিরে মা ও দাদাকে সব খুলে ব'ল্‌লাম। মা বিশেষ কিছু মন্তব্য ক'রলেন না। দাদা পূর্ব্ব থেকেই লোকটির উপর চটে' ছিলেন, এইবার খাপ্পা হ'য়ে উঠলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব যে কি, সুবিধা পেলেই তা' সুস্পষ্টভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন ব'লে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লেন।

তারপর প্রায় সপ্তাহ দুই আর তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

সেদিন আমরা ভাই-বোনে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চ'লে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা হ'য়ে পড়বে এই আশঙ্কায় একটা ভিন্ন পথ ধ'রে তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম। বাতাসের জোর বেশ বেড়ে উঠেছিল, সমুদ্রের ঢেউগুলা চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে ছুটে এসে তীরের কাছে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে' রাশি রাশি ফেনা ছড়িয়ে বালুর উপর গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

অকস্মাৎ দূরে কে যেন হৈচৈ তুল্‌ল, দ্রুতগতিতে সেদিক পানে চল্‌লাম। পৌঁছে দেখ্‌লাম—সেই লোকটি! তিনি বিবর্ণমুখে আমাদের বল্‌লেন, "দেখুন্‌, দেখুন, ঐখান থেকে একজন লোক জলের টানে কোথায় ভেসে গেল!—"

চম্‌কে উঠে ভীতদৃষ্টিতে আমি সেই দিকে চাইলাম। দাদা তখনই জলে পড়তে ছুটলেন। কিন্তু দু'-চার জন নুলিয়া এরই মধ্যে অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গী যা'রা দাঁড়িয়েছিল; তারা দাদাকে নিবারণ কর্‌ল। তিনি তখন ফিরে এসে লোকটিকে ধমক দিয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা বীরপুরুষ তো তুমি হে! একটা লোক ডুবে যায় সেদিকে নিজে একটু চেষ্টা না ক'রে—" কিন্তু কি মনে ক'রে হঠাৎ তিনি চুপ কর্‌লেন।

কিছুক্ষণ পরে জলমগ্ন লোকটিকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তুলে আন্‌তে দেখে আমরা হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। নুনিয়ারা তার জ্ঞানসঞ্চারের চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল।

লোকটি একপাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর মুখে চোখে, দেহভঙ্গীতে কেমন একটি অসহায় মানুষের মূর্ত্তি ফুটেছিল। কিন্তু অমন একজন পুরুষের পক্ষে বারবার এমন দুর্ব্বলতার কথা মনে হ'তে রাগে ঘৃণায় তখন আমার যে কি কর্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছিল তা' আর বল্‌বার নয়। দাদা আমার মুখের দিকে একবার দেখে তা'র সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন, "তুমি এমন বীরপুরুষ তা' এতদিন জান্‌তে পারি নি। এমন ফিট্‌ফাট্‌ হ'য়ে মাথা উঁচিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াও কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মনুষ্যত্ব, ভদ্রতাজ্ঞানও তো থাকা দরকার, ছিঃ! 'এ মিয়ার সোসাইটী পেট্‌, বৈঠকী বীর!"

এত বড় অপমানকর কথায় তাঁর চোখদুটি প্রায়ান্ধকারে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলে উঠ্‌ল; কিন্তু আমার সঙ্গে বারকয় দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই তিনি মুখ নামিয়ে ফেল্‌লেন,—দাদার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্যই কর্‌লেন না!

তাঁর সেই অটল মৌণতা আমাকে যেমন বিস্মিত কর্‌ল, তেমনি অস্থির ক'রে তুল্‌ল! দাদাকে ঠেলা দিয়ে বিদ্রূপভরে একটু জোরেই ব'ল্‌লাম, "লোকটাকে যদি ঘা'কতক বসিয়েও দাও দাদা তা'হ'লে ও তোমার গায়ে আঙুলটিও ছোঁয়াবে না। কাপুরুষ কোথাকার!"

আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে তিনি মুখ তুল্‌লেন। কী ভয়ঙ্কর তীব্রদৃষ্টি! মনে পড়লে এখনও শিউরে উঠি! তাঁর বিবর্ণ মুখের প্রতিটি শিরায় তখন রক্তের ধারা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল, মনে যেন কি একটা দ্বন্দ্ব দুর্নিবার হ'য়ে উঠেছিল, যেন তাকে প্রতিরোধ কর্‌তে চাইছেন, পারছেন না। মৃদু অথচ পরিষ্কার স্বরে তিনি আমাকে বল্‌লেন, "না, দেবী, কাপুরুষ আমি নই। কিন্তু আপনি অতিমাত্র নিষ্ঠুর। আমার একটা গোপনীয় কথা আছে—অবশ্য যদিও তা'তে লজ্জার কোনো কারণ নেই, তবু আমার কেমন একটা সংস্কার, ওটা প্রকাশ কর্‌তে সঙ্কোচ হয়। আমি দুর্ভাগা, তবু এ দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে ব'লে তাঁর করুণার পাত্র হতে আমার বাধে—বিশেষ, মহিলার কাছে; কিন্তু বাধ্য হ'য়ে একজন মহিলাকেই তা' বল্‌তে হ'চ্ছে।"

তাঁর স্বর কেঁপে গেল, একটু কেশে কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "যখন মহাযুদ্ধ বাধ্‌ল তখন আমি ইংলণ্ডে ইঞ্জিনিয়রিংয়ের ছাত্র। আমার বন্ধুবান্ধবদের সবাই যখন যুদ্ধক্ষেত্রে চ'লে গেল, তখন আমি আর থাক্‌তে পারলাম না—চেষ্টা ক'রে একটা সেনাদলে যোগ দিলাম। তারপর একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে গোলন্দাজদের সঙ্গে কাজ কর্‌তে কর্‌তে বিপক্ষের কামানের বিকট ফুঁয়ে আমার দু'খানা হতেই উড়ে গেল। সুতরাং এমন অসহায় অবস্থায় আমি কেমন ক'রে আপনাদের বোঝাব যে সত্যই আমি কাপুরুষ নই। আর গায়ের এই ক্লোক্‌খানা তুলে যে আমার কথার সত্যতা প্রমান করি সে শক্তিটুকুও যে ভগবান আমার কেড়ে নিয়েছেন, দেবী!"

বিস্ময়ে ও অনুতাপে আমার সারা মন তখন স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, ব্যথায়, লজ্জায় আড়ষ্টমূর্ত্তিতে আমি মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।...তারপর যখন চোখ তুল্‌লাম তখন দেখি, তিনি সেখানে নাই। দূরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাদা আমার পাশে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। *

---

* বিদেশী গল্পের অনুসরণে।

—মরীচিকা—

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

ভোলাযাত্রীর দল,—

সীমাহীন ধূ ধূ মরুর বুকের উপর দিয়ে চলে।

মেলা-ফেরতা বিরাট দলের পুরুষগুলোর চওড়া হাড্ডিওয়ালা চেহারা, রোদে দগ্ধান পোড়া রং, কোঁচকান বাবরী চুলে বকের পালক বাঁধা, হাতে তীর বর্শা, গলায় বনফুলের মালা, মনিবন্ধে লোহার তাগা, পরণে কারো নীল,কারো লাল কাপড়, গায়ে বেশী ভাগেরি ঘাস রঙের কুর্ত্তা।

কারো পিঠে তাঁবুর লম্বা লম্বা বাঁশ রশি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা কারো মাথায় কালিপড়া হাঁড়ি, খুন্তি, কোদাল, গজাল, সাবল, ইত্যাদি।

মেয়েদের দল, উজ্জ্বল তামাটে রং, একমাথা রুক্ষ চুল, হাতে বড় বড় বর্শা, বুকের উপর লাল নীল রঙ্গের কাঁচুলি দিয়ে বাঁধা, চোখের কোলে সুরমা টানা, কাঁকে কারো বাক্স, কারো হাঁড়ি, কারো চুব্ড়ি।

দু'দলের সামনে পেছনে আরব ঘোড়া, কুকুর, ছাগল।

মরুর পর মরু তারা পার হ'য়ে যায়, পিছনে কোন স্মৃতিই তারা রেখে যায় না। দুনিয়ার বুকে তারাই রাজা, তারাই প্রজা।

যাত্রীর দল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। পিঠ থেকে মাথা থেকে ধুপধাপ মোট ফেলে দেয়। পুরুষগুলো বাঁশের ডগায় বড় বড় হাতুড়ীর ঘা মারে, তাঁবু খাটান হয়ে যায়। একটু দূরে খোঁটায় পশুর দলের আস্তানা তৈরী হয়।

ছোটখাট রাজত্ব বসে যায়। বিশ্রামের পালা সুরু হয়। মেয়ের দল চুব্ড়ী মাথায় গ্রামের ভেতর ভেল্কি দেখাতে ছোটে। পুরুষদল কেউ শিকারে যায়, কেউ বাঁশের ডগায় নাচের খেলা দেখায়। এই রকম রোজগার চলে।...

শ্রাবণের সুরু—

ভরা বর্ষা। সাঁঝ আকাশের বুক জুড়ে মিশ-মিশে কালো মেঘ-যবনিকা। চারদিক ঘোলাটে বিবর্ণ। গ্রামের ভেতর তখন যাত্রীদলের ব্যবসা চলে।

আকাশের বুকের উপর পাগলা হাতীর ছোটা-ছুটি, তার সাথে ভীষন গর্জ্জন। শ্রাবণের অজস্র ধারা ভেঙ্গে নেমে আসে। যেন পৃথিবীর সাথে বোঝাপাড়ার দিন।

গ্রামের লোকগুলো কেঁপে উঠে। যাত্রী-দলের অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি। ছোটরা হাঁকে, আয়ে—বরখামে খেলি।

ও দিকে তাঁবুর ভেতর মাদল বাজিয়ে পুরুষ মেয়ে নাচে গায়, সরাব খায়।

দল আজ ধরেছে জোহেরাকে নাচ্তে। জোহেরা দেখতে সুন্দরী, হরিণ কালো টানা চোখ তার সুরমা আঁকা, গোলাপ ফোটা রং, দেহে ভরা উছল যৌবন, যেন বিরাট মরুর বুকে জোহেরা ফোটা ফুল। যাত্রীদলের সঙ্গে একবারেই খাপ্ খায় না। সর্দ্দার বলে—হাম্রা নিজ্ লেড়কী। তবু, অপরে বিশ্বাস করে না; তারা বলে—কোন ইরাণীর বুক হ'তে ছিনিয়ে আনা।

নানা ভঙ্গীমায় সরাবের পাত্র হাতে জোহেরা নাচে।

জমীর রাঙ্গা চোখ দু'টী স্থির ভাবে জোহেরার

দিকে নিবদ্ধ রেখে বসে থাকে। নাচ শেষ হ'লে জমীর ডাকে—জোহেরা, বাহার আয়ে।

গাঢ় কালো আবরণ সরে যায়, চাঁদ আকাশে ভেসে ওঠে। নিঃসঙ্গ প্রান্তর বুকে চাঁদনী রাতের বিপুল সমারোহ।

তাঁবুর অনেক দূরে দু'জনে চলে যায়। একটা গাছতলায় বসে। জমীর জোহেরার মুখপানে চেয়ে থাকে; আস্তে আস্তে জোহেরার একটী হাত নিজের কোলে টেনে নেয়। খানিক পরে বলে—জোহেরা!

—কা ভাই!

—নেহি, তোম মায়কো পিয়ারী!

জোহেরার মুখখানা ডালিমের মত লাল হ'য়ে যায়। হাতখানা টেনে নিয়ে না-র ভঙ্গীতে নেড়ে, দেহটা মৃদু দুলিয়ে বলে—নেহি, কভি নেহি, তু মেরা ভাই!

চাঁদের রাতটা জমীরের কাছে বিশ্রী বিবর্ণ হ'য়ে যায়। বুক থেকে একটা নিরাশার নিশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে আসে।

পূবের আকাশে ধীরে ধীরে সাদা রং ফুটে ওঠে। যাত্রীদলের তাঁবুর ভেতর জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। পুরুষের দল ধনুক হাতে বাঁশ কাঁধে ক'রে বেরিয়ে যায় গ্রামের দিকে। সর্দ্দারের তাঁবু খুলে জোহেরা বেরিয়ে আসে। সূর্য্যের তরুণ আলো তার বুকে মুখে জড়িয়ে ধরে, জৌলস বেড়ে যায়।

—সাম্‌নের তাঁবুর বাহিরে সহিদ ধনুকের ছিলে বাঁধতে থাকে। হঠাৎ তার নজর পড়ে জোহেরার ওপর, চোখ দুটো আনন্দে জ্বলে ওঠে। কিন্তু তখনি নিষ্প্রভ হ'য়ে নুয়ে পড়ে। কালকের কথা মনে পড়ে—জমীর জোহেরার হাত ধরে' রাতে বেড়াতে যাওয়া। জমীর ভাগ্যবান।

কিন্তু জোহেরা দেহখানা তরঙ্গিত হিল্লোলে দুলিয়ে সহিদের কাছে এসে বলে—গাঁওমে যাওগে?

সহিদ আনন্দে ব'লে--উঠে,—হ্যাঁ।

তারপর ভুলের যবনিকা ধীরে ধীরে সরে যায়। দু'জনের মনের ভাষা মুখের কোণে মুখর হয়ে ওঠে!

থম্‌থমে রাত।

তাঁবুর ভেতরে পুরোদমে হল্লা চলেছে। সেখান থেকে অনেক দূরে, স্তব্ধ নিঝুম প্রান্তরের ওপর জোহেরা ও সহিদ বসে আছে।

জোহেরা চপল ভঙ্গীতে বলে—মেরেজান্!

—কা পিয়ারী! বলে সহিদ প্রবল আবেগে জোহেরাকে আকর্ষণ করে' বুকে চেপে ধরে। আকাশ প্রান্তর জুড়ে যেন তৃপ্তির হাওয়া বইতে থাকে। জোহেরা খালি আবছা দেখতে পায়,—দূরে শড়কি হাতে একটা লোক চলে যায়। বোঝে, মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

রাত পোয়াতেই চির নিরাশ্রয় যাত্রীদের যাত্রা সুরু হয়েছে। খটাখট্ তাঁবু ওঠাবার শব্দ। ভেঙে যাবার কোলাহল। সর্দ্দার খোঁজ ক'রে দেখে,—জমীর নেই। জোহেরাকে জিজ্ঞেস করে। অন্যমনস্কভাবে সে বলে—কা জানি। অলক্ষ্যে দু'ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু ঝরে পড়ে। সহিদের হাতে ধ'রে জোহেরা দলের পেছুতে চলে। বুকের ভেতরটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে ঝরনার ধারা নামে। সহিদ জোহেরার মাথায় হাত দিয়ে বলে—রুদো মৎ।

হঠাৎ পেছনে যেন কার পরশ পায়। জোহেরা চম্‌কে পেছনে ফেরে! কিন্তু কোথায় কে? তবু জোহেরের মনে হয়,—কে যেন ধীরে ধীরে ডাকছে—জোহেরা মেরে বহিন!

যাত্রীর দল তখন বিরাট প্রান্তরকে পেছু রেখে চলেছে।

—ফরাসী-শিক্ষা—

শ্রীপ্রমীলা দেবী

বন্ধুবান্ধবেরা বিমলের নামকরণ করিয়াছিল—মোটকা। তাহার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে হইলেও একটু বেমানান রকম মোটা হইয়া পড়িয়াছিল—এই অপরাধ। খুব ভাল ছেলে—নামজাদা স্কলার—বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব লইয়া সে সম্প্রতি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিল।

এ হেন লোকের পক্ষে প্রধান প্রধান বিদেশী ভাষাগুলি জানা না থাকিলে প্রতি পদে ঠোকর খাইতে হয়। কাজ আরম্ভ করিয়া দুই পাঁচ-দিনের মধ্যে সে টের পাইল—কী মুস্কিল! ভাষা না জানায় তাহার অবস্থা হইল ডানাকাটা পাখীর মতো—ঝোঁক আছে, উড়িতে পারে না। হয় গবেষণা একেবারেই ছাড়িতে হইবে—না হয় —

বিমল সঙ্কল্প করিল, তার স্বভাবগত কুঁড়েমি-টাকে যেমন করিয়া হোক চাপা দিয়া ফরাসী ও জার্ম্মাণী ভাষাদুটোকে শিখিয়া লইতে হইবে। একজন টিউটার খুঁজিতে লাগিল।

শীতকালের দিন সকালবেলা বিমল বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছে—এমন সময়ে চাকর আসিয়া জানাইল—একটি মেয়ে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। এবং প্রায় সেই সঙ্গেই ঘরে ঢুকিল উঁচু হিলওয়ালা জুতা পায়ে একটি যুবতী। মেয়েটি তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল।

বিমল বলিল—আপনি ফ্রেঞ্চ টিউটার—অনুপম পাঠিয়েছে? বেশ হয়েছে, বসুন, আমি তাকে বলেছিলুম বটে—

কথা বলিতে বলিতে বিমল কৌতূহলে লাজুক চোখে এক একবার মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল। নেটিভ ক্রিশ্চানের মেয়ে, দেখিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ণ যুবতী। ক্ষীণ পাণ্ডুর মুখ, কুঞ্চিত চুলের থোলো এবং তনু লতা দেখিয়া মনে করা যায় বয়স ষোল। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের পরিপূর্ণ গড়ন এবং তীক্ষ্ণ কালো চোখ দুটীর দিকে নজর পড়িতে বিমলের মনে হইল—উহার বয়স কুড়ির নীচে ত নয়ই—হয়ত বা বাইশ তেইশ।

মেয়েটির নাম বলিল—মেরী নলিনী রায়। কাজকর্ম্মের কঠোর শুষ্ক ভাব ছাড়া তাহার মুখের উপর আর কিছুর ছায়ামাত্র নাই। একটিবার সে হাসিল না, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল না পর্য্যন্ত। শুধু এক পলকের জন্য তাহার মুখের উপর কেমন হতভম্বের ভাব জাগিয়া উঠিল, যখন জানিল যিনি পড়িবেন তিনি ঠিক স্কুলের খোকা নহেন, এবং সেই ছাত্রটিই তাহার বিপুলবপু লইয়া একেবারে সামনে বসিয়া। মেরী বরাবর ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে পড়াইয়া আসিয়াছে—এমনটা আগে ভাবে নাই।

বিমল বলিল—"আচ্ছা, মিস্ রায় তাহলে ঠিক রইল সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা অবধি আমাদের পড়াশুনো হবে। মাইনে যা বল্‌লেন, তিরিশ টাকা···আমার কিছু বল্‌বার নেই···বেশ, তিরিশই—

তারপরেও তাহাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইল কিন্তু তাহা ফরাসীভাষাতত্ত্ব বিষয়ক নয়। বিমল জিজ্ঞাসা করিল—চায়ের অভ্যাস আছে কি না?···এবং হাতের ফাউণ্টেন পেনটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটু হাসিয়া পরম ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে

চাহিল—তিনি কে, কোথায় পড়াশুনা হইয়াছে—কি করেন ইত্যাদি।

মেরী শুষ্ক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া যেন কর্ত্তব্য শেষ করিতে লাগিল। বছর দুই আগে সে বি,এ, পাশ করিয়াছে। তার বাবা বহুদিন ফ্রান্সে ছিলেন, তাঁর কাছেই ফ্রেঞ্চ শেখা। বাবা বাঁচিয়া থাকিতে অবস্থা ভালই ছিল কিন্তু অল্পদিন আগে তিনি মারা গিয়াছেন। এখন সে ও তাহার মা একরূপ নিঃস্ব। পেটের দায়ে একটা মিশনরী স্কুলে চাকরী জুটাইয়া লইয়াছে, আর একটি আইরিশ ভদ্রলোকের বাড়ী ছোট ছেলেমেয়েদের ফরাসী শিখায়।…

মেরী চলিয়া গেল, কিন্তু তার কাপড় চোপড় ও অঙ্গরাগের মৃদুরেশ ঘরে লাগিয়া রহিল। অনেকক্ষণ আর বিমলের কাজে মন বসিল না। বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহার মাথামুণ্ড নাই।

মাথামুণ্ড জুড়িয়া দিলে ভাবনাটা হয়ত এইরূপ দাঁড়ায়—এই মেয়েটি কেমন নিজে খাটিয়া নিজের উপায় করিতেছে…দেখিতে বেশ লাগে…আমাদের সমাজে এটা হইতে পারিত না…দুঃখ এই, এমন ফুলের মত তরুণীকেও দারিদ্র্য রেহাই দেয় না—পেটের জন্য ইহাকেও এমন করিয়া বেড়াইতে হয়…

এইসব সমাজে বিমল কোনদিন মেশে নাই এবং এই ধরণের মেয়েদের সম্বন্ধে তার কিছু প্রত্যক্ষজ্ঞানও ছিল না। যেটুকু শুনিয়াছে তাহাতে তাহার ভাবিতে দ্বিধা হইল না এই সুশ্রী-চেহারা যুক্ত মেয়েটি কেবল যে বাড়ী বাড়ী ফ্রেঞ্চ শিখাইয়া বেড়ায় তাহা নহে, আরও কি করে কে জানে?

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সাতটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী আছে—মেরী আসিল। ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া দুইগাল রক্তাভ হইয়াছে। আসিয়াই বর্ণমালা শিখিবার একখানা বই খুলিয়া বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করিল—ফরাসী ভাষায় ছাব্বিশটি অক্ষর, প্রথম অক্ষরের নাম এ, দ্বিতীয় বি—অর্থাৎ যেন একটি পাঁচ বছরের খোকাকে পড়াইতেছে।

বিমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল—একটা কথা…পড়ানোটা একটু অন্যভাবে আরম্ভ কর্‌লে সুবিধা হয়…আমি ইংরাজী জানি, ছাড়া ল্যাটিন গ্রীক ও কিছু কিছু পড়াশুনো আছে…বরং একেবারে একটা নামজাদা লেখকের বই আরম্ভ করে দিন—সে তার এক বন্ধুর দৃষ্টান্ত দিল-তিনি একখানা ইংরাজী, একখানা জার্ম্মেনী, এবং একখানা ফরাসী বাইবেল পাশা-পাশি রাখিয়া প্রতি কথাটি মিলাইয়া মিলাইয়া পড়িয়া এক বৎসরের মধ্যে চমৎকার ফরাসী শিখিয়াছিলেন।

মেরী অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। প্রস্তাবটি তার কাছে একেবারে অসম্ভব ও হাস্যকর ঠেকিল। একটি ছোট ছাত্র এই রকম প্রস্তাব করিলে তার ভাগ্যে অবশ্য অনুরূপ ব্যবস্থা হইত। কিন্তু এখানকার এই বিষম স্থূল এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রটির সম্বন্ধে সে সব চলে না! সংক্ষেপে বলিল—বেশ! যেমন খুসী—

বিমল আলমারী হইতে একখানি বই বাছিয়া আনিল দেখুন ত এটাতে চল্‌বে কি?

মেরী নির্লিপ্তভাবে বলিল—একটা হলেই হল—দিন্—

একেবারে বইএর নামথেকেই আরম্ভ করা যাক্—Memoirs।"

মেরী অনুবাদ করিয়া বলি—স্মৃতি-কথা—

তারপর মিনিট কুড়ি বিমল রকমারীভাবে প্রশ্ন করিয়া ঐ একটা কথা শিখিতে লাগিল। মেরী বিরক্ত হইয়া যা তা করিয়া কোন রকমে উত্তর দিয়া যাইতে লাগিল—এমন ছাত্রের পাল্লায় সে কখন পড়ে নাই—পড়িবার এমন অদ্ভুত ধরণ সে কিছুই বুঝিল না—বুঝিবার চেষ্টাও করিল না।

বিমল প্রশ্ন করিতে লাগিল, আর যখন তখন মেরীর সুবিন্যস্ত চুলের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—চুল ত ইহার আসলে কোঁকড়া নয়, কোঁকড়াইয়া তোলা হইয়াছে নিশ্চয়···আশ্চর্য্য... সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়া এমন সাজ-সজ্জার সময় পায় !

ঠিক আটটার সময় মেরী উঠিল, 'গুড নাইট' বলিয়া একেবারে কোন দিকে না তাকাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চুলের এবং অঙ্গের মাদক সুরভি ঘরের মধ্যে খেলা করিতে লাগিল এবং আরো অনেকক্ষণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন গবেষক-ছাত্র শ্রীমান বিমল একেবারেই কিছু করিল না, টেবিলের ধারে বসিয়া এটাসেটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

আরো কয়েকটা দিন কাটিল। এই কয়দিনে বিমল বুঝিল যে তার শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিল, তাহা ঠিক নয়—শান্ত, সভ্য, চমৎকার মেয়ে ! কিন্তু তার শিক্ষাটা একেবারেই ভূয়া—শুধু ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াইতে পারে, তার মত ছাত্রকে পড়াইবার ক্ষমতা একেবারেই নাই। তখন ঠিক করিল—আর সময় নষ্ট না করিয়া মেরীকে বিদায় দিয়া নূতন মাষ্টার আনিবে।···সপ্তাহ খানেক পরে একদিন খামের মধ্যে তিনখানা দশ টাকার নোট ভরিয়া, মেরী আসিলে তার সামনে ধরিল। কিন্তু কথা গুলো যেমন বলিবে ভাবিয়াছিল—তাহা হইল না, গোলমাল হইয়া গেল। যেনতেন গতিকে জোড়াতাড়া দিয়া বলিতে লাগিল মাফ কর্ব্বেন; আপনাকে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি দুর্ভাগ্য ক্রমে -

খামখানি দেখিয়া মেরী সব বুঝিল। এই কয়েক দিন পড়াইতেছে, কিন্তু আজ এই প্রথম ছাত্রের সম্মুখে মুখের উপর হইতে কর্ত্তব্যপরতার শুষ্কভাব মুছিয়া গেল—মুখখানা শঙ্কায় মলিন হইল, একটু লাল হইয়া উঠিল। তারপর চক্ষুদুটী নামাইয়া গলার সরু হার আঙ্গুল দিয়া নাড়াইতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া বিমল বুঝিতে পারিল, মাসিক তিরিশটাকা মেরীর পক্ষে কতখানি, এবং এই চাকরী গেলে তার পক্ষে কত ক্ষতি হইবে !

বিমলের মনের মধ্যে আরো গোল পাকাইয়া যাইতে লাগিল ··ধাঁ করিয়া হাতের খামখানি পকেটে পূরিয়া সে বলিল—মাফ কর্ব্বেন, আমাকে দশ মিনিটের জন্য একবার ভেতরে যেতে হচ্ছে—

সে যে মেরীকে বিদায় দিতে চাহে নাই—শুধু তাহার কাছে কিছুক্ষণের ছুটী চাহিবার দরকার ছিল, ব্যাপারটাকে এমনি দাঁড় করাইয়া বিমল পাশের ঘরে দশমিনিট কাটাইয়া আসিল। ফিরিয়া আসিবার সময় আরো বাধো বাধো ঠেকিতে লাগিল···তাহার এই ছুটীর লওয়া, মেরী কি ভাবে লইয়াছে, কে জানে ? তাহার আরো লজ্জা করিতে লাগিল।

পড়া আবার আরম্ভ হইল, কিন্তু বিমল মন দিল না, বুঝিল—এই পড়ায় তার একবিন্দু লাভের আশা নাই। সুতরাং মাষ্টার যেমন খুসী পড়াইয়া চলিলেন, ছাত্র প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিল না। মেরী অপেন মনে পাতা দশেক অনুবাদ করিয়া গেল, আর হাতের গোড়ায় কাজ না থাকায় বিমলচন্দ্র বসিয়া বসিয়া মেয়েটির থোলোথোলো চুলভরা ছোট মাথাটি, শুভ্র সুন্দর হাত দুখানি, ঘাড়ের বঙ্কিম রেখাটি পর্য্যন্ত তাকা-ইয়া দেখিতে লাগিল এবং কাপড় চোপড় হইতে যে স্নিগ্ধগন্ধ আসিতেছিল তাহার ঘ্রাণ লইতে লাগিল।

এই সময়ে হঠাৎ সে ধরিয়া ফেলিল সে যাহা মনে মনে ভাবিতেছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না ; ভারী লজ্জি হইল। তারপর বিরক্ত হইয়া উঠিল—এই কথাটা তাকে তীব্র সূক্ষ্ম বেদনা দিতে লাগিল যে মেরী তাহার সঙ্গে একেবারে শিক্ষক ছাত্রের

সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছে, কাজের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু দেখিতে চায় না—একটা বাজে কথা বলে না। একাগ্র মনে পড়াইয়া চলিয়াছে এমন শঙ্কাও হয় না যে অপরিচিত পুরুষের সামনে বসিয়া আছে, দৈবাৎ সে স্পর্শে কোন একটা অঘটন ঘটিতে ও পারে। বিমল ভাবিতে লাগিল—কী করিয়া ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা যায়, কারণ এই মেয়েটিকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, যে সে কী তুচ্ছ জিনিষ বুঝাইতেছে এবং বুঝাইবার ধরণটাও বা কী অন্যায় রকমের!

একদিন মেরী ফিকা সবুজ পোষাকে বড় বাহার করিয়া আসিল···যেন সে মেঘলোকের মধ্য দিয়া উঠিয়া চলিয়াছে—বুঝি একটু ফুঁ দিলেই উঠিয়া যাইবে! আধঘণ্টা আগে সে ছুটী চাহিল, এখান হইতে সোজা একজন আত্মীয়ের কাছে যাইবে।

সেদিন বিমল তাহার পারিপাট্যে ও শ্রীতে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। মেরী যথানিয়মে বই খুলিয়া প্রবল বেগে অনুবাদ করিয়া যাইতে লাগিল—

—তারপর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল···সে বল্‌ছিল, তুমি কিসের জন্য এমন খেটে মর, বন্ধু! তোমার ম্লানমুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—

"স্মৃতিকথা" বইখানা অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়াছিল, মেরী আরেকখানির অনুবাদ করিত। ··পুনরায় একদিন সে এক ঘণ্টা আগে আসিল এবং বলিল—এখান হইতে ফিরিয়া ছয়টায় বায়স্কোপে যাইবে।

পড়ার পরে মেরী যখন চলিয়া গেল, বিমল ও কাপড় জামা পরিয়া বায়স্কোপে চলিল। নিজেকে বুঝাইতে চাহিল—এত পড়াশুনা ও খাটুনীর মধ্যে একটু বিরাম ও আমোদ প্রমোদ চাই··· সেইজন্যই সে ওখানে চলিয়াছে এবং মেরীর কথা একবারও ভাবিতেছে না। ইহা কখনও স্বীকার করা চলে না যে, তার মত প্রতিভাশালী ছাত্র—যে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া বই লিখিতেছে এবং আজন্ম কুঁড়েমি যার স্বভাবগত যে তার সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া বায়স্কোপ চলিল, কিনা সেখানে একটা নেহাৎ নগণ্য মেয়ের দেখা পাইবার জন্য—যার সম্বন্ধে সে একেবারেই কিছু জানে না এবং যার না আছে বুদ্ধি, না আছে বিদ্যা।...

তবু, যে কারণেই হোক ইন্‌ট্যারভাল হইলে যখন আলো জ্বলিয়া উঠিল তখন তার বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করিতে লাগিল। সেই সময়টুকু বারাণ্ডায় পায়চারী করিয়া আবার অন্ধকার হইতেই কেমন বিরক্ত হইয়া নিজের যায়গায় বসিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল টিকিট ঘরের ওদিকটায় ফিকা সবুজ সাড়ীর প্রান্তটি···তাহার অন্তর দুলিয়া উঠিল, আর সত্যই জীবনে প্রথম সে ঈর্ষ্যা অনুভব করিল।

মেরী জন দুইতিন চোয়াড়ে চেহারার ফিরিঙ্গি যুবার সহিত বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। সে অনর্গল কত কি কহিতেছিল, হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। বিমল তাহাকে এই মূর্ত্তিতে কোনদিন দেখে নাই! যে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে, মনে কোন সঙ্কোচ নাই; এখানে আপনাকে অবারিত করিয়া দিয়াছে। কেন? কিসের জন্য?··· ফিরিঙ্গিগুলা উহার বন্ধু—একদলের লোক।

বিমল বুঝিতে পারিল, ঐ সমাজ আর তার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রহিয়াছে।

সে গিয়া মেরীকে নমস্কার করিল। মেরী কোনরকমে প্রতি নমস্কার সারিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল—ভাব যেন, সে এই সব বন্ধুমহলে জানাইতে চাহে না যে তার কোন ছাত্র আছে, তাকে ছেলে পড়াইয়া রোজগার করিয়া খাইতে হয়।···

তারপর বিমলের কি হইল, সে হাল ছাড়িয়া দিল এবং ইহার পর প্রতিদিন পড়ার সময়ে সে মনোহরা শিক্ষয়িত্রীকে দু'চোখ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। আর নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি না করিয়া কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিল, সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। কিন্তু মেরীর কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না, সে যথাপূর্ব্ব আটটা বাজিলেই 'গুডনাইট' বলিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং বিমল দুঃখের সহিত ভাবিত—মেরী তাহাকে চাহিয়াও দেখে না, এত করিয়া নজরে পড়িল না —হায় হায়।—

কখন কখন, পড়া চলিতেছে—তার মাঝখানে সে বসিয়া বসিয়া স্বপ্ন দেখিত, কত আশা করিত, মতলব পাকাইত, মনে মনে প্রেম-নিবেদনের কত রকম মুসাবিদা করিত, ভাবিত এই ধরণের মেয়েরা ত খুব বেশী দুষ্প্রাপ্য বলিয়া শোনা যায় না তবে—কিন্তু ঘরের বাতি খোলা হাওয়ায় রাখিলে যেমন এক পলকে নিভিয়া যায়, তেমনি মেরীর মুখের দিকে একটিবার তাকাইলেই, সমস্ত গোল পাকাইয়া যাইত।...একদিন তাহাকে যেন ভূতে পাইয়া বসিল। বিকারের ঝোঁকে লোকে যেমন আপনাকে হারাইয়া ফেলে তেমনি কিছুতে সে আজ নিজেকে সামলাইতে পারিল না। পড়ার শেষে মেরী যখন বাহির হইয়া যাইতেছে, তখন সে সামনে গিয়া থামিয়া থামিয়া নিঃশ্বাস লইয়া বলিতে লাগিল—আমি—আমি আপনাকে ভালবাসি আপনাকে না পেলে আমার জীবন—দয়া করুন আমায়—

মেরীর মুখ পাংশু নিষ্প্রভ হইয়া গেল—সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় যে ইহার পর আর এখানে পড়ানো চলিবে না, মাসিক ত্রিশটি টাকা নষ্ট হইয়া গেল! বিহ্বল ভয়ার্ত্ত চোখে সে বলিতে লাগিল—"না—না—অমন বল্‌বেন না, দয়া করে—"

কিয়ৎকাল পরে মেরী চলিয়া গেল। বিমলও মরমে মরিয়া গেল। ইহার পর মেরী যে আর পড়াইতে আসিবে না তাহা নিশ্চয়। ঠিক করিল, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে।

কিন্তু পরদিন যথাসময়ে মেরী আসিল। আসিয়াই একখানা বই লইয়া অনুবাদ করিয়া চলিল...

—ওগো বন্ধু, আমার এই ফুলটার প্রতি তুমি লোভ করিও না, ইহা যে আমার রোগা মেয়ের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। সে বড় দুঃখিণী...*

* শেকভের অনুসরণে।

'হারেম'

শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল
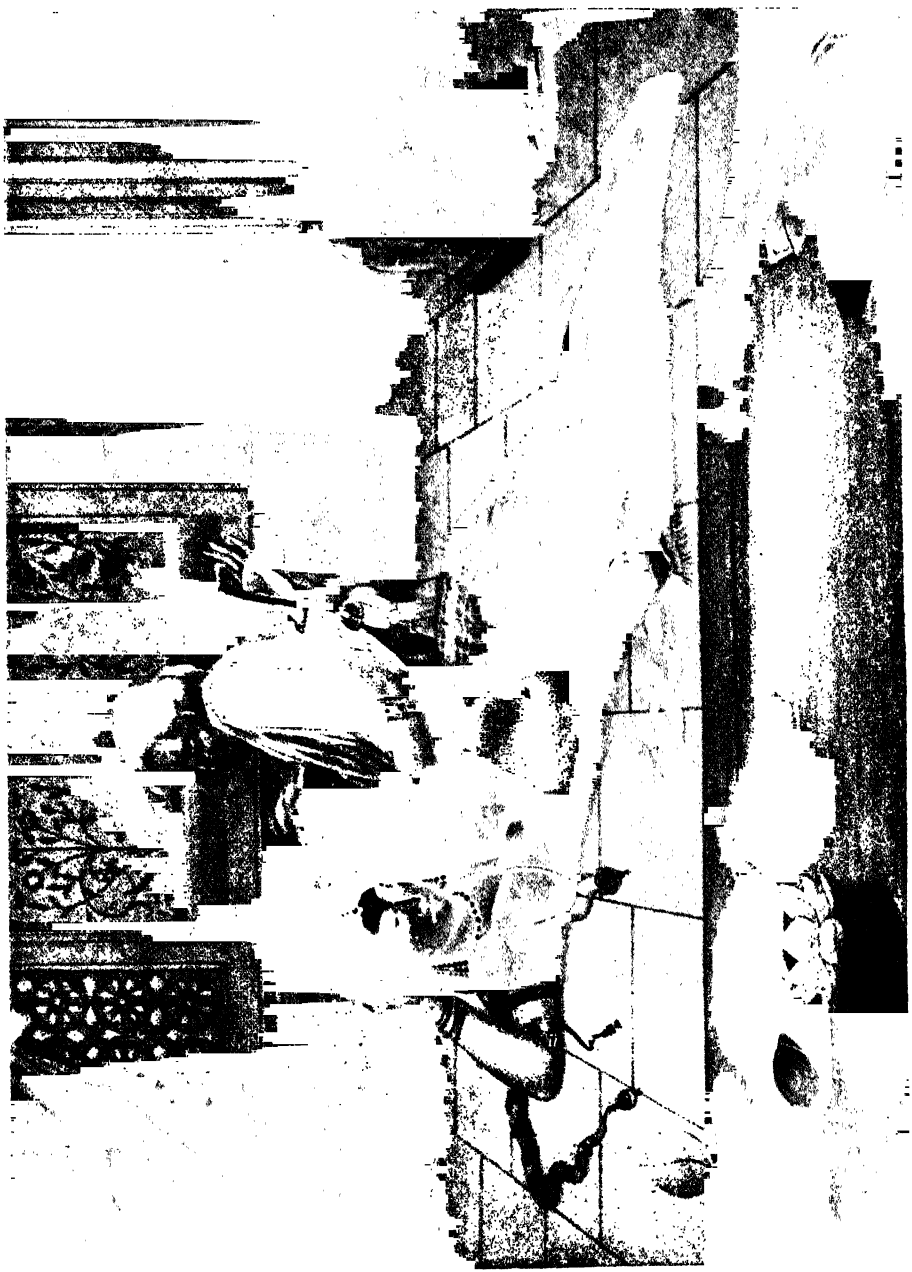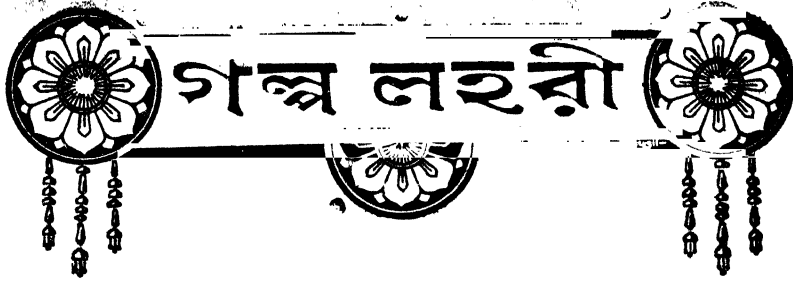
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ | মাঘ, ১৩৩৮ | দশম সংখ্যা

—লভ্-লেটার—

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি-এ

একটী মেয়ে।

বাসে চলিতে চলিতে এক চমকের মধ্যে হঠাৎ নজরে পড়িল আলগা ফোলানো খোঁপা কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এপ্লারংএর খদ্দরের শাড়ীখানি দেহলতাকে আড়াইবার বেষ্টন করিয়া আসিয়া চাবিহীন খোলা আঁচলটাকে বাতাসে ছাড়িয়া দিয়াছে, আল্তা-লাল নাগরা পায়ের প্রান্ত শুধু কোন রকমে ছুঁইয়া আছে। উজ্জ্বল শ্যাম মুখে উৎসুক দু'টি চোখ…

সমস্ত মিলাইয়া যেন একখানি ছবি!

দক্ষিণ তর্জ্জনী অবহেলাভরে উঠিল, সঙ্কেতে এক্সপ্রেস বাস থামিয়া গেল।

গাড়ীতে জায়গা ছিল না, অনেকেই দাঁড়াইয়া যাইতেছিল, তবু সেই গাড়ীতেই মেয়েটি উঠিতে এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া বসিয়া রহিল। এ ত নিত্যকার ঘটনা। রোজ রোজ মেয়েদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে ত আর পারা যায় না। একপেট খাইয়া অফিস যাইবার সময়ে আবার দাঁড়াইয়া যাইতে হইলে শুধু কর্ম্মভোগ নয়, বুক-পকেট হইতে পয়সা চুরী যাওয়া এবং জুতা মাড়াইয়া দেওয়া কিম্বা কারো গায়ে হুমড়ি খাইয়া পড়ার আশঙ্কাও আছে। সুতরাং যেমন আছ, চক্ষুলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকো।

কিন্তু আমি পারিলাম না। কেন পারিলাম না সেটা বিশদ করিয়া বলিতে পারিব না, তবে সেটা যে নিছক নারীজাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন নহে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারো। মানে, একজন বৃদ্ধকে দেখিলে হয় ত উঠিতাম না।

হিতে হইল বিপরীত। আমার জায়গায় থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল এক পুরুষ, ওদিকে বিপিন দা' দরজার গোড়া হইতে সশব্যস্তে উঠিয়া বসুন বসুন এই যে এখানে বসুন বলিয়া মেয়েটিকে নিজের জায়গায় বসাইয়া দিল।

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল—ট্যাঙ্ক্স্!

মেয়েটির একেবারে গায়ের উপর যে লোকটি বসিয়াছিল সে দিব্য আরাম করিয়াই বসিয়া রহিল। বিপিন দা' এবং সেই লোকটা মনে মনে দু'জনেরই মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমার আর

মেয়েটির মুখের দিকে ভালো করিয়া দেখা হইল না, সে কিছু পরেই নামিয়া গেল।

যাইবার সময়ে তার বাঁহাতে দু'খানি খাতা এবং ডানহাতে দু'গাছি চুড়ি আমার মনটাকে দিশাহারা করিয়া দিয়া গেল।

ঠিক বুঝাইতে পারিলাম না, যদি কবি হইতাম আরো চমৎকার করিয়া বলিতে পারিতাম। ফর্‌সা হইলেই যে সুন্দর হয় না, শ্যামবর্ণেও যে অপরূপ রূপ ফুটিয়া উঠে, সেদিন প্রথম যেন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম।

বৌদি'কে বলিলাম, একটি যা' আশ্চর্য্য মেয়ে দেখেছি, কোথায় লাগে তার কাছে তোমাদের চাঁপা—

চাঁপা বৌদি'র ভাইঝি, আমার স্কন্ধে চাপাইবার জন্য বৌদি'র চেষ্টার অন্ত নাই।

বৌদি' বলিলেন—ইস্‌, তা' আর হ'তে হয় না! চাঁপার মতন রং ক'জন বাঙালীর ঘরে আছে! ব'লে বিশ্বনাথের মন্দিরে পাণ্ডারা তাকে কিছুতে ঢুকতে দেয় নি! বলে মেম, শাড়ী পরে এসেছে, বিশ্বাস করলে না সে বাঙালী।

স্বীকার করি তার রং খুব, কিন্তু বৌদি', রংই সব নয়।

ও মা শোনো কথা! রং না হ'লে আবার সুন্দরী কি? বলে—সর্ব্ব দোষো হরেৎ গোরা। যাক্‌, কি দেখ্‌লে? কোথায় দেখ্‌লে?

কলেজ যাচ্ছিল একটি মেয়ে—

তবেই হয়েছে! কলেজে-পড়া মেয়ে না কি আবার রূপসী হয়! সব রোগা রোগা ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা, মা গো! আমার ভায়ের জন্যে ইস্কুল-কলেজের মেয়ে দেখ্‌তে আমি ত বাকী রাখি নি, জানো? শেষটা আমার ত বিশ্বাসই হয়ে গেল, যারা পড়াশোনা করে, তাদের চেহারা থাকে না, হয় ত পড়াশোনা থামাবার পর রূপ ফুট্‌লেও ফুট্‌তে পারে!

এ তোমার অন্যায় অভিযোগ, কলেজে-পড়া মেয়েরা একথা শুন্‌তে পেলে তোমার নামে মানহানির অভিযোগ আন্‌তে পারে।

তা' আনুক ঠাকুর-পো। এখন বাজে কথা রেখে দিয়ে তুমি সুরু করো ত কোথায় কি জিনিষ দেখ্‌লে, যাতে এমন একেবারে—

এমন একেবারেরই কথা! বীডন ষ্ট্রীটের মোড় যেন আলো করেছিল।

দেখো ভাই, বীডন ষ্ট্রীটের মোড়ে যেন কোনো দিন গোরুর গাড়ী চাপা পড়ো না, তা' হ'লে ফাইন দিতে হবে।

আচ্ছা মশাই, তোমার কাছে পরামর্শ নিতে আসি নি। তার কোন্‌টা বর্ণনা করব, অতবড় খোঁপা আজ অবধি দেখি নি।

খোঁপায় স্পঞ্জভরা আছে কি না জানো কি?

তা' থাকে না কি আবার?

শুধু স্পঞ্জ নয়, ন্যাকড়ার ফালিও থাকে। কি জাত্‌ জানো কি?

অ্যারিষ্টোক্র্যাটিকই হবে।

অ্যারিষ্টোক্র্যাটিকের মোটর জোটে না? বাসে যাবে অভিজাত?

তোমার যে খুব রাগ দেখ্‌তে পাচ্ছি। চাঁপাকে পছন্দ করি নি ব'লে না কি? যাই বলো, ঐ পাতাকাটা, মলপরা, হাতে তাগা-বালা, আমার দু'চক্ষের বিষ। দাঁড়াতেই শেখে নি এখনো। সামনে এসে দাঁড়ালো মাথাটা নীচু ক'রে। তেমন ধারা ট্যাক্স্‌ বলা শিখ্‌তে চাঁপার এখনো দশ বছর লাগ্‌বে।

বৌদি' রীতিমত চটিয়াছিলেন, যাবার সময় বলিয়া গেলেন—ঘর-সংসার কর্‌তে হ'লে শুধু ট্যাক্স্‌ শুনেই ত পেট ভরবে না।

আর একদিন অল্প অল্প বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায় ঘন নীলবর্ণ শাড়ী পড়িয়া দেখিলাম তরুণী চলিয়াছে। চুল ভিজিয়া গিয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই, আধ আলো আধ ছায়ায় অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে স্যাণ্ডাল ফেলিয়া, বৃষ্টির ছাট হইতে চোখের পাতা বাঁচাইবার জন্য ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া,—দেখিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম, হাতের ছাতাটা আগাইয়া ধরিতে যাওয়ায় ট্যাক্সস্ বলিয়া সে মোড় বেঁকিল।

আরো দেখা হইয়াছে, কাছাকাছি আসিয়া একবার অপলক-নেত্রে চোখেচোখে চাহিয়া চলিয়া যাওয়া—না, কোন কথা না, কিছু হাসি—তবু তাই যেন স্মরণের -চিরদিনের স্মরণের সামগ্রী মনের মণিকোঠায়।

দোকান ছিল আমার ফটোগ্রাফের, কতদিন কত তরুণী আসিয়াছে ফটো তুলিতে, কোনোদিন এমন শিহরণ জাগে নাই যেমন সেদিন—

সেই তরুণী, আর একটি সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে কলকণ্ঠে সিঁড়ি মুখরিত করিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল—আমরা ফটো তুলব। কি চার্জ্জ ?

মনে হইল বলি—কিছু না, দয়া করিয়া যদি তোল, সেই আমার ভাগ্য। চাপিয়া গেলাম। বলিলাম—কোন্ সাইজ বলুন।

ক্যাবিনেট।

তিন টাকায় তিন রকম।

দু'জনেরই মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। এত সস্তা! অন্য জায়গায় যে বল্লে একরকম পাঁচ টাকা ?

আমরা বড়দিন উপলক্ষে এই ব্যবস্থা করেছি। আমাদের একরকম তিন কপি এক টাকা। কোন্ ব্যাক্ গ্রাউণ্ডটা পছন্দ ?

কয়েকখানা দেখিয়া একটি মনোনীত করিল—পিছনে নদী, তরণী চলিয়াছে।

দু'জনে বসিল, তাহাদের কথাবার্ত্তায় জানিলাম তরুণীর নাম ইলা, সঙ্গিনীর নাম রমা।

ইলা! কি সুন্দর নাম! ইলা মানে কি তা' জানি না, কিন্তু নামটি বেশ, নয় ?

ফটোর কপি বৌদি'কে দেখাইলাম। দেখো আমার মানসী।

কোন্‌টি ? এ ধারেরটি, না ও ধারেরটি ? ইলাকে দেখাইলাম।

মা গো, কি তোমার রুচি ঠাকুর-পো! সরু সরু কাটি কাটি হাত-পা, তোমার যদি কোন পছন্দ থাকে! এর ওপর যদি গায়ের রং ময়লা হয়, তবে ত খোলতাই।

এরই নাম দেহলতা, কালিদাস যাদের বলেছেন তন্বী।

হ্যাঁ, তন্বী একে বলে! হাড় বার করা শুঁটকি!

আমি ফটো কাড়িয়া লইলাম। ভাইঝিকে বাতিল করিলে মেয়েদের এমনি রাগ হয়। আমারই ভুল, দেখাইতে যাওয়া। ভালো হইলেও ভালো যে বলিবে না, সে ত জানা কথাই। আমারই বোঝা উচিত ছিল।

শীতের এক সকালবেলা আবার নমস্কার পাইলাম। ইলা খবর দিল আজ আমাদের বোর্ডিংএ ছবি তুলতে চলুন, গ্রুপ তোলা হবে।

তৎক্ষণাৎ সম্মতি ও সময় দিলাম। কিন্তু সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে রিক্‌শ ভাড়া পাওয়ার নিয়ম, সেকথা বলিবার অবসরও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না।

অল্প কয়েকজন মেয়ে একটি মেস করিয়া থাকে। আমি যাইতেই কলগুঞ্জন সুরু হইল।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে দেখি ইলা রান্নাঘর হইতে স্যাণ্ডাল পায়েই বাহির হইয়া আসিতেছে। বলিল—বামুন আসে নি, ছুটির দিন আমরা নিজেরাই রান্না করছি।

হাতের হাতাটা একপাশে রাখিয়া সিঁড়ির রেলিংএ হাত দিল, আমাকে বলিল—দাঁড়ান, আগে যাই।

সবশুদ্ধ আটজন। প্রত্যেককে এক কপি দিতে হইবে। দাম সম্বন্ধে কথা হইল, বলিলাম —যা' দিতে পারবেন!

রমা হাসিয়া বলিল—না দিলে চলে কি?

কেন চল্‌বে না বলুন, খুব চল্‌বে। কিন্তু তা' চলিতে দিল না, দশ টাকার একখানা নোট দিয়া বলিল—আপনার প্রোফেশন। ধরুন। আপনি ত এমেচার নন। আরো যা' লাগে পরে নেবেন। হ্যাঁ, ফটোগুলো সিপিয়া ক'রে দেবেন।

স্থানবিশেষে টাকা লইতেও যে এতটা কষ্ট ও অপমান বোধ হয় আগে সে অভিজ্ঞতা ছিল না।

ইলা যে ঘরে থাকে সেই ঘরেই বসিয়াছিলাম, টেবিলের উপর ফ্রেমে বাঁধানো ইলার ছবি, বইগুলায় ইলার নাম লেখা। সে ঘরে আরেকটি মেয়ে থাকিত, পেন্সিলটা ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ফিলসফির মোটা একখানা বই লইয়া সে নাড়া-চাড়া করিতেছিল।

একটা মার্জ্জিত আবহাওয়ার সুবাস আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। ইলা ঘরে প্রবেশ করিল, রাস্তার মলিন ধুলায় তাকে যা' দেখায় তার চেয়ে শতগুণ ভালো দেখাইতে লাগিল ঘরের মধ্যে। দক্ষিণের জানলা দিয়া হাওয়া আসিয়া চূর্ণকুন্তলে ধাক্কা মারিয়া গেল, শুভ্র খদ্দর শাড়ী কাঁপিয়া গেল। পিছনে দেওয়ালে জাপানী ছবি—বরফঢাকা পাহাড়ের পাশে রৌপ্য-ধবল তটিনীর কোলে সোনালী পালতোলা তরণী—

ইলার হাতে একখানি ছেঁড়া খাম, হাতে করিয়া আনিয়া তাকের উপরে রাখা একটা বড় জাপানী ফুলতোলা বাক্স খুলিয়া ফেলিল, চিঠিটা রাখিয়া চাবিটা বিছানার তলায় যেথানে ছিল রাখিয়া দিল।

রুম-মেট—মণিকা তার নাম—মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—এলো এল্-এল্?

কি করিস্—বলিয়া ইলা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই সে চুপ করিয়া পড়ায় মন দিল, আমি এল্-এল্ কথাটার মানে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

তিনমাস আর ইলাকে পথে-ঘাটে দেখিতে পাই নাই। খোঁজ করিয়া জানিলাম সে বোর্ডিং অন্য কোথায় উঠিয়া গেছে।

একদিন হঠাৎ দেখিলাম ইলা দোতলা বাস হইতে নামিতেছে, সঙ্গে আর দু'টি তরুণী, পর-পর বোধ হয় জনকুড়ি যুবকও গাড়ী খালি করিয়া নামিয়া পড়িল। সকলেরই গন্তব্য-স্থান কি এক পাড়াতেই। একজন বলিল—ঐ যে দেখছিস্ ডানধারে, ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড।

একটি বৃদ্ধ বলিল—দশবছর বাদে এরকম কত দেখ্‌বে, ভিড় ঠেলে যেতে হবে। বুঝিলাম, স্ত্রী-স্বাধীনতা আর যে দেশে চলুক—সর্ব্বধর্ম্ম জাতিসমন্বয়ের পীঠস্থান কলিকাতায় চলিবার এখনো সময় হয় নাই।

দিনকতক বাদে, বোধ হয় দিন পনেরো—ইলা আমার ষ্টুডিয়োয় ছবি তুলিতে আসিল, সঙ্গে আমারি পুরোণো বন্ধু বসন্ত।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম!

বলিলাম—মানে ?

বসন্ত বলিল—নিউলি ম্যারেড্।

ইলা অবশেষে বসন্তটাকে করিল বিবাহ—যার নাম দিয়াছিলাম আমরা বথা দি গ্রেট্!

ইলা অবশ্য আমাকে না-চেনার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না, সহজভাবেই অনেক কিছু কথা কহিল এবং যাইবার সময় সেই পুরাতন সুরে বলিয়া গেল—ট্যাঙ্ক্স্।

নিড্নট্ মেনশন—আজ আর উচ্চারণ করিতে পারিলাম না।

বিশ্বের বিচিত্র বিধানে মাস তিনেক যাইতে না-যাইতে খবর পাইলাম মিসেস্ ইলা মিস্ হইয়া গেছে এবং নূতন ছবি কুললক্ষ্মীতে সহধর্ম্মিণীর পার্ট চমৎকার করিয়াছে। গ্রাজুয়েট ফিল্ম কোম্পানীর নূতনতম অবদান!

বেচারা বসন্ত, অথবা ব্রুট্ বসন্ত! রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। দেখা পাইলে ঘুসি মারিয়া বসি।

একদিন ঘটনা-চক্রে ট্রামে দেখা। বলিলাম—চিরকালটা একভাবে কাটালি, বিয়ে করলিই বা কেন, ছাড়লিই বা কেন ?

বলিল—আমাকে দোষ দিও না রাজেন। একবার আমার বাড়ীতে চল। দেখাবো সব।

উৎপাতের মূলসূত্র—সেই জাপানী ফুল-তোলা চিঠির বাক্স। খুলিয়া দেখাইল,—অসংখ্য চিঠি, অসংখ্য প্রেমিকের প্রেমপত্র গদ্যে-পদ্যে চিত্রে-হেঁয়ালীতে। যা' হইয়া গেছে হইয়া গেছে, আর হইতে দিতে বসন্তর আপত্তি ছিল।

বিবাহের পর যে চিঠিখানা ডাকে ফেলিতে দিবার আগে সে ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং যা' লইয়া বিবাহচ্ছেদ,সেখ নাও দেখাইল। পড়িলাম—

ডার্লিং,

"জোছনাহসিত বসন্ত নিশীথে
কেন এসেছিলে প্রাণে ব্যথা দিতে,
কেন গো বাঁধিলে এ বীণার তার
যদি না বাজাতে জানো।"

আমি বলিলাম—থাক, আর দরকার নেই।

উঠিবার আগে আর একখানা চিঠি দেখাইল—ময়মনসিংহের এক গণ্ডগ্রাম হইতে লেখা, বিবাহের কিছু পূর্ব্বে পাওয়া।

শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষঞ্চ,

পরে ইলা মা, আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ঝড়ে শয়ন-ঘরের টিনের চাল উড়িয়া গিয়াছে, ধানের মন একটাকা হইয়াছে। আর তোমার কলিকাতার খরচ বহন করিতে পারিতেছি না। শীঘ্র মধ্যে চলিয়া আসিবা।

নিত্য শুভার্থী—
তোমার পিতা

কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম কুসুমের কীটের সঙ্গে কবি রূপসীর মনোবিকারের উপমা দিয়াছিলেন।

—নারী—

শ্রীপ্রমথ দে, বি-এ

এক

কুটীরের স্বল্পান্ধকারে বেদনার দীর্ঘ-ইতিহাস অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া সুনীতি যখন ধীরে ধীরে শেষ করিলেন, তখন তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাসে শুধু এই কথাটাই ঘরের প্রতি কোণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল—"ইহার কি কোন উপায়ই নাই!"

নির্ম্মল কোন কথা কহিল না, কিন্তু প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে দেখা গেল যে, তাহার মুখে সুদৃঢ় অপ্রত্যয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে নাই। ব্যথাতুর বালিকার অন্তরের সুগভীর ভালবাসার এই করুণ-কাহিনী সত্যই তাহাকে কথঞ্চিৎ বিচলিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের জন্য। সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্র, এ অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, তাহা সে মুহূর্ত্তের মধ্যে স্থির করিয়া লইল। তাই পরক্ষণেই নিজের কণ্ঠস্বরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত করুণার সুর ঢালিয়া দিয়া সে কহিল—"আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

সুনীতি কহিলেন—"আমার বলা-না-বলায় কিছুই এসে যায় না ভাই। বোন সে আমার এ আমি জানি এবং এও জানি তোমার ওপর আমার কোনও দাবী নেই, তাই ত আমার কোন অনুরোধ-অনুযোগ নেই। আমিও মেয়েমানুষ, তাই চোখের সুমুখে আর একটী মেয়ের এই গভীর অন্তর্বেদনা অনুভব করতে পেরে আর নীরব থাকতে পারলুম না, তাই বলতে এলুম। আমি শুধু বাহক। তুমি বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান, তাই এই বিরাট বেদনার ইতিহাস তোমার অন্তরের রুদ্ধ-দ্বারে পৌঁছে দিয়েই আমার ছুটী।"

দু'জনেই কিছুকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। শুধু একটী ছোট ঘড়ি তাকের উপর হইতে সময়ের গতি নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল এবং তাহারই শব্দের তালে তালে নির্ম্মলের মনে এক গভীর আলোড়ন সুরু হইল।

সুনীতি কহিলেন—"বিয়ে আমার খুব অল্প-বয়সেই হয়েছিল এবং বিধবাও তার কিছুদিন পরেই হই। কিন্তু তোমাকে আজ যথার্থ বল্‌ছি ভাই, যে,—এই ভালবাসা জিনিসটা যে কি অপূর্ব্ব,তা' আমি ওই অত্যল্প সময়েই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি। এ না পারে এমন কোন কিছুই এ পৃথিবীতে নেই। পাথেয় আমার এতখানি মূল্যবান ছিল বলেই আজও আমি টিঁকে আছি।"

নির্ম্মল কহিল—"তিনি কি আপনাকে খুব ভালবাসতেন দিদি?"

সুনীতির চোখের কোণ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি তাহা মুছিবার লেশ-মাত্র চেষ্টা করিলেন না; শুধু একবার কষ্টে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া কহিলেন—"আজ সে কথা থাক ভাই, যদি কোনদিন সময় এবং সুযোগ পাই, তবে তা' জানাব।

আবার কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব রহিলেন। সুনীতি আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিলেন—"আমি যাই।" কিন্তু তখনি গেলেন না, নীরবে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন—"বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা তোমার আছে ভাই, কিন্তু যে ভালবাসার অশ্রুসিক্ত-কাহিনী এই মাত্র তোমাকে শোনালুম, এখানে তোমার ও শিক্ষা দিয়ে বিচার করতে বসো না, তা' হ'লে

যে শুধু অন্যায় করবে তা' নয়, তোমার আজীবন অনুতাপেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। এ ত তোমার অঙ্ক কষা নয়, যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়, এ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মন নিয়ে কারবার, এখানে কথার মারপ্যাঁচ চলে না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়।"

নির্ম্মল এইবার সত্য-সত্যই বিচলিত হইয়া উঠিল। এবং বারবার তার এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, আজ এঁরা নিজেদের মাঝে পাইয়া তাকে দিয়া জোর করিয়া একটা কিছু স্বীকার করাইয়া লইতে চান। কি যে চান, সেইটাই এঁদের মুখ হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য সে একটু রুক্ষ-স্বরেই কহিল—"তাই ত আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আমাকে কি করতে উপদেশ দেন ?"

দিদি পূর্ণদৃষ্টিতে নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"ছি ভাই, না বুঝে রাগ করে' কারও মনে কষ্ট দিতে নেই। একটী কথা আজ তোমাকে জানিয়ে রাখি ভাই,—পৃথিবীতে যত কিছু অন্যায় আছে, তার মধ্যে মানুষ হয়ে মানুষের মনে ব্যথা দেবার মত, মর্য্যাদা না বোঝার মত পাপ আর নেই।"

দিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নির্ম্মলের মন কি-একপ্রকার অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল ; কিন্তু ইহারই ফাঁকে হৃদয়ের পরতে পরতে সে যেন কি-এক অনাস্বাদিত অপরূপ পুলকের সন্ধান পাইতে লাগিল। পাশ বালিসটার উপর আড় হইয়া শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল, সুনীতির এই কাহিনীর পরিপূর্ণ অর্থ কি হইতে পারে ? বহুক্ষণ পর কি-একটা শব্দ শুনিয়া চোখ মেলিতেই সামনে পড়িল শশী চাকর। তাহাকে কহিল—"দিদির কাছ থেকে এক গ্লাস খাবার জল আর একটা পাণ আনত রে।"

দুই

ঘরে ঢুকিল মায়া। এক হাতে তার খাবার জলের গ্লাস আর এক হাতে পাণ। গ্লাসটী নির্ম্মলের হাতে দিয়া মায়া দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইল ! কিন্তু কি মনে করিয়া হঠাৎ তাহার সমস্ত প্রাণমন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু সে ছেলেমানুষ নয়, তাই মুহূর্ত্তের মধ্যে শিক্ষিত অভিনেতার মত শুধু মুখের ভাব নয়, কণ্ঠস্বরও বদলাইয়া ফেলিল। এক নিশ্বাসে জলটুকু খাইয়া ফেলিয়া পাণটী হাতে লইয়া কহিল—"বসো।"

মায়া বসিল না, কিন্তু চলিয়াও গেল না।

নির্ম্মল ডাকিল—"মায়া।"

মায়া কহিল—"কি ?"

নির্ম্মল তাহার পার্শ্বের জায়গাটুকু দেখাইয়া কহিল—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এখানে বসো না।

মায়া বসিল। নির্ম্মল কহিল—"দিদির কাছে সব শুনলুম। কিন্তু এ কি সত্যি ?"

মায়া কথা কহিল না, শুধু তাহার আনত বক্ষ হইতে একটী দীর্ঘশ্বাস অতর্কিতে জোরের সহিত বাহির হইয়া আসিল। মনে হইল, তাহার পায়ের নখ হইতে চুলের শীর্ষভাগ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। নির্ম্মল পুনর্ব্বার কহিল—"উত্তর দাও।"

মায়া তবু কথা কহিল না। দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর নির্ম্মল ব্যাকুল হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"উত্তর যে আমার চাই-ই মায়া। আর সে যে আমি তোমার কাছ থেকেই চাই।"

মায়া তবুও নীরব। কি ই বা বলিবার আছে, কতটুকুই বা সে বলিবে ! ভাল সে বাসিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরের সুগভীর তলদেশে সেই ভালবাসার যে ফল্গুধারা এই দীর্ঘকাল অতি সুগোপনে প্রবাহিত হইতেছিল, আজ সে কেমন করিয়া এই নিরতিশয় বুদ্ধি-অহঙ্কারী পুরুষের সম্মুখে তাহার আবরণ মুক্ত করিবে ! এ যে একেবারে তাহার নিজের

জিনিষ! এতে ত আর কাহারও সহায়তা ছিল না, প্রচ্ছন্ন আশাবাণী ছিল না, অনুকূল ইঙ্গিত ছিল না! তবু সে উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া কোন স্বর ফুটিয়া উঠিল না। কিন্তু এই একান্ত চেষ্টার উদ্যমটুকু তাহার চোখের জলের ধারায় নির্গত হইয়া বক্ষের বসন ভিজাইয়া দিল।

হঠাৎ কি মনে করিয়া নির্ম্মল অমিত সাহসে মায়াকে নিজের বুকের ওপর আকর্ষণ করিল, মায়াও বাধা দিল না। নির্ম্মলের মুখে-চোখে বিজয়ীর নিষ্ঠুর আনন্দ জ্বলিয়া উঠিল। নির্ম্মল মায়ার মস্তক আপনার মুখের নিকট আনিয়া বুঝি বা একটি চুম্বন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু চোখের জলে হাত লাগিবামাত্রই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণ কণ্ঠস্বরে সে যত করুণাই ঢালিয়া থাকুক এবং উত্তর পাইবার জন্য যত ব্যগ্রতাই প্রদর্শন করিয়া থাকুক, সে সমস্তই ছিল পরিপূর্ণ কৃত্রিম অভিনয়। এই কপটতার আড়ালে ছিল তাহার পরিহাসের একটী নিদারুণ ইচ্ছা। সে মনে করিয়াছিল, বিনা দায়ীত্বে এবং বিনা পরিশ্রমে যাহা পাওয়া গেল তাহাই লাভ এবং তাহার এই অভিনয় যাহাতে পরিপূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে, সেই দিকেই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ঐ অসহায়া বালিকার অবরুদ্ধ অন্তর্বেদনার বিগলিত অশ্রু-রূপ তাহার সমস্ত পরিহাসের কুয়াসা-জাল চোখের পলকে সূর্য্যালোকের মত ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল—তাহার শিক্ষিত মনের সমগ্র মনুষ্যত্ব একটি কঠিন আঘাতে চেতনা পাইয়া জাগিয়া উঠিল। নির্ম্মল পুরুষ, তাই বোধ হয় চোখ দিয়া জল পড়িল না, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে অনুতপ্ত পাপীর কি প্রার্থনাই না জাগিয়া উঠিল! সে নিজের কাপড় দিয়া মায়ার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল—"কিন্তু এ যে অসম্ভব মায়া!"

এতক্ষণ পরে মায়ার কণ্ঠে স্বর ফুটিল। সে কহিল—"অসম্ভব বলে'ই ত আমি এতদিন কাউকে জানতে দিই নি নিমু দা'।"

মায়া উঠিয়া বসিল। নির্ম্মল বিষণ্ণমুখে বলিল—"কিন্তু, দিদি জানলেন কি করে'?" মায়া কহিল—"তা' জানি না।"

নির্ম্মল অসহায়ের মত কহিল—"কিন্তু আমি কি করতে পারি মায়া। কি যে করা উচিত, তা' ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মায়া আঁচল দিয়া ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া কহিল—"কি যে করা উচিত, এত কেউ কাউকে বলে দিতে পারে না নিমু দা'।"

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর গলায় আঁচল জড়াইয়া নির্ম্মলকে প্রণাম করিল। গ্লাসটী হাতে লইয়া কহিল—"আমি যাই। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলুম নিমু দা'। এতে তোমার কোন দায়ীত্ব নেই, এ আমার একান্ত নিজস্ব বস্তু। এ ভালবাসার আভাষ আমি কোনদিন তোমার কাছ থেকে পাই নি, তাই এর গুরুত্ব তোমাকে অনুভব করাতেও চাই না। শুধু আজ তোমার কাছে আমার এইটুকু প্রার্থনা যে, কবে কোন্ এক অখ্যাত মেয়ে তোমাকে মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় তার প্রেম জ্ঞাপন করে' ছিল, তা' ভুলে যেও।"

তিন

কিন্তু ভালবাসা যেমন ফরমাস দিয়া নিজের ইচ্ছামত তৈরী করিয়া লওয়া যায় না, তেমনি ভুলিতে বলিলেই কেহই তাহা ভুলিয়া যাইতে পারে না। তাই প্রতিকূল জলস্রোতের সংঘাতে নদীর ওপার যখন দিনের পর দিন ভাঙ্গিতে ছিল, তখন এপার ছিল নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া; কিন্তু স্রোতের মুখ যখন ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখা গেল এ পারের মুখের নিশ্চিন্ত প্রসন্নতা শুধু যে অসহ্য বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা নয়, তাহার তট

রেখার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাঙ্গনের বাঁশীও বাজিয়া উঠিয়াছে।

এমনিই না কি হয়। সৃষ্টির অপার লীলায়, স্রষ্টার অপূর্ব্ব খেয়ালে সামান্য কথা হইতে ক্ষুদ্র ছল উপলক্ষ্য করিয়া কত ভাঙ্গা-গড়াই না প্রতি মুহূর্ত্তে এ সংসারে হইতেছে! অবজ্ঞায় যাহার কথা কোনদিন ভাবিবার অবসর হয় নাই, প্রবৃত্তি হয় নাই, কালক্রমে সেই হইয়া দাঁড়াইল জীবনের চরম প্রার্থনীয় বস্তু! নির্ম্মল যাহাকে নিছক কৌতুক বলিয়াই মনে করিয়াছিল, তাহাই হইয়া দাঁড়াইল তাহার সংসার-যাত্রা-পথের প্রধানতম সমস্যা। এই স্থানে গোড়ার ইতিহাসটুকু বলিবার প্রয়োজন আছে।

শৈশবে মায়া তাহার মামাত বোন মমতার সহিত নির্ম্মলদের বাড়ীর পাশে তাহার মামার বাড়ীতে থাকিত। শিশুকাল হইতেই মায়া মাতৃহীনা। উভয় পরিবারের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ছিল এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল মমতা এবং নির্ম্মলের মাঝে একটি বিশিষ্ট স্নেহের সম্পর্ক।

সময় এবং সুযোগ পাইলে এই স্নেহ যে কাল-ক্রমে কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, তাহা হয় ত অনুমান করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়, কিন্তু প্রজাপতির খেয়ালে মমতার বিবাহ হইয়া গেল। তারপর বহুদিন গত হইয়াছে। নির্ম্মল পূর্ব্বেরই মত তাহাদের বাটী গিয়াছে, মায়ার সহিত ছোট বোনের মত ব্যবহার করিয়াছে।

কিন্তু এই মা-হারা মেয়েটীর প্রতি নির্ম্মলের এই সহানুভূতি মায়ার বুকে গিয়া বিঁধিল অন্যরূপে এবং কখন যে এই অমিশ্রিত স্নিগ্ধ অনুকম্পা ওই ছোট মেয়েটীর চিত্ততলে ভালবাসার প্রথম বীজ অঙ্কুরিত করিল, তাহা খোঁজ না রাখিল নির্ম্মল, না রাখিল মায়া নিজে। কিন্তু কালক্রমে যখন এই অনুভূতির তীব্রতা বাড়িয়া উঠিল, বয়সের সাথে সাথে যখন মায়া বুঝিল সে ভালবাসিয়াছে, তখন শুধু যে সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহা নহে, নিজের মনের কাছে নিজে স্বীকার করিতেও সাহস পাইল না। মূলধন তার নিতান্তই সামান্য, অশ্রদ্ধেয়। মমতার মত সে শিক্ষিতও নয়, সুন্দরও নয়, তাই বারংবার সে শুধু এই কথাই মনে করিতে লাগিল, ভগবান রূপ আমার নাই, কিন্তু সে জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখও নাই; কিন্তু এ কি অপরূপ সুধারসে আমার সমগ্র চেতনা তুমি প্লাবিত করিয়া দিলে! ইহা ত আর আমি চাপিয়া রাখিতে পারি না!

কিন্তু চাপিয়া সে রাখিল এবং সেই দুর্দ্দমনীয় চেষ্টার ফলে সে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া যেমন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল, তেমনি তাহার চোখে-মুখে এক মহীয়সী নারীর তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই ভাবে বেশীদিন যাইতে পারিল না, তাহার বড় ভাই ললিতের বিবাহ উপলক্ষে সে যখন নিজের বাপের বাড়ী গেল, তখন ধরা পড়িয়া গেল তাহার বড় বিধবা দিদি সুনীতির কাছে। তারপর বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া নির্ম্মল যখন তাহাদের বাড়ী আসিল, তখন এক জ্যোৎস্নার আধ আলোয় দিদি কহিলেন—মায়ার বেদনার এই সুদীর্ঘ ইতিহাস।

মায়া চলিয়া গেলে নির্ম্মল ভাবিতে বসিল। আজ তাহার মনের কোণে গত দিনের কত ছোটখাটো ঘটনা, কথা, হাসি প্রভৃতি উঁকি দিয়া যাইতে লাগিল এবং এতদিন পরে বিদেশে অজানা এক কুটীরের আধ-আলোয় তাহার পরিপূর্ণ অর্থ ধীরে ধীরে দিনের আলোর ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। কবে তাহাদের মাঝে সামান্য কথা লইয়া অকারণ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল, কবে তুচ্ছ পরিহাস দু'জনের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছিল এবং প্রতি-বারই মায়া অবলীলাক্রমে এই বিরোধের কি অচিন্তনীয় সহজ সমাধানই না করিয়াছিল, তাহাই আজ তাহাদের প্রতি ক্ষুদ্রতম আনন্দের পসরা

লইয়া নির্ম্মলের অন্তরে সুধাবৃষ্টি করিতে লাগিল।

আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল, লেখাপড়ার অবসরে যে কয়দিন সে বাড়ী থাকিয়াছে, সেই কয়দিন প্রতি কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে তাহার আদর-যত্নের প্রতি কাহার আঁখির একটী স্নেহ-সমুজ্জ্বল-দৃষ্টি পড়িয়া থাকিত এবং এতদিন পরে সেই ব্যবহারের সম্যক অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়া সে যেমন আনন্দাপ্লুত হইয়া উঠিল, তেমনি তাহার অন্তরের প্রতি কোণে বেদনার এক আর্ত্তধ্বনি প্রতিহত হইয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। উপায় যে নাই, সত্য-সত্যই উপায় যে নাই! কবে কোন্ দূর অতীতে কোন্ বালিকা আপনার অন্তরের সমস্ত মধু নিঙাড়িয়া নীরবে বসিয়া যে দুরূহ তপস্যা সুরু করিয়াছিল, আজ তাহারই দুশ্ছেদ্য আকর্ষণ তাহাকে দুর্নিবার বেগে টানিতে লাগিল—কিন্তু মিলনের তটরেখা আজও যে তাহার দৃষ্টির পরিধি হইতে বহু বহু দূরে অদৃশ্য রহিয়াছে।

প্রত্যেক ছেলের মত নির্ম্মলেরও নিজের ভাবীপত্নীর সম্বন্ধে একটী সুমধুর কল্পনা ছিল এবং তাহার এই তেইশ বছর জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তাহাই লইয়া সে যে সমস্ত পুলকোচ্ছল স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহার সহিত এই অতিবাস্তব কাহিনীর সামঞ্জস্য কোথায়? মায়ার গায়ের রং কালো না হইলেও ফরসা নয় এবং সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে তাহার যত অভিজ্ঞতাই থাকুক, শিক্ষিত ছেলের জীবন-সাথী হইবার মত শিক্ষা দীক্ষা তাহার নাই। নির্ম্মল তাহার মানসীর যে ছায়া-ছবি কল্পনার রঙীণ তুলিতে আপনার মর্ম্মের পরতে পরতে আঁকিয়া রাখিয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। তাই পুনঃপুনঃ দীর্ঘশ্বাসের সহিত নির্ম্মলের মনে হইতে লাগিল, ইহা অসম্ভব। এবং অসম্ভব বলিয়াই সে বহু চিন্তার পর ঠিক করিল যে,ভালবাসার এই অনন্তস্রোতকে একেবারে উল্‌টাদিকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে এবং সে হেতু যত অন্যায় এবং ছলনারই প্রয়োজন হোক্ না কেন, তাহাতে সে পশ্চাৎপদ হইবে না।

চার

পরদিন ভোরবেলায় হাত-মুখ ধুইয়া নির্ম্মল ঘরের মধ্যে বসিয়া একখানা পুরাতন মাসিক-পত্র পড়িতেছিল, এমন সময় চায়ের কাপ ও খাবার হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল মায়া। চায়ের কাপ টেবিলের উপর রাখিতেই নির্ম্মল সেদিকে চাহিল। দু'জনের চারি চক্ষু যখন মিলিত হইল, তখন উভয়ে ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল। নির্ম্মল দেখিল,—একরাত্রে মায়ার চেহারার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! চোখ বসিয়া গিয়াছে, মুখ শুক্‌না, সমস্ত মুখমণ্ডলে এমন একটা কাঠিন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, মনে হয় যেন কেহ মায়ার দেহ হইতে সমস্ত লাবণ্য এবং মাধুর্য্য অতি নিদারুণ নিষ্পেষণে নিঙাড়িয়া লইয়া শুধু আধারটী মাত্র রাখিয়া গিয়াছে। আর মায়া দেখিল যে, এ যেন সে নিমুদা' নয়; তাহার সমগ্র প্রতিমূর্ত্তির মাঝে একটী সকরুণ আত্ম-নিগ্রহ ও অতি সংযমের সুকঠিন শুষ্কতা তাহার সকল চাঞ্চল্য এবং প্রফুল্লতা ছাপিয়া আপনাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। কেহ কোন কথা কহিল না।

কিছুকাল পরে মায়া কহিল—"চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল নিমু দা'।"

নির্ম্মল চায়ের কাপ হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল—"খাচ্ছি।" তাহার কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক রূঢ়তা ফুটিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে যেন মনের মাঝে কি-একটা সঙ্কল্প ঠিক করিয়া লইয়া নির্ম্মল ধীরে ধীরে কহিল—"তোমার বয়স ত এত অল্প,শিক্ষা-দীক্ষাও তেমন পাও নি, কিন্তু এমন সুন্দর অভিনয় কর্‌তে শিখ্‌লে কোথা থেকে বল ত?"

মায়ার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু যাহাতে

কণ্ঠস্বরে কোন প্রকার জ্বালা ফুটিয়া না উঠে সেই হেতু কিছুকাল নীরব থাকিয়া শান্ত সমাহিতভাবে কহিল—"অভিনয়! তার মানে?"

নির্ম্মল একটু হাসিল, কিন্তু সেই হাসির আভা তীক্ষ্ণ ছুরির মত ঘরের সমগ্র প্রসন্নতা যেন চিরিয়া ফেলিল; কহিল—"মানে, এত ন্যাকামী তুমি শিখলে কোথা থেকে। কি যে এর মানে তা' বোঝবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি এবং বিবেচনা তোমার আছে। না হ'লে গত রাত্রে অতখানি ছলনা করে' হাসি-কান্নার লীলা-খেলা দেখাতে পারতে না।"

মায়ার সমগ্র মুখ হইতে কে যেন সমস্ত রক্ত শুষিয়া লইয়াছে। তাহার চোখ আপনা হইতে বুজিয়া আসিল। নির্ম্মল নিদারুণ নির্ম্মমতার সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল—"ছি ছি,তোমাকে দেখার আগে নারীজাতির সম্বন্ধে আমার সুউচ্চ ধারণা না থাকুক, শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তুমি এ কি করলে মায়া। নিজের ক্ষণিক খেয়ালের জন্য নিজে হ'লে অভিসারিকা, দিদিকে করলে দূতী, আর—"

তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না, মায়া প্রাণপণ চেষ্টায় ঢোক গিলিয়া মূর্চ্ছাহতের মত কহিল—"আমি?"

—"হ্যাঁ, তুমি। তুমি কি বলতে চাও, আমি কিছু বুঝতে পারি নি মায়া। আমাকে আজ তোমাদের নিজেদের মধ্যে পেয়ে এই যে বেঁধে ফেলবার জন্য একটা হীন প্রচেষ্টা, এটা বোঝবার মত বুদ্ধিও কি আমার নেই?"

নির্ম্মল মায়ার প্রতি চাহিয়া দেখিল এবং বুঝিল যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হায় রে, মানুষের স্পর্দ্ধার না কি সীমা নাই, তাই নিতান্ত অস্পৃশ্যাকেও যে কথা বলিতে লোকে সঙ্কুচিত হয়, তাহাই অবলীলাক্রমে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল! এটা বুঝিল না, ওই কচি বুকটুকু ভাঙ্গিতে সে ইতঃপূর্ব্বে যে মুষলাঘাত করিয়াছে, তাহাই প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। কহিল—"কাল ওই আধ আলো-ছায়ার গভীর রহস্যের মাঝে ভালবাসার কথা বলে', চোখের জলের বান ডাকিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে' ফেলেছিলে। তুমি আমাকে ভালবাস, নয় মায়া? প্রয়োজন হ'লে নিজের চরিত্রের ওপর কলঙ্কপাতেও তোমাদের আটকায় না, তাই বুঝি—"

বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া নির্ম্মল বাহির হইয়া দেখিল, শশী চাকর। তাহাকে বলিল—"ললিতকে ডেকে দে ত, আমি আজই কোলকাতায় যাব।"

শশী বলিল—"সে কি বাবু, আজ যে বৌভাত!"

নির্ম্মল কহিল—"তা' হোক, আমি আজই যাব। তুই ওঘর থেকে আমার কাপড় এবং চাদরখানা এনে দেত।"

শশী চলিয়া গেল। নির্ম্মল ঘরে ঢুকিল। দেখিল, মায়া বিছানায় মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। নির্ম্মল কহিল—"এখানে আর বিন্দুমাত্র সময় থাকবার মত ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি আমার নেই। ললিতের সঙ্গে আমার দু'-একটা কথা আছে, তুমি এখন যেতে পার মায়া।"

এ কথা শুনিবার পরও মায়া উঠিল না। নির্ম্মল ক্রুদ্ধস্বরেই কহিল—"শুনতে পারছ না মায়া, তুমি এখন চলে' গেলে আমি সুখী হ'তে পারতুম।"

মায়া কিন্তু তথাপি উঠিল না। ঠিক এমনি সময়ে ঘরে ঢুকিল ললিত। ললিত বলিল—"কি হে, খবর কি? তুমি না কি আজই যেতে চাইছ। কিন্তু ও কি—মায়া ওখানে ওভাবে শুয়ে কেন?"

নির্ম্মল কহিল—"কি জানি কেন, আমাকে চা দিতে এসে ওখানে বসেছিল, তারপর ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। আমি দু'-তিনবার ডাকলুম, কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না।"

ললিত কাছে গিয়া মায়াকে ডাকিল, কিন্তু

কোন উত্তর না পাইয়া হাত ধরিয়া টানিতেই দেখিতে পাইল মায়া মূর্চ্ছা গিয়াছে। কহিল—"নিমু, এ যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে! শীগ্‌গির শশীকে জল আর পাখা আনতে বল ত।"

শশী জল আনিলে চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা এবং বাতাস করিবার কিছুকাল পরে মায়া চেতনা পাইল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ললিত নির্ম্মলকে কি কথা বলিতে গিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আবক্ হইয়া গেল! বলিল—"তোমার কি কোন অসুখ কর্‌ল নিমু?"

নির্ম্মল শুষ্কস্বরে শুধু কহিল—"না।"

পাঁচ

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে শত-সহস্র অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া নির্ম্মল কলিকাতা ফিরিবার জন্য রওনা হইল। দিদিকে প্রণাম করিয়া সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিতে পাইল চোখের জলে দিদির সমস্ত আঁচলটা ভিজিয়া গিয়াছে। দিদি কহিলেন—"তুমি যাবেই, তোমাকে রাখতে পারব না এ আমি জানতুম ভাই; কিন্তু, সেই রাখতে না পারার অক্ষমতার পরিমান যে কত গভীর, কত দুঃসহ, তা' এর আগে বুঝতে পারি নি। অনেক কষ্ট তুমি পেয়ে গেলে তার জন্যে মাপ চেয়ে ফল নেই—কিন্তু দুঃখ রইল ভাই, যে, তুমি ভুল বুঝে গেলে! আমার এই স্নেহের ফাঁকে ফাঁকে তুমি উদ্দেশ্যের কুৎসিত ইঙ্গিত দেখ্‌তে পেয়েছ, এ ত আমি মরে গেও ভুলতে পারব না।"

নির্ম্মল শুধু কহিল—"সময় হয়ে গেছে আমি যাই।"

দিদি কহিলেন—"এস।"

ঘোড়ার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বাড়ীর সুমুখের পথটা যেখানে ঘুরিয়া গিয়াছে, সেখানে নির্ম্মল মুখ বাহির করিয়া দেখিল, বাড়ীর পশ্চিম-কোণের লেবু গাছটীর কাছে মায়া দাঁড়াইয়া আছে—যেন চেতনাহীন। দু'জনের চোখোচোখি হইল। নির্ম্মল দেখিল, কি অসম্ভব শুষ্কতা মায়ার সমগ্র মুখমণ্ডলে। লাঞ্ছনা, বেদনা এবং অপমান প্রিয়তমের কাছ হইতে কতখানি তীব্র হইলে মানুষের এই প্রকার চেহারা হইতে পারে, তাহা বুঝিবার মত অবস্থা নির্ম্মলের মনের ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মুখখানিই সারা পথটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল এবং সমগ্র অন্তরের অতি গভীর গোপন কোণে এক অপরূপ ব্যথা অতর্কিতে জাগিয়া উঠিল।

নির্ম্মল মগ্ন হইয়া ভাবিতেছিল—হঠাৎ একটা কঠিন আঘাত পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারের মাঝে কি দেখিয়া ঘোড়া ভয় পাইয়া অকস্মাৎ পথ ছাড়িয়া একদম মাঠের মাঝে নামিয়া পড়িল এবং তাহারই হ্যাঁচকা টানে একটা চাকা খুলিয়া গাড়ীটা একেবারে উল্টাইয়া গেল। কাছেই লোকালয় ছিল। এই ঘটনা ঘটিতে দেড় মিনিটের বেশী সময় লাগে নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত নির্ম্মল যেটুকু মনে করিতে পারে তাহা এই যে, অনেকগুলি লোক তাহাকে ধরাধরি করিয়া উঠাইল, চোখে-মুখে জল দিল এবং আর একখানি গাড়ীতে চাপাইয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথেই পুনর্ব্বার রওনা করাইয়া দিল।

পরদিন ভোরবেলায় পায়ের নিদারুণ যন্ত্রণায় নির্ম্মলের যখন চেতনা হইল সে দেখিল, তাহার মাথার কাছে বসিয়া মায়া বাতাস করিতেছে। নির্ম্মল যে জাগিয়াছে, এটা মায়া টের পাইল না। নির্ম্মল অনেকক্ষণ ধরিয়া মায়ার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কি জানি কেন বেদনার অনেকটা লাঘব বোধ করিল। নিজের বুক হইতে বাহির হওয়া একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস অতি কষ্টে রোধ করিয়া সে উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা দিয়া মায়া কহিল—"উঠ না নিমু দা', তোমার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে

দেওয়া হয়েছে, আর তা' ছাড়া, তুমি এখন দুর্ব্বল।"

নির্ম্মলের গত রাত্রের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়িল; সে বলিল—"পা কি খুব বেশী কেটে গিয়েছে?"

মায়া সান্ত্বনার সুরে কহিল—"না না, অল্প একটু ছড়ে গিয়েছে মাত্র, ও দু'-একদিনেই সেরে যাবে।" নির্ম্মল আর উঠিতে চেষ্টা করিল না, কিন্তু পাশ ফিরিবার সময় মায়ার একটী হাত আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। মায়া বাধা দিল না।

দিন পাঁচ-ছয় পরের কথা। নির্ম্মলের পায়ের ব্যথা সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু গত দুই দিন হইতে হঠাৎ জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন সকালবেলায় খুব বেশী জ্বর আসিয়াছিল। সারাক্ষণ নির্ম্মল প্রায় চেতনাহীনের মত পড়িয়াছিল। বিকালের দিকে জ্বরের উত্তাপ অনেকটা কমিয়া আসিল। মাথায় কাহার হাতের স্নিগ্ধ পরশে চমকিয়া উঠিয়া নির্ম্মল দেখিল, মায়া মাথা হাতে বসিয়া। 'আঃ' বলিয়া একটী আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া আবার কিছুকাল সে চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল। তার-পর কহিল—"একটু জল দাও ত মায়া, আর সামনের ওই জানলাটা খুলে দাও।"

মায়া জানালা খুলিয়া দিয়া নির্ম্মলকে জল আনিয়া দিল। তখন সে মায়াকে টানিয়া পাশে বসাইল। কিছুকাল দু'জনেই নীরব। অনেক চেষ্টার পর নির্ম্মল কহিল—"মানুষের দুর্ম্মতির সীমা নেই মায়া। সে ভাবে, সে যা' করে, তাই-ই চরম; সে যা' বোঝে, তা' সকলের চেয়ে ভাল। কিন্তু আর একজন যে ওপর থেকে সমস্ত হিসেব কড়া-ক্রান্তিতে মিলিয়ে নিচ্ছেন; এ সে চোখের ওপর দেখেও বিশ্বাস করে না কেন জান, মায়া?"

মায়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে জানে না। নির্ম্মল কহিল—"যাক্ গে, মানুষের কথা নিয়ে আমার কি হবে। আমার এই বিপত্তির জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মায়া! এ নইলে ত তোমার এই সেবাপরায়ণা মূর্ত্তির কথা, এই হৃদয়হীনের প্রতি তোমার গভীর স্নেহ ও ভাল-বাসার কথা এত বড় করে' উপলব্ধি করতে পারতুম না!"

মায়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু নির্ম্মল জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল—"আমি জ্ঞানগর্ব্বে এবং বুদ্ধির অহঙ্কারে নিজের যে ভরাডুবি করতে বসেছিলুম তা' থেকে যে বেঁচে গিয়েছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য! ক্ষমা চেয়ে তোমাকে নীচু করব না—কিন্তু আজ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছি যে, তোমাকে ছাড়া আর আমার উপায় নেই! বলো, তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দেবে না?"

কি জানি কেন মায়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু নির্ম্মল ছাড়িল না; কহিল—"উত্তর দাও মায়া।"

মায়ার উত্তর দিবার মত অবস্থা তখন ছিল না এবং পাছে কণ্ঠস্বরে চোখের জলের আভাষ জাগিয়া উঠে, এই ভয়ে সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে,—দিবে না।

নির্ম্মল মহানন্দে ছেলেমানুষের মত মাথা দুলাইয়া বলিয়া উঠিল—"ঠেলে ফেলে দিতে যে তুমি পারবে না,তা' আমি আগেই জানি। তুমি ত শুধু আজকে আমার হ'লে না, যুগ-যুগান্তর ধরে' তোমার এবং আমার মাঝে যে এক অচ্ছেদ্য স্নেহ-বন্ধন আছে, চোখে দেখা না গেলেও আমি মর্ম্মে মর্ম্মে তা' বুঝতে পারছি জান, মায়া! বিশ্বাস না হয় গায়ে হাত দিয়ে দেখ, নিশ্চয়ই আমার আর জ্বর নেই। শরীর আমার খুব হাল্কা বোধ হচ্ছে। কিন্তু তুমি ত বেশ—সেই কখন খেয়েছি তা' মনেও নেই, কিছু খেতে দেবে না বুঝি? এমনি করেই তুমি স্বামীর সেবা করবে না কি!"

মায়ার সমগ্র মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই তাহা

একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। সন্ধ্যায় ম্লান আলোয় নির্ম্মল তাহা লক্ষ্য করিল না বোধ হয়; অথবা, তাহার নিজের আনন্দের আতিশয্যে আর কিছুর কথা তাহার মনেই ঠাঁই পাইল না।

সে কহিল—"কই গো মায়া দেবী, আমি যে মরে গেলুম, তুমি কি—"

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই মায়া বলিয়' উঠিল—"এই যে দিচ্ছি, হাতটা ধুয়ে আসি।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

নির্ম্মল ইজিচেয়ারটায় শুষ্কমুখে শুইয়া আছে। দিদি তাহার সুটকেশ গুছাইয়া দিতেছেন। নির্ম্মল ক্লান্তস্বরে কহিল—"কিন্তু এ হতেই পারে না দিদি! সেদিন সে নিজে স্বীকার করলে; আমার সঙ্গে ত সে কোনদিন মিথ্যা চাতুরী করে না।"

দিদি কহিলেন—"অদ্ভুত এই মানুষের মন ভাই! এ যে কি স্বীকার করে, আর কি যে করে না, তা' কিছুই বোঝা যায় না। তোমার কথায় ওর মুখে কি আনন্দই না ভেসে উঠতে দেখেছি! তোমার অসুখের সময় কি আশ্চর্য্য সেবাটাই না ও করলে! তাই ত মনে হয়েছিল, ওর সমগ্র জীবনের যা' চরম কাম্য, তা' বোধ হয় ও পেলে। কিন্তু আজ "

কথা শেষ না হইতেই নির্ম্মল আবেগভরে কহিয়া উঠিল—"বাধা যা' ছিল, সেই আমার শিক্ষার অহঙ্কার, বুদ্ধির দুর্ম্মতি, সে ত ওর প্রেমের একনিষ্ঠতার কাছে পরাজয় মেনেছে। তাই ত আমি ভেবে পাই নি। যথাসময় ওর ডাকে আমি সাড়া দিই নি এ কথা সত্যি—কিন্তু আজ যদি আমার ভুল ভেঙ্গে গেল, গর্ব্ব চূর্ণ হয়ে গেল, যদি যথার্থই মোহান্ধকারের মাঝে ওর ভালবাসার সত্যালোক দেখতে পেলুম, তবে ও কেন আজ দূরে সরে' যেতে চায়?"

দিদি কিছুই বলিলেন না। বলিবেনই বা কি? এই প্রত্যাখ্যানের ব্যথা যে কত মর্ম্মন্তুদ, কত চিত্তদাহী, তাহা তিনি নির্ম্মলের মুখের প্রতি রেখায় অঙ্কিত দেখিতে পাইতেছিলেন; তাই শুধু কথার জাল গাথিয়া মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না।

নির্ম্মল কহিল—"এ তার অভিমান দিদি। তাকে অপমান করেছিলুম, এ হয় ত তারই প্রতিশোধ। কিন্তু আজ তোমাকে আমি যথার্থ বলে' যাচ্ছি দিদি, আত্ম-নিগ্রহের গুরু পাষাণভার একদিন 'ওর নারীত্বকে জাগিয়ে দেবে। সেদিন আমি কোথায় থাকব জানি না, কিন্তু তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে ওকে জানিয়ে দিও যে, চিরদিন আমি 'ওকেই চেয়েছি।"

নির্ম্মল রুমাল দিয়া চোখ মুছিল। কিয়ৎকাল পরে কহিল—"দিদি, একগ্লাস জল দেবেন?'

সুনীতি এ ইঙ্গিত বুঝিলেন, বলিলেন—"তুমি বসো, আমি এনে দিচ্ছি।"

প্রায় আধঘণ্টা পরে জল এবং পাণ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া মায়া। নির্ম্মলের আর এক রাত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু আজ না কি চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে—সেদিন যে ছিল দাতা, আজ সে প্রার্থী। সেদিন যাহা অতি সহজেই হইতে পারিত, আজ তাহার পথরোধ করিয়া আছে বিরাট এক পর্ব্বত প্রমাণ ব্যবধান।

মায়া কহিল—"আমাকে ডেকেছ নিমু দা'।" তাহার কণ্ঠস্বর ভেজা মনে হইল—যেন এই মাত্র সে কাঁদিতেছিল।

নির্ম্মল কহিল—"কিছুতেই কি তোমার দয়া হবে না মায়া। তোমার হৃদয় কি পাথর দিয়ে তৈরী? মানুষের প্রাণের চেয়েও কি তোমার প্রতিশোধ বড়?"

মায়ার মনে হইল বলে—"হৃদয় তার পাথর দিয়ে তৈরী বৈকি, নইলে এত আঘাত সে কি করে' সইল!" কিন্তু প্রতিশোধের কথায় সে

আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; কহিল—"প্রতিশোধ ? না নিমু দা', এ আমার প্রতিশোধ নয়, এ আমার আত্মহত্যা ! কিন্তু, এ ছাড়া আর ত আমার কোন পথ নেই।"

নির্ম্মল বলিল—"পথ কি সত্যি নেই মায়া ! আমার সমগ্র অন্তরের একান্ত মিনতির চেয়ে, কামনার চেয়ে, আমার একদিনের মিথ্যাই কি বড় হ'ল ? আমার ভালবাসার কি কোনই মূল্য নেই ?"

মায়া আর পারিল না—কান্নার আবেগে তাহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল—"তোমার পায়ে পড়ি নিমু দা', আমাকে আর লোভ দেখিও না—হয় ত আমি আর সামলাতে পারব না !"

নির্ম্মল আগ্রহভরে কহিল—"তবে, তবে কেন এই আত্মবঞ্চনা, এই মিথ্যা অভিমানের বাধা ! আমিও তোমাকে চাই, তুমিও আমাকে চাও, তবে কেন—"

কাঁদিতে কাঁদিতে মায়া কহিল—"আমি তোমাকে চাই এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই। কিন্তু তুমি ত আমাকে চাও না। এত তোমার ভালবাসার চাওয়া নয়, এ যে তোমার করুণার আত্মদান। তাই দু'দিন পরে দানের মোহ যখন ভেঙ্গে যাবে, তখন আমার ভার যে তোমার দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠ্‌বে নিমু দা' ! তখন সে করুণার লাঞ্ছনা হ'তে নিষ্কৃতি পাবার কোন পথই যে আমার খোলা থাকবে না !"

নির্ম্মলের চোখও শুষ্ক ছিল না। সে কহিল—"তবে কি কোন উপায়ই নেই ?"

মায়া কহিল—"না নেই—আমার মরণ ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই !" বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পথ দিয়া কে যেন গাহিয়া যাইতেছিল—

"ওগো নিঠুর দরদী,
এ কি খেলা খেল্‌ছ অনুখন !
তোমার কাঁটায় ভরা মন,
তোমার প্রেমে ভরা মন !"

—'বাটীভাড়া'—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম-এ, এফ-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

এক

কলিকাতায় বাড়ীর মালিকেরা দিন দিন যে ভাবে বিনা কারণে বাটীভাড়া বাড়াইয়া দিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, যদি ব্যবস্থাপক-সভার কোন সদস্য এরূপ প্রস্তাব করেন যে, আইন দ্বারা এইরূপ দুষ্কৃতকারীদিগকে ফাঁসীর ব্যবস্থা করা হউক, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি জনসাধারণের সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাই অর্জ্জন করিবেন। কিন্তু বাড়ীভাড়া কমাইয়া দিয়াও একজন বাড়ীর মালিক যে প্রজাগণের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, সে সম্বন্ধে একটি সত্যঘটনা আমি জানি এবং আজ তাহা আপনাদিগকে বলিব।

অমরনাথ আমাদের সঙ্গে পড়িত। তাহার পিতা মৃত্যুকালে যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হইত না। সে আমাদেরই মত প্রজার রক্তশোষণকারী ধনী জমিদারগণের উপর খড়্গহস্ত ছিল। ভগবান তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় একদিন তাহার বহু লক্ষপতি নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠতাতকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়া তাহাকে বিশলক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক করিয়া দিলেন।

অবস্থার পরিবর্ত্তনেও অমরনাথ মত পরিবর্ত্তন করে নাই। প্রজাগণকে সুখী করিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র পড়িতে পড়িতে সে একদিন দেখিল যে, তাহার জ্যেষ্ঠতাত সার্কুলার রোডে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী নিলামে মাত্র ত্রিশ হাজার টাকায় কিনিয়াছিলেন; উহা হইতে এক্ষণে বার্ষিক আট হাজার টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। উঃ! প্রজাগণের কি ভয়ানক রক্তশোষণ! অমরনাথ স্থির করিল, তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। বাড়ীভাড়া কমাইয়া দিয়া সে প্রজাগণের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিবে।

তখনই বৃদ্ধ বনমালী সরকাকে তলব করা হইল। বনমালী সার্কুলার রোডের সেই বাড়ীটিরই খান দুই-তিন ঘরে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিত এবং সামান্য বেতন লইয়া বাড়ীটির জন কুড়ি ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে বাটীভাড়া ও অভিশাপ সংগ্রহ করিত।

নূতন জমিদারের নিকট বনমালী কম্পিত চরণে স্পন্দিত বক্ষে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। অমরনাথ তাহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর কণ্ঠে বলিল, "বনমালী দাদা, একটা কাজ কর্‌তে হবে। প্রজাদের আজই ব'লে' দিতে হবে যে, এ মাস থেকে তাদের বাটীভাড়া এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া হ'ল।"

"কমিয়ে দেওয়া হ'ল"—এই অসম্ভব কথা শুনিয়া বনমালী স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে কি ঠিক শুনিতে পায় নাই? সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কমিয়ে! মহারাজ ঠাট্টা কর্‌ছেন! আপনার উদ্দেশ্য বোধ হয় ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে? মালিক পরিবর্ত্তন হ'লে কল্‌কাতার ভাড়া বাড়ানই হয়ে থাকে, তবে এক তৃতীয়াংশ একটু বেশী—না?"

—"বনমালী দা', আমি ঠাট্টা করি নি। সত্যই আমার ইচ্ছা ভাড়া কমান।"

"মহারাজ, একবার ভেবে দেখ্‌বেন। ভাড়া

কমান! কল্‌কাতায় এ রকম কথা কেউ কখন শোনে নি। এ কথা শুনলে হুলস্থুল পড়ে যাবে! লোকে কি মনে কর্‌বে!”

অমরনাথ এবার প্রভুজনোচিত গম্ভীর ও দৃঢ়-কণ্ঠে কহিল, “বনমালীবাবু, আমি যখন আদেশ দি’, ভেবে চিন্তেই দিয়ে থাকি এবং আমি চাই যে, আমার আদেশ আমার কর্ম্মচারীরা বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন কর্‌বে।”

দুই

বনমালী মাতালের মত টলিতে টলিতে নূতন মনিব বাড়ী হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিল। “বাটী-ভাড়া কমান” “বাটীভাড়া কমান”—“পাগল,” “মাথাখারাপ হয়েছে” ইত্যাদি বাক্য বিড়বিড় করিয়া বলিতে বলিতে সে যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখন তাহার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার স্ত্রী মাতঙ্গিনী স্থির করিল, আজ দিনেই বনমালী শুঁড়ীর দোকান হইয়া আসিয়াছে।

—“কি হ’য়েছে আজ তোমার?” বলিয়া মাতঙ্গিনী বনমালীকে এক ধাক্কা দিল।

বনমালী উদাসকণ্ঠে বলিল, ‘কিছু না, কিছু না।”

“আমার কাছে লুকোবে? কি হয়েছে বল, বল্‌তেই হবে।”

“কি হয়েছে? যা’ হয়েছে, তা’ তোমরা বিশ্বাসই করবে না।”

—“কি হয়েছে বল না ছাই!”

—“বলুব? বিশ্বাস কর্‌বে না কিন্তু। হুকুম হয়েছে সব প্রজাদের ভাড়া এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেবার!”

—“কমিয়ে দেবার? ঠাট্টা। নূতন জমিদারটি ত বেশ রসিক লোক দেখ্‌ছি!”

—“না গো, না। সত্যি।”

—“কি সত্যি—তুমি কৈলাস সাহার দোকানে—”

মাতঙ্গিনীর কথা সমাপ্ত হইল না। বনমালী ও মাতঙ্গিনীর দাম্পত্য হাতাহাতির উপক্রম হইল। সৌভাগ্যবশতঃ পুত্র গোপাল তখনও স্কুলে যায় নাই—সে কোন রকমে মাতা-পিতাকে নিরস্ত করিল। মাতঙ্গিনীর কিছুতেই বিশ্বাস হইল না যে, বনমালী প্রকৃতিস্থ আছে। সে দুপুর-বেলায় খদ্দরের শালে আপাদমস্তক মুড়িয়া স্বয়ং জমীদার বাড়ীতে গেল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “কে?”

মাতঙ্গিনী উত্তর দিল, “আজ্ঞে, আপনার সার্কুলার রোডের বাড়ী থেকে আস্‌ছি। আমার সোয়ামীর সকালে এখান থেকে বাড়ী ফেরবার সময় সর্দ্দিগর্ম্মীর মত হয়, ভুল বক্‌ছে। আপনার যদি কোন হুকুম থাকে আমাকে বলুন, আমার ছেলেকে দিয়ে হুকুম তামিল কর্‌ব।”

—“ওঃ। তুমি বনমালীর স্ত্রী? হুকুম? এমন কিছু নয়, কাল সকালে বনমালী একটু সুস্থ হ’লে প্রজাদের যেন বলে যে, তাদের বাড়ীভাড়া এখন থেকে এক-তৃতীয়াংশ কমে গেল।”

মাতঙ্গিনী যেন আকাশ হইতে পড়িল! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? এতকাল সে দেখিয়া আসিয়াছে বাড়ীভাড়া বৎসর বৎসর বাড়িয়াই আসিতেছে। ভাড়াটীয়া উঠিয়া গেলে বৎসরের মধ্যেও দুই-একবার বাড়ে নাই তাহা নহে। জমীদার কি সত্যই পাগল না কি! কিন্তু বনমালীর চেয়ে তাহার বুদ্ধি বেশী ছিল। সে সাহস করিয়া বলিল, “আপনি যদি দয়া করে’ ঐ কথাটি কাগজে লিখে দেন ত ভাল হয়।”

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে কাগজে তাহার আদেশ লিখিয়া দিল।

তিন

পরদিন প্রভাতে বনমালী ভাড়াটিয়াদিগকে একে একে নূতন প্রভুর হুকুম জানাইল। তাহারাও প্রথমে কিছুতেই বনমালীর কথা বিশ্বাস

করিতে পারিল না। বাটীর কুড়ি জন ভাড়াটীয়া (সচরাচর পরস্পরের সঙ্গে কথবাবার্ত্তা কহে না) জটলা বাঁধিয়া নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল :

—"মশায়, শুনেছেন ?"

—"হ্যাঁ, ভারি আশ্চর্য্য !"

—"এ রকম কখনও শোনা যায় নি।"

—"ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে !"

— "তিন ভাগের এক ভাগ !"

—"আশ্চর্য্য !"

—"বাড়ীওয়ালার মতিভ্রম হয়েছে।"

জনদুই-তিন ভাড়াটীয়া পরামর্শ করিয়া জমাদারকে পত্র লিখিয়া জানাইল যে, বনমালী সরকারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে এবং সে এইরূপ অসম্ভব আদেশ প্রচার করিয়া সকলকে সংশয়াম্বিত করিয়াছে। জমীদার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, বনমালী তাঁহাদের আদেশ যথোচিত-ভাবেই প্রচারিত করিয়াছে।

সংশয়ের আর কোনই কারণ নাই। এইবার চারিদিক হইতে নানা প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল।

—"ভাড়া কমানর মানে কি ?"

—"কারণটা কি ?

—"এর উদ্দেশ্যই বা কি ? নিশ্চয়ই এর কোন গূঢ় কারণ আছে। কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ কি ছেড়ে দেয় ?"

—"নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সেটা কি ?"

রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য একতলা হইতে চারিতলা পর্য্যন্ত ভাড়াটীয়ারা অহোরাত্র মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিল। অনেক রকম থিওরি উদ্ভাবিত হইল।

—"বোধ হয় লোকটা মহাপাপ করেছে এবং সেই পাপস্খালনের জন্য দয়া ধর্ম্ম অবলম্বন করেছে।"

—"এ রকম মহাপাপীর সংস্রবে থাকা কর্ত্তব্য নয়, কারণ এ সবলোকেরা আবার অকস্মাৎ পাপের প্রলোভনে পড়তে পারে।"

—"আপনি কি মনে করেন বাড়ীটা বেশ নিরাপদ ?

—"বোধ হয় একরকম।"

—"কিন্তু বাড়ীটা বহুদিনের।"

—"বোধ হয় ছাদটা ধ্বসে পড়তে পারে।"

—"ফ্লোরের নীচে মাঝে মাঝে যেন কিসের শব্দ হয়, কেউ কিছু করে বোধ হয়।"

—"আমার মনে হয়, গোয়েন্দারা বাড়ীটার ওপর নজর রেখেছে।"

—"বোধ হয় বাড়ীটা বড্ড পুরোণো, কোন দিন এতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে মোট টাকা নেবার মতলব।"

—"আমার মনে হয়, বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে। সেদিন রাত্রে সাদা কাপড়পরা একটা ভীষণ চেহারা দেখেছিলাম !"

—"রাত্রে কিসের যেন শব্দ হয়।"

পরদিন হরিত পোদ্দার বনমালীকে জানাইল, পরের বন্ধকী জিনিষ লইয়া তাহার কারবার বাড়ীতে আগুন লাগিলে তাহার সর্ব্বনাশ ! সে উঠিয়া যাইবে। বনমালী অমরনাথকে জানাইল। অমরনাথ বলিল, "যায় যাক্, বোকার শিরোমণি।"

বলাই বিশ্বাস ও গোবর্দ্ধন মাইতি পরদিন বাটী ছাড়িবার ইচ্ছা জানাইল,—ভূতের হাতে প্রাণ দিতে তাহারা নারাজ।

তারিণী চাটুর্য্যে ও গৌরচরণ বসাক পরদিন বাড়ী ছাড়িয়া গেল— পুরাতন বাড়ীর ছাদ চাপা পড়িয়া তাহারা মরিতে সম্মত নহে।

এইরূপে একে একে বাড়ীর সকল ভাড়াটীয়ারাই ছাড়িয়া গেল। নূতন ভাড়াটীয়া

আর থাকে না। দুই-চারিজন বাড়ী দেখিতে আসে, কিন্তু যখনই শুনে ছাদ পড়িয়া যাইবে কিংবা ভূতের উৎপাতের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী প্রজারা উঠিয়া গিয়াছে, তাহারা বাড়ীভাড়া লইতে চাহে না। ভাড়া আরও কমাইয়া দেওয়া হইল, তথাপি ভাড়াটীয়া আর থাকে না। ঘরগুলি ইঁদুরের রেস কোর্স হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রিতে অতবড় বাড়ীতে বনমালী ও তাহার স্ত্রী-পুত্রের দুইটী নির্জ্জন ঘরে থাকিতে গা ছমছম করিত। ইঁদুরের উৎপাত কি ভূতের উৎপাত তাহা তাহারা স্থির করিতে পারিত না। রাত্রিতে কাহারও নিদ্রা হইত না। পড়ার অসুবিধা হইতেছে বলিয়া গোপাল হোষ্টেলে ভর্ত্তি হইল। বৃদ্ধ বনমালী ও মাতঙ্গিনী বিনিদ্র হইয়া কতদিন সেই ভূতের বাড়ীতে থাকিবে? একদিন অসহ্য বোধ করিয়া বনমালী অনেকদিনের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া সেই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এখনও আপনারা সার্কুলার রোড বেড়াইতে গেলে সেই বাড়ীটী দেখিতে পাইবেন। বড় বড় হরফে লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে—"বাটীভাড়া।" বারন্দা, জানালা, ও দরজার উপর দশপুরু ধূলা জমিয়া আছে, বাড়ীর সম্মুখস্থিত কম্পাউণ্ডটি আগাছা ও জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। বহু বৎসর হইয়া গেল করুণহৃদয় জমীদার-মহাশয়ের বাটীখানি পড়িয়া আছে এমন কি ভূতের বাড়ীর সন্নিকটে বলিয়া কাছাকাছি বাড়ীগুলির সহজে ভাড়া হয় না। *

---

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

—রমেশ ও ভবতোষ—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ব্যাপার সামান্য, কিন্তু রমেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

মাধবী গিয়াছিল বায়স্কোপ দেখিতে, সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কথা ছিল, বায়স্কোপ ভাঙে সাড়ে আটটায়, তারা বাড়ী ফিরিবে ন'টার মধ্যেই। কিন্তু ফিরিবার পথে মার্কেটের আলোয় লুব্ধ হইয়া সেখানে ঢুকিয়া পড়ে।

খাঁচার পাখী ছাড়া পাইলেই ডানা দু'খানি মেলিবার আনন্দ এড়াইতে পারে না। সারি সারি দোকান, থরে থরে পণ্য, বিচিত্র গঠন, বিজলী প্রভায় ঝক্‌ঝক্ চক্‌চক্ করিতেছে। সে চারিদিকে কিছুকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া দু'চোখের ক্ষুধা মিটাইল। তারপর এক যায়গায় আসিয়া পণ্যের সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া এক বাক্স চকোলেট, সেখান হইতে আর একটু ঘুরিয়া ফুলের দোকান হইতে এক ডজন গোলাপ কিনিয়া ফেলিল। ফুলগুলি তখনও ভাল করিয়া ফোটে নাই—চোখের পাতা দু'টি একটু মেলিয়াছে মাত্র। চমৎকার গন্ধ, আধ ফোটা রূপ, নিটোল দেহ ও ঘন লাল রং—এমনি ফুলই রমেশ ভালবাসে। চকোলেটও তার প্রিয়। মাধবীর মনে গোলাপের মত রঙীন্ কল্পনার কুঁড়ি দেখা দিল। বায়স্কোপেও সে দেখিয়াছে, সুদূর মিসিসিপি নদীর ধারে একটী ছোট পাতার কুটীর। নানা রঙের বনফুল তুলিয়া দয়িতা কেমন করিয়া কান্তকে উপহার দিতেছে। বিনিময়ে কান্ত যা' দান করিল, তার কোমল স্পর্শে দয়িতার মনের মাঝে লক্ষ পাখীর কলরব, ফুলে ফুলে বর্ণ, সুষমা ও গন্ধে তা' ভরপুর—

আনন্দ-লঘুচিত্তে সময়ের পদরেখা পড়ে না। প্রায় দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ হাত-ঘড়িটার উপর চোখ পড়িতেই অমল বলিল,—"দিদি, আর নয়।"

—"এরই মধ্যে যাব কি রে?"

—"এদিকে দশটা বাজে।"

—"দশটা!" মাধবী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। "চল্, চল্।"

শীতের রাত।

বাহিরের বাতাস হিম হইলেও রমেশের ভিতরটা উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কাণ দু'টি জ্বালা করিতেছে। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল, দশটা বাজিয়া দশ মিনিট। মেয়েরা একবার ছাড়া পাইলে, বাড়ীর কথা ভুলিয়া যায়।

চাকর আসিয়া বলিল—"বাবু, খাবারের—"

—"তোকে সর্দ্দারী করতে কে বলে গেছে রে।" বলিয়া রমেশ রুখিয়া দাঁড়াইল।

বাস্তবিক পক্ষে তাকে কেহ বলে নাই। মনিবের আহার হইলেই তার ছুটি, এমনি ব্যবস্থা। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়টি চলিয়া গিয়াছে। বলিল—"অনেক রাত হ'ল—"

—"যা—যা—"

নীচে তখন ট্যাক্সি আসার শব্দ। রমেশ জানালার কাছে সরিয়া গিয়া দেখিল—মাধবী।

অমল তাকে দরজায় নামাইয়া দিয়াই চলিতে চলিতে বলিল—"চল্লুম দিদি। ওদিকে মেসের ভাত—"

—"ওরে শোন শোন। এখানেই খেয়ে যা।" ততক্ষণে অমল পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

তারপর—মিনিট তিনেক পরই রমেশের তর্জ্জন-গর্জ্জন; মাঝে মাঝে হুঙ্কার; সপ্তমে উঠে আবার খাদে নামিয়া যায়। পাশের বাড়ী হইতে মনে হইল, তার ঘরে একমাত্র বক্তা ও শ্রোতা সে, বাড়ীর আর সকলে নিদ্রিত। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিল। তারপর সব নিঝুম। সে রাতে মাধবীর গোলাপগুলি ও চকোলেটের বাক্সটি পরিশেষে কোথায় পড়িয়া রহিল, জানি না।

পাশের বাড়ীটা রমেশের বন্ধু ভবতোষের। মাঝে একখানি দেওয়াল তার পায়ে ছোট্ট একটী দরজা। দু' বাড়ীর কর্ত্তারাও পরমবন্ধু ছিলেন। গৃহিণীরা থাকিতে দ্বিতলের এই পথে যাওয়া-আসা ছিল। এখন তাঁরা নাই। দরজাটিও বন্ধ।

ঝড়-ঝঞ্ঝা থামিয়া গেলে ভবতোষ বলিল,—"রমেশটা একটা টাইর‍্যাণ্ট—ষ্টুপিড্। ওসব লোকের বিয়ে না করাই উচিত।"

ভবতোষ লোকটি বেশ। বিদ্বান্, সচ্চরিত্র এবং আজও কুমার। কেন বিবাহ করে নাই, তার ঠিক কারণটা জানা যায় না। তবে একবার যেন সে বলিয়াছিল, নারীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে আনিয়া সংসারের তাপে ও চাপে কখনও কখনও তার প্রতি অসম্মান ঘটিবে, তার চোখের জল পড়িবে, দাম্পত্য জীবনারম্ভের পক্ষে ইহা একটি প্রকাণ্ড বাধা। মা কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছেন, দিদি বলিতে বলিতে হয়রাণ, বন্ধু-বান্ধবরাও পরিহাস করে, তথাপি সে অটল। এই গোলযোগের মাঝে বয়সটাও দেখিতে দেখিতে চল্লিশের কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

রমেশের প্রতি ধিক্কারে তার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। স্থির করিল, পরদিন তাকে ডাকিয়া ক্ষুদ্র একটী বক্তৃতা দিবে।

কিন্তু পরদিন রমেশকে ডাকিতে হইল না, একটু বেলা হইলে সে নিজেই আসিল এবং ভবতোষকে অবসর না দিয়াই বলিল,—"এবার আর অমত কোরো না হে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি তার গুণ; বয়সও আঠারো-উনিশ। দেখ, তোমার ঘরে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটে উঠ্বে। তা' ছাড়া, বড় গরীব। ওর মা ত ওকে ওদের গাঁয়ের গোমস্তটার সঙ্গেই বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি তোমার কথা বলে ঠেকিয়েছি। এখন যদি—"

—"কি বলেছ? আমি বিয়ে কর্ব?"

"ঠিক তা' নয়। তবে বলেছি—যোগ্য পাত্র, রাজীও হবে। তুমি যদি মেয়েটিকে একবার দেখ—" বলিয়াই রমেশ মানসচক্ষে কাহাকে যেন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

ভবতোষ বলিল—"বিয়ে করার সম্বন্ধে ভাববার অনেক আছে।"

"আর সেটা বিয়ে করবার পরই উচিত। তা' হ'লে যা' ভাব্তে চাইছ, চোখের সাম্নে আপনা থেকেই সব ফুটে উঠ্বে।"

—"মেয়েটিকে তুমি দেখেছ?"

—"হুঁ। তোমায়ও দেখাতে পারি, আজই।"

—"বেশ। আমি না হ'লেও অন্য কারো জন্যে চেষ্টা কর্ব। তার আগে দেখে-শুনে রাখা চাই। আর দেখ, কাল তুমি বাড়ীতে যে রকম চেঁচামেচি করছিলে, ওটা আমি কোন দিক দিয়েই সমর্থন করতে পারি নে—"

রমেশের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মনের ভাবটা গোপন করিয়া কৌতুকমাখা-কণ্ঠে বলিল—"দম্পতি কলহ—"

"কলহ কোথায়? ও যে অত্যাচার—টির‍্যাণী—"

রমেশ ততক্ষণে রাস্তায়। চলিতে চলিতে চীৎকার করিয়া বলিল—"কথা রইল, আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে—"

ভবতোষ উঠিয়া পদচালনা করিতে লাগিল।

এবং কথামত সেইদিনই সন্ধ্যায় আরতিকে দেখিল—ঠিক যেন একটী রসভারাতুর আঙুর—নিটোল, কোমল ও ঈষৎ রক্তিম।

অতঃপর শুভকার্য্যেও বিলম্ব বা বিঘ্ন ঘটিল না। পাত্র হইল সে নিজে।

তারপর দিন যায়, রাত যায়, মাস যায়—বছরও চলিয়া যায়।

ভবতোষের বিশৃঙ্খল সংসার সুসজ্জিত। সেও আরতিকে নানা উপহারে সোহাগে কথায় খুশী করিতে চেষ্টা করে, নানা মতে সাজায়, তবু—তবুও মনে হয়, তার মনটিকে ঠিকমত ধরা যাইতেছে না; জীবনের দু'টি ধারাই পাশাপাশি বহিয়া চলিতেছে, তবুও তার সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইতে পারিতেছে না।

একটী কাজ আরতির বড় ভাল লাগে। খোলা জানলায় দাঁড়াইয়া রাজপথে মানুষের চঞ্চল স্রোতধারাটির পানে তাকাইয়া থাকা। কিন্তু ভবতোষের ইহা ভাল লাগে না। আরতির প্রতি সহস্র চক্ষুর লুব্ধদৃষ্টি ভবতোষের মনকে পীড়িত, এমন কি উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। অবশ্য ইহার দরুণ আরতির কাছে কোনদিনও সে অনুযোগ করে নাই।

এক-একদিন সে যখন খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া পলকহীন চোখে পথের পানে তাকাইয়া থাকে, ভবতোষ সহসা পিছনে গিয়া বলে—"কি দেখ্‌ছ?"

আরতি উত্তর করে—"দেখ, দেখ, ঐ মেয়েটি কি সুন্দর! চমৎকার, না? উনি বোধ হয় ওর বাবা। মেয়েটির মুখখানি ঠিক বাপের মত—কি সুন্দর!"

ভবতোষের বুকের ভিতরটা অশান্ত হইয়া উঠে। সে আরতিকে ডাকিয়া লইয়া যায়। কিন্তু কিছু বলে না। তারপর গোপনে আয়নায় নিজের মুখখানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকে—না, তার চেহারাও খারাপ নয়। আরতিও সে কথা বলে। তথাপি ঐ প্রশংসাটুকু তার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকে, একটু জ্বালাও করে।

সেদিন তখন দ্বিপ্রহর বেলা। ভবতোষ অফিসে। আরতি জনবিরল পথের পানে তাকাইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া। হাতে একটা ক্যামেরা ও ছোট ব্যাগ—সবগুলিই সদ্য ক্রীত। সুরেশ্বর এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে পথ দিয়া চলিতেছে। হঠাৎ উপর পানে নজর পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং আরতির সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"এই বাড়ী ত?"

—"হাঁ। এসো, এসো—ঐ যে সাম্‌নে দরজা।" বলিয়াই আরতি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তারপর সুরেশ্বরের হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিল—"কি আমার ভাগ্যি। এতদিনে মনে পড়েছে তা' হ'লে!"

—"তোর কথাই মনে করতে করতে চলেছি। কিন্তু বাড়ীর গায়ে নম্বর-টম্বর নেই। তা' যাক্—শীগ্‌গির চল তোর ঘরে।"

—"কেন?"

—"একটা মজা দেখাব।"

আরতি সুরেশ্বরকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেল। ঘরে গিয়াই সুরেশ্বর বলিল,—"দরজা জানলাগুলো সব ছিটকিনি দিয়ে দে। একটুও যেন আলো না আসে।"

—"কেন, আগে শুনি।"

—"ফটো ছাপব।"

—"দেখি কার?"

—"ছাপি আগে, তারপর দেখিস্।" বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আরতির মুখে-চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া

গেল। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ও বুঝেছি। সেই যে মেয়েটাকে তুমি ভালবাস—"

—"ধ্যেৎ!"

ব্যাপারটা তাই-ই। কলেজ হইতে বাহির হইয়াই সুরেশ্বর ফটো লইয়াছে। ইচ্ছা ছিল, তখনই নিজের হাতে তা' ডেভেলপ করে, ছাপে এবং অবিলম্বে গিয়া মেয়েটির হাতে একখানি তুলিয়া দেয়। সে শুনিয়াছিল, কাছেই আরতির বাড়ী। কিন্তু পথ খুঁজিয়া বাহির করিলেও বাড়ীটা এতক্ষণ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তার আর বিলম্ব সহিল না, জানালাগুলি নিজেই ত্রস্তহাতে বন্ধ করিয়া বলিল—"যা' আরতি, শীগ্‌গির এক ঘটি জল নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ এগুলো সব ঠিক করি। চমৎকার অন্ধকার হয়েছে, এই যে একটা লাল আলোর ডুমও রয়েছে দেখছি—যা' যা'।"

আরতি কৌতূহলে ফাটিয়া পড়িল; বলিল, "তুমি দরজা বন্ধ করো না দাদা। আমি এখুনি আসছি।" বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া এক ঘটি জল আনিতেই সুরেশ্বর দরজায় খিল লাগাইয়া দিল।

অন্ধকার ঘর। একটী ছোট লাল আলো অন্ধকারের গায়ে ম্লান রশ্মিগুলি ছড়াইয়া দিতেছে। তারপর পাঁচ মিনিটও কাটে নাই, সুরেশ্বর সরঞ্জামগুলি খুলিয়া প্লেটখানি বাহির করিয়াছে মাত্র, হঠাৎ বাহির হইতে দরজায় প্রচণ্ড আঘাত—"দরজা খোল।"

ভবতোষ সকাল সকাল অফিস হইতে ফিরিয়াছে। উপরে উঠিয়া দেখে শয়ন-ঘরের দরজা বন্ধ। মনে করিয়াছিল, আরতি হয় ত ঘুমাইতেছে। কিন্তু ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"একটী বাবু আর মা ঘরে আছেন।" বলিয়াই সে ভবতোষের জন্য খাবার কিনিতে বাহির হইয়া গেল।

কথাটা শুনিয়াই তার বুকের ভিতরে ধা পড়িল, মাথাটা দপ করিয়া জলিয়া উঠিল। তারপরই আঘাত—আবার আঘাত—এবার খুব ঘন ঘন—"এই খোল দরজা।"

আরতি সচকিত হইয়া উঠিল; ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"উনি এসেছেন।"

সুরেশ্বর তার হাত চাপিয়া ধরিল; বলিল—"এখন খুললে সব মাটি। বলো, অন্য ঘরে যেতে।"

ভবতোষ দরজায় কাণ পাতিয়াছিল। অন্য ঘরে?

—"এই খোল, খোল দরজা।" আঘাতটা আরও প্রচণ্ড, স্বর আরও বিকট। সারা বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল।

আরতি বলিল—"ছাড়—ছাড়।"

—"না না, আরতি, আমার বড় সাধের ছবি।"

দুম্—দুম্—দুম্। ভবতোষ উন্মাদের মত দরজায় পদাঘাত করিতে লাগিল।

"খুন করব—খোল খোল—শীগগির খোলো—ও—ও—"

আরতি দরজা খুলিতে চায়, সুরেশ্বর তা'কে ধরিয়া রাখে। বলে—"আর একটু পরে।"

আরতি তার হাত ছিনাইয়া যাইতে পারে না ভিতরে ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ।

ভবতোষ সে শব্দ আর শুনিতে পারিল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া দ্বারে আঘাত করিল। বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল—"খুন করব—খুন করব!"

রমেশের শরীর সেদিন অসুস্থ। ঘরেই ছিল। ভবতোষের চীৎকার ও দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দে সে শয্যায় উঠিয়া বসিল; বলিল—"ভবতোষটা স্কাউণ্ড্রেল। মেয়েটাকে বুঝি মেরে ফেললে। আমি ভাল করে না জেনে—" বলিতে বলিতে সে ছোট দরজাটি খুলিয়া ভবতোষের দোতলার বারান্দা দিয়া ছুটিতে লাগিল। পিছনে মাধবী।

ওদিকে ভবতোষ দরজাটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। উন্মত্তের মত ঘরে ঢুকিয়া সে সুরেশ্বর ও আরতির হাত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"শয়তান্—পুলিশে দেব—আর তুমি—" তার সারাদেহ কাঁপিতেছে।

রমেশ সেই মুহূর্ত্তে তার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে এক ঝলক দৃষ্টিপাত করিয়াই ব্যাপারটা নিমেষে বুঝিয়া লইল; বলিল—"বেয়াকুব—ফুল—"

—"চোপরাও ষ্টুপিড্—টাইর‍্যাণ্ট্। কি জান তুমি?"

—"আর তুমি জেলাস্ ব্রুট, কিছু বুঝ্তে পেরেছ? ও তোমারই পিস্তুতো শ্যালা। ভাল করে' ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখ।"

রমেশের কথায় ঘরের মধ্যে তাকাইয়াই ভবতোষের মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। লাল আলোটি যেন রক্ত চক্ষু মেলিয়া তার পানে তাকাইয়া আছে। চারিদিকে ফটো তুলিবার সরঞ্জাম ছড়ানো। সুরেশ্বর সেই সুযোগে তার হাত ছাড়াইয়া, সাধের ছবি ফেলিয়াই সরিয়া পড়িল। ভবতোষ বিবর্ণমুখে তাকাইয়া দেখিল, আরতি লজ্জায়, ঘৃণায় আড়ষ্ট ও নতমুখী। রমেশের মুখ কঠিন।

মাধবী ছিল অদূরে দাঁড়াইয়া; সে এতক্ষণ একটী কথাও বলিতে পারে নাই। বোধ করি ভবতোষের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াই আপন-মনে কিন্তু অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ছি ছি, কি ঘেন্না! পুরুষ জাতটাই কি এমনি?"

-পরলোক—

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

চব্বিশএ নভেম্বর আমার মা আমাদের দু'টি বোনকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। আমার ছোট বোন তখন অত্যন্ত ছোট। মায়ের জন্য সে খুব কান্নাকাটী আরম্ভ করিল; কেবলই জিজ্ঞাসা করিত—"দিদি মা কোথায়?"

মায়ের অকাল-মৃত্যুতে সকলেই শোকে ম্রিয়মান হইয়াছিলেন। বাবা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন! ছোট বোনটীকে তাঁহার কোলে দিয়া কোনরূপে তাঁহাকে শান্ত করা হইত।

বারই ডিসেম্বর। প্রায় এক মাস পরের ঘটনা। বেলা তখন দেড়টা হইবে। বাবাকে অফিসের জামা-কাপড় দিয়া তিনি বাহির হইলেন দেখিয়া ছোট বোনটীকে খাইবার জন্য ডাকিতে গেলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখি, একটী সোফায় সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অসময়ে ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহার গায়ে হাত দিতে যাইব, হঠাৎ পিছন দিকে একটী শব্দ অনুভব করিলাম। ফিরিয়া দেখি, আর একটী সোফার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া,—আমার এক মাস পূর্ব্বের হারান মা! তাঁহাকে আবছায়া দেখা যাইতেছে; তাঁহার চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। চমকিয়া উঠিলাম! অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে বাহির হইল—"মা, তুমি?"

খুব মৃদুস্বর; কোনও রূপ বিকৃত কণ্ঠস্বর নহে। মা কহিলেন—"হ্যাঁ, আমি। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তুই একটু বোস, গোটাকতক কথা আছে।"

ছোট বোনটীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সে তখনও তেমনি ঘুমাইতেছে। ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করিয়া মায়ের নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া কহিলাম—"মা, আমাদের ছেড়ে তুমি কি করে' আছ—মন কেমন করছে না? আমরা যে আর থাকতে পারছি না! মা, তুমি আর যেও না। বল, তুমি থাকবে?" বলিয়া মাকে যেমনি ধরিতে যাইব, অমনি শশব্যস্তে মা সরিয়া গিয়া বলিলেন—"আমায় ছুঁয়ো না মা। আমি কি ইচ্ছা করে' তোমাদের ছেড়ে আছি! আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তোমাদের ছেড়ে, তা' কি আর বলবার! কিন্তু উপায় ত কিছুই নেই। যাক্, যা' বলছি শোন, ওঁর একটা বিপদ খুব নিকটবর্ত্তী—তাতে ওঁর প্রাণের আশঙ্কা আছে। আমি সাবধান করে' দিতে এসেছি, তাঁকে বলব।"

আমি বলিলাম—"বাবা ত অফিসে বেরিয়ে গেছেন, কা'কে বলবে।"

অল্প হাসিয়া মা বলিলেন—"এখনি আসবেন দেখ না; টাকার ব্যাগ ফেলে গেছেন।"

দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম, টেবিলের উপর সত্যই ব্যাগটী রহিয়াছে। তখনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাবা দরজার নিকট আসিলেন। আমি উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলাম—"বাবা, মা এসেছে।"

বাবা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কি বলছ মা?"

—"হ্যাঁ বাবা, ঘরে এস, দেখবে। আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম।"

বাবা তাড়াতাড়ি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিক তাকাইতে লাগিলেন এবং মায়ের নাম ধরিয়া বলিলেন—"সে কই মা?" তারপরই সোফার উপর মায়ের আবছায়া মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর

হইতেই হর্ষবিকশিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—“তুমি !”

মায়ের চক্ষু দিয়া আবার দ্বিগুণবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। বাবা তাড়াতাড়ি সোফায় বসিতে যাইতেই, আমি বলিলাম—“ওখানে বস না বাবা। মা বললেন—এখন আর আমরা ওঁকে ছুঁতে পারব না।”

কি ভাবিয়া বাবা অন্য একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কি বলিতে যাইতেই বাধা দিয়া মা কহিলেন—“তোমার সঙ্গে দু’-একটা কথা আছে। অফিসের সময় বলে’ তুমি ব্যস্ত হ’তে পার, কিন্তু দেরী হ’লেও ক্ষতি হবে না ; কারণ, তোমার সাহেবের গাড়ীর সঙ্গে অন্য একটা গাড়ীর ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটবার খুব সম্ভাবনা। বেলা বারটার আগে সাহেব অফিসে আসতে পারবেন না।”

সবিস্ময়ে বাবা বলিলেন—“সে কি করে’ জানলে ?”

মৃদু হাসিয়া মা বলিলেন—“জানি। এখন শোন কথাগুলো।” বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। সেগুলি আমরা জানাইতে অক্ষম ; তবে এইটুকু জানাইতেছি যে, বাবার খুব একটা বিপদ আসিতেছিল, কি করিলে রক্ষা পাইবেন মা তাহা বলিয়া দিলেন।

মার কান্নার কারণ বাবা জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন—“তোমাদের ছেড়ে বড় কষ্টে আছি। তাই আজ এসেছি।”

কথাবার্ত্তার শেষে মা চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার কান্না দেখিয়া মাও আবার পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“কেঁদ না মা, চুপ কর।”

আমি বলিলাম—“তুমি যেও না মা। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি থাক।”

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে মা বলিলেন—“সে যে হয় না মা, আমি মাঝে মাঝে আসব। এখন তুমি একটু ঘর থেকে যাও, ওঁকে দু’-একটা কথা বলব।”

আমি চলিয়া আসিলাম। তারপর তাঁহাদের কি কথাবার্ত্তা হইল জানি না। কিছুক্ষণ পরে বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, মা চলিয়া গিয়াছেন।

সেদিন বাবা অফিস হইতে ফিরিলে শুনিলাম,—সত্যই সাহেবের গাড়ীর সঙ্গে অপর একখানা গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। সাহেবের বা অন্য গাড়ীর লোকেদের কোনও অনিষ্ট হয় নাই।

ইহার পর প্রায়ই বাবা এবং আমি মায়ের কথামত তাঁহাকে ডাকিতাম। কখন কখন আমি ডাকিতাম না, বাবাই ডাকিতেন।

দের এসবের কথা কেহই জানিত না।

একজনকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার শরীরে [illegible] হইত, কিন্তু তাহা আবার যে কোনও লোকের শরীরে হইত না। আমার এক কাকা ছিলেন, তিনি এবং আমার দিদিমা, আর আমি ছাড়া কাহারও শরীরে হইত না।

একদিন বাবা নাই, সন্ধ্যার সময় দেখি, আমার সেই কাকা আমাদের শোবার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ আমার ইচ্ছা হইল, মাকে ডাকি। বাবা নাই, একথা স্মরণ হইল না। যেরূপে বাবা ডাকিতেন, সেইরূপেই ডাকিয়া গল্প করিতেছি, হঠাৎ কয়েক মিনিট বাদেই আমার মনে হইল,—খাটশুদ্ধ আমি শূন্যে উঠিতেছি। কাকা তখনও সেইরূপ অবস্থায় আছেন। খাটখানা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়া কড়িকাঠে ঠেকিল, আবার সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল। এই প্রকার দুই-চারিবার হইয়া খাটখানি কড়িকাঠের সঙ্গে আটকাইয়া রহিল। মনে হইল,—আমার গলা কে যেন সজোরে

চাপিয়া ধরিয়াছে—দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে—ক্ষণপরেই একটা ভিন্ন কণ্ঠস্বরে কথা শুনিতে পাইলাম—"কেমন জব্দ করেছি, আর কখনও এমন করবি ?"

মায়ের আদেশ ছিল—"গঙ্গাজল ভিন্ন কখনও ডেক' না। ঠাকুর-ঘর হ'লেই ভাল হয়। যদিও অন্য কোথাও ডাকা হয়, তা' হ'লে যে ডাক্‌বে সে যেন পবিত্র অবস্থায় থাকে। তা'না হ'লে অন্যান্য দুষ্টু আত্মারা অনিষ্ট কর্‌তে পারে—এমন কি প্রাণনাশও হ'তে পারে।" হঠাৎ আমার সেই কথা মনে পড়িল। তবে কি নিজের অজ্ঞাতেই কোন অন্যায় করিয়া বসিয়াছি। হঠাৎ মায়ের আর্ত্তস্বর শুনিলাম। তিনি যেন আমার কানের ভিতর একটীমাত্র উপদেশ দিলেন। এবার খাটখানা নামিতেই আমি ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। এক ঘটী গঙ্গাজল আনিয়া ছিটাইয়া দিতেই কে যেন বলিয়া উঠিল—"ওঃ, খুব বেঁচে গেলি! যাঃ, তোর মার দয়াতেই এ যাত্রা রক্ষে পেলি!" আমি তখন মুক্তির আনন্দে পুলকিত।

তারপর সে চলিয়া গেল। মাকে আর সেদিন ডাকি নাই। কাকাকে উঠাইলাম। তিনি ত কিছুই জানেন না। শুধু উঠিয়া বলিলেন—"শরীরটা বড় খারাপ লাগছে কেন বুঝতে পারছি না। ভরসন্ধ্যেবেলা বড় ঘুমিয়েছি, তাই বোধ হয়।"

তাঁহাকে কিছু বলিলাম না। বাবা আসিলে সকল কথা জানাইতে তিনি বলিলেন—"সর্ব্বনাশ করেছিলে আর কি! আর কখনও ওরকম করো না।" *

* প্রেসে পাঠাইবার পূর্ব্বে আমার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই লেখাটি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। বুঝিলাম, মা আমার ইং ১৯১৪ সালের ২৪এ নভেম্বর তাঁহাদের প্রকৃতির স্বর্গারোহণের পর কয়েকটী ঘটনা যাহা ১৯২৪ ডিসেম্বর হইতে ১৯২৫ জানুয়ারী মধ্যে ঘটিয়াছিল, তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক ঘটনা সত্য—তবে উহা প্রচারের কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রবোধবালা দেবীর স্বর্গারোহণ তারিখ—২৪এ নভেম্বর, ১৯১৪ এবং প্রথম আবির্ভাব বা পুনরাগমনের প্রথম তারিখ ১২ই ডিসেম্বর ১৯১০ এবং ঐ দিনের প্রথম সম্ভাষণ—"কেমন আছ?" এবং সঙ্গে সঙ্গে দরবিগলিত অশ্রুরাশি আমি এখনও বেশ মনে করিতে পারি।

পরে শ্রীমতী প্রবোধবালার নাম বা স্মৃতিরক্ষার্থ একটী Matric School ২৭ এ-১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। আজ প্রায় দশ বার বৎসর বহু বালক সেই স্কুল হইতে Matric পাশ করিয়া আসিতেছে।

অলমতি বিস্তরেণ

শ্রীঅভয়পদ ভট্টাচার্য্য

—স্নেহের টান—

শ্রীসুধীরকৃষ্ণ তালুকদার

সিরাজগঞ্জে থাকিয়া ওকালতি করিয়া কায়-ক্লেশে নিজের খরচাটাই কোনরকমে চালাইয়া লইতেছিলাম। হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতেরই মত পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমি একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থাতেই দেশাভিমুখে রওনা হইলাম। গরীবের শোক করিবার অবসর নাই; কাজেই পিতার সঞ্চিত যা'কিছু অর্থ ছিল, তাহাতেই শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আবার কর্ম্মস্থানাভিমুখী হইলাম। মাতার মুখে শুনিলাম, পিতার না কি একান্ত ইচ্ছা ছিল গঙ্গালাভ করিবার। অন্ততঃ, তাঁহার অস্থিটুকু যেন গঙ্গায় দেওয়া হয়।

মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যতশীঘ্রসম্ভব তাহার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করিব। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তাহা আর হইয়া উঠিতে-ছিল না।

পিতার মৃত্যুতে সংসারের ভার আমার উপর পড়িল। একটী ছাত্রকে রাত্রিতে তিন ঘণ্টা পড়াইবার কার্য্য লইলাম। বেতন ত্রিশ টাকা। ছাত্রদত্ত বেতন এবং আমার ওকালতির আয় হইতে আমার খরচের জন্য সামান্যই রাখিয়া বাদবাকী সমস্তই বাটীতে মায়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলাম। কোনরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল। মা প্রতি পত্রেই পিতার অস্থি যতসত্বরসম্ভব গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে লিখিতেছিলেন। এতদিন সময় এবং অর্থের অভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। সহসা সুযোগ উপস্থিত হইল। একটা মোকর্দ্দমায় কিছু টাকা পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

আমার ছাত্রের পিতার নিকট হইতে কয়েক-দিনের বিদায় লইয়া বাটী রওনা হইলাম। বাটীতে কয়েকদিন কাটাইয়া নৈহাটী যাইব মনস্থ করিয়া রাত্রির ট্রেণ ধরিবার জন্য যাত্রা করিলাম। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। এই দুর্য্যোগে মা যাইতে নিষেধ করিলেন। কোর্ট কামাই হইতেছে, বিলম্বে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা বলিয়া মাতার পদধূলি মস্তকে লইয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদিগেরই একটী প্রজা আলো এবং আমার সামান্য জিনিষপত্র যাহা ছিল লইয়া আমাকে রেলষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। আমি ষ্টেশনে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই মুষলধারে বৃষ্টিপাত এবং প্রবলবেগে ঝড় আরম্ভ হইল। আমি বিশ্রাম-ঘরে বসিয়া প্রকৃতিদেবীর সেই রুদ্রলীলা দেখিতে লাগিলাম। যথাসময়ে ট্রেন আসিলে, ভিজিতে ভিজিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সেদিন বেশী যাত্রী ছিল না। পাঁচ-ছয়জন ভদ্রলোক শুইয়াছিলেন। স্থানের অভাব হইল না। আমিও আমার ক্ষুদ্র শয্যাটী বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানিতে পারি নাই।

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। মনে হইল, কে যেন আমাকে ডাকিতেছে। উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম, দুইজন ভদ্রলোক তাঁহাদিগের বিছানা ইত্যাদি গুছাইয়া লইতেছেন; বোধ হয় তাঁহাদিগকে শীঘ্রই নামিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারা কেহই আমাকে ডাকেন নাই। ইতিমধ্যে গাড়ীখানি দীর্ঘপথ দৌড়াইয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িবার জন্য একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইল।

গাড়ীর কাচের জানালা দিয়া দেখিলাম পোড়াদহ আসিয়াছি। যাঁহারা শুইয়াছিলেন, সকলেই উঠিয়া বসিলেন। আমি কি রকম একটা অসচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতেছিল, কে যেন আমাকে ডাকিতেছে! গাড়ীর দুয়ারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। কত লোক উহারই ভিতর উঠানামা করিতেছিল। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, পিছন হইতে কে যেন প্রবলবেগে ধাক্কা দিয়া আমাকে দ্বারের নিকট ঠেলিয়া দিল। একটী ভদ্রলোক ধরিয়া ফেলিলেন, পতন হইতে রক্ষা পাইলাম। গাড়ীর ভিতর যাঁহারা ছিলেন, সকলেই অবাক-বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ গাড়ীর বন্ধ দুয়ার সশব্দে খুলিয়া গেল। মনে হইল বাহির হইতে কেহ ধাক্কা দিয়া খুলিয়া দিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল; গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। আমি তখনও সেই ভাবেই দাঁড়াইয়াছিলাম। অকস্মাৎ দুইখানি সবল হস্ত আমাকে শূন্যে উঠাইয়া প্ল্যাট্‌ফরমের উপর নিক্ষেপ করিল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়িয়াছিলাম জানি না; জ্ঞান হইলে দেখিলাম, আমার চতুর্দ্দিকে বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে। আমার সহযাত্রী ভদ্রলোক কয়জনও ছিলেন। গাড়ী তখনও প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়াছিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করিলেন। গাড়ীর দুয়ারের দিকে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, আমার স্বর্গগত পিতা দাঁড়াইয়া আমাকে হস্তসঙ্কেতে গাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিতেছেন। পিতার মূর্ত্তি ছায়াময়, অতি শুষ্ক, বিষাদপূর্ণ মুখমণ্ডল, কেবলমাত্র চক্ষু দুইটী জ্যোতির্ম্ময়। অনেকেই এই অশরীরি ছায়াময় মূর্ত্তি দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম—বাহ্যজ্ঞান সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছিল। সহযাত্রী একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"আপনি এ ট্রেণে না গিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান; ইহার পরে পুনরায় যাইবেন।"

আমার দ্রব্যাদি নামাইয়া লইয়া বিশ্রাম-ঘরে গিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমার ফিরিবার গাড়ীরও অধিক বিলম্ব ছিল না। শরীর বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল। কিন্তু বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, গাড়ীর দেখা নাই।

বসিয়া বসিয়া বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট গেলাম। তাঁহারা সকলেই মহাব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতেছেন। ব্যাপার কি জানিতে চেষ্টা করিলাম; কোন জবাব পাইলাম না। বহুক্ষণ পরে একটী ভদ্রলোক বলিলেন—"হালসার নিকট ঢাকা মেলগাড়ীর সহিত অন্য একখানি গাড়ীর সংঘর্ষ হওয়াতে বহু গাড়ী নষ্ট হইয়াছে এবং অনেক লোক মারা গিয়াছে। অন্ততঃ একদিন সমস্ত ট্রেণ চলাচল বন্ধ থাকিবে।"

অবাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম! কোনপ্রকারে বিশ্রাম-ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে নাই। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনিলাম যে, প্রথম পাঁচখানি গাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—একটী প্রাণীও বাঁচে নাই। আমি সম্মুখের তৃতীয় গাড়ীখানিতেই ছিলাম। স্বর্গগত পিতার আত্মা পুত্র স্নেহের প্রবল আকর্ষণে আসিয়া তাঁহার অযোগ্য পুত্রকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়া গেলেন। পূর্ণ দুইদিন পোড়াদহ ষ্টেশনে কাটাইয়া মনে মনে পিতার আত্মাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

—ভৈরবী—

শ্রীহরিপদ গুহ

এক

আমরা কয়জন বন্ধুতে বড়দিনের ছুটীতে কাশী চলিয়াছিলাম। শুনিলাম,—এই সময়ে নাকি সেখানে মাছ, দুধ, কপি ইত্যাদি খুব সস্তা; পেটুক মানুষ, লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

বারমাস সহরের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া প্রাণ-মন কেমন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ট্রেণে উঠিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

বর্দ্ধমানে গাড়ী থামিতেই তারাকান্ত কিছু মিহিদানা ও সীতাভোগ লইয়া আসিল। আমরা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম; সুতরাং, আর কালবিলম্ব না করিয়া দক্ষিণ হস্তের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম।

কখন ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে লক্ষ্য করি নাই। সহসা সম্মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখি,—দ্বারের কাছে কয়েকজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া; সঙ্গে একটি সন্ন্যাসিনীও আছেন।

বেঞ্চের লোকেরা ব্যস্ততার সহিত সরিয়া বসিয়া তাঁহাদের বসিবার স্থান করিয়া দিতেছে।

আমাদের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সকলেরই লুব্ধদৃষ্টি পড়িল গিয়া পরিপূর্ণ-যৌবনা অনিন্দিতা সুন্দরী সন্ন্যাসিনীর প্রতি।

তাঁহাদের লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল।

আশু মন্তব্য প্রকাশ করিল—'এই সব বেটারা এক নম্বর বদ্‌মাস, না পারে হেন কাজ নেই।'

জগদীশ তাহার প্রতিবাদ করিল; বলিল—'তোমার এ ভারী অন্যায়; এক-আধজনকে দেখে, সকলের প্রতি তোমার এই রকম ধারণা রাখা উচিত নয়।'

ধীরেন মধ্যে পড়িয়া মীমাংসা করিয়া না দিলে, তাহাদের বাদানুবাদ বাড়িয়াই চলিত।

তারপরই গল্পের সুরু।

সতীশ, রমণী, বীরেন সকলেই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলিতে লাগিল।

সকলের গল্প শেষ হইলে, ধীরেন একটু হাসিয়া বলিল—'তোরা যে সন্ন্যাসীর বেজায় ভক্ত দেখতে পাচ্ছি। দীক্ষা নিস্ ত বল, ঐ মহাপ্রভুদের কাছে নিয়ে যাই।'

সকলেই হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

তারাকান্ত বলিল—'তোমারই বা অভক্তির কারণটা কি শুনি?'

ধীরেন মৃদু হাসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল; তবে শোন:—

দুই

খুব বেশীদিনের কথা নয়। চৈত্রমাস। গ্রামে খুব ওলাউঠা সুরু হইয়াছে। আমরা মহামারীর ভয়ে রক্ষাকালী পূজা করিতেছিলাম।

ঘোষ-মহাশয় একখানি চেয়ারে বসিয়া সব দেখা-শোনা করিতেছিলেন। সকলেই তাঁহাকে খুব মান্য করে। গ্রামের সমস্ত কাজেই তিনি খুব উৎসাহী এবং চাঁদাও দেন মোটা রকমের। তাঁহার নিজের কোন সন্তানাদি নাই, কাজেই তিনি ছেলেদের লইয়া থাকিতে খুব ভালবাসেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী

সূর্য্যের শেষ কিরণছটা নারিকেল গাছের শাখায় পড়িয়া চিক্‌মিক্‌ করিতেছিল।

পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সামিয়ানার নীচে ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছিল। তাহাদের আজ ভারী আনন্দ!

তাহাদের মধ্য হইতে হঠাৎ একটি ছেলে দৌড়াইয়া আসিয়া ঘোষ-মহাশয়কে বলিল—'ঐ দেখুন না, কারা আস্‌ছেন।'

সকলেই উৎসুক হইয়া পশ্চাৎদিকে চাহিল।

দেখা গেল—তিনজন লোক আসিতেছেন। তিনজনেরই লোহিত বসন। তাহাদের মধ্যে একজন আবার যুবতী। বেশ সুশ্রী গড়ন, টানা টানা বড় চোখ—সকলকেই মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

একজন প্রৌঢ়। দীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। আবক্ষলম্বিত ঘন-কৃষ্ণ শ্মশ্রু। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জট্। আরক্ত চক্ষু, চক্ষে ভীষণ হিংস্রতা, সর্ব্বদাই দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

আর একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক। সুশ্রী চেহারা। দেখিলেই মনে হয় খুব নিরীহ। মুখখানি লাজুকতায় ভরা।

ঘোষ-মহাশয় স-সম্মানে তাঁহাদের যত্ন করিয়া বসাইলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস, অসীম ভক্তি। তিনি তখনই মহা হৈচৈ করিয়া তাহাদের ভোজন ও বাসস্থানের সমস্ত জোগাড় করিয়া দিলেন।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দিলেন—তাঁহার নাম রাঘবানন্দ, অপরটী তাঁহার প্রিয়শিষ্য, নাম—প্রেমানন্দ; এবং ঐ রমণী—ভৈরবী। মায়ের আদেশে তাঁহারা তিব্বত হইতে সুদূর বাঙলার এই পল্লীটিতে আসিয়াছেন।

তারপর তিনি ঘোষ-মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—'মা তোমার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার বাসনা অপূর্ণ থাক্‌বে না। তোমার একটি পুত্র হবে; সেজন্যই মা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।'

ঘোষ-মহাশয়ের মন আনন্দে একেবারে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি সোল্লাসে 'মা-মা' বলিয়া ডাকিয়া তিনবার যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন।

রাঘবানন্দস্বামী আড়-চোখে একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া লইয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। তারপর ঘোষ মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'এখন আর আমাদের ভোজনের প্রয়োজন হবে না! মায়ের পূজার পর কয়েকখানা লুচি হলেই চল্‌বে'খন। যাও, তুমি এখন কাজ-কর্ম্ম দেখ গে!'

তিন

গভীর রজনী। অনেকক্ষণ হইল মায়ের পূজা হইয়া গিয়াছে। এদিকে আহারও প্রস্তুত।

রাঘবানন্দস্বামী শিষ্য প্রেমানন্দকে কি ইঙ্গিৎ করিলেন। একটু পরেই তিনি একটি বোতল খুলিয়া শ্বেতপাথরের বাটিতে এক বাটি কারণ-বারি ঢালিয়া দিলেন। রাঘবানন্দস্বামী চোঁ চোঁ শব্দে তাহা নিঃশেষ করিয়া বাটিটী আবার তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। তিনি আবার উহা মধুরসে ভরিয়া দিয়া বোতলটির ছিপি আট্‌কাইয়া দিলেন।

তারপরই স্বামীজির আহারের কি বিরাট ঘটা! মায়ের প্রসাদের সঙ্গে দিস্তা পাঁচ-ছয় গরম গরম ফুল্‌কালুচি আহারান্তে একবাটি ঘন দুধ ও কয়েকটি সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া তিনি ভোজন-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

তারপর তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে স্বামীজী ঘোষ-মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি হঠাৎ এক সময়ে ঘোষ-মহাশয়কে তাঁহার অতি নিকটে সরিয়া বসিতে বলিয়া চুপি চুপি কহিলেন—'দেখ, আমি শুধু তোমার সন্তানের জন্যই এখানে আসি নি। আর একটি অতি গোপন কথা তোমায় বল্‌তে এসেছি। তুমি অগাধ ধনরত্নের অধীশ্বর। তোমার কোন নিঃসন্তান পূর্ব্বপুরুষ বহু অর্থ মাটির নীচে পুঁতে রেখে গেছেন; তুমিই তার এক মাত্র মালিক। কিন্তু, সেই গুপ্তধন এখন যক্ষের অধীন;

পাওয়া অতি দুঃসাধ্য !' বলিয়া স্বামীজী হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

ঘোষ মহাশয় খুব মনোযোগসহকারে সন্ন্যাসীর কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইল, ইতঃপূর্ব্বে আরও কয়েকজন তাঁহাকে গুপ্তধন-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছিলেন বটে ! আনন্দে তাঁহার শিরায় শিরায় শোণিত নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি স্বামীজীর পদযুগল বেষ্টন করিয়া বলিয়া উঠিলেন —'প্রভু, আমাকে দয়া কর্‌তেই হবে; আপনার কৃপা না হ'লে কিছুতেই ঐ ধন আমি পাব না !'

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন; বলিলেন -'সে বড় কঠিন কাজ; অনেক পরিশ্রম, আর অনেক অর্থব্যয় ! পরিশ্রম না হয় আমি কর্‌লুম, তুমি অর্থব্যয় কর্‌তে পার্‌বে কি ?'

স প্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি ঘোষ-মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

ঘোষ-মহাশয় কহিলেন—'অনুমান কত খরচ পড়্‌বে ?'

সন্ন্যাসী কহিলেন—'এক পক্ষ অহোরাত্র যক্ষরাজের পুজা কর্‌তে হবে। খরচ একশ' ক'রে পনের দিনে পনের শ' টাকা তোমার লাগ্‌বে—পার্‌বে কি ব্যয় করতে ?'

ঘোষ-মহাশয় একটুখানি ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—'বেশ, তাই হবে। আমি পনের শ' টাকাই আপনাকে দেব। কিন্তু গুপ্তধনের অংশ কিরূপ হবে ?'

স্বামীজী হাসিলেন। কি অপূর্ব্ব সে হাসি ! কহিলেন—'আমি সন্ন্যাসী মানুষ; আমার অর্থের কি প্রয়োজন। সমস্ত ধনরত্ন তোমারই থাক্‌বে। তবে একা ভোগ করো না। কোন আশ্রমে কিংবা সৎকর্ম্মে কিঞ্চিৎ দান করো।' বলিয়া সন্ন্যাসী-ঠাকুর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চক্ষে ঘোষ-মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর কহিলেন— 'আগামী কাল থেকেই তবে কাজ আরম্ভ করা যাক্। কি বল ?'

ঘোষ-মহাশয় বলিলেন—'বেশ।'

ধীরেন একবার সম্মুখের বেঞ্চের দিকে চাহিয়া লইল। দেখিল,—সন্ন্যাসীরা বেশ জমাইয়া তুলিয়াছেন। রমণীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। আর তিনি নানা প্রকার ঔষধ বিতরণ করিতেছেন এবং বিনিময়ে নামমাত্র মূল্য পাঁচ পয়সা করিয়া লইতেছেন। সে মনে মনে একটু হাসিয়া লইয়া আবার গল্পের সুরু করিল।

চার

ঘোষ-মহাশয়ের এক শ্যালক সেখানে থাকিত। তাহার বয়স প্রায় বছর চব্বিশ। এই সব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সে মহা চটিয়া গেল; রাগে ফুলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী তাহার অবস্থা দেখিয়া একটু হাসিলেন; তারপর ভৈরবীকে ডাকিয়া কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন।

ভৈরবীও সহাস্য বদনে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরই দেখা গেল—ভৈরবী ঘোষ-মহাশয়ের শ্যালকের সঙ্গে 'গঙ্গা-যমুনা'র মতই মিশিয়া গিয়াছেন। তাহাকে দেখিলেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া কত কথা কহিতে থাকেন। সে একেবারে মুগ্ধ—কোথায় গেল তার অত বীরত্ব ? সে ভৈরবীর সঙ্গ-সুখ এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর ছাড়িতে চায় না।

স্বামীজী মধ্যে মধ্যে এক-একবার আড়চোখে তাহাদের দেখিয়া লইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে থাকেন।

* * *

ভাবী মাতৃত্বের আশায় ঘোষ-গৃহিণীর মন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী সর্ব্বদা সন্ন্যাসীর সেবায় নিরত। প্রত্যহ তাহাদের একশত করিয়া টাকা ত ব্যয় হইতেছেই, তা'

ছাড়া, সন্ন্যাসীদের ভোজনের সে কি বিরাট আয়োজন!

স্বামীজীর মুখ দিন দিনই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। তিনি ঘোষ মহাশয়কে আশ্বাস দেন—তাঁহার পূজায় যক্ষরাজ তুষ্ট হইয়াছেন; আর তিনদিন পরই তিনি গুপ্তধন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।

ঘোষ মহাশয় আনন্দের আতিশয্যে সন্ন্যাসীর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলেন—"বাবা, এ কেবল আপনারই অসীম কৃপা!"

সন্ন্যাসী গম্ভীরমুখে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া বলেন—"সকলই মা জগদম্বার ইচ্ছা!"

আগামী কল্য সন্ন্যাসীর পূজা সমাপ্ত হইবে। ঘোষ মহাশয় মনে মনে কতই না আকাশ কুসুমের সৃষ্টি করিতেছিলেন।

সেদিন খুব প্রত্যুষেই ঘোষ-মহাশয় শয্যাত্যাগ করিলেন। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া তিনি সন্ন্যাসীর ঘরে গিয়া দেখিলেন,—ঘর একেবারে খালি! তাঁহার শিষ্য কিংবা ভৈরবী কাহাকেও না দেখিয়া তিনি মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুসন্ধান করিলেন—কিন্তু কোথায় তাঁহারা?

ঘোষ-গৃহিণী বলিলেন—তাঁহার গহনার বাক্সটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

ঘোষ মহাশয় একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। তবে কি সন্ন্যাসী তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া গেল! কিন্তু কিছুতেই তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল অদূরে একখণ্ড কাগজের উপর। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—

'বাবাজী,

আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তোমার বাটীর উত্তরধারে যে বটবৃক্ষ আছে, উহার নীচে সওয়া তিন হস্ত খনন করিলেই তুমি গুপ্তধনের সন্ধান পাইবে। সৎকর্ম্মে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিও। ইতি,

আশীর্ব্বাদক—

রাঘবানন্দস্বামী।'

পত্র পড়িয়া ঘোষ-মহাশয় আনন্দে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন।

তিনি ছুটিয়া গৃহিণীকে এই শুভ সংবাদটা দিয়া আসিলেন।

ঘোষ-গৃহিণী মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ছেলে হওয়ার কথা কিছু লেখে নি?'

ঘোষ-মহাশয় হাসিলেন; বলিলেন—'হবে, হবে, সব হবে। ইনি ত আর যে-সে সন্ন্যাসী নন, এঁর একটি কথাও মিথ্যে হবে না।'

* * *

সেই রাত্রিতে নিজে কোদাল লইয়া সওয়া তিন হস্তের স্থলে সাত হস্ত খুঁড়িয়াও ঘোষ-মহাশয় কয়েকটা ভাঙা কড়ি ব্যতীত আর কিছু পাইলেন না। এখনও কিন্তু তাঁহার মনে হয়,—বোধ হয় তাড়াতাড়িতে লিখিবার ভুলেই এ বিভ্রাট। কোনদিন না কোনদিন গুপ্তধন তাঁহার হস্তগত হইবেই।

এই খানে ধীরেনের গল্প শেষ হইল।

সকলেই খুব একচোট হাসিয়া লইল।

জগদীশ হাসিল না। কহিল—'সংসারে ভাল-মন্দ সব রকম লোকই আছে। এও ত শোনা যায় যে, কোন কোন সন্ন্যাসীর দয়ায় বন্ধ্যারও সন্তান হয়; অতি দীন ব্যক্তিও অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়।'

কেহই ইহার উত্তর দিল না। সকলের দৃষ্টি এবং মন ছিল তখন ঐ সন্ন্যাসীদের উপর।

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই এক যুবক আমাদের কামরায় উঠিল। তাহাকে দেখিয়াই সন্ন্যাসীর দল তাড়াতাড়ি সেই ষ্টেশনেই নামিয়া পড়িল।

যুবককে দেখিয়া ধীরেন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—'আরে পিন্টু যে, খবর কি, কেমন আছ? তোমাদের কথাই হচ্ছিল।' পরে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—'এই সেই ঘোষ-মহাশয়ের শ্যালক। এর কথাই তোমাদের বলছিলাম।'

পিন্টু কহিল—'কি, খবর কি?'

ধীরেন বলিল—'এই যে সন্ন্যাসীরা নেমে গেল, এদের দেখে, তোমার জামাইবাবুর সেই 'গুপ্তধন' পাওয়ার কথাই হচ্ছিল।'

পিন্টু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সন্ন্যাসীদের দেখিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—'ঐ ত সেই বেটী ভৈরবী।'

তখন গাড়ী চলিতে সুরু করিয়াছে।

—তারপর-

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

বিবাহ-রাত্রে পত্নীর কালো মুখ দেখিয়া অরুণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। চিরদিন ওই কালো মেয়েটাকে লইয়া তাহাকে জীবন বহন করিতে হইবে! দাদা এবং বৌদি'র উপর রাগও হইল তেমনি। আজ তাহার মা-বাপ নাই বলিয়া দাদা টাকার লোভে একটা রূপহীনা মেয়েকে তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন। কেন, জগতে টাকাটাই কি সব? ক্ষুব্ধ অভিমানে সে গম্ভীর হইয়া রহিল।...বাসরের আনন্দে যোগদান করা ত দূরের কথা, একটি কথা পর্য্যন্ত কহিল না—শত অনুরোধেও কেহই তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

পরদিন বৌদি' আনন্দ-উচ্ছল-মুখে বর-বধূকে বরণ করিয়া লইতে আসিলেন; কিন্তু অরুণের মুখ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার মুখ এত শুক্‌নো কেন ভাই, কি হয়েছে?

অরুণ আর রাগ সামলাইতে পারিল না। রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিল—মুখ শুকনো হ'লে আর তোমাদের কি ক্ষতি! আমার সুখ-দুঃখে তোমাদের কি এসে যায়! তোমাদের সম্পর্ক ত শুধু টাকার সঙ্গে!...অভিমানে সে আর কথা বলিতে পারিল না।

কথাগুলি বৌদি'র বুকে শেলের মত বিঁধিল। নিজের কর্ণকে যেন তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেই অরুণ! যাহাকে আশৈশব কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন! সে আজ এত-বড় কথা তাঁহার মুখের উপর বলিল কি করিয়া! অলক্ষ্যে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিলেন। শান্ত-কণ্ঠে বলিলেন—বাবা যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন ভাই!...তাঁর সত্য রক্ষা করতে—

বাধা দিয়া অরুণ বলিয়া উঠিল—তাঁর আর কি! প্রতিজ্ঞা করে' গেলেন; আর তোমরা মনের আনন্দে তা' পালন করলে। এখন সারা-জীবনটা ভুগে মরি আমি। আমার দিকটা কেউ তাকালে তোমরা!...অরুণ চলিয়া গেল।

বৌদি' মড়ের ন্যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বহুদিনের জীর্ণ পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।...

এম্-এ পাশ করিয়া অরুণ 'ল' পড়িতেছিল। বড় ভাই বরুণকুমার ভায়ের শিক্ষার জন্য সাধ্যের অতীত অর্থব্যয় করিতেছিলেন। বড় আশা, অরু মানুষ হইয়া দশজনের একজন হইবে—বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। সেদিনের কথা আজও অনিমার মনের কোণে স্পষ্টাক্ষরে জাগিয়া আছে। এ গৃহে প্রথম প্রবেশের দিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথনের সূত্রপাত হইয়াছিল এই অরুণকে লইয়া। আবেগোচ্ছল-কণ্ঠে পত্নীর হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন—অরু বড় অভাগা, অল্পবয়সেই মা-বাপ দু'জনকেই হারিয়ে বসে' আছে। তোমার হাতে তুলে দিলুম; দেখো, ও যেন কোনদিন তাঁদের অভাব না বুঝতে পারে।

অনিমা সেই যে স্নেহভরে অরুণকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, আজ অবধি পুত্রস্নেহে পালন করিয়া আসিতেছেন। একদিনের জন্য জীবনে স্নেহের শৈথিল্য ঘটিতে দেন নাই। তাঁহার ব্যবহারে বরুণকুমারকে পর্য্যন্ত বলিতে হইয়াছে—

না, তোমার আবদারেই ছেলেটা বিগ্‌ড়বে দেখছি।

তারপর অরুণ যখন স সম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছিল, তখন সেই দুই সরল অভিভাবকের কি আনন্দ! কত আশা ভরসাই না তাঁহাদের স্নেহ-বক্ষে স্থান পাইল!…

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে যাইবার সময় অরুণের সে কি কান্না!—তোমায় ছেড়ে কি করে' থাকব বৌদি'!

বৌদি' সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হও ভাই! দেখছ ত সংসারের কষ্ট। তুমি মানুষ হ'লে আমাদের দুঃখ দূর হবে! তোমার দাদা তোমার জন্যে কত করছেন। কিসের আশায়, এসব কথা কি তোমার ভুললে চলে!…সেই হইতে অরুণ আরও মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল,—ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া দাদা-বৌদি'র কষ্ট দূর করিবে।

বিবাহের পর অরুণ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। হোষ্টেলের বন্ধুরা তাহাকে ঘিরিয়া নববধূর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। হাস্যচঞ্চল তরুণ অরুণ হঠাৎ কেমন যেন মেঘাবৃত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সকলেই সাশ্চর্য্যে বলাবলি করিতে লাগিল—অরুণের এ হ'ল কি?…

গ্রীষ্মের ছুটি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। দাদা আমবাগান এবার আর জমা দিলেন না—অরুণ আসিয়া আম খাইবে; সে যে ও বাগানের ফল বড় ভালবাসে! তখন কেউ ছিল না স্বতন্ত্র কথা; এখন আবার বৌমা আসিয়াছেন—আর কি পয়সার লোভে বাগান জমা দেওয়া চলে!

ছুটিতে আসিবার জন্য তিনি অরুণকে চিঠি লিখিলেন। নমিতা অনেক কথা জানাইয়া স্বামীকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিল। অরুণ রাগে তাহার কোনটারই উত্তর দিল না। যত রাগ পড়িল বেচারী নমিতার উপর—কেন সে কালো?

আবার চিঠি গেল। তখন সে দাদাকে লিখিল—পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী; এবার বাড়ী গেলে পড়ার ক্ষতি হইবে।

দাদা দুঃখ করিলেন। বৌদি' বুঝাইতে লাগিলেন—এ যে তোমার অন্যায় দুঃখ করা। পড়ার ক্ষতি করে' সে কি করে আসে। তার ওপর সাম্‌নে পরীক্ষা।

মুখে বলিলেও অন্তর কিন্তু তাঁহার কাঁদিয়া উঠিল। তথাপি কি করিয়া এতবড় আঘাত সরল স্বামীর বুকে দেন! কাজেই মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল। আহা, তিনি যে অরু বলিতেই অজ্ঞান!

নমিতা অভিমান করিল। বিছানায় শুইয়া গোপনে চোখের জলে উপাধান ভিজাইয়া তুলিল।… এতই কি পড়ার চাড়! কেন দু'দিনের জন্যেও কি আসিতে নাই? আর চিঠি? তার কোন উত্তরও দিল না। বেশ, এবার আসিলে আমিও কথা কহিব না। কক্ষণোও না…

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর এমনি করিয়া কাটিয়া গেল—অরুণ বাড়ী ফিরিল না। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। কাগজে কাগজে কৃতী ছাত্রদের নাম বাহির হইল। তাহাতে অরুণেরও নাম সুস্পষ্ট অক্ষরে ছাপা। দাদা একরাশ বাজার করিয়া বাড়ী আসিলেন। বৌদি' ত অবাক্! জিজ্ঞাসা করিলেন—এত বাজার, ব্যাপার কি?

মধুর হাসি দাদার মুখে চোখে। তিনি বলিলেন—আরে, এই জন্যেই ত অরু বলে,পাড়াগেঁয়ে ভূত! যদি দু'অক্ষর শিখ্‌তে, জান্‌তে পারতে আজ কি দিন! পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে—আমার অরু ভালভাবে পাশ করেছে।

অরুণের সাফল্যে বৌদি'র অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি দেবতার উদ্দেশে একবার প্রণাম করিলেন।

নমিতা শুনিল। স্বামীর সাফল্যে তাহার আনন্দে হৃদয়ও ভরিয়া উঠিল—কিন্তু তা' ক্ষণিকের জন্য। ঠাকুর ঘরে গিয়া সে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল—বুঝি প্রাণের আকুল প্রার্থনা দেবতার পায় উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া আসিল!

পাড়ার পাঁচজন খাইতে বসিল। কিন্তু, যাহার জন্য এত আনন্দ, সে কোথায়? ··· খাইতে বসিয়া দাদা বলিলেন—এবার আর আমাদের দুঃখ থাকবে না কি বল? এবার আমার ছুটি: বাবা, এত ঝঞ্ঝাট কি আমার পোষায়! অরুকে সব বুঝিয়ে দিতে পারলে বাঁচি!

বৌদি' সায় দিয়া গেলেন। ব্যথায় তাঁহার বুকটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। নমিতার মুখের দিকে তাকাইতেই তাঁহার চোখ সজল হইয়া আসিল। দোষ না হয় তাহারাই করিয়াছে,—কিন্তু ঐ সরলা বালিকা সে ত কোন দোষেরই দোষী নয়! ফুলের মত কোমল তাহার প্রাণ! কি নিষ্ঠুর অরুণ! কি করিয়া এমন প্রাণে সে আঘাত দেয়!

দাদা রোজই ভাবেন, এইবার অরুণ আসিবে। ষ্টেশনে নিজে যান, লোক পাঠান, কিন্তু অরুণ আসে না। পত্র দেন তাহার কোন উত্তর নাই।

বৌদি' অন্তরের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া চুপ করিয়া থাকেন। অরুণের না আসিবার কথা তবু স্বামীকে খুলিয়া বলিতে পারেন না।

নমিতা আর কি করিবে! নীরবে কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করা ছাড়া তাহার আর করিবারই বা কি আছে! ভাবনায় চিন্তায় দিন দিন সে কৃশ হইয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ এক দিন দাদা অরুণকে আনিতে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। অনিমা বাধা দিতে পারিলেন না। শুধু উপরের দিকে চাহিয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন—দেখ' ঠাকুর, ওঁর মনে আর কষ্ট দিও না! অরুণের যেন সুমতি হয়—সে যেন ফিরে আসে!

কলিকাতায় আসিয়া বরুণকুমারের কিন্তু সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল।

নমিতার বর্ণ কালো! তাই সে উপেক্ষিতা! তাই সে ঘৃণিতা! তাঁহার ভাই অরুণ কি করিয়া এতবড় অপদার্থ হইল? তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—অরুণের সঙ্গে আর তিনি কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। আজ হইতে অরুণ তাঁহার কেহ নয়! ছি! ছি, তাঁহার ভাই হইয়া অরুণ কি করিয়া বলিল যে,—টাকার জন্য তিনি তাহাকে কালো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন! একথা শুনিবার আগে তাঁহার মৃত্যু হইল না কেন? অবসন্ন-হৃদয়ে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বৌদি' অরুণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন—তার কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করো না। আজ থেকে সে আমার কেউ নয়!······

কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। অলক্ষ্যে তাঁহার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল বাহির হইয়া আসিল।

নমিতা সমস্তই শুনিল। তাহারই জন্য তাহার স্বামী আজ গৃহছাড়া! নিজের উপর রাগ হইল—কেন সে কালো? ·· সত্যই ত অরুণের পাশে তাহাকে কি মানায়! অরুণ রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান। সব গুণই তাহার আছে, কিন্তু তাহার নিজের কি আছে? ·····সে কি দিয়া অরুণকে তুষ্ট করিবে?······এত সুখই যদি দিয়াছিলে, ভগবান, তবে ভোগ করিবার ক্ষমতাটুকু দিলে না কেন! অবহেলায় অনাদরে সে আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

অরুণ বি-এল্ পাশ করিয়া বাঁচিতে আসিয়া প্র্যাক্‌টিশ আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে বেশ সুনামও করিল। হাতে দু'পয়সা রোজগারও হইতে লাগিল। প্রথমটা দাদাকে

মণিঅর্ডারে সে টাকা পাঠাইয়া দিল। দাদা তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ফেরৎ দিলেন। সঙ্গে একখানি চিঠি–তোমাকে ভাই বলে' মনে করতেও আজ আমি ঘৃণা বোধ করি। আমাদের বংশে জন্ম-গ্রহণ করে কি করে' তুমি এতদূর অধঃপাতে গেলে ভেবে পাই না। যাক্, আমাদের অর্থকষ্ট হয় নি। যতদিন আমি থাক্‌ব, ততদিন তোমার সাহায্য প্রয়োজন হবে না।

অরুণের রাগ হইল। দাদা? দাদা বলিয়া তিনি তাহাকে এতদূর অপমান করিবেন।..... ..ভাবিল,—হাজার হোক, সৎমার ছেলে ত! বেশ, তাই ভাল। সেও তাঁহাদের আর কেহই নয়।

এক-একসময় বৌদি'র জন্য তাহার কষ্ট হইত। পূর্ব্বস্মৃতিতে মন খারাপ হইয়া যাইত। আবার পরক্ষণেই ভাবিত—সব ফক্কিকারী! কিছুই সত্য নয়—ছলনার অভিনয়!

অধঃপতনের স্রোতে সে গা ভাসাইল। দাদা সবই শুনিলেন–অরু, অরু মাতাল! তাঁহার চোখ ছাপিয়া জল আসিল।

বৌদি' স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—যাও, এখনও তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তুমি গেলে সে না এসে থাক্‌তে পারবে না।

দাদা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—না, কক্ষণো যাব না! কেন যাব?... . যে রং কালো বলে' স্ত্রীকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে, যে বলে—টাকার লোভে আমি এ বিয়ে দিয়েছি, তার মুখদর্শন করব না। ভাই? হলেই বা ভাই। তার সঙ্গে সে সম্বন্ধ আমার আর নেই!

নমিতা চোখের জলে হৃদয়ের ব্যথা হাল্‌কা করিতে চাহিল। আকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইল–ঠাকুর,আমাকে তোমার পায়ে টেনে নাও! আমি মরলে আমার স্বামী ভাল হবেন—মনের মত স্ত্রী পাবেন।...

বাসন্তী পূর্ণিমা।

আলো — আলো — চারিদিকে আলোর লহরী! ধরণীর বুকে কি শোভা!

সেই আলো জানালার ফাঁক দিয়া নমিতার ঘরে ঢুকিয়া মাতামাতি আরম্ভ করিয়াছিল। নমিতার হৃদয়ে কিন্তু একটুও আলোর পরশ লাগিল না। সেখানে কেবল নিরন্ধ্র অন্ধকারের রাজত্ব। দূরে বহু দূরে—তাহারই মত এক বিরহিণী ব্যথিতা চাতকী আকুল-স্বরে মিনতি জানাইয়া ডাকিতেছিল—ফটিক জল! ফটিক জল!

পূর্ব্বদিকের নারিকেল গাছের মাথাটা বাতাসে মৃদু-মৃদু নড়িতেছিল। নমিতা বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিল—তাহার অদৃষ্টের কথা!

হঠাৎ বৌদি' ঘরে ঢুকিলেন—হাতে একখানি পত্র। চোখে-মুখে সে কি যেন একপ্রকার ভাব! ব্যথিত-কণ্ঠে ডাকিলেন—নমি!

নমিতা উত্তর দিল—কেন দিদি? চোখে তখনও তাহার জল।

ঠিক হয়ে নে বোন্, আমাদের এখনি যেতে হবে—অরুর ভয়ানক অসুখ! তিনি আর বলিতে পারিলেন না।

নমিতা আর স্থির থাকিতে পারিল না; তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। টপ্ টপ্ করিয়া তাহার দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৌদি' সাদরে চোখ মুছাইয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—ভয় কি দিদি! ভগবান্‌কে ডাক। তিনিই এ বিপদ মুক্ত করে' দেবেন—অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

বৌদি'র কথায় নমিতা অনেকটা আশ্বস্ত হইল। অনেকখানি হৃদয়ে বল পাইল। কিন্তু অবাধ্য চোখ তবু যে বাধা মানে না!

এমন সময় দাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন—ও গো, নিমে গাড়োয়ানকে ঠিক করে এলুম। যেতে কি চায়? বলে—আমার

অমুক কাজ, তমুক কাজ। বললুম—ছোড়দা'র তোর এতবড় অসুখ, আর তুই কাজের অছিলায় পিছিয়ে থাকবি রে বাঁদর? সে এখনি আসছে। তোমরা সব ঠিক্‌ঠাক্ হ'য়ে নাও। বৌমাকে বলেছ ত? উনি যাবেন ত?—তার এতবড় অসুখ! দেখে নিও, উনি গেলেই সে কিন্তু ভাল হয়ে যাবে।

রোগীর ঘর।

দাদার অকাতর অর্থব্যয়, বৌদি' ও নমিতার অক্লান্ত সেবা যত্নে অরুণ ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে ফিরিতেছে। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন,—যদি এই ভাব স্থায়ী হয়, তা' হ'লে আর ভয়ের কারণ নেই।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নমিতা তখনও অরুণের বুকে মালিশ করিয়া দিতেছিল। অরুণের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের উপর অস্তগামী চাঁদের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘুমন্ত মুখখানি নমিতার বড় সুন্দর লাগিতেছিল।

তাহার অগোচরে এক ফোঁটা চোখের জল অরুণের কপালে পড়িল। অরুণ জাগিয়া উঠিল। দেখিল,—নমিতার কালো মুখে অশ্রুর দাগ তখনও পরিস্ফুট। অরুণ ব্যথিত হইয়া বলিল—কাঁদছ কেন?

স্বামীর মুখের এই প্রথম স্নেহ-সম্ভাষণ শুনিয়া নমিতার এতদিনের বুভুক্ষিত হৃদয় বুঝি তোলপাড় করিয়া উঠিল। পিপাসু-নয়নে সে একবার মাত্র স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ নামাইল। কি যেন বলিতে চাহিল—কিন্তু লজ্জা বাধা দিল। সহসা ঘুম ভাঙার মত উঠিয়া তাড়াতাড়ি ছোট কাঁচের গেলাসটিতে কি একটা ঢালিয়া অরুণের মুখের অতি নিকটে ধরিয়া বলিল—ডাক্তার বলে' গেছেন, এটুকু খেয়ে ফেলুন।

অরুণ নিঃশব্দে ঔষধটুকু খাইয়া ফেলিল। নমিতার দিকে আর একবার তাকাইল; দেখিল,—নমিতা তখনও তাহার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।...এ কি! এই কি তার অনাদৃতা বিবাহিতা পত্নী!—এ যে মূর্ত্তিমতি সেবা! এত কালো কুৎসিত নমিতা নয়—এ যে অপূর্ব্ব রূপবতী, মানবীরূপে দেবীমূর্ত্তি!...

কালোর ভিতর এত আলো কি করিয়া আসিল সে ভাবিয়া পাইল না। দুর্ব্বল মস্তিষ্কে যেন তাহার সমস্ত চিন্তা ওলট-পালট হইয়া যাইতে লাগিল। বারবার নমিতার কোমল কালো মুখখানিই তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শুভ-দৃষ্টির সময় স্ত্রীর মুখ যেরূপ দেখিয়াছিল, এখন আর সেরূপ দেখিল না। অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য নমিতার মুখে প্রতিফলিত হওয়ায় সে স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না; গদগদস্বরে বলিল—নমি, নমি, আমার ভুল ভেঙে গেছে—তুমি এত ভাল! তুমি কালো নয়, আমার নয়নের আলো!

নমিতা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। এক অব্যক্ত আনন্দে মন তাহার ভরিয়া উঠিল।...বলিল—ভাল না ছাই।

তারপর দু'জনে কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর নমিতা বিনীতকণ্ঠে বলিল—আর কষ্ট দিও না! তুমি জান না, তোমার জন্যে তাঁরা কত কষ্টে আছেন!

নমিতার কথে অরুণ চমকিয়া উঠিল! মনে মনে তাহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যথায় তাহার বুকটা আনচান্ করিয়া উঠিল; অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—আর তোমায় বলতে হবে না নমিতা, আমি এবার আবার মানুষ হবার চেষ্টা করব! বৌদি', বৌদি'!

বৌদি' পাশের ঘরে সবই শুনিতেছিলেন; আনন্দিত মনে ছুটিয়া আসিলেন।

দাদা মিষ্টহাসি হাসিয়া বলিলেন—আরে, অরু কি যে সে—খাঁটি সোনা! ভেজাল কি ওর কাছে টিক্‌তে পারে! কি বল গো?

উত্তর দিবার লোক তখন পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

—টিউবওয়েল—

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

দশ

(দীনেশের কথা)

এইবার শোন মা, আমাদের আমলাবেড়ে যাওয়ার অবশিষ্ট কথাগুলো।

হরিশ গাড়োয়ান এসে ডাকবামাত্রই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল ঘুম ত ভারি; ঘণ্টাখানেকও শুই নি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বল্লাম—"হরিশ, এক কাজ কর; আমার এই বিছানাটা নিয়ে তোমার গাড়ীর মধ্যে আগে পেতে দাও। তারপর এসে আমাদের এই দুটো বাক্স আর ঐ হাঁড়িটা নিয়ে গাড়ীতে তুলে দেও। তোমার সঙ্গে লণ্ঠন আছে ত? না থাকে ত এই হ্যারিকেনটা নিয়ে যেও।"

হরিশ বল্ল—"লণ্ঠন নিতে হবে না, আমার গাড়ীতে আলো আছে।" এই ব'লে সে আমার বিছানাটা তুলে নিয়ে গেল।

তোমার আদুরে ছেলে রমেশচন্দ্র তখনও ঘুমুচ্ছেন। হরিশ চ'লে গেলে আমি রমেশের গায়ে ঠেলা দিয়ে বল্লাম—"এই রমেশ, শীগ গির ওঠো।"

রমেশ আমার কথা শুন্তে পেলে কি না, বুঝতে পারলাম না; সে দেখি পাশ ফিরে শোবার আয়োজন করছে। আমি তখন তাকে আরও জোরে একটা ঠেলা দিয়ে বল্লাম—"আর শুয়ে থাকতে হবে না, এখন ওঠো।"

রমেশ উঠে ব'সে বল্ল—"ছোড়দা', রাত পুয়িয়েছে না কি?"

আমি বল্লাম—"রাত পোয়াতে অনেক দেরী, এখন দুটো।"

রমেশ বল্ল—"রাত দুটোর সময় উঠে কি করব?"

—"আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে?"

—"আপনি পাগল হয়েছেন না কি ছোড়দা!' রাত দুটোর সময় কেউ কি বেড়াতে বা'র হয়। পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে চোর ব'লে।"

—"সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি এখন গাত্রোত্থান কর, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

এই সময় হরিশ গাড়োয়ান ঘরের মধ্যে এসে বল্ল—"বাবুজি, খুব পুরু ক'রে খড় বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পেতে দিয়েছি। আমি বাক্স দুটো, আর হাঁড়িটা নিয়ে যাই; আপনারা আসুন, দেরী করবেন না।"

রমেশ আমার দিকে চেয়ে বল্ল "আমি ত কিছু বুঝতে পারছি নে ছোড়দা', কোথায় যেতে হবে এত রাত্রে।"

আমি বল্লাম—"তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না; আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।"

রমেশ বল্ল—"তবুও শুনি না। আমার এ দেশ। আপনি ত এখানকার কিছুই জানেনও না, চেনেনও না।"

আমি বল্লাম—"সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। আমি সব জানি। আমি কোথায় যাব

শুন্‌বে? আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমলাবেড়ে যাব। বাইরে গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। এখনই যাত্রা না করলে ভোর পর্য্যন্ত সেখানে পৌঁছান যাবে না।"

রমেশ যেন আকাশ থেকে পড়ল! সে অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল! কি যে বল্‌বে, তা' যেন ভেবে পেল না। তারপর ব'লে উঠ্‌ল—"সে কি কথা! আমলাবেড়ে যাবেন কেন?"

"যাব, আমার খুসী! তোমার কাছে তার জবাব আমি দেব না। এখন ওঠো, সুবোধ ও সুশীল বালকের মত আমার সঙ্গে এস।"

রমেশ বল্‌ল—"সে হ'তেই পারে না ছোড়দা'! আমলাবেড়ে আমাদের বাড়ীতে যাবেন আপনি—পাগল হয়েছেন না কি? আপনার মত বড় মানুষের ছেলের বস্‌বার দূরে থাক, দাঁড়াবার মত স্থানও আমার বাড়ীতে নেই। সেখানে যাবেন আপনি? এ হ'তেই পারে না! আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না! আপনি জানেন না, আমরা কত গরীব। আমাদের ঘর দুয়ার নেই বল্‌লেই হয়, কোনরকমে দিন চলে। আর, আপনি বল্‌ছেন কি না, আমার বাড়ীতে যাবেন। বলেছি ত, দাঁড়াবার যায়গাও আমার বাড়ীতে নেই। আপনাকে খেতে দিতে পারি, এমন সঙ্গতিও আমার নেই। আমরা যে দীনহীন দরিদ্র।"

আমি বল্‌লাম—"দেখ রমেশ, আমার ধারণা ছিল তুমি একটা ছেলের মত ছেলে! এখন দেখছি আমার সে ধারণা ভুল। তুমি দরিদ্র ব'লে নিজেকে দীনহীন মনে করছ—এত দুর্ব্বল তুমি? দারিদ্র্যের যে একটা মহা গৌরব আছে, তা' তুমি বোঝ না, এইটেই আমার কাছে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে! যাক্ সে কথা, আমি বল্‌ছি, আমি আমলাবেড়ে যাবই। বাড়ী থেকে মা, বাবা, দাদারা আমাকে সেই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে যেতেই হবে। তুমি যেতে না চাও, যেও না, এখানে থাক; আমি একাই যাব। হরিশ গাড়োয়ান আমলাবেড়ে গ্রাম চেনে। সেখানে গিয়ে তোমাদের বাড়ী খুঁজে নিতে আমার কষ্ট হবে না। সে আমি পারব। তুমি থাক, আমি চল্লাম, আর দেরী করতে পারব না, আমাকে হয় ত আজই ফিরে আস্‌তে হবে।"

এই ব'লে আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলাম, তখন মা, রমেশ আর চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারল না, উঠে বল্‌ল—"ছোড়দা', ব'লে দিচ্ছি, আজ আপনার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। যখন যাবেনই, চলুন, আমিও সঙ্গে যাই। কিন্তু আমাকে যে কি বিপদে ফেল্‌লেন ছোড়দা', তা' আমলাবেড়ে গেলেই বুঝতে পারবেন। পাড়াগাঁ কি, গরীবের সংসার যে কি, তা'ত জানেন না।" এই ব'লে রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

আমি তার হাত ধ'রে গাড়ীর কাছে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লাম—"দেখ রমেশ, তুমি কাতর হোয়ো না, নিজেকে অত তুচ্ছ মনে করো না। আমার কোন কষ্ট হবে না। আমি কল্‌কাতা থেকে আস্‌বার সময় মা সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, সব জিনিস সঙ্গে দিয়েছেন, তোমাকে বিব্রত হ'তে হবে না। তুমি সুধু আমার সঙ্গে যাবে নিতান্ত অপরিচিতের মত। যা' কিছু ব্যবস্থা সব আমি ক'রে নেব।" এই ব'লে রমেশকে, বল্‌তে গেলে টেনে নিয়ে গরুর গাড়ীতে তুললাম। গাড়োয়ানও তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছেড়ে দিল।

রমেশ গাড়ীতে উঠে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল, একটা কথাও বল্‌ল না। তাকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে আমিই বল্‌লাম—"রমেশ, তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে, তা' হ'লে শুয়ে পড়, বেশ সুন্দর বিছানা হয়েছে। আমি আর শোব না। আমি এই চাঁদের আলোতে মাঠের

আর জঙ্গলের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাব। তুমি বলেছিলে, এখান থেকে আমলাবেড়ে ছয় ক্রোশ পথ ; গাড়োয়ানও বলেছে, ঘোরা পথে ছয় ক্রোশই বটে। এখন মাঠের চাষ উঠে গেছে ; এখন গাড়ী মাঠের মধ্য দিয়ে যাবে, তাতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ কমে যাবে। আমরা তা' হ'লে ভোর হ'তে-না-হ'তেই তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠব। খবর না দিয়ে হঠাৎ ভোরবেলা আমাদের দেখে তোমার মা, তোমার দিদি একেবারে অবাক্ হয়ে যাবেন। আমি সেই আনন্দের কথাই ভাবছি রমেশ।"

রমেশ বল্‌ল—"আর আমি ভাবছি,আপনাকে দেখে তাঁরা আশ্চর্য্য বোধ করবেনই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভেবে পাবেন না যে, আমি কেমন ক'রে আপনাকে আমাদের সেই জরাজীর্ণ কুঁড়ে ঘরে নিয়ে এলাম।"

আমি বল্‌লাম—"কোন ভয় নেই শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র! আমি সে সব ঠিক ক'রে নেব। তুমি হয় ত ভাবছ, তাই ত, ছোটদা' যে ঘুম থেকে উঠেই চা খান ; আমলাবেড়ে কেন, আশপাশের দশখানি গ্রামেও চায়ের সন্ধান মিল্‌বে না। কেমন ? সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না ; আমার মা আর বৌদিদিরা সব গুছিয়ে দিয়েছেন। ঐ যে প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটা দেখ্‌ছ, এতে সব আছে। পাছে তোমাদের গ্রামে ভাল জল না মেলে, তার জন্য এক বোতল কলের জল পর্য্যন্ত ঐ ট্রাঙ্কে আছে, বুঝ্‌লে।—চা, চিনি, কন্‌ডেন্স মিল্ক, বিস্কুট, রুটি সব আছে। কোন ভয় নেই। ষ্টোভ পর্য্যন্ত আছে। তারপর আহারের কথা—তোমার মা, তোমার দিদি দুটো বেগুন ভাতে দিয়ে চারটী ভাত রেঁধে দিলে, আমি তা' পবিত্র মহাপ্রসাদ ব'লে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাব। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়, আর রাত জেগো না। হরিশ, আর কতদূর হে ?"

হরিশ হেসে বল্‌ল—"বাবুজি, এখনও যে সিকি পথও আসি নি, এখনই কতদূর। ভোর হ'তে-হ'তেই আমলাবেড়ে পৌঁছে দেব। বাবুজি, আপনি একটু গড়িয়ে নিন।"

আমি বল্‌লাম—"না হরিশ, আমি আর শোব না। আমরা কল্‌কাতার লোক, এমন সুন্দর মাঠের মধ্যে দিয়ে এই জ্যোৎস্না রাত্রে কখনও পথ চলি নি। আমার ভারি ভাল লাগছে এ সব।"

রমেশ আর কোন কথা না ব'লে দিব্বি শুয়ে পড়ল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তেই নিদ্রাগত। আমিও তার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

তুমি বিশ্বাস করবেনা মা, আমি সে রাত্রে একটুও ঘুমোই নি। শুনেছিলাম, গরুর গাড়ীতে যেতে না কি ভারি কষ্ট হয়। আমার তা' মোটেই হয় নি, গাড়ীরও ঝাঁকুনী প্রথমে একটু খারাপ বোধ হয়েছিল, তারপর আর কিছু না।

ঘণ্টাতিনেক এইভাবে চ'লে আমরা যে গ্রামে পৌঁছলাম, গাড়োয়ান বল্‌ল—এই আমলাবেড়ে। কখন ভোর হয়েছে, সূর্য্য তখনও ওঠে নাই। তোমার রমেশচন্দ্র মা, তখনও ঘুমে অচেতন। আমি তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বল্‌লাম—"এই রমেশ, ওঠো, আমরা আমলাবেড়ে এসেছি। এখন তোমার বাড়ীর পথ গাড়োয়ানকে ব'লে দাও।"

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠে বাহিরের দিকে চেয়ে গাড়োয়ানকে পথের সন্ধান দিল। তারপর তিন চারমিনিটের মধ্যেই আমাদের গাড়ী একেবারে একটা বাড়ীর উঠানে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ীর কেউ তখনও ওঠেন নি। রমেশ গাড়ী থেকে নেমে ডাক্‌ল—"মা, দিদি!"

দেখ মা, 'মা' ব'লে আমরাও ত তোমাকে দিনরাত ডাকি, 'দিদি'কে কত ডাকি, কিন্তু, সেদিন রমেশের ঐ 'মা', 'দিদি' ডাকের মধ্যে যে কি সুধা ছিল, কি ব্যাকুলতা ছিল, সে কথা

আমি তোমাকে বল্‌তে পারছি না—সে ডাকে আমাদের রক্ত-মাংসের প্রত্যক্ষ মা কেন, স্বয়ং জগজ্জননীর আসন নিশ্চয় টলেছিল। এমন মধুমাখা 'মা', 'দিদি' সম্বোধন আমি কখনও শুনি নি।

রমেশের ডাক শুনে ঘরের মধ্য থেকে উত্তর এল—"কে, বাবা রমেশ এলি। ও দুর্গা, শীগ্‌গির ওঠো মা, রমেশ এসেছে।"

যেমন ডাক, তেমনি তার উত্তর! আমার শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীর-মন যেন জুড়িয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলে একসঙ্গে মা ও মেয়ে বেরিয়ে এলেন।

রমেশ বল্‌ল—"আমি একা আসি নি মা! আমার সঙ্গে দীনেশ দাদা এসেছেন।"

এই কথা শুনেই মা ও মেয়ে মাথার কাপড় টেনে দিতে গেলেন। আমি তখন এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লাম—"মা, দিদি, আমি যে রমেশের দাদা, আমাকে দেখে আপনারা লজ্জা করলেন কেন? রমেশ, তুমি মা, দিদিকে প্রণাম করলে না। ভুলে গেলে বুঝি।"

রমেশ বলল "ছোড়দা', আপনার প্রণামেই আমারও প্রণাম করা হয়ে গেছে।"

ক্রমশঃ

—যা' হয়—

ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এম-এ, ডি-লিট্

রেবা আর লীলা,—দুই বন্ধু।

বোর্ডিংয়ের একই রুমে ওরা দু'জন থাকে ;—পড়েও এক সঙ্গে ফার্ষ্ট ইয়ারে।

রেবার বাপ ঢাকার একজন নামজাদা ডাক্তার, আর লীলার বাপ একটা দেশীয় রাজ্যের ইঞ্জিনীয়র।

ওদের নামে মাসের প্রথমে মণিঅর্ডারে যে টাকাটা আসে,তা' দেখে আশে-পাশের ঘরে একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়। অনেকের মতে ওরা দু'জন না কি বেশ একটু দেমাকে। কারও সাথে ওরা বড় বেশী মেলামেশা করে না। পরস্পরকে নিয়েই ওরা এত বেশী তন্ময় যে, আর কারও সাথে ঘনিষ্ঠতা করবার অবকাশ ওদের হয়েই ওঠে না। ওদের জগৎ যেন ওরা নিজেদের মাঝে রচনা ক'রে নিয়েচে।

ডাফ ষ্ট্রীটের ও বোর্ডিংটা ছাত্রীরা নিজেরা চালায়। একজন লেডি টিচার ওখানে রেসিডেন্ট সুপারিণটেন্‌ডেন্ট্ হিসাবে থাকেন বটে, তবে নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ তিনি করেন না ; ওখানকার আইনকানুন তাই অত কড়া নয়। অনেক বিষয়ে ছাত্রীদের স্বাধীনতা ওখানে অব্যাহত আছে ; অর্থাৎ. হেদোর পাড়ের 'ছোট হরিণবাড়ী'র খাস এলাকাভুক্ত ওটা নয়।

ছুটির দিন পেলেই দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়ে। লেক্, জু,বোটানিক গার্ডেন, ম্যুজিয়ম, দক্ষিণেশ্বর,—ওরা যে কতবার করে' দেখেছে, তার আর হিসাব নেই। ওদের যা' মনের কথা, তা' ওরা এই সব ছোটখাট এক্সকারসনে বেরিয়ে পরস্পরের কাছে বলে। কত মতলব আঁটে, প্রোগ্রামের পর প্রোগ্রাম রচনা করে।

কিছুদিন হ'তে দুইবন্ধুতে ঠিক করেচে, বিয়ে ওরা কেউ করবে না। এখানকার পড়া শেষ হ'লে ওরা প্রথমতঃ অক্সফোর্ড কি কেম্‌ব্রিজে যাবে এবং সেখানে থেকে আরও কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করবার পর আমেরিকা ও আফ্রিকা হয়ে সমস্ত পৃথিবীটাই ঘুরে আসবে। তারপর ক'লকাতার কাছাকাছি একটা জায়গায় ওরা মেয়েদের জন্য একটা আদর্শ শিক্ষায়তন গড়ে তুলবে। বর্ত্তমান নারীজাগরণের ওপর ওদের বিশেষ সহানুভূতি নেই। ওরা বলে, পুরুষই যেন নারীকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিচ্ছে। নারীর এ জাগরণ হয় ত তার অকাল নিদ্রাভঙ্গ ! এ জাগরণ তাই শুধু কাগুজে আন্দোলন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের আকাঙ্ক্ষা, নারীর সত্যিকারের ও স্বাভাবিক জাগরণ যে কী ভাবে হ'তে পারে, তা'ওরা প্রমাণ করে দেবে।

এ সব 'মন্ত্রগুপ্তি' অবশ্য ওদের দু'জনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, 'ষট্‌কর্ণগত' তখনও হয় নি। অর্থাৎ, ওদের অভিভাবকেরাও এ সবের কিছু জানতেন না।

দু'জনের মাঝে গড়া জগৎটাকে নিয়ে ওদের দিন কাটছিল মন্দ নয়। মাঝখান থেকে এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব সেখানে হওয়ায় ওদের বাঁধাধরা নিয়মের যেন একটু ব্যক্তিক্রম দেখা দিতে দিতে লাগলো। এই তৃতীয় ব্যক্তিটী একজন পুরুষ—সে যুবক ও তার নাম সমর।

দুই বন্ধুতে গেচে গ্লোবে মেট্রোর একটা নূতন

ছবি দেখতে। 'শো' যখন শেষ হ'ল তখন প্রায় সাড়ে আটটা। বাইরে এসে ওরা দেখে, এরই মধ্যে কখন বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে; তখনও ঝিরঝির করে' দু'-চার ফোঁটা জল ঝরছে।

র‍্যামন নোভারোর গান তখনও ওদের কাণের কাছে ঝঙ্কার তুলছিল। মনটা এতই খুসীতে ভরা যে, অল্প অল্প ভিজতে ভিজতেই ওরা চৌরঙ্গীর মোড় পর্য্যন্ত এসে পৌঁছল। শীগ্‌গিরই শ্যামবাজারের একখানা বাস এসে পড়ায় ওরা দু'জন তা'তে উঠে দোতলার একটা বেঞ্চি দখল করে বস্‌ল।

বাস্ চলতে সুরু করতেই লীলার একটু একটু শীত বোধ হ'তে লাগলো; ক্রীম্‌কলার শাড়ীর আঁচলটা বাঁ হাতের মুঠো দিয়ে সে বুকের উপর চেপে ধরলো। হাওয়ার জোরে দু'-একগাছা চুল কপালের উপর এসে গড়িয়ে পড়ায় সে বেশ একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়লো। সামনেকার খোলা জানালাটা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে দেখে রেবা কণ্ডাকটারকে ডেকে সেটা বন্ধ করতে বলবে মনে করে' পিছনে তাকিয়ে দেখে কণ্ডাক্টর সেখানে নেই, নীচেয় চলে গেছে। অগত্যা নিজে উঠে গিয়ে সে শার্শিটাকে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো। বৃষ্টির জল লেগে শার্শিটা এমনই এঁটে গেছে যে, দু'-তিনবার টানাটানি করেও সে তুলতে পারলো না। না পারার লজ্জায় মুখখানা তার রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো।

এই সুন্দরী তরুণীর অসহায় অবস্থা দেখে পাশের বেঞ্চি হ'তে উঠে এসে সমর বললো, "আপনি সরুন, আমি তুলে দিচ্ছি।"—সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা পরিপুষ্ট সবল হাত দিয়ে সে একটানে শার্শিখানাকে ওপরে তুলে দিল। রেবার মুখ থেকে মৃদুস্বরে বেরিয়ে এল, "থ্যাঙ্কস্।"

একটু হেসে সমর বললে, "এতে থ্যাঙ্কস্ দেবার কিছু নেই, এ অতি সামান্য ব্যাপার।"

কথা বলার সময় সে এই তরুণীযুগলের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখে নিল। এ দু'টী মেয়েই বেশ 'আপ-টু-ডেট্।' ওদের কেশ বেশ, প্রসাধন,—সব কিছুর মধ্যেই এমন একটা পারিপাট্য আছে, যা' বাহুল্য ত মোটেই নয়, বরং খুবই সুশোভন ও মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক।

তার তরুণ মনের কল্পনা হয় ত আরও কিছুর আভাষ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় বাস্ কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে মেছোবাজারের কাছাকাছি এসে একেবারে থমকে দাঁড়াল।

যতদূর দৃষ্টি চলে, জল থৈ থৈ করছে, আর ট্রাম, বাস্, ট্যাক্সি ইত্যাদি লাইন ধরে' দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় 'ম্যানহোলে'র মুখ খুলে দিয়ে তার কাছে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে; প্রায় এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ট্রাম কোম্পানীর ফিরিঙ্গি চেকাররা তাড়াতাড়ি জল সরানর ব্যবস্থা করছে।

যাদের দরকার বেশী তারা জুতো হাতে নিয়ে ও যতটা পারা যায় শ্লীলতা বাঁচিয়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জলের মধ্যে হাঁটা সুরু করেছে।

বিশেষ তাড়াতাড়ি যে জল কমবে সে ভরসা নেই দেখে ওদের বাস থেকেও এক এক করে' লোক নেমে যেতে লাগলো। ফাঁকতালে খানিকটা ফুরসৎ পেয়ে শিখ ড্রাইভার ও হিন্দুস্থানী কণ্ডাকটর তৎক্ষণ মনের আনন্দে বিড়ি ধরিয়ে নীচের তলায় গল্প সুরু করে' দিয়েছে। উপরের তলায় তখন ওরা তিনটী প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রেবা বললো, "তাই ত লিলি, ভারী মুস্কিল হ'লো ত! রাত ত ন'টা বাজে, বেশী দেরী হ'লে সুনীতি দি' হয় ত বকবেন; কি করে' যে এখন যাওয়া যায় তাই ভাবছি।"

কথাটা লীলাকে বলা হ'লেও সে যেন সমরের কাছ থেকে এর উত্তরের আশা করছে, এমন ভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লীলার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো। রাস্তায় জলের দিকে একটা দীর্ঘদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' সে বললো, "ফুটপাত থেকে জলটাও যদি নেমে যেত, তা' হ'লে এ পথটুকু নয় হেঁটেই যাওয়া যেত। যা' করতে হয়, তাড়াতাড়ি কর। দশটার পরে গেলে কিন্তু সুনীতি দি'র কাছে বকুনি খেতে হবে, এটা মনে থাকে যেন।"

সমর নিজের কব্জীতে বাঁধা সোণার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলো, ন'টা বেজে সাত মিনিট হয়েছে। প্রতুলদের বাড়ীতে দশটার আগে না পৌঁছলে, ভবানীপুরে ফিরে যাওয়া সে রাত্রি তার হয় ত ঘটেই উঠ্‌বে না। অন্য লোকে যখন নেমে যায়, তখন সে নিজেও নামবে কি না ভাবছিল; কিন্তু ওই দু'টী তরুণীকে রাত্রিক'লে একা একা বাসে ফেলে রেখে যেতে তার পুরুষের মন সায় দিতে পারছিল না। আর যাই করুক, ও দু'টী মেয়ে যে জুতো হাতে নিয়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে এই দু'-তিন ফারলং জল ভেঙে যেতে পারবে না, একথা ধ্রুব সত্য। এর কল্পনাটাও তার কাছে ভারী বিশ্রী লাগলো। অথচ ওদের এই অবস্থার মাঝে ফেলে যাওয়াটাও ত উচিত নয়। আর একটা কথা হয় ত তার অজ্ঞাতসারেই তার মনের গোপনতলে ভেসে উঠ্‌ছিল। ওই সুবেশ সুন্দরী তরুণীযুগলের এই একান্ত সান্নিধ্য তার মনে একটা খুসীর ভাব জাগিয়ে তুলছিল। সমস্ত রাত যদিও ভাবে ওখানে বসে থাকা চলত তা'তেও হয় ত তার আপত্তি হ'ত না।

দুই বন্ধুর কথায় সে বুঝলে ওদের আর দেরী করা চলবে না। কতকটা আত্মগতভাবেই সে বললো, "চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর জলটা হয় ত এতক্ষণ সরে গেছে। ওদিক্ দিয়ে গেলে ততটা অসুবিধা না হ'তে পারে।"

দুই বন্ধুরই মুখে উৎসাহের ভাব দেখা গেল।

রেবা বলে উঠ্‌লো, "আপনি ও দিক্‌টা দিয়ে যাবেন না কি? চল্ ভাই লিলি, ওঁর সঙ্গে আমরাও না হয় ও পথটা দিয়েই যাই। কতদূর যাবেন আপনি?

"শ্যামবাজারে।"

"আমরা যাবো ডাফ্ ষ্ট্রীট।"

"বেশ ত চলুন। পথেই ত পড়বে। আপনাদের পৌঁছে দিয়েই যাব 'খন।"

উত্তরের আশায় সে ওদের দিকে চেয়ে রইল। লীলা রেবার কাণের কাছে চুপি চুপি কি বলতে সে বললো, "কিন্তু আপনার তা'তে হয় ত অসুবিধা হবে।"

সমর অসহিষ্ণু হ'য়ে প্রতিবাদ করে উঠলো, "না, না, সে সব কিছু মনে করবেন না—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ দিয়েই ত আমায় যেতে হবে। অসুবিধা কী আর বলুন।"

বাস থেকে নেমে ওরা তিনজন হ্যারিসন রোডের পথ ধরলো।

আলফ্রেড থিয়েটারের সামনে কয়েকখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। সমরের ইঙ্গিতে তাদের একজন কাছে এলে গাড়ীর দোর খুলে দিয়ে সে বললো, "নিন, উঠে পড়ুন। দেরী হ'লে আপনাদের সুনীতি দি' হয় ত কৈফিয়ৎ চাইবেন।

ওরা দু'জনে ভিতরে বস্‌তেই সে দোর বন্ধ করে' ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

দুই বন্ধুর ইচ্ছা হচ্ছিল ওঁকে ভিতরে ডাকে। কিন্তু কে আগে কথাটা তুলবে, এটা একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দিতে সমর একবার পিছন ফিরে ওদের ভাল করে' দেখে নিল। রাস্তার আলো এসে দু'জনের মুখের উপর পড়েছে! কি সুন্দর ওদের দেখতে! বেশীক্ষণ চেয়ে থাকাটা অশোভন হবে বলে' সে ঘাড় ফিরিয়ে নিল। একটা মৃদু অথচ দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

ডাফ্ ষ্ট্রীটে গাড়ী ঢুকতে সমর বললো, কোথায় গাড়ী রাখতে হবে বলুন।"

দু'-একখানা বাড়ী পেরুতেই রেবার

নির্দ্দেশে একটা বড়তেতালা গাড়ী বারান্দাওয়ালা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সিখানা দাঁড়াল। সমর চেয়ে দেখ্‌লো, বেথুন ও স্কটিশের মেয়েরা মিলে যে নতুন বোর্ডিংটা করেছে, এ সেই বাড়ীখানা। নামবার সময় লীলা রেবার কাণের কাছে আবার কি বলতেই সে ঝুঁকে পড়ে মিটারটা দেখতে লাগলো।

তার মনের ভাব বুঝতে পেরে সমরের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সে বললো, ও দেখে আর লাভ কী বলুন। গাড়ীখানাকে ত এখনও অনেকটা ছুটতে হবে।"

গাড়ী থেকে নেমে দুই বন্ধু সমরের দিকে চেয়ে একটা নমস্কার জানালো।

এতক্ষণে লীলার মুখে একটা কথা জোগাল, "আপনাকে অনেকটা কষ্ট দিলুম আমরা।"

মৃদু হাসির সঙ্গে সমর উত্তর দিল, "কষ্ট? না, না, কষ্ট আর কিসেব! আপনাদের যে সামান্য উপকার করতে পেরেছি, এই আমার পরমলাভ। এরকম কষ্টের অবকাশ জীবনে খুব কমই পাওয়া যায়। আচ্ছা আসি এখন, নমস্কার।"

তার নির্দ্দেশে ড্রাইভার গাড়ীর মুখ ফেরাচ্ছে, এমন সময় রেবা বলে উঠ্‌লো, "আপনার নামটী ত আমাদের জানা হলো না।

সমরের ঠোঁটের উপর একটু পাণ্ডুর হাসির রেখা মিলিয়ে গেল, "ও অভিযোগ ত আমিও আনতে পারি। মুহূর্ত্তের পরিচয়—নাম জেনে আর কীই বা এমন লাভ হবে বলুন। নমস্কার, চলি তা' হ'লে।"

দেখতে দেখতে গাড়ীখানা বিডন ষ্ট্রীটের পথ ধরে' চোখের আড়ালে চলে গেল।

রেবা আর লীলা ধীরে ধীরে এসে নিজেদের ঘরে ঢুকলো। সেসপিনটা খুলতে খুলতে রেবা বললো, "ও ভদ্রলোক বেশ খাসা লোকটি ভাই। যেমন য়্যাপোলোর মত সুন্দর চেহারা, তেমনি কথাবার্ত্তা।"

লীলার মুখে একটা দুষ্টুমিতে ভরা হাসির রেখা ফুটে উঠলো, "দেখিস যেন ওঁর প্রেমে না পড়িস্।"

"ধেৎ! সে কথা আর আমাকে বলতে হয় না, নিজে সামলে থাকিস। বাপ রে, সমস্ত পথটা যদি মেয়ের মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল! কী অত হাঁ করে' ওঁর দিকে চেয়ে ভাবছিলি?"

"বাঃ রে! আমি আবার কখন ওঁর দিকে চাইলুম। নিজেই ত বাবু ওঁর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে তুলছিলে!

ওদের হাসিঠাট্টা হয় ত আরও অনেকদূর গড়াতো, হঠাৎ পাশের রুমের প্রতিভাকে আসতে দেখে দুই বন্ধুই চুপ করে' গেল।

ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই প্রতিভা বলে উঠলো, কি গো লিলি, রুবি, সমর রায়ের সাথে কোত্থেকে ট্যাক্সিতে আসা হ'ল বল ত? ব্যাপার কি?"

প্রায় এক সঙ্গেই ওরা দু'জন জিজ্ঞাসা করলো "তুমি ওকে চেন নাকি?"

প্রতিভা বললো, "চিনি না! ভবানীপুরে আমার মাসীর বাড়ীর পাশের বাড়ীটাই ত ওঁদের। ওঁর বোন গীতার সাথে ত অনেকদিক থেকে আমার রীতিমত আলাপ আছে। তা' ছাড়া, ভাল ছেলে বলে' ওঁর নিজেরও ত বেশ নাম আছে। এই বার বুঝি ওঁর ফিপ্‌থ ইয়ার চলছে। বেশ মজা ত। তোমরা ওঁকে চেন না, অথচ ওঁর সঙ্গে কোত্থেকে এলে বল ত?

লীলার দিকে একটা বক্রদৃষ্টি ফেলে রেবা উত্তর দিল, "চিনি না কে বললে তোমায়? তুমি চেন কি না তাই ত জিজ্ঞেস করলুম্। নে ভাই লিলি, রাত অনেকটা হয়েছে, যা' হোক্ কিছু খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া যাক্।"

প্রতিভা যেন কতকটা বিরক্ত হয়েই ওদের ঘর থেকে চলে গেল।

রেবা বললো, "এ নিয়ে একটা হৈচৈ হয়, এ আমি পছন্দ করি নে। সব কথা সব লোককে ভেঙে বলবার কোন দরকার আছে বলে' ত আমার মনে হয় না।"

একটু হেসে লীলা উত্তর দিল, "বিশেষতঃ, নিজের যেটা জানার দরকার ছিল, তা' এখন জানা হয়ে গেল, কি বলিস রুবি।"

"ওঁর পরিচয় জানবার দরকার কার যে বেশী, সে বিচার হবে পরে। আজ কি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে' তুমি ওঁর কথা নিয়ে রাত কাটাতে চাও না কি? এরই মধ্যে এতদূর!"

অগত্যা লীলাকে চুপ করে' যেতে হ'ল।

দুই বন্ধুকে নামিয়ে দিয়ে সমরের মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'তে লাগলো। ওই দুটী তরুণীর স্নিগ্ধ অঙ্গসৌরভ তখনও গাড়ীখানার চারিপাশে যেন ভেসে আসছিল।

শ্যামবাজারে তার বন্ধুর বাড়ী খাওয়া-দাওয়ার কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে সে চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়লো। ততক্ষণে বাস্ আবার চল্‌তে সুরু করেছে।

বাসে বসে' তার মনে হ'তে লাগলো তাদের দু'জনের কথা। একটীর নাম ত তার শোনা হয়ে গেছে,—লিলি! আর ওই যে মেয়েটী তার সঙ্গে কথা কইছিল, তার নামটা যেন কী হতে পারে! হয় ত লিলিরই কাছাকাছি একটা কিছু হবে।

লিলি! খাসা নামটী!

সে মনে মনে আওড়াতে লাগলো, "লিলি! লিলি!! লিলি!!!

শুধু যে নামটী খাসা তা' নয়, ওটী যার নাম সেও ত বেশ খাসা! ও মেয়েটী হয় ত একটু লাজুক। বেশী কথা বলে নি। আর ওর বন্ধুটী বেশ ফরওয়ার্ড—দু'টীই বেশ ভাল! তবু সমরের মনে হলো, ওই লিলি মেয়েটীকে যেন বেশী ভাল লাগে! জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে হয় ত ফরওয়ার্ড মেয়েদের নিয়ে চলাটা খুবই সহজ, কিন্তু মনের মণিকোঠায় যার স্থান, কর্ম্মক্লান্ত দেহমন যার সঙ্গ পেয়ে সকল শ্রান্তি ভুলে যায়, সে যেন ওই লিলির মতই হয়। ও মেয়েটীর চোখে-মুখে একটী স্বপ্নলোকের কমনীয়তা মাখানো আছে, যা' ওর সঙ্গীর মধ্যে ততটা নেই। সমর ভাবলো, আজকালকার মেয়েদের মাঝে নারী-সুলভ চারুসৌন্দর্য্যের যে একান্ত অভাব ঘটেছে, পুরুষের সঙ্গে সমানে চলার পৌরুষ প্রচেষ্টাই যেন তার একটা প্রধান কারণ! লিলি মেয়েটীকে দেখলে কিন্তু ওকথা মনেই হয় না। ওর মধ্যে নববধূর সলজ্জ চারুতার মত ভাব এখনও অব্যাহত আছে!

কণ্ডাক্টর হেঁকে উঠলো, "বাইয়ে, এলগিন রোড!

সমরের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি নেমে সে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো।

লিলির সাথে যে তার অত শীগ্‌গির আবার দেখা হয়ে যাবে, তা' সমর মোটেই আশা করতে পারে নি।

উত্তরবঙ্গের 'দুর্গতদের' সাহায্যের জন্য ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটে সেদিন একটা অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। গেট দিয়ে ঢুকতেই সমর দেখে দু' তিনটী মেয়ের সাথে লীলা দাঁড়িয়ে আছে। সুসজ্জিতা লীলাকে দেখে তার বুকের মধ্যে একটা অজানা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

কাছে গিয়ে একটী নমস্কার করে বললো, "ভাল আছেন ত! চিনতে পারছেন আমাকে!"

শুচি-শুভ্র খদ্দর-পরিহিত সমরকে দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর! তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টি ফেলে প্রতি নমস্কার করে লীলা বললো, "আপনি চিনতে

পারলেন, আর আমি চিনতে পারবো না—এরকমটা আপনি ভাবছেন কেন? ভাল আছেন ত বেশ?"

"হ্যাঁ একরকম কেটে যাচ্ছে! আপনার বন্ধু কোথায়? তাঁকে যে আজ দেখতে পাচ্ছিনে।"

"রেবা? তার শরীরটা একটু খারাপ বলে' সে আজ আসে নি। সেদিনকার উপকারের জন্য সে কিন্তু আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ আছে। অনেক সময়ে সে আপনার কথা বলে।"

"এতে কৃতজ্ঞতার কিছু নেই। তবু যে আমাকে তিনি মনে রেখেছেন সে তাঁর মহত্ত্ব আর আমার ভাগ্য! তাঁর সঙ্গে আজ যদি আবার দেখা হ'ত ত খুব খুসী হতুম। তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন।"

লীলা মুখে বললো, 'আচ্ছা', কিন্তু মনের মধ্যে যেন কোথায় তার একটা অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগলো।

রেবাকে দেখবার জন্য সমরের এই অতি-আগ্রহটা তাকে বিশেষ খুসী করতে পারলো না। কই, তাকে দেখে সমর খুব খুসী হয়েছে, এ কথা ত সে বললো না। রেবার পাশে সে কী এতই ছোট যে, তাকে কারও চোখে পড়ে না!

আস্তে আস্তে সে গিয়ে আর আর মেয়েদের মাঝে তার সিট নম্বরটা দেখে বসে পড়লো।

অভিনয় সুরু হ'ল।

লীলার মনের ঘোর তখনও কাটে নি। সে ভাবতে লাগলো, সমর মুখে যাই বলুক, সে যে তার নারীত্বকে অবহেলা করেছে তা'তে আর সন্দেহ নেই। রেবা বাক্‌পটু, মিশুকে, সহজে লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে পারে, আর সে হয় ত একটু ডল্; তাই ওই সমরের কাছে রেবাকেই বেশী ভাল লেগেছে! নইলে আর কোন্ বিষয়ে রেবার চেয়ে সে কম যায়! বরং চেহারাটা যে তারই ভাল, একথা ত বোর্ডিং-য়ের সব মেয়েই বলে!

নীচেয় যেখানে সমর বসে ছিল, অভিমানভরে সে একবার সেই দিকে চাইলে। দেখে সমরও তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই দু'জনে মাথা নীচু করলে।

লীলা ভাবলো, না, না, ওভাবে ওর দিকে চাওয়া হবে না, সমর হয় ত কি মনে করবে!

দু' চারমিনিট যেতে না যেতেই তার প্রবল কৌতূহল হ'লো সমর এখন কি করছে দেখাই যাক্ না। এবার চোখ ফেরাতে সমরই প্রথম দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

লীলার মনের মধ্যে একটা আনন্দের স্রোত বহে গেল। সমর তা হ'লে এতক্ষণ ধরে' শুধু তাকেই দেখ্‌ছে!

রেবা আসতে পারে নি বলে' তার মনে একটু কষ্টও হ'ল। সমরকে দেখলে সেও হয় ত কত খুসী হ'ত।

অভিনয় শেষে সমরের সঙ্গে আবার তার দেখা হ'ল। সমরের চোখে-মুখে পুলক ঝরে পড়ছে! সে বললো, "এত শীগ্‌গির যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে তা' ভাবতেও পারি নি। কী ভালোই যে আমার লাগছে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে!"

লীলার দেহের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। সে বললো, "রেবাকে আপনার কথা বলবো। আচ্ছা, আসি এখন, নমস্কার।"

বিদায় মুহূর্তে সে তার কম্প্রকলস্বর ও কোমল দৃষ্টি দিয়ে সমরের সকল দেহ-মনে এক উদ্দাম তরঙ্গের সৃষ্টি করে' দিয়ে গেল।

বোর্ডিংয়ে ফিরে লীলা দেখে ওদের ঘরটা তখনও অন্ধকার। হাত দিতেই দোরটা খুলে গেল। সুইচটা টিপে দিতে প্রথমেই তার চোখে পড়লো রেবা। রেবা চোখ বুজে পাশ ফিরে চুপ

করে শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে মনে করে লীলা তাকে আর ডাকলো না। আর্শিটার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের মুখখানার দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখতে লাগলো।

শাড়ীখানাকে আলনার ওপর রাখতে গিয়ে তার মনে হ'ল রেবা হয়ত কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে সে তার কপালের উপর একটা হাত রাখলো।

চোখ মেলতেই লীলাকে দেখে রেবা জিজ্ঞাসা করলো, "কখন এলি ভাই লিলি ?"

"এই আসছি। কেমন আছিস্ এখন রুবি ? মাথাধরাটা একটু ছেড়েছে কি ?"

"হ্যাঁ ; তুই চলে যেতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এখন মাথাটা অনেকটা হাল্কা বোধ হচ্ছে। থিয়েটার দেখ্‌লি কেমন ?"

থিয়েটার সে যে কেমন দেখেছিল তা' লীলা নিজেও জানতো না। ও সময়টা যা' করে' সে কাটিয়েছিল, একান্ত অন্তরঙ্গ হলেও, রেবার কাছে তা' বলতে তার কেমন সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগলো। রেবার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, "মন্দ নয়। হ্যাঁ, দেখ্ ভাই রুবি, সমরবাবুর সাথে কিন্তু আজ আবার দেখা হয়ে গেল।"

"উনি বুঝি থিয়েটারে এসেছিলেন।"

"হ্যাঁ, আমি আগে ওঁকে দেখতে পাই নি, উনিই নিজে এসে আলাপ করলেন। তোকে তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন। তোর কথা কিন্তু অনেকবার বলছিলেন। কে জানে ও বেচারা হয় ত সেই রাত্রি থেকে তোর কথাই শুধু ভেবে দিন কাটাচ্ছে,—বলে' সে একটু মুখ টিপে হাসলে।

"থাক্, থাক্, আর ফাজলেমিতে কাজ নেই। তোমার নয় থিয়েটার দেখে, আর সমরবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে পেট ভরে গেছে, আমি যে বিকাল থেকে কিছুই খাই নি, তা' খেয়াল আছে কি। যা, না ভাই, হরিয়াকে বল, চট করে আমার জন্য একখানা ফারপোর রুটি নিয়ে আসুক।"

সমরের প্রসঙ্গ সেদিনকার মত ওইখানেই চাপা পড়লো।

আরও দু'-চারদিন কেটে যায়।"

রেবার মনে হয়, লিলি যেন থিয়েটার দেখে ফিরে আসা অবধি কেমন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর অকারণ হাসি আর হাল্কা কথাবার্তা অনেকটা কমে গেছে। চুপচাপ থাকাটাই আজকাল ওর খুব ভাল লাগে।

রেবা মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে বলে, "কি গো লিলিরাণী, হঠাৎ এত গম্ভীর কেন ? আমায় যে বড় বলতিস্। এখন চুপ করে' বসে' কার কথা অত ভাবা হয় বল্ ত।"

"না, না, ভাববো আবার কার কথা! তোর একরকম! আমায় আবার গম্ভীর দেখলি তুই কোনখানে।"

কাছে গিয়ে ওর মুখখানা দুই হাতে তুলে ধরে রেবা বলে, "এইখানে গো এইখানে। মুখটীতে যে হাসির ঝরণা আর এখন যখন-তখন ছোটে না। তোকে দেখে আমার মনে পড়ে চণ্ডীদাসের সেই পদটী। বলেই সে সুর ধরে,—

"রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা!
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না শুনে কাহার কথা!"—

তার মুখে হাত চাপা দিয়ে লীলা বলে, "তুই ত আচ্ছা ফাজিল মেয়ে। কোথাও কিছু না, কার কোথায় অন্তরে ব্যথা হ'লো বলে' তোর এত মাথাব্যথা কেন ?"

"জানি, জানি, মুখের কথায় কি আর মনের ভাব চাপা থাকে। সমরবাবুর সাথে সেদিন ইনষ্টিট্যুটে দেখা হওয়ার পর থেকেই তোমার এই অবস্থা! বলিস ত না হয় দূতীগিরিটাই করি!"

লীলা ওর দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করতেই হাসতে হাসতে রেবা সেখান থেকে চলে যায়।

দেখতে দেখতে পূজার ছুটী এসে পড়লো। বোর্ডিং ছেড়ে মেয়েরা যে যার ঘরের দিকে চললো। দুই বন্ধুতে একদিনেই দু'দিকে রওনা হ'ল। রেবা গেল ঢাকায় তার বাপের কাছে, আর লীলার বাপ ছুটী নিয়ে কাশীতে সপরিবারে বেড়াতে এসেছিলেন, কাজেই লীলারও আহ্বান এল সেখানে যাওয়ার। কথা হ'লো সপ্তাহে অন্ততঃ দু'খানা ক'রে চিঠি লিখেও ওরা ওদের দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবে।

কাশী থেকে লীলার দু'খানা চিঠি পাওয়ার পর তৃতীয় যে চিঠিখানা রেবা পেলে, সেখানা সে লিখেছে শিলং থেকে। ও চিঠিটায় লীলা লিখছে,"ভাই রুবি, চিঠিখানার ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছিস্ এটা লিখছি শিলং থেকে। আমার যে বৌদিদির কথা তোকে অনেক সময় বলতুম, (অর্থাৎ আমার পিসতুত ভাই প্রভাত দা'র বউ, যার নামও হয় ত তোর মনে আছে,—নীহার) তাঁরা এখন শিলংএ থাকেন। ওঁরা এখানে যে বাড়ীখানা নিয়েচেন, তা' বাস্তবিকই ভারী চমৎকার! বাংলো প্যাটার্ণের ছোট বাড়ীখানি, পাশেই একটা ছোট ঝরণা, সব সময়েই ঝিরঝির করে' জল ঝরছে! ড্রইংরুমে বসলে এখানকার বিখ্যাত পাইন-ভিউ চোখে পড়ে! খাসা বাড়ীখানি। বাড়ীর খোদ মালিক যিনি, অর্থাৎ বৌদি, তিনি আবার আরও খাসা! এমন আমুদে লোক আমি আর দেখি নি ভাই। ওঁর আবার মাস তিনেক হ'ল একটী খোকা হয়েছে। ভারী সুন্দর কিন্তু দেখতে। ছোট ছোট রাঙা রাঙা হাত-পাগুলো ছুঁড়ে কী সুন্দর খেলা করে! ওকে কোলে করতে আমার এত ভালো লাগে! আমরা যাই বলি না কেন ভাই, এমন একটী খোকা না পেলে জীবনটার অর্দ্ধেকেরও বেশী যেন অনাস্বাদিত থেকে যায়! তুমি আবার যা' লোক, এর থেকে যা' তা' মানে করে বসো না কিন্তু।

সকাল-বিকাল দু'বেলাই আমরা বেড়াতে বেরুই। কোনদিন লাবান পাহাড়ের দিকে, কোনদিন গোল্‌ফ গ্রাউণ্ডটার ও দিকে, আবার কোনদিন বা য়্যাজালিয়া ওয়াকের পাশ ধরে' খানিকটা ঘুরে বেড়াই। বিশপ্ ফল্ আর বিডন্ ফল্ দেখতে শীগ্‌গিরই যাব। তোকে বড় মনে পড়ছে। তুই যদি এখানে আসতিস্ কী মজাই যে হ'ত!

প্রণম্যদের আমার প্রণাম দিস্, আর তুই নিস্ আমার চুমু! ইতি তোর লিলি।"

চিঠির উত্তরে রেবা জানালো, তার মায়ের শরীরটা এখন তত ভাল নেই। এ সময়ে তাঁকে ছেড়ে যাওয়া ত উচিত নয়। লীলা যে ওখানে বেশ ভাল আছে, এতেই সে খুসী হয়েছে। আর খোকার কথায় লীলা যা' লিখেছে, তাতে সে বুঝতে পারছে যে, নিজস্ব একটা খোকা পাওয়ার সাধ লীলার মনে বেশ ভালভাবেই জন্মেছে।

রেবার চিঠি পড়ে লীলার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠলো। সে তার পরদিনই জবাব দিল। এ ও তা' লিখবার পর সে লিখলো, "তুই ত আচ্ছা কাজিল! ও সব যা' তা কী লিখেছস? কে তোকে বলেছে যে, আমি একটা খোকা চাইছি! তবে এ কথা আমি হাজারবার বলবো যে, বৌদি'র খোকাকে কোলে নিলে, তুইও ঠিক এই কথা না বলে পারতিস না। ফের যদি ওই রকম লিখ্‌বি তোর সঙ্গে হবে আমার আড়ি।

শোন ভাই রুবি, তোকে একটা নতুন খবর দিই। সমরবাবুর সাথে কাল আবার দেখা হয়ে গেল ভারী আশ্চর্য্য রকমে। বৌদি', প্রভাত দা' আর আমি তিনজনে লেক দেখে ফিরছি, বড় বাজারের মোড়ের কাছটাতে হয়ে গেল সমর বাবুর সঙ্গে দেখা। ওঁর এক মামা বুঝি এখানে সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। উনি সেখানে বেড়াতে এসেছেন। আমাকে দেখে ওঁর যা খুসী,

তোকে আর কী বলবো। ওঁর কথাবার্ত্তার ধরণ শুনে প্রভাত দা'ও একেবারে চুপ, আর বৌদি' ভাই আমার মুখের দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন। শুনবি ওঁর কাণ্ড। প্রথম দেখা হতেই তিনি বলে উঠলেন, বা রে, আপনি এখানে আবার কোত্থেকে! এই শাড়ীখানাই ত সেদিন আপনার পরণে ছিল, যেদিন প্রথম আপনাদের দুই বন্ধুর সাথে আমার দেখা হয়। এটাতে আপনাকে মানায় কিন্তু ভারী চমৎকার!' তার পর তোর কথা! তুই এসেছিস কি না জানতে চাইলেন।

পরিচয় করিয়ে দিতেই প্রভাত দা' তাঁকে ধরে' বসলেন, 'আপনার সঙ্গে যখন চেনা হয়ে গেল, তখন আর আপনাকে ছাড়ছিনি মশায়। আমার গিন্নী আর এই ছোট বোন্‌টী কেমন চা তৈরী করতে পারেন সকাল-বিকালে তা' পরখ করবার পাকা নেমতন্ন আপনার রইল।'

সমরবাবু হেসে বল্‌লেন, গিন্নী বলে যাঁর উল্লেখ করছেন, তার তরফ থেকে কোন আশ্বাস না পেলে আমি কিন্তু আপনার নেমতন্ন গ্রহণ করতে ভরসা পাচ্ছি নে।'

বৌদি'র মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন,'আচ্ছা সেদিক থেকেও না হয় অভয় দেওয়া যাচ্ছে। তবে দেখবেন, আমাদের চায়ের সম্মান যেন রক্ষা হয়। একবেলাও য়্যাবসেণ্ট থাকা চলবে না কিন্তু আগে হ'তে বলে রাখছি।'

তিনি বল্‌লেন, 'সে এখন চেষ্টা করে' দেখা যাবে।'

বৌদি ভাই ভারি ফাজিল মেয়ে। প্রভাত দা'র সামনেই সমরবাবুর কথা নিয়ে আমায় এমন যা' তা বলে।

মায়ের শরীর এখন কেমন লিখিস্। তাঁকে আমার প্রণাম দিস্, আর তুই নিস আমার ভালবাসা।"

রেবা তার চিঠিতে লিখলো, "লিলি! ভয় হচ্ছে, এখন হ'তে তোর চিঠি হয় ত ঠিক সময় পাওয়া যাবে না। কেন তা নিজেই বুঝবি। সমর-বাবুকে আমার নমস্কার দিস। চায়ের আসরে দিন হয় ত তোর ভালই কাটছে। বৌদি'কে ভালবাসা জানাস, আর তুইও ভালবাসা নিস্। শরীর একটু ভাল।"

এবার কিন্তু সত্যি-সত্যিই লীলার কাছ থেকে ঠিক সময়ে চিঠি এল না। রেবাই আবার লিখলো, "বলি লিলি রাণী, ব্যাপার কী? সমরবাবুর জন্যে চা কি এখন সকাল বিকাল ছাড়া সারা দুপুর বসেও করতে হচ্ছে না কি? এত তন্ময় যে, এক-খানা চিঠি লেখবার সময়ও করে উঠতে পারলি নে! কোন অসুখ করে নি ত? ও কথাটা ভাবতেও ভারি খারাপ লাগে। কেমন আছিস জানাস। মনটা বড় ব্যস্ত। সমরবাবু ও বৌদি'কে আমার নমস্কার জানাস। আর আমার হয়ে খোকনের মুখে একটা চুমু দিস।"

লীলার কাছ থেকে এবার যে চিঠিখানা এল, তা' হাতে করেই রেবা বুঝলে এবার এতে কিছু নতুন খবর আছে; ওজনেও চিঠিটা একটু ভার বলে' মনে হ'ল। পড়বার ঘরের চৌকিটার ওপর বসে চিঠিখানা খুলে সে পড়তে লাগলো, "রুবি ভাই, চিঠিখানা লিখতে একটু দেরী হয়ে গেছে বলে রাগ করিস নে। এখানে দিনগুলো কাটছে মন্দ নয়; তবে তুই কাছে নেই এইটুকু যা খেদ। তোকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই যে আমার ভাল লাগে না।

বৌদি'র ওই খোকাটা কিন্তু ভাই ভারী পাজী! সেদিন ও যা' আমায় লজ্জায় ফেলেছিল কী আর বলবো!

সকালবেলায় প্রভাত দা' আর সমরবাবু ড্রইংরুমে বসে' গল্প করছেন। বৌদি' তাঁদের গরম কচুরী খাওয়াবেন বলে, তাই নিয়েই ব্যস্ত আছেন। ছেলেটা কাঁদছে দেখে আমি তাকে কোলে করে' ড্রইংরুমের দিকে নিয়ে গেছি। সেই

দুষ্টুটি সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছিল। সবে মাত্র উঠেই কান্না জুড়েছে। দুধ খাওয়া তার তখনও হয় নি। আয়াটা হয়ত এক্ষুণি আসবে মনে করে' আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের দুজনকার গল্প শুনছি।

ছেলেটার সে যা কাণ্ড! ও হয়ত ভেবেছে আমিই তার মা! আমার হারের লকেটটা নিয়ে দু'চারমিনিট টানাটানি করবার পর সে করছে কি···! তোকেও ভাই সে কথা লিখ্‌তে আমার লজ্জা করছে।

সমরবাবু আবার কেমন লোক তা শোন। গল্প করছেন তিনি প্রভাতদা'র সঙ্গে, চেয়ে আছেন কিন্তু এ দিক্‌টায়, যেন খোকাকেই দেখছেন।

খোকার ওই কাণ্ড দেখে উনি অবিশ্যি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখলুম, তাঁর মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠতে!

এমন মুস্কিলেও মানুষ পড়ে।

সেই সেদিন কলকাতায় তোর আর আমার সাথে সমরবাবুর দেখা হয়, তুই ত তাঁর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলি! তিনিও বড় কম লোক নন ভাই।

কেবল তাঁর কাণ্ডটাও তা'হ'লে তোকে বলি! আর তোকে না বলে বলবোই বা কা'কে? বৌদি ত সুধু ঠাট্টা করতেই জানে।

কাল দুপুরের পর থেকে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। একটা জরুরি কাজ থাকায় তা' সত্বেও প্রভাত দা'কে বেরুতে হলো। তিনি আমায় বলে গেলেন, সমরবাবু এলে তাঁকে যেন একটু বসতে বলি। বৌদি'র যা কথা! তার জন্যে আর ভাবনা কি? তোমার বোনটি যা' অতিথি পরিচর্য্যা করতে পারে, স্বয়ং শকুন্তলাও তা পারতো না।

আমি বললাম, "যে রকম বাদলার দিন, সমরবাবু হয় ত আসবেনই না।"

মুখ টিপে হেসে বৌদি' বললো, সেই জন্যেই ত তিনি আজ আরও গরজ করে' আসবেন। এত কাছে থেকেও কী উনি আর মেঘদূতের যক্ষের মত বিরহে ছটফট করবেন। এই বাদলেই যে তোমাদের প্রথম মিলন, সে কথা কী তোমরা দু'জনে কেউ ভুলে বসে আছ না কি?"

শোন্ ভাই তাঁর কথা! আমি যেন ওই ভেবেই বলছি!

টিপ টিপে বৃষ্টিটা কিন্তু একেবারে থামলো না। দূরের পাহাড়ে কোথাও হয়ত জোরে বৃষ্টি হয়েছে, আমাদের বাড়ীর পাশের ছোট ঝরণাটা বেশ ফুলে উঠেছে।

জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের মেঘের খেলা দেখছিলুম। একটু বাদেই দেখি ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়ে সমরবাবু আসছেন। ড্রইংরুমের দোরটা খোলাই ছিল। তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দেখেই বৌদিকে গিয়ে তাঁর আসার খবরটা জানালুম।

বৌদি' হেসে বললো "এখানকার চায়ের লোভ কী কেউ সহজে ছাড়তে পারে! বিশেষতঃ, যার হাত দিয়ে চা তৈরী হচ্ছে, তার কথা মনে হ'লে!"

আমি বললুম, "ওরকম যদি বল, তা'হ'লে কিন্তু আমি আর চা তৈরী করতে পারবো না বলে দিচ্ছি।"

বৌদি বললো "থাক্, আর রাগ করে' কাজ নেই। হাজার হোক্ ভদ্রলোক জলবৃষ্টির মাঝ দিয়ে এলেন, আপাততঃ, এককাপ্ চা তৈরী করে তাঁকে দিয়ে এস। খোকার এই বিছানাটা ঠিক্ করে' আমি যাচ্ছি। ততক্ষণ না হয় তুমি তাঁর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বল গে।"

ছোট ট্রের ওপর কাপটা বসিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখি, সমরবাবু খবরের কাগজখানার পাতা ওলটাচ্ছেন। আমি তাঁকে বললাম, "দাদা একটা জরুরি কাজে বাইরে গেছেন, আপনাকে একটু ওয়েট করতে বলেছেন।"

ও কথা যেন তাঁর কাণেই ঢোকেনি এমনিভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "শীতের ভয়ে বুঝি আজ চান্ করেন নি। শুকনো চুলগুলো এসে আপনার মুখের ওপর পড়ায় ভারী সুন্দর কিন্তু দেখাচ্ছে আজ আপনাকে—প্রথম যেদিন বাসে দেখা হয় ঠিক্ সেইদিনকার মত !"

এতও বকতে তিনি পারেন !

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "চা-টা জুড়িয়ে যাবে যে।" তাড়াতাড়ি করে' উনি সেটা তুলতে যাওয়ায়, খানিকটা গরম চা চলকে এসে আমার হাতের ওপর পড়লো। 'উঃ' বলে' আমি হাতটা সরিয়ে নিতেই তিনি ত ভাই মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দু'টীও ছল-ছল করে' উঠ্‌লো। যেন কতই অপরাধী। আমার হাতখানা তিনি তাঁর হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললেন, "ইস্, লাল হয়ে উঠেছে যে, ফোস্কা পড়বে হয়ত ! আমায় ক্ষমা করবেন কি ?" এই বলে' উনি করলেন কি, আমার হাতখানাকে তুলে ধরে' তার ওপর তাঁর ঠোঁট দু'টী চেপে ধরলেন !

ভাই রুবি, তোর কাছে ত আমার কোন কথাই গোপন করা চলে না। তোকে গোপন করে' আমি যে শান্তি পাই নে !

হাতের জ্বালা আমার তখন ছিল না। তাঁর উত্তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শে আমার সকল দেহে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো !

আমার মাথা যে কখন তাঁর বুকের ওপর হেলে পড়েছিল, তা' মনে নেই। এত মাদকতাও মানুষের শরীরে থাকে !

আস্তে আস্তে আমার মুখখানাকে তুলে ধরে' চোখের উপর চোখ দু'টী রেখে তিনি বললেন, "তুমি আমার হবে লিলি ?"

মুখে আমার কথা জোগায় নি।

তাঁর বুকের ওপর আবার মাথা রাখতেই তিনি মুখ নীচু করে,—

রুবি, তুই যাই ভাবিস্ না কেন, একটা কথা আমি তোকে জিজ্ঞাসা করতে চাই,—আমি না হয়ে যদি তুই হতিস্, তা' হলেই বা কী করতিস ?"

চিঠিখানা পড়ে রেবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। বন্ধুর সুখে তার আনন্দ ! তবু যেন মনের মধ্যে সে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। চিঠির প্যাডটা টেনে নিয়ে তখনই সে তার জবাব লিখতে বসলো, "লিলি ভাই ! কন্‌গ্রাচুলেশনস সত্যিই আজ তোর উপর হিংসে হচ্ছে ! তুই লিখেছিস আমি হ'লে কী করতুম। তুই যা করেছিস্, আমি তা' ছাড়া অন্য কিছু করতে পারতুম বলে' ত মনে হয় না। বৌদি'কে চিঠি লিখছি, তুই নিশ্চিন্ত থাক্ ! সমরবাবুকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাস্। তাঁর দিক থেকেও লাভটা বড় কম নয়। ভালোবাসা নিস ! ইতি,

তোর রুবি—
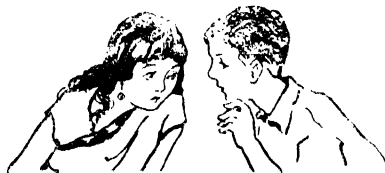
—রীতি—

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

একই ছাদের তলায় সুদীর্ঘ দশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মুখোমুখী দুইটী ঘরের অধিবাসীগণের জীবনও কাটিয়া গিয়াছে ঠিক এক ই ভাবে। কল জল লইয়া মাঝে মাঝে যে দু'-একদিন বচসা হইয়া গিয়াছে, তাহা অতি সামান্য ই; উভয় পরিবারের মধ্যে সহজ সম্প্রীতিকে বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। সামনের ঘরের সান্ন্যাল-মশায় মার্চেন্ট আফিসের কেরাণী—আমিও তাই। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া আমাদের আলোচনা চলে—'রিডাক্সন্' 'রিট্রেঞ্চমেণ্ট' ও 'রাউণ্ডটেবল !'…

দুইটী পরিবারের জীবন যাত্রা একরূপ আনন্দ সম্প্রীতির মধ্য দিয়াই দশটী বৎসর কাটিয়া যায়।

তারপর—

তারপর গল্পের সুরু —।

নীচের ঘরের নবাগত ভাড়াটেদের লইয়া গিন্নীর-সহিত সান্ন্যাল গিন্নীর কানাকানি চলে দিবরাত্র। তাহার-ই দু'-একটা কথা মাঝে মাঝে কানে আসিয়া পৌঁছায়।

—"যাই বল ভাই, আমার কিন্তু অমন বেহায়ার মত হাসি ভাল লাগে না! অত বড় সোমত্ত মেয়ে একটুতেই হেসে লুটোপুটি! মা গো, সেদিন বরের সঙ্গে যা' বেহায়াপনাটাই করলে! আমরা ত' লজ্জায় মরে যাই।"

—"ঠিক বলেচো ভাই! আমারও যেন কেমন কেমন লাগে। কি যে ব্যাপার ওদের। শোনো কথা তবে, আমি বেশ নজর করে' দেখেচি সেবার তিনদিন ওদের আর হাঁড়ি চড়ল না—সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যের সময় ছেলেটা কোথা থেকে ফিরে এসে বউটাকে ইসারা করে' কি বলত, আর বউটা আস্তে আস্তে উঠে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একগ্লাস জল এগিয়ে দিত, আর তা-ই খেয়ে ছেলেটা হাত-পা মেলে বিছানায় শুয়ে পড়ত। শেষে হঠাৎ তিনদিনের দিন বিকাল-বেলা ছেলেটা কোথা থেকে ছুটো ঝাড়নে করে' বাঁধা কি সব এনে হাজির! পকেট থেকে ঝন্-ঝন্ করে' কতকগুলা টাকা বার করে' বউটার দিকে ছুঁড়ে দ্যায়। বউটাও আনন্দে দিশে হারা! তখুনিই উনুনে আঁচ দিয়ে রান্না চাপিয়ে ফেললে। তারপর রাত দুটো পর্য্যন্ত দু'জনে কী গল্প—ওদের ছোট্ট মেয়েটাকেও ঘুমোতে দেয় নি একটু। আবার শোনো, সেদিন সন্ধ্যে বেলায় দু'জনে মিলে কোথায় বেড়াতে বেরুলেন, শুন্লুম না কি রবি ঠাকুরের জন্যে কি মিটিং হয়েছিল, সেখানে গিয়েছিলেন। মা গো, যাদের পেটে ভাত নেই, তাদের আবার অত সখ কিসের!"

হঠাৎ সিঁড়িতে সান্ন্যাল-মশায়ের চটির শব্দ হয়। কাজেই উহাদের কথোপকথনের মাঝে আধপথেই যবনিকা টানিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

ব্যাপারটা অবশ্য খুবই সামান্য, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা লইয়াই আমাদের মধ্যে কেমন একটা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

একরকম গায়ে পড়িয়াই আলাপ করি।

সকালবেলা ছেলেটীর সহিত একেবারে

মুখোমুখী। দু'-একটা কথা হয়। বলে, উপস্থিত কি-একটা কোম্পানীর সেলিং এজেন্ট; তার আগে ইউনিভারসিটীতে কাজ করত। চাকরীটাতে বিশেষ-কিছু আসে না; -এর পর আবার কি করতে হবে কে জানে! হঠাৎ কথার মাঝখানে বউটা আসিয়া বলে—তোমার চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটীও ঈষৎ হাসি হাসিয়া চলিয়া যায়।

চলিয়া আসিবার সময় ওদের ঘরের দিকে একবার চকিত-দৃষ্টি হানিয়া আসি। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! ঘরের প্রতিটী জিনিষের মধ্যে দারিদ্র্যের লেশমাত্র ইঙ্গিতও নাই। প্রত্যেকটী কেমন সুন্দর সুচারুরূপে গুছান—কোনোটীই শ্রীহীন নয়। বুঝিলাম,—দারিদ্র্যকে যদিও উহারা আমরণ জীবনের সম্বল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার নিকট একান্তভাবে তাহারা আত্মসমর্পণ করে নাই—নিত্য দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়াও কোনরকমে আপনাদের লক্ষ্মীছাড়া করিয়া তুলিতে হয় ত' ওদের বাধে।...

ওদের ছোট্ট একটী মেয়ে; মাস ছয়েকের বেশী বয়স হইবে না বোধকরি। কিন্তু তা' হইলে কি হয়! দারিদ্র্যের একটী শীর্ণ রশ্মি-উত্তাপও ওর গায়ে লাগিতে দেয় না। নিজেরা কিছু খাক-বা-নাই-খাক মেয়েটার দুধ-সাগু খাওয়াই-বার কামাই ছিল না কোনোদিন।

* * * *

ছুটির দিনে দুপুরবেলাটা বাড়িতেই থাকি। দেখি ন'টা-দশটার সময় খাওয়া-দাওয়া করিয়া ছেলেটী বাহির হইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই বউটীও ঘুমন্ত মেয়েটাকে পিঠে করিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায় এবং ঘণ্টা দুয়েক পরে এক পোঁটলা পশম, সুতো, ছিট-কাপড় প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসে। পরদিন আবার ঠিক সেই সময়েই কাগজ-মোড়া কি কতকগুলা লইয়া বাহির হইয়া যায়।

প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও আবার সান্যাল গিন্নীর বক্তৃতা সুরু হয়। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করেন—"জানলে বউ, আমার কথাটা এমন কি খারাপ হয়েছিল বল না? আমি কি বলেছিলুম, জান? বলেছিলুম—হাঁ গা',তোমার ঘুমন্ত মেয়েটাকে অমন কাঁধে করে' নিয়ে বেরিয়ে যাও কেন, রেখে গেলেই ত' পার, আমরা রয়েচি, একবার একবার কি আর দেখতে পারব না? বললে—না আপনাদের আবার কষ্ট হবে। বললুম—আমাদেরও ত ছেলেপুলে রয়েচে বাছা? তা' তখন হতচ্ছাড়া মাগী কি বললে জান? বললে—না, আপনাকে দেখে ও কেঁদে উঠবে—আপনি যা মোটা! শুনলে দেমাকের কথা! আমার ইচ্ছে হ'ল, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে। এসব কিন্তু আমার মোটেই ভাল লক্ষণ বলে' মনে হয় না বাপু—ওরা মোটেই ভদ্দর গেরস্ত নয়—ওরা হচ্ছে—"

অনুচ্চারিত শ্লেষ-বাক্যটী অনুচ্চারিতই থাকিয়া যায়। আমি হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ি। কিন্তু দেখি,—তখনই সিঁড়ি দিয়া বউটী নামিয়া যাইতেছে—কিন্তু নামিবার সময় আমার দিকে একবার আহত-দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া যায়। বেশ বুঝিতে পারি কথাগুলি উহার কানে গিয়াছে। কিন্তু উহা শুনিবার পরে কয়েকটী মুহূর্ত্তের মধ্যেই ও যেন কেমন কৃশ, বিবর্ণ হইয়া যায়; দেখিতে পাই, ওর ঐ চাহনির পশ্চাতে যেন এক অন্তর-জোড়া অশ্রুর সাগর দুলিতেছে!

পরদিন সকালেই দেখি একটা লরিতে উঁহাদের জিনিষ-পত্র চাপান হইতেছে। যেমনি অকস্মাৎ অপরিচিতের ন্যায় উহারা আসিয়াছিল, তেমনি অকস্মাৎই চলিয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না। ভাবি, এইরূপ কত নরনারী-ই না দুখ-দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িয়া স্ব-স্ব সম্মুখে যবনিকা টানিয়া আপনাপন লক্ষ্যহীন জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার ইতিহাস কে-ই বা রাখে! সুন্দরকে যাহারা জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছে, সুদূর ভবিষ্যতের কোনো এক গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা ভাবিয়া বর্ত্তমানের দুঃখের কথা যাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের স্থান সমাজে নাই—বরং কলঙ্কের কালি আঁকিয়া তাহাদের উচ্ছেদ করাই সংসারের দণ্ড বিধি,—তাহাই সনাতন রীতি!

—তবে ?—

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

এক

বর্দ্ধমান সহরের রাজপথে প্রায়ই খোঁড়াটাকে দেখা যায়। লাঠির ভরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে সকলের নিকট পয়সা চাহিয়া ফিরিত। সহরের পাশে ছোট একটী গ্রাম, এক কৃষক পত্নীর অনুগ্রহে তাহারি একটী খালি গোয়াল-ঘরে সে কিছু রাঁধিয়া খায়, রাত্রিও তাহার সেই খানেই কাটিত।…

কি গ্রামে, কি সহরে সবাই তাকে বারবার এভাবে দেখিয়াছে। সে জানিত না যে, নিত্যকার এই পায়ে হাঁটা জায়গাটী ছাড়া অন্য কোথাও তার ভিক্ষার স্থান আছে কি না। স্থানটীর উপর কেমন যেন তাহার মায়া পড়িয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যায় যখন সে ভিক্ষালব্ধ চাল বা অন্য কিছু লইয়া তাহার ছোট্ট ঘরখানিতে আসিয়া পৌঁছিত, তখন মনে হইত যে, এই ছোট্ট কুঁড়ে-খানিই তার জগত, আর সে তারই একচ্ছত্র সুখী সম্রাট।…

অন্য ভিখারীরা প্রায়ই তাকে অন্য কোথাও যাইয়া ভিক্ষা করিবার জন্য বলিত, কিন্তু সে কথা তাহার কাণেই উঠিত না।

সহরের লোকজন, দোকানী-পসারী সকলেই খোঁড়াটার উপর বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিদিন ভিক্ষা চাওয়া, এ কি! আর কি জায়গা নেই, সকলে তাহাকে গালি দিত। গালি খাওয়াটাই যেন তাহার জীবনের নিত্য পাওনা।…

খোঁড়া বলিয়াই সকলে তাহাকে ডাকে, তার অন্য কোনও নাম যে থাকিতে পারে, একথা কাহারও মনেই উঠে না, খোঁড়াও মুখ ফুটিয়া কাহাকে কিছু বলে না।…

কোনও দিন হয়ত সারা পথ ঘুরিয়া খোঁড়ার ভিক্ষা জুটিল না। বাড়ী বাড়ী ঘুরিল—যা' পাইল, তা'তে হয় ত তার চলিবে না। কাজেই সামান্য ছাতুতে সে একবেলার জলযোগ সারিল।…

সন্ধ্যার পর সে ঘরে ফেরে—শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিষন্ন। কৃষক-পত্নীর মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে, তার যে পুত্র,—সন্তান বলিতে এখন ওই! ছুটিয়া সে তখনই চাল, দাল, তরিতরকারী আনিয়া দিয়া তাহাকে রাঁধিয়া খাইতে অনুরোধ করিত। এরকম প্রায়ই হইত।…

মহতাব রোড দিয়া খোঁড়া চলিত, স্কুলের যত ছেলে তাহার পিছন হইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত—

—"খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং,
কার বাড়ীতে সিঁদ কেটেছিস্
কে ভেঙেছে ঠ্যাং।"

বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, সে হাসিয়া তাহা-দের সুরে সুর মিলাইত। দূর হইতে দোকানী বলিত,—"ওই আসছে হতভাগা খোঁড়াটা, এখনই বিরক্ত করে মারবে!" সকলেই বিরক্ত, সে প্রত্যহ আসিয়া ভিক্ষা চাহিবে, এটা যেন সবারই জানা।…দূর হইতে দেখিলে পথিক পাশ কাটায়, দোকানের কাছে হাত পাতিবার আগেই সে বলে, "হবে না।" অন্য রুদ্ধদ্বার চির রুদ্ধই থাকে, তার কাতর আহ্বানে খুলে না। তবু কেমন যে মায়া সে অন্যত্র ভিক্ষায় আর যায় না।

দুই

'দুনিয়ায় তার কেহ নাই, কেহ থাকিবেও না'—এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই উপরওয়ালা একদিন তার একমাত্র আশ্রয়-দাত্রীকে হঠাৎ আপনার কাছে টানিয়া লইলেন।

গোঁড়ার এখন পথই ঘর। কৃষকের গৃহে আর তার স্থান হয় না; সে যায়ও না।

আগের দিন কিছু খাওয়া হয় নাই, একটী পয়সা পর্য্যন্ত পায় নাই যে। তাই সে সেদিন অতি কষ্টে লাঠি ধরিয়া রাস্তায় চলে, পথিক দেখিলে করুণ মিনতি জানাইয়া হাত পাতে। সকলেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তাহার করুণ আবেদন কাণে তোলাও কেহ প্রয়োজন বোধ করে না।

আবার কেহ হয় ত কঠোরস্বরে বলে—"যা' হতভাগা, রোজ জ্বালাতন, তোকে এ সহর থেকে না তাড়ালে দেখ্‌ছি আর শান্তি নেই।" বাড়ী বাড়ী যায়, নিরাশ হয়, তখন উদ্‌ভ্রান্তভাবে সে দাঁড়ায় মিঠাপুকুর রোডের ধারে।…

একটী প্রবীণা স্ত্রীলোক মন্দিরে পূজা দিতে চলিয়াছে, দয়া পাইবার আশায় গোঁড়া হাত পাতিল, বৃদ্ধা কর্কশকণ্ঠে বলিল—"পয়সা? হতভাগা, রোজ রোজ সহর সুদ্ধ লোকের হাড় জ্বালিয়ে মার। সামনে হ'তে সরে যা' বল্‌ছি।"

বটেই ত দেবতার ভোগে কি ভাগ বসে, সে সরিয়া দাঁড়ায়, বৃদ্ধাকে পথ দেয়। বিকালে শ্রান্ত হইয়া কোন ধনীর রোয়াকে শ্রান্তিভরে বসিয়া পড়িল।…

সে পথে কত ছেলে-মেয়ে,—কেহ চাকরের সঙ্গে, কেহ পিতা বা ভ্রাতার সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছে। সকলের মুখেই হাসি,—আনন্দের যেন তুফান ছুটিয়াছে। তাদের কাছে হাত পাতিতে তার আর প্রবৃত্তি হয় না, সে ত জানে তিরস্কার ভিন্ন অন্য কিছুই মিলিবে না।…

কাহারও বা চোখ পড়িয়া যায়, বলে—"ওই যে গোঁড়াটা, আবার এখনই তেড়ে আসবে কিছু চাইতে। গোঁড়া কিন্তু চায় না, ক্লান্ত দেহটা এলাইয়া রোয়াকের উপর সে শুইয়া পড়ে।

তিন

মধ্যরাত্রে চৌকীদারের ভীষণ ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। দুর্ব্বল সে, উঠিতে পারে না, চোখ মেলিয়া চায়,—বুঝিতে পারে না কি তাহার অপরাধ।

চৌকীদার বলিয়া উঠে—"শালা, এখানে ঘাপ্‌টী মেরে শুয়ে রয়েছে, চৌধুরীবাবুদের বাড়ী তুই-ই রোজ চুরী করিস্‌, আর ধরতে পারি না বলে' রোজ দারোগাবাবুর কাছে আমি বকুনী খাই। চল্‌ শালা, থানায় চল্‌।"

ভাবিতে পারে না, সে কেমন করিয়া চোর হইল। মুখের কাপড় সরিয়া যাওয়ায় অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে চৌকীদার চিনিল—এ সেই গোঁড়া।..

চৌকীদার আবার বলিল,—"ও, তোর এই কাজ, দিনে ভিক্ষে আর রাত্রে চুরী। চল চল্‌ থানায় চল।"

চৌকীদারের চেঁচামেচিতে চৌধুরীদের বাড়ীর দরোয়ান, দুই-একজন বাবু বাহির হইয়া আসিলেন। গোঁড়াকে সকলেই চিনিলেন; বুঝিলেন, কেন সে এ সহর ছাড়া অন্য কোথাও নড়িতে চায় না।

তারপর বেচারীর উপবাস-ক্লিষ্ট দেহের উপর সে কী প্রহার! মৃতপ্রায় গোঁড়াকে টানিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া চৌকীদার থানায় গিয়া এজেহার দিল—"এ চোর, দিনে গোঁড়া সাজিয়া ভিক্ষা করে রাত্রে চুরী। আজ অনেক চেষ্টায় ধরিয়াছে।" আর সকলে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল।

দারোগার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল ; তুড়ী দিয়া তুই একটী হাই তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হু, যে দেশে সতীশ মুখুজ্যে দারোগা, সে দেশে চোর-ডাকাত জব্দ। মশায়, আমার অনেকদিন আগেই একে সন্দেহ হয়েছিল বলেই আমি চৌকীদারদের একে নজরে রাখ্‌তে বলে-ছিলাম।"

দারোগা জুতার একটা ধাক্কা দিয়া ভূমে শায়িত অচৈতন্য খোঁড়ার নাম এতদিন পরে ডায়েরী লেখার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সাড়া না পাইয়া টেবিল হইতে ল্যাম্পটা তুলিয়া দেখিলেন।

একটু হাসিয়া চৌকীদারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"হুঁ, শালা মটকা মেরে পড়ে আছে ; যা,' একে একটা ঘরে পুরে রাখ্‌গে, কাল সকালে তখন এজেহার নেব।"

চৌকীদার অচৈতন্য মৃতপ্রায় খোঁড়াকে একটা অন্ধকার ঘরে পুরিয়া আসিল।

*　　　*　　　*

পরদিন চৌধুরীবাবুরা এবং অন্যান্য লোকেরা আসিলে দারোগাবাবু খোঁড়ার এজেহার লইবার আশাতেই হয় ত বন্ধঘর খুলিলেন ; কিন্তু সবাই দেখিলেন,—খোঁড়ার হিমশীতল প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।...

বুঝি সে প্রকৃত এজেহার দায়ের করিবার জন্য উপরওয়ালার কাছে চলিয়া গিয়াছে। *

* 'গী দ মোপাসাঁর ছায়া অবলম্বনে

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়
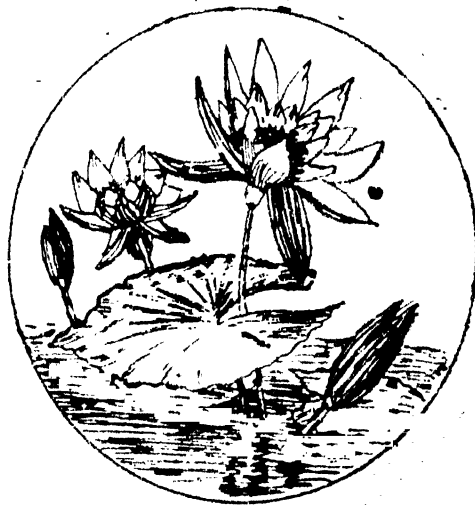
রাত্রে হঠাৎ শুভার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। পাশ ফিরিয়া শুইয়া দেখিল রমেন বিছানায় নাই। ভাবে, হয় ত বাহিরে গিয়াছে, এখনিই আসিবে। শুভা আবার ঘুমাইয়া পড়ে।

কিন্তু ছোট মেয়েটির কান্নায় দ্বিতীয়বার যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও পাশে রমেনকে দেখিতে না পাইয়া শুভা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। মেয়েটিকে মাই দিয়া শান্ত করিয়া শুভা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরের একটি কোণ হইতে নিভাইয়া রাখা হ্যারিকেনটি খুঁজিয়া লইয়া সেটিকে জ্বালিল। আলোটি হাতে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল, রমেন নাই। পাইখানার দিকে আগাইয়া গিয়া দেখিল পাই-খানার দরজাটি দু'হাট করিয়া খোলা, রমেন সেখানেও নাই। উঠান পার হইয়া সদর দরজার নিকট আসিয়া দেখিল, দুয়ারটি ভিতর হইতেই বন্ধ, অতএব রমেন বাহিরেও যায় নাই। কিন্তু ভিতরেও নাই। শুভা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। এদিক-ওদিক চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, 'ওগো, শুনচো? ওগো, তুমি কোথায়?' সাড়া নাই। উঠানের উপর দিয়া ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিবার পথে শুভার চোখ পড়িল কূয়ার পাড়ে রমেনের চটী জোড়াটি পড়িয়া রহিয়াছে। কী এক অজানা আশঙ্কায় শুভার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। শুভা সেইখানেই জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল।

ব্যাপরটি ঘটিয়াছিল আজ পাঁচবৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমের একটি ছোট্ট সহরের এক বাঙালী পরিবারে।

.৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার কোন্নগর গ্রাম হইতে চাকুরী উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু হরিবিলাস চক্রবর্ত্তী এই সহরে আসিয়াছিলেন—এবং সেই হইতে দেশে ফিরিয়া না গিয়া তিনি এইখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন।

সাংসারিক অবস্থা তাঁহার ভাল না হইলেও একমাত্র পুত্র রমেনকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে তিনি কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই। এবং এম-এ, বি-এল্ পাশ করিয়া রমেনও পিতার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিল।

ওকালতী পাশ করিয়া চোগা-চাপ্কান্ আঁটিয়া নূতন উৎসাহের সহিত সহরের আদালতে রমেন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিবার অল্প কিছুদিন পরেই হরিবিলাস চক্রবর্ত্তী একটি পৌত্রীর মুখদর্শন করিয়া পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে পরপারের পথে যাত্রা করিলেন।

শোকের বেগ কাটাইয়া উঠিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া রমেন সেই প্রথম অনুভব করিল তাহার অবস্থা কত অসহায়। এতদিন তাহার স্নেহময় পিতা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া দুনিয়ার ঝড়ঝাপ্টা হইতে তাহাদের বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। আজ আশ্রয়-চ্যুত বিহঙ্গমের মতই তাহার অবস্থা।

দুইটি কুমারী ভগিনী, বিধবা জননী, স্ত্রী ও শিশুকন্যাটিকে লইয়া রমেনের নূতন করিয়া জীবন-যাত্রা সুরু হইল।

ওকালতীর মোহ যতই মধুর হউক, ইহার মত মরীচিকাও খুব কম আছে।

সে দুপুরটা আদালতের প্রাঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়ায়; সন্ধ্যা ও সকালে দুইটা টিউশানী করে। এমনি করিয়া কায়ক্লেশে কোনোরকমে তাহাদের দিনচলে।

কিন্তু অনূঢ়া ভগিনী দুইটিকে লইয়াই হয় মুস্কিল। দেশের পৈত্রিক ভিটা ও যৎসামান্য জমিজমা যাহা ছিল, সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া প্রথমা ভগিনীকে কোনরকমে পাত্রস্থ করিল। দ্বিতীয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিল জগদীশ্বরের উপর।

এদিকে সংসার বাড়িয়াই চলে। যেখানে লক্ষীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে না, মা ষষ্ঠী বুঝি সেইখানেই অবস্থান করিতে ভালবাসেন।

প্রতিবৎসরই শুভা স্বামীকে একটি করিয়া সন্তান উপহার দেয়।

টিউশানী করিয়া কয়টা টাকাই বা ঘরে আসে। মুদির দোকানে, দুধওয়ালীর নিকট, এমনি সর্বত্রই দেনা বাড়িয়া চলে। সকলেই শাসাইয়া যায়, টাকা না পাইলে তাহারা আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবে। ঘরের সমস্ত অলঙ্কার তৈজসপত্র বন্ধক দিয়া, বিক্রয় করিয়া মান বাঁচাইতে হয়।

ইহার উপর অবিবাহিতা ভগিনী। বয়স কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। তাই সে ও বাড়িয়া চলিয়াছে। ঘরে মা'র তাড়া এবং বাহিরে আত্মীয়-প্রতিবেশীদের টিট্‌কারীতে রমেন অস্থির হইয়া উঠে।

কিন্তু বেশী দিন সহ্য করিতে হয় নাই।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে নীলিমা আপনার পথ খুঁজিয়া লইল।

প্রতিবেশীরা বলাবলি করিতে লাগিল, এ প্রকার ঘটনা যে একদিন ঘটিবেই তাহা তাহারা বহুপূর্ব্বেই জানিত। ছি ছি, শেষকালে একটা কায়েতের ছেলের সঙ্গে ···

ভার কমিল বটে, কিন্তু নীলিমা বংশের বুকে যে কালি ঢালিয়া দিয়া গেল, তাহার অন্ধকারে রমেন মুখ লুকাইল। লোকের সম্মুখে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না।

এই ঘটনার পর বৃদ্ধা ভবসুন্দরী সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন, ক্রমাগত পাঁচমাস ভুগিয়া একদিন ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তির শেষনিশ্বাস ফেলিলেন। যথেষ্ট দেনা করিয়া মাতার চিকিৎসা করাইয়াও রমেন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

রমেন প্র্যাকটিস্ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ছাড়িয়া দেওয়ার তাহার লাভ বই ক্ষতি হয় নাই, কারণ, আদালত হইতে কোনোদিনও সে একটী পয়সা ঘরে আনিতে পারে নাই। উপরন্তু সাজসরঞ্জাম বজায় রাখিতে ও গভর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক লাইসেন্সের টাকা দিতে তাহাকে যথেষ্ট কষ্ট করিতে হইত।

এদিকে টিউশানীও বিশেষ জুটে না। নীলিমা গৃহত্যাগ করিবার পর হইতে সকলেই যেন তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়।

দিন তাহাদের চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার উপর ছেলেদের একটি না একটির অসুখ লাগিয়াই আছে। চিকিৎসা করাইবারও সামর্থ্য নাই। এমনি করিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া ছয়টির মধ্যে দুইটি সন্তান মরিয়া বাঁচিয়াছে এবং আর একটি সন্তান আটদিন একাজ্বরী থাকিবার পরও চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় নয় দিনের দিন সন্ধ্যায় রমেনের সহিত শুভার কিঞ্চিৎ বচসা হইয়া যায়। শুভা বলে — 'যা'র তিনকড়ার মুরোদ নেই,তা'র সংসার করার সাধ না হওয়াই উচিৎ। বউ ছেলের ভাত যোগাতে পারে না যে পুরুষ, তা'র গলায় দড়ী···'

সেদিন রাত্রেই দড়ীর সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রমেনের চোখে পড়িল, কূয়ার উপরের একটি কাঠের সহিত জল তুলিবার বাল্‌তীটি একটি প্রকাণ্ড দড়ী দিয়া বাঁধা রহিয়াছে। বাল্‌তীটি খুলিয়া রাখিয়া দড়ীর সেই প্রান্তটি আপনার গলায় বাঁধিয়া রমেন আস্তে আস্তে কূয়ার ভিতর ঝুলিয়া পড়িল। চটী জোড়াটি হয় ত ভুল করিয়াই কূয়ার পাড়ে খুলিয়া রাখিয়াছিল।
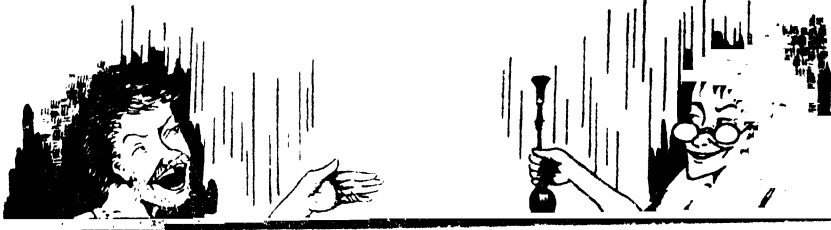
মাসিক সাহিত্যের গল্প সমালোচনা

ভারতবর্ষ—পৌষ, ১৩ ৮

বদলী মঞ্জুর—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটী নিঃসঙ্গ তরুণীর বৈচিত্র্যহীন জীবনের করুণ-কাহিনী। ষ্টেশন-মাষ্টার হরিপদর স্ত্রী বীনাপাণির সুদীর্ঘ আটবৎসরের একঘেয়ে জীবন-যাত্রার মধ্যে সুকুমারের ক্ষণস্থায়ী আবির্ভাবে বীনার হৃদয়ে চঞ্চল নব তরঙ্গ। আর তারপর সেই ক্ষণিকের অতিথির স্মৃতি কৃপণের সামান্য পুঁজির মত বীনাপাণির কাছে একান্ত আদরের গোপনের জিনিষ। বহুদিন পরে বড় জংসনে হরিপদ বদলী হইল—কিন্তু তখন সর্ব্বনাশ, বীণা রোগে অবসন্ন—নিরুৎসাহ। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বীনা মাতুলালয়ে গেল—কিন্তু সেইখানেই তাহার মৃত্যু হইল। তাহার সঙ্গীহীন জীবনের অবহেলাভরা অন্তরাত্মা কোন আনন্দ কোলাহল মুখর ষ্টেশনে বদলী হইল কে জানে!

অবসরবিহীন স্বামীর সঙ্গ বীনা পাইত না; অথচ, নিজের অবসর ছিল সুপ্রচুর—তাই জনবহুল স্থানে বদলী হইবার জন্য ছিল তাহার কাতর প্রার্থনা। এই অকারণ ব্যথার করুণ ছবি শৈলজাবাবু সুন্দরভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। গল্পটী মাঝে মাঝে অযথা দীর্ঘ হওয়ার সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে।

গল্প—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কিরূপে নীরবে উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে হয়, বিজয়বাবু গল্পচ্ছলে তাহারই একটী সুনীতিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন। ভাষা বেশ সাবলীল। তবে ছোটগল্পের আসরে অচল।

আগন্তুক---শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আধিভৌতিক (প্রেত্নীক ?) গল্প

[illegible]কুমারের বেশবিন্যাস কক্ষে সহসা তাহার পূর্ব্ব প্রণয়িনীর আত্মার আবির্ভাব, কথোপকথন এবং তিরোভাব। লেখক এই কাহিনীটী সালঙ্কারে লিখিয়া ছোটগল্প বানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পে কোন বিশেষত্বই নাই। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকের কলমেই আজকাল ভূতের আবির্ভাব হইতেছে, বুদ্ধদেববাবুর সচল লেখনীও ভূতাবিষ্ট হইতে চলিল। আশার কথা নহে।

গতিক—শ্রীবিমল মিত্র

বহুদিনের বিধবা ঝি সিন্ধুর মাতৃত্ব এবং নূতন ঝি নন্দর মা ও উড়ে চাকরের পলায়ন—এইসব লইয়া একটী দুর্ব্বল গল্প। গল্পের সূক্ষ্মভাব ধারাটী অপ্রয়োজনীয় কথার চাপে আদপেই ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। বড় বড় কথা—পঙ্কিল আবহাওয়া, পঙ্কের গ্লানি, অসুন্দরের পূজা, পৃথিবীর রহস্যের স্পষ্টতা—মায় সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রণাম পর্য্যন্ত—কাহারও গতিক সুবিধা নয়।
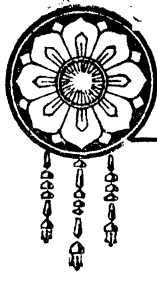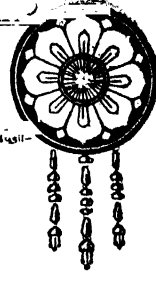
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ { ফাল্গুন, ১৩৩৮ } একাদশ সংখ্যা

—মন্দিরা—

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া অত্যন্ত অবসন্নভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আর ত পেরে উঠি নে।"

শয়নগৃহের সম্মুখস্থ রোয়াকে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া স্ত্রী মন্দিরা বসিয়া পাণ সাজিতেছিল; নীলকণ্ঠের এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হ'ল আবার?"

নীলকণ্ঠের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গায়ের চাদরখানা বাঁশের আলনায় রাখিয়া সেই রোয়াকের একপ্রান্তে একখানা সতরঞ্চি টানিয়া লইয়া তিনি বসিলেন। একটা পাণ মুখে দিয়া বলিলেন, "আজ জমীদারবাবুর আসবার কথা ছিল জান ত? তিনি এসে পৌঁছেছেন দুপুরবেলা।"

জিজ্ঞাসাকুল-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মন্দিরা বলিল, "তারপর, কিছু বল্‌লেন না কি?"

"বল্‌লেন বৈকি। নীতিকথা অনেক শোনালেন। সামান্য একটা ঘটনা থেকে কি কাণ্ডটাই হ'তে বসেছে, তাই ভাবছি।" বলিয়া নীলকণ্ঠ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

এ ব্যাপারটা মন্দিরার অজানা ছিল না; কাজেই সে চুপ করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সত্যসত্যই একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার হইতে যে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটিবে, ইহা কেহই ভাবিতে পারে নাই।

* * *

গুণাইগাছা গ্রামে জমীদারের একটা নূতন কাছারীবাড়ী প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যিনি গোমস্তা হইয়া আসিলেন, তার নাম ধরণী ঘোষাল। তাঁর মত বিচক্ষণ লোক না কি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

ছোট গ্রামখানি। অধিবাসী দুই-চার ঘর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ছাড়া আর সকলেই কৃষিজীবি অথবা মৎস্যজীবি।

গোমস্তার বিচক্ষণতার পরিচয় গ্রামের লোকের পাইতে বড় বেশী দেরী হইল না। বিনা-মূল্যে মৎস্য এবং তরিতরকারী জোগানো ত তাহাদের নিত্য-নিয়মিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতেও তাহারা তত বিচলিত হইয়া পড়ে নাই;

কিন্তু সেদিন যখন পরাণ জেলের মাছের চুপড়ী হইতে ঘোষাল-মহাশয় সর্ব্ববৃহৎ মৎস্যটী তুলিয়া লইলেন, তখন পরাণ বিনীতভাবে জানাইল যে, সেদিন তাহার মায়ের ঔষধ আনিতে তাহাকে মহকুমায় যাইতে হইবে, সুতরাং সেদিন তাহার পয়সার বড়ই প্রয়োজন ; গোমস্তা-মহাশয় যদি দয়া করিয়া একটা ছোট মাছ সেদিন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।

একটা ধীবরের এতখানি ঔদ্ধত্য গোমস্তা সহ্য করিতে পারিলেন না ; তাহার গণ্ডে সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া তাহার ঝুড়িতে যতগুলি মাছ ছিল, সবগুলি কাড়িয়া লইলেন। সে বেচারী কাঁদিয়া উঠিল। গোমস্তার সঙ্গে কাছারীর যে পাইকটা আসিয়াছিল, সে এই ব্যাপারে বড়ই কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বাজারে গিয়াছিলেন ; চোখের উপর এ দৃশ্যটা সহ্য করিতে পারিলেন না—তার উপর পাইকটার হাসি দেখিয়া তাঁহার মাথায় একেবারে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

গোমস্তা একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন, নীলকণ্ঠ পিছন হইতে বাঘের মত লাফাইয়া তাঁহার ঘাড় ধরিয়া ফেলিলেন। পাইকটা মাছ ফেলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় লুকাইল। গোমস্তা অতি কাতরভাবে নীলকণ্ঠের দিকে চাহিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কাছারীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এই যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সেটা সহজে নিভিল না।

মাসখানেক পরেই হঠাৎ একদিন আদালতের এক পেয়াদা নীলকণ্ঠের বাড়ী আসিয়া আদালতের এক ডিক্রী দেখাইয়া জানাইল যে, সেই ডিক্রীর টাকা মায় খরচ এখনই মিটাইয়া দেওয়া হয় ভালই, নচেৎ তাঁহার গরুবাছুর প্রভৃতি সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার হুকুম আদালত হইতে দেওয়া হইয়াছে।

কিসের নালিস, কিসের পাওনা, কবেই বা মোকর্দ্দমা হইল, কবেই বা ডিক্রী হইল নীলকণ্ঠ কিছুই জানিতেন না, কাজেই ব্যস্ত হইয়া মহকুমায় ছুটিয়া গিয়া সে যাত্রা অস্থাবর ক্রোকের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু অনর্থক কতকগুলি টাকা খরচ হইয়া গেল।

সময়ে এবং অসময়ে এই ব্রাহ্মণ যুবকটীর কাছে গ্রামের অনেক লোকে অনেক উপকার পাইয়াছে; কাজেই তাঁহার এই লাঞ্ছনা তাহারা নীরবে সহ্য করিতে পারিল না। তাহার ফলে সেবারকার কিস্তিতে জমীদার সরকারে গুণাইগাছার প্রজাদের নিকট হইতে একটী পয়সা খাজনা আদায় হইল না। ধরণী ঘোষাল সদরে রিপোর্ট দিলেন যে,নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি প্রজাদের বিগড়াইয়া দিয়া সারা গ্রামখানিতে একটা অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে—ইহার প্রতীকার না করিলে জমীদারের মান-মর্য্যাদা আর থাকে না।

প্রত্যুত্তরে জমীদারবাবু জানাইলেন যে, তিনি স্বয়ং গ্রামে আসিতেছেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন।

* * *

মন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "মোটের ওপর জমীদারবাবুর মেজাজ কেমন দেখলে ?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "মোটেই ভাল নয়। খুব চড়া ভাবে আমাকে বল্লেন যে, 'আপনার জন্যেই যখন গ্রামে এই গোলযোগ, তখন আপনাকেই যেমন করে' হোক্ তিনদিনের মধ্যে টাকা আদায় করে' দিতে হবে ; নইলে সারা গ্রামের লোকেদের এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যে, তারা জীবনে কখনও ভুলবে না'।"

মন্দিরা বলিল, "সমস্ত শুনেও এই কথা বল্লেন ? কার দোষ তাও দেখলেন না ?"

"তা' ত নয়ই, আরও বরং সিঁড়ি দিয়ে আমি যখন নেবে আসছি, তখন আমাকে শুনিয়ে

বল্‌লেন যে, সহজে যদি না দেয়, তা' হ'লে মেয়ে-ছেলেদের ওপরেও অত্যাচার করতে তিনি কুণ্ঠিত হবেন না।"

মন্দিরা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ও মা কি সর্ব্বনেশে কথা গো! নতুন বড়মানুষ হয়েছে কি না, তাইতে এত তেজ!"

নীলকণ্ঠ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বড়মানুষ ত ভারী! ওর দাদামশয়ের বিষয় ছিল, তিনিই মরবার সময় উইল করে' দিয়ে গিয়েছেন। তাও আবার শুনতে পাই, আপন দাদামশায় নন, মায়ের জেঠা হতেন। তা' নইলে, ওর বাপ ষ্টীমারের টিকিট বেচত, নিজে পিসের বাড়ীতে খেয়ে মানুষ। দাদামশায়ের বিষয়ের দৌলতে আজ হয়েছেন জমীদার শশীভূষণ চাটুয্যে। একেই বলে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ আর কি!"

মন্দিরা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল; বলিল, "কি, কি নামটা বল্‌লে?"

"শশীভূষণ চাটুয্যে।"

মন্দিরা যেন একটু চঞ্চলভাবে বলিল, "কার নাম? এই নতুন জমীদারবাবুর নাম?"

"হাঁ।"

"পিসের বাড়ীতে খেয়ে মানুষ? বাপ ষ্টীমারের টিকিট বেচতেন বল্‌লে না?"

"হাঁ, কেন বল দিকি নি?"

"পাতলা ছিপছিপে মতন চেহারাটা?"

"হ্যাঁ, তবে খুব পাতলা নয়, মোটাও ঠিক নয়।"

"উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ?"

নীলকণ্ঠ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বাঃ, তুমি যে খাসা বর্ণনা আরম্ভ করে দিলে দেখ্‌ছি! একেবারে হুবহু বলে যাচ্ছ ত। চেন না কি বাবুকে?"

মন্দিরা দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল। অনেকদিন পরে তাহার মনের ভিতরকার একটা পুরাতন স্মৃতি আজ বড়ই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দুই

অনেকদিনের কথা। কল্যাণগঞ্জের জমীদার যোগেশবাবুর সাত বছরের মেয়ে মন্দিরা যেদিন গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইল, সেইদিন হইতেই তাহার পড়াশুনার ভার পড়িল শশীভূষণের উপর।

শশীভূষণ ছেলেটার শৈশবে মা মারা গিয়াছিল, পিতা ষ্টীমার কোম্পানীর ফেরি জাহাজে সামান্য একটী কর্ম্ম করিতেন। তাঁহাকে দিবারাত্রই জলের উপরবাস করিতে হইত, এক জায়গায় স্থির হইয়া কিছুদিন থাকিবার উপায় ছিল না; কাজেই ছেলেটীকে বাধ্য হইয়া কল্যাণগঞ্জে তাহার পিসেমহাশয় পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট রাখিতে হইয়াছিল। পীতাম্বর কল্যাণগঞ্জের জমিদারী সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং মেধাবী বলিয়া স্কুলের গুরুমহাশয় শশীভূষণকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু অত বড় দুরন্ত ও দুর্ব্বিনীত বালক কল্যাণগঞ্জের পাঠশালায় আর ছিল না; সেজন্য সময়ে-অসময়ে গুরুমহাশয় তাঁহার হাতের বেত্রখণ্ডটীর সহিত তাহার পৃষ্ঠের পরিচয় করাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

মন্দিরা যেদিন প্রথম পাঠশালায় আসিল, সেদিন গুরুমহাশয় শশীভূষণকে ডাকিয়া জানাইলেন যে, জমীদারের এই মেয়েটীকে যুক্তাক্ষরের বানান শিখাইতে হইবে।

শশীভূষণ নিজের জায়গায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নাম কি রে খুকী?"

"মন্দিরা।"

শশীভূষণ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "কি মন্দিরে রে? শিবমন্দিরে—না কালীমন্দিরে?"

নিজের নাম সম্বন্ধে সমালোচনা শুনিলে সকলেরই রাগ হয়; বিশেষতঃ, সাত বছরের মেয়ের। মন্দিরা রাগিয়া জিভ দেখাইল।

শশীভূষণ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল, "জিভ ভেঙচালি যে ?"

"বেশ করেছি।"

"বেশ করেছিস ? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।" বলিয়া তাহার কাণ ধরিয়া এক টান দিল।

প্রথম দিন পাঠশালায় আসিয়া এই অভ্যর্থনা-লাভ করিয়া মন্দিরা কাঁদিতে কাঁদিতে গুরু-মহাশয়ের নিকট নালিশ করিল।

গুরু ত্রিলোচন ঘোষাল শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কি সর্ব্বনাশ! বড়লোকের মেয়ে, জমীদারের মেয়ে, সবেমাত্র আজ স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে—তাহারই কি না কর্ণমর্দ্দন! খুব ভারী গলায় তিনি ডাক দিলেন, "শশে!"

শশীভূষণ একবার ভাবিল লম্ফ দিয়া পলায়ন করিয়া সম্মুখস্থ বাঁশবাগানে আশ্রয় লইয়া আত্ম-রক্ষা করে; কিন্তু কি ভাবিয়া তাহা না করিয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রিলোচন বলিলেন, "তুই জমীদারের মেয়ের কাণ মলে দিয়েছিস্ ?"

শশীভূষণ বলিল, "আমাকে মুখ ভেঙচালে কেন ?"

"বেশ করেছে মুখ ভেঙচেছে। তুই কাণ মলে দিতে গেলি কেন রে হতভাগা ? তুই আর ও সমান ? জানিস ও কে ?"

"কে আবার ?"

ত্রিলোচন দন্তপাটী বিকশিত করিয়া বলিলেন, "কে আবার ? জমীদারের মেয়ে রে বাঁদর! যার ভাত খেয়ে তোর পিসেমশায় আর তুই দিন দিন এতবড় ধাড়ী হচ্ছিস্।" বলিয়া পার্শ্বস্থ কঞ্চিটা তুলিয়া লইলেন।

গুরুমহাশয়ের কথাটা ভাল করিয়া না বুঝিলেও পর মুহূর্ত্তেই যে কি ঘটিবে, তাহা কঞ্চিটা দেখিয়া শশীভূষণের বুঝিতে দেরী হইল না।

সপাং সপাং করিয়া কয়েক ঘা তাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন, "যা', ফের যদি কোনদিন—"

মুখখানা খুব ভারী করিয়া, চোখ ফাটিয়া যে জলধারা বাহির হইতে চাহিতেছিল সেটাকে গোপনের চেষ্টায় শশীভূষণ সেখান হইতে আপনার জায়গায় আসিয়া বসিয়া একখানা বই খুলিয়া নিজের মুখের সম্মুখে ধরিয়া রহিল, কাহারও সহিত একটা কথা কহিল না।

তারপর পাঁচ-ছয়দিন দিন শশীভূষণ এমন গম্ভীরভাবে পড়াশুনা করিতে লাগিল যে, গুরুমহাশয়ও তাহার সুখ্যাতি করিলেন। কিন্তু তাহার এই গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে যে প্রতিহিংসা-বৃত্তিটাও গোপনে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহা কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই।

একদিন সে হঠাৎ অলক্ষিতে মন্দিরার দপ্তর হইতে একখানা বাঁধান ছবির বই বাহির করিয়া সম্পূর্ণ বিনা কারণে পাঠশালার প্রাঙ্গণস্থ এক হাটু কাদার উপর ফেলিয়া দিল।

পলায়মান শশীভূষণকে ধরিয়া আনিয়া গুরুমহাশয় কঠোরভাবে আদেশ দিলেন যে, আজ সারাদিন তাহাকে উঠানে নাড়ুগোপাল হইয়া থাকিতে হইবে।

তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ও পদদ্বয় প্রসারিত করাইয়া দুই হাতের উপর প্রকাণ্ড দুইটা ইষ্টকখণ্ড স্থাপিত হইল এবং গোষ্ঠ ও অভয়কে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া গুরুমহাশয় গৃহমধ্যে গেলেন।

কিন্তু এই দুরন্ত বালকটাকে নাড়ুগোপাল করিয়া রাখিবার ফলও তেমন আশানুরূপ হইল না। গুরুমহাশয় সবেমাত্র তাঁহার পায়াভাঙ্গা চেয়ারখানির উপর বসিয়াছেন, এমন সময়ে গোষ্ঠ ও অভয়ের কাতর চীৎকার শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, বৃহৎ ইষ্টক দুইখানি প্রহরী-যুগলের পদদ্বয়ে ফেলিয়া দিয়া শশীভূষণ অন্তর্হিত হইয়াছে। গোষ্ঠ ও অভয়ের পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

সন্ধ্যাবেলা স্কুলের ছুটী অন্তে মন্দিরা চাকরের সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় পার্শ্বস্থ ঝোপ হইতে হঠাৎ লাল টুকটুকে একখানা বই তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেদিকে চাহিবামাত্র ঝোপের ভিতর হইতে শশীভূষণ বাহির হইয়া বলিল, "এই নে রে মন্দিরে, তোর বই ফেলে দিয়েছিলাম, তুই আমার এইখানা নে। এতেও কত ভাল ছবি, ভাল গল্প আছে। ভারী ত তোর বই!"

মন্দিরা কোন কথা বুলিবার পূর্ব্বেই সে উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া অন্তর্হিত হইল।

পরদিন পাঠশালায় সবাই পরম বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, শশীভূষণ মন্দিরার শ্লেট লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহাকে অঙ্ক কসিয়া দিতেছে।

তিন

এমনি ভাবে ঝগড়া করিয়া, পড়াশুনা করিয়া এবং মন্দিরার পিতার কলমের বাগানের আম, লিচু এবং গোলাপজামের সৎ এবং অসৎ ব্যবহার করিয়া, খুব ঘনিষ্ঠতার ভিতর দিয়া শশীভূষণের কয়েকটী বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর একদিন গ্রামের সেই পাঠশালা হইতেই সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইল।

শশীর পিতা মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খবর পাইয়া পদ্মার তীরের কি একটা সহর হইতে পত্র লিখিলেন যে, ছেলেটী যখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন তাহাকে ইংরাজী লেখাপড়া শেখান নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই তিনি না কি ইঁহার কোম্পানীর বড়বাবুর অনেক খোসামোদ করিয়া স্থায়ীভাবে এখানে বদলী হইয়াছেন। স্থানটী বেশ ভাল, এনট্রান্স স্কুল আছে, ম্যালেরিয়া নাই এবং জিনিষপত্রও সস্তা।

শশীভূষণের পিসেমহাশয় পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর সে প্রস্তাবে অসম্মত হইবার কোন কারণই ছিল না; সুতরাং, তিনি অতি সহজেই তাহা অনুমোদন করিলেন। তারপর কয়েকদিন পরেই মহিমচন্দ্র পুত্রকে পদ্মার তীরে বদরখালি লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকালবেলা কলমের বাগানে একটা লিচু গাছের তলায় বসিয়া মন্দিরা একটী বাছুরের গলায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, এমন সময় পায়ের শব্দে চমকিয়া পিছনে ফিরিয়া দেখিল শশীভূষণ।

শশীভূষণ বলিল, "আমি আজ চলে' যাচ্ছি রে মন্দ্।"

"কোথায়?"

গতরাত্রে শশীভূষণ পিতার নিকট হইতে বদরখালির বর্ণনা শুনিয়াছিল; তাহা যথেষ্ট অলঙ্কৃত করিয়া জানাইল যে, সে যেখানে যাইতেছে, সেখানকার নদী বেত্রবতীর দশগুণ এবং তাহাতে দিনরাত লাল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি নানা রঙের নৌকা ভাসিয়া বেড়ায় এবং বড় বড় জাহাজ এক পার হইতে অন্য পারে দিনের মধ্যে ছত্রিশবার যাতায়াত করে।

বর্ণনাটা শুনিতে খুবই ভাল লাগিল; কিন্তু শশীভূষণ যে সত্যই চলিয়া যাইবে, এ কথাটা মন্দিরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না, কাজেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "যাঃ, মিথ্যেবাদী কোথাকার! ওঁকে নিয়ে যাবার জন্যে ত লোকের আর ঘুম হচ্ছে না।"

শশীভূষণ ততোধিক তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "তুই না বিশ্বাস করলি ত বড় বয়েই গেল। কাল সকালে উঠে আমাকে দেখতে পাস যদি, তখন বলিস।" বলিয়া গাছের সম্মুখের ডালটা নোয়াইয়া এক মুঠা লিচু ছিঁড়িয়া লইয়া বাগানের ক্ষুদ্র প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সে অদৃশ্য হইল।

সেইদিনই অপরাহ্ণে সে চলিয়া গেল।

শশীভূষণ চলিয়া গেলে কিছুদিন মন্দিরা বড়ই শূন্যতা অনুভব করিল। চাকরের সঙ্গে প্রত্যহ

নিয়মিতভাবে স্কুল যাইত বটে, কিন্তু পড়াশুনা করিতে কেমন যেন একটা বিরক্তি বোধ হইত। গোষ্ঠ ও অভয় অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন এই ছাত্রীটীর পড়াশুনার বিশেষ কিছু উন্নতি দেখিতে পাইল না, তখন তাহারা হাল ছাড়িয়া গুরুমহাশয়কে জানাইল যে, আর অধিক লেখাপড়া শিখিবার সম্ভাবনা উহার নাই। গুরু বলিলেন যে, যতটুকু হইয়াছে, আজকালকার বাঙ্গালীর মেয়েদের পক্ষে উহাই যথেষ্ট।

মন্দিরার তখন বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। পাত্রের বাছাই এবং দরের পরিমাণ লইয়া যখন কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন হঠাৎ কি একটা ব্যায়রামে সামান্য দিনকয়েক ভুগিয়া মন্দিরার পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরে দেখা গেল যে, সম্পত্তির চেয়ে ঋণের পরিমাণ অনেক বেশী। মেয়ের বিবাহ দেওয়ার সমস্যাটা তখন মন্দিরার মাতার কাছে একটা বিভীষিকার ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।

এমন সময় শোনা গেল যে, গুণাইগাছার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ছেলেটী বড়ই ভাল, ইংরাজী লেখাপড়া জানে, মাথার উপর অভিভাবক কেহই নাই, সুতরাং টাকার দাবী কম। গ্রামের মধ্যে যাহা জমীজমা আছে, তাহাতে পল্লীগ্রামের একটা গৃহস্থের সংসার বেশ স্বচ্ছন্দভাবে চলিয়া যায়।

ভবিতব্য খণ্ডন হইবার নয়; অতএব সেইখানেই মন্দিরার বিবাহ হইয়া গেল। আর শশীভূষণ হইয়া আসিল সেই গ্রামের জমিদার। ঘটনাটা যেমনই বিচিত্র, তেমনই চমৎকার বটে!

চার

টাকা না পাইলে গ্রামের লোকেদের বেশ করিয়া শিক্ষা দিবার যে প্রতিজ্ঞা শশীভূষণ গুণাইগাছা পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গেই জানাইয়াছিল, সেটা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে সে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিল না!

সেদিন নীলকণ্ঠ সবেমাত্র স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে উদ্ধব ঘোষের ছেলে আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া জানাইল যে, তাহাদের কালী গাইকে এইমাত্র কাছারীর পাইক আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে খাজনার টাকা শোধ করিলে তবে গরু ছাড়িয়া দিবে, নচেৎ নয়।

নীলকণ্ঠের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়াই তিনি উত্তেজিতভাবে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু কোন ফল ফলিল না—উদ্ধবের বাকী খাজনা, মায় সুদ সাড়ে পাঁচ টাকা নিজে দিয়া তবে তাহার গরু ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটার যবনিকা এখানেই পড়িল না। যাহাকে লইয়া এই ঘটনার সূত্রপাত, সেই পরাণ জেলে কয়েকদিন পূর্ব্বে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিবামাত্র কাছারীতে তাহার তলব হইল, এবং তাহার প্রতি আদেশ হইল যে,তাহার ঔদ্ধত্যের দণ্ডস্বরূপ তাহাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হইবে এবং কাছারীর উঠানে নাকে খৎ দিয়া ধরণী ঘোষালের কাছে ক্ষমা চাহিতে হইবে। এ ব্যাপার লইয়া সে যদি পুলিস কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘর ত দেখিতে পাইবেই না, স্ত্রী-পুত্রের সন্ধানও হয় ত না মিলিতে পারে। তাহাকে টাকা সংগ্রহের জন্য দুইটী দিন মাত্র সময় দেওয়া হইল।

পরাণ আসিয়া নীলকণ্ঠের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। সমস্ত শুনিয়া তাঁহার মাথার ভিতর যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তিনি তৎক্ষণাৎ কাছারীবাড়ী ছুটিলেন। শশীভূষণ তখন ফরাসে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছিল। নীলকণ্ঠ পরাণের সাংসারিক অবস্থা বিবৃত করিয়া জানাইলেন যে, পঞ্চাশ টাকা ত দূরের কথা, পাঁচ টাকা দিবার সামর্থ্যও সে ব্যক্তির নাই।

ধরণী ঘোষাল বাবুর গুড়গুড়িতে কলিকা বদল করিয়া দিয়া একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যাহারা ছিল সবাই হাসিল।

একটা গুরুতর ব্যাপারের সঙ্গে এতগুলি লোকের হাসির সম্বন্ধ কি, তাহা নীলকণ্ঠ হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না।

শশীভূষণ বলিল, "আপনিই ত পরাণ জেলের মস্ত পৃষ্ঠপোষক। তার অবস্থা যদি ভাল না হয়, বেশ ত, টাকাটা আপনিই দিয়ে দিন না।"

নীলকণ্ঠের সর্ব্বশরীর আবার জ্বলিয়া উঠিল; বলিলেন, "তা' দিয়ে দিতাম, যদি জানতাম যে, আপনার জুলুমের শেষ এইখানেই।"

শশীভূষণ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "জুলুম! জুলুম ত এখনও কিছুই করি নি। পোস্তাগাড়ীর মিত্তিররা আমার সঙ্গে চালাকী করতে গিয়েছিল—তাদের ভিটের চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখি নি। সেই ভিটে ভেঙ্গে সেখানে একটা থিয়েটারের ষ্টেজ তৈরী করে দিয়েছি। কেবল পরাণ জেলে নয়, আপনিই ত হলেন আমার প্রধান মক্কেল।" বলিয়া আবার হাসিল।

ধরণী ঘোষাল বলিলেন, "পরাণের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়েছে বলে' ভাববেন না মুখুয্যে-মশায় যে, আপনারও এই পঞ্চাশে মিটবে।—" বলিয়া বাবুর দিকে আবার চাহিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিল।

নীলকণ্ঠের তখনও সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে; বলিলেন, "টাকা না দিলে?"

"সে ত পরাণকে বলা হয়েছে।"

"আমারও ত সেই ব্যবস্থা?"

উত্তর দিল ধরণী ঘোষাল। তিনি বলিলেন, "বাবুর ব্যবস্থায় উচ্চ-নীচ প্রভেদ পাবেন না মশায়। সবাই ওঁর কাছে—"

নীলকণ্ঠ বলিল, "অর্থাৎ, আমার যা' জরিমানা করবেন, তা' যদি আমি না দিই, তা' হ'লে আমারও ভিটের চিহ্ন থাকবে না এবং আমার যখন ছেলেমেয়ে নেই, আছে কেবল এক স্ত্রী,—তখন তাকেও হয় ত খুঁজে পাওয়া যাবে না—কেমন, এই ত কথা?"

বাবু উত্তর না দিয়া নল টানিতে লাগিলেন। ধরণী ঘোষাল হঠাৎ একখানা পাখা লইয়া বাবুকে বাতাস করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠ ঝড়ের মত বাহির হইয়া আসিলেন।

পাঁচ

রাত্রি একেবারে নিশুতি না হইলেও বোধ হয় এগারটার কম হইবে না। লোকজন সব চলিয়া গিয়াছে; শশীভূষণ নিজের ঘরে বসিয়া অনেক কথাই ভাবিতেছিল। রাগের মাথায় যে খুব একটা রূঢ়কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে এবং তাহার ফলে অত্যাচার যতই প্রবল হোক্, সারা গ্রামে যে একটা অশান্তির আগুন বেশী করিয়াই জ্বলিবে, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

এমন সময় একটা তের-চোদ্দ বছরের ছেলেকে সঙ্গে করিয়া কাছারীর প্রধান পাইক নন্দ বাগ্দী বাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটি বলিল, "আমাদের মা-ঠাকরুণ এসেছেন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

শশীভূষণ চমকিয়া উঠিল। এই কয়দিনে তাহার যে সুনাম গ্রামের মধ্যে রটিয়াছে, তাহাতে কেহ যে স্বেচ্ছায় তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে, এটা যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার। তার উপর এই রাত্রিকালে—মা-ঠাকরুণ!—স্ত্রীলোক!

নন্দ বাগ্দী ছেলেটীকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শশীভূষণ ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমার মা-ঠাকরুণ?"

"আজ্ঞে হুজুর, নীলকণ্ঠ মুখুয্যে-মশায়ের পরিবার।"

বিস্ময়ে শশীভূষণের চক্ষু কপালে উঠিল! বলিল, "আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?—কেন?—না, না, কোন ভুল হয় নি ত?—কোথায়?"

"আজ্ঞে, বাইরে বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

"সঙ্গে আর কে?"

"আজ্ঞে, আমি ছাড়া আর কেউ নেই।"

কৌতূহল দমন অসম্ভব হইয়া পড়িল। শশীভূষণ উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ভাবিল, গ্রামের কোন বদমায়েস লোকের ষড়যন্ত্র নয় ত? ভাবিয়া, পিস্তল ও ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চটা পকেটে লইল। চটি জুতা পায়ে দিয়াই বাহিরে আসিল।

কাছারীর দরজার একটু দূরেই বাঁধানো বটগাছ। তাহারই সম্মুখে একটা সাদা কাপড় ঢাকা মূর্ত্তি দেখা গেল। শশীভূষণ বিহ্বলের মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরার মুখ ঘোমটায় ঢাকা, সর্ব্বাঙ্গ একটা মোটা চাদরে আবৃত। শশীভূষণ সম্মুখে আসিবামাত্র সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই বলিল, "আমার স্বামীকে আপনি বলেছেন যে, টাকা না পেলে আপনি না কি স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার করতেও ছাড়বেন না।"

এত কঠিন, অথচ সত্য কথা শশীভূষণ কোন দিন শোনে নাই। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

মন্দিরা বলিল, "টাকা পেলে আপনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন বলতে পারেন? আর কখনও এদিকে নিজের মুখ দেখাবেন না?"

সেবারেও শশীভূষণের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অথচ কাছারী-ঘরের মধ্যে যদি কোন পুরুষ সেই কথাগুলি বলিত, তাহা হইলে তাহার এতক্ষণ বোধ হয় সোজা হইয়া বসিবার সামর্থ্য থাকিত না। কিন্তু এ কি নিষ্ঠুর সত্যের তীব্র কষাঘাত!

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা ক্ষুদ্র পুঁটলি বাহির করিয়া মন্দিরা শশীভূষণের পায়ের কাছে রাখিল; বলিল, "আপনার কত টাকার দরকার তা' আমি জানি না, জানতেও চাই না। কিন্তু আমার যা' কিছু ছিল, আমার গায়ের সমস্ত গয়না এই পুঁটলিতে আছে। এগুলো বিক্রী করলে কত টাকা হবে, তা' আমার জানা নেই; কিন্তু দোহাই আপনার, আপনি চলে যান। এ গাঁয়ে আর জীবনে কখনও আসবেন না—এভাবে আর নিজের মুখ দেখাবেন না।"

শশীভূষণকে কথা কহিবার আর অবকাশ না দিয়া মন্দিরা চলিয়া গেল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শশীভূষণ ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চের বোতাম টিপিল। উজ্জ্বল আলোতে দেখা গেল যে,—একটা নারীমূর্ত্তি চলিয়া যাইতেছে; তাহার পশ্চাতে সেই ছেলেটী।

সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে যেন আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প বলিয়া মনে হইল। এ কি কাণ্ড! বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েছেলে, গৃহস্থের বধূ, এই রাত্রিকালে পল্লীগ্রামে,—বিশেষতঃ, অত্যাচারী জমিদার বলিয়া তাহার যেরূপ নাম এই কয়দিনেই রটিয়াছে, তাহাতে কি দুঃসাহসে এই অপরিচিতা নারী নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাভরণা করিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার তাহার হাতে অসঙ্কোচে সমর্পণ করিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সমস্ত দম্ভ, সমস্ত অত্যাচারকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল! এ কি দুর্জ্ঞেয় রহস্য!

নন্দ বাগ্দী ফটকের কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। মনিব তখনও সেই অন্ধকার গাছতলায় একাকী দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন লইয়া আসিল।

শশীভূষণ তাহাকেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "নীলকণ্ঠবাবুর পরিবারকে জানিস্?"

বাবুর নিকট এ প্রশ্নটা সে আশা করে নাই। নীলকণ্ঠকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত। একবার ইচ্ছা হইল বলে যে, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না, কিন্তু ভয়ে সেকথা মুখ দিয়া বাহির হইল না; বলিল, "আজ্ঞে, জানি বৈকি হুজুর। মস্তবড় লোকের মেয়ে। তেনার বাবার মত মানুষ এককালে এ দিগরে আর ছিল না বল্‌লেই হয়।"

মস্ত বড়লোকের মেয়ে! শশীভূষণ ঈষৎ হাসিল; ভাবিল, তাই এতখানি স্পর্দ্ধা দেখাইয়া তাহাকে অপমান করিয়া চলিয়া গেল।

নন্দ বলিতে লাগিল, "আমার বাবা ত তাঁদেরই খেয়ে মানুষ হুজুর। বাঁড়ুয্যে-মশায় আমাকেও বলেছিলেন যে, 'নন্দ, চাকরী যদি করিস্—'আহা, হঠাৎ মারা গিয়েই ত সব ছন্ন-ছাড়া হয়ে গেল কি না!"

শশীভূষণ বলিল, "ও, এই গাঁয়েরই মেয়ে বুঝি? কার মেয়ে রে?"

"আজ্ঞে না হুজুর, এ গাঁয়ের নয়; ওই যে ওধারে কল্যাণগঞ্জ গাঁখানা, সেখানকার যোগেশ বাঁড়ুয্যে-মশায় জমীদার ছিলেন—"

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত পুরাতন স্মৃতিটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কল্যাণগঞ্জ!—যোগেশ বাঁড়ুয্যে তাঁর মেয়ে! তবে এ কি সেই মন্দিরা? সেই ছেলেবেলাকার মন্দু! সে ছাড়া আর কে হইতে পারে? যোগেশবাবুর ত আর কোন ছেলেমেয়ে ছিল না।—তবে নিশ্চয়ই সেই। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে পড়িল, সেই আম বাগান, লিচু বাগান, ত্রিলোচন পণ্ডিতের পাঠশালা! তাহার গায়ের ভিতর যেন যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল।

পুঁটলিটা তুলিয়া লইয়া নন্দ বাদ্দীকে বলিল, "লণ্ঠনটা নিয়ে শাগ্‌গির আয় আমার সঙ্গে।"

পরদিন সকালে গ্রামের লোক সবিস্ময়ে শুনিল যে,—হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় জমীদারবাবু শেষ রাত্রেই রওনা হইয়া গিয়াছেন। ধরণী ঘোষাল বলিতে লাগিল, "আমিও কালকে সন্ধ্যানাগাদ-চলে যাচ্ছি। বড় তরফের রায়বাবুরা বেশী মাইনে দিয়ে আমাকে খোসামোদ কচ্ছেন; এসব ছোট-খাট জমীদারের চাকরী করা কেবল ঝকমারী ছাড়া আর কিছু নয়।"

—চাকরীর উমেদারী—

শ্রীঅজিতকুমার সেনগুপ্ত

এক

পতাকায় মাল্যে সুশোভিত মস্তবড় গেট-ওয়ালা দ্বিতল সুন্দর বাড়ী প্রভাত শিশির কিরণে উদ্ভাসিত এবং উল্লাসে মত্ত হইয়া আশে-পাশের কুঁড়ে ঘরগুলির প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। বাড়ীতে লোকের বেশ একটুকু সোরগোল উঠিয়াছে—হ্যাঁ, ডাক একটু জোরেই উত্থিত হইতেছে। তিন দিন পরই বাড়ীর কর্ত্তার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। বাপের এই সর্ব্বকনিষ্ঠ মা-মরা আহ্লাদের পুত্রটির বিবাহে 'রিটায়ার্ড' ধনবান পিতা একটু বেশী রকমের খরচ করিবেন,—তাই আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বড় দুই চাকুরে ছেলেও ইহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সকলেই বাড়ীতে উপস্থিত। অনেকদিনের দরিদ্র অপরিচিত আত্মীয়ের দল আসিয়া অতিকষ্টে নিজেদের পরিচয় দিয়া বাড়ীতে ঠাঁই লইয়াছে। এখনও সকল আত্মীয়েরা আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

একটি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী গড়গড় করিয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী থামিবার শব্দে বীণা তাহার বন্ধুবান্ধবদের লইয়া হাস্য-গল্পরতা অবস্থায় জানালার ফাঁক দিয়া পুঁটলীহস্তে সাধারণ পোষাকে একটি যুবককে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিদ্রূপের ভাবেই চোখ ফিরাইয়া লইল। কলেজের ছাত্রী বীণা মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছে ভবিষ্যতে সে একজন বড় স্কলারের স্ত্রী হইবে; তাহার এ দরিদ্রতাকে তাচ্ছিল্যের সহিত বিদ্রূপ না করিলে চলিবে কি করিয়া।

"এ বাড়ীতে দিন দিন কোত্থেকে কতগুলো ভূত এসে জমছে,—কিবা চেহারা, কিবা ভাষা, পুরাদস্তুর 'ইডিয়ট্' বলিয়াই বীণা তাহার বন্ধু-বান্ধবসহ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

মাধবী বীণার খুড়িমা। বীণার কথার শেষ দিক্‌টা শুনিয়া তাঁহার দরিদ্র মামার কথা মনে হওয়ায় তিনি বীণার ঘরের সুমুখে থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর জোর করিয়া মনের ব্যথা-টাকে চাপিয়া আপন কাজে চলিয়া গেলেন। মাধবী এ বাড়ীতে দরিদ্র আত্মীয়দিগের প্রতি খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার হইতেছে দেখিয়া মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, তাই বীণার কথা শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। যুবকটি বিদ্রূপাত্মক হাস্য-ধ্বনি শুনিয়া একবার চোখ তুলিয়া উপরের জানালার দিকে তাকাইল, তারপর আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল।

বৈঠকখানা ঘরে একজন বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে শায়িত; আরও দু'-চারজন প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ইজিচেয়ার এবং অন্যান্য চেয়ারে বসিয়া কেহ বা কথা কহিতে-ছেন, কেহ বা চোখ বুজিয়া হুঁকার নলটা মুখে দিয়া আরামে টানিতেছেন ও মাঝে মাঝে শুধু 'হ্যাঁ' 'না' বলিয়া সকলের কথার জবাব দিতেছেন। লম্বা জুলফি-কাটা আধুনিক বাবু পোষাকে দুই-একজন যুবকও হাফসার্ট গায়ে ফরাসের উপরে বসিয়া আছেন। বিবাহে কি কি খরচ করিতে হইবে, তাহার তালিকা ও কাহাকে কি কাজের ভার দেওয়া হইবে তাহাই তাহাদের সম্পাদ্য

বিষয়। পুঁটুলি হস্তে অপরিচিত যুবকটি ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের আলোচনা একটু থামিল। বৃদ্ধের দল যুবকের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইলেন,আর লম্বা জুলফি-কাটা বাবুরা তাহার দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলিয়া চোখ ফিরাইলেন।

বৃদ্ধ কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ?"

যুবকটি বৃদ্ধের হাতে একখানি পত্র দিল। তাহার উপরে লেখা ছিল 'বড় মামা'। বৃদ্ধ সম্মুখের টেবিলের উপর হইতে চস্‌মাটা চোখে আঁটিয়া চিঠিখানা পড়িয়া বলিলেন—"তুই ত আমাদের আন্নার ছেলে কুটু, এতবড় হয়েছিস্, আন্না কেমন আছে ? সে আসে নি কেন ?"

যুবক বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া খামে আঁটা আর একখানা চিঠি দেখাইল। বৃদ্ধ তাহার বড় মেয়ের নাম দেখিয়াই বলিলেন—"তোর বড় মাসীমার চিঠি।" বৃদ্ধ তাহার বড় মেয়েকে ডাকিয়া কুটুকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বলিলেন।

কুটুর মামারা সকলেই প্রাতঃভোজন সমাপন করিয়া মাত্র পাণ মুখে দিতেছিলেন। কুটুর মাসীমা তাঁহাদের সঙ্গে কুটুর পরিচয় করাইয়া-দিলেন। কুটু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল। তাঁহারা বড়লোকী মেজাজে কুটুর দিকে যেন না তাকাই-য়াই তাহার প্রণাম গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন —"ও আন্না দি'র ছেলে কুটু।"

প্রথম পরিচয়ের সম্ভাষণটুকু কুটুর কাছে অদ্ভুত ও অপমানজনক ঠেকিল। সে কিছু না বলিয়া তাহার বিনিদ্র ক্লান্ত দেহ লইয়া পুঁটুলিটি পাশে রাখিয়া একটা চৌকিতে বসিল। তাহার কুশল-সংবাদ কেহ জিজ্ঞাসা না করায় সে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। পত্র পড়া শেষ হইলে বড় মাসীমা হাসিয়া বলিলেন—"ওরে, আন্না লিখেছে, কুটুর একটা বধা তোরা করে দিবি। আরও লিখেছে, তোদের ছাড়া কুটুকে নিয়ে আন্না কোথায় দাঁড়াবে।"

এই বলিয়াই বড় মাসীমা কুটুর দিকে একটা কৃপার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মামারা সকলেই বলিলেন—"চাক্‌রী কি সোজা জিনিষ। তবে আমাদের কাছে থাকলে যা'হয় একটা কিছু করে' দেওয়া যাবে ; তাতেও যথেষ্ট খাট্‌তে হবে।"

তাঁহাদের কথা হ'তে কুটু জানিল একজন চা বাগানের হেড্ ক্লার্ক এবং বড় মামা পাটের অফিসের পারচেজার। আর সর্ব্বকনিষ্ঠ মাতুল দুইবার মেট্রিকুলেশনে অকৃতকার্য্য হইয়া এখন একটা টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়িতেছে। কুটুর মা কুটুকে কিছুই না বলিয়া এরূপ মামাদের কাছে তাহার চাক্‌রীর জন্য লিখিয়াছে জানিয়া মনে মনে একটু লজ্জিত হইল, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ-করিল না। যিনি পাটের অফিসের পারচেজার সেই বড় মামা কুটুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইংরেজি-টিংরেজি তোর কিছু জানা আছে ? কিরে ?" সে মৃদুকণ্ঠে সুধু সায় দিল—"হাঁ, আছে।"

তখনই 'দিদি' 'দিদি' বলিয়া একটি লম্বা জুলফি-কাটা যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"একটা লোকের দরকার। কতগুলো জিনিষ আন্‌তে হবে, আমার একার দ্বারা পোষাবে না।"

যুবকটি তখন "আপনার নাম বুঝি কুটুবাবু ?" এই ভূমিকা করিয়া কুটুকে তাহার অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করিল। এ অভদ্রোচিত ইঙ্গিতে কুটু বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া কিছু না বলিয়া সুধু বড় মাসীমার দিকে তাকাইল।

বড় মাসীমা বলিলেন, "এস গে বাবা, সে যখন বল্‌ছে।"

যুবকটি আবার বলিল—"একটু তাড়াতাড়ি ; দেরী সইছে না, চলুন।"

কুটু তাহার ক্লান্তদেহ লইয়াও লজ্জায় বলিল না—তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। কেবল তাহার

পুঁটলিটির দিকে একবার তাকাইল। "তোর কাপড়গুলো রেখে দিচ্ছি—তোর ভয় নেই। তা' ছাড়া, নেবেই বা কি" বলিয়া বড় মাসীমা ডাকিলেন—"ভুটিয়া।"

একটি ছেলে আসিয়া তাহার পুঁটলিটা লইয়া গেল। কুটু অত্যন্ত অন্যমনস্কের মত উঠিয়া সবেমাত্র সে যুবকটির অনুগমন করিবে, মাধবী সে ঘরেই এতক্ষণ কাজ করিতেছিলেন, বলিলেন—"দিদি, ওর বোধ হয় কিছু খাওয়া হয় নি, ও খেয়ে নিক, অন্য কাউকে পাঠান।"

বড় মাসীমা যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াই বলিলেন- "তুই বুঝি কিছু খাস্ নি? খেয়ে নে, অন্যলোক পাঠাচ্ছি।"

মাধবী কুটুর বড় মাসীমার দিকে একবার কটমট্ করিয়া তাকাইলেন, তারপর কুটুকে বলিলেন—"চল, কল দেখিয়ে দিচ্ছি, হাত-মুখ ধুয়ে এসো, তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

শৈশবে পিতৃহারা আন্না মামার সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছিল। আন্নার বিবাহ দিয়া বৎসর দুই-তিনের মধ্যেই মামা তাহার কর্ম্মস্থলে সংসার পাতিলেন। গ্রামের বাড়ীতে কেহই রহিল না। বিবাহের পর আন্না তাহার দিদির কাছে চিঠি লিখিত, উত্তরও মাঝে মাঝে আসিত। কিছুদিন পর যখন উত্তর আসিল না, আন্নারও চিঠি লেখা শেষ হইল। প্রায় বিশ বৎসর যাবত আন্না তাহার মামা ও মামাতো ভাইদের কোনও খবর পায় নাই। তবে আন্না লোকমুখে শুনিয়াছে যে, তাহার মামাত ভায়েরা মোটা মাহিনার চাকরী করে। তাই সে আজ কুটুর একটি চাকরীর জন্য তাহাদের লিখিয়াছে। সে লিখিয়াছে, কুটু লেখাপড়া শিখিয়াছে, কিন্তু কিছুই উপায় এখনও হয় নাই, ইত্যাদি। কিন্তু কুটু কি পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, সে কথা আন্না লিখে নাই।

কুটুর থাকিবার জায়গা ঠাকুর-চাকর থাকিবার ঘরের পাশে ছোট্ট একট নোংরা কামরা নির্দ্দিষ্ট হইল। সারি বাঁধা একটি এক-তোলা দালান চলিয়াছে, তাহারই ছোট ছোট কোঠাগুলিতে অনেক দরিদ্র আত্মীয় ও চাকর-বাকরের থাকিবার যায়গা। বাড়ীটি ভাড়াটে। 'রিটায়ার্ড' কর্ত্তা কিছুদিন হইল কর্ম্মত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। তাহার নিজের বাড়ী এখনও প্রস্তুত হয় নাই, তাই এ ভাড়াটে বাড়ীতেই তিনি আপাততঃ আছেন। বীণা হোষ্টেল ছাড়িয়া মাসখানেক যাবত এ বাড়ীতে আসিয়াছে। সে কলেজে পড়ে। তাহার জানাশুনা কয়েকটি মেয়েও নিমন্ত্রিত হইয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছে।

আহারান্তে একটু বিশ্রামের জন্য কুটু ভুটিয়ার সঙ্গে তাহার থাকিবার ঘরে চলিয়া গেল।

দুই

বীণা কলেজের ছাত্রী, একটু সাহেবী মেজাজ। ঝি-চাকর তাই তাহার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। তাহার কাজের একটু ত্রুটি হইলেই সর্ব্বনাশ!

নম্র অল্পভাষী কুটুর সহিত বীণার আলাপ হইয়া গিয়াছে। বীণা কুটু হইতে তিন-চার বৎসরের ছোট হইলেও কুটুকে 'কুটু' ও 'তুই' বলিয়া ডাকিয়া তাহার কলেজে পড়ার সম্মানটুকুকে অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে। কুটুর নতচক্ষে ও বিনা বাক্যব্যয়ে কাজ করা বীণার নিকট তাহার গৌরবটুকুকে বাড়াইয়া দিয়াছে। সাধারণ গ্রাম্য যুবক কুটু কোন্ সাহসে বীণার চোখের দিকে চাহিয়া কথা বলিবে। সে তাই ভাবিয়া কুটুকে দিয়া তাহার অনেক কাজ করাইয়া থাকে। কুটুর কাজে সন্তুষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে সে তাহার পিতাকে বলিয়া কুটুর জন্য একটি চাকরি করিয়া দিবে বলিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে চাহিত, কিন্তু কুটু একটুও উৎসাহিত না হইয়া বরং মৃদু হাসিয়াই অন্যত্র চলিয়া যাইত।

প্রায় সন্ধ্যাবেলা কয়েকটা জিনিষ কিনিয়া আনিয়া কুটু সোজা বীণার পড়িবার

ঘরে চলিয়া গেল; কারণ, বীণার সেইরূপই আদেশ ছিল। সেখানে বীণাকে না দেখিয়া কুটু জিনিষগুলি টেবিলের উপরে রাখিয়া বীণাব অপেক্ষায় তাহার সেক্সপীয়রের একটা পড়ার বই দেখিতে লাগিল। তখনই বীণা সদলবলে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুটু বই হইতে মুখ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। 'এসেছিস' বলিয়া বীণা জিনিষগুলি দেখিতে লাগিল।

"কুটু বাবু যে" বলিয়া সেই লম্বা জুল্‌ফি-কাটা যুবকটি বীণার করমর্দ্দন করিল। তারপর বলিল—"কি জিনিষ দেখি।"

"কি দেখবেন। এ যে বুদ্ধি করে' এনেছে, এই যথেষ্ট।" বলিয়া বীণা হাসিয়া উঠিল।

"আমায় দিলে দেখতেন কত ভাল গিয়ে আসতুম।"

বীণা—"না, ভদ্রলোককে কষ্ট দেওয়াটা উচিত নয়।"

"দেখুন ত কুটুবাবু, এ ব্রুচটি যে দিয়েছি, তা' কত সুন্দর!" বলিয়া সেই যুবকটি কুটুর দিকে চাহিল। ব্রুচটির দিকে তাকাইয়া কুটু একটু মৃদু হাসিল; সে হাসি বোধ হয় ইহাই প্রকাশ করিতেছিল যে, ব্রুচটি তেমন সুন্দরও নয়, দামীও নয়। হাসি দেখিয়া যুবকটি বিদ্রূপের দৃষ্টিতে কুটুব দিকে তাকাইয়া রহিল।

বীণা জিনিষগুলি একটু গুছাইয়া রাখিয়া কুটুকে বলিল—"কুটু, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? নীচে যে কাজ যথেষ্ট। পড়তে চাস্, আরব্য উপন্যাসটা দেব'খন, পড়ে দেখবি, বেশ সুন্দর গল্প আছে।"

বীণা সেই যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিল, "কুটুকে যে বড় কুটুবাবু বললেন?" তারপর উপেক্ষার সহিত সে আবার কহিল—"কতগুলো সব 'ইডিয়ট' এসে জুটছে।"

কুটু ততক্ষণ নীচে চলিয়া গিয়াছে। বীণার কথার শেষ দিক্‌টা তাহার কাণে পৌঁছিয়াছিল কি না বলা যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই যে গান পঞ্চম সুরে চলিল, তাহা কুটুর অগোচর রহিল না।

সেদিন এদিক্-ওদিক্ যাওয়া-আসায় কুটুর খাওয়ার সুবিধা হয় নাই। মামারা তাহাকে অন্যত্র যাইতে বলিয়া আহার করিয়াছেন, তাহা সে নিজ-চক্ষে দেখিয়া গিয়াছে। বাহির হইতে সকল কাজ সারিয়া সে যখন বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তখন রাত্রি প্রায় বারটা। বাবুরা তখন নিজ নিজ কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। বাড়ীর প্রায় সকলেরই আহার হইয়া গিয়াছে। বাড়ীটি নিস্তব্ধ; লোক-জনের কোলাহল মোটেই নাই; তবে রান্নাঘর হইতে তখনও ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। ক্ষুধার্ত্ত কুটু নিজের প্রতি অন্যায় অবিচারের কথা ভুলিয়া সোজা রান্নাঘরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বড় মাসীমা 'ভুটিয়া ভুটিয়া' বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। ভুটিয়ার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া রান্নাঘরের দিকে তাহাকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন—"কে রে?"

উত্তর হইল—"আমি কুটু।"

"আয় ত বাবা, সে দুষ্ট ছোঁড়াটা কোথায় গিয়েছে। আয়, আমার এ কাজটা করে যা' দিকিন।"

ক্ষুদায় ক্লান্ত কুটু এ অপ্রত্যাশিত কাজের আদেশে খুব বিরক্তিভাবেই ফিরিয়া দাঁড়াইল। মাধবী কুটুর অপেক্ষায় রান্নাঘরে বসিয়াছিলেন। তিনি তখনও পর্য্যন্ত আহার করেন নাই। একজন দরিদ্র নিরীহ শান্তস্বভাবের আত্মীয়কে অভুক্ত রাখিয়া তিনি আহার করেন কি করিয়া। তিনি ত আর কলেজের পাশকরা মেয়ে নন যে, তাহাতে তাঁহার সম্মানে আঘাত করিবে। এ অসময়ে ক্ষুৎপীড়িত অল্পভাষী ছেলেটিকে কাজের

আদেশ দেওয়ায় মাধবী বলিয়া উঠিলেন—"কুটু এখনও খায় নি, খেয়ে নিক্।"

"তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একটু পরে খেলে ত আর খাওয়ার সময় বয়ে যাচ্ছে না। আমার কথার ওপর কথা। এস বাবা, এই ত পাঁচ মিনিটের কাজ।"

মাধবী চুপ করিয়া গেলেন। কথা কহিয়া সে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে একটা তুমুল কাণ্ড বাঁধাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কুটু বুঝিল চাকর ভৃত্য পর্য্যন্ত আহারান্তে বেশ আরামে নিদ্রা যাইতেছে, আর তাহার ভাগ্যে এখনও খাওয়া জুটে নাই। নিদ্রা ও ক্ষুধার তাড়নায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; তবু সে কিছুই না বলিয়া বড় মাসীমার নিকটে গেল। ভাঁড়ারঘরের মোটগুলি ঘরের মধ্যখান হইতে একদিকে সরাইয়া রাখিয়া সে দুই-তিনজন মহিলার জন্য বিছানার যায়গা করিয়া আসিল। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটা।

এ টানা-হেঁচ্ড়াতে তাহার শরীর খুব অবসন্ন হইয় পড়িল। এই অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাহার মাসীমা একটি কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাহিনার চাক্‌রী তাহাকে নিশ্চয়ই করিয়া দিবেন, এই কুটুর আশা। কিন্তু কার্য্য শেষ হইলে বড় মাসীমা যে তাহাকে একবারও আহার করিতে যাইতে আদেশ করিলেন না, তাহা ক্ষুধার্ত্ত কুটু লক্ষ্য করিল।

বিশ্রামের আশায় কুটু আহার করিবে না ভাবিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মাধবী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন—"যাচ্ছ কোথায়? খেয়ে যাও।"

"কেমন যেন খিদে নেই, আজকে আর খাব না" বলিয়া কুটু মাধবীর দিকে তাকাইল। মাধবী তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিতেই বুঝিলেন, তাহার ক্ষুধা আছে কি নাই। তিনি বলিলেন—"সে কি হয়, চল।"

বড় মাসীমা হাঁকিয়া বলিলেন—"বৌয়েরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, কাল্‌কে সকালেই উঠ্‌তে হবে।"

মাধবী তাহার কথায় কোন সায় না দিয়া শুধু মৃদুস্বরে বলিলেন—"এ বাড়ীর লোকগুলো এমনিই ছোটলোক।"

মাধবীর আদরে বাড়ীর বিধবা মায়ের কথা মনে হওয়ায় কুটু হয় ত একবার ভাবিয়া দেখিল তাহার মায়ের মামাত ভাই-বোন্‌দের আদর-যত্ন কতখানি প্রবল! তাহার খাওয়া-নাওয়া হইল কি না সে খবর এখানে এক মাধবী ছাড়া আর কেহই লন না; কারণ, সে যে এখানে ঠাকুর চাকরদের মতই বাবুদের অনুগ্রহপ্রার্থী।

তিন

বিবাহ ও ভোজ দুই-ই শেষ হইয়া গিয়াছে; আজ সকলেই একটু আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়াছে। ভোরবেলা বাড়ীর যুবকেরা চেয়ারে বসিয়া গল্প করিয়া ও সিগারেট্ টানিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছে। লম্বা জুলফি-কাটা যুবকটি, অর্থাৎ, বীরেন, কুটুর কনিষ্ঠ মাতুল ও অন্যান্য অনেকেই সেই স্থানে উপস্থিত। এ কয়দিন প্রত্যেক কাজে বীরেন কুটুর একটা-কিছু ত্রুটি ধরিয়া তাহার দিকে চক্ষু রাঙ্গা করিয়া তাকাইয়াছে, কিন্তু সে তাহাতে মৃদু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বীরেন তাহাতে তাহার প্রতি বেশ একটু বিরক্ত; তাই টেবিলের উপরে পা দু'টা কুটুর মুখের দিকে সোজা করিয়া রাখিয়া মাঝে মাঝে তাহার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটা বিজ্ঞতার হাওয়া ছড়াইয়া দিয়া কুটুর কনিষ্ঠ মাতুলকে বলিল—"প্রোফেসার রমণ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। কি মাথা ভাই,—ইণ্ডিয়ান ওশেনের তরঙ্গ দেখে, আলোকের তরঙ্গ আবিস্কার করেছেন। তারই নাম রমণ এফেক্ট্।"

বীরেনের কথা শুনিয়া কুটু হাসিয়া উঠিল।

বীরেন তিক্তকণ্ঠে বলিল—"তুমি কি জান যে, হেসে উঠলে।"

ছোট মাতুল বীরেনকে বলিল—"ওর কথা ধরিস্ কেন?" তারপর কুটুর দিকে চাহিয়া সে বলিল—"কুটু না জেনেশুনে ভদ্রলোকের কথার উপর হাসা অত্যন্ত অভদ্রতা।"

কুটু নিঃশব্দে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। বড় মাসীমার আদেশ পালন করিয়া স্নান সারিয়া যখন সে বাড়ী ঢুকিল, তখন বেলা প্রায় এগারটা। আজ বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগের খাওয়া বেলা এগারটার সময়েই সম্পন্ন হইবে। তাই সে সেই সময় বাড়ীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল। সম্মুখের ঘরেই দেখিল মামারা, বৃদ্ধের দল ও কয়েকটি সৌখীন যুবক বসিয়া আছেন। একটি যায়গা তখনও খালি পড়িয়া রহিয়াছে। একটু এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া যখন কুটু দেখিল প্রায় পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত যায়গাটা খালিই পড়িয়া আছে, তখন সে কাহারও আহ্বানের অপেক্ষা না রাখিয়া সে যায়গায় বসিবার জন্য ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মামারা বা যুবকদের মধ্যে কেহই এতক্ষণ তাহার দিকে চোখ তুলিয়া চাহেন নাই। তাহাকে এখন ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কুটুর দ্বিতীয় মাতুল ডাকিলেন—"অমল।" কারণ, তিনি ইতিমধ্যে কুটুর ভাল নাম যে 'অমল,' তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন—"অমল, এতক্ষণ তোমায় দেখি নি, ও যায়গাটায় বসে পড়।"

তখনই দুই-তিনজন যুবক ও অমলের তৃতীয় মাতুল বলিয়া উঠিল—"এখানে যায়গা কোথায়? এ যে বীরেনের যায়গা, ওদিকে গিয়ে বোস।"

কুটু বা অমল আজ তাহাদের কথায় অত্যন্ত অপমানিতের মতই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দ্বিতীয় মাতুলের দিকে চাহিল। দ্বিতীয় মাতুল অমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"অমল, তা'হ'লে ওধারে গিয়ে বোস, মনে কবো না কিছু।" অমল ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু ফিরাইয়া লইল। সে দেখিল যুবকের দল তাহার হীন পোষাকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে যে, তাহাদের উচ্চ সম্মানের সম্মুখে সে নিতান্ত হীন ও অনুপযুক্ত। বীরেন তখনই অমলের দিকে একটা ক্রূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আসন গ্রহণ করিল। অমল যখন অত্যন্ত ব্যথিত মনে ধীরে ধীরে তাহার থাকিবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল, তখন শুনিল ছোটমামা মৃদুকণ্ঠে বলিতেছে—"ভদ্রলোকদের ভাল করে' খাওয়ানো দরকার; অন্যের তেমন না হ'লে বিশেষ কিছু আসে যায় না।"

ছোটমামার কথাটা হয় ত অমলের হীন অবস্থাটাকে ধিক্কার দিয়াছিল, তাই অমল তাহার ঘরে কোনও রকমে সময় কাটাইতে লাগিল; কারণ, বাবুদের আহারের পূর্ব্বে ত তাহার ডাক পড়িবে না।

হায় রে চাকরীর উমেদারী! হায় রে বড়-লোকের অনুগ্রহ-প্রার্থনা! মানুষকে যে তাহাতে কতটা ভুগিতে হয়, তাহার নিজের সত্তা কি ভাবে বিসর্জ্জন দিতে হয়, অমল হয় ত স্মিত-হাস্যে তাহাই ভাবিতেছিল।

বীরেন পাড়ারই একজন যুবক। সে পঞ্চম শ্রেণী হইতে সরস্বতী দেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এখন নানা যায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায়ই তাহাকে মেয়েদের গাড়ীর পিছনে পিছনে বাইক লইয়া বেড়াইতে দেখা যায়। বেশভূষার মধ্য দিয়া পাড়ার লোককে জানাইয়াছে যে, সে একজন বড় জমিদার পুত্র। কিছুদিনের মধ্যেই অমলের ছোটমামার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বড় মামার মেয়ে বীণার সঙ্গেও তাহার বেশ আত্মীয়তা জমিয়া উঠিয়াছে। বীণাকে তাহার জন্মদিন উপলক্ষে সে একটা মূল্যবান উপহারও দিয়াছে। বীণার গান গাওয়া, বীরেনের সঙ্গে তাহার

বেড়ান খুবই 'এরিস্টক্রেটিক্' বলিয়া মনে হয়। সেজন্য দেখা হইলেই উভয়ের করমর্দ্দন চলে এবং বেড়াইবার সময় আপনার সম্মানের পরিমাণটা বাড়াইবার জন্য বীণা সাধারণ বাঙ্গালীদের উপর তাচ্ছল্যের দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালাদেশেই লণ্ডনের হাওয়া ছড়াইয়া থাকে।

চার

দিন দুই পরের কথা।

বড় মাসীমা সেদিন অমলকে বাড়ী গিয়া আবার সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে বলিয়া দিলেন। তাহা না হইলে মামাদের সঙ্গে দেখা হয় কি না সন্দেহ; কারণ, যতদিন না তাহার চাকরী হয়, ততদিন তাহাকে তাঁহাদের একজনের কাছে থাকিতে হইবে। তিনি বলিয়া দিবেন যাহাতে তাহাদের একজন অমলকে লইয়া যায়। বড় মাসীমার খুব উৎসাহ; কিন্তু অমল এতটুকুও উৎসাহিত না হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

প্রায় দুইটার সময় আহার করিয়া অমল তাহার ঘরে বসিয়া আরামের নিশ্বাস ছাড়িতেছিল। ভুটিয়া যখন অমলকে ডাকিয়া নিদ্রা হইতে উঠাইল, তখন সন্ধ্যা। ভুটিয়া জানাইয়া গেল, দিদি তাহাকে ডাকিতেছেন। ভুটিয়া অমলের বড় মাসীমাকে দিদি বলিয়া ডাকে সে তাহা জানিত।

উপরে বড় মাসীমা কি একটা কাজ করিতেছিলেন। অমলকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বলিলেন—"বসো কুটু।"

অমল একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। মাসীমা আবার বলিলেন—"কুটু, বীণার সোনার রিষ্টওয়াচটা পাওয়া যাচ্ছে না। তুই পেয়েছিস্? পেয়ে থাক্‌লে আমার কাছে দিয়ে ফেল। বীণারা বল্‌ছিল, হয় ত তুইই পেয়েছিস্।"

অমলের প্রতি তাহার মাসীমার কি করিয়া এমন হীন সন্দেহ জন্মিল! অমল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতই উত্তেজিত হইয়া উঠিল; অতি কষ্টে সে আপনাকে সাম্‌লাইয়া বলিল—"না, পাই নি ত; আর পেলেই আমি তা' আমার কাছে রাখব কেন?"

"তোর কাছে রাখবি কেন। এতক্ষণ কি করেছিস্ তুই-ই জানিস। আমার ওয়াচ্ ফিরিয়ে দে, নইলে তোর নিস্তার নেই ইডিয়ট্" বলিয়াই পাশের ঘর হইতে বীণা অমলের কাছে আসিয়া চক্ষু রাঙ্গা করিয়া দাঁড়াইল।

অমলের মনে হইল তাহার পায়ে নীচে হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। আর দারিদ্র্যই যে তাহাদের সন্দেহের কারণ তাহা বুঝিতে তাহার এতটুকু বাকী রহিল না। মিথ্যা সন্দেহ করিয়া একজন ভদ্রকন্যা যে এমনভাবে একজন ভদ্রলোকের অপমান করিতে পারে, তাহা সে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল; অতি কষ্টে জোর করিয়া রাগ চাপিয়া সে বলিল—"আমি চোর নই!"

বীরেনও বীণার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে বীণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"চোরেরা অমন বলেই থাকে, আমি ত আগেই আপনাকে বলেছি।"

বীরেনের কথায় অমল আর ঠিক থাকিতে পারিল না। সার্টের হাতা গুটাইয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"ভদ্রতার একটা মাত্রা আছে জেনে রাখবেন।"

মাধবী চেঁচামেচি শুনিয়া পাশের ঘর হইতে আসিয়া বীণার বড় মাসীমা ও বীরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনারা সকলে মিলে একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে অপমান করছেন কেন। আপনাদের এ ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।"

বীরেন তখনই বলিয়া উঠিল—"চোরকে জুতো না দিলে ঠিক হয় না।"...

বীণা বীরেনের এ কথায় একটু আপত্তি

করিল, আর মাধবী জলন্ত-দৃষ্টিতে বীরেনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অমল আর সহ্য করিতে না পারিয়া বীরেনের ঘাড় ধরিয়া জোর করিয়া তাহার মাথাটা মাটির দিকে নামাইয়া দিল।

সহসা বীরেনের পকেট হইতে রুমালে বাঁধা কি একটা জিনিষ বাহির হইয়া পড়িল। অমল তখন রুমাল খুলিয়া সকলকে দেখাইল বীণার রিষ্টওয়াচ্ কোথায় ছিল। মাধবী চেঁচাইয়া কি বলিতে গেলেন। বীণা নিশ্চল। বীরেন দূরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

তখনই 'অমল' 'অমল' বলিয়া তাহার দ্বিতীয় মাতুল উৎফুল্লভাবে একটি টেলিগ্রাম হস্তে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে অকস্মাৎ ঘরের গোলমাল থামিয়া গেল। তিনি সকলের দিকে একবার তাকাইয়া শেষে টেলিগ্রাম পড়িয়া গেলেন। টেলিগ্রাম অমলের বন্ধু সুধীর করিয়াছে। তাহাতে লেখা ছিল—"তুমি স্কলারসিপ্ পাইয়াছ। পনের দিনের মধ্যে বিলাত রওনা হইতে হইবে। অতি সত্বর এখানে চলিয়া আসিবে।"

সকলেই নির্ব্বাক হইয়া শুনিল, সেই দরিদ্র যুবকটীই ইউনিভারসিটির প্রসিদ্ধ স্কলার অমল সেনগুপ্ত। সুবর্ণপদক পাইয়া সে এম্-এস সিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল। অমলকে নয়টার ট্রেণ ধরিতে হইবে। সে পূজনীয় ও পূজনীয়াদিগকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ কর্ত্তা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাথেয় বাবদ একটি দশ টাকার নোট দিলেন। মাধবী অনেক সাধাসাধি করিয়া পথে খাইবার জন্য একটা ছোট হাঁড়িতে কিছু লুচি ও সন্দেশ তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। বীণা জানালা দিয়া দেখিল সেই পুঁটলি হস্তে যুবকটি একটি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। গাড়ী চলিয়া গেল; কিন্তু আজ আর বীণা সেদিক্ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না।

—রঘুয়া—

শ্রীবলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তাদের দু'জনের যা' ঝগড়া শুধু চাকরকে লইয়া; নহিলে এমন মনের মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ।

সুধা বলিল—"ও হাড়হাবাতেকে রেখে ফল কি; দাও, তাড়িয়ে দাও, ভারি ত কাজ, এ আমি খুব সেরে নিতে পারব।"

সে পারিলেও সেই পারিতে দেওয়াটা যে কতবড় অপমানের, কথাটা বুঝাইতে গিয়া নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—"তা'ত পারবে,কিন্তু এদিকে মান কত বাড়বে তা' জান, লোকে বলবে—মাষ্টারবাবুর পয়সা নেই।"

সুধা বিরক্ত হইয়া বলিল—"লোক ত ভারি; ঘরকতক কুলি। এ তেপান্তরের মাঠে আছে কে?"

নির্ম্মল বলিল—"সেই জন্যই ত ওকে আরও দরকার; বনবাসে একটা জানোয়ার সঙ্গীও ভাল।"

সম্মুখের উন্মুক্ত প্রকৃতির চিত্রপটের দিকে সুধা একবার চাহিয়া দেখিল;—দূর সীমান্তে রেখার মত নারিকেল, তাল, খর্জ্জুরশ্রেণী আঁকাবাঁকা-ভাবে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে গ্রাম; মধ্যে ক্ষুদ্র খরস্রোতা স্রোতস্বিনী। তারপর মাঠের পর মাঠ; ধরিত্রী মায়ের দেওয়া কাঁচা সোণায় ভরা আমন ধানের ক্ষেত। ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে। কৃষক স্বপরিবারে তাহাদের বৎসরের পরিশ্রমের পুরস্কার ঘরে তুলিবার জন্য মাঠে আসিয়াছে। কেহ কাটিতেছে, কেহ আটি বাঁধিতেছে, কেহ মোট মাথায় গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিতেছে। দুয়ের নিত্যসঙ্গী তাহারা; দিন দুই বাদে চলিয়া যাইবে। তখন ফাঁকা মাঠে দিনকয় ঐ দূর গ্রামের পশারি দু'-একজন, নিত্যকার যাত্রী জনকয়, গরু-মহিষ, আকাশে উড়া পাখী তাহারাই হইবে তাহার দর্শনীয় প্রাণী। তারপর সম্মুখের রেলপথে ট্রেণ চলিবার সময় ক'খানি গাড়ী গোণা ছাড়া তাহার আর দ্বিতীয় কার্য্য থাকিবে না। স্বামীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—"বনবাসই বটে! "হ্যাঁ গা, বদলীর দরখাস্ত করলে যে, কি হ'ল?"

নির্ম্মল আপাততঃ বিপদ কাটিয়া গিয়াছে জানিয়া নিশ্বাস ছাড়িল; বলিল—"লোক পেলে তবে ত বদলী করবে; কেউ আসতে চায় না যে।"

"তুমি ত এসেছ।"

"কি করি পেটের দায়ে। সে সময়টা যে কি মনে আছে ত?"

অতীতের জীবন্ত ছবি সুধার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল,—সদ্যমৃত শ্বশুরের মৃতদেহ প্রাঙ্গনে পড়িয়া আছে, ভায়ে ভায়ে লাঠি হাতে বল পরীক্ষা করিতে উদ্যত,জ্ঞাতিরা সুবিধা বুঝিয়া দল বাছিয়া লইয়াছে মজা দেখিতে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। মৃতের ফেলিয়া যাওয়া বিত্ত পূর্ব্বেই ভাগবাঁটিয়া হইয়া গিয়াছিল। যায়েরা বাছিয়া বাছিয়া যে যার মনের মতটী তুলিয়া লইয়াছিলেন। নবাগতা সে, অজ্ঞ পল্লীবালা, তার ভাগ শূন্য! সেজ যায়ের ভাগের ঘড়াটা ছোট হওয়াতে সে কি বিপদ, সে কি কেলেঙ্কারী! হাতের বালা ঘুচাইয়া সে সে যাত্রা দায় উদ্ধার করে।

স্বামীর দিকে চাহিয়া সুধার চক্ষু জলে ভরিয়া

আসিল ; তবু কৌতুক করিতে ভুলিল না, বলিল —"মা গো, তোমরা বেটাছেলেরা কি !"

সে যাত্রা রঘুয়াও বাঁচিয়া গেল। নির্ম্মল হাসিতে হাসিতে ষ্টেশনের দিকে পা বাড়াইল।

দুই

বাহির হইতে রঘুয়া ডাকিল—"মাইজী।"

সুধা রান্নাঘর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল— "কি রে ?"

"একঠো বখ্‌রী।"

"বখ্‌রী, তা' আমি কি কর্‌ব, তাড়া না।"

"নেহি, বেলায়ে গা নেহি, রাখে গা।"

"রাখবি কি রে হতভাগা, কার চুরী করে' আনলি" বলিতে বলিতে সুধা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সত্যসত্যই একটা পাহাড়ী ছাগলের কাণ ধরিয়া রঘুয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছাগলটা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে না।

চঞ্চলকণ্ঠে সুধা বলিল—"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে হনুমান, মাঠ পার করে' তাড়িয়ে দিয়ে আয়। মোছলমানেরা দেখলে আর রক্ষে রাখবে না, তোর পিঠের চামড়া তুলবে।"

কিন্তু সে প্রস্তাব রঘুয়া কাণেই তুলিল না। কুয়ার দড়িগাছা টানিয়া আনিয়া ছাগলের গলায় জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিল। সুধা বকিতে বকিতে রান্নাঘরে ফিরিয়া চলিল।

পিছন হইতে রঘুয়া হাঁকিয়া বলিল—"আজ মাড় মাত ফেকিয়ে, রাখ দিজিয়ে, বখ্‌রীকো খিলায় গা।"

সুধা আগুনভরা দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিল—"মরছিস আপনি, মর হতভাগা, আমাদের জড়াস নি। মতলব, আমাদেরও হাতে দড়ি দিবি।"

নির্ম্মল বাড়ী ফিরিবার পথে কথাটা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সুধা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আহতকণ্ঠে বলিল—"হাসলে যে ?"

নির্ম্মল বলিল—"তুমি ভেবেছ ত গাঁয়ের কারও চুরী করেছে, কিন্তু তা নয় ; এনেছে রেল থেকে। ধন্যি সাহস বলতে হবে হতভাগার! এক প্রাণীও টের পায় নি। বলতে বলে—'খোকাবাবুর দুধ বাড়ীতে বাঁধা থাক্‌বে, বেশ হবে, রোজ রোজ পয়সা লাগবে না'।"

স্বামীর মুখে অনাগত খোকার কথা শুনিয়া সুধা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল—"মা গো, তুমি ভারি ইয়ে" বলিয়া দ্রুত সেখান হইতে সরিয়া গেল। রঘুয়ার কিন্তু ইহাতে মোটেই আসিয়া যায় না। এক লম্ফে প্রাঙ্গন পার হইয়া সে রসুইঘরের দ্বারে হাত পাতিয়া বলে—"জেরা তেল দিজিয়ে মাইজী।"

সুধা রাগতভাবে বলিল—"পারি না বাবু তোর জ্বালায়! ঠিক দুপুরে মানুষ তেতে-পুড়ে এল, কোথায় তাকে দেখব, না তোর ছাগল নিয়ে রঙ্গ। দূর হ', আমি পারব না।"

নির্ম্মল রঘুয়ার কাতর-বিহ্বল-দৃষ্টির দিকে চাহিয়া বুঝিল, বেচারী কিছুই বুঝে নাই ; তাই তাহার হইয়া নিজে ওকালতি করিতে গেল ; বলিল—"আহা দাওই না একটু, বেচারী চাচ্ছে।"

সুধা মুখ ভার করিয়া বলিল—"দিতে হয় নিজে দাও, আমি পারব না। ও কি, সত্যি-সত্যিই আমার ভাঁড়ারে ঢুকছ যে! বলে' রাখছি ফেলে দেব কিন্তু সব ; যা' তা' কাপড়ে ম্লেচ্ছমী আর যেথায় কর কর, আমার ঘরে চলবে না।"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—"এ ব্যবস্থা মন্দ নয় ; নিজে ত দেবেই না, কাউকে দিতেও দেবে না, এতে ও বেচারী করে কি শুনি ?"

সুধা কথা বুঝিল না, রাগে গরগর করিতে করিতে ভাঁড়সুদ্ধ তেল বাহির করিয়া রঘুয়ার মাথায় খানিক ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল—"এই নাও, মর, হ'ল ত!"

সে বেচারী অপ্রতিভ, ত্রস্তে মাথায় হাত পাতিয়া বলিল—"নেহি নেহি, হামকো নেহি, বখ্‌রীকো লাগায় গা।"

সুধার কাল্পনিক কাঠিন্য তখন হাস্যরসে পরিণত হইয়াছে। স্বামীর দিকে আড়চোখে চাহিয়া মুখের হাসি সাধ্যমত গোপন করিতে করিতে সে বলিল—"দেখ ত, জানোয়ার আর কাকে বলে! ছাগলে কখন তেল মাখে।"

ক্লেশ লাঘবের জন্য গৃহপালিত জন্তুর শিংয়ে যে তেল দেওয়া হয়, তাহা বুঝাইতে পারিবে না জানিয়াই নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল। রঘুয়া তখন নিশ্চিন্তে ছাগল লইয়া পড়িয়াছে।

তিন

ক্রমে অনাগতের জন্য অনেক কিছুই আসিয়া জুটিল। বাঘের চোখ, গণ্ডারের দাঁত, বুনো শুয়ারের পাঁজরা, আমড়ার আঁটি এগুলি আসিল ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতে। আর আসিল দু'জোড়া হাঁস, তিন জোড়া পায়রা, দুইটা খরগোস, একটা বানর, ইত্যাদি।

যোগাড় দেখিয়া সুধা ত হাসিয়া খুন; বলিল —"হ্যা রে, বাঁদর কি হবে?"

রঘুয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলা শিখিয়াছিল; বলিল—"খুকু-দাদু খেলা করবে।"

সুধা গম্ভীর হইয়া গেল; বিরক্তিতে মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"দূর করে' দিয়ে আয়, দেবে কোন্‌দিন আঁচড়ে-কামড়ে, তখন।"

"হামি মারিয়া ফেলব, হামার খুকু-দাদুর গায়ে হাত দিবে, শালাকে হামি আগ্ ফুঁকে খাইয়ে ফেলবে।"

সুধা তার অজ্ঞতায় আর হাসিল না, বুঝাইয়া বলিল—"ও বুনো জানোয়ার, ওর কি বুদ্ধি আছে; দিন থাক্‌তে অমঙ্গল কিছু ঘটবার আগে, দিয়ে আয় বনে ছেড়ে; তাতে ও বাঁচবে, আমিও নিশ্চিন্ত হব।"

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রঘুয়া বানর লইয়া চলিয়া গেল।

সারা আকাশ তখন গোধূলীর রাঙ্গা মেঘে ভরা। আলোর এ বিদায়-অভিভাষণ পাখীরা মোটেই সহ্য করিতে রাজী নয়, তাই সমস্বরে প্রতিবাদ তুলিয়াছে। সুধা বসিয়া বসিয়া তাহাদের কলকাকলীর মধ্য হইতে একটী অনাগতের কণ্ঠ আবিষ্কার করিতে চায়। দূরের ওই বড় তারাটার মত তাহার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয়। কিন্তু নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যেও সে অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানির সঠিক উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তারপর সত্য-সত্যই যেদিন খোকা আসিল, সেদিন রঘুয়ার কি আনন্দ! কি ছুটাছুটি! রাত দু'টা হইতে তিনজন চামারণীকে বসাইয়া রাখিয়াছে। এ দেশে দাইয়ের কাজ তাহারাই করে। চাক্ ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করিতে হাত-মুখ ফুলাইয়া বসিয়াছে, গ্রাহ্য নাই—খোকা-দাদুর ইহাই যে প্রাথমিক আহার! শুনিয়াছে, খোকাকে গরমে রাখিতে হইবে; তাই গ্রাম জুড়িয়া কাহারও গাছ আর অক্ষত নাই।

শেষ রাতে দাইয়েদের উপর সে কি তম্বি! সে যে আসিয়াও আসিতে পারিতেছে না, এ ত মাগীদের কারসাজী! মাইকে কষ্ট দিয়া দুনা টাকা লইবার ফিকির! রোস, তোদের নেওয়াচ্ছি টাকা, কালকে ধরে' গড়ের পুকুরে যদি না চোবাই, আমার নাম রঘুয়াই নয়!

সুধা ধমক দিল। নির্ম্মলকুমার তাহার হাতে ধরিয়া বলিল—"সময় না হ'লে আমরা কি করব, এ মিছে অনুযোগ।"

কিন্তু তবু সে অবুঝকে বুঝাইয়া রাখা যায় না।

তারপর আকাশের নূতন আলোক যখন প্রথম প্রকাশের ছলে উঁকি মারিল, তখন আঁতুড়-ঘর হইতে কচি গলার ক্রন্দন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া রঘুয়াকে মাতাইয়া তুলিল। গলায় কানাস্তারা ঝুলাইয়া বাজাইতে বাজাইতে তার সে কি নাচ! সারা রাত্রির অবসাদ-কাতর নির্ম্মল তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এ বীভৎস নৃত্যে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ভ্যাবাচাকা

খাইয়া রঘুয়ার দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"কি হ'ল হতভাগা, পাগল হলি না কি?"

ঘাড় মাথা দুলাইয়া রঘুয়া উত্তর দিল—পাগল যদিও সে হয় নাই, তবু আঁতুড়ঘরের ঐ নবাগতের অভ্যর্থনায় পাগলের উপর যদি কিছু থাকে, সে তাহা হইতে প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে চামারণীরা বাহিরে আসিয়া বলিল—"বাবু, খোকা আয়েছে, হামাদের বক্‌শিষ্।"

চার

কাঠের পিঁড়া উল্টা করিয়া পাতিয়া কাঁথা বিছাইয়া সুধা প্রথম যেদিন খোকাকে বাহির প্রাঙ্গনে রৌদ্রতাপে শোয়াইল, সেদিন রঘুয়ার স্ফূর্ত্তিতে সুধা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। আজীবন যতগুলি কসরৎ তাহার জানা ছিল, একে একে খোকার সম্মুখে সব ক'টির মহলা দিয়াও সে তৃপ্তি পাইল না; অবশেষে লম্ফে লম্ফে কিয়ৎদূরে সরিয়া যাওয়া, আবার তখনি আচম্বিতে তাহার অতি নিকটে আসিয়া পড়া ইত্যাদিতে ঐ ক্ষুদ্র প্রাণীটীর অন্তরের আনন্দ বাহ্যিক প্রকাশ করিবার সহায়তায় সে অনেক কিছুই করিল।

সুধা পূর্ণ পরিতোষের সহিত বলিল—"খোকা রইল, দেখিস, আমি স্নান সেরে আসি।"

রঘুয়াও বুঝি তাই চায়; বিনা ওজরেই সে সম্মতি দিল। দু'-একপদ অগ্রসর হইয়া সুধার প্রাণ কিন্তু আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিল; ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"দেখিস্ গায়ে-টায়ে হাত দিস নি যেন। এখনও হাড় হয় নি; মচকে গেলে চিরকাল খোঁড়া হয়ে থাকবে, আর সারবে না।"

অজ্ঞতার আঘাত রঘুয়ার বড় করিয়া বাজিল; খোকার নিকট হইতে সে অনেকটা দূরে গিয়া বসিল। কে জানে, তার জোয়ান গায়ের হাওয়ায় তাহার যদি কোন অনিষ্ট হয়।

জয়শ্রী বাড়ীর পাটঝাট করিত। সুধা চলিয়া গেলে সে আসিয়া খোকার অতি নিকটে বসিল। রঘুয়ার কিন্তু তাহা সহ্য হইল না; সে এমন এক ধমক দিল যে, খোকা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জয়শ্রী হাসিয়া বলিল—"বেশ, কাঁদালি ত; এখন কি করে' থামাবি, থামা। বলছি গিয়ে মাইজীকে।"

কি যে করা উচিত, উপায়হীন রঘু তা' ভাবিয়াই পাইল না। কাচুমাচু মুখে পিঁড়াসমেত খোকাকে তুলিয়া ধীরে ধীরে সে দোলাইতে লাগিল। খোকা কিন্তু তার প্রাণের সন্ধান পাইল না। থামা দূরে থাকুক, ভয় পাইয়া সে আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

হাসিয়া জয়শ্রী তাহাকে বুকে তুলিয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিল—"আরে সর, এসব কি তোদের কাঠগোঁয়ারের কাজ। দেখলি, এই দেখ, চুপ করল ত? কেমন আর ধমকাবি?"

তারপর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। জয়শ্রী ও রঘুয়ার কাড়াকাড়ির মধ্যে খোকা হামা টানিতে শিখিয়াছে; তাহাকে আগলাইতে সবায়ের প্রাণান্ত। বাড়ীর কোন কিছু আলগা করিয়া রাখিবার জো নাই; খোকা ফেলিবে, নয় ভাঙ্গিবে। তাহার বেশী ঝোঁক রঘুয়ার গাঁজার কলিকাটীর উপর; তাহা নানা স্থানে লুকাইয়াও রঘুয়া নিষ্কৃতি পায় না।

সদ্যভাঙ্গা কলিকাটী হাতে লইয়া বেচারী আঁধার-মুখে বলিল—"আজ তামাক কিসে খাব দাদু-ভাই; তুই কি শেষে আমার গাঁজা ছাড়াবি?"

জয়শ্রী পশ্চাৎ হইতে হাঁকিয়া বলিল—"তা' হ'লে কিন্তু আপদ যায়, তাই কর খোকা-বাবু, ওর কলকে বল্‌তে একটাও তুমি আস্ত রেখ না।"

তাহাদের দু'জনের এ আড়াআড়ির অভিযোগ খোকা কতটা বুঝিল, তা' সেই জানে; জয়শ্রীর কথার উত্তরে সে কিন্তু খলখল শব্দে হাসিয়া উঠিল।

রঘুয়াও আমোদ পাইল; ছুটিয়া গিয়া দুরন্ত

অপরাধীকে মাথায় তুলিয়া একপাক ঘুরাইয়া লইল। তারপর শূন্যে শূন্যে সে কি লোকালুফি!

সুধার মায়ের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল; হাতের কাজ ফেলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। ছোট্ট ঐকুটু খোকাকে লইয়া উহাদের অত চাঞ্চল্য, অত কোলাহল কেন? সে কথার উত্তর যখন সুস্পষ্ট চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, তখন কিন্তু আর ধৈর্য্যের বাঁধ থাকিল না, বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। সক্রোধে চীৎকার করিয়া সুধা বলিল—"মেরে ফেলবি কি হতভাগা! দে আমার ছেলে দে, রাখতে হবে না তোকে; হাত ফস্কে পড়লে ও কি আর বাঁচবে!"

বুকের ধন বুকে চাপিয়া সে পলাইয়া বাঁচিল। সংসারের সকল কাজ যেন তিক্ত হইয়া গেল; অত সাধের কেনা মাছ অকোটাই পড়িয়া রহিল। আনন্দের রূপ তখন জগত ছাড়িয়া কোন অজানা রাজ্যে পলাইয়া গিয়াছে যে! কাজেই সব কিছু নীরস, বিস্বাদ স্ফূর্ত্তিহীন! সেদিন বক্ষের দ্রুত স্পন্দন থামিতে অনেকক্ষণ সময় লাগিল।

নির্ম্মলকে বলিয়া কোন ফল হয় না। চাকরের কোন দোষ বুঝি তাহার নজরেই পড়ে না; তাই সে হাসে। সুধার কিন্তু তা' মোটেই ভাল লাগে না; বিরক্তিভরে মুখ গোঁজ করিয়া থাকে। দুষ্ট ছেলেটাও কি তেমনি! রঘুয়াকে দেখিয়াই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া যায়।

সেদিন কিসের উৎসব। দূর গ্রামের সকল নরনারী, যুবক-যুবতী, এমন কি অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে শিশু পর্য্যন্ত আমোদে মাতিয়াছে। পরণে সবারই হলুদের রঙে ছোবান ধুতি-শাড়ী, গলায় বনফুলের হার, হাতে তীর-ধনুক। দলে দলে সে কি নাচ!

সকল দলই মাষ্টারবাবুর বাসায় নিজেদের অভিরুচি মত কসরৎ দেখাইতে আসিল। নাচিয়া নাচিয়া মাদল বাজাইয়া রঘুয়ার পরিবেষিত আকণ্ঠ তাড়ি পান করিয়া পরম তৃপ্তিভরে দলের পর দল চলিয়া গেল।

এইবার ঘরের লোকের পালা। মাদল অভাবে কানাস্তারা বাজাইয়া রঘুয়ার নাচ ত নয়, উলম্ফন! ঘুমুর পায়ে জয়শ্রীর পায়রা-লোটন লুটাইয়া নাচ ও গান! সুধা হাসি সামলাইতে পারিল না; বেদম হইয়া মুখে কাপড় গুঁজিতে গুঁজিতে অন্যত্র পলাইল।

হঠাৎ খোকার কথা মনে হওয়ায় সে ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহা কোনমতে কোন মাতাই সহ্য করিতে পারে না; তীব্রকণ্ঠে ডাকিল —"রঘু, হতভাগা, কচ্ছিস্ কি?"

জয়শ্রী ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রঘু দাঁত বাহির করিয়া হাসিল; বলিল—"কুচ্ছু নেহি মাইজী, খোকাবাবুকে একটু তাড়ি দিয়াছি, সর্দ্দি-উর্দ্দি থাকবে না, বেমো ওমো কুচ্ছু না হবে।"

কিন্তু তার এতবড় নীতিজ্ঞানের পুরস্কার দারুণ প্রহারে পরিণত হইল। সুধা হাতের কাছে যাহা পাইল, তাহা ছুড়িয়া রঘুয়ার অপরাধের গুরুত্ব বুঝাইতে চাহিল। খোকাকে বুকে জড়াইয়া দণ্ডিত কিন্তু ততক্ষণে ষ্টেশনের পথে ছুটিয়াছে।

নির্ম্মল শুনিয়া এবার ঠিক না হাসিলেও মুখ খানার ভাব এরূপ করিল, সুধা যা' মোটেই সমর্থন করিতে পারিল না। বলিল—"তোমার মতলব কি বল ত, এই বয়স থেকেই ছেলেটা গোল্লায় যাক্।"

নির্ম্মল মাথা নাড়িয়া বলিল—"না না, তা' কেন। ও বেচারী কিন্তু নিজের অপরাধের গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে বুঝেছে; আমার পা ছুঁয়ে বলেছে—এমন কাজ আর কখনও করবে না।"

স্বামীর এ উদাসীনতা সুধার কিন্তু ভাল লাগিল না; কাঁদিয়া বলিল—"চাকরই তোমার সব; কেন, খোকা কি তোমার কেউ নয়?"

নির্ম্মল হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"কে বললে কেউ নয়; খোকা তোমারই মত আমারও সব

রসের দুলাল। তবু কি জান, বুনোকে পোষ মানাতে হ'লে কতকটা তাদের ভাবেই মোড় ফেরাতে হয়।"

পাঁচ

দেশটা যত বড় অসুবিধারই হোক না কেন, চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু রঘুয়ার অত্যাচারটা সত্যসত্যই সুধার পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাই ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে সে সুধু বদলীর দিনেরই প্রার্থনা করিতেছিল। এমন দিনে বদলীর হুকুম আসিয়া তাহাকে আনন্দে অস্থির করিয়া তুলিল।

জয়শ্রী কাঁদিয়া খুন! বলিল—"খোকাবাবুকে কেমন করে' ছেড়ে থাকব মাইজী। আমাকেও নিয়ে চল।"

সুধা কত বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিল—ভিন গাঁও, আত্মলোক কেউ নেই, এ মায়ার নেশা দু'দিনেই কেটে যাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আচ্ছা চণ্ডাল কিন্তু ঐ রঘুয়াটা! মুখে এতটুকু বিষণ্ণতা নাই, বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে মোটঘাট বাঁধা-ছাদা করিতেছে। মন বুঝিতে সুধা প্রশ্ন করিল—"তুইও কি বদলীর মঞ্জুরী চেয়েছিস্ রঘু?"

রঘু হাসিয়া বলিল—"রাম কহো মাইজী; আমরা কুলি-মজুর, আমাদের আবার বদলী! নকরী যাবে ত বদলী হোবে না।"

সুধা শুনিয়া প্রাণে প্রাণে যেন আশ্বস্ত হইল।

সে আশ্বস্তি মধুর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল,—যখন চেনা মাঠ-পথ ছাড়াইয়া, ফেলিয়া-যাওয়া কুঠির ষ্টেশনের অস্তিত্ব মুছিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। ঐ বড়বিল, জেলেরা যাহার মাছ ধরিয়া মাথায় কাঁধে বাঁকে লইয়া নিত্য তাহার ক্ষুদ্র বাড়ীটার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত। দূরে গ্রামের ঐ প্রান্ত সীমা। ঐ কাল কোকিলটা, যে নিত্য তাহার বাড়ীর সম্মুখে তারে বসিয়া গান গাহিত; বুঝি, মায়া ছাড়িতে পারে নাই বলিয়া এত দূরে সে বিদায়-অভিভাষণ জানাইতে আসিয়াছে। কিন্তু কি নিষ্ঠুর এ দেশের এই মানুষগুলা! রঘুয়ার কথা মনে পড়ায় সুধার প্রাণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ ফিরাইল।

নির্ম্মল পত্নীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিল—"অন্ততঃ রঘুয়াটাকে সঙ্গে নিলে হ'ত; বিদেশ-বিভূঁই, খোকা পাছে হেদায়।"

সুধা রুষ্টকণ্ঠে বলিল—"রাখ, রাখ, তার আবার মায়া, কেবল তোমার আমার মন ভেজাতে তার যত প্রবঞ্চনা; দেখলে, একবার আসবার নাম সে মুখে নিলে?"

নির্ম্মল চুপ করিয়া গেল; হয় ত কথাটার সারবত্তা মনে মনে উপলব্ধি করিল।

মাঠ শেষ হইয়া গ্রামের চরণ-চিহ্ন আঁকিয়া দিল। সেই কৃষাণ, সেই পল্লীবধূ, সেই বালক-বালিকা গাড়ী দেখিয়া আনন্দে লাফালাফি করি-তেছে, নিত্য যা' চোখের সম্মুখে ঘটিত। ভারক্লান্ত বলীবর্দ্দ বোঝা বহিতে পারিতেছে না। নূতন ধানের মিষ্ট গন্ধ বনফুলের সহিত মিশিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আবার দিগন্তব্যাপী মাঠ; মনে হইল, তাহার বুঝি শেষ নাই। দূরে—বহু দূরে তটরেখার মত শীর্ণ বনানী যদিও সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, তথাপি ভ্রম হইতে লাগিল, সত্যই উহা প্রান্তসীমা কি না।

ছোট একটী পাহাড়,তার চেয়েও ছোট্ট একটী গিরিনদী, অনুর্ব্বর ক্ষেত্র, লাল পাথর শ্রীহীন কলেবরে দণ্ডায়মান; মনে হইল পৃথিবীর কণ্টক। কিন্তু তখনি অন্যদিকে ঘন বনানী সে রুক্ষতার কদর্য্যতা আপন শ্যাম আবরণে ঢাকিয়া ফেলিল। ষ্টেশন—কত দরিদ্র নরনারী পাতার ঠোঙ্গায় বুনো জাম বিক্রয় করিতে আসিল। খোকা ভ্রম করিয়া বলিয়া ফেলিল—"মা, রঘু দা'!"

মা হাসিল। তখনি নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিল,—জানি না দুধের বালক কতদিনে সে মায়াবীর মায়া কাটাইতে পারিবে!

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া সে ছেলেকে জাম কিনিয়া খাওয়াইতে বসিল।

দিন গেল, রাত্রি আসিল। অনেক দাপাদাপি করিয়া খোকা ঘুমাইয়া পড়িল। গভীর রাত্রে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট যাত্রার পথ শেষ হইল। নির্ম্মল তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল—"এ রাত্রে কাকেই বা ডাকি, অচেনা যায়গা, যাই বা কোথায় ?"

কুলি আসিয়া মোট নামাইয়া লইল। তখনি চার্জ্জ বুঝিয়া লইতে হইবে; নির্ম্মল ষ্টেশন কামরার দিকে চলিয়া গেল। ওয়েটিংরুমে সুধা মোটঘাট সমেত ঘুমন্ত শিশু কোলে লইয়া একলা বসিয়া রহিল। তখন থাকিয়া থাকিয়া একখানা অকৃতজ্ঞ মুখ বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

"মাইজী।"

সুধা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—"কে রঘু, তুই এলি কি করে' ?"

"ভুল হয়েছে, মাপ করবেন। আপনার লোক আমরা চিনতে পারি নি। বিনা টিকিটে এসেছিল—" পুলিশ সেলাম বাজাইয়া সরিয়া গেল।

সুধা বিরক্তির মধ্যেও তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল—"কিরে রঘু, এলি যে বড়, চাকরী থাক্‌বে ?"

রঘু হাসিয়া বলিল—"হামার খুকু-দাদুর কাছে নক্‌রী কুচ্ছু না মাইজী! আমি কুলি আছি; ষ্টেশনে থাক্‌বে, পয়সা কামাবে—একটা ত পেট, তার আবার ভাবনা।"

নির্ম্মল আসিয়া বলিল—"না, সারারাত খোকাকে নিয়ে হিমভোগ তোমাকে আর করতে হ'ল না। বাড়ী ওঁরা ছেড়ে দিয়েছেন; কুলিরা মোট নিচ্ছে—তাই ত এ কে !"

"ও খোকার বড় ভাই !" সুধা এবার নিঃসঙ্কোচে রঘুয়ার কোলে ঘুমন্ত শিশুকে তুলিয়া দিল।

—স্ত্রী—

শ্রীসাহাজী

এক

শের আফগান আজ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। হাকিম বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর বাঁচিবার আশা নাই। মেহেরউন্নিসা মুমূর্ষু নিঃসংজ্ঞ স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর অতীত; কক্ষমধ্যে কেহই ছিল না। কেবল একাকিনী মেহের মুমূর্ষু পতির দেহ আগু লিয়া বসিয়াছিল—যেন যমের সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। কোনও হিন্দু রমণী অপেক্ষা স্বামীকে সে কম ভাল বাসিত না। এক হিন্দু সতী সাবিত্রী যাহা পারিয়াছিল, সে কি তাহা পারে না!—সে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে এইরূপ কত কথা ভাবিতেছিল। প্রদীপের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ তাহার দৃষ্টিতে ম্লান বলিয়া বোধ হইতেছিল।

কিন্তু ও কে? পাষাণ ভিত্তিতে ও কাহার ছায়া পড়িল?—সেলিম?—সেলিম এখানে কি করিয়া আসিল? মেহের শিহরিয়া উঠিল। সেলিম অগ্রসর হইয়া কহিলেন, 'ভয় নেই মেহের, আমি সেলিম।'

মেহেরউন্নিসা বুদ্ধিমতী, মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের সন্ত্রস্তভাব সংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, 'তুমি! তুমি এখানে কেন, রাজকুমার?'

'কেন?'—সেলিমের মুখে ব্যথার হাসি ফুটিয়া উঠিল;'কেন, তা'কি তুমি জান না,মেহের? তুমি কি জান না, এই দীর্ঘ দশ বৎসর কার ছবি আমি হৃদয়ে ধ্যান করেছি? পিতা তোমাকে আমার চক্ষের আড়াল করে' রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু আমার হৃদয়ের আড়াল করে' রাখতে ত তিনি পারেন নি তোমায়। মেহের, পিতা স্বর্গে গেছেন, আর আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। আমি তাই ছুটে এসেছি, আগ্রা থেকে বাংলায় —শুধু তোমারই জন্য। মেহের! পাষাণি!' তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

দাসদাসী কেহ সে স্থানে ছিল না, নিকটে কেহ আছে বলিয়াও মেহেরের বোধ হইল না। সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সেলিম পুনরায় কহিলেন, কিন্তু কি কহিলেন, চিত্তবৈকল্যবশতঃ এবার মেহের তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিল না। সে শুধু মূর্চ্ছিতার ন্যায় শুনিল, 'ওকে হত্যা করে' আমার ধন আমি আজ ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'হত্যা' শব্দটি মেহেরের কর্ণে বিকট হইয়া বাজিল। সে চমকিয়া উঠিল! বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।

'হত্যা! কাকে হত্যা করবে, রাজকুমার? আমার স্বামীকে?'

সেলিম উত্তর করিলেন, 'ও তোমার স্বামী হ'তে পারে, কিন্তু জেন, ও আমার সর্ব্বস্ব অপহারক।'

'রাজকুমার! আমি কে, তা' জান? বাংলার সুবেদারের পত্নী আমি। তুমি কোন্ সাহসে আমার কক্ষে প্রবেশ করেছ? আমি এখনই রক্ষীদের ডাকছি।' মেহেরউন্নিসা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল।

সেলিম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'বৃথা ডাকা, মেহের। ডাকলে কারও সাড়া পাবে

না। তা' ছাড়া, তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি এখন ভারতের সম্রাট।'

মেহের কম্পিত দেহে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলার ন্যায় বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সেলিম তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, 'কেন এমন অধীর হচ্ছ, মেহের?'

অনন্যোপায় হইয়া মেহের তখন সহসা 'বাঁদী বাঁদী' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু কাহারও কোনও রূপ সাড়া-শব্দ পাইল না; শুধু প্রতিধ্বনি কক্ষের পাষাণ ভিত্তিতে প্রতিহত হইয়া ব্যঙ্গোক্তি করিল মাত্র। মেহের প্রমাদ গণিল।

সেলিম কতবার কত কৌশলে শেরকে বিপদ-গ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বামীর নিকট মেহের সে সকলই শুনিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া সে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া উঠিল। স্বামীর শয্যা আগুলিয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্ত-কণ্ঠে কহিল, 'তোমার সাধ্য নেই সেলিম, আমার স্বামীর কেশাগ্র তুমি স্পর্শ কর। তুমি সম্রাট্ সত্য, কিন্তু জেন, প্রেমের রাজ্যে আমিও সাম্রাজ্ঞী।'

সেলিম হাসিয়া কহিলেন, 'শৈশবে, কৈশোরে তুমি আমায় কত ভালবাসতে, সে সব কথা কেন ভুলে যাচ্ছ আজ? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব, মেহের!'

মেহেরউন্নিসা সহসা সেলিমের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। তাহার পদদ্বয় দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, 'সেলিম, আমায় ক্ষমা কর। আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা দাও! ঐ ত মরা মানুষ। মরতে বসেছে যে, যম নিজে যাকে মারছে, তাকে মেরে কেন আর নিমিত্তের ভাগী হও, সম্রাট্!'

'না, মেহের। শের বীর। বীরেরা সহজে মরে না। হকিমের কথায় বিশ্বাস নেই। মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। ওকে হত্যা করে' আমার চিরদিনের সাধ পূর্ণ করব আজ। এই তার উত্তম সুযোগ।'

সেলিমের হস্তস্থিত শানিত ছুরিকা প্রদীপের আলোকে ঝলকিয়া উঠিল। মেহের, অনাবৃতমুখী মেহের এবার তাহার অনবদ্য নয়নের পরিপূর্ণ দৃষ্টি সেলিমের মুখের প্রতি ন্যস্ত করিয়া যুক্তকরে কাতরকণ্ঠে কহিল, 'সেলিম! তুমি সম্রাট্, আমি ভিক্ষুণী। আমায় একটি ভিক্ষা দাও।'

'আমি ততোধিক ভিক্ষুক, মেহের! যে ভিক্ষা তুমি চাইছ, তা' দেওয়া আমার অসাধ্য।'

সেলিম ধীরে ধীরে মেহেরউন্নিসার বাহু বন্ধন হইতে পদদ্বয় মুক্ত করিয়া লইলেন। মেহের এবার আর কোনওরূপ বাধা দিল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল—সৃষ্টির প্রাক্‌কালে সদ্য-জাগরিতা সুপ্তা নারীশক্তির ন্যায়। সেলিমের সম্মুখে দীপ্তা সিংহীর মত দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিল, 'ভিক্ষা তা' হ'লে চাই নে, সম্রাট্। আমার স্বামীর প্রাণ আমি কিনে নিতে চাই।'

সেলিমের অন্তর উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে কহিলেন, 'মূল্য?'

'খুব অধিক মূল্য দেব সম্রাট্,—আমার সতীত্ব। কেমন, সন্তুষ্ট ত? যাও, বর্ব্বর।'—বলিতে বলিতে মেহের হতচেতনাবৎ কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল।

সেলিম সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মেহের যখন প্রকৃতিস্থা হইল, তখন আর সে সেই কক্ষে সেলিমকে দেখিতে পাইল না। ব্যগ্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, স্বামী অক্ষতদেহে রোগ শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। রিক্তা সর্ব্বহারা নারীর ন্যায় মেহের আবার কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। শের আফগানের পবিত্র শয্যা স্পর্শ করিবার সাহস আর তাহার হইল না। স্বামীর রোগ-

বিকৃত মুখের দিকে তাকাইতে গিয়া তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল; সে ভাবিল, মুখ বিকৃত করিয়া স্বামী বুঝি তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন।

দুই

শের আফগানের পারলৌকিক-ক্রিয়া যথা-সময়ে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। মেহেরের সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইল। পূর্ব্ব হইতেই সে সংসারের সহিত তাহার দেনা-পাওনার হিসাব চুকাইয়া দিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সংকল্প করিয়াছিল এবং সেই শত্রুপুরীতে পাছে কেহ তাহার মনের গোপন কথা বুঝিতে পারে, সেজন্য সে যথাসাধ্য সতর্ক হইয়া চলিতেছিল। আজ তাহার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার দিন।

সে ধীরে ধীরে উদ্যানে স্বামীর কবরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর চন্দ্র গগণে উদিত হইয়াছিল। মেহের কবরের পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিল। তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বেদনারুদ্ধ-কণ্ঠে সে কহিল, 'সতীত্ব দিয়ে তোমার জীবন কিনতে চেয়েছিলাম,—আমি অসতী। কিন্তু তুমি ত আমার অন্তর জান। দেহ দিয়ে পাপ,—দেহ চুকিয়ে দিলেও কি তুমি আমায় নেবে না, প্রভু?' শরবিদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় মেহের কবরের পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল। বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার কথঞ্চিত লঘু হইলে সে উঠিয়া বসিল। স্বামীর উদ্দেশে সেই স্থানে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল; তাঁহার কবর চুম্বন করিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া যেন অতিকষ্টে তাহার মৃত দেহভার বহিয়া লইয়া, সে প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই এক ব্যক্তি অলক্ষ্যে যে তাহার অনুসরণ করিতেছিল, সে তাহা দেখিতে পায় নাই। তাহার মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। আপন হস্তে নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াইবার দুর্ভাগ্য যে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়, তাহার মনের অবস্থা অন্তর্যামী ভিন্ন অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

* * *

জাহাঙ্গীর তখন প্রাসাদ-কক্ষে বসিয়াছিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছিল। নর্ত্তকীরা সকলেই সেদিনকার মতো বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময় মেহেরউন্নিসা ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। জাহাঙ্গীর 'কে?' বলিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে সদ্যো-বিধবা মেহেরের মলিন মূর্ত্তি। বিশ্বরূপসীর সেই দীন রিক্ত সর্ব্বহারা মূর্ত্তি দেখিয়া সম্রাটের চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া গেল। তিনি করুণা-বিগলিত-কণ্ঠে কহিলেন, 'এমন অসময়ে কি মনে করে' মেহের?'

মেহের তাঁহার কাতরকণ্ঠের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উত্তর করিল, 'আমি আমার ঋণ পরিশোধ করতে এসেছি, সম্রাট্।'

'কিসের ঋণ, মেহের?'

'ভুলে যাচ্ছেন, সম্রাট্, আমার স্বামীর জীবনের মূল্যের ঋণ।'

জাহাঙ্গীর চমকিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখ কালিমা বর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি কহিলেন, 'কি মূল্য দেবে তুমি, মেহের?' তাহার স্বর কুণ্ঠাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল; তাহাতে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ইঙ্গিত ছিল কি না বুঝা গেল না।

'খুব বেশী মূল্য, জাঁহাপনা। কত বেশী, তা' রমণী বোঝে; আপনি তা' কি বুঝবেন? রমণীর সতীত্ব ছেলেখেলার জিনিষ নয় সম্রাট্!'

সম্রাট্ মাথা নাড়িয়া উত্তর করিলেন, 'সতীত্ব। বড় অল্প মূল্য, মেহের।'

"কিন্তু সেই কথাই ত হয়েছিল, সম্রাট্।"

'মূল্য না পাই, সেও ভাল। তবু অল্প মূল্য নিয়ে মূল্য নেওয়ার বদনাম কিনব না। আমি তোমার পত্নীত্ব চাই।'

'না, না, সে আমি দিতে পারব না, সম্রাট্!'

—বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে মেহের চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সেই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে জাহাঙ্গীর চমকিয়া উঠিলেন; স্তম্ভিতের ন্যায় তাহার দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন! এইরূপে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে মেহের আত্মস্থ হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, 'তা হ'লে আমায় মুক্তি দিন, সম্রাট্।'

জাহাঙ্গীর ব্যথিত-দৃষ্টিতে মেহেরের পানে চাহিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'মুক্তি ত তোমায় সেই দিনই দিয়েছি, মেহের। আমায় ক্ষমা কর তুমি।'

'তুমি মহান্ সম্রাট্।'—আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, কৃতজ্ঞতায় গলিয়া মেহের সম্রাটের চরণ স্পর্শ করিল।

সম্রাট্ বলিলেন, 'কিন্তু মেহের, তুমি আরও মহীয়সী।'

মেহের ধীরে ধীরে স্বামীর কবরের পার্শ্বে ফিরিয়া আসিল। সেই অলক্ষ্যচারিণী এবারও তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারিল না। রাত্রি তখন অধিক ছিল না। সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। আলো-আঁধারের অস্পষ্ট ছায়ায় কুন্দ-কামিনীর শুভ্রছটা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। প্রকৃতির সেই প্রাণাভিরাম আনন্দের রাজ্যে বসিয়া প্রকৃতি সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি মেহের বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বহু-মূল্য সুবর্ণ অঙ্গুরীয় বাহির করিল। অঙ্গুরীতে গরল ছিল। অলক্ষ্যচারিণী ইহা লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে শব্দে চকিতা হইয়াই বোধ করি মেহেরও তৎক্ষণাৎ অতি ত্রস্তে সেই বিষ গলাধঃ করিল। হায় নারী, নিয়তির গতিরোধ কি মানুষে সম্ভবে!

সন্ধ্যাকালে মেহেরের লুপ্তসংজ্ঞা কথঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিলে সে ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিয়া সম্রাটের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি কাতর-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহি-লেন, 'কেমন আছ এখন, মেহের? কেন এমন করে' মরতে চাও তুমি, মেহের?'

শুনিয়া মেহের চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সম্রাট্, সম্রাট্, আর ও নাম করো না। মেহের মরে' গেছে।'

জাহাঙ্গীর উৎফুল্ল হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, 'তাই হোক্, মেহের, তাই হোক্। মেহের মরে' গেছে। তোমার চরিত্রের আলোয় আজ আমি মোহমুক্ত। তুমি শুধু আমার নয়নের আলো নয়, তুমি জগতের আলো—তুমি নুরজাহান্!'

কিন্তু নুরজাহানের কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না। সে তখন মূর্চ্ছা গিয়াছিল।

—অনির্দ্দেশের পথে—
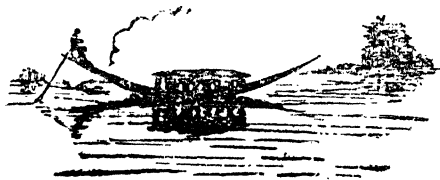
কুমারী ঊষারাণী দত্ত

দু'টী তরুণ হৃদয়ের গভীর প্রেমের কথা।

সুন্দরী ধনীর দুলালী যূথীর বন্ধু হইল কি না দরিদ্রা মৃদুল। এটা যে যূথীর ক্লাসের মেয়েদের নিকট শুধু আশ্চর্য্যের বিষয় হইল তাহা নহে, হিংসারও বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

সে একদিনের কথা। যূথী স্কুলে গিয়া দেখিল এককোণে অবস্থিত একটী নীরব নত ছাত্রীকে বেষ্টন করিয়া তাহার ক্লাসের মেয়েরা বিদ্রূপ করিতেছে। নূতন ছাত্রী আসিলে তাহাকে লইয়া এভাবে বিব্রত করা, তাহাকে জব্দ করা, স্কুলের মেয়েদের একটা মহা আনন্দের খেলা। যূথীকে দেখিয়া তাহারা সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও ভাই যূথি, আজ একটা মজার জিনিষ দেখবি আয়।"

তাহারা যূথীকে একপ্রান্তে লইয়া গিয়া বলিল—"ঐ মেয়েটা আমাদের সঙ্গে পড়বে, ও যেন কী অদ্ভুত মেয়ে! আমরা ওকে জব্দ করবার জন্যে কত চেষ্টা করছি, কিন্তু, কোনমতেই গ্রাহ্য করছে না।"

কেহ বলিল—"ও বোকা।"

কেহ বলিল—"না, ও অহঙ্কারী।"

মেয়েটীর বিষয় এইরূপ নানা কথা শুনিয়া যূথী কৌতূহলী হইয়া তাহাকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু মেয়েটীকে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল; এতগুলি মেয়ের হাসি-বিদ্রূপ তাহার স্থির মুখশ্রী ত এতটুকুও চাঞ্চল্য আনিতে পারে নাই! সে এক-মনে কি একখানি পুস্তক পড়িতেছিল। শ্যামবর্ণ; কিন্তু শ্যামল রূপের আভা কি এতই মধুর! কি একটা শান্ত কোমল শ্রী তাহার সমস্ত মুখখানির উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাহার বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু দু'টীতে একটা অজ্ঞাত ব্যথার ছায়া প্রকাশ পাইয়া যেন শ্যামল রূপের মাধুর্য্যকে আরও করুণ মধুর করিয়া তুলিয়াছে! যূথী মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; কী এক অজানা শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তাহার মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া আসিল—আর আসিল এই মেয়েটীর সহিত আলাপ করিবার একটা আকুল আগ্রহ! যূথী তাহার অতি নিকটে সরিয়া গিয়া মধুরস্বরে বলিল—"তোমার নাম কি ভাই?"

মেয়েটী বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিল; সে আসিয়া অবধি শুধু বিদ্রূপবাণই সহিয়াছে, এরূপ কোমল স্বর ত শোনে নাই। সে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—"মৃদুল।"

"মৃদুল, বাঃ, বেশ নাম ত! আজ থেকে আমরা দু'জনে বন্ধু হলুম, কি বল?"—যূথীর স্বরে একটা ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ পাইল।

যূথীর সরলতায় মৃদুল বিস্মিত হইল। কণ্টকে প্রস্ফুটিত এই কুসুমটীকে বক্ষে স্থান দিতে সে দ্বিধা করিল না। এমনই করিয়া এই দু'টী হৃদয় যে কবে কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে এক হইয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। যূথী মৃদুলের বন্ধুত্ব হইল আর সকলের হিংসার বস্তু।

যূথী মৃদুলের নিকট হইতে তাহার পরিচয় জানিয়া লইয়াছে। সে অতি দরিদ্রের কন্যা; ছোটবেলায় মা-বাপ মারা যাওয়ায় সে মামার নিকট মানুষ। মামার চেষ্টায় বিবাহও হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহের পর দেনা-পাওনা লইয়া বরের

পিতার সহিত কি-একটা গোলযোগ হয়,তাহাতেই তিনি তাহাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়া তাঁহার রাগ শান্ত করেন। তাঁহার পুত্রও পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া সুপুত্র নাম অর্জ্জন করিতে ভুলেন নাই। মামা অনেক সাধাসাধি করিয়াছিলেন; কিন্তু ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বৈবাহিক-মহাশয় অচল অটলই থাকিয়া গেলেন। তাহার পর অনেক দিন গত হইয়াছে। তাঁহারা মৃদুলের কোন খোঁজই আর লন নাই। সম্প্রতি মামার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক তাহাকে এই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। মামার কিছু টাকা আছে, তাহার দ্বারা মৃদুলের পড়াশুনার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

মৃদুলের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যূথীর কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। সে মৃদুলের পাষণ্ড স্বামীর অজস্র নিন্দাবাদ করিল। এই দুঃখিনী বালিকার হৃদয় তাহার অনাবিল স্নেহের দ্বারা ভরিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

মৃদুলের কথা-বার্ত্তায় শ্রীতে একটা গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত বটে, কিন্তু তাহা তীব্র নহে, শান্ত মধুর। মৃদুল যেন প্রবল ঝটিকার পর ধীর শান্ত গভীর সমুদ্র! যূথী যতই মৃদুলকে দেখিত, ততই কী একটা অজ্ঞাত শ্রদ্ধা ভক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিত। যূথী তাহার হৃদয়ের আবেগ শান্ত করিতে পারিত না; দুই বাহু দিয়া সে বন্ধুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিত। কিন্তু মৃদুলের নিকট হইতে কোন উদ্দামতার আভাস না পাইলেও তাহার হৃদয়ের ভালবাসার গভীরত্ব যূথী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিত। এইরূপে এই দুইটী নারীর বৈষম্য সত্ত্বেও তাহাদের গভীর ভালবাসার ধারা পরস্পরের হৃদয়কে অভিসিঞ্চিত করিতে লাগিল।

দুই

বসন্তের জ্যোৎস্না স্নাত সন্ধ্যা। যূথী ও মৃদুল বাগানের একপাশে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া-ছিল। অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে; তাহারা স্কুল-জীবন শেষ করিয়া কলেজে পড়িতেছে।

যূথী মৃদুলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিল—"মা-বাবাকে বল মৃদু, আমার বিয়ে ভেঙ্গে দিতে।"

মৃদুল ধমক দিয়া বলিল—"না, এমন অন্যায় কথা আমি তাঁদের বলতে পারব না। কেন, তুই বিয়ে করবি না কেন? শুনেছি তোর মত নিয়েই ছেলেটীকে বিলাত পাঠান হয়েছিল; তখন তোর পছন্দ হয়েছিল, তবে এখন আবার অমত কেন?"

যূথী বলিল,—"না, তুই বাবাকে বল্, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন বল দেখি, আমার কাছে ত তোর কোন কথাই গোপন নেই, তবে বলছিস না কেন যূথী?"

যূথী মৃদুলের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ব্যথা-জড়িতকণ্ঠে বলিল—"বিয়ে হ'লে ত তোকে ছেড়ে যেতে হবে, তোকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না।"

মৃদুলের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; কিন্তু মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ করা মৃদুলের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই হাসিয়া সে বলিল—"ও, এই; এই জন্যে তুই বিয়ে করবি নি, পাগল!"

যূথী অভিমানভরা কণ্ঠে বলিল—"তোর কাছে সামান্য হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি তোর কাছে তুচ্ছ, কিন্তু তুই আমার যে ....." সে আর বলিতে পারিল না; তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

মৃদুল আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—"থাক্, আর অভিমানে কাজ নেই। যদি আমায় ছেড়ে থাক্‌তে না পারিস, তবে বিয়ের পরে তোদের বাড়ীতে আমায় নিয়ে যাস। কেমন, তা' হ'লেই ত হ'ল।"

যূথী আগ্রহপূর্ণকণ্ঠে বলিল—"সত্যি যাবি

বল ? তা' হ'লে আমার বিয়ে করতে কোন অমত নেই।"

মৃদুল বলিল,—"আচ্ছা, আগে বিয়ে হোক্, তারপর এসব কথা।"

যূথী বলিল—"উঁ হুঁ, তা' হবে না; শেষকালে তুই বলবি—'ও মা তা'কি হয়, তোর বাড়ী আমি কি করে' যাব।' সে হবে না; কি হবে আগে থাক্‌তে তোকে সত্যি করে' বল্‌তে হবে।"

মৃদুল বলিল—"আর তোর বর যদি আমায় থাক্‌তে না দেয় ?"

"তোকে থাক্‌তে দেবে না!" যূথীর হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল—"ইস্, বল্লেই হ'ল কি না! তোমায় যদি সম্মান না করে, তবে অমন বর আমার চাই না! তাকে ফেলে আমরা দু'জনেই চলে' আসব।"

মৃদুল যূথীর সরলতাপূর্ণ মুখখানির দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তিন

এ কী অদ্ভুত সংঘটন!

বরের আসনে উপবিষ্ট যূথীর বর মৃদুলের স্বামী মলয়।

মৃদুল শিহরিয়া স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যূথী, যূথী, তাহার প্রাণের যূথী আজ কোথায় গিয়া পড়িতেছে!

মৃদুল আর দাঁড়াইতে পারিল না; ধীরে ধীরে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কি হইল, কি হইবে, কেমন করিয়া সে তাহাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে। যদি যূথী জানিতে পারে সে তাহার কে! না না,—আর মৃদুল ভাবিতে পারিল না। সে কতক্ষণ যে এমন অসাড় অচেতনভাবে পড়িয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; যূথীর ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল—"মৃদু, মৃদু, কি হয়েছে তোর, কেন এমন ভাবে শুয়ে আছিস ভাই?" যূথী আসিয়া ব্যাকুল-উদ্বেগপূর্ণস্বরে মৃদুলকে জিজ্ঞাসা করিল।

মৃদুল চমকিয়া উঠিল! যূথী তাহার আদরের যূথী, কি বলিবে সে। মৃদুল কথা বলিতে পারিল না। যূথী তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদ-কাঁদস্বরে বলিল—"ও মৃদু, কি হয়েছে তোর, বল্ আমায়।"

মৃদু তাহাকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল—"কিছু হয় নি; শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছিল বলে' শুয়ে আছি। তুই কি বাসর থেকে পালিয়ে এলি যূথী ?"

"হ্যাঁ, তোকে যে কতক্ষণ দেখি নি।"

"ছি, যূথি, তোর সব তাতে ছেলেমানুষী! আজকের দিনে এমনভাবে আসতে নেই, যা' শীগ্‌গির।" যূথী আপত্তি করিয়া বলিল "না, আমি যাব না; তোর অসুখ করেছে, আর আমি এখানে থাকব না, বা!"

"যূথী!"

যূথী চমকিয়া উঠিল! মৃদুলের গম্ভীর স্বরকে সে চিনিত। মৃদুল উঠিয়া বসিয়া দৃঢ়-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল—"যা', আমি যা' বলছি, তাই শোন্।" সে স্বর অগ্রাহ্য করিবার শক্তি যূথীর ছিল না।

চার

কয়েক বৎসর গত হইয়াছে।

যূথীর বারবার কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও মৃদুল তাহার সহিত যায় নাই; অসুখের ছল করিয়া অন্য স্থানে আছে। যূথীও অভিমান করিয়া আর তাহার কোন খোঁজ লয় নাই।

যূথী একটি রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়াছে। তাহাকে লইয়া মলয় ব্যতিব্যস্ত। প্রসূতি ও শিশুর ভার লইবার জন্য মলয় মৃদুলকে আহ্বান করিয়াছে। যূথী পীড়িত, মৃদুলের আদরের যূথীর এমন অবস্থা, আর তখনও সে স্থির হইয়া আছে! না, আর নহে, তাহাকে এখনি যাইতে হইবে! কিন্তু মলয়? সেখানে যে সে আছে! তাহাতে কি হইয়াছে, সে কি মলয়কে তাহার যূথীর স্বামী বলিয়া মনে করিতে পারিবে না? কেন পারিবে না, খুব পারিবে! দু'দিনের মিথ্যা সুখ-

স্মৃতি ত! সে অন্তরলোক হইতে তাহা টানিয়া আনিয়া বিস্মৃতির গর্ভে সমাধি দিয়াছে! তথাপি এ ভয় কিসের জন্য? কিন্তু, মলয় যখন তাহাকে চিনিবে, তখন কিন্তু—সেই তখনের কথা ভাবিয়া ত আর সে যূথীকে মরিতে দিতে পারে না। যূথী তাহাকে কি পাষাণী, কি অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছে! কিন্তু একবার যদি সে জানিতে পারিত কিসের ভয়ে তাহার মৃদুল এখন দূরে রহিয়াছে, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতায় হয় ত তাহার হৃদয়ে আপ্লুত হইয়া উঠিত। মৃদুল সেই দিন যূথীর নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তারপর কয়েকদিন যূথীর মান ভাঙ্গাইতে তাহাদের চিকিৎসার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজে সে এত ব্যস্ত ছিল যে, মলয়ের কথা ভাবিতেই সময় পায় নাই। সেদিন একটু অবসর পাইয়াছে। সন্ধ্যার সময় ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে কর্ম্মক্লান্ত দেহটা একটা রেলিংয়ের উপর এলাইয়া দিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় পরিপ্লুত। আকাশের বুকে তারার মালাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, আর মৃদু সমীরণ ফুলের বুকের সুমিষ্ট সুবাসটুকু চুরি করিয়া আনিয়া পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দিতেছে। মৃদুল সমস্ত দেহ মনে কেমন একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

"মৃদুল।"

মৃদুল চমকাইয়া চাহিয়া দেখিল,—মলয় তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মৃদুলের বক্ষ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করিবার শক্তি তাহার অসীম, তাই সে শান্ত ধীরকণ্ঠে বলিল—"আমায় কিছু বলবেন?"

"হাঁ মৃদুল! আমি তোমায় চিনেছি, তোমার কাছে আমি মহা অপরাধী; কিন্তু যদি তুমি এদের কাছে সব বলে' দাও, তবে—" সে আর বলিতে পারিল না; আশঙ্কায় তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল! সে হঠাৎ মৃদুলের পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল—"বল মৃদু, তুমি আমায় ক্ষমা করবে, এসব কথা কিছু বলবে না।"

মৃদুল পিছাইয়া গেল। দারুণ ঘৃণায় তাহার সারা দেহ-মন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছি, ছি, এতবড় হীনও মানুষ হইতে পারে! সে গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল—"আপনার ভয় পাবার কোন আবশ্যক নেই; কারণ, আমার অতীত জীবনের কথা মনে করবার সময় বহুদিন হ'ল চলে গেছে!"

তারপর সে মলয়ের ধন্যবাদ-বাণী শুনিবার জন্য সেখানে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, ধীরপদে নীচে নামিয়া গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই মৃদুলের অক্লান্ত সেবা-যত্নে যূথী সারিয়া উঠিল। মৃদুলকে পাইয়া তাহার আনন্দ উদ্যম শতগুণে বাড়িয়া গেল। মৃদুলও ধীরে ধীরে এই ক'টি প্রাণীর মধ্যে নিজেকে কখনযে মিশাইয়া দিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম সে যাইবার কথা বলিত, কিন্তু যূথী কাঁদিয়া-কাটিয়া এমনই অস্থির হইত যে, তাহাকে শান্ত করিতে মৃদুলের প্রাণান্ত হইত। কিন্তু তারপর তাহারই এমন হইল যে, তাহাদের ছাড়িয়া সে যে কোনদিন যাইতে পারিবে, সে কথা তাহার মনেও উঠিত না। সংসারের সব ভার, যূথীর খোকার ভার সমস্তই তাহার উপর পড়িয়াছিল। যূথীদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ডুবাইয়া দিয়া সেও মনে মনে বেশ খুসী হইয়াছিল। যূথী তাহার উপর সব ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পরম আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। মলয় প্রথম প্রথম তাহাদের আমোদ-প্রমোদে যোগ দিত না, ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা মৃদুলের সঙ্গ এড়াইয়া চলিত। মৃদুল কিন্তু তাহার সহিত বেশ সাধারণভাবে মিশিত। কিছুদিন পরে মলয়ের ভয় ও সঙ্কোচ কাটিয়া গেল; সেও যখন-তখন আসিয়া মৃদুল যূথীর সহিত হাসি-গল্পে যোগ দিতে লাগিল।

কিন্তু মৃদুলের ভাগ্যে এ আনন্দ বেশীদিন

সহিল না। সে লক্ষ্য করিল যে, ক্রমে যেন মলয় তাহার প্রতি বড় বেশী অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছে। সর্ব্বদাই যেন সে তাহার সঙ্গ ভালবাসে। কথা বলিতে বলিতে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। দারুণ অস্বস্তিতে মৃদুলের অন্তর ভরিয়া উঠিল। তাহার উপর যূথার প্রতি মলয়ের একান্ত উদাসীনভাব লক্ষ্য করিয়া সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। সেদিন যূথী কোথায় নিমন্ত্রণ গিয়াছে। মৃদুল খোকাকে লইয়া আদর করিতেছিল। মলয় ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে এমন সময় আসিতে দেখিয়া মৃদুল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মুখে কোন ভাবপ্রকাশ না করিয়া উঠিয়া তাহাকে বসিতে দিল।

মলয় বসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"তোমার সঙ্গে ক'টা কথা আছে মৃদু।"

মৃদুল বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার সঙ্গে! কি কথা?"

মলয় মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"ক'দিন ধরে' অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনমতেই মনকে বোঝাতে পারলুম না যে, এ আমার অন্যায় দাবী। আমাকে তোমার করে' ফিরে পেতেই হবে মৃদুলা।"

মৃদুলা বলিল—"আপনি এ কি বলছেন! যূথী—"

মলয় বাধা দিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল—"না, না, আমার এ প্রার্থনা রাখতেই হবে! তোমার ক্ষমা যদি আমি পাই, যূথীর ভালবাসায়ও আমি বঞ্চিত হব না! তোমায় অদেয় তার কিছুই নেই মৃদু!"

"চুপ, চুপ, ওকথা আর মুখে আনবেন না।" মৃদুলের আর্ত্তস্বর বাজিয়া উঠিল—"এ কি সব বলছেন, কেন আমায় এমনভাবে অপমান করছেন?"

মলয় ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"তোমায় অপমান করি নি, তোমায় অপমান করতে আমি পারি না মৃদু, তুমি যে আমার স্ত্রী!"

বাধা দিয়া মৃদুল বলিল—"স্ত্রী নয়, স্ত্রীর বন্ধু এখন।"

মলয় উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল—"না, না, যতবড় অন্যায়ই করে' থাকি, আজ আর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেব না! আমি নিজে থেকেই যূথীকে বলে' তোমায় ভিক্ষা চেয়ে নেব। তোমার জন্য আমার মন যে কত ব্যাকুল হয়েছে, তা' যদি দেখাতে পারতুম!"

মৃদুল বলিল—"বুঝলুম, আপনার মন অস্থির হয়েছে। কিন্তু আমি বিনীতভাবে বলছি,—আপনি চঞ্চলতাকে দমন করুন; মানুষ জগতে নিজের ইচ্ছাটাকেই পূরণ করতে আসে নি। আমি ক'দিন থেকে আপনার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করছি; কী যে দুঃখ পাচ্ছি আপনার এই অসংযত মনের পরিচয় পেয়ে, তা' ভগবানই জানেন। আমার বিশেষ অনুরোধ,—এ সব কথা আর মনেও আনবেন না। তা' ছাড়া, মিনতি করে' বলছি,—নিজের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে একদিন আমার সর্ব্বনাশ করেছেন, আজ তারই প্রলোভনে আর একজনকে পথে বসাবেন না।"

মলয় আর কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না;—ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মৃদুল দুই হাত দিয়া বক্ষ চাপিয়া ধরিল।

যূথী, তাহার কত আদরের যূথী, তাহার ভাগ্যাকাশের রাহু হইবে সে! ইহা হতেই দুঃখের কথা তাহার আর কি আছে! কিন্তু কি করিবে সে! কি ক্ষমতা আছে তাহার মলয়কে ফিরাইতে!

ছয়

গভীর রজনী।

প্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্য চলিয়াছে। সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া ঝড়ের বিকট গর্জ্জন রাত্রির ভীষণ

অন্ধকারের বক্ষেও চমক লাগাইয়া দিতেছিল। মৃদুল শয্যা ছাড়িয়া উঠিল। আর নয়, তাহাকে যাইতেই হইবে। সে থাকিতে মলয়ের এ মোহ ছিন্ন হইবে না। মলয়ের চক্ষের সম্মুখে থাকিয়া যূথার সর্ব্বনাশ সে আর দেখিতে পারিবে না। যূথী জানিবে মৃদু, তাহার অতিপ্রিয় মৃদু তাহার বন্ধু নয়, সংসার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী। না, না, এ হইতে সে দিবে না! কিন্তু সে যাইবে কোথায়? জীবন-মরুর এই স্নিগ্ধ প্রস্রবণ-ধারা স্বেচ্ছায় রুদ্ধ করিয়া দিয়া কোন অজানা অচেনা বালুকাময় তটে ঘুরিবে সে! তথাপি তাহাকে যাইতেই হইবে—এ সুখের নীড় তাহার ভাঙ্গিতেই হইবে! সে যে এ জীবনে হারাণর পালা গাহিতে আসিয়াছে, মিলনের সুর ধরিলে চলিবে কেন?

মৃদুল সেই ভীষণ ঝটিকাময় রাত্রিতে গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় তাহার গন্তব্য সে জানে না। যূথীর জীবন-যাত্রা সুখময় শান্তিময় করিবার জন্য তাহার সংসার-পথ সুগম করিয়া দিয়া সে হইল দুর্গম মরুপথের উদ্‌ভ্রান্ত পথিক!

—বিপর্য্যয়—

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়
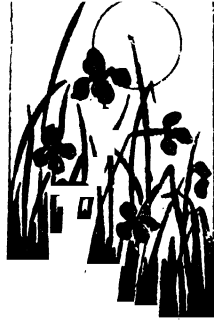
বেণুবনের পাশে অপরিসর লোহার কারখানার ভেতর শম্ভুনাথের দীর্ঘ সাতাশটা বছর নিঝঞ্ঝাটে কেটে গেছে।

পেশীযুক্ত দীর্ঘ হাতের বিরামহীন হাতুড়ির আওয়াজ ঠিক সমানভাবে এখনও চলেছে; কারখানার সামনে কিছু দূরে ঘন কাশবনে ঢাকা অস্পষ্ট গ্রামখানার সঙ্গে সে বেশ ভালভাবে পরিচিত। পশ্চিমদিকে আকাশখানা, যেখানে বড় বড় অর্জ্জুন গাছগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সেখানে দৈনন্দিন সূর্য্যাস্ত সমারোহের সে নিত্য দর্শক।

পৃথিবীর উপর গ্রীষ্মের তাপ সেদিন কিছু বেশীরকম।

কর্ম্মরত শম্ভুনাথের সামনে কে এসে দাঁড়াতেই, ঊর্দ্ধে উত্তলিত হাতুড়িটা নামিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে বললে, ঠাকুর-মশায় বসুন!

হরি ভট্চাজ একটা কাঠের বাক্স টেনে নিয়ে তার উপর বসে বললেন, হ্যাঁরে, এই গরমে তুই কাজ করিস কি করে' বল ত?

শম্ভুনাথ তার স্বাভাবিক হাস্যমুখে বললে, ঠাকুর-মশায়, আমাদের এ অভ্যেস হয়ে গেছে।

দূরে লেলিহান জ্বলন্ত হাপরের দিকে চেয়ে হরি ভট্চাজ বললেন, শম্ভুনাথ, আমার সেই সাবলটা তৈরি হয়েছে?

আজ্ঞে হয়েছে, নেবেন না কি?

ফতুয়ার দুটো পকেটে একবার হাত পূরে হরি ভট্চাজ বললেন, আজ পেলে ভাল হয়, কিন্তু আমার কাছে এখন ত পয়সা নেই।

তা'তে কি হয়েছে ঠাকুর-মশায়, পরে দেবেন'খন।

নব-নির্ম্মিত সাবলটি হাতে নিয়ে হরি ভট্চাজ শম্ভুনাথকে বসতে বলে,' উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে বলে' উঠলেন, শুনেছিস শম্ভু, মালিনী ফিরে এসেছে!

সহসা আকাশ থেকে কুহেলী কেটে গিয়ে প্রভাতের প্রথম আলোটুকু যেমন দপ্ করে' জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি একটা আনন্দ আগ্রহের রেশ হঠাৎ শম্ভুনাথের মুখে প্রতিফলিত হয়ে উঠল; খুব ব্যগ্রভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে, কখন এসেছে ঠাকুর মশায়?

হরি ভট্চাজ মুখের ভাবটায় তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বললেন, কখন এসেছে তা' জানি না; তবে গ্রামের লোক বলে বেড়াচ্ছে, মাগীটা জাত হারিয়ে আবার গ্রামে এসে ঢুকেছে। যত সব কেলেঙ্কারী! গ্রামে যে ভদ্রলোকের বাস করা দায় হ'ল।

শম্ভুনাথ তার স্বাভাবিক নিরীহ চোখের ভাবটা আশ্চর্য্য রকমে বিস্ফারিত করে' বললে, কেলেঙ্কারী কি হয়েছে? মালিনী ত খুব ভাল মেয়ে।

বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে হরি ভট্চাজ বললেন, তোরা কি জানিস? হঠাৎ বুড়ী মাকে নিয়ে গ্রাম থেকে উধাও···আর ঐরূপ কিছু কি না··।

জিভ কেটে শম্ভুনাথ লাফিয়ে উঠে বললে, ছি ছি ঠাকুর-মশায়, ও সে রকম মেয়েই নয়। ও কথা কইবেন না।

রাখ বাপু, রাখ! তোরা ছেলেমানুষ।

মালিনীকে উদ্দেশ্য করে' হরি ভট্চাজ আরো

এমন সব মর্মান্তিক অশ্লীল কটুবাক্য উচ্চারণ করে গেল যে, ঐ কথাগুলো শুনে শম্ভুনাথ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এমনি একদিন গরম কালে শম্ভুনাথ যখন জ্বলন্ত হাপরের সামনে নেয়ানের ওপর লোহা রেখে হাতুড়ির অবিশ্রান্ত ঘা মারছিল, এমন [illegible] যৌবনা মালিনী লীলায়িত গতি ভঙ্গীমায় ছোট্ট কারখানাটার ভেতর ঢুকে শম্ভুনাথের [illegible] বলিষ্ঠ দেহটার দিকে চেয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল। শম্ভুনাথ হাতুড়িটা নামিয়ে কপালের বড় বড় ঘামের ফোঁটা বাঁ হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বললে, মালিনী, কি চাস?

মৃদু হাসির রেখা টেনে মালিনী একটা ছোট্ট উত্তর দিলে, দরকার আছে!

কি দরকার, বল্ না?

আছে, বলছি।

হাতুড়িটা হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে শম্ভুনাথ বললে, মালিনী, তোর মা কেমন আছে?

পায়ের আঙ্গুল ক'টা দিয়ে নেয়ানের উত্তাপটা অনুভব করতে করতে মালিনী বললে, মা ভাল নেই। তারপর একটু থেমে বললে, শম্ভুদা' ছুরিটা একটু শানিয়ে দাও না।

চওড়া হাতখানা বাড়িয়ে মালিনীর হাত থেকে ছুরিটা নিতে গিয়ে অজান্তে তার পেলব হাতের স্পর্শে শম্ভুর সারা গাটা একটা অনাবিল তৃপ্তিতে শিরশির করে' উঠল। মালিনী ততক্ষণ খোলা প্রান্তরের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, শম্ভুদা' আমি আসছি তুমি ছুরিটা ঠিক করে' রেখ।

শম্ভুনাথ ছুরিটা নেয়ানের উপর রেখে বাইরের দারুণ গ্রীষ্মে বিবর্ণ রুক্ষ শ্যামল প্রান্তরটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দূরে গ্রামের সীমানায় পত্রহীন একটা বকুল গাছের ডালে কতকগুলো নির্জীব পাখীর একঘেয়ে ভাঙা ডাকে প্রান্তরের বুকে মৃত্যু যন্ত্রনার একটা বিভীষিকা ফুটে উঠেছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কুঙ্গা বনের ভেতর দিয়ে বড়খালটা জীর্ণ জলধারাটুকু বুকে নিয়ে দীপ্ত মধ্যাহ্নকে যেন ক্লান্তস্বরে জানিয়ে যায়, আর পারি না! কিন্তু সে কথা কে শোনে! শম্ভুনাথের হাতের মত তারও গতির বিরাম নেই।

দূরে কাঁটাবনের ধার দিয়ে মালিনীকে ফিরে আসতে দেখে শম্ভুনাথ তাড়াতাড়ি ছুরি শানাতে বসল। মালিনী সামনে এসে হাসতে হাসতে কোমলস্বরে বললে, এখনও হয় নি?

এই হয়ে গেল বলে' যেমনি শম্ভুনাথ সহাস্য মুখটা মালিনীর প্রতি তুলে চেয়েছে, অমনি মুহূর্ত্তের অসাবধাতায় তার আঙ্গুল কেটে ঝরঝর করে তাজা রক্ত বার হ'তে লাগল।

মালিনী অনতিদূরে একঝাঁক ফুলেভরা ঝুমকাগাছের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। হঠাৎ চোখ ফেরাতেই শম্ভুনাথের আঙ্গুল হতে সদ্যনিঃস্যত রক্তধারার দিকে চেয়ে ব্যাকুলভাবে বললে, ও কি! কি হ'ল?

মালিনী তাড়াতাড়ি তার হাতখানা চেপে ধরতেই শম্ভুনাথ বললে, কিছু হয় নি, ও অমন অনেক কাটে।

কে কথা শোনে, মালিনী এক গোছা দুর্ব্বা তুলে এনে চিবিয়ে শম্ভুনাথের ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে' বললে, এখুনি রক্ত পড়া থেমে যাবে।

মালিনীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখের ওপর ডালের ফাঁকে ফাঁকে মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যের আলোক-রশ্মি সম্পাতে তার স্বাভাবিক মুখশ্রী আরো সুন্দর হয়ে উঠেছিল। সামনে আমগাছের ডাল হ'তে এক ঝাঁক রঙবেরঙের পাখী কিচিমিচি করতে করতে উড়ে গেল।

শম্ভুনাথ মালিনীর নিটোল সুন্দর মুখখানার দিকে অপলক-নেত্রে ক্ষণকাল চেয়ে বলে' উঠল, রক্ত থেমে গেছে, ছেড়ে দে, তোর ছুরিটা আর একটু বাকি আছে।

মালিনী আঙ্গুলটার দিকে ঝুঁকে পড়ে কাটার পরিমানটা দেখে ব্যস্তভাবে বললে, না শম্ভুদা', এখন তাড়াতাড়ি করে' দরকার নেই, সন্ধ্যের সময় নেবখ'ন।

শম্ভুনাথ ক্ষতস্থানটা দেখতে দেখতে বললে, আচ্ছা, আমি সন্ধ্যের সময় তোদের গাঁয়ে যাব, অমনি তোর বাড়ীতে দিয়ে আসব।

গ্রামের একধারে, যেখানে কতকগুলো পেঁপে গাছের পাশ দিয়ে বড় খাল একটা জলের সরু রেখা টেনে চলে গেছে, সেইখানেই একখানি ছোট্ট মেটে ঘর।

মায়ে-ঝিয়ে থাকে। মাটিলেপা দেওয়াল বয়ে নাম-না-জানা কত বনলতা তা'তে উঠেছে। বাইরে হাতে পরিস্কার করা প্রান্তরের খুব ছোট্ট একখণ্ড জমীর উপর মালিনীর রচা বাগান। সেই বাগানের এক ধারে গোলপাতার ছাউনির ভেতর খোঁটায় বাঁধা মালিনীর কালো দেশী বকনা।

অনাবৃত আকাশের তলে একটা স্বল্পায়তন পৃথিবী গড়ে উঠেছে; সেখানে মায়ে-ঝিয়ের অনেক গুলো বছর কেটে গেছে। মালিনীর চোখের উপর ঋতুর কত বিচিত্র উৎসব চলেছে, কে তার সন্ধান রাখে।

পল্লীর আকাশে সবে সন্ধ্যে নেমেছে।

মালিনী তুলসীতলায় সন্ধ্যে প্রদীপ দেখিয়ে টিপ করে' একটা প্রণাম করে' উঠেই দেখে সামনে শম্ভুনাথ।

খুব সন্তর্পণে জ্বলন্ত মৃৎপ্রদীপটা হাতে নিয়ে মালিনী বললে, শম্ভু দা', তোমার হাত কেমন আছে?

ভাল বলে' শম্ভুনাথ ছুরিটা মালিনীর হাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পাশে একটা গোলাপচারার ওপর ছুরিটার ধার পরীক্ষা করতে করতে মালিনী সঙ্কুচিতভাবে বললে, শম্ভু'দা কত দেব?

তার ব্রীড়ানত মুখখানার দিকে চেয়ে শম্ভুনাথ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, তার মানে?

স্নিগ্ধ ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টেনে ঈষৎ অভিমান-মিশ্রিত-স্বরে মালিনী বললে, শম্ভু দা,' আর তোমার কাছে কোন জিনিষ করাব না। প্রত্যেকবারেই তুমি এই কথা বলে এড়িয়ে যাও।

পূর্ব্বদিকে সুপারিগাছের ওপর চাঁদের কিরণ ঝরে পড়েছে। অদূরে ঘন বটপাতার ভেতরে নীড়ভাঙা পাখীদের খস্‌খস্ শব্দ সুরু হয়েছে। মালিনীর স্নিগ্ধ মুখখানার দিকে ক্ষণকাল নীরবে চেয়ে শম্ভুনাথ বললে, পয়সা ত সবারই কাছে পাই, না হয় একজনের কাছে বাদই থেকে গেল।

লাজনম্র আঁখি দু'টি প্রদীপের প্রতি নিবদ্ধ রেখে মালিনী চাপাস্বরে বললে, শুধু শুধু বেগার খাটবে; কেন, পয়সা সস্তা হয়েছে বুঝি?

হাঁ, বলিয়া শম্ভুনাথ মালিনীর আরো নিকটে সরে' এসে ডাকলে, মালিনী, আমি তোকে কত...

যাও, তুমি বড়—বলে' রক্তলতার পাশ কাটিয়ে লজ্জারাঙা মুখে মালিনী শম্ভুনাথের দিকে একটা কটাক্ষ হেনে চলে গেল।

বিশাল প্রান্তরের ওপর ঝাউবনের ফাঁক থেকে সোনালী সূর্য্যের আলো সবেমাত্র প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে। মালিনী ঝারি হাতে বাগানে দাঁড়াতেই পাশের গাঁয়ের মধুসূদন কিছু দূর থেকে বলে উঠল, মালিনী, তোর বকনা কাল বিকেলে আমার বাগানের গাছ-গাছড়া সব নষ্ট করে' ফেলেছে।

নিদ্রালু চোখ দু'টি মধুসূদনের উপর ন্যস্ত করে' অপ্রতিভভাবে মালিনী বললে, কাজের হিড়িকে

কাল বিকেলে বক্‌নাকে বেঁধে রাখতে পারি নি। তাই ত বড় লোকসান হয়ে গেল আপনার। অবলাজাত, অপরাধ নেবেন না।

তা'তে আর কি। তবে কলার ঝাড়টা বড় সখের, একেবারে নষ্ট করে' ফেললে, এই যা'।

তারপর খানিক চুপ করে' থেকে মধুসূদন বলে উঠ্‌ল, হাঁ রে, গরুর দড়িটা একেবারে যে পচে গেছে, বদলে ফেলিস না কেন?

যুঁইগাছের গোড়ায় জল দিতে দিতে মালিনী বললে, দেব এইবার; ক'দিন ধরে ভাবছিও, কিন্তু পাচ্ছি না বলেই হয়ে ওঠে নি।

চোখের দৃষ্টিটা মালিনীর ওপর তীব্রভাবে হেনে মধুসূদন বললে, কাল হাটে গেছলুম, ক'গাছা দড়ি এনেছি; সন্ধ্যের সময় গিয়ে নিয়ে আসিস একগাছা।

মালিনী বললে, বৌদি' এখানে আছেন?

হ্যাঁ।

আচ্ছা যাবখ'ন বলে' মালিনী নিজের কাজে লেগে গেল।

সন্ধ্যের সময় মধুসূদনের দরজায় টোকা পড়তে না পড়তেই উৎসুক হাতে মধুসূদন দরজাটা খুলে দিয়ে বললে, মালিনী এসেছিস; তোরই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। এই মাত্র গোয়ালে গেছে, আমরাও ওখানে যাই চল।

ঘরের কানাচ দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ। দু'জনে গোয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল।

সহসা মালিনীর পেলব হাতটী উত্তেজিতভাবে মধুসূদন দু'হাতে চেপে ধরে' মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে' কি কথা বলতে গেল। মালিনী নিজের প্রাণপণ শক্তিতে হাত ছিনিয়ে নিয়ে তাকে সজোরে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। বোয়ান ঝোপ ধরে' মধুসূদন যখন সামলে উঠল, মালিনী তখন অপরিসর পথটার শেষ সীমানায়।

একবার এদিক ওদিক চেয়ে মধুসূদন সেইপথ ধরে' তাকে ধরতে ছুটেছিল—সহসা পত্নী মৃণালিনীকে সামনে দেখে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়্‌ল! মালিনী একবার সেই দিকে চেয়ে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। নির্মেঘ আকাশে তখন হাজার হাজার ফোটা তারা। নীচে বনানীর স্তব্ধ নিঝুমতা।

পরের দিন দুপুরবেলা মালিনী কচি ঘাসের আঁটি হাতে নিয়ে বকনাকে খাওয়াচ্ছে। এমন সময় একটা কোমল হাতের পরশ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখে শুষ্ক শীর্ণমুখে মৃণালিনী দাঁড়িয়ে। চোখে তার পরাজয়ের তীব্র বেদনার ছায়া!

মালিনী স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, কি বৌদি'?

মৃণালিনী মালিনীর হাতটা নিজের কম্পিত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, কাল সারারাত ভেবেও কোন কুল খুঁজে পাই নি! শুধু এইটুকু বুঝেছি, তুই চোখের ওপর থাকলে ওঁর দুর্মতির অন্ত থাকবে না।

মালিনী একবার মৃণালিনীর মুখের পানে চেয়ে সান্ত্বনার সুরে বল্‌লে, আমিও ওই কথা ভেবেছি বৌদি', আমরা এখান থেকে চলে' যাব!

চলে যাবি?—কবে?

যখন বল; আজই, এখনই।

কৃতজ্ঞতায় মৃণালিনীর দু'টা চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। মুখে কথা বেরুল না।

সেই দিনই নিশীথ রাত্রে মালিনী তার মাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চল্‌তে সুরু করল।

জ্যৈষ্ঠ গোধূলির ম্লানায়মান সন্ধ্যা।

বড় খালের দিকে খানিকটা খোলা প্রান্তরের ওপর বাঁশ পুঁতে তাঁবু তৈরি হয়েছে। গ্রামের ষোল আনার ডাক আজ সেই তাঁবুর ভেতরে। বিষয়টী হ'ল—

মালিনীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে তাকে সমাজ-

চ্যুত করা হবে, এমন কি গ্রাম থেকে একবারে তাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। বিষয়টির সমাধান করবেন গ্রামের দুই মাথা হরিভটচাজ আর মধুসূদন!

একে একে গ্রামের ষোলআনা এসে তাঁবুর তলায় জড় হ'ল। হরিভটচাজ গ্রামের নীচজাতীয় স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে হাত-মুখ নেড়ে বিচিত্রভঙ্গীতে বক্তৃতা দিবার পর বেশ উঁচুগলায় মালিনীকে ডাক দিলেন।

তরুণী মালিনী আঁচলটী গলায় দিয়ে ব্রীড়ানত মুখে ধীরে ধীরে হরিভটচাজের সামনে এসে দাঁড়াল।

হরিভটচাজ তার সুন্দর মুখশ্রী যৌবনের ঢল-ঢল দেহখানার প্রতি একবার তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে নিয়ে অস্বাভাবিক জোরগলায় বললে, মালিনী কেন তুই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছলি?

সলাজ সজল চোখ দু'টি একবার হরিভটচাজের মুখের দিকে ও আর একবার মধুসূদনের মুখের দিকে ফেলে মালিনী ধীরে ধীরে মাটির দিকে নামিয়ে নিলে।

মালিনীর মুখ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে হরিভটচাজ চড়াসুরে বললেন, তোকে সমাজচ্যুত করা হ'ল।

ডাগর চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে মালিনী হরিভটচাজের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একটু থেমে হরিভটচাজ আবার বললেন, বুঝলি?

মালিনীর দু'চোখে তপ্ত অশ্রুভরা; সে ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছি।

মধুসূদন ক্রূরদৃষ্টি হেনে কঠোর ভাষায় মালিনীকে বললে, ভ্রষ্টার স্থান সমাজ ত' চুলোয় যাক্, এ গ্রামেও হবে না।

বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর মত মালিনী একবার বিচারকর্ত্তার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ঘাড় নামিয়ে নিলে।

রামভটচাজ কঠিনসুরে বললেন, হ'তে পারে না, কুলটার স্থান কোনমতেই দেওয়া যেতে পারে না।

মধুসূদন সেই কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠল, এখুনি গ্রাম ছেড়ে চলে যা'।

মালিনীর পায়ের তলায় সারা পৃথিবীটা ভূমিকম্পের মত কাঁপতে লাগল। একবার তার ইচ্ছে হ'ল এই ষোলআনার সামনে দাঁড়িয়ে সে গ্রাম ছাড়ার কারণটা বলে' যায়, কিন্তু আবার কি ভেবে সে চুপ করে' গেল।

চোখ মিলে গ্রামের ষোলআনার দিকে সে চেয়ে দেখলে, কেবল শম্ভুনাথ ছাড়া সকলেই উপস্থিত। তারপর ধীরে ধীরে বড়খালের ধার ধরে' নুয়েপড়া বেতগাছের পাশ দিয়ে শম্ভুনাথের কারখানার দিকে চলতে সুরু করল।

এদিকে হরিভটচাজন আর মধুসূদন ছাড়া গ্রামের ষোলআনা চাপাগলায় কানাকানি করে' বলতে বলতে চলল ভটচাজ-মশায় কাজটা ঠিক করলেন না।

নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা আকাশের নীচে শম্ভুনাথের ছোট কারখানার ভেতর তখনও নেয়ানের ওপর হাতুড়ির ঘা চলছে। মালিনী বাইরে মহুয়া গাছের অন্তরাল থেকে কোমলকণ্ঠে ডাকলে, শম্ভু দা'।

দুটো বছর পর পরিচিতার কণ্ঠে স্বরে চমকে উঠে শম্ভুনাথ বাইরে বেরিয়ে এল। এক টুকরা কালো মেঘ এসে চাঁদের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল, এই মাত্র সরে গিয়ে অন্ধকারকে একটু তরল করে' দিয়েছে।

শম্ভুনাথ বেরিয়ে এসে মহুয়াতলায় মালিনীর সামনে দাঁড়াল। তারপর মালিনীর কোমল হাতটী নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে,

এতদিন কোথায় ছিলি মালিনী; ও কি তুই কাঁদছিস কেন ?

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মালিনী বললে, একফোঁটা চোখের জলের জোরে একদিন গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলুম শম্ভু দা'; আজ নিজের সমস্ত বুকের রক্ত দিয়েও নিজেকে এখানে রাখতে পারলুম না। ষোল-আনা আজ আমায় সমাজ ছাড়া, গ্রাম ছাড়া করেছে। এখুনি আমায় এখান থেকে চলে' যেতে হবে।

শম্ভুনাথ মালিনীর আরো কাছে সরে' এসে তার পেলব হাতটি আপনার দুটো হাতের মুঠোর মধ্যে আরো জোরে চেপে ধরে বললে, আমি ত তোকে ছাড়ব না। তোকে নিয়ে আমি ষোল-আনার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।

দৃঢ়স্বরে মালিনী বললে, পারবে ?

পারব, পারব! আমার কাছে ভগবানের চেয়েও বড় তুই; তোর গা ছুঁয়ে বলছি, খুব পারব! হ'ল ত ?

মালিনীর অশ্রুভারানত চোখ দুটির তলে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। শম্ভুনাথের কাঁধের ওপর তার কোমল হাতখানি রেখে সে বললে, তবে তাই হোক! মা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন মনে করে' ছিলুম ঘরের প্রয়োজন আমার শেষ হয়েছে; আজ বুঝেছি, সুরুরই দিন তখন আসে নি। চল, ভেতরে যাই।

তার পরের দিনেই,—

পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের মেলা সবে সুরু হয়েছে।

হরি ভট্চাজ আর মধুসূদন শম্ভুনাথের দোকানের সামনে দিয়ে ও গ্রামের হাটে যাচ্ছিল।

কি ভেবে মধুসূদন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলে, শম্ভুনাথ!

শম্ভুনাথ মালিনীকে নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

দু'জনের গা রাগে শিরশির করে' উঠল। মধুসূদন একটা ক্রোধ কটাক্ষ মালিনীর দিকে হেনে তীব্রস্বরে বললে, তুই এখনও যাস নি।

মালিনীর হয়ে শম্ভুনাথই উত্তর দিলে, ও যেতে চেয়েছিল, আমিই যেতে দিইনি ঠাকুর-মশায়। পরের কথায় নিজের স্ত্রীকে ভাসিয়ে দিতে যে পারে পারুক, আমি পারব না।

ক্রোধকম্পিতস্বরে মধুসূদন বললে, তোকেও তা' হ'লে সমাজ ছাড়া, গ্রাম ছাড়া হতে হবে!

মাংসপেশল প্রশস্ত হাতখানা নেড়ে নির্ভীক ভাবে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে শম্ভুনাথ বললে, সমাজ যদি আমায় ছাড়ে, তা'তে আপত্তি নেই ঠাকুর-মশায়; কারণ সেটা আপনাদের হাতে—কিন্তু গ্রাম আমি কোনমতেই ছাড়ব না—এর জন্যে যদি প্রাণও যায় আপত্তি নেই।

হরি ভট্চাজ মধুসূদনের হাতটা ধরে' টানতে টানতে শম্ভুনাথের বলিষ্ঠ দেহখানার দিকে চেয়ে বললে, ভেতরে যা' শম্ভু, রাগ করিস নি; আর আমার নূতন সাবলটা আর একবার একটু ধার করে' দিস্।

—ব্যথার মরু—

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রশান্ত শ্যামল বনের মধ্য দিয়া সরু বন-রেখা সীমা ছাড়াইয়া সুদূর মাঠের বুকে গিয়া মিশিয়াছে। কয়েকখানা মাঠের পারেই ওধারে কুসুমপুর গ্রাম। বন মাঠ, ও গাঁয়ের সাথে ওপরের মেঘের লীলার মায়া যেন সস্নেহে মিতালী বাঁধিয়া দিয়াছে। গাঁয়ের পথের প্রান্তে অসংখ্য খর্জ্জুরের সারি যেন ক্লান্ত পথিকের অভিবাদনের জন্য মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অদূরে বিশাল বুড়া বট মায়ার কোল পাতিয়া ক্লান্তের শ্রান্তি হরণের জন্য কোমল ছায়ার আঁচল বিছাইয়াছে। এই সুশ্যামল ছায়ার মায়াপুরের পাশে পাশে ডুলে বাগ্দীদের ছোট ছোট জীর্ণ সুন্দর নীড় নিজের অস্তিত্ব লইয়া আজও শোভন হইয়া আছে। পাশে পাশে পানাভরা খানা-ডোবাগুলির বুকে পচুরী শিশুর দল বর্দ্ধমান হইয়া চলিয়াছে।

গ্রামের হারানো মহিমার বুকে বসিয়া মাধব রায় আজও মাইনার স্কুলের মায়ায় বাঁধা রহিয়াছেন আগের কুসুমপুরের কথা মনে হইলে এখনও তাঁহার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

সে আজ বহুদিনের কথা; যেদিন তিনি অনাহুত হইয়া আসিয়া ছোট গ্রামের পাঠশালাটীকে মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। সেখানকার কত ছেলেকে মানুষ করিতে পারার গর্ব্ব আজও তাঁহার মনে নিজস্ব হইয়া রহিয়াছে।

তাহাদের সহর বাসের মোহ গ্রামের মায়া ছাড়াইয়া গেছে—তাই মাঝে মাঝে আনন্দ-বেদনায় ওই ঘরছাড়াদের জন্য তাঁহার মন কি জানি কেন আজও চঞ্চল হইয়া উঠে।

স্কুলটীকে তিনি বুকের রক্ত দিয়া ছোট শিশুর মতই লালন করিয়াছেন—ভাঙার বেলায় তাই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখার কথাই মনে তাঁর মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

গৃহিণী আনন্দময়ীর যত্নে রায়-মহাশয়ের সংসার কোনরূপে চলিয়া যায়। তাঁহাদের সবেমাত্র একটী মেয়ে—মাধবী। তাহা হইলে কি হয়—সমস্ত গ্রামের দীন সংসারে তাঁহারা যেন 'সব কিছু' হইয়া আছেন। গ্রামবাসীদের দুঃখ-বেদনায় রায়-মহাশয়কে বেদনার অংশ লইতে হয়। দুঃস্থ গ্রামের বৃহৎ গোষ্ঠী লইয়া রায়-পরিবারের দিন সত্যই আনন্দের হাসি লইয়া বিদায় লয়। গ্রামের ছেলেদের ভবিষ্য জীবনের সুন্দর পরিকল্পনার আনন্দে মাধব রায় সব সময়েই মশগুল থাকেন। রায়-গৃহিণী পরের ছেলের জননীর আসন লইয়া সব ছেলেদের মা হইতে পারার গর্ব্ব অনুভব করেন।

মাধবী তাহাদের সঙ্গে খেলাধূলায় পড়ায় এক সঙ্গে বাড়িয়া উঠে।

গ্রামের অজিত দা'ই তাহার সব চেয়ে প্রিয় সহচর।

বনের ধারের শিয়াকুল বৈঁচি তোলার সময় তাই তাহার অজিত দা'র সঙ্গ না হইলে চলে না।

রায় দম্পতী ইহাদের শিশু-জীবনের সহজ ভালবাসায় যেন মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন—না জানি কিসের আশায়।

ক্রমে মাধবীর খেলার বয়স ফুরাইয়া যায়। মাধবীর সর্ব্বাঙ্গে কৈশোর যেন তার লীলার তুলি বুলাইয়া দেয়। ছোট্ট মাধবী যেন কোন্ যাদু-করের মদির স্পর্শের শিহরণে সচকিত হইয়া উঠে।

অজিত দা'র সুমুখে আজ মাধবীর স্বচ্ছন্দ চলার ছন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠে না—যেন কোথায় তার চরণের সহজ গতি কি জানি কেন বাধিয়া গিয়াছে।

সেদিন অজিত বাহির হইতে 'কাকীমা' বলিয়া ডাক দিতেই—ভিতর হইতে রায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"কে অজু, এস বাবা—এস।"

অজিত বলিল—"মাধু কই কাকীমা।"

হাসিয়া উঠিয়া মা জোরে ডাক দিয়া বলিলেন—"কই রে মাধু, এধারে আয়। তোর অজিত দা'কে আবার এত লজ্জা করতে শিখলি কবে থেকে ?"

"ধ্যাৎ, তা' কেন ?" বলিয়া লজ্জার ঝুড়ি লইয়া মাধবী মুখ নত করিয়া নীরবে অজিতের সুমুখে আসিয়া দাঁড়ায়।

মাধবীর রূপের লীলা যুবক অজিতের মনে যেন নূতন করিয়া আনন্দের দোল দিয়া উঠে। মনে মনে অজিত ভাবে—এই কি সে চটুল মাধু ? যার খেয়াল চরিতার্থের জন্ম আম্রবনের ফাঁকে ফাঁকে তার কাঁচামিঠে আম পাড়ার সমারোহে হয় ত কোনদিন সারা দুপুর কাটিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ দক্ষিণ হস্তের কব্জীর নীচে তার কাটার দাগটা নজরে পড়িতেই সে মনে মনে হাসিয়া উঠিল।

কাটার দাগটুকু সব নিঃশেষ করিয়া অজিত "কাল আসব 'খন কাকীমা" বলিয়া উঠিয়া পড়ে।

মাধবী লোকের গোড়ার ফাঁক হইতে একবার চোখ তুলিয়া চকিতে দেখিয়া লইয়া অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠে—"ঠিক এসো কিন্তু অজু দা'।"

পরের দিনের আসার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া চাহিয়া মাধবীর দীর্ঘবেলার অবসান হইয়া যায়।

আবার ভোরের আলো আশার নবীন উৎসাহে মাধবীর সমস্ত ক্ষণকে সজীব সুন্দর করিয়া তুলে।

দু'টী শুভ্র বুকের আশা-আনন্দ ভাঙা-গড়ার ফাঁকে ফাঁকে কোন্ এক শুভ-মুহূর্ত্তে মনের ভাব বিনিময় হইয়া যায়—পরস্পর পরস্পরের অতি নিকট হইয়া পড়ে।

মাধবী তাহার সমস্ত জীবনের সরলতা দিয়া অজিতকেই কোন অজানা মুহূর্ত্তে প্রিয়তমের আসন দিয়া বসে—নির্ব্বিচারে। তার মনের মণিকোঠায় অজ্ঞাতসারে জীবন-দেবতার আসন কখন পাতা হইয়া গেছে—সে জানে না।

দু'টী জীবনের হাস্যউচ্ছল মাধুরী ঝরিয়া পড়ার ক্ষণে যেন মা-বাপের মনের কাণা আনন্দের বানে ভরিয়া যায় ; তাহাদের পাল্‌টী ঘরের ছেলেই যে এই অজিত।

অজিতের মা রাধারাণী দেবী বিবাহ অনুষ্ঠানের আগেই রায়-গৃহিণীর সহিত বেয়ান সম্বন্ধ যেন কায়েম করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

•

কুসুমপুর গ্রামের প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সে বছর যেন বসন্ত রোগের বীভৎস লীলায় ছাইয়া গেল।

মাধবী তাহার আক্রমণে শয্যাশায়ী হইল। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে বিছানায় শুইয়া শ্যামা ধরণীর পানে চাহিতে চাহিতে তাহার ধরার মায়ায় মুগ্ধ চোখ দু'টী হইতে অবিরল বেদনার অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। অজিতের প্রেমই তাহার নিকট ধরণীকে এত সুন্দর করিয়া রঙাইয়া তুলিয়াছে। প্রিয়তমকে দিয়া তাহার জীবনের এতটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয় নাই—তাই মরণের বাঁশীর সুর তাহার কাণে এমনিই করুণ হইয়া বাজিয়া

উঠিয়াছে। সুন্দর ভুবনের আলো-ছায়ার মেলায় সে যে একমাত্র অজিতের জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে চায়।

মরণ-দেবতা যেন মাধবীর মিনতির আবেদনে সত্যই বিচলিত হইয়া গেল। রোগ তাহাকে রেহাই দিল—তাহার অপরূপ রূপ-শ্রী লইয়া। আজ যার জন্য তাহার বাঁচিয়া থাকার বিপুল পুলক, তার অনুরাগ যে হায় বিরাগে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে! যেন তাহার রূপের জন্য সে অপরাধী।

যে নারী জীবন ব্যর্থতার আঁধারে ডুবিয়া গেল,—তাহার বাঁচিয়া থাকার আনন্দ কোথায়? রূপহীনা মাধবীর বুকের ব্যথা আজ যেন বেদনায় মূক হইয়া গেছে।

সৌন্দর্য্যপিপাসু কলেজে-পড়া অজিত নূতন প্রেমের মধু সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে। শিক্ষিতা তন্বী লীলার লীলায়িত মোহন চরণের চলার ছন্দে নিজের মনের মাধুরী মিশাইয়া দু'জনে সুখের নীড় বাঁধে।

আর মাধবী—

হাজারীবাগের কোন্ একটা মেয়ে স্কুলের চাকরী নিয়া আজও বুকের মাঝে ব্যথার মরু জাগাইয়া রাখে।

কুসুমপুরের কথা মনে হইলে এখনও বেদনায় তার মনের চোখ দু'টি জলে ভরিয়া উঠে কি না—কে জানে!

—বিদায় বন্ধু—

শ্রীশম্ভুনাথ বসু

বাতাসে তখন সবেমাত্র শীতের আমেজ দিতে সুরু করেছে। শহরটা এতদিন মরেছিল যেন; শীতের স্পর্শে জেগে উঠে আবার জীবনের স্পন্দন অনুভব করছে।

তার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। বন্ধু পরিচয় করিয়ে দিলে, নাম লাবণ্য।—লাবণ্যকে আমার ভাল-লাগল।

বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু বেড়াতে।—পথের মাঝে লাবণ্যদের সহিত দেখা হ'ল, বনের পথ ধরে সে ছুটছিল আর একটী মেয়ের সঙ্গে।—

বন্ধুকে দেখে সে বললে—এই যে সমীর দা'। দাও ত ঐ খরগোসের বাচ্ছাটা ধরে'। বলে সমীরকে দূরের একটা খরগোস দেখিয়ে দিলে।—তার সাথী মেয়েটী তখন ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছিল।

লাবণ্যর ছিল এলো খোঁপা, তাই থেকে যে কয়টী কেশ গুচ্ছ খসে পড়ে' তার চোখ-মুখের ওপর এসে পড়েছিল, সেগুলো ঝিরঝিরে হাওয়ায় উড়ছিল!—সে তার সুন্দর মুখ-টী তুলে এই কথা গুলো বললে।—এই বলার মধ্যে ছিল আদর, ছিল অনুযোগ, ছিল আদেশ—ছিল ভালবাসার সুর। লাবণ্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।—কপালে লেগেছিল মুক্তা-বিন্দুর মত কয়েক বিন্দু ঘাম।—আদর করে' সেগুলো নিজের রুমালে মুছিয়ে দিয়ে সমীর বললে—বড্ড ঘেমে উঠেছ রাণী।…কি বোকা তুমি।…ওকি ধরা দেয়, না ওকে ধরা সহজ?…তোমার মত বড় দুষ্টু।…সহজে ধরা দেয় না।…বলে'সমীর লাবণ্যকে একটু আদর করলে।—লাবণ্যকে রাণী বলে ডাকতে সে ভালবাসে।

লজ্জায় মিশে যাচ্ছিলাম মাটীতে একেবারে।—পথের মাঝে তাদের এ কি কাণ্ড! লাবণ্যর সহচরীর দিকে একবার দেখলাম—সকালের আর সাঁঝের সিঁদুর রং সেখানে-ও।—

এবারে সহচরীর নাম শুনলাম—সন্ধ্যা।—মস্তবড় অফিসারের মেয়ে—লাবণ্য বললে।—বললে—দেখুন না সন্ধ্যার বাবাকে একবার ধরে' চাকরী একটা হয়ে গেলেও যেতে পারে।—সন্ধ্যা আপনার হয়ে সুপারিশ করবে 'খন তার বাবার কাছে—বলে লাবণ্য হাসতে লাগল। -

সন্ধ্যা দিলে সে কথার উত্তর।—হাসতে হাসতে বললে—সুপারিশ করা আমার স্বভাব নয়; আপনি তার কথা বিশ্বাস করবেন না।—

এবারেও কথা কইলে লাবণ্য।—সুপারিশ করা তোর স্বভাব নয়? সমীর দা'র কথা কে আমায় রোজ রোজ বলত রে? তুই ত রোজ বলতিস্—জানিস ভাই লাবু, ওদের ঐ ছেলেটা তোকে দেখে একেবারে—

বাধা দিলে সমীর।—বললে—আঃ, কি হচ্ছে রাণী! জানো সন্ধ্যার কাছে আমরা কত ঋণে ঋণী? মাঝে সে না থাকলে আমাদের আলাপ হ'ত কি করে'? তার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।—

এত উচিত-অনুচিতের কথা জানি না, তবে সে মিথ্যা কথাই বা বলবে কেন?—লাবণ্য ঝঙ্কার দিলে।—

সন্ধ্যা এবারে নিজের দোষ স্বীকার করলে।—তারপর আমায় বললে—চলে আসুন আমার

সঙ্গে, তারা দু'জনে ঝগড়া করুক এক পাথরে বসে' বসে'।—বলে' সন্ধ্যা একটু হাসলে।—

লক্ষ্য করি নি সমীর কখন লাবণ্যর পাশে বসে' পড়েছে।—বল্লাম—তাই চলুন।—

স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া এসে মনটাকে একটু সজীব করে' দিয়ে গেল।—পাহাড়ের ওপর অনেকক্ষণ বেড়ালাম। রৌদ্রের তেজ আর সহ্য হচ্ছিল না, নামতে সুরু করেছি, সন্ধ্যা সাবধান করে' দিলে। —বললে—দেখছেন না ওরা দু'জনে এখনো গল্প করছে। এত তাড়াতাড়ি নেমে কি হবে? সমীর দা' বিরক্ত হবে, আর লাবু হয় ত আমায় তেড়ে মারতেই আসবে।—তার চেয়ে এখন না নামাই ভাল।—

ক্লান্ত হয়েছিলাম, ছোট একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলাম।—সন্ধ্যাও পাশে এল।—লজ্জা এদের নেই।—দূরে লাবণ্য আর সমীরকে আসতে দেখলাম।—সন্ধ্যাকে বল্লাম—চলুন, আমরা নামতে সুরু করি, তারা আসছে।—

তা'তে কি হয়েছে?—সন্ধ্যা বললে।—তারা আসুক না একসঙ্গে নামা যাবে 'খন।—

না, তার আগেই চলুন, এ বড় বিশ্রী—বল্লাম—!

আচ্ছা লোক ত আপনি! সন্ধ্যা হেসে বললে —এতটা সময় একলা আমার সঙ্গে কাটালেন, আর এখন দু'জনকে এক গাছতলায় দেখবে বলে' এত ভয় খাচ্ছেন? সমীর দা'কে বলতে হবে এ কথা।—

সে জন্য নয়—বল্লাম।—

তবে কি জন্যে বলুন? সন্ধ্যা প্রশ্ন করলে।—বিশ্রীটা কি? একসঙ্গে বসে' থাকা, না একসঙ্গে—

সন্ধ্যা তার কথা শেষ করলে না।—হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।—হাসির পালা শেষ হ'লে বললে—এতটা ভয় কেন বলুন ত? আমাদের নিজেদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মনে করেন?—এবার গম্ভীর সুর।—

চুপ করে' রইলাম।—

সমীর আর লাবণ্য দু'জনেই এল।—সন্ধ্যা তাদের সে কথার কিছুই বললে না।—মনে মনে তার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।—অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে হাসি চলছিল।—আকাশ-বাতাসে তার প্রতিধ্বনি।—দূরে সাদা মতন দুটো কি দেখা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে'।—এতক্ষণে কাছে এল।—সাহেব আর মেম।—পাহাড়ের ওপর উঠেছে। লাবণ্যর হাসি ধরছিল না।—মেমটার সঙ্গে আর একটু হ'লেই ধাক্কা লাগিয়েছিল আর কি! মেমটী হেসে সরে' গেল। 'সরি'—বলে লাবণ্য শুধরে নিলে।—মেমটা তার সমবয়সী কি দু'-এক বছরের বড় হবে।—"ডোণ্ট মাইণ্ড" বলে' সেও একটু হেসে নিলে।—পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পেরেছে যেন।

বিদেশে বন্ধুর বাড়ী, দু'দিনের অতিথি আমি। —খাতির-যত্নের শেষ ছিল না।—লাবণ্য আর সন্ধ্যা দু'জনকেই কাছে পেতাম।—

বিকালে সেদিন একটু দূরে যাওয়া হ'ল।—বাড়ী ফিরতে লাবণ্যর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। —সমীর একটু গরম সুরে বল্লে—এখন থেকে এত অবাধ্য হয়ো না রাণী! যা' বলছি, লক্ষ্মী মেয়ের মত শোন।—

লক্ষ্মী কিন্তু লাবণ্য হতে চায় না।—বললে—আমি চঞ্চলই থাকব।—কাজ কি আমার লক্ষ্মী হয়ে? চঞ্চলতাই ত যৌবনের লক্ষণ।—বুড়ো ত হই নি এই বয়সেই।—

সন্ধ্যা কিন্তু ফিরতে চায়।—আমার ওপর দরদ দেখিয়ে বললে—চল না লাবু, দেখছিস না নির্ম্মলবাবু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।—

ক্লান্ত আমি হই নি—একথা ওদের জানিয়ে দিই।—বলি—না না, এত তাড়াতাড়ি ফেরবার কোন দরকার নেই। কচি ঘাসগুলোর ওপর একটু বসা যাক্।

লাবণ্য জোর পায়। হেসে বলে—আচ্ছা, ভোট নেওয়া যাক্। কে কে ফিরতে রাজী আছ, হাত তোল।

হাত কিন্তু কেউ তোলে না—সমীরও না। গলা ছেড়ে লাবণ্য গান ধরে—

জীবনে যত পূজা
হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাহা
হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাহা
হয় নি হারা।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম। গানের তারিফ করলে সমীর আর সন্ধ্যা। চুপ হয়ে গেলাম। রাস্তার বাতি অনেক আগে জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। সকলেই চুপ। যেন বাণীহারা দেশের লোক সব, কথা নেই মুখে কারও। চমক লাগিয়েছিল লাবণ্য—ভাঙলেও সে। একটা গাড়ী ভাড়া করে' বাড়ী ফেরা গেল সেদিন। রাত অনেক টা হয়ে গিয়েছিল তখন।

পরদিন লাবণ্যকে একটু বিষণ্ণ দেখলাম।—কি যেন হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন বাধ-বাধ লাগলো। নদী এত শীগগির মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেললে? ফুল না ফুটেই ঝরে গেল না কি?

সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলাম।—বললে—মাঝে মাঝে ও অমন হয়ে পড়ে, ওটা ওর অভ্যাস। দেখুন না, এখুনি ধাক্কা সামলে নিলে বলে'। সামলেও নিলে। মেঘ কেটে গেছে, ঝলকে ঝলকে স্নিগ্ধ রোদ্দুর বেরিয়ে আসছে তখন। লাবণ্যকে দেখে সন্ধ্যা হাসলে। আমিও।

লাবণ্য বললে—চলুম, একটু বেড়িয়ে আসি। সমীর দা'র ঘর থেকে একটা গায়ের কাপড় এনে দিন ত দয়া করে, একটু শীত পাচ্ছে।

মোটা গোছের একটা গরম কাপড় ছিল, সেইটা নিয়ে এলাম। লাবণ্য হেসে বললে—ও গায়ের কাপড় আমাদের মত নরম গায়ের জন্য নয়। আপনি বরং ওটা নিন, আপনার গায়ের ঐ পাতলাটা আমায় দিন—বলে লাবণ্য হাত বাড়ালে। ইতস্ততঃ না করে' আমার-টাই দিয়ে দিলাম। সন্ধ্যা একবার আমার দিকে চাইলে। একটু হেসে নিলে, কোন কথা বললে না। সেদিন কাটল। পৃথিবী হ'তে পরমায়ু একদিন কমে গেল।

সন্ধ্যা একদিন জিজ্ঞাসা করলে—কলকাতায় সমীর দা'র বাড়ী বুঝি আপনার বাড়ীর কাছেই?

কাছে নয়, পাশেই,—একেবারে গায়ে গায়ে—বললাম।

একটা নিশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলো। তারপর বললে—লাবণ্যর সঙ্গে তা' হ'লে আপনার রোজই দেখা হবে বলুন? বে' ত হচ্ছে ওদের আসছে মাসেই।

কৈ সমীর ত আমায় একথা বলে নি একবারও—অবাক হয়ে বললাম।

অবাক হচ্ছেন কেন? একদিন ত হবেই।—সন্ধ্যা হেসে বললে। আজই শুনতে পাবেন। বে' পর্য্যন্ত আপনাকে এখানে থাকতে হবে যে।

দিন ছয়েক পরে লাবণ্য আমায় একবার বললে—সন্ধ্যাকে ছাড়তে আমার বড়ই কষ্ট হবে। ওকে আমি বড় ভালবাসি। চিরকাল দু'জনে পাশাপাশি থাকবো, এই সর্ত্তে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। পাশাপাশি দুটো ঘরের গৃহিণী হব ও আর আমি। জানালায় দাঁড়িয়ে দু'জনে কত

কথা কইবো,—ছেলে কেঁদে কোকিয়ে উঠবে—দু'জনেই জানালা থেকে দৌড়ে চলে যাব,—এ সর্ত্ত ও সেদিন অবধি আমায় মনে করিয়ে দিয়েছে। ওকে এখন কি করি বলুন দেখি—বলে লাবণ্য হাসতে লাগল।

সন্ধ্যার সেদিনকার কথা মনে পড়ল। নিঃশ্বাস ফেলে কেন খানিকক্ষণ চুপ করেছিল, তাও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। লাবণ্যকে কোন কথা-না বলে' টেবিল হ'তে একখানা বই তুলে নিলাম। মাথা গুলিয়ে গেছে তখন।

দু'দিন বাদে আভাসে সমীরও কথাটা জানালে। প্রশ্ন করলে—তোর কি রকম লাগছে রে নির্ম্মল ?

বেশ ভালই—বললাম।

আচ্ছা রাণীকে—মানে লাবণ্যকে কি রকম বুঝছিস ?

এ প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়, আলোচনায় কোন লাভ নেই—বললাম।

রাণীকে না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু সন্ধ্যা কেমন ?—সে জিজ্ঞাসা করলে।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—সন্ধ্যার মতই সুন্দর। নাম রাখা সার্থক।

পিছনে হাসির শব্দ। হাসতে হাসতে লাবণ্য ঘরে ঢুকছে। আমায় বললে—বেড়াতে যাবেন না আজ ? হ্যাঁ, সন্ধ্যার এত সুখ্যাতি করছিলেন কেন বলুন ত ?

সব শুনে ফেলেছেন তা' হ'লে ?—হেসে হেসে প্রশ্ন করলাম।

শুনেছি বৈকি! ঘাড় নাড়িয়ে লাবণ্য বললে।—সেই জন্যেই ত অত হাসছিলাম।

কি রে বেড়াতে যাবি নি বুঝি ?—সমীর আর একবার তাগাদা দিলে।

এই যে যাচ্ছি ভাই, তোরা ততক্ষণে একটু এগো—জামা পরতে পরতে বললাম।

না, একসঙ্গেই যাব—লাবণ্য বললে। সন্ধ্যা ত এখনও আসছে না, তার জন্যেও ত অপেক্ষা করতে হবে—বলে লাবণ্য একটু হাসলে।

চুল ঠিক করবার জন্য আরসীর সামনে ফিরে দাঁড়ালাম।—লাবণ্য তখনও হাসছে। ইসারায় সমীর ওকে চুপ করতে বলছে। আরসীর ভেতর দিয়ে সমস্তই দেখলাম।

সন্ধ্যা এসে পড়ল। কচি কলাপাতা রং-এর সাড়ী পরণে, পায়ে ভাল দামী নাগরা।—বেশ মানিয়েছিল। আনন্দের একটা শিহরণ আমাকে স্পর্শ করে গেল।

লাবণ্য সেদিন আমাকে শুধোলে—তার বিয়ে পর্য্যন্ত আছি কি না ?

থাকব নিশ্চয়ই—জবাব দিলাম। কাল বাড়ীর জন্য রওনা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা' আর হবে না। বাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দি' যে, দিন পনের পরে যাব। কি বলেন ? লাবণ্যকে প্রশ্ন করলাম।

সে ত ভাল কথা—লাবণ্য উত্তর দিলে।

বিয়ে তাদের হয়ে গেল।

বাড়ী যাব বলে সুটকেশ-টা গুছিয়ে নিতে বসলাম। আর ভাল লাগছিল না। ঝরণার মত যে লাবণ্য ছিল—সে এই ক'দিনেই কি রকম বদলে গেল। নদী মরুপথে হারাল না, হারাল সমীরের মধ্যে।

দিনটা সেদিন কাটছিল না। লাবণ্যকে আর কাছে পেতাম না তেমন—পেতাম সন্ধ্যাকে। সন্ধ্যাকে বললাম—একটা বই দিতে পারেন—পড়ব ?

গোকুল নাগের 'পথিক' নিয়ে এল। বই-টা খুব ভাল, আমার ভাল লাগে—সন্ধ্যা বললে। আপনার কি রকম লাগে পড়ে বলবেন।

আমার দেওয়া কোন উপহার নেবেন ত ? সন্ধ্যা হঠাৎ প্রশ্ন করলে।

সানন্দে, মাথা পেতে—বল্‌লাম।

আচ্ছা বই-টা একবার দিন ত—বলে আমার কাছ থেকে বই-টা সন্ধ্যা নিলে।

এই বই-টাই আপনাকে উপহার দিচ্ছি—সন্ধ্যা বললে। টেবিলের ওপর থেকে কলমটা নিয়ে উপহার পৃষ্ঠায় লিখে দিলে—পথিক-বন্ধুকে ভুলবেন না যেন!

না, ভুলব না, চিরকালই আপনাকে মনে থাকবে—সন্ধ্যাকে বল্‌লাম।

চিরকাল আপনার মনে বেঁচে থাকতে পারি, এতটা পরমায়ু আমার নেই—ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বললে।

নিস্তব্ধতায় ঘর-টা ভরে' উঠল।

আমাদের ঘরে আসুন না কেন? দু'জনে একসঙ্গে জীবন কাটাব—আবেগভরে কম্পিত কণ্ঠে সন্ধ্যাকে বললাম। আপনারও ত এই ইচ্ছা লাবণ্যর মুখে শুনেছি।

ইচ্ছা একদিন ছিল, কিন্তু আজ আর নেই—সন্ধ্যা জবাব দিলে। ইচ্ছা ছিল বলেই ত সমীর দা' আপনাকে এখানে আনালেন—সন্ধ্যা বলে' চলল। ভাল ছেলে হ'লেও মাঝে মাঝে তাদের দুঃখ পেতে হয়, আপনাকেও পেতে হবে। মনের কথা তারা স্পষ্ট করে' বলে না, কি জানি ভাল নামটা যদি খারাপ হয়ে যায় এই ভয়ে। আপনারও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে, এখন অনুশোচনা করতে হবে বৈকি। দিনকতক পরে আমাকেও পরের ঘর করতে চলে যেতে হচ্ছে। সবই ঠিক হয়ে গেছে, এখন আর কোন উপায় নেই। বসে' বসে' অনুশোচনায় পুড়ে মরুন—এই বলে' সন্ধ্যা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল।

বছর খানেক হ'ল কলকাতায় নিজের বাড়ীতে ফিরে এসেছি। লাবণ্য সেদিন একটা পুঁটুলির সঙ্গে হাতে একখানা চিঠি দিলে। বললে—সন্ধ্যার চিঠি, পুঁটুলিটাও তার। আজ দিন পাঁচ ছয় হ'ল মারা গেছে!

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাথার পরে বাজ পড়েছে। বুকেও।

এত কাছে এসেছিল, তবু মরবার আগে একবার দেখা করতে পারলুম না—লাবণ্য বললে। বললে—গার্ডেনরীচের কোন একটা বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিল আজ তিন মাস। বিয়ের দিন দুই আগে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল। মরবার আগে আমায় একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। নাম ঠিকানা সবই লিখেছে, কেবল ডাকে দেয় নি। তা'হ'লে হয় ত তার সঙ্গে আর একবার শেষ দেখা হ'ত। এগুলো আপনাকে দিতে অনুরোধ করেছে। লাবণ্য দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে।

হাত বাড়িয়ে সমস্ত নিলাম। চোখ দিয়ে আমার জল পড়ল না—সরস পদার্থ কিছু ছিল না হয় ত। শরীরের সবই শুকনো হয়ে গেছে।

গার্ডেনরীচ-এ এত কাছে এসেছিল—তবু জানতে দেয় নি। স্কুলগুলোর সামনে দিয়ে এই সেদিনও ত বেড়িয়ে এসেছি; কেন একবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল না? তা' হ'লে হয় ত এমন হ'ত না। অন্ধকার রাত্রির মধ্যে সন্ধ্যা যে কোথায় আত্মগোপন করে, কেউ তা' জানে না। দু'টী ফুলের একটী না ফুটেই অকালে ঝরে পড়ল। স্রোতকে ভিন্ন মুখে ফেরাতে আমি ত চেয়েছিলাম, কিন্তু সে রাজী হ'ল না। দুর্জ্জয় আত্মাভিমান এসে ওর পথরোধ করে দাঁড়াল, নিজেকে ও নিঃশব্দে বলি দিলে।

সন্ধ্যার এই অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী কে? আমি?

আকাশে-বাতাসে কার কান্না আজ বারবার গুমরে উঠে আমাকে আকুল করে তুলছে! মেঘের আওয়াজের মধ্যে যেন কার বিদায়-সম্ভাষণ শুনতে পাচ্ছি! বিদায় বন্ধু!—বিদায়!—

সন্ধ্যার গোধূলি-আলো আমায় ঘরছাড়া করতে চায়, কেন?

—ভয়—

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

নিজের জীবনের কাহিনী—

কাহিনী বলিবার ঝুলি হাতড়াইয়া যখন কিছু পাওয়া যায় না, তখন নিজের মনের খাতার পাতায় হিজিবিজি আখর দিয়া যে গল্প বিশ্ব-শিল্পী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে রঙ ফলাইয়া নিজের কেরামতি দেখাইতে ক্ষতি কি? নিজের জীবনের কাহিনী আজ সবাইকে জানাইলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

তোমরা নিন্দা করিবে জানি, কিন্তু উপায় নাই—শুনিতেও তোমরা ছাড়িবে না, প্রেমের গল্প তোমাদের অসহ্য—থ্রিল চাও, অথচ জীবনে যার থ্রিল নাই সে থ্রিলিং কাহিনী সৃষ্টি করে কিরূপে?

কাজেই সেই সাতান্ন বৎসর আগেকার কথা আজ আধুনিক জগতে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেও সত্যকে অবগুণ্ঠিত করার যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সাতান্ন বৎসর আগেকার কথা বটে, কিন্তু আজও এমন দিন যায় নাই যেদিন সে কাহিনী আমার মনে পড়ে না—আমার নিদ্রাতুর নয়নে তাহা বহুবার স্বপ্নরূপে দেখা দিয়াছে, ভয়ে, বিস্ময়ে, আজও শিহরিয়া উঠিতেছি! মাত্র পনেরো মিনিট ধরিয়া যাহা আমায় সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা তোমরা কখনও কল্পনা করিতে পারিবে না সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। আজও রাতের আঁধারে আবছা আলোয় কোনো ছায়া দেখিলে আমি শিহরিয়া উঠি। সত্য কথা বলিব—আমার বাপু ভয় করে, গা ছম্‌ছম্‌ করে প্রতি রাতেই!

যখন তোমাদের মতো তরুণ ছিলাম, একথা স্বীকার করি নাই লোক লজ্জার ভয়ে; কিন্তু আজ সত্তর বৎসর পার হইয়া সে কথা বলিতে আর লজ্জা কি।

গৌরচন্দ্রিকা তোমাদের ভাল লাগিবে না তাহা আমার জানা আছে; আচ্ছা টীকা না করিয়াই বলি—

বিষ্ণুপুরে আমি তখন ম্যাজিষ্ট্রেট। সকালে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ানো আমার অভ্যাস ছিল, তখন ওটা ছিলো ফ্যাসন। পথে চলেচি এক মাঘ-ফাল্গুন মাসের সকালে, এমন সময় একজনকে দেখিয়াই মনে হইল সে আমার অপরিচিত নহে। ঘোড়ার বেগ কমাইয়া দিলাম; সে লোকটা আমার কাছে আসিয়াই আমার হাত ধরিল। তাহাকে চিনিতে পারিলাম ভূপেশ নাগ, কলেজে একত্রে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এই কয় বৎসরেই সে যেন কত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মাথার চুল সব শাদা, পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে, রেখাবহুল মুখে চিন্তার এক সুস্পষ্ট ছাপ; যেন তার পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর বয়স হইয়াছে, বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না!

ভূপেশ বুঝিল আমি বিস্মিত হইয়াছি; কহিল, এই ক'বছরে আমার জীবনের ওপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তা' যদি জান্‌তে ত এত বিস্মিত হতে না।

জানিতাম, সে এক সুন্দরী তরুণীকে ভালবাসিত এবং তাহাকেই বিবাহ করিয়া সুখাও হইয়াছিল বলিয়া ভূপেশ আমাকে বহুবার সাক্ষাতে ও পত্রযোগে জানাইয়াছে; কিন্তু আজ

শুনিলাম বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই না কি তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। তাহার পর হইতেই সে পাশের গ্রাম নন্দীর হাটে তার যে বিরাট পৈতৃক আবাস ছিল, তাহা ছাড়িয়া এইখানেই ছোট একটা বাড়ী করিয়া একাই আছে। সে বাড়ী নাকি শ্মশান, জীবন তাহার নিকট উদ্দেশ্যহীন। তাহার ছোট কুটীরে বসিয়া সে নাকি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিবার আসায় উৎকর্ণ হইয়া আছে।

কিছুকাল কথা কহিবার পর ভূপেশ কহিল, এভাবে তোমার সঙ্গে যে আমার আবার দেখা হবে তা' কোনোদিন ভাবি নি. তোমাকে ভাই আমার একটা উপকার কর্‌তে হবে।

আমার পুরাণো বাড়ী তোমার পরিচিত, কতবার তুমি সেখানে গিয়েছ, সেখান থেকে যদি দু'-চারখানা দরকারী কাগজ পত্র এনে দাও ত' আমার বিশেষ উপকার হবে, সে শ্মশানে আমার আবার যাওয়া অসম্ভব, আমাদের সরকার রতন-বাবু শুধু সেখানে আছেন, আমি আমার শোবার ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে কতকগুল কাগজ তাড়া বেঁধে রেখে এসেচি, কোনো লোক দিয়ে তা' আনান অসম্ভব; কারণ, সেগুলি বড়ই গোপনীয়। আমি সরকারের নামে একখানা চিঠি দেব, ও চাবী দেব। তুমি ভাই যদি দয়া করে আমার এ উপকারটী করো।

অনেকদিনের বন্ধু, তাহা ব্যতীত স্ত্রীবিয়োগে সে মুহ্যমান, কাজেই রাজী হইলাম। তার পরদিন যখন তাহার বাড়ী গেলাম তখন তাহার আর সেই বাক্যস্রোত নাই, একটা স্তব্ধভাব তাহার বাড়ীতে। সে নিজে অত্যন্ত অপ্রতিভ হইতে লাগিল তাহার মৌনতার জন্য। বুঝিলাম, যে বাড়ীতে আমি যাইব, তাহার সহিত ভূপেশের অনেকদিনের দুঃখ-শোক জড়িত আছে; কাজেই, তাহার অন্তরে বিক্ষোভের এক আন্দোলন সুরু হইয়াছে। যে-কাজের ভার সে আমাকে দিল, তাহা এমন কিছুই নহে, কিন্তু তাহার কুণ্ঠার আর নাই। যাইবার সময় সে আমাকে সহসা কহিল, দেখ বিনয়, তুমি শুধু কাগজগুলি নিয়ে চলে এসো, ওই ঘরের আশপাশে আর লক্ষ্য করো না।

তাহার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলাম। আমার সেমনোভাব আমার বাক্যের শ্লেষে প্রকাশ পাইল। সে বলিল, ভাই বিনয়, আমার যে কি কষ্ট তোমায় কি বোঝাব, আমার সব দোষ তুমি মার্জ্জনা কোরো।

তার দু'চোখ দিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আমি সেই চোখের জলে অভিভূত হইয়া গেলাম।

দিনটা সুন্দর, সোনালী রৌদ্রের আভায় চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পথের দু'ধারেই সারি সারি বিরাট বৃক্ষশ্রেণী। পাখীর গানে, পাতার সর্‌ সর্‌ শব্দে চারিদিক মুখরিত। আমার ঘোড়ার নাম ছিল সর্দ্দার, সর্দ্দার মহাআনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যখন নন্দীর হাট আসিয়া পড়িলাম, তখন পকেট হইতে সেই চিঠি বাহির করিয়া দেখিলাম তাহা শীল করা, বিরক্তি ও ঘৃণায় আমার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, ফিরিয়া যাই, কি প্রয়োজন আমার। ঠিক পরক্ষণেই মনে হইল, আহা বেচারীর মনের ঠিক নাই, কাজেই সে অন্যমনস্ক অবস্থায় চিঠি শীল করিয়াছে।

বাড়ীখানির সে শ্রী আর নাই, এখন তাহা পোড়োবাড়ীর মত অযত্নে দাঁড়াইয়া আছে। কোন-দিন এখানে যে মানুষের আবাস ছিল, তাহা আজ বিশ্বাস করা কঠিন। বাগানের চারিদিক জঙ্গলাবৃত, ভাঙ্গা ফটকটা অতীত গৌরবের সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সর্দ্দারের খুরের শব্দে ও আমার ডাকা-

ডাকিতে বৃদ্ধ সরকার বাহিরে আসিল। চিঠিখানা তাহাকে দিলাম। সেখানা নাড়াচাড়া করিয়া সে বহুবার পড়িল; তারপর আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হুজুর কি চান?

অত্যন্ত রাগ হইল; বলিলাম, কি চাই তা' তোমার মনিব তোমায় লিখে দিয়েছেন; আবার জেরা করার মানে?

সে চুপ করিয়া রহিল। তারপর আবার অত্যন্ত ভীতস্বরে বলিল, আপনি তা' হ'লে মা-ঠাকরুণের ঘরে যেতে চান?

বলিলাম, তোমার কি ইচ্ছেটা বল ত?

সে বিচলিত হইয়া বলিল—হুজুর, মা-ঠাকরুণ দেহ রাখবার পর ও ঘর আর খোলা হয় নি; তাই বলছিলাম, যদি অপেক্ষা করেন ত সাফ-সুতরো করে' দিই।

বলিলাম—তার মানে, চাবী রইল আমার কাছে, সাফ-সুতরো করবে তুমি, তোমার মতলবটা কি খুলে বলো।

সে অবশেষে হতাশ হইয়া কহিল, তা' হ'লে আসুন হুজুর, ঘরটা আমি দেখিয়ে দিই।

তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়াছিলাম, বলিলাম, আমায় শুধু সিঁড়ি দেখিয়ে দাও, ঘর আমি চিনতে পারব।

সে তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু তবুও—

আর তাহাকে সহ্য করা গেল না; তাহাকে একপাশে সরাইয়া দিয়া আমি একাকী উপরে উঠিয়া গেলাম।

প্রথমেই সুন্দর বারান্দা; তারপর হলঘর। উপরে উঠিবার সিঁড়ি, হলঘরের ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সামান্য অনুসন্ধান করিবার পর ভূপেশের নির্দ্দেশানুযায়ী সেই ঘর খুঁজিয়া পাইলাম।

ঘরের ভিতর এরূপ অন্ধকার যে, চোখে কিছুই দেখা যায় না; তার উপর দূষিত বাষ্পের গন্ধে স্থানটী ভরপুর! একটা জানালা খুলিয়া দিলাম। দেখিলাম, বেশ প্রশস্ত ঘর, ঘরের মাঝে একটা সুন্দর পালঙ্ক, তাহার উপর সুন্দর বিছানা পাতা, এবং সেই বিছানা দেখিয়া মনে হইল,—এই মাত্র কেহ সেইখানে শুইয়াছিল।

চারিদিকে কতকগুলি চেয়ার ছড়ান, পাশের ঘরের একটী দরজা অর্দ্ধোন্মুক্ত। দেরাজ খুলিয়া দেখি কাগজ-পত্রে সেটা ভরপুর। আমার প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে বেশ একটু বেগ পাইতে হইতেছে, এমন সময় আমার পশ্চাতে মৃদু পদধ্বনি ও শাড়ীর খস্‌খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ভাবিলাম, বাতাসে কোনো কাপড় হয় ত উড়িতেছে। সেদিকে লক্ষ্য করিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে সেই শব্দ আবার। সবেমাত্র দু'টী বাণ্ডিল কাগজ মিলিয়াছে, তৃতীয়টীর সন্ধান করিতে যাইতেছি, এমন সময় গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মনে হইল পকেটে রিভলভার আছে; দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু পিছনে চাহিয়া দেখিলাম,—এ কি, এক সুন্দরী তরুণী আমার পিছনে দাঁড়াইয়া! আমার দিকে সে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে।

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সারাদেহে সে কি উত্তেজনা! প্রেতাত্মায় বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু ভূপেশের স্ত্রীর সহিত তাহার চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল,—আমার বুঝি হৃদয়ের স্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া আসিল। সেই নারী মৃদু ও কোমলকণ্ঠে কহিলেন, বিনয়বাবু দয়া করে' আমার একটু উপকার যদি করেন।

উত্তর দিবার বৃথা চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কথা ফুটিল না; গলা হইতে শুধু অস্পষ্ট শব্দ বাহির হইল।

পুনরায় তিনি কহিলেন, আপনি সাহায্য করলে আমার একটা বিশেষ কষ্ট দূর হয়। কি

যন্ত্রণা যে আমি ভোগ করছি, তা' আর কি বলব!

এই কথা শেষ করিয়াই তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। সেই ব্যথা-কাতর চাহনি আমার চোখে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। আমি সম্মতি জানাইলাম যে, তাঁর উপকার করতে আমি প্রস্তুত।

তিনি একটী চিরুণী আমার হাতে দিয়া কহিলেন, আমার মাথা আঁচড়ে দিন, তা' হলেই আমি সুস্থ হব।

মনে মনে হাসি আসিল। সেই ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ তিনি এলাইয়া দিলেন; আমি সভয়ে তাহা স্পর্শ করিতেই অনুভব করিলাম,—তাহা হিম-শীতল এবং পাষাণের মত ভারী! কি কুক্ষণেই তাঁহার কথায় রাজী হইয়াছিলাম। সেই স্পর্শ আজও আমার আঙ্গুলে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই চুল আঁচড়াইয়া দিলাম।

যখন শেষ হইল, তিনি মাথা নামাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

চাহিয়া দেখিলাম,—একটা স্বস্তির আনন্দ যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, আজ আপনাকে কষ্ট দিলুম; কিন্তু এর চেয়ে কতবড় কষ্ট যে আমি এতদিন ভোগ করে' এসেছি, তা' যদি বোঝাতে পারতুম!

আমি বিস্ময়-উন্মুখ-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম! তিনি বলিতে লাগিলেন, ক'টা বছর ধরে' শুধু দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি একজন দরদীর জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে' আছি, কেউ একবার ভুলেও এদিকে আসে নি, ভয় পেয়ে ফিরে গেছে! আজ যখন আপনাকে পেয়েছি, তখন বুকের রুদ্ধ বেদনার ইতিহাসের প্রত্যেকটী পাতা আপনার কাছে মুক্ত করব! শুনবেন ত?

কি জানি কেন তাঁহার জীবনের কাহিনী শুনিবার জন্য আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—কৌতূহল দমন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; বলিলাম, শুনব বই কি; বলুন আপনি।

একটা চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ধীরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, নারীর কাম্য বলতে যত কিছু, তার কোনটিরই অভাব আমার ছিল না। স্বামী-সৌভাগ্যের কথা উঠলে লোকে নিঃশব্দে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিত। আনন্দে, গর্ব্বে আমারও মাটিতে পা পড়তে চাইত না। সমস্ত জীবনটাকে যেন একটা কল্পলোকের মধ্য দিয়েই টেনে নিয়ে চলেছিলুম।

এখনও বেশ মনে আছে, আপনি একদিন এসে ঠাট্টা করে' বলেছিলেন, কি হে, একজনের জন্যে আমাদের সকলকে ত্যাগ করলে দেখছি। বৌ যাদু-টাদু জানে না কি?

উনি ঘরে এসে বললেন, শুনলে ত? ওরা আমায় অতিষ্ঠ করে' তুলেছে।

আমি মৃদু হেসে বলেছিলুম, তুলুক। তা' বলে' পাঁচজনের কথা শুনে ঘরের কোণে ভূত হয়ে মরতে আমি পারব না।

সেদিন কে জানত, একান্ত অসংলগ্ন প্রলাপের মত মিথ্যা ভাষণটাই আমার জীবনে সত্যরূপে পরিণত হয়ে উঠবে।

একদিন পাশের বাড়ী বৌভাতে নিমন্ত্রণ গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি,—আমার বাক্স-প্যাঁটরা খোলা; জিনিষপত্র সব মেজের ওপর এদিক-ওদিকে ছড়ান। মুখে একটা দারুণ উত্তেজনা নিয়ে স্বামী কিসের অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

আমাকে দেখেই তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেল। তিনি বললেন, এ কি এরই মধ্যে তুমি চলে' এলে?

দারুণ অস্বস্তিতে যেন আমার সারা অন্তর ভারী হয়ে উঠেছিল; বললুম, হাঁ, কিন্তু এসব কি ব্যাপার বল ত?

তিনি হেসে বললেন, কিছু না। একটা দরকারী কাগজ খুঁজে পাচ্ছি না; তাই ভাবলুম,

যদি তোমার কাছে ভুলে কোনদিন দিয়ে থাকি—

উত্তরটার মধ্যে যুক্তির এতটুকু আভাষ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলুম না; তবু কোন প্রতিবাদ করলুম না।

দু'-চার দিনের মধ্যে কিন্তু তাঁর মধ্যে বেশ একটা পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখে শিউরে উঠলুম! সেদিন দুঃসহ গরমে যেন সারা পৃথিবীটাকেই মূর্চ্ছিত করে তুলেছে। কোনমতেই স্থির থাকতে পারছিলুম না। মেঝের ওপর অবসন্ন দেহটা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে চমকে উঠে দেখি,—খাটের তলাটা একখানা কাপড় দিয়ে ঘেরা, আর তারই শেষ দিক্ থেকে যেন কার দুটো চোখ আমার দিকে চেয়ে জ্বলছে! কাপড়খানা ফেলে দিতেই তাঁকে দেখ্‌লুম; বললুম, এ কি! তুমি? তুমি এখানে এমন করে' বসে' কেন? অফিস যাই বলে' খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে, তারপর, ছি, ছি, তুমি কী! তোমার দু'টী পায়ে পড়ি বল, তুমি কি চাও? আমায় সন্দেহ হয়? চুপ করে' থেকো না উত্তর দাও।

তিনি ধীরে ধীরে খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘামে তাঁর সমস্ত কাপড় ভিজে উঠেছে। মুখ-চোখে যেন রক্ত জমে গেছে। বললেন, না না, তুমি ওসব কি বলছ—সন্দেহ করব কেন? এমনই একটু মজা করছিলুম তোমার সঙ্গে—

লজ্জায়, ঘৃণায়, অতিবড় আত্মাভিমানের জ্বালায় মনটা তখন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বৃথা কথা কাটাকাটি করার প্রবৃত্তি আর হ'ল না। চুপ করে' রইলুম। আপন-মনে কি কতকগুলো বকে' উনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অনেকদিন পরে আজ প্রাণ ভরে' কাঁদতে সুরু করে দিলুম। এতদিনে মনে হ'ল, আমার মত হতভাগিনী বুঝি আর পৃথিবীতে কেউ নেই।

বহু চেষ্টা করেও কিন্তু আর তাঁর সঙ্গে তেমন ভাবে মিশতে পারলুম না। একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর যেন দু'জনের মাঝখানে আপনা হ'তে ধীরে ধীরে গড়ে' উঠতে লাগল; অথচ, প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও তাঁর সন্দেহের মূল কারণটা আবিষ্কার করতে পারলুম না।

পূর্ণিমার রাত্রি। আজকেরই মত সেদিন আকাশে আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। জানলাটা খোলা। গাছের মাথা ডিঙিয়ে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ এসে আমার ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে। কি জানি কেন মনের আবেগে গতদিনের কথা বিস্মৃত হয়ে প্রসাধনের জন্যে আরসীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কয়েকটা মাসের কথাগুলোকে আজ দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। স্বামীর স্নেহ-সান্নিধ্যের কল্পনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছি। ধীরে ধীরে চিরুণীখানি ড্রয়ার থেকে বা'র করে' সামনে এনে রাখলুম।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল; দেখলুম স্বামী। তাঁর চোখের দিকে চাইতেই কিন্তু ভয়ে আমি শিউরে উঠলুম। হিংস্র বাঘেরই মত যেন তাঁর চোখ দু'টি জ্বলছে। প্রকৃতির কোন আকর্ষণই তাঁর মনে ছাপ ফেলতে পারে নি। তিনি এগিয়ে এসে 'খপ' করে চিরুণীখানা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে' কি দেখলেন; তারপর বললেন, এ তুমি কোথায় পেলে?

বললুম, কেন?

প্রশ্ন আমার, তোমার নয়—উত্তর দাও?

উত্তর দেবার প্রবৃত্তি হ'ল না। তবু বললুম, দেশ থেকে এসেছে।

গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, তা' আমি জানি। কে পাঠিয়েছে, তাই বল? দেশ বলতে ত তোমার একখানা ভাঙাবাড়ী; তা' হ'লে কি বুঝতে হবে, এ সেই বাড়ীরই দেওয়া।

বললুম, বাড়ী পাঠাবে কেন, কমল দা'।

তিনি বীভৎস-কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলেন, তা' হ'লে পাঁচজনে এতদিন যা' বলেছে, সবই সত্যি, কেমন? ওঃ, তুমি এত হীন!—

কথাগুলো যেন বিশ্চিক দংশনের মত আমাকে অসহ্য করে' তুললে ; বললুম, হ্যাঁ, আমি তাই— কিন্তু তুমি কি ?

বজ্রের মত তার হাত দুটো এসে আমার গলার ওপর চেপে বসল। তিনি বললেন, আমি, আমি কি শুনবে ? তবে শোন,—আমি সেই লোক, যাকে তুমি একদিন দেবতা বলেই ভ্রম করতে ! অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে বোঝাতে হবে আমি কে ? তুমি বল ত, তুমি কে ? তোমার পরিচয় কি ? পথের একপাশে পড়েছিলে, নাম-গোত্র-পরিচয়হীনা, পথের আবর্জ্জনা ! হাঁ পথের আবর্জ্জনা,না হ'লে যে তার মান-সম্ভ্রম আত্মীয় সকলের বিনিময়েও তোমাকে বুকে তুলে নিয়েছিল, তার বুকে এতবড় ছুরি চালাবে কেন ? গ্রামের লোকে ঠিকই বলেছে। কমল, তোমার প্রাণের কমল, নইলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চিঠি লিখবে কেন ? উপহার দেবে কেন ? ছি, ছি, আমি কী নির্ব্বোধ, এতদিন বুঝতে পারি নি !

আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল, বহুকষ্টে বললুম, ছাড় ছাড়, আর একটু হ'লে আমি মরে' যাব। ভুল—

তিনি হো হো করে' পাগলের মত হেসে উঠে বললেন, সে দেবতা স্বামী তোমার মরেছে, এ তার প্রেতাত্মা ! তোমার মৃত্যুই যে আমি চাই ; না হ'লে কমল—না না, তোমাকে মরতেই হবে !

আমি প্রাণপণ শক্তিতে তাঁর হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। ক্রমে সমস্ত পৃথিবীটা যেন আমার চোখের ওপর অন্ধকার হয়ে এল—একবিন্দু নিশ্বাস নেবার জন্যে সমস্ত শক্তি, জীবনের সমগ্র কামনা দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলুম ! দিলেন না ! বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে তাঁহার এই করুণতম কাহিনীটী শুনিতেছিলাম। বলিলাম, তারপর ?

রমণীর মুখে সে কি হাসি ! তিনি বলিলেন, তারপর জ্ঞান হ'তে দেখলুম—নর-জগতের সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই। বোধ করি অনুশোচনার তাড়নায় তিনিও এ বাড়ী ছেড়ে বিষ্ণুপুরের দিকে কোথায় গিয়ে না কি আত্মহত্যা করেছেন। আমরা মানুষের রক্তমাংসের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মন—দেখলুম, মনের হাত হ'তে ত মুক্তি নেই ! গত জীবনের সমস্ত ভুলতে পারলুম, কিন্তু দু'টী স্মৃতির পীড়া থেকে কোনমতেই মুক্তি পেলুম না ! এই দুঃখটাই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠল যে, তিনি আমায় অন্যায় সন্দেহ করে' হত্যা করলেন, কিন্তু জানতে পারলেন না যে,—কমল আমার রক্তের সম্বন্ধে না হ'লেও হৃদয়ের সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় আত্মীয় – আমার দাদা—আমার দুঃসময়ের অভিভাবক—আমার পিতৃতুল্য ! আর একটি—কমল দা'র যত্নে দেওয়া দান চিরুণীখানি আমার কোন কাজেই এল না। আজ আমার দু'টী বাসনাই পূর্ণ ! স্বামীর অন্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছে,—তাই তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাকে লেখা কমল দা'র চিঠির বাণ্ডিলগুলি নিয়ে যেতে। এগুলি দেখলেই তিনি সব বুঝতে পারবেন। আর একটী,—আপনি এইমাত্র আমার অনুরোধে যা' করে' দিলেন।

আপনি আমার কি উপকারই যে করলেন—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে !

তারপর আমার হাত হইতে সেই চিরুণীখানি লইয়া অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজা দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

সমস্ত বাড়ীটাতে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা ! ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সারা দেহমন অভিভূত হইয়া পড়িল ; যখন চৈতন্যলাভ করিলাম তখন লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে,—যে দরজাটী এতকাল অর্দ্ধোন্মুক্ত ছিল, তাহা এখন বন্ধ। সেই দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলাম, কিন্তু তাহা কিছুতেই খুলিল না—পাথরের মত অচঞ্চল !

আর সে ঘরে থাকার মত সাহস ও শক্তি আমার ছিল না; তাড়াতাড়ি কতকগুলি কাগজ-পত্র সংগ্রহ করিয়া বাহিরে আসিলাম। সর্দ্দার বাগানের অযত্নবর্দ্ধিত ঘাসে মনসংযোগ করিয়াছিল। তাহার পিঠে চাপিয়াই আমি বিষ্ণুপুরে ছুটিলাম।

বাংলোয় ফিরিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পাইলাম না যে, ব্যাপারটা কি হওয়া সম্ভব। একবার ভাবিলাম, মনোবিকার; বহুকালের পোড়োবাড়ী আর সরকারের সেই অদ্ভুত আচরণ মিশিয়া এই অদ্ভুত স্বপ্ন আমাকে সত্যের মত আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল।

চেয়ার হইতে উঠিয়া জামা ছাড়িতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, লম্বা লম্বা কালোচুল আমার জামার সহিত লাগিয়া আছে! কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলাম, বেহারা! সে আসিল। তাহাকে বলিলাম, আজ আর আদালতে যাব না; আর দেখ, এগুলো ভূপেশবাবুকে পাঠিয়ে দিও এখুনি।

সে 'জী হুজুর' বলিয়া চলিয়া গেল। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না।

কিছুকাল পরে চাপরাশী আসিয়া ভূপেশের সই করা রসিদ দিয়া গেল এবং কহিল, ভূপেশ না কি বারবার প্রশ্ন করিয়াছে, আমার শরীর কেমন আছে? চাপরাশী তাহাকে আমার অসুস্থতার সংবাদ জানাইতে, সে না কি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

হৃদয় হইতে যেন সমস্ত ভার নামিয়া গেল। মিথ্যা স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম, না হইলে ভূতে কখন রসিদ দেয়।

পরদিন ভূপেশের সন্ধানে গিয়া বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। জীর্ণ বাড়ীটি মুমূর্ষুর মত দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু ভূপেশের কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাইলাম না। আশে-পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করায় সকলে আমায় পাগল সাব্যস্ত করিয়া এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

নিঃশব্দে সেস্থান ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

সাতান্ন বছর আগেকার কথা। সেদিন যতটুকু জানিয়াছিলাম, এতদিন চলিয়া গিয়াছে তাহার বেশী জানিতে পারি নাই। বহুবার ভাবিয়াছি, স্যার আর্থার কোনান ডয়েলকে পত্র দিই; কিন্তু তিনিও আজ আর নাই!

* গল্পের কঙ্কালটা ফরাসী

হায় অসম্পূর্ণ ছাড়া ছাড়া! কার অভিশাপ এ? —বিধাতার?—কিন্তু কেন? কেউ তার উত্তর দেয় না।

দীপ্তি ছাদের উপর বিছানা রোদে দিচ্ছিল। প্রণব সেই সময় ঘরে ঢুক্‌ল—তার খাতাখানা নিতে। দীপ্তিও ঘরে এল। প্রণবের হাতখানা ধরে' বল্‌ল—রাগ করেছ?

প্রণব কোনও উত্তর দিল না। শুধু প্রশ্ন কর্‌ল—ও কি! ছুঁলে যে?

দীপ্তি তার হাতখানা ছেড়ে দিল—কি ভেবে আবার তখনই টেনে নিল। বল্‌ল—তুমি কেবলই আমাকে যা' তা' বল্‌বে। কিন্তু রাগ করো না। আমার কোনও অপরাধ নেই। সত্যি বল্‌ছি—কাল বড়ই ঘুম এসেছিল—তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দীপ্তিকে এর চাইতে বেশী কোনদিনই কিছু বল্‌তে হয় নি। প্রণবের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। এরই জন্য বুঝি তার প্রাণ পিপাসায় শ্রান্ত হয়ে ওঠে।

সে দীপ্তির একখানা হাত ধরে' তাকে কাছে টেনে নিল। এবার দীপ্তি তাকে কোনও বাধাই দিল না। দীপ্তিকে বুকের কাছে চেপে ধরে' সে তার মাথায় চুলগুলির ভিতরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একটু আদরের চিহ্নও সে তার গণ্ডস্থলে মুদ্রিত করে' দিত, কিন্তু হঠাৎ নীচে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। আঃ, ছাড় ছাড়! —করে' দীপ্তি আপনাকে মুক্ত করে' নিল।

নিষ্ফল প্রযত্নে প্রণব ব্যথা পেল। এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে—কাজ হয় তার অন্যস্থানে। নীচে মানুষ চলে' গেল—আর যত অশান্তি হ'ল তাতে ওপরে

সে খাতা একখানা টেনে নিল কবিতা একটা লিখ্‌বে বলে। ভাল লাগ্‌ল না। খাতাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুম্ হয়ে বসে' রইল।
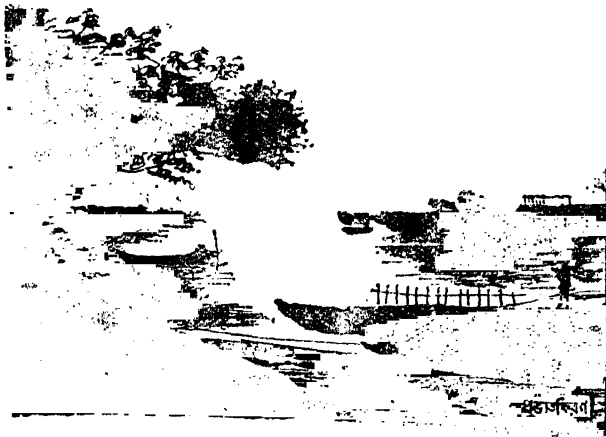
—টিউবওয়েল—

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

এগার

(দীনেশের কথা)

এইবার মা, এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ করে' ফেলি।

রমেশের বাড়ীর কথাই আগে বলি। বাড়ীতে তিনখানি ঘর, একখানি একটু বড়, আর দু'খানি ছোট। মাটীর দেওয়াল, তার ওপর খড়ের চাল। যেখানি বড় ঘর, তার একটা বারান্দা আছে, আর দু'খানি ঘরের বারান্দা নেই। বড় খানিই শোবার ঘর, আর তার বারান্দাই বস্‌বার স্থান। আর দু'খানি ছোট ঘরের একখানি গরুর ঘর; অপরখানির একদিকে উঁচু মাচা বেঁধে তার ওপর ধান বোঝাই করা থাকে, অপর দিকে রান্না হয়। বাড়ীর উঠানটা বেশ বড়। তিন দিকে তিনখানি ঘর, আর একদিকে কতকগুলো গাছপালা। বাইরে বস্‌বার ঘরও নেই, বাড়ীর চারদিকে পাঁচিল কি বেড়া কিছুই নেই। যেদিকে গাছপালা, তারই পিছনে একটা ডোবা; শুনলাম, তাতে বার' মাসই জল থাকে। সেই জলই এদের সম্বল; তাতেই স্নান, সেই জলই খাওয়া, সেই জলে কাপড় ধোওয়া সব। এই ডোবাতে মাছও আছে। উঠানের ধারে ধারে শাক্ সবজীর ক্ষেত; একটু উঁচু করে' মাটী দিয়ে বাঁধানো একটা মঞ্চ, তা'তে তুলসীগাছ। উঠানটা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি; যেখানি রান্নাঘরই বল বা গোলাঘরই বল, তারই গায়ে একখানি চালা আছে, তারই নীচে ঢেঁকি।

এই যা' বল্‌লাম রমেশদের বাড়ীর কথা, তার থেকে তুমি যে একটা আইডিয়াও করতে পারলে না মা, তা' তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। তুমি হয় ত ভাবছ, এ কেমন বাড়ী। মেটে ঘর, মাটীর দাওয়া, চারদিকে জঙ্গল, বাড়ীর আবরণ নেই, বাইরে একখানি বস্‌বার ঘর নেই, চার পাশ খোলা—এ কি বাড়ী! তা' কিন্তু নয় মা, রমেশদের সেই পত্রকুটীর, সেই অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য, সেই ক্ষেতের ধানের মোটা রুক্ষ চালের ভাত, সেই ডোবা থেকে তখন-তখনই ধরা ছোট-ছোট পুঁটিমাছ ভাজা, তারই চচ্চড়ি, ঘরের গাইয়ের অমৃত সমান দুধ—এ সব যে কি মনোহর, কি তৃপ্তিকর মা, তা' তোমাকে কেমন করে' বোঝাব। আর রমেশের মা, দিদির সেই যে আকিঞ্চন, সেই স্নেহভরা আগ্রহ, সেই যে প্রাণপণ যত্ন, একেবারে অনির্ব্বচনীয় মা, অনির্ব্বচনীয়—বর্ণনার অতীত! আমার ইচ্ছা করছিল, এখনও ইচ্ছা করে, সেই পাখীডাকা, ছায়ায় ঢাকা, পল্লীর বিলাসশূন্য নির্জ্জন নেপথ্যে জীবন কাটিয়ে দিই। সত্যই মা, আমি বুঝতে পারি নে, রমেশ ষ্টুপিডটা অমন স্বর্গভোগ ছেড়ে আমাদের ক'লকাতার এই নরকে থাক্‌তে চায় কেন? কিসের অভাব ওর? ঘরভরা ধান, ডোবায় মাছ, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাই, উঠানের পাশে লাউ-কুমড়া, শাক-তরকারীর ক্ষেত, সজনে গাছ, আম-কাঁঠালের বাগান, বড় বড় নারকেল গাছ, তা' হোক্ না সংখ্যায় কম—

এ কি-কম সম্পদ রমেশের! তারপর অমন স্নেহময়ী দিদি, অমন দেবীস্বরূপিনী মা যার ঘরে, তার অভাব কিসের বল ত মা? আমি কবিত্ব করছি নে মা, সত্যি বল্‌ছি—আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা' তোমাকে বোঝাতে পারছি নে!

সে কথা যাক্, রমেশের বাড়ীতে উঠে কি করলাম সেই বলি।

রমেশের মা তাঁদের সেই বারান্দায় একখানি পুরাণো মাদুর তাড়াতাড়ি এনে পাততে পাততে বল্‌লেন, "বাবা, বস্‌তে যে দেব তার যায়গাও নেই, কিসে যে বসাব আপনাকে, তাও পাচ্ছি নে। গরীবের বাড়ীতে যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন এই ছেঁড়া মাদুরেই বস্‌তে হবে।"

আমি তখনও উঠানে দাঁড়িয়ে আছি। সেখান থেকেই বললাম, "মা গো, এই সারাপথ আপনার ঐ ছেলের 'তাই ত, তাই ত' শুন্‌তে শুন্‌তে এসেছি; আবার এখন আপনিও আরম্ভ করলেন। ও-সব আপনি, মশায়, পদধূলি, আর যা' কিছু আপনার গুরুদেবের জন্য তুলে রাখুন; আমি ঘরের ছেলে ঘরে এসেছি—ব্যস্।

দিদি হেসে বল্‌লেন, "ঠিক বলেছ ভাই। তুমি যদি তাই না ভাবতে, তা' হ'লে আস্‌বে কেন? এ তোমারই বাড়ী। এটা গরীবের বাড়ী ত নয়, ক'লকাতার দীনেশ সিংহের বাড়ী—কেমন? তোমায় এর আগে কখনও দেখি নি ভাই, কিন্তু রমেশের চিঠিতে তোমাদের কথা শুনে যা' ভেবে রেখেছিলাম, তাই দেখছি। তোমার কথা শুনে শরীর জুড়িয়ে গেল। কে বলে আমরা গরীব, আমরা চাষা? আজ দেখে যাক্, আমরাই বা কি, আর নাড়াজোলের রাজাই বা কি?"

আমি বল্‌লাম "এই ঠিক হয়েছে দিদি। ও হে রমেশ, ইডিয়টের মত দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? ঐ সব জিনিসগুলো নামাও। বাবা হরিশ, তুমি একটু সাহায্য কর। দেখুন দিদি, এক কাজ করুন। উঠানের পাশে ঐ যে উনোনটা দেখ্‌ছি, ঐতে আগুন করুন ত চট্‌পট। আর যা' করতে হয়, আমি করছি, একটু চা খেতে হবে যে।"

রমেশ এতক্ষণে কথা বল্‌ল। কি বল্‌ল জান মা? বল্‌ল, "আমাদের গাঁয়ে চা পাওয়া যায় না যে।"

আমি বল্‌লাম, "সে আমি জানি শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র। ওহে বাপু হরিশ, আগে ট্রাঙ্ক দুটো নামাও ত, তারপর হাঁড়িটা, শেষে বিছানাপত্র, বুঝলে।"

দিদি কিন্তু তৎপর; তখনই উনোন ধরাতে বসে' গেলেন। আমি একটা ট্রাঙ্ক টেনে নিয়ে খুলে ফেলে চায়ের সরঞ্জাম, মায় কেটলি, জলের বোতল বা'র করে' রমেশকে বল্‌লাম, "এইবার জল গরম করে' চা তৈরী কর ত ভাই। দেখ দেখি সব আছে কি না। কিছুর অভাব নেই; এ আমার মা জননীর গোছান।"

রমেশের মা বললেন, "বাবা, চা'ল-ডালও এনেছ না কি?"

আমি বল্‌লাম, "আপনার ছেলে হয়ে' এত বেয়াদবি করতে পারি নে। যা' সব এখানে হয় ত পাওয়া যাবে না মনে হয়েছে, মা তাই গুছিয়ে দিয়েছেন।"

রমেশ তখন ধীরে-সুস্থে চা তৈরী করল। আমি, রমেশ, আর হরিশ এই তিনজনে চা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে, রমেশের দিদিকে ডেকে অপর ট্রাঙ্কের চাবী তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লাম, "এ বাক্সে যা' আছে, তার জন্য আমি দায়ী নই দিদি! তার জন্য যদি ঝগড়া করতে হয়, তা' হলে' ক'লকাতায় আমার মায়ের কাছে যেতে হবে; আর সেই জন্যই মা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের বাড়ী-

ঘর দেখতে আসি নি, আপনাদের ক'লকাতায় আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি।"

দিদি হেসে বল্লেন, "সে কথা পরে হবে। এখন কিছু খেতে হবে ত। তুমি যা' এনেছ, তা' খেতে পাবে না ভাই। কাল আমি মুড়ি ভেজেছি, তাই খেতে হবে।"

আমি বল্লাম, "বেশ ত তাই খাব।"

রমেশ বলল, "ছোড়্ দা', কখন মুড়ি খেয়েছ?"

আমি বললাম, "আমি কি রাজা, না মহারাজ যে, মুড়ি খাই নি।"

তারপর মা, তেল, নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একরাশ মুড়ি খাওয়া হ'ল। রমেশের তখন আনন্দ দেখে কে! হরিশকে সঙ্গে নিয়ে জাল হাতে করে' সে ডোবায় মাছ ধরতে গেল। আমি আর গেলাম না, আমি তখন ট্রাঙ্কের মধ্যে তুমি যা' সব দিয়েছিলে, তাই দিদিকে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। দিদি যত বলেন 'এ সব কেন ভাই', আমার একই উত্তর 'ক'লকাতায় গিয়ে মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে যত পারেন ঝগড়া করবেন।' দিদি নিরুত্তর।

রমেশ মাছ ধরতে গিয়েছিল। এই হচ্ছে আসল কথা জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ। আমি দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা দিদি, আপনি বলতে পারেন, রমেশের চাকুরী করবার এত ঝোঁক পড়েছিল কেন? আর পাঁচ-শ' টাকা জমাবারই বা তার এত কি দরকার হয়েছে? ধার-কর্জ্জ কিছু আছে কি?"

দিদি বললেন, "না ভাই, বাবা এক পয়সাও ধার রেখে যান নি। তিনি এই দু' বছর হ'ল মারা গিয়েছেন, এ দু'বছরে আমাদেরও ধার করবার কিছু দরকার হয় নি। যা' সামান্য কয় বিঘে জমি আছে, নিতান্ত অজন্মার বছরেও তা'তে যা' ধান হয়, তা'তে আমাদের বেশ চলে' যায়। যেবার ভাল জন্মায়, সেবার কিছু ধান আমরা বেচেও থাকি। সামান্য গরীব মানুষের যা' দরকার, তার অভাব কোন দিনই হয় না। তবুও রমেশের কি জেদ, তার পাঁচ-শ' টাকা চাই-ই। বাবা মারা যাবার পরই তার মাথায় এই পাঁচ-শ'টাকার খেয়াল চেপেছে। তাই সে চাকরী করতে গিয়েছে। এখন দেখছি, রমেশ ভালই করেছে। তার এই খেয়ালের জন্যই ত তোমাদের পেয়েছি। এ কি কম লাভ ভাই!"

আমি বললাম, "এ খেয়ালের কারণ যে কি, তা' আমরা মোটেই জান্তে পারি নি। মনে করে-ছিলাম, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এখানে খরচ পাঠাবার কথা বললে রমেশ বলে দরকার হবে না; যা' জমা জমি আছে, তাতেই বাড়ীর খরচ চলে' যাবে। তা'র কাছে শুনেছি, পাঁচ-শ' টাকা জমা হ'লে সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী আসবে, আর চাকরী করবে না। কি করবে ও টাকা দিয়ে, তা' বুঝতে পারি নে।"

দিদি বললেন, "আমাদের কাছেও সে ঐ কথাই বলে, বিশেষ কিছুই বলে না।"

রমেশ তখন কতকগুলো পুঁটি মাছ নিয়ে এসে বললে, "ছোড়্ দা' আপনার অদৃষ্টে নেই, কি করে একটাও বড় মাছ পাওয়া গেল না।"

আমি বললাম, "বেশ হয়েছে, ঐ ছোট মাছেই হবে।"

তারপর মা, রমেশকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম দেখতে বা'র হলাম। ছোট গ্রাম, কুড়ি-পঁচিশ ঘর গৃহস্থ। সবারই অবস্থা রমেশেরই মত, সবাই চাষ-বাস করে। বেশ আছে মা, তারা। কোন কষ্ট আছে বলে' মনে হ'ল না।

দুপুরবেলা যা' খাওয়া হ'ল, তার বর্ণনা করে' তোমার লোভ বাড়াব না। তবে, একথা না বললে মিথ্যা বলা হবে মা, তুমি কিন্তু সেই মোটা রাঙা চালের ভাত খেতে পারতে না। আমার কিন্তু ভারি মিষ্টি লেগেছিল!

তারপর রমেশের মা ও দিদিকে এখানে আস্‌বার জন্য অনেক বললাম, অনেক অনুরোধ করলাম, তাঁদের ঐ এক কথা, রমেশ তার পাঁচ-শ' টাকা নিয়ে বাড়ী এলে, তাঁরা মা-মেয়ে আপনা হ'তে ক'লকাতায় এসে তোমাদের পায়ের ধুলো নিয়ে যাবেন।

তখন আর কি করব, বিকেলেই মেদিনীপুরে ফিরবার ব্যবস্থা করলাম। রাত্তিরটা থাকবার জন্য তাঁরা অনেক অনুরোধ করলেন; শীগ্‌গির আবার আসব বলে' তাদের নিরস্ত করলাম। রমেশকে দু'-একদিন বাড়ীতে থাকবার জন্য বললাম, সে তাতে সম্মত হ'ল না। কাজেই তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় চারটের সময় যাত্রা করলাম। রাত প্রায় আটটার সময় মেদিনীপুরে পৌঁছলাম। পরের দিনটা সেখানে কাটিয়ে, তারপর আর কি. মায়ের ছেলে মায়ের কাছে এসে পড়েছি। আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শেষ হ'ল, এখন কি পুরস্কার দেবে বল ?

মা বললেন—"তোদের অদেয় আমার কি আছে বাবা !"

(ক্রমশঃ)
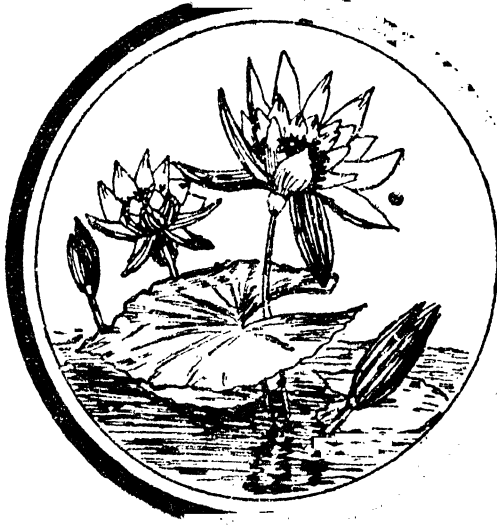
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ | চৈত্র, ১৩৩৮ | দ্বাদশ সংখ্যা

—প্রিয়তর—

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে সেবার দূর দক্ষিণের এমন একস্থানে গিয়াছিলাম—যেখানে বাংলা, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষার ইঙ্গিতমাত্রও কেহ বুঝিত না। ভাঙ্গা ইংরাজীতে কাজ চলিলেও নিভৃত পল্লীর দোকানে ও হাটে ভাষা থাকিতেও আমরা বোবা বনিয়াছিলাম। সম্মুখে যদি বা প্রার্থিত জিনিষটি না থাকিল ত সহস্র ইঙ্গিত-ইসারায়ও তাহাকে দোকানের টিনের কৌটা হইতে টানিয়া বাহির করা যে কি দুরূহ ব্যাপার—তা' একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। এবং সম্মুখের জিনিষগুলির সম্বন্ধে কোনরূপ দরদস্তুরও চলে না। আস্ত টাকাটা ফেলিয়া বিক্রেতার দয়ার উপর বাকী পয়সার প্রত্যাশা করিতে হয়। তা' যাহা হউক, এমনই করিয়া কাজ চালাইতে চালাইতে অবশেষে আমরা ত্রিচি সহরে আসিয়া উপস্থিত।

ঠিক সময়ে না আসার দরুণ—শ্রীরঙ্গম্‌গামী ট্রেণ ফেইল করিয়া খানিক হতাশ হইয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম। তারপর—ক্ষুণ্ণমনে চৌলট্রিতে (পশ্চিমের ধর্ম্মশালা বিশেষ। তবে বাসের জন্য কিছু কিছু দক্ষিণা দিতে হয়) আসিয়া মাশুল গণিয়া ঘর দখল করিলাম। চৌলট্রি-রক্ষক জানাইলেন,—অধিক বেলা হইয়া যাওয়ায় গাইড দল শ্রীরঙ্গমে চলিয়া গিয়াছে। যদিও এখানে সস্তার মোটর যাতায়াত করে, কিন্তু কাবেরী নদীর সাধারণ পোল মেরামত হওয়ায় সে পথ বন্ধ। নদী পার হইতে হইবে নৌকায়।

পথ সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা করাইয়া দিয়া যখন তিনি আমাদের মুখ দেখিয়া বুঝিলেন—কোন ধারণাই আমরা করিতে পারি নাই, তখন সহসা বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং একজন আধাবয়সী স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া জানাইলেন,—ইহাকে সঙ্গী করিলে মেয়েদের কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। মেয়েটি হিন্দী জানে এবং ঠাকুর-দেবতার নাম, ধাম, বিবরণ ঠিক ঠিক বাতলাইয়া দিবে।

মেয়েটিকে দেখিলেই বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়।

চলন ও কাপড় পরিবার ভঙ্গীতে দক্ষিণা-সুলভ কায়দা থাকিলেও সমগ্র মুখে লজ্জা-মেদুর

ভাবটি সুপরিস্ফুট। নম্র চোখের ভীরু চাহনি—দূর দক্ষিণের প্রত্যন্ত দেশে বঙ্গ অন্তঃপুরের রমণীয় ছবিটির বর্ণ ও রেখার কথাই জাগাইয়া তুলে। এবং যে হিন্দী ভাষায় সে কথা কহিল—তাহাও বাংলার জল-হাওয়ায় পশ্চিমী রুক্ষতা বর্জ্জিত। যুক্তকরের প্রণামটি তার ভারী সুষ্ঠু।

কাবেরী তীরে আসিয়া কূলহারা গৈরিক জলরাশির পানে চাহিয়া মনে ভয় জাগিল। পারাপারের যানগুলিও অপূর্ব্ব! সে যেন নৌকাই নহে। বড় চামড়ার গামলার মত তার আকৃতি; না দাঁড়, না হাল। আরোহীরা টপাটপ গলা অবধি গামলা ডিঙাইয়া ভিতরে গিয়া বসিতেছে এবং মাঝিরা ক্ষিপ্র করে বড় বড় লগী ঠেলিয়া কাবেরীর জলে পাড়ি দিতেছে।

এমন অসংখ্য নৌকা যাইতেছে—আসিতেছে।

পথ-প্রদর্শিকার পানে চাহিতেই—সে হাসিয়া ফেলিল।

হাসি দেখিয়া সন্দেহের আর লেশমাত্র রহিল না।

কহিলাম, "তুমি বাঙ্গালী? কিন্তু এত দূর দেশে কেন?"

প্রত্যুত্তরে, তার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, ছোট একটি শব্দহীন নিশ্বাসও হয় ত বা বাহির হইয়াছিল, কোন কথা না বলিয়া ললাটে তর্জ্জনী রাখিয়া সে কাবেরীর নিস্তরঙ্গ গৈরিক জলের পানে চাহিয়া রহিল।

কাবেরীর নিঃশব্দ স্রোতের মতই ওর অন্তরের আবেগ বুঝি বাহিরের মৌণতার আবরণে প্রশান্তি লাভ করিয়াছে।

সূর্য্যের পানে চাহিয়া কৌতূহল দমন করিলাম।

ঠিক করিলাম চৌলট্রিতে ফিরিয়া ওর ইতিহাস আমরা জানিব।

কয়েক মুহূর্ত্তে অচল বাংলা ভাষা লইয়া যেখানে মনপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে আমাদের, কোন মোহে মাসের পর মাস ধরিয়া মূক-জীবনের একাকীত্ব মুখ বুজিয়া সহিতেছে ওই মেয়েটি! ওর পিছনের ইতিহাস নিশ্চয়ই কৌতূহলময়।

নৌকা আসিল। ও-দেশীয় ভাষায় দরদস্তুরের অনর্গল তর্ক শুনিয়া হিসাব করিলাম, দু'-এক বৎসর নহে—বহুকাল এই দেশান্তরের নির্ব্বাসনে উহার কাটিতেছে।

নৌকায় উঠিয়া মেয়েটি পরিষ্কার বাংলাতেই বলিল, "ভয় পাবেন না, নদী চওড়া হ'লেও তিন-চার হাতের বেশী জল কোথাও নেই। বাঁশের লগী ঠেলে দিব্যি ও-পারে যাবে। আজ অবধি নৌকাডুবির খবর আমরা শুনি নি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত বছরের অভিজ্ঞতা তোমার?"

সে হাসিয়া বলিল, "অভিজ্ঞতা কি শুধু বছরের মূল্যে নির্দ্দেশ করা যায়?"

বুঝিলাম উত্তরটা কৌশলেই এড়াইয়া গেল।

* * *

পারঘাটায় একটা বড় আমগাছের তলায় নৌকা আসিয়া লাগিল। ফোটা মুকুলের গন্ধে স্থানটি বসন্ত-আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এ যে কার্ত্তিক মাস। হিমের আড়ালে বাংলা দেশের শীত সবেমাত্র উঁকি মারিয়া ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অধিবাসীদের সচকিত ও ভীত করিয়া তুলে। এখানে ঋতুর অত্যাচার নাই। আম, জাম—বার মাসই ফলে। হিম ভারে অবসন্ন কার্ত্তিক মাস আসে না,—শীতের জড়তাও কম। সকালে বসন্তের স্পর্শ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের দাহ এবং যখন-তখন প্রচণ্ড বর্ষার মর্ত্ত্যাবতরণ।

পোয়ামাইল পথ ঘুরিয়া কাবেরীর ভগ্নপ্রায় বাঁধাঘাটে আসিয়া স্নানার্থ নামিলাম।—কী সে স্রোত! কুটা পড়িলে ভাঙ্গিয়া যায়।

ভোজ্য—নারিকেল কেনা হইতে দক্ষিণান্ত

করিতে আমাদের কোন বেগই পাইতে হইল না। মেয়েটি এক কথায় সমস্ত মিটাইয়া দিল। অদূরে মন্দিরের চূড়া দেখিয়া পদব্রজেই দেব-দর্শনে চলিলাম।

মেয়েটি বলিল, "ঝট্‌কা (গাড়ী) করলে ভাল হ'ত। পথ অনেকখানি, রোদও চড়া।"

স্নানান্তে তখন সবেমাত্র স্নিগ্ধ হইয়াছি, গোযানে চাপার চেয়ে হাঁটিতেই উৎসাহ বেশী। অসম্মতি জানাইলাম।

মেয়েটি বলিল, "ঐ যে দেখছেন মন্দিরের চূড়ার মত, ও চূড়া নয় গোপুরম্। ঐ রকম সাতটি গোপুরম্ পার হ'য়ে তারপর আসল মন্দির। এবং মন্দিরের দরজা থেকে দেব-দর্শনে যেতে হ'লেও আধ মাইলের কম হাঁটতে হবে না।"

বলিলাম, "এতদূরে গোপুরম্ কেন? সাতটাই বা কি জন্য?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "মন্দিরই বলুন, আর প্রাসাদই বলুন, মানুষ কোথায়ই বা তার কীর্ত্তির চিহ্ন না এঁকে রাখতে ভালবাসে? দেখেন নি ধর্ম্মশালার ঘরের দেওয়ালে কয়লা পেন্সিল খড়ি দিয়ে নামে সে চিরস্থায়িত্ব লাভ করতে চায়।"

তার কথায় অন্তরে শ্রদ্ধা জাগিল। জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তার পানে চাহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, "তেমনি রাজারাও নিজের নিজের নামকে বাঁচাতে কাবেরীর ধার পর্য্যন্ত গোপুরমের পর গোপুরম্ তৈরী ক'রে গেছেন। যারা কাঠকয়লা দিয়ে ধর্ম্মশালায় নাম রাখতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত, তারা সংসারে কালের দেওয়ালে সে নাম আঁকতে যত্ন করে না কেন, আমি শুধু তাই ভাবি। শুধু ইট-কাঠের মধ্যে নির্জ্জীব নামটাকে জাগিয়ে রাখবার ব্যবস্থাই কি মানুষের চরম লক্ষ্য?"

সবিস্ময়ে বলিলাম, "তা' ত নয়ই। কিন্তু তুমি—আপনি—"

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার কথা-গুলো এমন কিছু মহৎ নয় যে, সম্মানের এতবড় প্রমোশন হঠাৎ পেতে পারি।"

তার ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তর দেবার আমার কিছুই ছিল না।

সত্য বটে 'তুমি' সম্বোধনটা অতি অন্ত-রঙ্গতার চিহ্ন এবং গভীর প্রীতির নিদর্শনও বটে, কিন্তু অনাত্মীয় অপরিচিতকে এ সম্বোধনের পশ্চাতে যে ক্ষুদ্র অবহেলা লুকাইয়াছিল মেয়েটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য ত তাহা এড়ায় নাই।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল, "দুঃখিত হবেন না। আমরা প্রকৃতির বাইরে দেখেই প্রশংসা করি, তাতেই অভ্যস্ত। উঃ, কি চড়া রোদ দেখেছেন!" বলিয়া ভিজা গামছাটা দু' ভাঁজ করিয়া মাথায় দিল।

আমরাও তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলাম।

কিন্তু সে কতক্ষণ!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তীব্র রৌদ্রে গামছা শুকাইয়া গেল; তিনটি গোপুরম্ পার হইয়াই দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মেয়েটি আমাদের পানে চাহিয়া বলিল, "বলেছিলাম ত এ রোদের কাছে বাংলা দেশের ভাদ্রমাসের রোদকেও মনে হয় ঠাণ্ডা। গাড়ী ডাকব, না কোন চৌলট্রীর মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম করবেন?"

মেয়েরা চৌলট্রিতে যাইবার কথা বলিলেন।

খোলার ছোট ছোট ঘর; সেখানে আশ্রয় লইতেই সূর্য্যদেব যেন আমাদের ব্যঙ্গ করিয়া মেঘের আড়ালে মুখ লুকাইলেন। তারপর আধ ঘণ্টা ধরিয়া ছোট বড় মেঘের দ্রুতগতিতে আকাশের আলো নিবিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল এবং আমাদের যাত্রাপথকে সুস্নিগ্ধ করিতে প্রবল বারিবর্ষণ সুরু হইল। কোথায় লাগে বাংলা দেশের শ্রাবণ মাস। কি প্রবল তার বেগ! কি দ্রুত তাদের দলবদ্ধ অবতরণ! দণ্ড কয়েকের মধ্যে সম্মুখের পথ-ঘাটের আর চিহ্নমাত্র রহিল

না—জাগিয়া উঠিল এক নদী। কাবেরীর মতই স্বর্ণতোয়—স্রোত-তীব্র!

ওদিকে মেয়েটিকে লইয়া মেয়েরা গল্প ফাঁদিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হইল, দেব-দর্শন না ঘটিলেও এত দূরান্তরে আসিয়া মেয়েটির মুখের গল্প শুনিয়া যদি আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি ত তাহাতে ক্ষোভের কিছুই নাই।

আমি আর কি করি, চৌকিতে বসিয়া প্রকৃতির যুদ্ধলীলা দেখিতেছিলাম। বায়ুবেগে নারিকেল বৃক্ষের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আম্রশাখা মুকুলসহ জলের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। কাগজ, কাঠ, হাঁড়ি—খড় কুটা কত না সেই তীব্র স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ছুটিতেছে। কোন কিছু কাজ না থাকিলে কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া এর অভিনবত্ব দেখিয়া সময় কাটান যায়।

ক্রমে বর্ষণ থামিল, মেয়েদের কলরবও থামিল এবং সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া পথের নদীতে আমরাও নামিয়া পড়িলাম।

দেবতা—তিনি দেখিবারই মত। ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শায়িত বিরাট্ পুরুষের সে কি মহিমা-ব্যঞ্জক রূপশ্রী! পদতলে সেবারতা রমা, মাথায় সহস্র ফণছত্র বিস্তার করিয়া নাগরাজ। প্রলয় পয়োধির পদ্ম-বেদিকায় শয়ন করিয়া নূতন পৃথিবীর ক্ষুদ্র দেহকে প্রীতি দিয়া পালন করিবার কি সে অভয় স্মিতহাস্য সেই বিরাট পালকের মুখে! শাস্ত্র সত্য, না শিল্পী সার্থক এ প্রশ্ন বার-বারই মনে জাগে। প্রণাম সারিয়া দেখি মেয়েটির অবনত মস্তকের যেন ভূমি সমাধি ঘটিয়া গিয়াছে। স্পন্দহীন, শব্দহীন, প্রণাম। কামনাহীনও বুঝি।

আমাদের প্রণাম প্রার্থনা কয়েক মিনিটে শেষ হইয়াছে। দেবতার কাছে ভক্তিভরে চাহিয়াছি কি? দেহের স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ, পার্থিব সম্পদ, আত্মীয়-আত্মীয়ার কুশল এবং পরকালের জন্য স্বর্গের কোন মনোরম স্থান।

বহুক্ষণ পরে অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিয়া সে বলিল, "চলুন।"

নিঃশব্দে বিশাল মন্দির-দুর্গ পার হইলাম। কাবেরী তীরে আসিয়া নৌকায় চাপিলাম এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে ত্রিচির চৌলট্রিতে ফিরিলাম।

চৌলট্রিরক্ষক বলিলেন, "কেমন বাবু, তীর্থ-দর্শন হয়েছে ত?"

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটির পানে চাহিলাম। সে তখন মেয়েদের কাছে বিদায় লইয়া চৌলট্রি ত্যাগের জন্য দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হস্তেঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া গোটা দুই টাকা বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই সে এক পা পিছাইয়া হাসিমুখে বলিল, "ও সব রাখুন, আজ যা' পারিশ্রমিক আমি পেয়েছি—এমন বহুদিন পাই নি। কেমন মুদেলিয়ার, নয় কি?"

চৌলট্রিরক্ষক হাসিবার মত মুখের ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "তা' বটেই ত! তবু বাবুরা যখন দিচ্ছেন, নাও। ওঁর অসম্মান করো না।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "অসম্মান! তুমি বুঝবে না মুদেলিয়ার, এ দেশ শস্যশ্যামলা হলেও বাংলার মাঠের পাশে দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করে। আমি আমার সেই গ্রামকে এখনও যে ভালবাসি। ওদের কাছে পারিশ্রমিক নিয়ে তাদের অসম্মান দিয়ে দূরে ঠেলতে পারি কি?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে একটি নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

মুদেলিয়ার বিস্ময়ে এবং ক্রোধে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বাবুজী, ও পাগল। আজ বিশ বছর ওকে এমনিই দেখছি। যাত্রীর কাছে দু'পয়সা নিয়ে ওর সংসার চলে—অথচ, বাঙ্গালীর কাছে প্রাণান্তেও কিছু নেয় না।

অন্তরে অন্তরে বুঝিলাম—নির্ব্বাসিতার বেদনা! পরের কাছে হাত পাতিয়া দীনতা

দেখাইতে ওর বাধে না সত্য, কিন্তু আত্মীয়ের দুয়ারে সম্মান বিক্রয় করিয়া পর হইয়া যাওয়ার মত আত্মহত্যা আর কি আছে? বাংলা হইতে বিশ বৎসর নির্ব্বাসিতা হইয়া সারা বাঙ্গালীকে ও আত্মীয় বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছে।

আজ কুড়ি দিন নির্ব্বাসনে কাটিতেছে। বুঝি ত বাংলার মাঠে মাঠে কি প্রচণ্ড মোহ মাখানো আছে। ট্রেনের পথে লাল মাঠের বুকে শ্যামল তৃণখণ্ড দেখিলেই মনে জাগে, ফেলিয়া-আসা জলা-জঙ্গলের পাশে ভূমিলক্ষ্মীর শস্যশ্রী। কাবেরীর গৈরিক জলে গঙ্গার কল্পনা করিয়া এই কতক্ষণ পূর্ব্বে আম্র-মুকুল-সুরভিত খেয়াঘাটে বসিয়া বাংলার বসন্ত সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করিতেছিলাম।

* * *

মা বলিলেন, "আহা, মেয়েটির কথা যদি শুনিস ত চোখের জল রাখতে পারবি নে। ওর বাপ এই সহরেই রেলে কাজ করত,—সামান্য মাইনে। দেশে কি একটা ঝগড়া হওয়ায় দশ বছরের মেয়েটিকে নিয়ে দেশ ছাড়ে; তারপর আর বাংলামুখো হয় নি। কিছুদিন পরে ওরাও যেন এদেশের বাসিন্দা হ'য়ে পড়ল। এক মাদ্রাজীর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য,—বিয়ের মাসখানেক না পেরুতে বর টাকাকড়ি নিয়ে সেই যে উধাও হয়,—আজ পর্য্যন্ত তার কোন খবর নেই। কিছুদিন পরে ওর বাপ মারা গেল। মেয়েটির তখন অকূল পাথার। এই ধর্ম্মশালার বুড়ো লোকটা ওর বাপের না কি বন্ধু ছিল। দিন গুজরাণের উপায় ওই বাতলে দেয়।

বলিলাম, "তা' ত দেখছিই, যাত্রী এলে সব দেখিয়ে শুনিয়ে—"

মা বলিলেন, "তাতেই ওর চলে। তবে বাঙ্গালীর কাছে ও কিছু নেয় না। বলে,—বাপ-ভাইয়ের কাছে কি দাম নেওয়া যায়। সে যে বড় লজ্জার কথা। দশ বছর বয়সে গাঁ ছেড়েছে বটে, কিন্তু গাঁকে ও এখনও ভোলে নি।"

শ্রদ্ধান্বিতস্বরে বলিলাম, "আত্মীয়কে ও সেই অল্প বয়সেই চিনেছিল মা। আমরা এতদিন বাংলায় থেকে যা' দেখি নি, এই দূর প্রবাসে ওর চোখে তা স্পষ্টতর। দেশকে ভুলতে আমরা দেশ-ভ্রমণ করি; অথচ আশ্চর্য্য দেখ মা, দেশান্তরে গেলেই দেশ আমাদের কত কাছেই না টানে! মায়ের কোলছাড়া হ'লেই না তাকে বেশী ক'রে চেনা যায়।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "রাখ তোর তত্ত্বকথা। ক'টায় ট্রেণ—হুঁস আছে কি?"

দেখিলাম—সময় সন্নিকট।

বলিলাম, "গুছিয়ে নাও।"

মা বলিলেন, "মনে হচ্ছে যেন কত কি ফেলে যাচ্ছি। হাঁ রে, মেয়েটিকে সঙ্গে নিলে হয় না?"

সে কথা ধর্ম্মশালার রক্ষক বৃদ্ধ মুদেলিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন, "না বাবুজী, এর আগে কত বাঙ্গালী ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছে—ও যায় নি। ওর বিশ্বাস, ওর স্বামী এখনও বেঁচে আছে, আর সে একদিন ফিরে আসবেই। তাই ত এখান থেকে ও কোথাও যেতে চায় না—কোন তীর্থেও না।"

স্ত্রীকে একান্তে ডাকিয়া বলিলাম, "এটা কিন্তু ওঁর বাড়াবাড়ি। কোন্ হতভাগা পত্নী-পরিত্যাগী জোচ্চোরই ওঁর দেশের চেয়ে আপন হ'ল।"

স্ত্রী মৃদু হাসিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালী এবং হিন্দু বটে, কিন্তু ভাগ্যিস্ স্ত্রীলোক হ'য়ে জন্মাও নি।"

বলিলাম, "কেন?"

স্ত্রী তেমনই হাসিয়া বলিলেন, "তা' হ'লে দেশ বড় কি স্বামী বড়—এ কথা জিজ্ঞাসাই করতে না।"

—জীবনের চল্‌তি পথে—

রুবি মল্লিক

—"উঃ, এত টাকা যদি আমার থাক্‌ত, তা' হ'লে বোধ হয় আমি আমার নিজের গ্রামে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড জমিদারী কিনে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে' আমার জীবনটা নিশ্চয়ই সুখে কাটিয়ে দিতে পার্‌তাম! আমার পরবর্ত্তী অন্ততঃ সাত পুরুষের জীবনটাও চলে যেত—আমার মতই সুখে। কিন্তু এগুলো যে পরের টাকা—সেই জন্যই ত গোল বাঁধিয়েছে।

—"আমি যেন শুধু একটা চিনির ভারবাহী বলদ; পিঠের 'পর চিনি বইছি, খেতে হ'লে সেই পাঁকগোলা জল খেতে হবে। কোটী কোটী টাকার হিসাব রাখ্‌ব, লেনদেন কর্‌ব, কারবার কর্‌ব আমি—কিন্তু তার উপস্বত্ব ভোগ কর্‌বেন বাবুরা। আর মুখে খালি বল্‌বেন—'আহা বিপিন, ওর মত বিশ্বাসী কর্ম্মচারী কি আজকালকার দিনে পাওয়া যায়! ও আমাদের বাপ-পিতাম'র আমল থেকে রয়েছে। বিপিনকে যত বিশ্বাস কর্‌তে পারি—ততটা নিজেদেরও বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। ওর 'পর সব আমরা ছেড়ে দিতে পারি—বিষয়-আশয় এস্তক। আর ব্যবসা,—ও যেমন বোঝে, আমরা তার কিছুই বুঝি না। ঠাকুর্দ্দা যে ওকে নিজে হাতে ধরে' ব্যবসা শিখিয়েছেন'।

—"কিন্তু তার সার্থকতা কি মাসে এক শ' টাকা। পৃথিবীর মধ্যে যা'-কিছু কাম্য, যা'-কিছু প্রয়োজনীয় যা'-কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বুঝ্‌তে পারা যায়, ভোগ কর্‌তে পারা যায়—সব তোমাদের জন্য, আর আমাদের জন্য নিরাকার শুধু ব্যবসা-বুদ্ধি, যা'র দাম এতটুকুও নয়; যা' দিয়ে নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বৃদ্ধা রুগ্ন মা, তা'দের প্রতিপালন করা অসম্ভব।

—"আচ্ছা, আমি যদি আজ এ টাকাগুলো নিয়ে সরে' যাই—তা' হ'লে আমার কতদিনের জেল হয়? দেখি না বাসায় গিয়ে, আইন ত একদিন পড়েছিলাম।"

বিপিনের বাসা বলিতে বিশেষ কিছু বোঝায় না। অপরিষ্কার অপরিসর গলির ভিতর ছোট একটা জীর্ণ একতলা বাড়ী। বাড়ীর অবস্থা দেখিলে গৃহস্থের দৈন্য খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

বিপিন গৃহে প্রবেশ করিয়া সরাসর শয়ন-গৃহে আসিয়া দেখিল যে, তাহার স্ত্রী শান্তমণি ঘুমাইতেছে। বিপিন একটী বই লইয়া দেখিতে লাগিল।

—"এই যে, এই যে, পেনাল কোডে লিখেছে তিন বছর—তিন বছরের বেশী নয়। আচ্ছা, তিন বছর জেলে কাটাতে পার্‌ব না—এটা কি বিশেষ শক্ত হবে? এখন আমার বয়স ছত্রিশ, তিন বছর পর হবে উনচল্লিশ, তখন এসে নবাবের মত জীবনটা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেব—তিন বছরের জেলের কষ্ট সুদে-আসলে পুষিয়ে নেব।

—"সাড়ে চার লাখ টাকা—উঃ, সেটা কি কম! যাই, কোন একটা এটর্ণির অফিসে, জমা দিয়ে বলি যে, আজ থেকে তিন বছর পরে যে এসে রঞ্জন নাম করে' টাকাটা চাইবে—তাকে

এই টাকাটা দিয়ে দেবেন। এখন এ টাকাগুলি জমা রাখুন—অবশ্য, আপনাদের যা' কমিশন সেটা এ থেকে কেটে নেবেন।"

বিকাল পাঁচটা—দত্ত ব্রাদার্সের বৃহৎ অফিসের সমস্ত কেরাণী এখনও গৃহে ফিরে নাই। বড় সাহেব, অর্থাৎ মিষ্টার রথীন দত্ত তাঁহার খাস কামরায় বসিয়া একটা প্রকাণ্ড চুরুট টানিতে-ছিলেন এবং কেবল তাঁহার চঞ্চল চক্ষু দ্বারের দিকে ফিরাইতেছিলেন—এমন সময় রক্তাক্ত দেহে বিপিন টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল—"বড় সাহেব! বড়সাহেব!—"

—কী, কী বিপিন? তোমার এত দেরী কেন? তোমার গায় রক্ত কেন? জামা-কাপড় ছিঁড়্‌ল কি করে'?—"

—"আজ্ঞে, সর্ব্বনাশ হয়েছে—ধুধুরীয়াদের কাছ থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা আদায় করে' আন্‌ছিলাম, রাস্তায় গুণ্ডারা কেড়ে নিয়েছে।"

—"তা' তুমি কি একা গেছ্‌লে। একটু বুদ্ধি-বিবেচনা তোমাদের নেই। ও হে সমর, যাও, পুলিসে একটা ফোন করে' দাও—আর দরওয়ানদের বলে' দাও, তারা যেন বিপিনকে অফিসের বাইরে যেতে না দেয়। যাও বিপিন, তুমি তোমার যায়গায় বসো গিয়ে।"

পরের দিন। বিচারালয় লোকে লোকারণ্য; কারণ, দত্ত ব্রাদার্সের প্রধান বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বিপিনের বিচার। কেহ বলিতেছে—"অত দিনের বিশ্বাসী—ও কি আর মিথ্যা কথা বল্‌ছে।"

কেহ বলিতেছে—"ও বেটা ডুবে ডুবে জল খেত, নিশ্চয়ই এবার দশ বছর জেল হবে—" এ রকম আরো কত কি।

বিকাল তিন-চার ঘটিকায় রায় বাহির হইল। বিপিনের জেল তিন বছর।

তিন বছর পর। বিপিন সেইমাত্র জেল হইতে বাহির হইয়াছে।

—"আঃ, সূর্য্যের আলোটা যেন আমায় হাত-ছানি দিয়ে ডেকে বল্‌ছে—'ও রে, তুই মুক্ত, তুই মুক্ত!' এবার বাবুগিরি!—যাই এটর্নির অফিসে—টাকা তুলে নিয়ে আসি।"

ক্লাইভ ষ্ট্রীট এটর্ণি এ, ডি, ব্যানার্জ্জি এণ্ড্ কোম্পানীর মস্ত অফিস্। মিষ্টার ব্যানার্জ্জি তাঁর কামরায় বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে। টলিতে টলিতে বিপিন প্রবেশ করিল—"মশায়, আমার সেই সাড়ে চার লাখ টাকা দিন ত!"

—"কিসের সাড়ে চার লাখ টাকা মশায়!"

—"সে কি! সেই যে তিন বছর আগে রেখে গেলাম। সেই যে নাম কর্‌লেই দেবেন--সেই একটা নাম।"

—"নামটা করুন, তবে ত দেব।"

—"হাঁ, নাম—নাম? আঃ, ভগবান্, নামটা—নামটা—নামটা যে মনে আস্‌ছে না! বলুন না মশায় নামটা! আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না—আমিই যে সেই লোক!—"

—"তা' ত হয় না মশায়, নামটা না বল্‌তে পার্‌লে দেব না টাকা।"

—"উঃ, ঈশ্বর, তোমার কি বিচার! সব কথা মনে আছে—শুধু নামটা ভুলে গেছি! এ তিন বছর কী অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি—কি আশায়, ভগবান্! সে আশার বাতিও কি আমার নিবে গেল—শেষ একবার, শুধু এক-বার জ্বালিয়ে দাও ঠাকুর!"

—"ও রে, এ পাগলটাকে এখান থেকে

গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে' দে, এ কাজকর্ম্ম কিছু কর্‌তে দিচ্ছে না।"

—"হ্যাঁ, আজকে আমায় পাগল ভাব্‌বে বই কি! আজ ত আমি দত্ত ব্রাদার্সের বিপিন ঘোষ নই—আর আমার আজ তালুকদার হবারও আশা নেই! যাই, নিজেই বেরিয়ে যাই—ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে আর গলা ধাক্কাটা খাব কেন?"

রাত বারটা। বিপিন ঘোষ হাওড়া ব্রীজের উপর উঠিতেছে।

—"এ কী, এ যে হাওড়া ব্রীজ্ আমার সাম্‌নে! সমস্ত দিন কি রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি! পেটে এক ফোঁটাও জল পড়ে নি? কী বিপিন ঘোষ, বড়লোক হবে না! ভগবানের বিচার দেখেছ!—আজ তুমি চোর, আজ তুমি জেল-ফেরৎ, আজ তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, সবাই তোমায় ঘৃণা কর্‌বে—বল্‌বে চোর, আরো কত কী!

—"উঃ, অর্থের কি মোহ! এক মুহূর্ত্তে আমার এমন সুন্দর জীবনটা কোথা থেকে টেনে এনে একেবারে পাঁকের মধ্যে পূরে, তার প্রতি স্তর পচা আবর্জ্জনায় ভরে' দিয়ে কী কুৎসিৎ করে' দিলে!

—"বাঃ, কী সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস! মা-গঙ্গা যেন হাওয়াকে দিয়ে আমার কাণে বলে' পাঠাচ্ছেন—'ও রে, আয় আয়, আমার কোলে এসে শান্ত হ'! তোর যা'-কিছু দৈন্য, যা'-কিছু কলঙ্ক, সব আমার কোলে এসে লুকো!' তাই যাই—তাই—ই যাই,—যা'র কেউ নেই—তার মা-গঙ্গা আছেন!"

সে হাওড়া ব্রীজের উপর হইতে জলে ঝম্প প্রদান করিয়া ডুবিয়া গেল—পর মুহূর্ত্তেই পুনরায় ভাসিয়া উঠিল—"মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—রঞ্জন!"

কিন্তু.........!*

---

* Maurise Levelএর Crysis অনুকরণে লিখিত
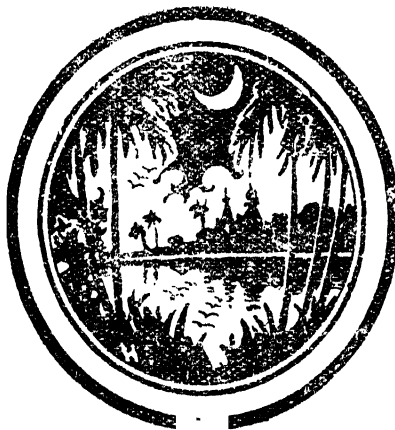
—অষ্টমীতে বিসর্জ্জন—

শ্রীচারুশীলা মিত্র, বাণী-বিনোদিনী

এক

প্রবল জ্বরের তাড়নায় কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ রায়-মহাশয় ডাকিলেন—"ইন্দু, অ ইন্দু, একবার এদিকে আয় না ভাই।"

ইন্দু ওরফে ইন্দ্রাণী তখন দাদা-মহাশয়ের জন্য পথ্য তৈরী করিতেছিল; দাদা-মহাশয়ের ডাক শুনিয়া হাতের কাজ রাখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি দাদা-মশায়, আবার বুঝি জ্বর এল?"

কম্পিত কণ্ঠে রায়-মহাশয় উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ দিদি। আমাকে একটু চেপে ধরতে পারিস?"

বৃদ্ধ তখন লেপের ভিতর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী লেপটা তাঁহার গায়ে উত্তমরূপে টানিয়া দিয়া তাহার উপর একটা বালিশ চাপাইয়া নিজের ছোট সুকোমল বাহু দু'টি দ্বারা যতটা পারিল দাদা-মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া রহিল। কিন্তু সে প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরের কম্প কি সহজে যায়!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ইন্দ্রাণী বলিল—"একটু জল গরম করে' আনব দাদা-মশায়?"

লেপের ভিতর হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে দাদা-মহাশয় উত্তর করিলেন—"না দিদি, এখন আমায় ছেড়ে গেলে আর বাঁচব না।"

অগত্যা ইন্দ্রাণী দাদা-মহাশয়কে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। ইন্দ্রাণীর বয়স মাত্র এগার বৎসর। কিছুদিন হইল তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতা প্রশান্ত রাজরোষে পতিত হইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ বন্দী আছেন। প্রশান্তের আর কেহ ছিল না, রায় মহাশয়েরও আর কেহ নাই। জামাতা বন্দী হইবার পর তিনি কন্যা ও দৌহিত্রীকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কালের অপ্রতিহত বিধানে তাঁহার সেই এক-মাত্র কন্যা আশালতা, একটি মাত্র সন্তান ইন্দ্রাণীকে রাখিয়া কিছুদিন পরে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ রায়-মহাশয় দৌহিত্রীটিকে বুকে লইয়া কন্যার শোক বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিলেন। রায়-মহাশয়ের যৎসামান্য জমীজমা ছিল; তাহাই ভাগে আবাদ করাইয়া কায়ক্লেশে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তাহার উপর কন্যা ও দৌহিত্রী স্কন্ধে পতিত হওয়ায় সেই ক্লেশের পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রশান্তের বাড়ী ছিল গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে। একজন আমেরিকাবাসী সাহেব বণিকের অপার মহিমায় এই সময় তাহার পিতৃ-পিতামহের বাস্তু-ভিটা সাহেবের নব-প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ 'জুট মিলে'র অট্টালিকার সহিত সংলগ্ন হইয়া গেল। অবশ্য ইহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু ক্ষতির পরিমাণের সহিত যোগ করিলে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সেই যৎসামান্য অর্থও আশালতার চিকিৎসাতে ব্যয় হইয়া গেল। অবশেষে বিশ্বধ্বংসী কাল তাঁহার ধন ও প্রাণ দুই-ই লইয়া প্রস্থান করিল। মাতৃহীনা ইন্দ্রাণী মাতামহের অপরিসীম স্নেহ ছায়াতলে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। পশ্চিম বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ম্যালেরিয়া বর্ষাসমাগমে এতই প্রবলভাব ধারণ করে যে, মানুষ সহস্র

যত্ন ও সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। বৃদ্ধ রায় মহাশয়ও পারিলেন না। রোগে, শোকে জরাজীর্ণ, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট বৃদ্ধ ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী শৈশব হইতে আপদ-বিপদের মধ্যে দিন যাপন করায় অতি অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণেরও তাহার অভাব ছিল না। তাহার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যতদূর সম্ভব সে দাদা-মহাশয়ের সেবা করিত। কিন্তু ছেলেমানুষ সে, কত দিক দেখে? সংসার ক্ষুদ্র হইলেও গৃহকর্ম্ম, রাঁধাবাড়া, বাসনমাজা প্রভৃতি সবই তাহাকে করিতে হয়। অর্থের অভাব, দাস-দাসী রাখিবার শক্তি নাই। ইন্দ্রাণী যদিও তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত শক্তিটুকু দাদা-মহাশয়ের সেবায়, নিয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু সেবাতেই ত আর রোগ সারে না। অর্থের অভাবে ভাল রকম চিকিৎসা হইল না। ভীষণ ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সোণার বাংলা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর সাধ্য নাই তাহার প্রতিকার করে। বাঙ্গালীর সংহতি শক্তি নাই, অর্থ নাই, দেহ ও মন অবসাদ পরিপূর্ণ! অকাল মৃত্যুতে দুর্ভিক্ষে, দারিদ্র্যে, রোগে, শোকে বাঙ্গালী নিষ্পেষিত, জর্জ্জরিত!

ইন্দ্রাণী তেমনিভাবে দাদা-মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া রহিল। তারপর কখন যে নিদ্রা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন চাহিয়া দেখিল দিনের আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। দাদা-মহাশয়কে আর পথ্য দেওয়া হয় নাই। বৃদ্ধ জ্বরের ঘোরেই হউক অথবা নিদ্রার ক্রোড়েই হউক, রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল।

দুই

দিন যায়, রায়-মহাশয়ের জ্বর আর সারে না। রোগে-শোকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ উঠিয়া কাজকর্ম্ম কিছু পরিদর্শন করিতে পারেন না; সুতরাং, জমীর উপস্বত্ব যাহা কিছু তাহাও পান না। জগতের নিয়মই এই, ঠকাইতে পারিলে কেহ ছাড়ে না। এ যে কলির রাজত্ব!

রায়-মহাশয়ের সঞ্চিত অর্থ কিছু ছিল না, যাহা দ্বারা অল্প কিছুদিনও বসিয়া চলিতে পারে।

পল্লীগ্রামের 'শতমারি' 'সহস্রমারি' গোছের চিকিৎসক একজন ছিলেন, তিনিই রায়-মহাশয়কে 'কুইনাইন পিল', 'ফিভার মিকশ্চার', 'ক্যাষ্টর অয়েল' প্রভৃতি দিতেন, কিন্তু তাঁহার কিছু প্রাপ্য হওয়াতে তিনি আর রায়-মহাশয়ের বাড়ীর দিকে পদার্পণ করিতেন না। ইন্দ্রাণী বড়ই বিপদে পড়িল। বালিকা কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, দাদা-মহাশয়ের পথ্যের যোগাড় করিতেও সে অশক্ত হইয়া উঠিল। গোয়ালিনী দুই মাস দুধের দাম পায় নাই বলিয়া দুধ বন্ধ করিয়া দিল। সারা রাত্রি চিন্তায় বালিকার চক্ষে নিদ্রা আসিল না; প্রভাতে উঠিয়া সে কি দিয়া দাদা-মহাশয়কে পথ্য দিবে! দাদা-মহাশয়কে সব কথা খুলিয়া বলিতে ইন্দ্রাণীর সাহস হয় না। রুগ্ন শয্যাশায়ী বৃদ্ধকে কেবল ক্লেশের উপর ক্লেশ দেওয়া হইবে বই ত নয়।

ঘরে একটিও পয়সা নাই। ইন্দ্রাণী ভাবিতে লাগিল, যদি সে ছয়টা পয়সা পায়, তবে এক পয়সার সাবু, এক পয়সার চিনি, এবং চার পয়সায় এক পোয়া দুধ কিনিয়া সাগু তৈরি করিয়া দাদা-মহাশয়ের একটা দিনের পথ্য চালাইয়া দিতে পারে। কিন্তু কোথায় পাইবে সে ছয়টা পয়সা? প্রভাতে উঠিয়া ইন্দ্রাণী প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে গিয়া পয়সা ধার চাহিল—"ও গো,

আমাকে ছ'টা পয়সা ধার দাও না, দাদা-মশায় ভাল হলেই দিয়ে যাব'খন !"

কিন্তু কেহই তাহাকে পয়সা ধার দিয়া সাহায্য করিল না। গরীবকে বিশ্বাস কি—পয়সা ছ'টা যদি আর নাই পাওয়া যায় ?

সেই এগার-বার বছরের মেয়েটী কিছুতেই পয়সা সংগ্রহ করিতে পারিল না। রায়-মহাশয়ের প্রতিবেশীদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। সকালবেলায় সকলেই তখন নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

পুরুষেরা কেহ লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জমী চষিতে যাইতেছে; কেহ কাস্তে হাতে রবিশস্য তুলিতে যাইতেছে ; কেহ বা কোদাল লইয়া মাটী কাটিতে চলিয়াছে। মেয়েরা কেহ ঘর নিকাইতে, বাসন মাজিতে ব্যস্ত। কেহ তরি-তরকারী শাকসব্জীর বোঝা লইয়া হাটে বিক্রয় করিতে ছুটিয়াছে। কেহ গাভী দোহন করিতেছে। মেয়েরা সেই দুধ লইয়া বাড়ী বাড়ী যোগান দিতে যাইবে। ইন্দ্রাণী হতাশাপূর্ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এক গোয়ালিনীর বাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইল।

গোয়ালিনী গাভী দোহন করিয়া সেই দুধ মাপিয়া একটা বড় ভাঁড়ে ঢালিয়া রাখিতেছিল। ইন্দ্রাণী বলিল—"গয়লা-পিসি, আমাকে এক পো' দুধ দেবে, কাল পয়সা দিয়ে যাব ?"

কাল যে পয়সা সে কোথা হইতে দিবে, সে কথা সে ভাবিয়া দেখে নাই। শুধু সে দাদা-মহাশয়ের পথ্যের চিন্তায় কাতর হইয়া এক নিশ্বাসে কথা কয়টী বলিয়া ফেলিল। কিন্তু হায়, সংসার স্বার্থপর! সরলা বালিকার সেই নিদারুণ চিন্তা, তাহার মর্ম্মবেদনা কে বুঝিবে ? তাহার ম্লান মুখের দিকে কে চাহিবে ? এমন করুণাময় ব্যক্তি জগতে যে নিতান্তই বিরল !

গোয়ালিনী ইন্দ্রাণীর কথা শুনিয়া মুখ ভার করিয়া উত্তর করিল—"না বাছা, দুধ কোথায় পাব। এ আমার রোজের দুধ। নগদ পয়সা দাও ত বরং অপর 'নোকে'র কাছ থেকে কিনে এনে দিতে পারি।"

ইন্দ্রাণী নির্ব্বাক রহিল। পয়সা ত তাহার কাছে নাই—পয়সা সে কোথা হইতে দিবে! অজ্ঞাতসারে তাহার আয়ত চক্ষু দু'টি সজল হইয়া উঠিল। তাহার সে মূক আবেদন ভগবানের কাণে পৌঁছিবে কি ! দুধ না পাইলে আজ তাহার দাদা-মহাশয়কে অনাহারে থাকিতে হইবে। রোগা মানুষ ক্ষুধার তাড়না কি প্রকারে সহ্য করিবেন ! হায়, যখন তিনি বলিবেন —'কি আছে ইন্দু খেতে দে, বড় ক্ষিদে পেয়েচে', তখন সে কি করিবে ! কেমন করিয়া বলিবে—'আজ কিছু নেই দাদা-মশাই !' ওঃ !

গোয়ালিনী তিন সের দুধে আড়াই সের জল মিশাইয়া কেঁড়েয় ভরিয়া তাহার মুখে একটা পোয়া ঘটি চাপা দিয়া কাঁকালে তুলিয়া লইয়া তাহাই খাঁটি বলিয়া বেচিতে চলিল। ইন্দ্রাণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। গোয়ালিনী চলিয়া গেলে পর সেও সেখান হইতে চলিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিল, গয়লা পিসীর একদিনেই আজ এক টাকা দশ আনা পয়সা লাভ হইল। টাকায় চার সের দুধ। ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রাণী দ্রুতপদে গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দাদা-মহাশয় একা রহিয়াছেন—তাঁহাকে দেখিবার সে ভিন্ন যে আর কেহ নাই ! ফিরিবার পথে ইন্দ্রাণী দেখিল, তাহারই সমবয়স্কা কৈবর্ত্তদের মেয়ে যমুনা তাহাদের গৃহ-সংলগ্ন বাগানের মাচা হইতে লাউ, কুমড়া, শশা ইত্যাদি বাছিয়া বাছিয়া কাটিয়া এক স্থানে জমা করিয়া রাখিতেছে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—"এগুলো কি হবে রে যমুনা ?"

যমুনা বলিল—"হাটে নিয়ে যাব বেচতে। বাবা জমীতে নাঙ্গল দিতে গেচে, মা মুড়ী ভাজচে, আমাকেই আজ হাটে যেতে হবে।"

বড় আগ্রহে ইন্দ্রাণী তাহাকে বলিল—"আমাদের গাছেও তিনটে বড় বড় লাউ আছে, বেচে দিবি ভাই ?"

যমুনা বলিল—"দোব। আমায় ক'টা পয়সা দিবি বল ?"

ইন্দ্রাণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে বলিল—"পয়সা ! পয়সা কোথায় পাব ভাই ? পয়সা ত আমার কাছে নেই।"

যমুনা বলিল—"পয়সা না দিলে কি কেউ অমনি কাজ করে দেয় ভাই ?"

হায় রে পয়সা ! ইন্দ্রাণী যাহার কাছে যায়, তাহার কাছেই কেবল শোনে পয়সা ! পয়সা ! পয়সা ! জগতে পয়সাই সব চেয়ে বড় ! পয়সা দিয়ে কি মানুষ কিনিতে মেলে ! একটা মানুষের জীবনের অপেক্ষাও কি পয়সার দাম বেশী !

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া ইন্দ্রাণী বলিল—"আচ্ছা, দাদা মশায় ভাল হলেই তোকে পয়সা দোব, মাইরি দোব, মিছে কথা বলচি না।"

যমুনা মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল—"না ভাই, তা' আমি পারব না। তোর দাদা-মশায় এখন কবে ভাল হবে তার ঠিক নেই। মা জানতে পারলে আমায় মারবে।"

ইন্দ্রাণী ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া চলিল। পরের উপর ত আর কোনও জোর-জবরদস্তি চলে না। ইন্দ্রাণী ভাবিতে লাগিল, সে যদি ভদ্রঘরের মেয়ে না হইয়া যমুনার মত চাষার মেয়ে হইত, তাহা হইলে সেও আজ তাহার মত শাকসব্জীর বোঝা লইয়া হাটে বিক্রয় করিয়া পয়সা লইয়া আসিত। কোন অভাবই থাকিত না। দাদা-মহাশয়ের পথ্যের জন্য তাহা হইলে কোন চিন্তাই করিতে হইত না। যাহাদের ক্ষেতে ধান, বাগানে শাকসব্জী, গোয়ালে গরু, তাহাদের আবার ভাবনা ! যাহারা মেয়ে-পুরুষে মিলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে তাহাদের আবার দুঃখ ! তাহাদের আবার অভাব ! মানের দায়ে যাহাদের প্রাণ যায়, সুখ তাহাদের কোথায় !

ইন্দ্রাণী চলিয়া যায় দেখিয়া যমুনা ডাকিল—"শোন্।"

ইন্দ্রাণী ফিরিয়া বলিল—"কি ?"

যমুনা বলিল—"আচ্ছা, পয়সা দিতে না পারিস, দুটো নাউ দিবি আমায় ?"

ইন্দ্রাণী সাগ্রহে বলিল—"দোব।" তখন যে তাহার ছ'টা পয়সা না হইলেই নয়।

যমুনা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে গিয়া তাহাদের গৃহের চাল হইতে লাউ তিনটা পাড়িয়া আনিয়া নিজের শাকসব্জীর সহিত বাজরা বোঝাই করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে লইয়া গেল। ফিরিবার সময় ইন্দ্রাণীকে একটা লাউয়ের দাম দশটা পয়সা দিয়া গেল। ইন্দ্রাণী মহাখুসী ! তখনই সে যমুনার দ্বারা দোকান হইতে এক পয়সার সাগু, এক পয়সার মিছরি কিনিয়া আনাইল এবং নিজে ছুটিয়া গোয়ালা-বাড়ী হইতে চার পয়সা নগদ দিয়া এক পোয়া দুধ কিনিয়া আনিয়া দাদা-মহাশয়কে পথ্য তৈরি করিয়া দিল। তাঁহাকে খাওয়াইয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

তিন

বালিকা ইন্দ্রাণী তাহার কৃষক প্রতিবেশীদের দেখাদেখি নিজেদের বাড়ীর উঠানে লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি কিছু কিছু গাছ লাগাইয়াছিল ; এখন যমুনার সাহায্যে সে এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইল। যমুনাকে অংশ দিয়া ঐ সকল লাউ, কুমড়া বিক্রয় করিয়া দু'-চার পয়সা যাহা পায়, তাহাতে সে উপবাস হইতে দাদামহাশয়কে রক্ষা করে।

আশ্বিন মাস। শারদীয়া পূজা সমাগত। যমুনার পিতা যমুনাকে দুই টাকা সাত আনা দিয়া একখানি খয়ের রংয়ের 'গোদাবরী' সাড়ী কিনিয়া দিয়াছে। যমুনার তাহা পাইয়া মহা-

আহ্লাদ তাহার এই আনন্দের অংশ ইন্দ্রাণীকে দিবার জন্য কাপড়খানি লইয়া সে তাড়াতাড়ি ইন্দ্রাণীর নিকট আসিল—"এই দেখ্ ভাই, আমার পূজোর কাপড়। বাবা দিয়েচে। এর নাম গোদাবরী সাড়ী। তোর কি কাপড় হ'ল ভাই ?"

ইন্দ্রাণী যমুনার কাপড় দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল—"আমার এবার পূজোর কাপড় হয় নি। বাবা বাড়ী নেই, দাদা মশায়ের অসুখ, কে কিনে দেবে ভাই ? দাদা-মশায় ভাল হ'লে দেবেন।"

—"ও মা তাও ত বটে!" বলিয়া যমুনা চলিয়া আসিল। যমুনার লালচে রংয়ের রেশম পাড় সাড়ীখানি দেখিয়া ইন্দ্রাণীর খুবই পছন্দ হইয়াছিল ; কিন্তু সে ত নির্ব্বোধ বালিকা নয় যে, কাপড়ের জন্য বায়না করিবে। তবে মনের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে অসমর্থ হইয়া সে দাদা-মহাশয়কে বলিল—"দাদা মশায়, যমুনার বাবা যমুনাকে একখানা পূজোর কাপড় কিনে দিয়েচে। কি চমৎকার কাপড়! নাম গোদাবরী। বললে—'এই নতুন উঠেছে'।"

একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাদা-মশায় বলিলেন—"তোকেও কিনে দোব ভাই ; আগে তোর বাবা ফিরে আসুক।" রায়-মহাশয় মর্ম্মে মর্ম্মে যে গভীর বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহা অবক্তব্য ! অবর্ণনীয় !

সারা বৎসরের পর মা আসিতেছেন। বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দের স্রোত বহিতেছে, শুধু তাঁহারই গৃহ নিরানন্দময়! এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাঁহার একমাত্র স্নেহের ধন জীবনের সমস্ত আশা আশালতা চলিয়া গিয়াছে ! জামাতা প্রশান্ত কোনও অজ্ঞাত কারণে রাজ-রোষে নিপতিত, বন্দী ! অনেক আবেদন-নিবেদন করিয়াও মুক্তির লক্ষণ দেখা যায় নাই। মাসিক সাহায্য কিছু দিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু এখনও পাকা কিছু শোনা যায় নাই।

আজ এই বৎসরের দিনে তাঁহার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি, সেবানিরতা স্নেহশীলা দৌহিত্রীকে একখানি নূতন কাপড় দিতে না পারায় তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে বেদনা রাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাঁহার অন্তর-দেবতা ভিন্ন আর কে বুঝিবে !

চার

রোগ-শোকে জীর্ণ বৃদ্ধ সকল বিষয়ে অক্ষম হইয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে ইন্দ্রাণীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বালিকা ইন্দ্রাণীর প্রাণেই বা কত সয়! একে সময়ের গুণ, তাহার উপর অতিরিক্ত পরিশ্রম, এবং আহারের অত্যল্পতা এই ত্র্যহস্পর্শ সংযোগে অতি বড় কর্ম্মঠ শক্তি-শালী লোকেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ইন্দ্রাণী ত বালিকা মাত্র! তাহার শরীরের উপর দিয়া যত কিছু অনিয়ম-অত্যাচার হইতে পারে, তাহা হইয়াছে, হইতেছে। একদিন দুপুরবেলায় সে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল, আর উঠিল না। প্রতি-দিন সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠিয়া সে গৃহকর্ম্মে রত হইত। শ্রান্তি ছিল না, ক্লান্তি ছিল না, বিরক্তির লেশমাত্র যাহার মুখে প্রকাশ পাইত না, কলের পুতুলের ন্যায় যে ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ সে নিতান্ত অবসন্নভাবে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ত দূরের কথা, বেলা প্রহর অতীত হইয়া গেল, তবু সে উঠিল না। প্রবল জ্বরে সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় এলোমেলো বকিয়া যাইতেছে। দারুণ পিপাসায় কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক। যাহার কণ্ঠস্বর কোনদিন উচ্চে উঠে নাই, প্রাণপণ যত্নে দাদা-মহাশয়ের সেবা করিয়া আসিয়াছে, কোনও বিষয়ে তাঁহাকে এতটুকু কষ্ট পাইতে দেয় নাই, সে আজ দাদা-মশায়কে ফরমাইস করিতে লাগিল—"দাদা-মশায়, জল দাও, দাদা-মশায় জল দাও! ওঠ না, গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল আমার!"

সংসারের একমাত্র অবলম্বন বালিকা দৌহিত্রীটিকে আজ সহসা এইভাবে পীড়িত হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ রায়-মহাশয়ের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। তিনি নিজের সমস্ত রোগের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। মা যেমন কোলের সন্তানটি পীড়িত হইলে তাহাকে বুকে করিয়া থাকেন, রায়-মহাশয়ও সেইরূপ ইন্দ্রাণীকে লইয়া রহিলেন। মা-হারা এই বালিকা দৌহিত্রীটি যে তাঁহার কত প্রিয়, তাহা অন্যে কি বুঝিবে! কত প্রকারে রায়-মহাশয় বালিকাকে একটু স্বস্তি দিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাণীর কিছুতেই স্বস্তি নাই। কখনও সে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় নীরব রহিল, আবার কখনও রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকটা বেলায় হাট হইতে ফিরিয়া যমুনা রায়-মহাশয়ের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল —"কই রে ইন্দু, কোথায় গেলি? এই নে ভাই, তোর কালকের চাল কুমড়োর পয়সা। আজ খুব দরে বিকিয়েচে, পূজো কি না। ও মা, ইন্দু কোথায়! সাড়াশব্দ নেই যে!" বলিতে বলিতে সে রায়-মহাশয়ের শয়ন-গৃহের দ্বারের নিকট আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিল ইন্দ্রাণী শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যমুনা বলিল—"ইন্দুর কি হয়েচে গা দাদা-মশায়?"

রায়-মহাশয় ইন্দুর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"ইন্দুর বড় জ্বর হয়েছে রে। বাছা আমার কাল থেকে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি।" তাঁহার স্বর গাঢ়, কম্পিত, অশ্রু-বিক্ষুব্ধ।

যমুনা বলিল—"অ, তাই ত বলি, যে ভোর না হ'তে হ'তে পুকুর ঘাটে ছোটে, সে এত বেলা অবদি শুয়ে কেন? বাসিপাটও ত কিছু হয় নি দেখতে পাচ্ছি। চারদিক সব ভ্যান্‌ভ্যান্ করচে।"

রায়-মহাশয় বলিলেন—"কে আর করবে বল? ইন্দু যে আমার পড়ে রয়েচে!"

যমুনা আর কিছু না বলিয়া পয়সা কয়টা ঝনাৎ করিয়া রায়-মহাশয়ের শয্যার উপর ফেলিয়া দিয়া প্রথমে ঝাঁটা গাছটা খুঁজিয়া লইয়া ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিল, তারপর আগের দিনের উচ্ছিষ্ট বাসন কয়খানা মাজিয়া আনিয়া দুই কলসী জল তুলিয়া রাখিল। পরে রায়-মহাশয়কে বলিল—"তোমার দুটো খাবার কি হবে দাদা-মশায়?"

রায় মহাশয় বলিলেন—"কি আর হবে, খিদেও আমার নেই।"

—"উনুনটা ধরিয়ে দিই না, দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নাও। রোগামানুষ তুমি, কি করে' উপোস করে থাকবে?"

—"আমার কি আর রেঁধে খাবার শক্তি আছে রে যমুনা। তুই বরং দুটো পয়সা নিয়ে সাবু কিনে এনে ইন্দুর জন্যে একটু করে' দিয়ে যা'।"

যমুনা তাহাই করিল। তারপর তাহাদের বাড়ী হইতে একটা ডালা করিয়া কিছু মুড়ী ও একটু গুড় আনিয়া দাদা-মহাশয়কে বলিল—"এই মুড়ি ক'টা খাও দাদা-মশায়, খেয়ে একটু জল 'মুয়ে' দাও, মা বললে।"

এইভাবে কয়দিন কাটিয়া গেল। যমুনা প্রত্যহই একবার আসিয়া প্রয়োজনীয় কাজ সারিয়া দিয়া যায়। ইন্দ্রাণীর রোগ বাড়িয়াই চলিল। পূর্ণ বিকার। চোখ দু'টা রক্তজবার ন্যায় টক্‌টকে রাঙা, ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ। অর্থ নাই, চিকিৎসা হইল না। রায়-মহাশয় তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া গায়ত্রী জপ করেন, ভগবানকে ডাকেন—"হে অসহায়ের সহায় মধুসূদন, তুমি আমার ইন্দুকে রক্ষা কর!

নিঃস্বের ভগবান্‌কে ডাকা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে!

নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি, সারা পল্লী সুষুপ্ত।

কেবল ঝিল্লীর অবিরাম চীৎকার ধ্বনি সে নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। গৃহের এক পার্শ্বে দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারই অস্পষ্ট আলোকে রায়-মহাশয় ইন্দ্রাণীর গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণী চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল—"দাদা-মশায়, কি করছ? মাথাটা যে আমার গেল!"

—"এই যে দিদি, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া তিনি একটু জোরে জোরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহেই বা শক্তি কোথায়? ইন্দ্রাণী দুই হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল। চক্ষু মুদিয়া রায়-মহাশয় করযোড়ে শুধু ইন্দুর রোগমুক্তির কামনা করিতে লাগিলেন। কখনও বা প্রাণের সমস্ত স্নেহ-মমতা ঢালিয়া দিয়া তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ইন্দু বিকারের ঘোরে আচ্ছন্ন। ডাকিল—"দাদা-মশায়?"

—"কি দিদি?"

—"কাঁচের গেলাসটা ভেঙ্গে ফেলেছ?"

—"কই, না ত।"

—"হ্যাঁ, ভেঙ্গেছ। এই যে বিছানায় সব ছড়িয়ে রেখেছ। আমার গা যে কেটে গেল। উঃ, দেখ, দেখ, রক্ত পড়ছে বোধ হয়!"

রায় মহাশয় ধীরে ধীরে বিছানাটা ঝাড়িয়া দিলেন। ইন্দু বলিল—"উঁ হুঁ— তবুও হয় নি, এখনো রয়েছে। আমার গায়ে বিঁধছে।"

—"তবে আমার কোলের ওপর শুবি?"

—"ধ্যেৎ! আমি যেন কচি খুকীটি আছি, তাই তোমার কোলে শোব। দাদা-মশায়, দাদা-মশায়, কারা সব লাঠি ঘাড়ে করে আসছে! মার, মার—ওদের তাড়িয়ে দাও—নইলে আমায় টেনে নিয়ে যাবে!" বলিয়া ইন্দ্রাণী চীৎকার করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার বক্ষস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিছু পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"যমুনার কি সুন্দর পূজোর কাপড় হয়েছে! ঐ রকম একখানা আমায় কিনে দাও না দাদা মশায়।"

অতীত দিনের মত নিতান্ত আবদারের সুরে কথা কয়টা বলিয়া দাদা মহাশয়ের পরিধেয় বসনের এক প্রান্ত ধরিয়া টান দিল। রায়-মহাশয়ের ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ যেন লবণাক্ত হইয়া উঠিল। বঙ্গের এই শারদীয়া মহোৎসবে যাহার যেমন সঙ্গতি, সে সেইরূপ নূতন বসন-ভূষণে আত্মীয়-বন্ধু, প্রিয়পরিজনকে সাজাইয়াছে। পারেন নাই শুধু তিনি—হতভাগ্য রায়-মহাশয়—তাঁহার একমাত্র স্নেহের পুত্তলি ইন্দ্রাণীকে একখানি নূতন কাপড় দিয়া সাজাইতে! তাঁহার ইচ্ছা হইল, নিজের হাতে আপনার হৃৎপিণ্ডটা সজোরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সেই দুঃখময় জীবনের অবসান করিয়া দেন!

ইন্দ্রানী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া আবার ডাকিল—"দাদা মশায়!"

অশ্রুবিক্ষুব্ধ গাঢ় কম্পিত কণ্ঠে রায়-মহাশয় উত্তর দিলেন—"কেন ভাই?"

—"আচ্ছা, আমি যদি না বাঁচি, তা' হ'লে তোমাকে কে দেখবে?"

রায় মহাশয়ের কোটরগত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার শীর্ণ কপোলে আসিয়া পড়িল। ইন্দ্রাণীর অলক্ষ্যে তিনি তাহা বাম হস্তে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"বালাই, ষাট! ও কথা কি বলতে আছে? ভয় কি, ভাল হবে।"

—"যদি ভাল না হই?"

রায়-মহাশয় নীরব। ইন্দ্রানী আবার বলিল—"তা' হ'লে তোমার খুব কষ্ট হবে। না, দাদা-মশায়?"

এবার অশ্রু আর বাধা মানিল না,

ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার দুই-চারি ফোঁটা ইন্দ্রাণীর গায়ে পড়িল। সে তখন প্রকৃতিস্থ; বলিল—"কাঁদচ দাদা-মশায় তুমি, তবে আর বলব না। আচ্ছা, বাবা কবে আসবেন?"

—"কি জানি ভাই! তা' ত আমি কিছুই জানি না।"

—"কেন তারা বাবাকে ধরে' নিয়ে গেছে?"

—"সে কথাও ত বল্‌তে পারি না। অপরাধ ত কিছু প্রমাণ হয় নি।"

একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথা-ভরা কণ্ঠে ইন্দ্রাণী বলিল—"বাবাকে আর আমি দেখতে পাব না!"

সারারাত্রি এইভাবে কাটিল।

* * *

ঊষার আলোক তখন সবেমাত্র জানালার ফাঁক দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। সদ্যজাগ্রত পাখীর কাকলী চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিন অষ্টমী। দূরে বারোয়ারী তলায় সানাই রাগিনী আলাপ করিতেছিল। শেফালি সুরভিমাখা প্রভাত বায়ু মৃত্যু-পথ যাত্রিনী ইন্দ্রাণীর ললাটের স্বেদবিন্দুগুলি মুছাইয়া দিয়া গেল। বালিকা সারা রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর শ্রান্ত ক্লান্তভাবে দাদা-মহাশয়ের কোলের উপর মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

—রোমান্স—

শ্রীঅসিতকুমার সেন, বি-এল

বীণা অস্থির হয়ে উঠেছে। এই সাতদিন হ'ল রোজ রোজ ডাকে তার নামে একখানা করে' চিঠি আসছে। প্রেরকের নাম থাকে না। লাল খামে লাল চিঠির কাগজে টাইপ করা ইংরাজী লেখা—তাতে আবার যেন কি সুগন্ধ মাখান। লোকটা যেন পাগল এবং বোধ হয় বীণার প্রেমে পড়েছে।

বীণার বন্ধু লিলি রোজই বিকালে বীণাদের বাড়ী বেড়াতে আসে। সে এ ক'দিন রোজই বীণাকে ঠাট্টা করে' জিজ্ঞাসা করেছে—"ওলো, তোর প্রেমিকের অবস্থা আজ কেমন?"

বীণা সেদিন উত্তরে বলেছিল—"তার অবস্থা কেমন জানি নে, তবে আমার অবস্থা এই যে, সেই অজানা অনামা প্রেমিককে দেখতে পেলে একটি চড়ে তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিই। নে বাপু, তুই আর হাসিস নে, আমার গা জ্বালা করে।"

সেদিন রবিবার। লিলি আর তার মামাতো ভাই হিমাংশু এসেছে বীণাদের বাড়ী। হিমাংশু প্রায়ই আসে। লিলি ঠাট্টা করত বীণাকে, তার দাদার মন আটকেছে বলে। লিলি চা খেতে খেতে বল্‌ল—"দেখ ভাই দাদা, বীণা আজ ক'দিন হ'ল বড়ই বিপদে পড়েছে" বলে' বীণার দিকে চেয়ে একটু মুচকে হেসে আবার বল্‌ল—"ওর কে একজন প্রেম-মুগ্ধ ওকে রোজ টাইপ-রাইটারে ছেপে প্রেমপত্র পাঠাচ্ছে এই সাতদিন ধরে'" বলে' বীণার কাণে কাণে বল্‌ল—"আমরা হত-ভাগিনী, আমাদের কেউ প্রেমপত্র পাঠায় না—উঃ, ভাই বড় লেগেছে! এত জোরে চিমটি কাটিস। হাঁ, বীণা বাড়ীর কাকেও একথা শুনিয়ে ব্যস্ত করতে রাজী নয়। আর জানই ত আজকাল স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ—আমরা পুরুষের সাহায্য নেই না সহজে। দাদাকে দে না বীণা চিঠিগুলো—দাদা নিশ্চয়ই তোর একটা গতি করে দেবে।"

বীণা লিলির দিকে ভ্রূভঙ্গী করতে গিয়ে হেসে ফেল্‌ল। তারপর বাক্স থেকে চিঠিগুলো বের করে' হিমাংশুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—"এই দেখুন। আমার ত মাথা খারাপ হ'তে বসেছে।"

হিমাংশু চিঠিগুলি বেশ করে দেখ্‌ল। চিঠি বল্‌তে কিছুই নয়। প্রত্যেক কাগজের মাঝামাঝি জায়গায় টাইপ করা একটি ইংরাজী লাইন। পত্রে সম্বোধন—ডিয়ার বীণা, বেণু, বীনু বলে'। তারপর লেখা—

Your affairs are on the eve of mending.

Do not trust appearances—keep up a stout heart.

Love at last

Come back alone, I have news for you.

An unknown lover adores you—

ইত্যাদি

সব চিঠিরই শেষে লেখা—ইতি, তোমার প্রেম-মুগ্ধ, প্রেম পাগল, প্রভৃতি।

হিমাংশু কিছুই ঠিক করতে পারল না। মুখ তুলে বীণার দিকে চাইতেই লিলি প্রশ্ন করল—"কিছু বুঝলে দাদা?"

হিমাংশু বল্‌ল—"না লিলি, কিছুই বুঝলুম না।

কিন্তু মজা এই, এই লাইনগুলো যেন খুব জানা লাইন। এগুলো যেন কোন বইয়ে পড়েছি—না হয়, কোথাও লেখা দেখেছি—কিছুতেই মনে করতে পারছি না। তবে এটা ঠিক যে, লাইনগুলো খুবই পরিচিত।”

বীণা বল্‌ল—“একবার বুঝতে পারি কে ইনি ত চাবকে ঠিক করে দিই। আমাকে কি মনে করেছে বল্ দিকি নি। আমি কি সেই নোলক-পরা যুগের সুশীল সুবোধ কচিখুকী না কি যে, আমাকে যা' তা' বলবে, আর আমি তাই মুখ বুজে সহ্য করব।”

লিলি বলল—“আরে,অত চটিস্ নি। তোর জীবনে এইবার বোধ হয় রোমান্স আস্‌ছে।”

বীণা তখন খুব উত্তেজিত হয়েছে—ভুলে গেছে যে সাম্‌নে হিমাংশু বসে। বল্‌ল—“অমন রোমান্সের মুখে আগুন, তোদের রোমান্স নিয়ে তোরা থাক্। আমার অত কাব্য নেই। আমি তোদের মত নই যে, বোর্ডিংয়ের বারান্দা থেকে রাস্তায় ক্ষণিকের দেখা লোকের জন্যে কাব্যসৃষ্টি করব—মাপ করবেন হিমাংশুবাবু” বলে সে টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তার মুখ-চোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। হিমাংশু সেই সৌন্দর্য্য সেই চাঞ্চল্য দেখে কথা বল্‌ল না, মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। খানিক পরে বীণা আবার বল্‌ল—“আমি যে চাকরী করি, বিশেষতঃ, মাড়োয়ারী ফারমে, তা' অনেকের চক্ষুশূল। মেয়ে মানুষে চাকরী করবে, এ এখনও অসম্ভব বলে' মনে করে আমাদের দেশের লোকেরা। তাই হয় ত আমার কোন হিতকাঙ্ক্ষী এমন করে' আমার পেছনে লেগেছেন। একটা চিঠিতে লেখা আছে—'Beware! there are rogues about you.' ('সাবধান! শয়তানরা তোমার আশেপাশে ঘুরছে')। আর একটাতে লিখেছে—'your friend is a false one'. ('তোমার বন্ধু কপট')। এখন বন্ধু বলতে তোরা দু'জন। (এখানে লিলি বেশ জোরেই হেসে ফেলল। হাসির অর্থ বুঝে বীণার মুখ লজ্জায় লাল হ'ল) সুতরাং তোদের মধ্যে কাউকে উদ্দেশ্য করে' লেখা। পোষ্ট অফিসের ছাপ আছে জি, পি, ও। অফিস অঞ্চলে পোষ্ট করা। যে লিখেছে, তার টাইপ করার কল আছে; বা, তা' ব্যবহার করার সুবিধা আছে। ওঃ, হাঁ, হয়েছে, বুঝেছি এবার ইনি কে! দেখ্ লিলি, সেদিন দেখাই নি—সেই যে. যে ছোকরা সেদিন আমাদের বাড়ীর বারান্দার দিকে চাইতে চাইতে চলে গেল—ঐ যে ওপাশের গলিতে থাকে—রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনোর মত জুলপি, মাথায় রবীন্দ্রি চুল—আরে, আমাদের অফিসের আমারই একজন এ্যাসিষ্টান্ট টাইপিষ্ট। নাম আবার পেলব পাল। শুটকো শুটকো আঙ্গুলে ঠকাঠক্ টাইপ করে। পেলবত্ব যে কোথায়—”

লিলি বাধা দিয়ে বল্‌ল—“এ ভাই তোর বড় অন্যায়। যাকে দেখ্‌তে পারিস না, তার সবেতেই দোষ। কেন, সে ছোকরার ত বেশ চেহারা। চুলের ওপর বাতাস কেমন ঢেউ দিয়ে যায়। আবার বড়লোকও বোধ হ'ল—কাঁধের চাদর অর্দ্ধেকেরও ওপর কাদায় মাখামাখি হচ্ছিল। চশ্‌মার মধ্যে দিয়ে কেমন বঙ্কিম-নয়নে চাইছিল আমাদের দিকে।”

বীণা তাকে থামিয়ে দিল—“নাও বাপু, আর বর্ণনায় কাজ নেই। অফিসেও দেখি ছোকরা কেমন বাঁকা চোখে চায়। শিস্ দেন আবার 'কে বিদেশী মন উদাসী' সুরে। সর্ব্বদাই থিয়েটারী ঢঙ—কোন এ্যামেচার থিয়েটার পার্টির কেষ্ট-বিষ্টু হবেন বোধ হয়। দাঁড়াও না, দেখাচ্ছি ইয়ারকী।”

লিলি বল্‌ল—“আর না ভাই, এখন একটু থাম্। তোর রোমান্স বেশ জমেছে। এবার থেকে রোজ ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাস্,একদিন দেখবি তোর অজানা প্রেমিক সেখানকার গাছ

থেকে ঝুপ করে' তোর কাঁধে লাফিয়ে পড়বে" বলে' সে উঠে অর্গ্যানে গিয়ে গান ধরল—

"আমার জ্বলে নি আলো অন্ধকারে
দাও না সাড়া কি তাই বারেবারে—ইত্যাদি।"

বীণা সেদিন প্রতিজ্ঞা করল—কালই রীতিমত শিক্ষা দেবে।

দুই

পরদিন সোমবার। বীণা একটু সকাল সকাল অফিসে গেল। গিয়ে দেখল সেই ছোকরা বসে আছে। বীণার মাথায় 'দপ' করে' যেন আগুন জ্বলে উঠল। হঠাৎ মনে এল একটা চিঠিতে লেখা আছে—"come back alone, I have news for you" ("একলা এস, অনেক কথা আছে") ওঃ, তাই ত! রোজই দেখা যায় সে আগে এসে বসে' থাকে। আর পাল, ফারমের কর্ত্তার খাস কামরায় বসত। এখনও কর্ত্তা আসেন নি। বীণা হাতব্যাগে হাত পুরে সব চিঠিগুলি বের করে' হাত বাড়িয়ে পালের টেবিলের ওপর ধরে' বেশ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তুমিই এ সব চিঠি পাঠাচ্ছ আমাকে?"

ছোকরা ত অবাক! বার ছয়েক ঢোক গিলে বল্ল—"চিঠি! আপনাকে চিঠি পাঠাচ্ছি—মানে?"

—"মানে? এই দেখ, তুমিই ত?"

চিঠির তাড়ায় চোখ পড়তেই নজরে এল "An unknown lover adores you" ("এক অজানা প্রেমিক তোমার পূজা করে") ওঃ, ছোকরার ধড়ে যেন প্রাণ এল! সে বেশ করে' ঘরের চারদিক দেখে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে থিয়েটারী ধরণে ঘাড় বেঁকিয়ে বুকে হাত রেখে গদগদ-কণ্ঠে বলে' উঠল—"হাঁ, মিস্ বীণা, আমি—আমি আপনাকে—"

বীণা সরোষে চেয়ার ঠেলে 'ষ্টুপিড' বলে' হাত উঁচু করেছে বোধ হয় বেশ একটু শিক্ষা দেবার জন্যে—হঠাৎ দরজার বাইরে যেন কার পায়ের আওয়াজ পেল। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে' নিয়ে বেশ একটু চেঁচিয়ে বল্ল, "আজ এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্। চাষা, অভদ্র, জানোয়ার, রাসকেল! আজই ঝুনঝুনওয়ালাকে বলে' এর একটা বিহিত করব।"

একথাগুলি হয়ত পালকে ভয় দেখাবার জন্যে বলেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বিরাট ভুঁড়ি ঝুনঝুনওয়ালা কষ্টে দেহ টান্তে টান্তে ঘরে ঢুকলেন এবং তাদের দু'জনকে 'রাম রাম' বলে' অভিবাদন করে' 'ধপ' করে' নিজের চেয়ারে বসে' ভীষণ জোরে ফোঁস্ ফোঁস্ করে' নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলেন। ইনি সুদূর মাড়বার থেকে এসেছিলেন রুগ্নদেহ ও লোটাকম্বল সম্বল করে'। সে আজ বছর পনের হ'ল। তারপর এই সুজলা সুফলা বাঙ্গলা দেশে থেকে গোটাকতক লোহার সিন্দুক করেছেন এবং সেই শুষ্ক চেহারা আজ এই জলহস্তীর দেহতে পরিণত হয়েছে। কিছু ইংরাজী ও বাঙ্গলা বেশ ভালই শিখেছেন। মাস ছয়েক হ'ল বিপত্নীক হয়েছেন। তিন মেয়ে—নাতি-নাতনী অনেক। ছেলে নেই বলে' দুঃখ করেন। লোকে বলে বাবুর না কি আর একটা বিবাহ করার বড় ইচ্ছা। লাখপতি; আর তাঁর বয়স এমন কি, মোটে পঞ্চান্ন।

মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম করার পর তিনি বললেন—"হুঁ। মিস বীণা দেবী, আমাকে কি বলবেন বলছিলেন—মিঃ পালের সম্বন্ধে বুঝি। মিঃ পাল, আপনি এখন আসতে পারেন।" পাল যাবার সময় বেশ একটু তীব্র কটাক্ষপাত করে' গেল বীণার ওপর।

বীণা বলল—"না মিষ্টার, এমন কিছুই হয় নি; আপনাকে বলবার মত কিছুই নয়। শুধু ওকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।"

মাড়োয়ারীর কৌতূহল বেড়ে গেল—"না তা' হবে না। ব্যাপারটা বলতেই হবে। আমি

discipline চাই অফিসে। আর আমি ত দেখ্‌ছি আপনি খুব রেগেছেন।"

তিনি ব্যাপারটা জান্‌বার জন্যে খুব ব্যগ্র হয়েছেন। আর তা' ছাড়াও বীণা লক্ষ্য করেছে, আজকাল যেন তিনি তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্টভাবে আলাপ জমাতে চেষ্টা করছেন। এ সব বীণার ভাল বোধ হ'ল না। সে বল্‌ল—"না এমন কিছুই হয় নি। মিঃ পাল আমার সঙ্গে—আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়, আর তাই আমাকে যা'তা' লিখে চিঠি পাঠিয়েছে। অবশ্য সে নাও হ'তে পারে—তবে আমার মনে হয় সেই। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি ওকে কিছু বল্‌বেন না। এই জন্যে যদি তার শাস্তি হয় ত আমি বড় দুঃখিত হব।"

মাড়োয়ারী চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন—"মিঃ পাল চিঠি লিখেছে আপনাকে—চিঠি!"

—"হাঁ, এই দেখুন" বলে' বীণা তাঁকে চিঠিগুলি দেখাল।

মাড়োয়ারী সব দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"পাল কি বলেছে চিঠিগুলো সেই পাঠিয়েছে?"

"না, তা' বলে নি। তবে ভাবে বোধ হ'ল সেই।"

"ও" বলে' মাড়োয়ারী খুব জোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাক্‌বার পর একটা চোখ অর্দ্ধেক খুলে বেশ ভাব নিয়ে তিনি বল্‌লেন—"আচ্ছা বীণা দেবী, আপনাকে ভালবাসা কি অপরাধ! কেউ ত তা' বল্‌বে না। বরং আপনাকে ভালবাসা কত সোজা। আপনাকে দেখে কেউ যে না ভালবেসে থাক্‌তে পারে, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। পাল কেন, এই ধরুন না আমারই মনে কি আপনার ছবি আঁকা নেই" বলে' তিনি তাঁর বিশাল বক্ষের ওপর তাঁর চওড়া ডান হাতখানা রেখে বোধ হয় ভাবের আতিশয্যে চেয়ারে দুলতে লাগলেন।

বীণা ত অবাক। হঠাৎ মনে হ'ল সেই না একটা চিঠিতে লেখা Do not trust appearances এই না কি সেই appearance! সে বিস্ময়ে, ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল; তারপর জিজ্ঞাসা করল—"তা' হ'লে, তা' হ'লে—আপনিই কি—"

—"হাঁ—না, I might well have done so. আহা! An unknown lover adoers you এক অজানা প্রেমিক, মিস্ বীণা, মনে করুন আমিই সেই। আপনি, তুমি কি আমাকে সুখী করতে পার না বীণা?"

—"কি বল্‌ছেন আপনি! আপনার মেয়েরা আমার চেয়ে অনেক বড়—আপনার নাতি-নাতনী—?"

ভীষণ জোরে টেবিলে ঘুঁসি মেরে মাড়োয়ারী বল্লেন—"জাহান্নমে যাক্ তারা। তাদের সব ত্যাগ করব। আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার নামে লেখাপড়া করে' দেব। তা' হ'লে—"

—"তা' হ'লে এসব আপনারই লেখা—কেমন?"

—"বলেছি ত I might have done so."

—"আপনি পাগল!"

—"হাঁ বীণা, love murders reason—প্রেমে লোক কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়।"

—"তাই দেখছি—নইলে তোমার মত বুড়ো মেড়ো আমাকে এমনভাবে অপমান করে। তোমাকে—তোমাদের আমি ঘৃণা করি—আর তোমার চেহারা কী কুৎসিৎ! আজই আমি তোমার চাকরী ছেড়ে দিলাম—বাড়ী গিয়ে নোটিশ দেব। এতবড় স্পর্দ্ধা—জানোয়ার কোথাকার" বলে' সে অফিস ছেড়ে চলে' গেল।

তিন

বাড়ী যেতে ভাল লাগ্‌ল না। সটান্ জু গার্ডেনে গিয়ে ঘোরাফেরা করে' বেলা চারটার সময় বাড়ীতে ফিরে লিলির কাছে ফোন্ করল।

হিমাংশু উত্তর দিল—"লিলি এখনও কলেজ থেকে ফেরে নি।" বীণা বল্লে—"আপনি আসুন। বড় একলা, ভাল লাগ্‌ছে না। লিলিকে আসবার জন্যে চিঠি লিখে আস্‌বেন। এখানে চা খাবেন —কেমন ?"

হিমাংশুকে চা দিয়ে বীণা তাকে আদ্যোপান্ত সব ব্যাপার বল্‌ল। হিমাংশু চা খেতে খেতে মন দিয়ে সব শুনল। তারপর মিনিটখানেক চুপ করে' কি ভেবে চায়ের বাটি নামিয়ে রেখে বীণার একটি হাত ধরে' বল্‌ল—"তা' হ'লে বীণা, দেখা যাচ্ছে দু'জনই স্বীকার করেছে—অন্ততঃ দু'জনের কেউ ই স্পষ্টতঃ অস্বীকার করে নি! আচ্ছা, ধর—আর একজন—তৃতীয় ব্যক্তি যদি বলে, সে লিখেছে—"

বীণার কথা বেরোল না—"তৃতীয় ব্যক্তি—মানে—আপনি না কি ?"

—"ধর যদি তাই হয়—তা'হ'লে কি তুমি—"

—"তা' হ'লে, আপনিই শেষে—"বীণার মাথা তখন ঘুরছে। আজ সকাল থেকে সে আঘাতের পর আঘাত পাচ্ছে। "শেষে—"

হিমাংশু বল্‌ল—"না, না—সত্যিই কি আমি পাঠিয়েছি—I might well have done so যদি পাঠাতুম। আমিও ঐ মাড়োয়ারীর মত—একই নৌকায় ভাস্‌ছি। বীণা—"

বীণা তড়িৎগতিতে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌ল—"চুপ্‌ চুপ—পাশের ঘরে মা আর বাবা বসে'—কি যে কর—"

সে আরও হয় ত কিছু বলত কিন্তু হঠাৎ লিলির হাসি শোনা গেল। বীণা অপ্রস্তুত হয়ে সরে' গেল। লিলি বল্‌ল—"এই যে বীণা, তোর জীবনেও তা' হ'লে রোমান্স আছে। আহা—এই সময়ে যদি হাতের কাছে একটা শাঁখ থাকত গা!"

বীণা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। "যা" কি যে করিস—সব সময়ে ইয়ে—আজ আমার মন ভাল নয়। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছি।"

লিলি এগিয়ে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে' কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—"ও তাইতে বুঝি আবার নতুন চাকরীর জন্যে দাদার কাছে অমন করে দরখাস্ত পেশ করছিলি! কিন্তু চাকরী গেল কেন ?"

বীণা তাকে সব বলল।

শুনে লিলি বলল—"বুঝলি ত এবার, শাস্ত্রে কেন বলেছে—'স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি।'যাক্‌,ভালই হ'ল—এবার এম-এতে ভর্ত্তি হ'। দু'জনে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে—অবশ্য দাদার যদি কোন আপত্তি না থাকে। আর ঐ পালের বা মাড়োয়ারীর দোষ দিস নে। তাঁদের লেখা নয় চিঠিগুলো—মাড়োয়ারী ত বলেছে 'I might Woll have done so'—তাদের লেখা নয়—আমি জানি।"

—"তুমি জান ?"

—"হাঁ—কেন না ওগুলো আমারই লেখা যে। আমরা ভাবতুম তোর জীবনে রোমান্স নেই। তাই মনে হ'ল ঐ চিঠিগুলি পাঠিয়ে একটু মজা করা যাক্‌। লাইনগুলি পেলুম কোথা থেকে জানিস? ঐ যে রে, হগসাহেবের বাজারে যে ও ন হবার কল নেই,—তার টিকিটে লেখা থাকে ওগুলো। আমি ওগুলো ডায়েরীতে লিখে রাখতুম। মনে পড়ছেনা? আশ্চর্য্য! একথা তোর মনেই আসে নি—আর তা' আসবেই বা কোত্থেকে; তখন প্রেমপত্র পাচ্ছ, ভাবে বিভোর। হিমাংশু দা তবু কতকটা আঁচ ক'রেছিলেন কোথায় যেন দেখেছি না কি। যা হোক ভাই তোর রোমান্স ভাল করেই হ'ল। কিন্তু আর একটু হলেই—"

এই সময়ে পাশের ঘর থেকে বীণার বাবা হিমাংশুকে ডাকাতে সে উঠে গেল।

বীণা লিলিকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—"দাঁড়াও না মুখপুড়ি, তোমার সঙ্গে ঐ মাড়োয়ারীর বিয়ের বন্দোবস্ত করছি" বলে' তার গাল টিপে দিল।

হাস্‌তে হাস্‌তে লিলি বল্‌ল—"তাই দে ভাই, তবু একটা হিল্লে হয়" বলে' উঠে গিয়ে অর্গ্যান বাজিয়ে একটু চাপাগলায় গান ধরল—

"সই, কি আর বলিব আমি,
নাথের লাগিয়া ঘুরি একাকিনী
আকুলা দিবস যামি!
এ ঘরে ও ঘরে যে ঘরে তাকাই, নাথ সে
সবার আছে;
আমার কপালে বজর পড়িল না—"

বীণা তার মুখ চাপা দিয়ে বল্‌ল—"আঃ, মুখপুড়ি থাম—ওঘরে যে ওঁরা রয়েছেন!"

—চাঁদের রাতে চড়ুই ভাতি—

শ্রীরাজেন মিত্র

চাঁদের রাতে চড়ুই ভাতি···

শুনলেই লোভ হয়। অন্ততঃ, আমার সম্বন্ধে বলতে পারি, আমি যদি চাঁদের রাতে চড়ুই ভাতির নিমন্ত্রণ পাই, সব কাজকর্ম্ম ফেলেও যেতে রাজি—এমন কি পরীক্ষার পড়া ফেলেও। কলেজের পড়ুয়া, তাই কাজকর্ম্মের কথা উঠলেই পরীক্ষার কথাই আগে মনে হয়। ছাত্র-জীবনে পড়া আর স্ফূর্ত্তি ছাড়া আর কি কাজই বা থাকতে পারে?

অলক গিরিডিতে বেড়াতে এসেচে। একাই। তবে এখানে সঙ্গীর অভাব বিশেষ নেই। সেই জন্যেই ত দোলের ছুটীটা এখানেই কাটাতে চায়। সকালে অসীম দা' আর বৌদি'র মধ্যে কথা হ'ল আজকের দোল পূর্ণিমার রাত ঘরে বসে' না থেকে কোথাও বেরিয়ে পড়তে হবে। তার পরই বৌদি' প্রস্তাব করলো—"একটা Picnic Partyর (চড়ুই ভাতির) ব্যবস্থা করলে মন্দ না?" কথাও যা', কাজও তাই; অলক ত লাফিয়ে উঠলো, ও ত ঐ রকমই একটা কিছু চায়।

কিন্তু বীথিকাই সব মাটি করলো; সে জানিয়ে দিলে—সে যাবে না। বৌদি' একটু মুচকে হেসে অলককে বলে—"যাও ভাই, তুমি বলো, তা' হলেই ও রাজি হবে।"

অলক নিরুৎসাহ হ'য়ে ভাবে—দূর ছাই, বীথিকা যদি না যায়, তবে আবার পিক্‌নিক্‌ কিসের!···অলক বোঝে যে, এটা বীথিকার দুষ্টুমি ছাড়া কিছুই না। সে চায় যে, অলক তাকে একটু খোসামোদ একটু সাধাসাধি করুক। তা' হোক্‌, ওটা সব মেয়েই মনে মনে আশা করে। খোসামোদ, উপাচার মেয়েদের একচেটে বল্লেও চলে। পুরুষকে বাজিয়ে দেখবার ওটা ওদের একটা প্রিন্সিপ্যাল—কাজেই দোষের নয়। তার ওপর বীথিকা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে মেয়ে···বেশ পরিপাটী গড়ন, শান্ত সুন্দর চেহারা। টানা চোখ দু'টা তাকে আরও সুন্দর করে তুলেচে; মুখের ভাষার চেয়ে তার চোখের ভাষাই যেন স্পষ্ট বোঝা যায়। বীথিকার একঝলক বিহ্বল চাউনিই যেন তার একটা চুম্বন।

বীথিকা অলকের ঠিক friend (বন্ধু) নয়—'fiancee' অর্থাৎ ভাবী বধূ বল্লেই ঠিক বলা হয়। কাজেই ও দু'জনের সম্পর্কটা একটু অন্য রকমের; অন্ততঃ, আমাদের ত তাই ধারণা।

দুপুর। বারাণ্ডায় একটা ডেকচেয়ারে শুয়েছিল বীথিকা। সামনের দাঁড়ে একটা চন্দনা। অলক পাশে একটা চেয়ারে ব'সে পড়ে বলে—"আচ্ছা, বেশ!"

—"কেন বলে' বীথিকা খিল্‌খিল্‌ করে' হেসে ওঠে; ওর ঐ হাসিটুকু অলকের ভারী মিষ্টি লাগে।

অলক আর একটু গম্ভীর হ'য়ে বলে—"আজ রাতেই যাবো।"

—"হঠাৎ এ খেয়াল কেন?" (মুচকে হেসে)

—"মিছিমিছি দোল-পূর্ণিমাটা এইখানে এসে নষ্ট হ'ল।"

—"রাত্রে দিদি ত পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করচে।"

—(অভিমান স্বরে) "করলেই বা—আমি যাবো না।"

—"আর যদি আমি যাই" বলেই বীথিকা হেসে ওঠে; অলকের দিকে তাকিয়ে বলে—"কি, এবার উত্তর দাও।"

অলক আর থাকতে না পেরে হেসে ফেলে।

—"কি দুষ্ট মেয়ে!···আর কোথাও যদি এমন দেখে থাকি।"

বীথিকা বলে—"দেখো, পাখাটার গায়ে যত হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, ততই তেড়ে আসছে।"

—(হেসে) "যেমন তোমরা···"

—(অভিমান স্বরে) "হুঁ, তা' ত বলবেই!"

—"না, না, উপমাটা বড্ড বেশী হ'য়ে গেচে—অতটা নিষ্ঠুর আদপেই...অন্ততঃ তুমি নও।"

—"এই ত বল্লে?"

—"এমনি বল্লুম—দুষ্টুমির একটা শাস্তি দেওয়া চাই ত।"

* * *

সন্ধ্যার কিছু আগে একটা 'টুরিং কার' নিয়ে সকলে বে'রয়ে পড়লো। দলে ছিল পাঁচজন আর একটা চাকর। অসীম দা', অলক, বৌদি', বীথিকা আর তার ছোট বোন চিত্রা। খাবার সরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল।

অসিত দা' গাড়ী Drive করছিলো; গাড়ী ছুটে চলে। সকলে গান ধরে—"আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু, ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার!"

গাড়ী কিছুক্ষণের মধ্যেই সহর ছেড়ে মেঠো রাস্তায় এসে পড়লো; ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গাড়ীর বেগ গেল আরো বেড়ে।

তখন গান থেমে গেচে। এবার আরম্ভ হ'ল তর্ক। সেটা ছিল নারীধর্ষণ ও নারী নির্য্যাতনের যুগ। অসিত দা' বৌদি'কে বলে—"আচ্ছা···এখন যদি একদল গুণ্ডা এসে তোমাদের আক্রমণ করে, কি করবে বল ত?"

—"কেন তোমরা কি করতে আছো?"

—"মনে করো, আমরা সঙ্গে নেই।"

বীথিকা হেসে বলে—"আপনারা থাকলেও যা' করবেন তা' জানাই আছে—'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই ত! ভয় নেই, আমরা নিজেদের রক্ষা করতে জানি।"

এইখানে বলে রাখা ভাল, বৌদি', বীথিকা, চিত্রা সকলেই লাঠি ও যুযুৎসু শেখা মেয়ে। নারীধর্ষণের ফলে সমস্ত বাংলা দেশে তখন নানা বালিকা বিদ্যালয়ে, মহিলা সমিতিতে মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চ্চার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। সেই যুগেই তারা সেই সব কিছু শেখে। তবে বৌদি'র ভাল করে' শেখা হয় নি। বিয়ের পর আর ত শেখা চলে না।···তা' ছাড়া অসীম দা' মেয়েদের এই মেয়ে-মদ্দানি পচ্ছন্দ করে না এবং এই নিয়ে অযথা অসীম দা' আর বৌদি'র মধ্যে প্রায় তর্ক বেধে যায়।

তবে বীথিকা, চিত্রা এরা সব এখনো শেখে। বিশেষ করে বীথিকার এজন্য বেশ একটু গর্ব্বও ছিল। কারণ তার ধারণা, সে যা' যুযুৎসু ও ছুরি খেলা জানে, তার দ্বারা সে ইচ্ছে করলেই অনেক ছেলেকে কাবু করে' ফেলতে পারে। তার শক্তি পরীক্ষা করবার সুযোগ আমাদের ঘটে নি। তবে শুনেচি, প্রতি সন্ধ্যায় ব্যায়াম সমিতি থেকে এসেই তার প্রধান কাজ ছিল ছোট ভাই অজয়কে দু'-চারটে যুযুৎসুর কসরৎ দেখানো। অজয়ের কিন্তু আদপেই সেসব ভাল লাগে না। কতদিন যে সে চোখের জলে, নাকের জলে হ'য়ে মার কাছে নালিস করেচে তার ঠিক নেই। আমরা তাই নিয়ে বীথিকাকে দু'-একদিন ঠাট্টাও করেছিলুম। সে বলে—"সে সব রীতিমত Practice (অভ্যাস) করা দরকার···গুণ্ডারা যখন attack (আক্রমণ) করবে, তখন নিজেকে বাঁচাতে হবে ত।"

তর্ক করবার ইচ্ছে দমন করে' চুপ করে' যেতুম। আমাদের জানা ছিল মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করলে

তার সমাপ্তি হয় চোখের জলে। যাক যা' বলছিলুম, তাই বলি।

অনেক এবার বলে' ওঠে—"মেয়েদের সে সাহস থাকলে ভাবনা ছিল কি!...তা' হ'লে আর প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতাগুলো 'নারীহরণ, নারীধর্ষণ' সংবাদে ভর্ত্তি থাকত না। অথচ, এ সব পূর্ব্ববঙ্গেই বেশী হয়। কিন্তু শুনেছি কলকাতার মেয়েদের চেয়ে ওদিককার মেয়েরা সাহসী, শক্তিমতী।"

অসীম দা' কথার মাঝখানে বলে—"ওসব কথা ছেড়ে দাও; এ রকম 'নারীহরণ', নারীধর্ষণ' স্রেফ সাজানো ব্যাপার...মেয়েগুলো স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যাবে; আর পরে ধরা পড়লে বলবে—তাদের জোর করে' ধরে' নিয়ে গিয়েছিল। আর একটা মজা, নারীধর্ষণের সব মামলাই প্রায় বিধবাদের নামে। সেদিন Advance এ পড়ছিলুম—একজন হিন্দু বিধবা আদালতে স্পষ্টই বলেছে যে, সে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে...।"

বৌদি' অসহ্য হয়ে বলে ওঠে—"তোমরা সব তলিয়ে ভাবো না, দু'-চারটে খবর পড়েই মেয়েদের উপর একটা দুর্নাম দিতে পারলেই বাঁচ। আদালতে স্বীকার করলে সেইটেই তার অন্তরের কথা ধরে' নিতে হবে তার কোন কারণ নেই; স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের ওপর তার কত দুঃখের ইতিহাস লুকিয়ে থাকতে পারে তা' তোমরা না বুঝলেও আমরা বুঝি। আমাদের সমাজে একজন নারী বলপূর্ব্বক হরণ হবার পর নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে এলেও তার স্বামী, শ্বশুর, মুসলমান স্পর্শ করেচে বলে' তাকে ঘৃণা করবে; সে ধর্ষিতা না হ'লেও অনুমান করে' নেওয়া হয় সে ধর্ষিতা, তার ফলে কত নারী যে কুপথে যেতে বাধ্য হ'য়েচে তার ঠিক নেই। সে হয় ত ঠিক এই কারণেই নিরুপায় হ'য়ে অন্য কোন পথ না থাকায় 'স্বেচ্ছায় এসেছি' বাধ্য হয়েই স্বীকার করেচে। এই না বলা ছাড়া তার ত আর কোন পথই নেই। ...তা'বলে' দু'-একজন যে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যায় না, এমন কথাও জোর দিয়ে বলি না। ভাল খারাপ দুই-ই আছে।"

অলক বোঝে যে, বৌদি' একটু চটে গেচে, তাই কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বীথিকাকে বলে—"যতটা ভাবচো ততটা সোজা নয় গুণ্ডাদের কবল থেকে নিজেদের উদ্ধার করা। যে ধুমসো চেহারা, চোখের সামনে দেখলেই ভয় হয়।...হুঁ হুঁ বাপু, এ হেলে গিরগিটি নয়, মা মনসা...হাতে পড়লে মজা বুঝবে।"

বীথিকা গম্ভীর হয়ে গিন্নী টাইপে উত্তর দেয়—"দেখাই যাবে।" গাড়ী তখন একটা গ্রামের পাশ দিয়ে চলছে। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ খেলা করচে। দূর বনানী হ'তে ঝিল্লীর সুর ভেসে আসে সন্ধ্যা সঙ্গীতের মত। বসন্তের ঝরা পাতার ওপর দিয়ে কোন এক পথিক বাঁশী বাজিয়ে চলচে। বাঁশী গাইচে—

"আলোকে মোর চক্ষু দু'টি
মুগ্ধ হয়ে উঠল লুটি,
হৃদয় গগনে পবন হ'ল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে সুন্দর!"

অসীম দা' বলে—"বাঃ, চমৎকার বাজায় ত!"

আর একটা মোড় ঘুরেই গাড়ী একটা বুড়ো বটগাছের তলায় এসে দাঁড়ালো। সুন্দর জায়গাটি, চারিদিকে ধূ ধূ করচে মাঠ...তারি মাঝে ভারি মস্ত একটা অনেক দিনের পুরণো বটগাছ; আর তার কোলেই ছোট্ট একটা পুকুর। চার দিকে চাঁদের আলো—আকাশে তারার মালা দুলচে। সারা পৃথিবীর রং বদলে গেচে। দূরে গ্রামে গ্রামে হোলী খেলা চলেছে। আজ রং মাখাবারই রাত। আকাশ রাঙা...গ্রামের পথ, নদীর জল ফাগে কুমকুমে লাল হ'য়ে গেচে। মাঠের সুপ্ততাকে কম্পিত করে' সুদূর গ্রাম হ'তে মাদলের ধ্বনি, হোলীর গান ভেসে আসে।

সমস্বরে গেয়ে চলেচে—

"আয় বসন্ত, খেলবো হোলী
ফুলের মালা দুলিয়ে আয়!
আয় বাসন্তী লো সুন্দরী,
আয় স্বপন রাগের মুঞ্জরী,
হোলী খেলবি যদি, রূপস্বরগের
বন্ধ দুয়ার খুলিয়ে আয়!"

সহর হ'তে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরবর্তী সেই জায়গাটি। সেই বটগাছের তলেই আস্তানা পাড়বার ব্যবস্থা হ'ল।

অসীম দা' ঘাসের ওপর বসে' পড়ে বলে—"আর এমন সুন্দর রাত ঘরে বসে' কাটান যায়!"…

অসীম দা' কবি প্রকৃতির লোক। যদিও তার কবিতা লেখবার রোগ নেই, তবুও কবিত্ব করা তার অভ্যাস। হঠাৎ সে বিকট সুরে আরম্ভ করে—

"আকাশ আমার ভরলো আলোয়
আকাশ আমি ভরবো গানে!"

অসীম দা'র হঠাৎ এমন ভাব উথলে ওঠায় সকলেই হেসে ওঠে—এমন কি বৌদি'ও।

বৌদি' বলে—"গাইতে যখন পার না, তখন চীৎকার করে গানটা নষ্ট করে দিও না।"

(হেসে)—"মনে যখন ভাব আসে, তখন কি গলার স্বরে কিছু এসে যায়? শিখে রিহারস্যাল দিয়ে কি গান হয়?…তাতে প্রাণের স্পর্শ থাকে না। গান থাকে গাছের পাতায় পাতায়…চাঁদের আলোয়…নদীর জলে… আকাশের অসীমতায়। এই সুরকে ফোটাতে হ'লে চাই প্রাণের সুর; তাতে গলার স্বরের জন্য কিছু এসে যায় না।"

সকলেই হাসে।

রাত তখন এগারটা, চারিদিক নিঝুম হ'য়ে এসেছে। পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ তখন মাথার উপর। ঝিরঝিরে আতর-মাখান দক্ষিণ হাওয়া ব'য়ে যায়।

খাওয়া-দাওয়ার পর সতরঞ্চি পেতে বসে' গল্প হচ্ছিল। পূর্ব্বেই ত বলেচি, অসীম দা' কবি না হলেও কবি প্রকৃতির, তার ওপর প্রোফেসার। কাজেই তার মত লোকের অনবরত বকে' যাওয়া আদপেই অশোভন নয়। তারপর গল্পের আলোচ্য বিষয়ও সহজে অনুমান করে' নেওয়া যায়; বায়রণ, শেলী, কালিদাস রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চাঁদের রাতের কি রকম বর্ণনা করেচেন এই সব। আবার অসীম দা' মাঝে মাঝে চাঁদের দিকে তাকিয়ে দু'-চারটে কবিতাও আউড়ে যায়।

বীথিকা চিত্রা দু'জনেই উসখুস করে—তারা একটু বেড়াতে গেলেই যেন বাঁচে। চিত্রা একটা হাই তুলে বলে—"চল অলক দা', খানিকটা বেড়িয়ে আসি।"

অলক লুকিয়ে একবার বীথিকার দিকে চায় …অর্থটা সেও যাবে কি না।

বীথিকা বলে—"তাই চলো। দিদি, তোমরা বসো; আমরা ততক্ষণ বেড়িয়ে চারিদিকটা দেখি।"

অলককে এবার পায় কে! এবার বেড়ান আর গল্পের পালা। সে বোঝে চাঁদনি রাতে যদি বেড়াবার সময় মেয়েই না থাকে, তা' হ'লে চাঁদনি রাতও ব্যর্থ…বেড়ানোও অর্থহীন

অলক বলে—"আজ যদি কোলকাতায় থাকতুম, তা'হ'লে এমন রাতটাই ঘুমের তলায় চাপা পড়ে' যেতো। কিম্বা বড় জোর ঘরের দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিতুম; তার মধ্যে একটু ম্লান জ্যোৎস্না আমার নেটের মশারি ভেদ করে' আমার মুখে-চোখে ছড়িয়ে পড়তো।"

—"এই জন্যই ত এখানে চিঠি লিখেছিলুম; এমন রাতটা সার্থক হ'ল কেবল আমার জন্যে; এজন্য আমার কাছে Grateful (কৃতজ্ঞ) থাকা উচিত।"

—"শুধু Grateful নয়, আরও বেশী হ'তেও রাজি, যা' বলবে তখনি তাই করতে প্রস্তুত।"

(হেসে)—যদি বলি মরতে।"

—"তাতেও রাজি।"

—"আবার সেই নাটুকে মিথ্যে?···ওসব আমি দু'চোখে দেখতে পারি নে। বেশী ভণ্ডামি করতে হবে না।"

—"বিশ্বাস হয় না? (একটু থেমে) তোমার জন্য সবই পারি।"

—"সব হয় ত পারো...মরাটা বাদ দিয়ে। ভরা যৌবনে, কেউ মরতে চাইলেও তার প্রকৃতি তাকে মরতে দিতে চায় না।"

—"বিশ্ব-সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রে এমন ঘটনা বিরল নয়—যেখানে নারীর জন্য পুরুষ প্রাণ দিয়েচে।"

—"তোমার সঙ্গে তর্কে আমি পারবো না; তবে নিশ্চিন্ত হ'তে পার, তোমায় মরতে আমি কখনোই বলব না। আহা, বাপের একটি মাত্র ছেলে, দুধটুকু মরে ক্ষীরটুকু পুঁজি! বালাই, ষাট্! মরতে বলার ক্ষমতা আমার আছে কি না!···"

—"যদি কারো থাকে, সে তোমার।"

—"ইস···কত রঙ্গই জানো!"

এমন সময় চিত্রা বলে ওঠে—"কি চমৎকার বাগান!"

ওরা তখন একটা ছোট আমবাগানের মধ্যে এসে ঢুকেচে। চারিদিকে নানা গাছপালা, আর মাঝে একটা বাঁধ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সমস্ত বাগান আলোয় আলোকিত।

বাঁধের জলে জ্যোৎস্না তার শুভ্রতা ছড়িয়ে দেয়।

বীথিকা বলে—"বাঃ, কেমন একটা নৌকো বাঁধা!"

—"চড়বে?"

বীথিকা নৌকায় উঠে বলে—"আয় চিত্রা।"

—"বেশ মেয়ে যা' হোক! নিজের বোনটিকে ত ডেকে নিলে? আর আমি পথের ছেলের মত এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। কি স্বার্থপর!"

—"অমনি রাগ হ'ল বুঝি ...আমি দাঁড়িয়ে থাকতে বলেচি কি না! এসো, এসো, এসো, হয়েচে ত? না আবার 'Nunky dear' বলে' দু'হাতে তুলে ডাকতে হবে?"

—"যাও, বেশী আর রসিকতা করতে হবে না।"

তিনজনেই নীরব।

—"চুপচাপ যে?···বোকা হলে না কি?—কি ভাবচো?"

—"ভাবচি, জীবনের সব রাতই যদি এই রকম হ'ত!"

—"অর্থাৎ?"

—"মাথার ওপর অসীম আকাশ · নীচে জল বাতাসে থৈথৈ নেচে চলবে··আশেপাশে নীলপদ্ম ফুটে থাকবে··চারিদিকে কুঞ্জবন···আর দীঘিতে একটা নৌকা ভাসবে, তার মধ্যে আমরা বসে' গল্প করবো!"

—"আমরা মানে?"

—"এই আজ যেমন তুমি, আমি, চিত্রা গল্প করচি।"

চিত্রা তাড়াতাড়ি বলে—"আদপেই আমি গল্প করচি না।"

অলক চিত্রার চুলগুলো মুঠো করে' ধরে' বলে—"দুষ্ট।"

বীথিকে উত্তর দেয়—"ধ্যেৎ, আমরা আপদ, না থাকলেই বরং আরো ভাল।"

—"Silly! যতই চাঁদের আলো···নদীর জল...কোকিল, পাপিয়া ডাকুক, কিন্তু এ সবেরই Back ground-এ মেয়ে থাকা চাই; 'Panthom of delight' যদি না থাকে, তবে 'In such a night as this' কখনোই কবির কলমে ভাষা

বেরোবে না ; বসন্তে চারিদিকে শালফুল ছড়িয়ে থাকবে···আমের মুকুলের গন্ধ দক্ষিণ হাওয়াকে সুবাসিত করে তুলবে ··নব প্রস্ফুটিত অজস্র লাল কৃষ্ণচূড়া দীঘির ধারে সাদা জ্যোছনায় ছড়িয়ে পড়ে' একটা লাল রেখা টেনে দেবে...আর তারি Back groundএ থাকবে নর ও নারী উভয়ে ···তবেই তার সৌন্দর্য্য সার্থক !"

—"তুমি শুধু কবি নও···Lover'ও বটে ; ···অনন্ত আকাশ, চাঁদের আলো এবং নারী দুই চাও।"

—"ধ্যেৎ, আমি বুঝি তাই বলেচি।"

অলক দাঁড় টানতে টানতে বলে—বীথিকা, একটা গান করো।"

—"গান আর ভাল লাগে না।"

—"ওটা বাদ দিলে আজকে রাতটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ; ভবিষ্যতে যখন আজকের রাতটির কথা মনে হবে, তখনই এজন্য হয় ত মনটা খুঁৎখুঁৎ করবে। আজকের রাতের গল্প যখন আমার বন্ধুরা আমার কাছ হ'তে শুনবে, তখন তারা একটা দীর্ঘশ্বাস ত ফেলবেই···তবে গান শোনাবে না ?"

(হেসে)—"মা গো ! আজকের গল্প বুঝি সকলের কাছে করে বেড়াবে ?"

—"করবো না ? এই নিয়ে হয় ত একটা গল্পও লিখতে পারি ; কে জানে যে, আজ রাতেই একটা কবিতা লিখে ফেলবো না !"

বীথিকা গান গায়—

"আজি দখিন দুয়ার খোলা,
এস হে, এস হে, এস হে আমার
বসন্ত এস,
দিব হৃদয় দোলায় দোলা !"

হাওয়ায় বীথিকার চুল তার মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়ে—তাকে আরো চমৎকার দেখায়।

অলক বলে—"ভারী সুন্দর তুমি গাও !"

—"সত্যি ?"

—"সত্যি।"

—"ক'বার একথা বলবে ?"

—"যতবার শুনি ততবার বলতে ইচ্ছে করে, আর বাঁশীটা যদি থাকত এখন ··মোটরে পড়ে রয়েছে।"

চিত্রা দিদির কোলেই মাথা রেখে গান শুনছিল, হঠাৎ মাথা তুলে বলে' ওঠে—"অলক দা' চলো এবার...রাত হ'ল।"

—"দূর এর মধ্যে কি ; ভাল লাগচে না বুঝি ?"

চিত্রা চুপ করে' আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

—সত্যই আজ বাড়ী ফিরবে না, চোখে ঘুম নেই না কি ?"

—"না। ক্ষতি কি যদি এমনি ভাবেই রাতটা কেটে যায় ! এত জেগে থাকবারই রাত ! অতীতে হারিয়ে-যাওয়া দিনরাত্রিগুলোর দিকে ফিরে দেখলে এমন রাত জীবনে ক'টাই বা এসেচে ! বাঙালীর ছেলে, পড়া মুখস্ত করেই জীবনের আধাআধি কাটতে চল্লো... কুড়ি বছর বয়স, কুড়ি বার বসন্ত এসেচে, আবার ফিরে গেচে...কিন্তু আমি ত তার কোন সন্ধানই রাখি নে ! যৌবনের মিতালি যখন সারা অঙ্গে— বসন্ত এসে দ্বারে আঘাত করেচে···'ওগো দ্বার খোলো' তখন আমি খিল এঁটে পড়ায় মগ্ন।"

—"আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে।"

—"বেশ ত, তুমি ঐ কাঠের ওপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে নাও···আমি রোয়িং করি।"

—"চিত্রা ত ঘুমিয়ে পড়লো। আমার ও রকম ভাবে ঘুম আসে না।"

—"কেন ?"

—"তুমি সামনে থাকলে আমার ঘুম হবে না।

—"অবিশ্বাস হয় বুঝি ?"

—"আমি তাই বলেচি ?"

—"প্রকারান্তরে তাই বোঝায়।"

অলকের অভিমান হয়, চুপ করে' থাকে। বীথিকার দিক হ'তেও কোন কথা ওঠে না। নীরব।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। মাঝে মাঝে দূর হ'তে গ্রাম্য কুকুরের বিশ্রী ডাক কাণে ভেসে আসে। দু'জনেই অস্বস্তি বোধ করে। অলক ভাবে, আমি চলে যাই অসীম দা'র কাছে, ওরা থাকুক।

নীরবতা ভেঙে বীথিকা প্রথমে বলে—"কথা বলবে ত বলো—না হ'লে চলো।"

—"কথা বলে' আর অপমানিত হবার ইচ্ছে নেই।"

—"অপমান! কে অপমান করেছে?"

—"আর দরদ দেখাতে হবে না—খুব হয়েছে।"

—"বেশ, কি বলেচি?"

—"আমাকে বিশ্বাস হয় না।

—"ঠিক কথাই ত! তবে অপমান আমি করি নি।"

দু'জনেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে বীথিকা আপন-মনে অলকের একটা হাত ধরে' খেলা করে।

অলকও জলের দিকে চেয়ে পা নেড়ে যায়; মাঝে মাঝে অনিচ্ছা সত্ত্বেই বোধ হয় বীথিকার সাড়ীতে লেগে খস্‌খস্ শব্দ হয়। কিন্তু দু'জনেই চুপচাপ্।

চারদিকে আলোর ঝরণা। আকাশ হাসচে, বাতাস বইছে। বাঁধের ওপর নৌকাটা টাল খেয়ে নড়ে ওঠে।

অলক আর বীথিকা সামনা-সামনি বসে' আছে; কারো মুখেই কথা নেই। বীথিকা মাঝে মাঝে আড়চোখে চেয়ে দেখে অলক কোন্ দিকে চেয়ে আছে। অলকের সাথে চোখাচোখি হ'তেই সে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। বীথিকার চাউনিতে দুষ্ট মি-ভরা। অলকের বুকটা কি জানি কেন ঢিপ-ঢিপ করে। চিত্রা বীথিকার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমুচ্চে। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ে ওঠে। তার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দূরে একটা পাপিয়া থেকে থেকে ডেকে ওঠে।

অলক উঠে দাঁড়িয়ে বলে যায়—"যাই, অসীম দা' আর বৌদি'দের ডেকে আনি, বাঁশীটাও নিয়ে আসি।"

কিছুক্ষণ পরে।

—"কি, আমি যাই তা' হ'লে?"

—"কে মানা করেচে...বেঁধে রেখেছি আমি?"

—"একলা ভয় করবে না ত?"

—"যাও বকো না...নিজের ত কত সাহস!"

অলক এসে দেখে অসীম দা', বৌদি' কেউই নেই; মোটরের মধ্যে চাকরটা শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ভাবে—আচ্ছা বেরসিক ত!

চাকরটাকে ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করে—"ওরা সব গেল কোথায়?"

—"বেড়াতে গেছে।"

—"কোন্ দিকে?"

(আঙল নির্দ্দেশ করে')—"ঐ গ্রামের দিকে।"

অলক ভাবে—এ আর এক জ্বালা! ওদের এখন কোথায় খুঁজে বেড়াবো!

অলক বাঁশী বাজাতে বাজাতে গ্রামের দিকে চলে। গ্রামের কাছাকাছি যেতেই তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। অসীম দা' আর বৌদি' তখন গ্রামের চৌকীদারের সঙ্গে গল্প করছে—গ্রামে কত লোকের বাস, জমীদার কি রকম লোক, এই সব।

অলককে দেখেই বৌদি' জিজ্ঞেস করে—"বিজোড় যে?"

(হেসে)—"বিজোড় ত বরাবরই, সব সময়ই ত তিন জন।"

—"চিত্রার কথা বাদই দাও, ও ত অর্দ্ধেক।"

এমন সময় অসীম দা' বলে—"বীথি, চিত্রা, কোথায় ?"

—"ঐ বাগানের ভেতরে বাঁধে একটা নৌকা আছে, তাতেই ওরা বসে আছে।"

—"তুমি চলে এলে ?"

—"জানিয়ে দিলে, আমি থাকলে বীথিকার কবিত্ব করার অসুবিধে হয়।"

পাশ হ'তে বৌদি বলে ওঠে—"হুঁ হুঁ কিছু একটা হয়েচে—তা' না হলে তুমি চলে আসবে।"

সকলে তখন ঐ দিকেই চলে। অসীম দা' বলে—"রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, ওদের ডেকে নিয়ে বাড়ী যাওয়া যাক।" চৌকীদারটিও সঙ্গে সঙ্গে চলে। চেহারা দেখে আদপেই চৌকীদার বলে' মনে হয় না; রোগা ছিপছিপে গড়ন, তাল পাতার সেপাই; প্রকাণ্ড মাথা, তার ওপর আবার পাগড়ী জড়ানো; একটা মোটা লাঠি হাতে; গায়ে একটা সরকারী নীল রঙের জামা, কোমরে একটা চামড়ার বেল্ট; কালো তেলচিটে কাপড়—মোটের ওপর বেশ যুৎসই চেহারাটি! তবে, চোর-ডাকাত ঐ চেহারা দেখে ভয় পায় কি না সন্দেহ।

চৌকীদার বলে' যায়—"জানো বাবু, এই নিধিরাম চৌকীদারকে চেনে না আশপাশের বার-চোদ্দটা গ্রামের মধ্যে এমন লোক নেই। এখন বয়স হয়েচে, গায়ে সে শক্তিও নেই—তবুও এই লাঠিকে ভয় করে না, এমন কাউকে ত দেখি না। বয়স হয়েচে, আর পারি না, তাই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলুম; কিন্তু সদর থানা থেকে দারগাবাবু শুনে ছুটে এসে—"

এমন সময় দূরে কে চেঁচিয়ে উঠলো—"অলক দা', অলক দা' !"

বৌদি' বলে—"চিত্রার গলা না ?"

অলক ত ছুটলো।

অলক নৌকার কাছে এসে দেখে জলের ধারেই একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। শুধু পা, খালি গা, হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তোলা।

বীথিকা বলচে—"এখানে কি জন্য দাঁড়িয়ে... কি চাই...তো...মা...র, ব...ল...ব...ল...ছি।" গলার স্বর ভিজে। আর চিত্রা ত কেবলই চীৎকার করছে—অলক দা' অলক দা' !"

অলক ছুটে এসে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বলে—"কি চাই তোমার ? এখানে কেন ?"

সে কিন্তু কোন উত্তরও দেয় না; কেবল বলে—"জানো, এসব আমার সম্পত্তি, এখনি বেরিয়ে যাও।" বীথিকা এবার সাহস করে' নৌকা থেকে নেমে অলকের পাশে দাঁড়িয়ে অলকের সঙ্গে যোগ দেয়।

ততক্ষণে অসীম দা', বৌদি', ও চৌকীদারটাও এসে পোঁচেচে।

অলক ত তাকে কিছুতেই ছাড়বে না—"বেটা চোর, দুষ্টু নির্বুদ্ধি, পুলিসে দেবো।"

সে কেবল হোহো করে' হেসে ওঠে।

চৌকীদার লোকটাকে দেখে বলে ওঠে—"বাবু, ওকে ছেড়ে দিন; ও পাগল...জমীদার বাড়ীর ছেলে; শক্ত ব্যামো হ'য়েছিল, তারপর থেকেই এই রকম মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে; সমস্ত দিনরাত কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।"

অসীম দা' জিজ্ঞেস করে—"ওর কেউ নেই ?"

—"বাপ-মা সবই আছে; তবে ঘরে আটকে রাখলে ভীষণ চীৎকার করে, তাই বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেয়।"

সকলে পেছন ফিরে দেখে পাগলটা কখন নিঃশব্দে চলে গেছে।

সকলে গিয়ে যখন মোটরে উঠলো—তখন

রাত শেষ হ'তে দেরী নেই। সমস্ত রাত জেগে পূর্ণিমার চাঁদ ক্লান্ত হ'য়ে আকাশের গায়ে ঢুলে পড়েচে। ভোরের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ শীত শীত করে।

অলক লুকিয়ে বিথিকার হাতে একটা চিমটি কেটে বলে—"একটা কীর্ত্তি করলে যা' হোক্!... বহুদিন মনে থাকবে...একটা যুযুৎসুর প্যাঁচ লাগিয়ে দেখলে না কেন?"

অসীম দা'—"হাঁ তা' হ'লেই হয়েচে!...বিদ্যে-বুদ্ধি বুঝে নিয়েচি; চেহারা দেখেই চীৎকার, তবু সে গায়ে হাতও দেয় নি।"

বীথিকা কোন উত্তর দেয় না ·· উত্তর কিছু দেবার থাকলে ত দেবে।

—বিড়ম্বিত—

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

কুন্তলের স্বামী যোগেশ বুকিং ক্লার্ক।

গোলাপগঞ্জ ষ্টেশনে বদলী হইয়া আসিয়া কুন্তলার ভালো লাগিয়াছিল ষ্টেশনের চারিপাশ—খালি মাঠ, উন্মুক্ত, উদার···পড়িয়া রহিয়াছে সুবিস্তৃত হইয়া। তাদের একটা কোল দিয়া বাঁধা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

রাস্তার ধারে দু'-একটা দোকান আর একটু ওপাশে নদী। এখন মরা, বর্ষার উত্তাল তরঙ্গে নাচিয়া ওঠে···খানিকটা সোজা গিয়া পরে একেবারে উত্তর দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে অনেক খানি।

জ্যোৎস্না সুশুভ্র করিয়া তোলে ওই বিরাট মাঠ, নদীর জল...যেন মর্ম্মর প্রস্তর বিছাইয়া রাখা। ষ্টেশনের ছোট ঘরখানার দু'পাশ দিয়া চারিটা লাইন—অন্ধকারের ঘন কৃষ্ণতায় বিপুল ভয়াল রহস্যে ডুবিয়া থাকে। তবু সে বড় চমৎকার, অতি সুশ্রী!

আর ভালো লাগিয়াছিল এ, এস্, এম্, অনুকূলকে। সে সম্পূর্ণ একা। যেন ওর এ দুনিয়ায় কেউ আপন নাই। .. ...সারাটা দিন বাসায় পড়িয়া ঘুমায়, রাত্রে ডিউটী করে আর মদ খায়। মদ খায় ও সারাক্ষণ...কিন্তু কোন দিন একটা কাজে কেউ ওর খুঁত পায় নাই। এক মিনিট লেট, কি প্যাসেঞ্জার বুক করিতে গিয়া short of excess কেউ আজ অবধি খুঁজিয়া পায় নাই। বরং সে প্রায়ই বলিত—ওরে এই নেশা যেদিন ছেড়ে দোব, সেইদিনই দেখবি আমি আপ ডাউন দুটো ট্রেণে কলিসান বাধিয়ে বসেচি।

তারপর বলিত-কিন্তু একদিন দিলে হয় লাগিয়ে।

যারা শুনিত, বলিত—সে কি!

—মন্দ কি···সে বেশ দেখার একটি জিনিষ হবে। গাড়ীগুলো লাইন টপকে গিয়ে ওই নদীর ধারে ডিগবাজী খাবে। লোকের চীৎকার, হৈ-হৈ, কান্না, কাতরাণী, হল্লা। উপভোগের হবে সত্যি!···

লোকগুলা অবাক হইয়া যাইত।. অনুকূল বলিত—আরো যদি অন্ধকার রাত্রি হয়, ভারী রোমান্টিক হয়।···কোথাও কিছু দেখা যায় না, অথচ ভাঙ্গা, মরা, হুড়োহুড়ির সে একটা ভীতি-মোহন রূপ!···

অবশেষে বলিত—দোব একদিন টোয়েনটিথ্রি আপ এর সঙ্গে ফিপটিফোর ডাউনের লাইন ক্লিয়ার দিয়ে। যারা শুনিত, তারা কিন্তু বেশ শিহরিয়া উঠিত।

দুই

কুন্তলার পাশের ঘরই অনুকূলের। অনুকূল কোনদিন খায়, কোনদিন খায় না। দিনের বেলায়ও খানিকটা মদ গিলিয়া পড়িয়া থাকে।

কুন্তলার তরুণী প্রাণ ওই বেচারার জন্য কাঁদিয়া ওঠে।···ইচ্ছা করে তার পরিচয় লয়, ইচ্ছা করে তাকে দরদ দেখায়,স্নেহ করে · তার কী সে ব্যথা যার জন্য জীবনটাকে সে এত অবহেলা করে, অবগত হইবার জন্য অন্তর আছাড়িপিছাড়ি খায়।

যোগেশ হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। দূর ওটা মাতাল···ও আবার মানুষ!

কুন্তলার মন মানে না—মদ খাইলেই তার

মনুষ্যত্ব চলিয়া যায়, হইতেই পারে না। তাদের অনেকে মদ না খাইয়া যাহা করে, কেউ মদ না খাইয়াও তাহা করিতে পারে না, সঙ্কুচিত হয়।

কুন্তলা যোগেশের সহিত ঝগড়া বাঁধাইয়া দেয়। বলে—তুমি যাই বলো, আমি যখন এসেচি তাকে অমন করে' কষ্ট পেতে দেব না। না, অন্ততঃ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্বা, মজ্জা নিয়ে জন্মে তা' করা চলে না। অকর্ত্তব্য।

যোগেশ কিছু বলিতে সাহস করে না। তরুণী পত্নী।

অনুকূলকে ট্রানস্‌ফার করিবার মতলব গড়িতে থাকে। কুন্তলা যত যুক্তি, যত যাহাই বলুক না মাতালকে সে কিছুতেই ভাল বলিয়া ভাবিতে পারে না। ষ্টেশনে গিয়া বড়বাবুর সঙ্গে যুক্তি করে।

বিকাল বেলাটায় অনুকূল যাইতেছিল। কুন্তলা ডাকিল—আপনার ঘরের চাবিটা দিয়ে যাবেন ত। ঘরটা সাফ করে' দোব।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া অনুকূল একবার চাহিল, দেখিল দরজার আড়াল হইতে কুন্তলার আল্‌তা-পরা পা দু'টী দেখা যাইতেছে।

কুন্তলা সেইভাবেই বলিল—আমি যখন আছি, আপনাকে আমার চোখের ওপর এমন করে' আত্মহত্যা করতে দোব না। দিন চাবিটা।

হাসিয়া অনুকূল বলিল—জীবনের চিরটাদিনই যার এমনিভাবে কাটতে চ'লেছে—দু'দিনের সুখ দেখিয়ে তার লাভ কি!

—তা' হোক্। তবু আপনাকে দিতে হবে। আমার অনুরোধ।

দু'-এক মিনিট কি ভাবিয়া অনুকূল বলিল—"কিন্তু তোমাকে সামনে না পেলে ত দোব না দিদি। আপন হ'তে চাও—সত্যিই আপন হও।"

কুন্তলার মন একেবারে গলিয়া যায় এই লোকটীর উপর।...এ যেন ওর মর্ম্মস্থল হইতে উঠিয়া আসা ডাক। বাহির হইয়া বলিল—তা' হ'লে দাদা আপনি শীগগিরই ঘুরে আসবেন, আমি চা করে' রাখবো।

"অত করে' বেঁধ না দিদি, থাকতে পারবো না" বলিয়া অনুকূল চলিয়া গেল।

অনুকূলের বাসার ভিতর গিয়া কুন্তলা অবাক্ হইয়া গেল। এমন করিয়া কি মানুষ থাকিতে পারে! জঞ্জাল, আবর্জ্জনা, বিড়ি, দেশলায়ের বাক্স, মদের পাঁটের স্তূপ···কোনটা ফেলিয়া কোনটাই সরানো চলে না।

কোনরকমে চলনসই গুছাইয়া তখনকার মত কুন্তলা কাজ শেষ করিল।

তারপর ষ্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া সে যখন দরজার পাশটীতে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, অনুকূল আসিতেছে।

অনুকূল আসিয়া একবার চারিপাশ চাহিয়া বলিল—একি করেছ দিদি—হতচ্ছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী-শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে যে!

—লক্ষ্মীকে অনাদরে তুমিই ত শ্রীহীন করে' রেখেছে দাদা!...

—ওইটেই তোমাদের জাতের বড় গুণ ভাই। জঞ্জাল হটিয়ে রূপ ফোটাতে তোমরাই পার কেবল।···আমরা শুধু খেয়ে আর শুয়েই খালাস্।

কুন্তলা হাসিয়া বলিল—তা' যার রূপে তোমার ঘরে আলো জ্বলবে তাকেই নিয়ে এসো না দাদা।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অনুকূল বলিল—মাতাল, বদ্‌মাইসের ঘরে কেউ আসে। বোন্‌ই নয় দাদার মায়া কাটাতে পারে না। কিন্তু—

কুন্তলা বলিল—খুব আসবে দাদা। আর মাতাল তুমি কি চিরদিনই থাকবে, না থাকতে দোব? অনুকূল কুন্তলার কথায় কোন জবাব না দিয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কহিল—আঃ, অনেক কাল বাদে চা খেয়ে সোয়াদ পেলুম!···

তিন

যোগেশের এতটা মোটেই ভাল লাগে নাই। তরুণী স্ত্রী তার একটা মাতালকে নিয়ে মেলা-মেশা করে তাহা তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। কিন্তু কুন্তলাকে পারিয়া উঠিবার যো নাই। বলিতে গেলেই, কুন্তল এমন সমস্ত তর্ক আর যুক্তি আনে যে, যোগেশকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। অথচ উপায়ও নাই। বড়বাবু সেদিন ত বলিয়াছেন —ট্রান্সফার ওকে হঠাৎ করাই কি করে' যোগেশ। কোন ত দোষ নেই। আর সত্যি কথা কি লোকটী ডিউটি করে প্রাণ দিয়ে।... একটু ভুলচুক নেই। অথচ, অন্য লোক নিয়ে হয় ত আমার এমন নির্ভর করে' থাকা চ'লবে না। তুমি বাড়ীতে ঠিক করো।

ইহার উপর আর কথা চলে না। সেদিন দুপুরবেলায় এইট্‌টি নাইন আপকে পাশ করিয়া যোগেশ বাসায় আসিল। তারপর আর তিন ঘণ্টা কোন ট্রেণ নাই।

তরুণ মন। সুরূপা, সুযৌবনা প্রিয়াকে লইয়া নির্ঝঞ্ঝাট সময় কাটাইতে উৎসুক, উদগ্র হইয়া উঠে।.. যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের অন্তরতলে এ বাসনার আনাগোনা চলিয়া আসিতেছে।

যোগেশও কল্পনার প্রীতি রঙ্গীন খেলায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। কুন্তলা তখন অনুকূলের সঙ্গে কথা বলিতেছিল,—দাদা, তোমাকে মানুষ হ'তেই হবে।

অনুকূল বলিল—আমার প্রকৃতি মানুষ হওয়ার বাইরে বোন্।...এমনিই বন্ধন-বিহীন উদাস, উচ্ছৃঙ্খল জীবন আমার ভাল লাগে।...এ স্বভাবকে যদি জোর করে' ফেরাতে যাই হয় ত আমি একটা জন্তু, জানোয়ার হ'য়ে প'ড়বো। হয় ত যেন একটা কলের পুতুল।

যোগেশ চটিয়া গেল। গম্ভীরকণ্ঠে সে কুন্তলাকে ডাকিল। কুন্তলা আসিয়া বলিল—কি গো, এখন যে?

যোগেশ ঠিক করিল আজ ইহার একটা বুঝাপড়া সে করিবেই; বলিল—দেখো কুন্তল, আমি বাস্ত'বকই এতটা পছন্দ করি না।

কি, দাদার সঙ্গে—

—হ্যাঁ, একটা মাতাল, ব্রুট, বিষ্ট।

কুন্তলা লাল হইয়া উঠিল; বলিল—থাক্ সে মদ। কিন্তু তোমাদের মত নীচ, ইতর নয়।

—নীচ আমি হ'তে পারি হয় ত—কিন্তু তোমার স্বামী।...যখন বিবাহকে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই, তখন তোমার এই নীচ স্বামীর কোন অপ্রিয় কাজ তোমায় করতে দিতে পারি না কুন্তল।

—কিন্তু ভাই বলে' তোমার অন্যায় জুলুম আমি সইবো না।

যোগেশ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, অনুকূল দরজার নিকটে আসিয়া বলিল—বলে.. ছিলুম ত তোমায় দিদি, অত করে' বেঁধ না। আসুন যোগেশবাবু, মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা কি আমাদের পোষায়।

অনুকূল বেশ সপ্রতিভভাবেই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। যোগেশ বারকয়েক জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

চার

তারপর পূরা তিনটী দিন কুন্তলা অনুকূলের সঙ্গে দেখা করে নাই।

অনুকূলের যেন সে সবে কোন কৌতূহলই নাই। সে নিত্যকার মত মদ খাইত, রাত্রে ষ্টেশনে গিয়া কারণে-অকারণে চীৎকার করিত, আর কোনদিন তার বাসায় বসিয়া গান গাহিত—

প্রীত লাগায়ে চলি যায়
বেদারেদার—
নয়না লাগায়ে চলি যায়
বেদারেদার...

কুন্তলা শুনিত, দেখিত সবই—অকস্মাৎ মাঝে মাঝে তার চোখ জলে ভরিয়া যাইত।

অভাগা বন্দিনী নারী—জীবনের পথে তার আর দাবী করিবার কোন উপায় যেন নাই। তার সত্তা, তার আমিত্ব, তার রক্ত, মজ্জা সবই যেন হারাইয়া গিয়াছে! জানালার ধারে বসিয়া সে তবু দেখিত—রেলওয়ে লাইন খোলা পড়িয়া থাকা মাঠ—আর ওই ষ্টেশনের ঘরটা।

ট্রেণ আসিয়া দাঁড়ায়—খানিকক্ষণের কোলাহল…তারপর আবার সব নীরব হইয়া যায়।

এক-একবার কুন্তলার মনে হইত, এ দাসীত্ব সে সহিবে কেন? জীবনটা কি শুধু পরের ভরসায় চাহিয়া থাকিতে তৈয়ারী হইয়াছে! কিন্তু নারী, তার চিত্ততলে হাজার উত্থান-পতনের মাঝেও যে শঙ্কা সঙ্কোচের দুর্বার স্রোত ঘুরিয়া ফেরে, তার মোহ এড়াইতে পারে না।…

রাত্রি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ ঘুম হইতে সে উঠিয়া খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে—বাহিরে গাঢ় ঘন অন্ধকার, দূরের মরা ক্ষীণ নদীটা তা'তে আরও মরিয়া রহিয়াছে। সাইডিং লাইনে একখানা জি-আই-পি, একখানা বি-বি-সি-আই দু'খানা এম-এস্-এম আর একখানা ই-আই-এর ওয়াগন পড়িয়া আছে। তারা যেন দৈত্য-দানার মত ঝুপসী মারিয়া অন্ধকারকে আরও জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।… তাহার ইচ্ছা করিত—ওই আঁধারের বুকে সে ছুটিয়া খেলা করে। জ্যোৎস্নার রূপ তার মিষ্ট লাগে; কিন্তু আঁধার—এ আরও সুন্দর, অপূর্ব্ব! ষ্টেশন হইতে অনুকূলের চীৎকার কানে আসে। ওই লোকটার নিঃসঙ্গতার, উচ্ছৃঙ্খলতার, অথচ ওর মধুরতার কথা মনে করিয়া অন্তর গলিয়া যাইতে চাহে! ওর জীবনে যেন ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, তাই মায়া করিতে, আপন হইতে ইচ্ছা করে—অথচ কান্না উপছাইয়া আসে—

পয়েণ্টস্‌ম্যান রামদেও একখানা পাঁউরুটী লইয়া আসিতেছিল।

কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল—ও রুটী কি হবে রামদেও?

—ছোট বাবু খাবেন মা।

—ছোট বাবু খাবেন। কেন ভাত?

—ভাত ত আজ দু'দিন খান নি। কোনদিন রুটী আর ডিমসিদ্ধ, কোনদিন চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়েছেন। বলেন—রান্না আমার রোজ পোষায় না রামদেও। যেদিন নিতান্ত আর পারি না, সেদিন—

কুন্তলার নারী-চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। নারী আর সব সহিতে পারে, পারে না কেবল পুরুষকে অভুক্ত রাখিয়া নিজে খাইতে।

অনুকূলের জন্য মন তার কাঁদিয়া গেল। মনে পড়িল—তার দিদি ডাক—প্রথম আলাপের সে কী মধু পবিত্র বাঁধন!…

কুন্তলা বলিল—তুমি ছোটবাবুকে আমার নাম করে' বলো গে রামদেও, তিনি যেন তাড়াতাড়ি আসেন। আমি ভাত রাঁধচি।

রামদেও খুশী হইয়া বলিল—আমারই ক'দিন ইচ্ছে হয়েচে বাবুকে রেঁধে দিই। কিন্তু সাহস করি নি।

অনুকূলকে খাওয়াইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কুন্তলা যখন নিজের গৃহে ফিরিল, যোগেশের স্বামীত্বের কর্ত্তৃত্বের উত্তর দিতে গিয়া অবশেষে তাহার সেদিন আর খাওয়াই হইল না।

কিন্তু ধাক্কা একদিন বেশ লাগিয়া গেল। ট্রেণে ট্রেণে নয়—মানুষের মনেই।

যোগেশের প্রত্যহকার নীতিকথা আর তার সন্দেহকে কুন্তলা সহিতে পারিল না।

নারী-চিত্ত এইখানেই বেদনার গভীর আঘাতে নত হইয়া পড়ে—পুরুষ যখন তার সন্দেহের আভাষ দিয়া শাস্ত্রতথ্য আওড়ায়।…

হয় ত আরও অনেকটা পড়াইত, কিন্তু অনুকূল আসিয়া বাধা দিল। কুন্তলাকে বলিল—আমায় যদি তুই একটু ভালবাসিস্ দিদি, ত আমার অনুরোধ—তোর পায়ে পড়ে' অনুরোধ করি—আর কোনদিন তুই দরদ্ দেখাস্ নি!…

তারপর বলিল—দরদের বরাত করি নি ভাই। তা' যদি করতুম, তবে আজ আমি এতটা হতচ্ছাড়া হতুম না। মদ আমি খাই—ও আমার ভাঙা বুকে আলো জ্বালে, আমাকে ঘুম পাড়ায়!…

তারপর সেদিন অনুকূল যখন শেষ বিদায় লইয়া সকলের কাছে হাসিমুখে দাঁড়াইল—কেউ কথা বলিল, কেউ বা একটু হাসিল—যোগেশ বলিল, আপদ গেল বাবা। অনুকূল আসিল না কিন্তু কুন্তলার কাছে।…

ফট্‌টী থি আপের একটা কামরার খোলা জানালা যখন কুন্তলার ঘরের জানালার পাশ দিয়া সরিয়া যাইতেছিল, কুন্তলার মনে হইল—ওই লোকটার চোখের জল যেন তার চোখের জলকেই অভিনন্দন জানাইয়া গেল।…

কত কি অজানিত স্মৃতির ভিতর কত ব্যথা লইয়া ও চলিয়া গেল কেউ বুঝিয়াও দেখিল না। সাইডিংয়ে গাড়ীগুলা যেমন নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ ছুটন্ত অবস্থায় ওদের রুদ্রতার কথা এখন যেমন ভাবিয়াও পাওয়া যায় না, ওর ওই বুকের অভ্যন্তরে যে অজ্ঞাত অগাধ ব্যথার স্তূপ তা' যেন ঠিক তেমনিই…ধরা দিতে চাহে না।…

—জগাপিসির শিকার—

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি-এ

তাঁর আসল নাম যোগেশচন্দ্র বসু, পাড়ার লোক আড়ালে বলিত, জগাপিসি। তাঁর মত কার্য্যক্ষম লোক পৃথিবীতে সচারাচর দেখা যায় না।

জগাপিসির মেজ ছেলে আসিয়া বলিল, ছ'আনা পয়সা দিন, চশমাটা বেঁকে গেছে মেরামত করতে হবে।

চশমা বেঁকে গেছে, ছুটোপাটি করছিলি, বুঝি? তা' একটা চশমা ঠিক করতে দু'আনা পয়সা খরচ করতে হবে, নিজেরা করে' নিতে পারিস্ না। খোল্ দেখি কোথায় কি হয়েছে।

চশমাটা খুলিয়া দিতে হাতে লইয়া খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, ও এই হয়েছে, তার জন্যে দোকানে যেতে হবে! তোদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। নিয়ে আয় বড় সাঁড়াশিটা আর ছোট হাতুড়িটা, আমি ঠিক করে' দিচ্ছি! এই ত কাজ, তার জন্যে আবার—বলিয়া এমন এক হুঁ করিলেন যে, তাহাতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা কিছু নয়!

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল হাতুড়ি সাঁড়াশি ছোট কাঁচি, ষ্টোভ, প্যাকিং বাক্স, স্ক্রুড্রাইভার, কর্কস্ক্রু প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ চারিপাশে লইয়া তিনি ভীষণ মনোযোগের সহিত চশমা সারাইতে সুরু করিয়াছেন।

গৃহিণী হরিপ্রিয়া বলিলেন, তুমি নিয়েছ, তবেই হয়েছে এইবারে ভাঙে।

—ভাঙ্বে আবার কি, ভাঙ্বার কি আছে বলিতে বলিতে চশমাটার একদিকের ডাঁটি সাঁড়াশি দ্বারা চাপিয়া তিনি কটাস্ করিয়া একটা শব্দ করিলেন এবং মটাস্ করিয়া একখানা কাঁচ দু'-আধখানা হইয়া পড়িল।

—ভাঙল ত? ফল্‌ল ত আমার কথা?

—ফল্‌বে না? যা' কাণের কাছে টিক্‌টিক্ কর! কাঁচ যাক্, চশমাটা ঠিক হয়ে গেছে।

গৃহিনী মন্তব্য করিলেন, ছ'আনা বাঁচাতে গিয়ে এখন আড়াই টাকার ধাক্কা!

—তা' কি হবে, কাঁচটা ছিল পল্‌কা। কোথাও কিছু না, আপনি গেল কেটে, জাপানী চিমনীগুলোর মতই।

বিকেলবেলা। গৃহিণী দুধ জ্বাল দিতেছিলেন, বিড়ালটা পায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অন্যমনস্কভাবে পিছন ফিরিতে ল্যাজে পা পড়িয়া গেল এবং সেও সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাঁ-অ্যা-স্ করিয়া উঠিল।

হরিপ্রিয়া বলিলেন, আ মর, পায়ে পায়ে ঘুড়-ঘুড় করে বেড়াচ্ছে! দূর হ', দূর হ', মুখপোড়া বেরাল মরে না।

—কি হ'ল কি হ'ল বলিতে বলিতে জগাপিসি আসিয়াই দেখিলেন এই ব্যাপার। তৎক্ষণাৎ হুকে টাঙ্গানো এক চ্যাঙারি পাড়িয়া বিড়ালের পশ্চাতে ছুটিলেন। হরিপ্রিয়া দেখিয়া বলিলেন, কিসের নোংরা হাত আমার ও ভালো ঝুড়িটায় দিলে, তোমাকে বেরাল তাড়াতে হবে না, তোমার পায়ে পড়ি!

—না দাঁড়াও, এই দিয়ে শালাকে চাপা দোব বলিয়া ধাবমান শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কলতলায় আসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওদিকে যেও না গো

পেছল্—আর পিছল! দুষ্ট বিড়াল পলায় দেখিয়া জপাপিসি চ্যাঙারিটা ছুড়িয়াই মারিলেন, সাতহাত তফাৎ দিয়া সে ত পলাইল, শ্যাওলা-পড়া কলতলায় রাশিকৃত সকড়ি থালা বাসনের উপর দড়াম করিয়া পড়িলেন জগাপিসি।

লজ্জা পাইয়া কাঁদোকাঁদো মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, লাগে নি, তবে কনুইটা গেছে!

সেই হইতে রোজ একবার করিয়া বিড়াল তাড়ানো হইল তাঁর নিত্যক্রিয়া। একটা ধাম হাতে পিছনে পিছনে ঘোরেন, আচম্‌কা চাপা দিবেন এই অভিপ্রায়। কিন্তু লক্ষ্য কোনক্রমেই স্থির হয় না। মাঝে থেকে ধামাটা ধপাধপ ফেলিতে ফেলিতে একপাশ হইতে ফাটিতে সুরু করিয়াছে!

হরিপ্রিয়া সেদিন লক্ষ্মীপূজার যোগাড় করিতেছিলেন আপনার মনে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া, বিড়ালটা তাঁর হাতখানেক তফাতে গা মেলিয়া শুইয়াছিল, বাটির গৃহিণীকে মোটেই সে ভয় করে না, যেহেতু তাঁর তরফ থেকে কখনো আক্রমণ পায় নাই। এদিকে পশ্চাৎ দিক হইতে জগাপিসি ধামা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বিড়ালটা হঠাৎ দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মা ষষ্ঠী বলিয়া ধামা ছুঁড়িলেন, লাভের মধ্যে হইল হরিপ্রিয়ার মাথায় ধামা চাপা পড়িয়া চমকাইয়া ও মাগো বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, জগাপিসি থতমত খাইয়া পিছু হটিয়া কলার কাঁদির উপর ধড়াস্ করিয়া পড়িয়া আটদশটা মর্ত্তমানকে চট্‌কাইয়া দিলেন, পুরুত-ঠাকুর সহসা দাড়াইয়া উঠিয়া 'ব-ব-ব-ব-ব' বলিয়া এক ভীষন আর্ত্তনাদ করিলেন, নিস্তারিণী ঝি হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া চৌকাটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল, কোলের মেয়েটা ককাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অথচ যাহাকে লইয়া এত ব্যাপার,সেই বিড়ালটা দোতালার আলিশায় গিয়া নিশ্চিন্তমনে হাই তুলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন বিড়ালটা চাপা পড়িল, জগাপিসির হাতে নয়, ছেলেদের হাতে। ধামা হইতে তাহাকে চটের থলিতে বদলী করিবার মুখে কোথা হইতে জগপিসি আসিয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত সাবধানতাসহকারে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া কোনদিক দিয়া বিড়ালটা সরিয়া পড়িল বোঝা গেল না, জগপিসি রাগিয়া নেড়াকে গামচাইয়া দিলেন এবং পাঁচুর জুলপি ধরিয়া বেশ করিয়া নাড়া দিলেন। আসলে, কিন্তু দোষ তাঁহার নিজেরই।

সকলে স্থির করিল এবার যে দিন বিড়াল ধরা হইবে এবং বাহিরে চালান করা হইবে সেদিন জগপিসিকে এধার মাড়াইতে দেওয়া হইবে না, তিনি আসিলেই সব পণ্ড হইয়া যায়!

কিন্তু কার্য্যকালে জগপিসি কোথা হইতে আবির্ভূত হইলেন, বস্তাবন্দী করিয়া বিড়ালটাকে বাহিরে লইয়া যাইবার মুখে তিনি বলিলেন—ধরা হয়েছে,ধরা হয়েছে, বাঃ, এখন ওকে খানিকটা আনিমানি-ঘোরানি 'করে' দে, তা'তে দিক্‌ভুল হয়ে যাবে, খানিকটা গরম জল ঢেলে দে, আর কি করবি—একজন ওকে ওপর থেকে একটা ছোট ডাণ্ডা দিয়ে পেট ··

ছেলেরা কোন কথা শুনিল না, চাকরটাকে বলিল, নিয়ে চল, অনেক দূর দিয়ে আসি···

জগপিসি বাধা দিলেন, না না অনেক দূরে নয়, কোথায় যাবে খেতেটেতে পাবে না, কে মারবে ধরবে, ওকে এই পাড়াতেই একটা ভাল বাড়ী দেখে ছেড়ে দিয়ে আয়, খাবেদাবে, ভাল আসতে চাইবে না। যা', ঐ মজুমদারদের বাড়ীতে দিয়ে আয়…

জগপিসি নিজে গিয়া তদ্বির করিয়া সেই বাড়ীর সামনে ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন, বিড়ালটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াও গেল, কিন্তু জগপিসি গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার আগেই বিড়ালটা ফিরিয়াছে!

ইঁদুরে মহা জ্বালাতন করিয়াছে, ভাঁড়ারঘরে কোনকিছু ভাল অবস্থায় রাখিবার যো নাই, প্রকাণ্ড ধাড়ী ইঁদুর, জগপিসির চটিজুতা শেষ করিয়াছে, খাটের একদিকের পায়া আধখানা খাইয়া ফেলিয়াছে, কলম চাটিয়াছে, তাঁর প্রিয় আচারের হাঁড়ির তিনভাগ সাবাড় করিয়াছে।

এরকম অবস্থায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা যায় না। জগপিসি ব্যবস্থা করিতে উঠিলেন।

প্রথম দশ পয়সা দিয়া এমন এক কল কিনিয়া আনিলেন যে, ইঁদুর আসিয়া তার উপর পড়িলে কোথা হইতে এক শিক ছুটিয়া আসিয়া তার ছোট মাথাটাকে চ্যাপটাইয়া দিবে।

ব্যাপারটা কল্পনা করিয়া জগপিসি উল্লসিত হইতে লাগিলেন। রাত্রি দুইটার সময় অন্ধকারে উঠিয়া ইঁদুর পড়িয়াছে কি না দেখিতে গেলেন। দেখিলেন পড়ে নাই, তখন সেটাকে লইয়া ঘট্‌ঘট্ করিতে করিতে হঠাৎ নিজের হাতেই খটাং করিয়া ফেলিয়া গিন্নী গিন্নী বলিয়া ডাক পাড়িতে লাগিলেন।

রাতদুপুরে উঠিয়া স্বামীর হাত হইতে ইঁদুর-কল ছাড়াইয়া আইডিন খুঁজিয়া লাগাইতে হরিপ্রিয়ার কি পরিমাণ রাগ হইতে লাগিল সহজেই অনুমেয়, কিন্তু জগপিসি সেই রাত্রে নীচে গিয়া বাসন-কোসন ঝনঝন করিয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া এক কাটারি লইয়া আসিলেন। বলিলেন—এই গর্ত্তর মুখে দা নিয়ে বসে' থাকব, বেটা এলেই মারব এক কোপ। কিন্তু আলোজ্বালা ঘরে 'বেটা'র আসিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, জগপিসি বসিয়া বসিয়া অবশেষে ঘুমে ঢুলিয়া কাটারি ফেলিয়া কোণে মাথা রাখিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন।

পরদিন এক প্রকাণ্ড জাঁতিকল আসিল দোকান হইতে। সেটাকে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিবার মুখে দরজা-গোড়ায় পাতিয়া হরিপ্রিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন ওদিকে যেন কেউ না যায়।

এগারটা, সাড়ে এগারটা, বারটা, সাড়ে বারটা, জগপিসি উঠিয়া টর্চ্চ জ্বালিয়া জ্বালিয়া দেখিতে লাগিলেন ইঁদুর কতদূর।

টর্চ্চ নিভাইয়া ভাঁড়ার ঘরের শিকলি কায়দা করিয়া আলগা করিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে ফিরিবার সময়ে তাঁহারি পা-টা পড়িল কি না ঠিক জাতি-কলের মধ্যে এবং তারপরে সেও এক মহাব্যাপার।

তৃতীয় দিন তিনি একটাকা দিয়া দোকান হইতে ইঁদুরের বিষ কিনিয়া আনিলেন। সে বিষ খাইলে যে ইঁদুরকে মরিতেই হইবে তাহা কৌটার গায়ে লেবেলে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল সুতরাং সন্দেহের কোন কারণ থাকিতেই পারে না।

সেই বিষ এক মিষ্টান্নের মধ্যে পুরিতে হইবে, অতএব চার আনা দামের এক প্রকাণ্ড রসগোল্লা আসিল, যাহাতে ইঁদুর লোভ কিছুতেই ঠেকাইয়া না রাখিতে পারে।

সেই রসগোল্লার মধ্যে বেশী পরিমাণে বিষচূর্ণ পুরিয়া দিয়া নর্দ্দমার মুখে জগপিসি তাহা এক টিনের পাত্রে সযত্নে রাখিয়া দিলেন, ইঁদুর আসিয়াই খাইবে এবং তৎক্ষণাৎ ইঁদুরলীলা সংবরণ করিবে।

কিন্তু এক মুস্কিল ছিল, বিষ খাইয়া জল পান করিলেই ইঁদুর বাঁচিয়া যাইবে এ কথাও কৌটার গায়ে লেখা ছিল।

কাজেই জগাপিসি বাড়ীর সমস্ত কুঁজো কলসী ঘড়া বাল্‌তী মায় ঘটি পর্য্যন্ত উপুড় করিয়া সব জল ফেলিয়া দিলেন। তখন কলের জলও চলিয়া গিয়াছে, চৌবাচ্ছা ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে গেলেন।

রাত্রে জগাপিসিরই সকলের আগে 'তেষ্টা' পাইল, উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে ছোট খোকার একবাটি দুধ চাপা দেওয়া আছে

দেখিয়া তাই চোঁ চোঁ করিয়া শেষ করিয়া নিঃশব্দে গিয়া শুইলেন।

খানিক পরেই ছোট খোকা চ্যাঁ করিয়া উঠিতে গৃহিণী উঠিয়া দুধের বাটি দেখেন খালি। কর্ত্তাকে প্রশ্ন করিতে তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ওদিকে ছেলের কান্নাও থামে না।

অগত্যা তিনি দুধের খোঁজে বাহির হইলেন। গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন এত রাত্রে কি দুধ পাওয়া যাবে?

পয়সা ফেল্‌লে কলকাতায় বাঘের দুধ পাওয়া যায়, তা' গরুর দুধ—বলিয়া জগাপিসি বাহির হইয়া গেলেন।

গয়লাবাড়ীতেও অত রাত্রে দুধ পাওয়া গেল না, জগাপিসিরও ঝোঁক চাপিয়াছে তিনি গৌহাটায় গিয়া এক গরু কিনিবার মৎলব করিলেন।

রাত ভোর হইয়া গেল। ইঁদুর রসগোল্লা খাইয়া চলিয়া গেছে, কোনখানে তার মৃতদেহ সৎকারের অপেক্ষায় পড়িয়া নাই।

জগাপিসিরও দেখা নাই, হরিপ্রিয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা ঘরে এক প্রকাণ্ড গাভী হাম্বারব তুলিয়াছে, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য অগ্রসর হইতেই সে এমন সিং নাড়িয়া আসিল যে, গৃহিণী 'গেছি মা' বলিয়া পলাইতে পথ পান না।

জগাপিসি বলিলেন গয়লার ওপর রাগ করে' এক গরু কিন্‌লাম কাল, আপাততঃ বাইরের ঘরেই থাক্‌, নইলে কোথায় থাকে?

ইঁদুর সম্বন্ধে তিনি একটু উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন, পরে স্থির করিলেন 'বাসায় গিয়ে নিশ্চয়ই সে মরেছে।'

কিন্তু সন্ধ্যাবেলাই আবার সেই ইঁদুরটা লোকজনের সামনে দিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং শিলের উপর ঢাকাটা ফেলিয়া দিয়া কলসীর পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

জগাপিসি বলিলেন, ওকে আমি জামবাটি চাপা দোব—বলিয়া জামবাটি হাতে ছুটিলেন, এদিকে কোথা হইতে গরুটা আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া কোণে বসানো ভাতের হাঁড়ির মধ্যে মুখ পুরিয়া দিল, ওদিকে বিড়ালটা উঠানের একধারে পিঠটাকে ধনুকের মত করিয়া ম্যাও ম্যাও শব্দে কি বক্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল বোঝা কঠিন। কিন্তু সমস্ত বাড়ীটায় দুমদাম দুড়দাড় ধুপধপাস্ শব্দ এবং ছেলের কান্না মেয়ের চেঁচানি জগাপিসির হুঙ্কার মিলিয়া যে কী বিপর্য্যয় ঐক্যতান সৃষ্টি করিল কি বলিব।

তবু ইঁদুরকে জগাপিসি মারিবেনই, পাপোষ চাপা দিয়া হোক, লেপ চাপা দিয়া হোক, ডাব ছুড়িয়া হোক, খুন্তী ছেঁকা দিয়া হোক। সেই প্রচেষ্টা।

এরপরে জগাপিসি এক গামলা কিনিয়া আনিলেন, তার উপরে তারের পুল করিয়া দিলেন, মাঝখানে রাখিলেন খাবার, ইঁদুর মুখ দিতে আসিলেই পড়িবে জলের মধ্যে, ভিজিয়া ঢোল হইয়া থাকিবে।

যথাসময়ে দেখা গেল খাবার নাই, ইঁদুর হয় ত জলে পড়িয়াছিল কিন্তু উঠিতে দেরী হয় নাই।

এমন অবস্থায় একটা জালা কিনিলে ইঁদুরের ওঠার পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে স্থির করিয়া জগাপিসি এক জালাই কিনিয়া আনিলেন।

ছেলেমেয়েদের সকলকে জালাটাকে চারিপাশ হইতে ধরিতে বলিয়া তিনি কানাটার উপর উঠিয়া বসিয়া ভিতরে একটা ঠ্যাং গলাইয়া দিলেন। তাঁর ভার সহিতে না পারিয়া দু'জনে একদিক ছাড়িয়া দিল, জালার মধ্যে এক পা

ঢোকানো অবস্থায় তিনি উঠানময় গড়াইতে সুরু করিলেন পরে ডিম ফাটিয়া বাহির হওয়ার মত ফাটা জালার মধ্য হইতে যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ছেলেমেয়ের দল যে যেদিক দিয়া পারিল অদৃশ্য হইল।

জালাভাঙার ফটাস্ আওয়াজ হইতেই হরিপ্রিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া 'থ' হইয়া গেলেন। বলিলেন, তোমায় ব্যাগত্যা করি ইঁদুর মেরে কাজ নেই, তার চেয়ে আর্শুলা শিকার কর।

কোথায় আর্শুলা বলিয়া তিনি ছুটিলেন। গৃহিণী দেখাইয়া দিলেন খাবার ঘরের কোণে এক রাশ। প্রকাণ্ড এক ঝাঁটা হাতে করিয়া সপাৎ সপাৎ করিয়া তিনি শব্দ করিতে লাগিলেন আর্শুলা মরুক্ না মরুক্ হরিপ্রিয়ার গালে-মাথায় পর পর দুই তিন ঘা পড়িল।

তাঁর ঝাঁটা আস্ফালনে ইলেক্‌ট্রিকের ডুমটা সশব্দে পড়িয়া ফাটিয়া গেল এবং জগাপিসি চমকাইয়া লাফাইয়া উঠিতেই কয়েকটা কাঁচের টুকরা প্যাঁট প্যাঁট করিয়া পায়ে ফুটিয়া গেল।

খামকা রাগিয়া গিয়া তিনি ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে অগ্রসর হইয়া গৃহিণীর পায়ে এমন এক ল্যাং মারিলেন যাহা ক কোনক্রমেই ভদ্রতা-সম্মত বলা যাইতে পারে না। গৃহিণী পড়িলেন না বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন মরিয়া গেলেও জগাপিসিকে ইঁদুর বিড়াল আর্শুলা বধ করিতে বলিবেন না।*

* জগাপিসিকে লইয়া আমার যে সমস্ত গল্প ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য কাগজে বাহির হইয়াছে এবং রেডিওয় পড়া হইয়াছে সে সম্বন্ধে অনেকের কাছ হইতে এই ধরণের প্রশ্ন আমাকে শুনিতে হইয়াছে :—"প্রভাতবাবু, আপনি কি আমার মেজ দা'র কথা নিয়ে লিখেছেন?" "আপনি আমাদের জামাই-বাবুকে এঁকেছেন?" "আমার দাদামহাশকে কি আপনি দেখেছেন?" বাস্তবিক আমি কাহাকেও লইয়া লিখি নাই, কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণ হয় জগাপিসির মত ব্যক্তি বহু পরিবারেই আছেন। যারা মনে করেন তাঁরা ভীষণ কাজের লোক, অথচ আসলে কোন কর্ম্মেরই নন। যাহা হউক, এরকম ধরণের লোকের আরো বিবরণ আমাকে পাঠাইয়া দিলে আমার প্লটের পক্ষে সুবিধা হইবে এবং জগাপিসিদের আমি বঙ্গ-বিখ্যাত করিবার চেষ্টা করিতে পারি।—লেখক
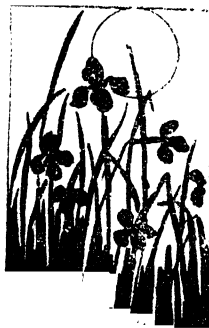
—ছোটলোক—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

সখারাম চামার জাতিতে মুচি। তাহার হাতের সুখ্যাতি ভালই ছিল। গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোক ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুই-চারিজন তাহার একচেটিয়া খরিদ্দার ছিল। সখারামের সংসারে মা-লক্ষ্মীর ততটা কৃপাদৃষ্টি না থাকিলেও মা ষষ্ঠী তাহাকে অনুগ্রহ করিতে ক্রটী করেন নাই। একঘর ছেলে মেয়ে হোক বলিয়া একটা আশীর্ব্বাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এই আশীর্ব্বাদ পূর্ণকলায় ফলবান হইয়াছিল সখারামের অদৃষ্টে। পাড়ার ভদ্রলোকেরা মন্তব্য করিতেন, 'মুচি বেটার পরিবারটা বছর বিউনী'। অর্থাৎ, প্রত্যেক বৎসরই সখারাম গৃহিণী হয় একটী পুত্র না হয় একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল এটা ঠিক। আজ বিশ বৎসর হইল সখারাম দারপরিগ্রহ করিয়াছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যায় বারটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র অকালমৃত্যু প্রাপ্ত হওয়ায় বর্ত্তমানে তাহার পুত্র-কন্যার সংখ্যা নয়টী।

জ্যেষ্ঠপুত্র কালু বেশ বড় হইয়াছে। তাহার বয়স এখন আঠার বৎসর। সে পিতার ব্যবসায়ে যথারীতি যোগদান করিয়া তাহার বাপকে কর্ম্মে সাহায্য করে, খরিদ্দারদের বাড়ী বাড়ী গিয়া অর্ডার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনে। কিন্তু পিতা পুত্রে একত্র ব্যবসা করিলে কি হয়, উহার বিস্তৃতি সমভাবে থাকায় উহা হইতে এমন বিশেষ কিছু আয় বৃদ্ধি হইল না। বয়স বৃদ্ধির সহিত সখারামের আজন্মপালিত অম্ল-রোগটা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার চক্ষুর দোষ, শিরঃপীড়া ইত্যাদি নানা রোগ প্রবলবেগে আসিয়া তাহাকে বিশেষ কাবু করিয়া ফেলিতেছিল। কালু প্রাণপণে মেহনৎ করিয়া তাহার বাপের কষ্ট কতকটা লাঘব করিত মাত্র।

পূজার সময় জমিদারবাবুর বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া কালু তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ বাবা, বামুন-কায়েতরা আমাদের ছোটলোক বলে কেন?' এই কেনর উত্তর সখারাম কোনদিনই ভাবিয়া দেখে নাই। হঠাৎ উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই বলিল - 'টাকা না থাক্‌লেই ছোটলোক হয়। আমাদের পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই, আমরা ছোটলোক হব না ত,—বামুন-কায়েত যাদের গোলাভরা ধান, সিন্দুকভরা টাকা, পেঁটরাভরা কাপড় তারা ছোটলোক হবে?' কালু বরাবরই তার বাবাকে বিশেষ ভক্তি করিত; তাহার পিতা যে সবজান্তা ইহাই ছিল তাহার ধারণা। কাজেই পিতৃদত্ত এই বিবৃতি বিনাদ্বিধায় মানিয়া লইল।

এখন হইতে কালু প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল, তাহাকে পয়সা উপার্জ্জন করিতে হইবেই। নিকটবর্ত্তী একটা হাট হইতে সস্তায় চামড়া কিনিয়া আনিয়া কোন অর্ডার না লইয়া জুতা তৈয়ারী করিয়া চলিল। এই সমস্ত জুতা বাজারে চালাইবার জন্য অর্ডারি জুতা অপেক্ষা বেশ খানিকটা মূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়ায় প্রথমে

ভদ্রলোকগণ যাঁহারা সারাবৎসরে মাত্র এক জোড়া জুতাই ব্যবহার করিতেন, এখন দুই জোড়া জুতা না রাখিলে তাঁহাদের শীলতার হানি হয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। আবার যাহারা কখনই জুতা পরিত না, সস্তায় জুতা পাইয়া তাহারাও জুতা পরিতে শিখিল, কাজেই কালুর ব্যবসা জোর চলিল। কার্য্যবৃদ্ধি হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে মুচিদিগকে মাহিনা করিয়া আনিয়া গ্রামের মধ্যে কালু জুতার একটী ছোটখাট কারখানা খুলিল।

খরিদ্দার বৃদ্ধির সহিত ব্যবসায় প্রসারিত হওয়ায় আয়ও যথাসম্ভব বাড়িয়া চলিল। মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হওয়ায় কালু কালপূজা করিয়া তদুপলক্ষে গ্রামস্থ তাবৎ ব্যক্তিকেই একদিন ভূরি-ভোজন করাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে সখারাম চামার পরকালে সদ্গতির লোভে সহজেই সম্মতি দিল। মনের মত প্রতিমা গড়াইবার জন্য গ্রামের শ্রেষ্ঠ কুমারকে অর্ডার দিল। গ্রামের ঢুলিদিগকে যথেষ্ট প্রলোভন দেখাইয়া পূজার দুইদিন বাজনা বাজাইবার জন্য বায়না দিল। চারখানা গ্রাম দূরে একঘর মুচির বামুন বাস করিত। কালু স্বয়ং গিয়া তাহাকে পূজা ও নিমন্ত্রণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিল। মোড়লদের পুকুর দুইটী জমা লইয়া জেলে ডাকাইয়া যথেষ্ট মাছ ধরিবার বন্দোবস্ত করিল। কলিকাতা হইতে রাবড়ী ও ভাল সন্দেশ আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। গ্রামের মুদিকে অগ্রিম টাকা দিয়া ভাল ঘী ও ময়দার জন্য বরাত করিয়া দিল। গয়লাপাড়ায় গয়লাদের টাকা দাদন দিয়া প্রচুর দই ও ক্ষীরের জন্য তাগিদ দিয়া রাখিল।

যথাসময়ে সেই মুচির পুরোহিত কালুর পক্ষে গ্রামের তাবৎ ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। কালু নিজে অনুন্নত সমস্ত জাতিদের বাড়ী বাড়ী গিয়া কালীপূজার দিন প্রতিমাদি দেখিবার জন্য আহ্বান করিয়া আসিল। এ বৎসর কার্ত্তিক মাস পড়িতেই কালীপূজা হওয়ায় এখন অবধি তেমন শীতের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, বেলাটা তেমন ছোটও হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে জয়ঢাকে কাটী পড়িতেই কালীপূজার জন্য যে বিস্তৃত সামিয়ানা তৈয়ার হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লোক আসিতে সুরু হইয়া গেল। কালু চামারের ঐশ্বর্য্যের কথা অল্পবিস্তর অনেকেই শুনিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পাড়ার ব্রাহ্মণেরা না কি শুনিয়াছিলেন যে, কালু মুচি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে একটী করিয়া মোহর দক্ষিণা দিবে। মুচির বাড়ী ভোজন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার হইলেও, ছাঁদা বাঁধিতে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। কেন না কাঞ্চনে তাবৎ অশুদ্ধ পদার্থ শুদ্ধ হইয়া যায়। এই কাঞ্চন প্রত্যাশায় বামুন পাড়ার দু'-একজন ছাড়া প্রায় সকলেই একে একে আসিয়া যোগদান করিল। বামুনেরা যখন যাইতেছে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কায়স্থদেরও অনেকে আসিল। এই সমস্ত বামুন-কায়েতের মাতব্বরগণ কেহ বা কোমরে চাদর জড়াইয়া কেহ বা উহা মাথায় বাঁধিয়া খুব মুরব্বী-চালে এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নবশাকগণ প্রথমে যাইবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বামুন-কায়েতের দল নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিতেছে দেখিয়া তাহাদের দুই-একজন সাহস করিতেই অনেকে যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল।

যথাসময়ে কালীপূজা হইয়া গেল। সে বৎসর দুর্গাপূজায় জমিদারবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া কালু দেখিয়া আসিয়াছিল যে, একেবারে ছাগল কুকুরের ন্যায় একধারে ছোটলোকদের ভোজন করিবার জন্য আসন নির্দ্দেশ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিল যে, ভদ্রজাতিগুলার ভুক্তাংশ আনিয়া তাহাদিগকে পরিবেশন করা হয়।

এই সনাতনী প্রথাটা আবহমান কাল প্রচলিত থাকিলেও কালুর নিকট কেমন বেয়াড়া বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই জন্যই বাড়ী আসিয়াই সে তাহার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাদের 'ছোটলোক' বলা হয় কেন? এবার কালু তাহার কালীপূজার নিমন্ত্রণে অনুন্নত ব্যক্তিগুলাকে ভদ্রলোকদের মত ভাল আসন দিয়া এবং তাহাদের ভোজ্য ভাল ভাল খাবার ইত্যাদি খাওয়াইয়াছিল। ভদ্রলোকগণ কালুর বাড়ীতে পংক্তিভোজন করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় বামুন দ্বারা তাহাদের ছাঁদা বাঁধিয়া দিয়া বিদায় করিতে হইয়াছিল। বিদায় করিবার সময় কালু ব্রাহ্মণদিগকে মাত্র দুই আনা দক্ষিণা দিয়াছিল।

কাজেই কালু যাহা আশা করিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। ভদ্রলোকের দল যদিও বিনা আপত্তিতে ছাঁদাটা বাড়ী অবধি বহন করিয়া লইয়া গেল, কিন্তু গ্রামময় কালুর স্পর্দ্ধার কথাটা বেশ জমকালোভাবেই রটাইয়া দিল। বেটা মুচী হইয়া গ্রামের কুলীনদের নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করা এবং বামুনদের মাত্র দু'আনা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া এই অপরাধে তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্র করা আরম্ভ করিল। ভদ্দর লোকদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের চক্রান্ত ফলে কালু ক্রমশঃ 'একঘরে' হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার তৈয়ারী জুতা 'বয়কট' হইয়া যাওয়ায় ব্যবসায় মন্দা পড়িল। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কালু একদিন তাহার বাবাকে বলিল, 'আচ্ছা কই, পয়সা হ'লে ত ভদ্র হওয়া যায় না বাবা! এখন ত আমাদের কিছু পয়সা হয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকগুলো তাদের দলে আমাদের তুলে নেওয়া দূরে থাক, আমাদের জাতের মধ্যেও আমাদের কোণঠাসা 'করে' একঘরে করেছে।' ব্যাপারটা সখারামের কর্ণেও কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছিল। কাজেই একটুখানি থমকাইয়া বলিল, 'কি জানিস কালু, তুই যে টাকাটা উপায় কচ্ছিস, ভদ্রলোক হ'তে গেলে ওগুলো যথেষ্ট নয়। আরও বড়লোক হয়ে বামুনদের এক-একখানা মোহর দিতে পারিস্ ত ওরা তোকে ওদের দলে টেনে নেবে।' কালু পিতার কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম না করিলেও, আরও বড়লোক হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে কালু কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিকটবর্ত্তী একটা সহরে গিয়া জুতার কারখানা খুলিল। কালুর ব্যবসাবুদ্ধি খুবই স্বাভাবিক ছিল। সেই জন্য তাহার বর্ত্তমান কারবার পূর্ব্বাপেক্ষ জোর চলিল। যথেষ্ট অর্থাগম হইতে থাকায় কালু তাহার গ্রামের বাড়ীখানি ইষ্টক দিয়া নির্ম্মাণ করাইয়া লইল, এবং সামর্থে যতটা কুলায় জমিজমা, বাগান-পুকুর ইত্যাদি খরিদ করিল। গ্রামের মোড়লরা কালুর উন্নতি হইতেছে দেখিয়া তাহাকে অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণও বৈকালীর মধ্যে কাঞ্চন পাইয়া পূর্ব্ব বৈরীভাব ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ফলকথা দুই-এক বৎসরের মধ্যেই গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই কালুর বিশেষ ভক্ত হইয়া উঠিল। এই মনোভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কালু স্থির করিল আগামী বৎসরে সে দুর্গোৎসব করিবে। দুর্গাপূজা করা জমিদারবাবুর একচেটিয়া অধিকার জানিয়া তাঁহার অনুমতি লইবার জন্য তাঁহার নিকট কালু গমন করিলে যথেষ্ট অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন সে ধাত্রীপূজা করিবে স্থির করিল।

যথাসময়ে ধাত্রী পূজা হইয়া গেল। অতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসমূহ কলিকাতা হইতে আনাইয়া ভদ্রলোকেদের বাড়ী বাড়ী বিলি করাইল।

এবার কালু ভদ্রলোকদিগকে তাহার বাড়ীতে আসিয়া ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করে নাই। ছোটলোকদিগকে সাদরে আনয়ন করিয়া ভূরিভোজন করাইয়াছিল। এবারকার এই ব্যাপারে আপামর সকলেই কালুর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল। ভদ্রলোকদের দল শুধু বলিলেন যে,'ছোটলোক বেটার বুদ্ধি হয়েছে ; লক্ষ্মী-শ্রী হ'লে সকলেরই বুদ্ধি খোলে।'

মধ্যাহ্নে আহার করিবার পর সখারাম যখন ধুমপান করিতেছিল, তখন কালু তাহার নিকট আসিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পর বলিল, 'বাবা, এত টাকা উপায় কল্লাম, কিন্তু বামুন-কায়েতরা ত ছোটলোক বল্তে ছাড়ে না।' তামাকের নলটায় একটা জোর টান দিয়া সখারাম খুব বিজ্ঞের মত বলিল—'ব্যাঙ্কে চেক না কাটতে পারলে আজকালকার দিনে কেউই ভদ্রলোক হ'তে পারে না। তোর টাকা হ'য়েছে স্বীকার করি, কিন্তু এসব ত কিছুই নেই।' কালু প্রতিজ্ঞা করিল কল্যই সে কলিকাতায় গমন করিবে এবং সেইখানে তাহার জুতার কারখানাটা স্থানান্তরিত করিবে।

চিন্তা অনুযায়ী কার্য্য হইয়া গেল। কালু মিস্ত্রীর সু ও পম্পসু কলিকাতা সহরে ফ্যাসনে পরিণত হইয়া যাওয়ায় চারি বৎসরের মধ্যেই কালু কলিকাতা সহরে এক প্রকাণ্ড বাড়ী একখানা সুদৃশ্য মোটর ও ব্যাঙ্কে টাকার আণ্ডিল করিয়া ফলিল। এ বৎসর স্থির করিল যে, জমিদারবাবুর হুকুম না লইয়া গ্রামের বাড়ীতে দুর্গোৎসব করিবে। মতলব অনুযায়ী কাজ হইয়া গেল। গ্রামের তাবৎ ব্যক্তিকেই সহরের কায়দায় পত্র দিয়া কালু নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই নেহাৎ প্রত্যাশিতভাবে কালুর গৃহে পদধূলি দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া গেল। কলিকাতা হইতে আনীত থিয়েটার-বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিবার জন্য যেরূপ বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য অভ্যাগতদের সংখ্যাও তাহাদের অপেক্ষা কিছু কম ছিল না। মন্তব্যটা শুনিবার জন্য কালু গুপ্তচর হইয়া শুনিল যে, সকলেই বলে, কালু মুচি এখন কালু মিস্ত্রী হইয়াছে। কালু কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ক্রমশঃ ব্যবসাবৃদ্ধির সহিত কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় তাহাকে বাধ্য হইয়া একটী অফিস খুলিতে হইল। নূতন অফিসের জন্য বিবিধ সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য অনেকগুলি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিল। লোকজন বাহাল করিয়া অফিসের কাজ পূরাদমে চলিয়াছে, এমন সময় একদিন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান কালুর নিকট আসিয়া একটী দীর্ঘ নমস্কার করিয়া একটী কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য কাতর আবেদন জানাইল। লোকের কোন প্রয়োজন না থাকায় কালু বলিতে বাধ্য হইল যে, কোন কর্ম্মখালি তাহার অফিসে নাই। লোকটী তখন যোড়হাত করিয়া কালুকে বলিল, 'বাবু আপনারা বড়লোক ও ভদ্রলোক ; আমি অতি দীনহীন, অত্যন্ত গরীব, অতিক্ষুদ্র। আপনার লোকের অভাব না থাক্তে পারে, কিন্তু আপনার মহৎ হৃদয়ের একটু করুণা পাব বলেই এখানে এসেছি।' কালুর মুখখানা ছলছল করিয়া উঠিল। সে কিছু উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। আগন্তুক তখন নেহাৎ কাতরভাবে কালুর পা দু'টা জড়াইয়া ধরিতে যাইবে, এমন সময় কালু তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'ঠাকুর করেন কি, আমি জাতে মুচি। যা' হোক, কর্ম্মে আপনাকে বাহাল কল্লাম।'

ব্রাহ্মণ খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'আপনি নরশ্রেষ্ঠ, আমি আপনাকে নমস্কার করি।'

—মাটির মায়া—

শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য, বি এ

দৌড়াইতে দৌড়াইতে আশুতোষ বিল্ডিংয়ে যাইয়া দেখি, একজন খ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুর স্মৃতি-দিবস উপলক্ষে কলেজ ছুটি হইয়া গিয়াছে। ছুটি পাইয়াও ক্ষুব্ধ হইলাম; কারণ, এই চৈত্রের উত্তপ্ত পিচের রাস্তা দিয়া আবার বাড়ীতে ফিরিতে হইবে। কাছে কোন বন্ধুর মেসে যাইব কি না ভাবিলাম, কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপে বাড়ীর রাস্তাই ধরিলাম।

রাস্তায় চলিতে চলিতে নিবিষ্টমনে চিন্তা করাটা বাঙ্গালীর বিশেষত্ব—কোন সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম। কথাটা আমার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। অতিশয় সরু পরিসর মাঝে লোক চলাচল কম হয় বলিয়াও বটে এবং সোজা রাস্তা বলিয়াও বটে সংকীর্ণ গলিটার মাঝে আসিয়া পড়িলাম।

পিছন হইতে কে ডাকিল - কেষ্টো · কেষ্টো… …কেষ্টো।

পর পর তিনটী ডাক,—এবং আমার শিশু কালের ডাক নাম। বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রাস্তায় দ্বিতীয় লোক নাই। গৌরবর্ণা বৃদ্ধা দরজায় দাঁড়াইয়া আমার দিকেই চাহিয়া আছেন। তাহার সস্নেহ-দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিলাম, আমাকেই ডাকিতেছেন। নিকটবর্ত্তী হইলে বলিলেন,—তুমি এ পথে যাও দেখেছি, আমাকে দেখেছ, কিন্তু চিন্‌তে পার নি। ডাক্‌বো ভাবি, কিন্তু সাহস পাই না।

আমি বিস্মিত হইলাম, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই বলিয়া তাঁহার এ স্নেহসিক্ত কথা কয়টিকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার অভ্যর্থনায় ভিতরে গিয়া চেয়ারটীতে বসিলাম। একটি কঙ্কালসার রোগিনী খাটের উপর শুইয়া—ঘরে রোগীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য।

বৃদ্ধাটি বলিলেন—ফণী, পদ্ম, টেবি কোথায়?

এগুলি আমাদের ভাই-বোনের নাম বটে, কিন্তু এখন এগুলি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। আমি যথাযথ উত্তর দিলাম।

বসন্তকুমারী আমার মায়ের নাম। মায়ের বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি হইয়াছে। বসন্তকুমারী নাম বিলুপ্ত হইয়া মা এখন মা,—না হয় অমুকের মা। যিনি সেই মায়ের নাম জানেন, তিনি যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিস্ময় বাড়তে লাগিল, কিন্তু যিনি আমার মায়ের নাম ধরিয়া কুশল-প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহার কাছে তাঁহার পরিচয় কি করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়!

তিনি আরও অনেক প্রশ্ন শুধাইলেন, আমিও পরিচিতের মত উত্তর দিয়া গেলাম। অবশেষে তিনি অভিযোগ করিলেন—ষোড়শী সেদিন দুঃখ কচ্ছিল, তুমি তাকে চিন্‌তেও পার নি বলে। দাঁড়াও তাকে ডাকি।

কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—ষোড়শী ছুটতে ছুটতে আস্‌ছে।

আমি ভীত হইলাম। সে ষোড়শী যেই হউক, ছুটিতে ছুটিতে আসিলে তাহার সহিত তাল রাখিয়া আলাপ করা চাই ত! অতীতের পৃষ্ঠাগুলি ত্বরিতে উল্টাইয়া দেখিলাম, তাহাতে কোথায়ও কোন ষোড়শী নাই। আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম—কে এ ষোড়শী! আর

তাহার আমারই জন্য ছুটিতে ছুটিতে আসিবার কি প্রয়োজন!

একটি বছর দেড়েকের শিশু কোলে করিয়া বাইশ কি তেইশ বছরের একটি মহিলা ঘরের মাঝে ঢুকিয়াই বলিলেন—কি কেষ্টো দা', আচ্ছা, সেদিন চিন্‌লে না কেন বল ত?

পথে কোন মেয়েকে দেখিলে তাহার দিকে তাকানোটা খুব দোষাবহ কাজ বলিয়া স্বীকার করি না তাই সেটা নির্ব্বিবাদে করিয়াও থাকি। তাহার দিকে চাহিয়া গিয়াছি বলিলে আশ্চর্য্য হই নাই। আমি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত জবাব দিলাম—আমার ভয়ঙ্কর বদ্‌অভ্যাস পথ চ'লতে চ'লতে ছাই মাটি ভাবি, কাজেই যা' দেখি, তা' সত্যি সত্যিই দেখি না।

ছেলেটিকে ঘরের মাঝে ছাড়িয়া দিয়া সে জল-চৌকিটায় বসিল। ষোড়শী খুব সুন্দরী নয়, কিন্তু তাহার দেহসৌষ্ঠবের মাঝে এমন একটী কমনীয়তা আছে, যাহা চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলাম, কিন্তু ওই মুখ-খানিকে জীবনের অতীত দিবসের মাঝে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। বৃদ্ধাটি বলিলেন – ও ষোড়শীর ছেলে।

ছেলেটি আমারই পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়া আসিয়াছিল, ভদ্রতার খাতিরে কোলে তুলিয়া লইলাম। ষোড়শী কহিল—তোমার চাহনি দেখে তাই মনে হয়েছিল কি যেন ভাবছ। আমাকে ভাল করে' দেখলে নিশ্চয়ই চিন্‌তে—না?

ষোড়শীর অসঙ্কোচ তুমি বলাটাও আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। একজন অপরিচিতা মহিলাকে কি করিয়া তুমি বলা যায়! বলিলাম—নিশ্চয়ই।

কিন্তু তখনও চিনিয়া উঠিতে পারি নাই কে এ মহিলা!

—আচ্ছা, মাসিমা কেমন আছেন?

মাসিমা কে ভাবিয়া পাইলাম না, তবে আন্দাজ করিলাম আমারই মা। বলিলাম—এমনই।

—ফণী দা'র বে হ'য়েছে?

—হুঁ।

—টেবির?

—হাঁ।

—টুনির?

—হাঁ।

—তোমার?

—না।

—বিয়ে কর নি? তুমি ত আমার চেয়ে ছ'মাসের বড়, তোমার বয়েস তা' হ'লে চব্বিশ হ'য়েছে। আচ্ছা দিদিমা, আমার শ্বশুরবাড়ীর সেই মেয়েটি,—শান্তির সঙ্গে বে' হ'লে কেমন হয়?

দিদিমা বলিলেন—বেশ হয়।

যথেষ্ট চেষ্টার পরে বলিলাম – তুমি ত বিয়ে ঠিক করে' ফেলছ দেখছি, কিন্তু বরটী এমন গো-বেচারী যে, সে নিজেই চল্‌তে পারে না।

ষোড়শী যেন আকাশ হইতে পড়িল! চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—গো-বেচারী! এই দ্যাখো,—তুমি ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে খেল্‌তে মেরেছিলে, সে দাগ এখনও আমার যায় নি। বিয়ের সাতদিন আগে এমন মারও দিতে হয়!

তাহার ললাটে যেখানে সিঁন্দূর রেখা শেষ হইয়াছে, তাহারই নীচে দেখিলাম সত্যই একটি দাগ রহিয়াছে। ঘরের মাঝে আর একটি যুবতী মহিলা প্রবেশ করিলেন। ষোড়শী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল – দ্যাখ ত একে চিনিস না কি!

তিনি বলিলেন—না।

ষোড়শী তাহার স্মরণশক্তিকে কটাক্ষ করিয়া কহিল—ধ্যেৎ—কেষ্টো দা'।

বাধ্য হইয়া এ মহিলাটিকেও তুমি বলিতে

হইল ; কারণ, চেহারার সাদৃশ্যে চিনিয়াছিলাম এ ষোড়শীর ভগ্নী। ষোড়শীকে যখন তুমি বলিয়াছি, তখন সামঞ্জস্যের খাতিরে বলিলাম—ওরা তখন খুবই ছোট ছিল, চিন্‌বে কি করে' !

ষোড়শী আমাকে অনুমোদন করিল। বুঝিলাম, ঢিল ঠিকস্থানে লাগিয়াছে। ষোড়শী কহিল—ঘেণ্ণা যা', দাদার জন্যে পাণ নিয়ে আয়।

ঘেণ্ণা নামটি মস্তিষ্কের এমন স্থানে গিয়া আঘাত করিল যে, অত তের সমস্ত স্মৃতি একসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। সহসা আনন্দে এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম যে, কি বলিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার পিতার মৃত্যুর কথা একটু একটু মনে আছে। বাংলার একটি ক্ষুদ্র সহরে বাবা উকিল ছিলেন এবং পাশের বাড়ীতে বীরেশ্বরবাবু নামে এক মোক্তার ছিলেন। তিনিই ষোড়শীর পিতা। তাঁহার পর পর ছয়টি কন্যা সন্তান হইয়াছিল, তাহারই শেষটি একেবারে ঘৃণা ধরাইয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল ঘেণ্ণা। বাবার মৃত্যু আজ তের বছর আগেকার কথা। তাহার পরেই আমরা বাড়ীতে চলিয়া আসি, এবং এই দীর্ঘ তের বছরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মার মামাবাড়ী ছিল এই বৃদ্ধার শ্বশুরালয়ের গ্রামে—ফলে তঁাহাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ ছিল। এবং ষোড়শীর মাকে বীরেশ্বরবাবুর সহিত বিবাহ দিয়া তিনি ওই শহরে আসিয়াছিলেন আর যান নাই। ভাবিয়া দেখিলাম ইঁহাদের সহিত মায়ের পরিচয় একদিন-দু'দিনের নয়, দীর্ঘ পঞ্চান্ন বৎসর ধরিয়া এবং অদর্শন এই দীর্ঘ তের বৎসর ধরিয়া।

ষোড়শীকে কহিলাম—ষোড়শী, পূর্ণবাবুর পুকুরে যেদিন তোকে জলে চুবিয়ে ধরেছিলাম, সেদিনের কথা মনে আছে ?

ষোড়শী হাসিয়া কহিল—তা' আবার নেই। তিনদিন জ্বর হ'য়েছিল আমার। ..আচ্ছা, তুমি আজকালও কি তেমনি অশান্ত আছ না কি ?

—না,—অশান্ত হওয়ার শক্তি এখন আর আমার নেই, তাই এখন শান্ত।

ঘেণ্ণা পাণ লইয়া আসিলে কহিলাম—ওকে সেই পাঁচ বছরের খুকীটি যখন দেখেছি তখন ঘেণ্ণা বলা চলতো, কিন্তু এখন ডাকতে লজ্জা করে। ভাল নামটি কি ?

ষোড়শী কহিল—অনিমা।

রোগিণীটি ষোড়শীর মা—আমাদের সম্পর্কে মাসিমা। তাঁহার কুশল প্রশ্ন করিলাম। সমস্ত শহরটিতে এই মহিলার রূপের খ্যাতি ছিল তা' আমার এখনও মনে পড়ে, কিন্তু তাহার চিহ্ন আজ আর নাই। শীর্ণ পাণ্ডুর দেহ,—প্রশ্ন করিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম, মাসিমাকে কালব্যাধি যক্ষ্মারোগে ধরিয়াছে, কিন্তু দিদিমা, ষোড়শী কেহই তাহা জানেন না। আমি বাড়ীর ঠিকানা দিয়া, এবং কাল অন্ততঃ ষোড়শীকে আমার মায়ের কাছে লইয়া আসব প্রতিশ্রুতি দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথ চলিতে চলিতে ভাবিলাম—

যে শহরটির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, তাহার মাটিতেই আমার জন্ম। সেই শহরের ধূলা মাটি আমি, ষোড়শী, এমন আরও অনেকে একসঙ্গে অঙ্গে মাখিয়া বড় হইয়াছিলাম। একাদশ বৎসর বয়সে আমার পিতার স্বর্গারোহণের পরে বাড়ী ফিরিয়া আসি, ষোড়শী শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যায়। ছোটবেলায় আমাকে যাহারা চিনিত, এখন চিনিতে পারে না,—আমার চেহারা না কি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই নারীজাতির,—দিদিমা ও ষোড়শী আমাকে অবর্থভাবে চিনিয়াছেন এবং অসঙ্কোচে জনাকীর্ণ কলিকাতার রাস্তা

হইতে ডাকিয়া লইয়াছেন। বিস্মৃতির কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে বাল্যের একটু স্মৃতি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—মনটা উন্মনা হইয়া গেল।

বাড়ীতে ফিরিয়া মাকে সমস্ত বলিলে, মা তাঁহার শেষজীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশায় ম্লান মুখখানিতে আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—অর্দ্ধশতাব্দী আগেকার কথা। ওই দিদিমা যখন নববধূ হইয়া প্রথম আসিলেন, তখন মায়ের বিবাহ হয় নাই, মামাবাড়ী বেড়াইতে যাইয়া এই বধূটির সহিত কেমন করিয়া ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল।···তারপর যেদিন সীথির সিঁদুর মুছিয়া তিরিশ বৎসরের পরিচিত শহরটি, আর তার বুকের অতি পরিচিত লোকগুলিকে ছাড়িয়া আসিতে হইল, সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়াই হয় ত মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—কাল তাদের নিয়ে আসিস্, গরীবের মত আছি, তা'তে তাদের কাছে আমার লজ্জা নেই।

একটি দোতালা বাড়ীর নীচে দু'টি অনতি অন্ধকার ঘর লইয়া আমি, মা ও দাদা থাকিতাম। বাবা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সবই ফুরাইয়া গিয়াছিল। মায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া দাদা আই এ পাশ করে। জ্ঞাতির অত্যাচারে কলিকাতার এই অন্ধকারে আশ্রয় লইতে হয়—অনশনে, অর্দ্ধাশনে, দুঃখ-দুর্দ্দশার এই নয়টি বৎসরের ইতিহাস সুদীর্ঘ।

পরদিন দুপুরে পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখি ষোড়শী আমার বুকের উপর হাত দিয়া কি যেন দেখিতেছে। আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলাম—ও, তোমরা এসে গেছ!

—হ্যাঁ, তোমার অপেক্ষা কর্‌তে পারি নি।···কিন্তু, কেবল টাকার অভাবে না খেয়ে খেয়ে তোমার এই অসুখটা হ'য়েছে।

—কি অসুখ দেখ্‌লে তুমি?

—প্লুরিসি—আমি মাসিমার কাছে শুন্‌ছিলাম। আমার বুকখানা সত্যিই ফেটে যাচ্ছিল। না খেয়ে এত কষ্ট করে' পড়েছ, কেবল টাকার অভাবে তুমি মরতে চলেছ!

কথাটা সত্যি। আজ একবছর প্লুরিসিতে ভুগিতেছিলাম, কিন্তু এই ব্যাধির চিকিৎসায় যে ঔষধ-পথ্য এবং সমুদ্রের বায়ু প্রয়োজন তাহা জুটিয়া উঠে নাই, তাই শেষ ফলাফল জানিয়াও মা এক চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই করিতে পারেন নাই। আমি কহিলাম—এমন কতলোক টাকার অভাবে মরে' যাচ্ছে!

ষোড়শীর চোখ দু'টি সজল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাণপণে উদ্গত ক্রন্দন দমন করিতেছিল, কিন্তু আর না পারিয়া চোখের জল মুছিয়া লইয়া কহিল তুমি এমনভাবে, এই চব্বিশ বছর বয়সে মরে' যাবে, এ আমার সহ্য হয় না।—উঃ, তোমার সঙ্গে যদি আর একটা বছর আগে দেখা হ'ত!

আমি হাসিয়া কহিলাম—যা' হয় নি, তা' নিয়ে অনুশোচনা করে' লাভ নেই। যারা গরীব হ'য়ে জন্মায়, তাদের গরীবের মত মরতে শেখাও দরকার।

—তুমি ত গরীব ছিলে না। মেসোমশায়ই ত উকীলদের মধ্যে বেশী টাকা পেতেন।

—কিন্তু তিনি দান করতেন তার চেয়েও বেশী।

ষোড়শী উঠিয়া যাইতেছিল, আমি বলিলাম—বসো, আমার খবর ত সবই জেনে নিলে, তোমার খবর কিছুই ত জানালে না।

ষোড়শী কহিল—বাঙালীর ঘরের সকল বৌয়ের খবরই এক, তবে খেতে-পরতে কষ্ট পাই নি কোনদিন।

—তিনি কি করেন ?

—ডাক্তার, এখানেই প্র্যাক্‌টিস্ করছেন আজকাল।

ঘটনাবহুল একটি মাস চলিয়া গেল।

মাসিমা চিরদিনের মতই বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলাম। ষোড়শী যখন কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মা চলে' গেলেন,—তখন প্রথমদিনের মতই হইয়া পড়িয়াছিলাম। কি বলিয়া মাতৃহীনাকে সান্ত্বনা দিতে হয় সে অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই দার্শনিকের মত বলিয়াছিলাম—সকলেই যাবে, কেউ থাক্‌বে না। ষোড়শী শান্ত হইয়াছিল কি না জানি না।

এই একমাসের পুনঃ পরিচয়ে বাল্যকালের সখীটিকে ফিরাইয়া পাইয়াছিলাম, অবিকৃত ভাবেই। শৈশবে ষোড়শী আমবাগানে পুকুর-ঘাটে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ যৌবনের শুষ্ক কুঞ্জেও সে সহচরী হইয়া উঠিয়াছে। কাজ ত বাড়িয়াছে,—তাহার মিনতির অসম্মান করিয়া একাকী লক্ষ্যহারার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি না, সঙ্গে করিয়া লইতে হয়। ষোড়শীর স্বামীর সহিতও পরিচয় হইয়াছিল—এই নারী-টির স্নেহ-করুণ অন্তরের কাছে তিনি এমন বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাহার কোন কাজেই বাধা দেওয়ার শক্তি তাঁহার একান্তই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ষোড়শী সেদিন জোর করিয়াই আমাকে তাহার স্বামীর নিকট লইয়া গেল। তাঁহার নাম রমেশ। চা খাইতে খাইতে তিনি হাসিয়া বলিলেন,—দেখুন কেষ্ট দা', আমার ওপর কি গুরুতর আদেশ হয়েছে তা' বোধ হয় জানেন না।

আদেশ কাহার তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না। বলিলাম—না।

আপনার ভগ্নী ত আল্টিমেটাম দিয়েছেন যে, আপনার সমস্ত অসুখ চিকিৎসা করে' সুস্থ এবং সবল না করে' দিতে পারলে, আমার খেতাবটা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তা' আপনাকে জামাটা খুল্‌তে হবে একবার।

রমেশবাবু ষ্টেথিস্কোপ লাগাইয়া মুখখানা ক্রমেই গম্ভীর করিয়া তুলিলেন, ক্ষণিক পরে বলি-লেন—বুঝেচি।

ষোড়শী রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিল; কহিল—ভাল করে' দ্যাখো।

আমি হেসে বল্লুম—ভাল করেই দেখে বুঝেচেন। ওষুধের প্রেস্‌কিপশান আমিই করে' দি—ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকসন, সি সাইডে বাস, কডলিভার সেবন এবং প্রটিনবহুল খাদ্য পথ্য।

রমেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—আপনি সব জানেন দেখছি।

বিনীতকণ্ঠে কহিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ষোড়শী এত হাসির মাঝে শুধু ম্লানমুখে কহিল—তা' হ'লে সত্যি!

আর কয়েকদিন পরে একদিন নির্জ্জন মধ্যাহ্নে ষোড়শী আসিয়া কহিল—কেষ্ট দা', সব ঠিক হ'য়ে গেছে, এখন তোমার মত পেলেই হয়।

—কি ঠিক হ'ল ?

—উনি বল্‌লেন ওষুধে এ সারে না—পথ্য চাই। কিন্তু আমি কিছু দিতে চাইলেও ত মাসিমাকে অপমান করা হবে—না দিলে তুমি বাঁচবে না। আমি ঠিক করেছি আমারও শরীর ভাল না, মনও খারাপ,—পুরী যাব। তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে।

আমি বলিলাম—যে মরবেই, তার পক্ষে মরার আগে অযথা ঋণ বাড়ানোর কোন আব-শ্যক আছে কি ?

মিনতিভরা দৃষ্টি দিয়ে সে শুধু কহিল—

তোমাকে যেতেই হবে যে,—আমি এত করে' বলছি।

জীবনের প্রারম্ভেই অন্তরে উচ্চবাসনা, উচ্চ-আদর্শের অনুপ্রেরণা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম যে, খুব বেশী হইলেও পাঁচ বৎসরের বেশী জীবন বহন করা চলিবে না, সেই দিন হইতেই মন এমনি শান্ত হইয়া গিয়াছে যে, ইহাতে বাসনার ঝড় একেবারেই নাই—কাজেই ষোড়শীর মিনতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা হয় নাই। তাহার হাত ধরিয়া সত্য-সত্যই একদিন পুরী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মা যাত্রাকালে শুধু বলিয়াছিলেন,—ষোড়শী, কেষ্টোকে কাছছাড়া করতে ভয় হয়, কিন্তু তোর হাতে দিতে আমার ভয় নেই—যদি জীবন ফিরিয়ে দিতে পারিস্, তবে—মায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আমার বুকের বেদনার সঙ্গে ষোড়শী নিজে প্রবল বিক্রমে ধস্তাধস্তি সুরু করিয়া দিল। নিয়মিত ঔষধ-পথ্য এবং সমুদ্রাগত বায়ুসেবন চলিতে লাগিল। ষোড়শী বৈকালে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রতীরে লইয়া আসে এবং সহস্রপ্রকারে আমাকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করে, সে কথা আমিও বেশ বুঝিতে পারি। রমেশবাবু পুত্র লইয়া অন্যত্র বেড়াইয়া বেড়ান।

সেদিন সূর্য্যাস্তের পরেই পূবের আকাশে থালার মত চন্দ্রোদয় হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমুদ্রের সহস্র তরঙ্গের মাথায় তরল জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। ষোড়শীর কপোলের কাছে কয়েক গাছি কবরীভ্রষ্ট কুন্তল বাতাসে দুলিতেছিল, সমস্ত মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে, ষোড়শী বালির উপর আমারই পাশে বসিয়া। তাহার মুখখানি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম,—ষোড়শী, তুই সত্যিই সুন্দরী।

ষোড়শী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল,—কিন্তু এই সুন্দর মুখের জোরে কোন কাজই ত উদ্ধার করতে পারলুম না!

—রমেশবাবুকে ত ভেড়া করেছ, অধিক আরও কিছু চাই?

—যাও, তুমি কি আমাকে খুকী পেলে যে, নির্ব্বিচারে যা'-তা' বলে' যাবে। এখন আর পূর্ণবাবুর পুকুরে সাঁতার দিতে যাই নে!

আমি হাসিলাম, ষোড়শীও হাসিল। ক্ষণিক চুপ করিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি তাকে শুধাইলাম—আচ্ছা, আমার জন্যে এত করে' তোর পুরী আসা, আর দিনরাত্রি আমার জন্যে এত শ্রম করার তোর কি দরকার ছিল!

ষোড়শী কহিল—যার কাজ থাকে না, তার ঘাড়ে নষ্টবুদ্ধি চাপে, আমারও তাই হ'য়েছে। নইলে পরের জন্যে এমন কেউ করে!

—আচ্ছা, তুমি রমেশবাবুকে ফেলে আমাকে নিয়ে রোজ এসো, এতে তিনি কিছু বলেন না?

—বলেন বৈকি! বলেন যে, এই লোকটীকে সত্যিই আমরা যদি ভাল করে' তুলতে পারি, তবে সে আমাদের কতবড় সৌভাগ্য!—এবং ভালও হ'য়ে উঠেছে।

হাসিয়া কহিলাম—তুমি কি মনে কর এ অসুখ সারবে?

—নিশ্চয় দাদা, সেরে ত গেছে, এবার কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে হবে।

—রমেশবাবু যাই বলুন না কেন, বিয়েতে তিনি মত দেবেন না—কারণ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে লেখা আছে।

—না সে বলেছে দাদা।

এমনি আলোচনায় সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিলাম। নিত্য সন্ধ্যাটী আমাদের এমনি আলাপ-আলোচনায়ই অতিবাহিত হয়।

সকাল আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাইতাম। ষোড়শী অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম ও মাখন-রুটি লইয়া ভোর হইতেই আনাগোনা করিত, কিন্তু কোনদিন ডাকিয়া ঘুম ভাঙায় নাই। সেদিন ডাকিলে আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়া বসিলাম, আরও বিস্ময়ের বিষয় একটি কুমারী পাশের চেয়ারটায় বসিয়া। ষোড়শী কহিল—এই আমার শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের শান্তি,—তোমার কাছে গল্প করেছি।

যাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য ষোড়শী জিদ ধরিয়াছে এবং দু'টি মাস পুরীতে নির্জ্জনে বসিয়া পাখীর মত পড়াইয়াছে—এই সেই শান্তি। শান্তির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—শান্তি সুন্দরী, চোখের চাহনি হইতে সদাই যেন স্নেহ-করুণা ক্ষরিয়া পড়ে। আমি কহিলাম—সুপ্রভাত, সকালেই ওঁর দেখা পেয়েছি।

ষোড়শী আঘাত করিয়া কহিল—এটা প্রভাত নয়,—এক প্রহর বেলা।

শান্তি হাসিয়া কহিল—আপনি বুঝি এমনি সময়েই উঠেন।

—হ্যাঁ, ঘুম কিছুতেই ভাঙে না।

শান্তির সহিত আলাপ হইয়া গেল। সমুদ্র-তীরের সঙ্গীও আর একটি বাড়িল। তীর-ভূমির বালুকায় বসিয়া অবিশ্রান্ত গল্প চলে—কোনদিন আমাদের শৈশব জীবনের তুচ্ছ ঘটনা, কোনদিন জীবনের সাফল্য, মাহাত্ম্য, কোনদিন শান্তির শৈশব-জীবনের কোন হাসির অভিজ্ঞতা—এমনি। দুইটি নারীর উচ্ছ্বসিত কুজন শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি গভীর হইয়া উঠে।

শান্তির পিতা ভাল চাকুরী করেন, অর্থেরও খুব অনটন নাই। কিন্তু দীন দরিদ্র আমার উপরেও তাঁদের স্নেহ কৃপা করুণার অন্ত নাই। শান্তির পিতাও আমাকে স্নেহ করেন,—সম্ভবতঃ শান্তির উচ্চ ধারণার উপর নির্ভর করিয়া। এত-গুলি লোক যাহাকে ভাল বলিয়া জানিয়াছে, তাহার পক্ষে এই ভালত্ব রাখিয়া চলা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন সমুদ্রতীরে গিয়া শান্তির ঝিনুক কুড়াইবার সখ হইল। ভিজা ঝিনুক তুলায় তাহার আঁচল অনেকটা ভিজিয়া গেল। আমি কহিলাম—কাপড় ভিজে গেছে, আজ বাড়ী ফেরা যাক্।

শান্তি কহিল—না, আঁচল এখনি শুকিয়ে যাবে।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল—ওকি তোমাকে ছেড়ে যাবে?

শান্তি লজ্জিত হইয়া ষোড়শীকে ধমক দিয়া কহিল—কেনই বা যাব?

এমনি করিয়া এই কথা-প্রসঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবটীও গুরুত্ব লাভ করিল। ষোড়শী বলিয়া ফেলিল—দাদা, তোমার মত হলেই হয়। শান্তি ত মত দিয়েছে।

শান্তি ঝিনুক লইয়া কি দেখিতেছিল—কথাটা শুনিতেই পায় নাই, এমনিভাবে বসিয়া রহিল। কিন্তু ষোড়শীর মুখে তাহার স্বীকারোক্তি শুনিয়া কর্ণমূল যে লাল হইয়া উঠিল, তাহা আমিও বুঝি-লাম। আমি হাসিয়া কহিলাম—যদি মত দিয়েই থাকে, তবে ভুল করেছে। শান্তির ত অর্থের অভাব নেই; অনেক ভাল বর আসবে, আর আমি হয় ত চাকরীই পাব না, পেলেও থাক্‌বে না। আমাদের গরীব ঘরের মাঝে ওঁকে মানাবেই বা কেন? না খেতে পেয়ে যাদের প্লুরিসি হয় তাদেরই একজন হ'তে যাওয়া পাগলামি।

ষোড়শী কহিল—তোমাদের কি ধারণা আমরা শুধু খেতে-পরতেই চাই।

—না তা' নয়, তবে খাওয়া-পরাটাও দরকার।

ক্রমাগত তর্কের ফলে ষোড়শী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আমার দিক হইতে দারিদ্র্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন যুক্তি ছিল না,—কিন্তু স্পষ্ট বুঝি-

লাম, এই দারিদ্র্যের দোহাই দেওয়ায় ষোড়শীকে সব চেয়ে বেশী আঘাত করিয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি এবং রমেশ-বাবুর মতে সম্পূর্ণ সুস্থও হইয়াছি। কিন্তু ষোড়শীর একঘেয়ে জিদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ষোড়শীর অনুরোধের বিপক্ষে যুক্তি দেখান ছাড়া স্পষ্ট না বলা যায় না,—কৃতজ্ঞতা না হোক্ অনন্তঃ চক্ষুলজ্জায় বাধে। যে বাল্য-সখী নিজে স্বেচ্ছায় সযত্নে সেবা করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে বেদনা দিতে ব্যথা পাওয়াই স্বাভাবিক। একদিকে মায়ের চোখের জল, অন্যদিকে ষোড়শীর মিনতির কাছে না বলিতে না পারিয়া একদিন হাঁ বলিয়া ফেলিলাম।

শুভ-বিবাহও সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

বধূ লইয়া ফিরিবার পথে কেবলই মনে হইতে লাগিল, ষোড়শী বধূ-বরণ করিতে আসিলে বলিব—ষোড়শী তুমিই বিজয়িনী!

ফিরিয়া দেখি সকলেই আসিয়াছে, কিন্তু ষোড়শী আসে নাই। যে আমাকে এমন করিয়া বাঁচাইয়া তুলিয়াছে, তাহার অনুপস্থিতি সমস্ত মনটাকে অত্যন্ত খারাপ করিয়া দিল। এ বিবাহের আগাগোড়া যাহার নিজ হাতে গড়া, সেই আজ আসে নাই—এবং এই আজ জীবনে আর কখনও ফিরিবে না। এই আয়োজন, আনন্দ সবই সহসা আমার কাছে নিরর্থক হইয়া গেল।

মা কহিলেন—অসুখ বলে' ষোড়শী আসে নি।

রমেশবাবু আসিয়াছেন, তাঁহাকে শুধাইলাম। তিনি কহিলেন—কল্ থেকে ফিরে তাকে নিয়ে আস্‌বো, কিন্তু দেখি সে শুয়ে কাঁদছে। বল্লে,—বিকেলে দু'বার বমি হ'য়েছে, আর পেট ব্যথা কর্‌ছে। ব্যথা খুব বেশী বোধ হয়; নইলে, সে ত সামান্য ব্যথা পেলে কাঁদে না, এমনি সহিষ্ণু। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে বল্লে—তুমি যাও, নইলে দাদা দুঃখিত হবে, আর আমার হ'য়ে বলো যে, আজ যেতে পার্‌লুম না বলে' আমাকে যেন ক্ষমা করে।

বলিবার মত কোন উত্তর ছিল না, কিছু বলিলামও না। বারবার শুধু মনে হইতে লাগিল,—যে পথের ভিখারীর জীবন এত যত্নে মধুময় করিয়া তুলিল, সেই তাহার সাথী রহিল না; যে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া গর্ব্বের সহিত ফিরিয়াছে, তাহারও গর্ব্ব ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে! কিন্তু একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি,—ষোড়শীর অসুখ করে নাই—এ তার মিথ্যা অভিনয়!

—টিউবওয়েল—

[পূর্ব্বানুস্মৃতি

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

বার

এক বৎসর পরের কথা।

একদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার পর আহারাদি শেষ করে' আমি আমার শোবার ঘরে একখানি ইজি-চেয়ারে শুয়ে সেদিন খবরের কাগজের একটা প্রবন্ধ পড়ছি; আমার গৃহিণী মেজেয় বসে' কি যেন করছিলেন, এমন সময় ঘরের মধ্যে এসে আমার গৃহিণীর পাশে মেজেতে বস্‌ল।

আমি তার দিকে চেয়ে বল্‌লাম, "কি রমেশ, খাওয়া-দাওয়া ত অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। এখনও শোও নি যে!"

রমেশ বল্‌ল, "আমি এত সকালে কোনদিন শুই না। ছোড়দা'র কাছেই ত দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত থাকি।"

আমি বল্‌লাম, "আজ তা' হ'লে দীনেশের দরবার থেকে এত আগেই বেরিয়ে এলে যে?"

রমেশ বল্‌ল, "মায়ের কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

গৃহিণী বল্‌লেন, "এমন কি জরুরী কথা বাবা, যে, দশটার সময় না জিজ্ঞাসা করলেই চল্‌ল না।"

রমেশ বল্‌ল, "তেমন দরকারী কিছুই নয়। আজ ক'দিন থেকেই কথাটা বল্‌ব বলে' মনে করি, কিন্তু মায়ের কাছে যখন আসি, তখন আর মনে থাকে না। আজ এই একটু আগেই ছোড়দা'র ঘরে বসে' কথাটা মনে হ'ল, তাই এই অসময়েই এসেছি। মা, আমার কথা শোনবার এখন আপনার সময় হবে ত?"

গৃহিণী হেসে বল্‌লেন, "তোমার কথা শোনবার জন্য আমি সব সময়ই প্রস্তুত রমেশ।"

রমেশ বল্‌ল, "আচ্ছা মা, এই দেড় বছর কাজ করে' কি আমার পাঁচ শ' টাকা জমে নি?"

গৃহিণী বল্‌লেন "কেন, তুমি কি তোমার টাকার হিসাব রাখ নি।"

রমেশ এই কথা শুনে আমার দিকে চেয়ে বল্‌ল, "শুনেছেন বাবু, আমার মায়ের কথা। এমন কথা ত কখনও শুনি নি যে, ছেলে টাকা এনে কাছে রাখবে, আর তার হিসাব লিখে রাখবে।"

আমি বল্‌লাম, "কেমন ঠিক জবাব মিলেছে ত।"

গৃহিণী হেসে বল্‌লেন, "স্বীকার করছি, কথাটা বলা আমার ঠিক হয় নি। সত্যিই ত, মায়ের কাছে ছেলে টাকা এনে দেবে, তার আবার হিসাব সে রাখতে যাবে কেন? পরেশ, নরেশ কতদিন কত টাকা এনে দেয়, তার হিসাব কি তারা রাখে? আমিও হিসাব রাখি না। কিন্তু, তোমার টাকার হিসাব আমাকে রাখ্‌তে হয়েছে। কেন, তা' শুন্‌বে? তোমার ঐ পাঁচ শ' টাকা জমাবার খেয়ালের জন্য। তোমাকে সেই হিসাবের খাতা এনে দেখাব বাবা।"

রমেশ বল্‌ল, "মা আপনার আজ কি হয়েছে? আমি কি হিসাব দেখতে চেয়েছি; আমি শুধু

আমি হেসে বল্‌লাম, "বেশ তাই হবে।"

দীনেশ বল্‌ল, "অতএব, আপনারা সকলে ধীরভাবে উপবেশন করুন। বাবা, আপনি শুয়েই থাকুন। আমার এ আদেশ এই সব আগন্তুকদের উপরই। শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র, আর বিলম্ব করো না, রাত এগারটা বেজে গেছে। তোমার কথা আরম্ভ কর।"

গৃহিণী বল্‌লেন, "দীনেশ, তুমি একটু চুপ করলেই রমেশ কথা বল্‌তে পারে।"

দীনেশ বল্‌ল, "এই আমি সাট্ আপ। রমেশ কথা আরম্ভ কর। সকলেই অধীর হয়েছেন।

ক্রমশঃ
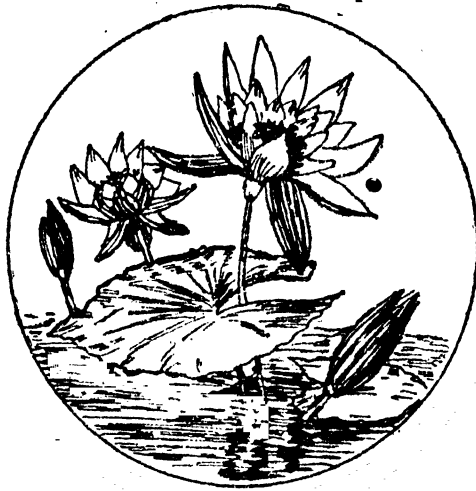
—উড়ো-মেঘ—

রায় শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, বি-এ, ও-বি-ই

—"জ্যোতি, শীগ্‌গির আয়।"

—"কি হয়েছে বিজু দা'?"

—"আরে, সর্ব্বনাশ হয়েছে তোর মা গঙ্গার ঘাটে যেতে গিয়ে মোটর চাপা পড়েছে! হাঁস-পাতালে নিয়ে গিয়েছে, শীগ্‌গির আয়।"

—"কি সর্ব্বনাশ! কি হবে বিজু দা', মা বাঁচবে ত?"

তাড়াতাড়ি বুড়ী ঝিকে বাড়ী আগলাইতে বলিয়া চতুর্দ্দশবর্ষীয়া জ্যোতি প্রতিবেশী বিজয়-কৃষ্ণের সঙ্গে একখানি ঠিকা-গাড়ী করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতি অল্পবয়সে জ্যোতির মা বিধবা হইয়া-ছিলেন। স্বামী মার্চ্চেন্ট-আফিসে অল্প বেতনে কাজ করিতেন। পৈত্রিক বাড়ী এবং সামান্য কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া কন্যার জন্মগ্রহণের পরেই তিনি সংসার হইতে বিদায় লন। দরিদ্র বিধবা অতিকষ্টে জ্যোতিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার একমাত্র ভাই। তিনি কোন্নগরে টিকিট কলেক্টর; মাসে দু'-একবার ভগ্নীর তত্ত্বাবধান করিতেন। জ্যোতি দেখিতে বেশ সুশ্রী। পাড়ার মেয়েস্কুলে পড়াশুনা, সেলাই ও গানে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। প্রতিবেশী বিজয়কৃষ্ণ জাতিতে শুঁড়ি হইলেও এই ব্রাহ্মণ পরি-বারের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। জ্যোতির ঠাকুরদাদার সহিত বিজয়কৃষ্ণের বাপের বেশ জানাশুনা ছিল। অনেক দিন হইতেই এই দুই গৃহস্থ পরিবার প্রতিবেশীসূত্রে আবদ্ধ ছিল। বিজয়কে জ্যোতি জন্মাবধি দাদা বলিয়া ডাকিত।

দুই

"বিজু দা' আমাকে এ কোথায় আন্‌লে? কৈ, এ ত হাসপাতাল নয়, এখানে ত লোকজন কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বল, মা কোথায় আছে?"

কাশীপুরের একটা প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ীতে বিজয় জ্যোতিকে লইয়া আসিল। বাড়ীর আকার দেখিয়া প্রথমে জ্যোতি ভাবিয়াছিল, ইহা বুঝি হাসপাতাল। উপরে উঠিয়া একটা প্রকাণ্ড ঘরের মেজে ফরাসের উপর বিজয় তাহাকে বসিতে বলিল।

একটা উজ্জ্বল কেরোসিনের আলো ঘরে জ্বলিতেছিল। এক উড়িয়া চাকর ভিন্ন জ্যোতি সেখানে আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিস্তব্ধতায় ভীত হইয়া সঙ্গীকে উপরোক্ত প্রশ্ন করিল। বিজয় একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—"এটা হাসপাতালের বাইরের ঘর, তোর মা একটু দূরে অন্য এক বাড়ীতে আছে, সেখানে খবর দিয়েছি এখুনি ডাক্তারবাবু এসে তোকে মার কাছে নিয়ে যাবে। তুই চুপ করে' বোস, আমি ডাক্তারকে ডেকে আন্‌ছি।"

এই বলিয়া সে নীচে চলিয়া গেল। একটু পরেই একখানি মোটরের শব্দ শোনা গেল। মোটরখানা আসিয়া বাড়ীতেই থামিল। পরক্ষণে কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে কেহ উঠিতেছে এইরূপ শব্দ জ্যোতি শুনিতে পাইল।

তারপর একটী সুপুরুষ যুবা, বয়স—বিশ-বাইশ বৎসর, পরিধানে চুড়িদার পাঞ্জাবী, কোঁচান ঢাকাই কাপড়, পায়ে লপেটা জুতা, গলায় ঢাকাই চাদর, এসেন্সের গন্ধ ছড়াইয়া জ্যোতির ঘরে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া জ্যোতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—"আপনি ডাক্তারবাবু? মা কোথায়? কেমন আছেন? শীগগির নিয়ে চলুন না।"

যুবকটী হাসিয়া বলিল—"কৈ, তোমার মায়ের কথা ত আমি কিছু জানি না। তিনিও এসেছেন না কি? দাঁড়ালে কেন, বোস।" এই বলিয়া জ্যোতির হাত ধরিয়া জোর করিয়া ফরাসের উপর বসাইয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।

জ্যোতি—"তা'—আপনি ডাক্তারবাবু নন? আমার মা যে মোটর চাপা পড়েছে—ডাক্তার-খানায় নিয়ে গেছে। বিজু দা' মাকে দেখাবার জন্য আমাকে এখানে এনেছে। তা' হ'লে এটা কি ডাক্তারখানা নয়? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে!" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে যতই কাঁদিতে লাগিল, যুবকটী তাহাকে ততই জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। জ্যোতি তখন চীৎকার করিয়া—"ও গো বাবা গো, আমায় রক্ষা কর গো!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। যুবকটী বেগতিক দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বিজয় নীচে একটা কামরায় অপেক্ষা করিতেছিল। বন্ধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি এত শীগগির চলে এলে? পছন্দ হয়েছে ত? একেবারে ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে—এখনও কুমারী।"

যুবক—"পছন্দ কি? কি কাণ্ড বল দেখি? তুমি কি আমাকে বিপদে ফেলতে চাও? মেয়েটাকে কি জোচ্চুরি করে' এখানে এনেছো?"

বিজয়—"কেন কি হ'ল? পছন্দ হ'ল না?"

যুবক—"আরে, গাধা, পছন্দের কথা নয়—অমন মেয়ে পেলে আমি ত বিয়ে কর্‌তে পারি; কিন্তু এ যে ভদ্রলোকের ঘরের ভাল মেয়ে এনেছো, একে নষ্ট করে' কি শেষে তুমি ও আমি জেলে যাবো।"

বিজয়—"আচ্ছা, আমি দেখছি"—এই বলিয়া উপরে গেল।

জ্যোতির ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে ভয়ানক কাঁদিতেছে এবং বিজয়কে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বিজু দা' আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে তুমি এখানে মিছে কথা বলে' আমায় নিয়ে এসেছো। শীগগির আমায় ছেড়ে দাও।"

বিজয় বালিকাকে বুঝাইল যে, যে বন্ধুটী আসিয়াছে সে খুব বড়লোকের ছেলে, তাহার কথা শুনিলে আর তাহাদের অর্থের অভাব থাকিবে না এবং জ্যোতিরও অনেক বসন ভূষণ লাভ হইবে। জ্যোতি ব্রাহ্মণকুমারী হইলেও বিজয়ের পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাড়ী নিয়ে চলো।"

বিজয় কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। শেষে বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক হইল যে, তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসাই ভাল। তাহারা তাহাকে ভয় দেখাইল যে, যদি সে কোনওরূপ চীৎকার বা একথা প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহাকে খুন করিবে।

তিন

এদিকে জ্যোতির মাতা গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া বৃদ্ধা ঝিয়ের নিকট শুনিলেন বিজু জ্যোতিকে গাড়ী করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কারণ, বিজুর সহিত জ্যোতি এ পর্য্যন্ত বাড়ীর বাহিরে যায় নাই। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন, সুতরাং ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া তাঁহার ভ্রাতাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। বৃদ্ধা যখন টেলিগ্রাম

নয়নে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। যখন জ্যোতির মাতার সম্মুখে জমিদার-গৃহিণী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাবী বধূকে পছন্দ হইয়াছে কি না, জমিদার-পুত্র হাসিয়া সম্মতি জানাইল।

সাত

বিবাহের আর তিন দিন আছে। জমিদার-গৃহিণী কলিকাতা হইতে একখানি পত্র পাইয়া অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। বিবাহের আয়োজন বন্ধ করিতে পুত্রকে বলিলেন। নরেন কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"কোলিকাতায় মেয়েটার চরিত্র ভাল ছিল না, তাই তার মা তাকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে।"

ছেলে—"তুমি কি করে' জান্‌লে?"

মা—"গোপনীয় খবর পেয়েছি।"

ছেলে—"কে বল্‌লে তোমায়?"

মা—"একখানা উড়ো চিঠি পেয়েছি।"

ছেলে চিঠি দেখিতে চাহিল, মা আনিয়া দিলেন। চিঠিটা এই—

"বিনীত নিবেদন—শুনিলাম আপনার পুত্রের সহিত বেণী বাঁড়ুয্যের কন্যার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে ঐ কন্যা পাড়ার এক শুঁড়ির ছেলের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তাহার জাতিপাত হইয়াছে এবং ঐ কন্যার বিবাহ হয় নাই। হিতার্থে নিবেদন করিলাম। ইতি,

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী"

নরেন পত্রখানা পড়িয়া মর্ম্মাহত হইল; কারণ, এই কয় মাস জ্যোতির রূপের এবং গুণের কথা জানিয়া তাহার বিবাহ না করিবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছিল। জ্যোতিকে বিবাহ করিলে প্রকৃত জীবন-সঙ্গিনী পাইবে এবং দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় এক সহকর্ম্মিনী লাভ হইবে, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। মাকে বলিল—"মা, উড়োচিঠি লিখে লোক পরের মেয়ের অনেক সময় শত্রুতা করে। তার চেয়ে এ বিষয় মেয়ের মাকে স্পষ্ট করে' জিজ্ঞাসা করাই ভাল, সত্যি কি মিথ্যে।"

মা—"তাও কি হয়? যদি সত্যিই হয়—তা' হ'লে কি তারা স্বীকার করবে?"

ছেলে—"বাস্তবিকই যদি মিথ্যা হয়, তা' হ'লে কি ওঁরা বলবে সত্যি। মিথ্যেও ত হ'তে পারে। এতদূর কথা দিয়ে আর আমাদের আত্মীয়-কুটুম্বদের বিয়ের কথা জানিয়ে শেষে ভেঙে দিলে সমাজে আমাদেরও ত একটা বদনাম। তার চেয়ে ওঁদের চিঠিখানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করাই ভাল। যতদূর তোমার কাছে শুনেছি, ওঁরা ধর্ম্মভীরু লোক আর কাশীশুদ্ধ বাঙ্গালী ওঁদের সুখ্যাতি করে।"

মা—"সুখ্যাতি করতে পারে বাবা, কিন্তু তারা হয় ত কোলকাতার কাণ্ড জানে না।"

ছেলে—"আচ্ছা বেশ, আজ কিছু করো না, আমি আজ ভেবে দেখে তোমায় পরে বলবো।"

আট

আকাশে আজ শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের আলোয় ধরাতল যেন ধৌত হইয়া যাইতেছে। জ্যোতি ভাবী সুখের স্বপ্নরাজ্যে ভাসিয়া গান গাহিতেছে—

"চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে?
মোহনসুরে ধীরে মধুরে,
পরাণ বীণায় কে গো বাজিলে?"

হঠাৎ নীচে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। তাহার মাতা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হইতে আরতি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন ভাবিয়া সে দরজা খুলিতে গেল। দরজা খুলিয়াই দেখিল সম্মুখে তাহার ভাবী বর। লজ্জায় তাড়াতাড়ি পলাইয়া উপরে যাইতে লাগিল। নরেন পিছনে পিছনে উপরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মা কোথায়?"

জ্যোতি প্রণাম করিয়া বলিল—"এখনও

মন্দির থেকে আসেন নি। আপনি একটু বসুন, এখনি আসবেন।

নরেন—"হাঁ বসি।—তোমার মার সঙ্গে খুব গুরুতর কথা আছে।"

জ্যোতি ভাবী স্বামীর মুখমণ্ডল গুরুগম্ভীর এবং বিষাদাচ্ছন্ন দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল—"তা' আমায় বলুন না, কি হয়েছে? যদি মায়ের আস্‌তে দেরী হয়, আমি না হয় তাঁর হয়ে জবাব দেব।"

নরেন—"সে সব কথা বলে' তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই নি। তবে একটা খবর পেয়েছি, সেটা সত্যি কি মিথ্যে জান্‌তে এসেছি।"

জ্যোতি মাথা নীচু করিয়া বলিলেন "দেখুন, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি নি, তার জন্য, আর লোককে বিশ্বাস করে' যথেষ্ট লাঞ্ছনা-ভোগ করেছি। যখন সত্যি কথা বলে' এত কষ্ট সহ্য করতে পেরেছি, তখন আর মিথ্যে কথা বলবার ত কোন কারণই নেই।"

নরেন নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল।

জ্যোতি বলিল—"কি ভাবছেন, বলুন না কেন? আমাদের কিছুই লুকোন নেই।"

নরেন তখন তাহাদের লোক লাঞ্ছনা ইত্যাদির কথা ভাবিয়া মনে করিল যে, পত্রের লিখিত ঘটনাটী বোধ হয় মিথ্যা এবং এই মিথ্যা কুৎসার জন্যই বোধ হয় তাহারা দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছে। যাহা হউক, কম্পিত হস্তে পকেট হইতে কলিকাতার প্রাপ্ত চিঠিখানি জ্যোতির হাতে দিয়া বলিল—"পড়ে দেখ।"

সে চিঠিখানি পড়িয়া বলিল—"কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা।"

নরেন স্তম্ভিত হইয়া বলিল—"যদি বাস্তবিকই আমাকে ভাবী স্বামী ভাবে দেখে থাক, তা' হ'লে সব কথা নির্ভয়ে খুলে বল।"

জ্যোতি তাহার গত জীবনের দুর্ভাগের কাহিনী বলিয়া চলিয়াছিল। শুনিতে শুনিতে নরেন কাঁদিয়া ফেলিল। "জ্যোতি আমায় মাপ কর! আমিই সেই জমিদারের ছেলে, যে, বিজয়ের সাহায্যে তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে চেষ্টা করেছিল। অল্পবয়সে বাপ মারা গিয়ে আমি চরিত্রহীন হয়েছিলাম। তোমার সেদিনকার পবিত্র ও করুণ মূর্ত্তি দেখে আমি শপথ করেছিলাম যে,—জীবনে আর কখনও স্ত্রীলোকের সম্পর্কে থাকব না। সেই জন্যই এতদিন বিবাহ করি নি।"

জ্যোতিও কাঁদিতে লাগিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নরেন বলিল—"তুমি আমায় ক্ষমা করে' যদি বিয়ে কর, তা' হ'লেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। বল জ্যোতি, তুমি আমায় মাপ কর।"

জ্যোতি নরেনের পদধূলি লইয়া বলিল—"আপনি সেই দুর্দ্দিনে আমায় অসহায় পেয়ে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে পার্‌তেন, কিন্তু করেন নি বলে' আমি সেদিন থেকে মনে মনে আপনার মনুষ্যত্বের পূজা করে এসেছি। প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না।"

—"বেশ তাই হবে" বলিয়া নরেন উঠিয়া পড়িল। জ্যোতি তাহার মাতার আসা পর্য্যন্ত তাহাকে বসিতে বলিল, কিন্তু সে তাহার মাতার নিকট বক্ষের পাষাণ ভার নামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিল—"এই চিঠি পেয়ে অবধি মার মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে' আমি এখনি গিয়ে তাঁর মনের দুঃখ মেটাব" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

শেষ

বাড়ী আসিয়া নরেন মাতার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। তারপর এক পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোতি ও নরেনের বিবাহ কাশীর বাঙ্গালীটোলার একটী চির স্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিল।

নিবেদন

এ দুর্দ্দিনেও যাঁহাদের অনুগ্রহ লাভে গল্পলহরী বঞ্চিত হয় নাই, তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন গল্প-লহরীর দেয় বার্ষিক মূল্য মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দেন। তাহা হইলে কাগজ বিলম্বে পাইবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকিবে [illegible] এবং আমাদের পক্ষেও বহু সুবিধা হইবে। যিনি একান্ত গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, [illegible] চৈত্রের মধ্যে জানাইবেন। অন্যথা ভি পি পাঠান হইবে। আশা [illegible] ভি পি ফেরৎ [illegible] অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিবেদন ইতি

কর্ম্মকর্ত্তা—গল্প লহরী